"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

২৭শ বর্ষ।

(১৩৩১ মাঘ হইতে ১৩৩২ পৌষ পর্য্যন্ত)

উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার

কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৷০ টাকা।

উদ্বোধন সূচী

(২৭ বর্ষ—মাঘ ১৩৩১ হইতে পৌষ ১৩৩২)

চক্র-প্রবর্ত্তন

চারু বসন্ত প্রভাতে,
কোকিলের মধু গীতিতে.
প্রলয় ভীষণ স্ফূর্ত্তিতে,
ভূধর-অগ্নি উৎপাতে,
তুমি হাসু বিশ্বতোমুখ
ব্যাপিয়া রহিছ ধরা।
--ব্যোম্ ব্যোম্ সুখ পারা।
দুর্ভিক্ষ মৃত্যু উৎসবে,
অতি চঞ্চল মহাদানবে,
তোমার স্ফূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
—ব্যোম্ ব্যোম্ শঙ্কর।
অনন্ত অনন্ত গ্রহ-উপগ্রহ গ্রাসিয়া ব্যাপিয়া তুমি,
অনল অনিলে অপ্ দেশ কালে পেতেছ আসন তুমি।
সূর্য্যে তোমার তীব্র আভা, চন্দ্র-হাস্যে তোমার সুষমা,
তারকা ছাদিত নিখিল গগনে জড়িত রহিছে গরিমা।
বিশ্বকর্ম্মা তুমি।
নামরূপ এই প্রকৃতির দেহে অসীম অঙ্ক আঁকি
শিক্ষকরূপে দাঁড়াইয়া দূরে দেখিছ কত যেবা কি!
মাতা প্রকৃতিরে জড় আখ্যা সুসন্তান শত শত
যন্ত্র পাতি পটুতা বিস্তার, বিফল স্পর্দ্ধা যত।

বিদ্যুৎ-প্রকাশ, তব অট্টহাস, মেঘ গর্জ্জে কড়কড়া
অশনি-নিপাত, সব ভূমিসাৎ, ভাঙ্গা শুধু নাই গড়া।
এস সৃষ্ট জীব। ভয়ঙ্কর শিব নাচেন প্রলয় রঙ্গে
প্রলয়ের শেষে সৃষ্টি সূচনা সৃজন নূতন ভঙ্গে।
ত্রিসংসার গ্রাস, ঋতু-বর্ষ মাস সৃজন নবীন পুনঃ,
শঙ্কট-শিখা নিভিয়া যে গেল, সংযত শান্ত মনঃ।
ওঁ শান্তিঃ॥

—শ্রীসুশীলকুমার দেব।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৭ই ভাদ্র, ১৩২৫। আমার অসুখ করিয়াছিল, একটু ভাল হতে আজ সন্ধ্যারতির পরে গেছি। মা শয়ন করিয়াছিলেন। দেখেই বল্‌লেন "কি গো, ভাল আছ? অসুখ সেরেছে?" "হ্যাঁ, মা"। মা সাংসারিক কুশল প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন। ঢাকার একটি শিষ্যা মাসখানেক হইতে চলিল উদ্বোধনে আছেন—তিনি বল্লেন—"মা তেল মালিস করে দেবো? দিদির (আমার) তো শরীর ভাল না," মা—"তা হোক্, ও দিতে পারবে।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করায়ও বললেন "না, না, ও তেল দিতে পারবে। তুমি না হয় একটু বাতাস কর," তিনি বাতাস করিতে লাগিলেন। একটু বাতাস করার পর মা বললেন 'হয়েছে ঠাণ্ডা লাগছে, এখন একটু শোওগে, জল খেয়েছ? মিষ্টি নিয়ে জল খাও না"। মা এমনি করে সকলের মনস্তুষ্টি করে থাকেন। তিনিও উঠে মায়ের কথা মত জল খেয়ে শয়ন করিলেন। মা—(আমাকে) কাল কেমন ঠাকুরের বই পড়া হলো, সরলা পড়েছিল,

কি সব কথা, তখন কি জানি মা এত সব হবে? কি মানুষই এসে-ছিলেন। কত লোক জ্ঞান পেয়ে গেল। কি সদানন্দ পুরুষই ছিলেন! হাসি, কথা, গল্প, কীর্ত্তন, চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই ছিল। আমার জ্ঞানে ত আমি কখন তাঁর অশান্তি দেখিনি। আমাকে এমন কত সব ভাল ভাল কথা বলতেন—"আহা, যদি লেখা পড়া জানতুম্, তা হলে অমনি করে সেই সব টুকে টুকে রাখ্‌তুম। কই গো সরলা, আজ আবার একটু পড় না।" তিনি কথামৃত পড়িতে লাগিলেন। রাখাল মহারাজের বাবা এসেছেন, ঐ স্থান হইতে পাঠ আরম্ভ হইল। "পড়া শুনতে শুনতে মা বলছেন—ঐ যে রাখালের কথা তার বাপকে বল্লেন—যেমন ওল তেমন মুখীটিত হবে। সত্যই তিনি অমনি করে রাখালের বাবার মন খুসী রাখতেন। তিনি এলেই যত্ন করে এটি ওটি দেখাতেন, খাওয়াতেন, কত কথা বলতেন—মনে ভয়, পাছে রাখালটিকে ওখানে না রাখে, নিয়ে যায়! রাখালের সংমা ছিল। সে যখন দক্ষিণেশ্বরে আস্‌ত, ঠাকুর রাখালকে বলতেন—"ওরে ওঁকে ভাল করে দেখা শুনা, যত্ন কর, তা হলে জানবে ছেলে আমাকে ভালবাসে।" পড়িতে পড়িতে বৃন্দাঝির লুচির কথা এল, মা বল্লেন—"হ্যাঁগো, সে কি কম ছিল? তার জল খাবারের বরাদ্দের লুচি যদি কোন দিন খরচ হয়ে যেতো, তবে বকে অনর্থ করতো, বলতো,—"ওমা, কেমন সব ভদ্দর লোকের ছেলে গো, আমারটি সব খেয়ে বসে থাকে—মিষ্টিটাও পাই না?

"ঐ সব কথা পাছে ছেলেদের কানে যায়, তাই ঠাকুর আবার ভয় করতেন—একদিন ভোরে উঠে এসেই নবতে আমাকে বলছেন—"ওগো বৃন্দের খাবারটিত খরচ হয়ে গেছে তা তুমি তাকে রুটি, লুচি যা হয় করে দিও না, নইলে এক্ষণি এসে আবার বকাবকি করবে। দুর্জ্জনকে পরিহার করে চল্‌তে হয়।"

আমি ত বৃন্দে আসতেই তাড়াতাড়ি বল্লুম—"বৃন্দে, তোমার খাবার তৈয়ের করে দি, খরচ হয়ে গেছে, তখন বল্লে—"থাক্ আর তৈয়ের করতে হবে না, এমনিও দাও, তখন যেমন সিদে সাজায়, তেমনি করে ঘি, ময়দা, আলু, পটল সব দিলুম।"

এক অধ্যায় পাঠ হলে, সরলাদিদি গোলাপমার সেবায় গেলেন। তাঁর অসুখ।

মা আস্তে আস্তে বলছেন—"ঠাকুর, ভগবানের বিষয় ছাড়া কোন কথাই বল্‌তেন না। আমাকে বলতেন, দেখেছ ত মানুষের দেহ—কি, এই আছে, এই নাই, আবার সংসারে এসে কত দুঃখ, কত জ্বালা পায়। এ দেহের আবার পয়দা করা কেন? এক ভগবানই নিত্য সত্য তাঁকে ডাকতে পার্‌লেই ভাল। দেহ ধর্‌লেই নানা উপসর্গ।" "সে দিন বিলাস এসে বল্‌ছে—'কত সাবধানে আমাদের থাক্‌তে হয় মা, পাছে মনেও কিছু উঠে, এই ভয়েও সশঙ্ক থাক্‌তে হয়। তাই ত ওরা হল সাদা কাপড়—আর সংসারীরা হল কাল কাপড়, কাল কাপড়ে কালী পড়লেও অত ঠাওর হয় না, কিন্তু সাদা কাপড়ে এক বিন্দু পড়লেই সকলের চোখ পড়ে। দেহ ধর্‌লেই বিপদ। সংসার ত এই কাম-কাঞ্চন নিয়েই আছে। ওদের (সাধুদের) কত ত্যাগ করে চল্‌তে হয়। তাই ঠাকুর বলতেন 'সাধু সাবধান।"

ইতিমধ্যে হরিহর মহারাজ ঠাকুরের ভোগ দিতে এসেছেন। তাঁকে দেখাইয়া মা বলছেন—"এই দেখ একটি ত্যাগী ছেলে, ঠাকুরের নাম নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সংসারী লোক খালি গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলের জন্ম দিতে থাকে, ঐ যেন কাজ! ঠাকুর বলতেন—দু একটি ছেলে হওয়ার পর সংযমে থাকতে। ইংরাজেরা নাকি বিষয় বুঝে ছেলের জন্ম দেয়, যে, এই (সম্পত্তি) আছে এতে এ কটি ছেলে হলে বেশ চলবে এবং তাই হবার পর স্ত্রী-পুরুষ দুজনে বেশ আলাদা আপন আপন কাজ নিয়ে থাকে। আর আমাদের জাতের।

হাস্‌তে হাসতে বলছেন, "কাল একটি বউ এসেছিল মা! গাঁড়া গোঁড়া ছোট্টটি, তার কোলে পিঠে ছেলে, ভাল করে সাম্‌লে নিতেও পাচ্ছে না"।

"তারপর বলে কি, 'মা, সংসার ভাল লাগে না।' আমি বলি—'সে কি গো, তোমার এই সব কাচ্চা বাচ্চা।' তাতে বল্‌লে—"ঐ পর্য্যন্তই, আর হবে না"। বল্লুম—'তা পার যদি, ভালই ত গো,' বলে হাস্‌তে লাগলেন।

আমি—"আচ্ছা, মা সংসারেত স্ত্রীলোকদের স্বামী একান্ত পূজ্য ও গুরু। তাঁর সেবায় সালোক্য, সাযুজ্য পর্য্যন্ত মিলে থাকে শাস্ত্রে বলে। সেই স্বামীর কতকটা মতের বিরুদ্ধে কোন স্ত্রী যদি অনুনয় বিনয় বা সদালাপ দ্বারা সংযমী হয়ে থাকতে চেষ্টা করে তাহাতে কি পাপ হয়?" মা—"ভগবানের জন্য হলে কোন পাপ হয় না মা, কেন হবে? ইন্দ্রিয় সংযম চাই, এই যে বিধবাদের এত ব্যবস্থা সব ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য।"

"ঠাকুরের কোন বিষয়েই ভগবান ছাড়া ছিল না। আমাকে যে সব জিনিষ দিয়ে ষোড়শী পূজা করেছিলেন সেই সব শাঁখা সাড়ী, ইত্যাদি—আমার ত গুরু-মা ছিলেন না,—কি করবো ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি ভেবে বল্লেন—'তা তোমার গর্ভধারিণী মাকে দিতে পার; তখন বাবা বেঁচে ছিলেন—'কিন্তু দেখো তাঁকে যেন মানুষ জ্ঞান করে দিও না, সাক্ষাৎ জগদম্বা ভেবে দিবে'। তাই কল্লুম এমনি শিক্ষা তাঁর ছিল।"

শ্রীমান্ মাসিক যে পাঁচ টাকা দেয়, তাহা মাকে দিতে দিয়েছিল। দিতেই মা বল্লেন—'কেন মা, এখন তার কষ্ট, এখন নাই বা দিলে?' আমি—"কত দিকে কত খরচ হয়ে যাচ্চে মা, এত আর বেশী নয়। যে আপনার সেবায় দিতে পারে তারই মনের তৃপ্তি; নইলে—", মা বল্লেন—"হাঁ, তা বটে এখানে দিলে সাধু ভক্তের সেবায় লাগে।"

মাল্‌পো এনেছিলুম, খুলে ঠাকুরের কাছে দিতে বল্লেন। রাত অনেক হয়েছিল প্রায় সাড়ে দশটা—ভোগ হয়ে গেছে—মায়ের আহারের পর প্রসাদ নিয়ে বিদায় হলুম।

১৮ই ভাদ্র—১৩২৫ মা জপের আসনে বসে আছেন। আরতি হয়ে গেছে। রাধুর স্বামীর জন্য মাংস রেঁধে এনেছিলুম, রাধুকে ডেকে তেতলায় রাধুর ঘরে উহা রেখে আস্‌তে বল্লেন। আমি উহা রেখে এসে প্রণাম করে বস্‌লাম। মা কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। একটি আত্মীয়া মেয়ে এসে মাকে বল্‌ছেন—"তুমি আমার মনটি ভাল করে দাও, আমার মনে বড় অশান্তি, আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা নাই, যা আছে তোমাকে লিখে পড়ে দিয়ে যাব। আমি মরবার পরে তুমি সেই মত কাজ কোরো।" মা হেসে বল্লেন—'তা কবে মর্‌বি গো।' শেষে গম্ভীর হয়ে বললেন—

"তা হলে, আস্তে আস্তে বাড়ী চলে যাও, এ সব জায়গায় যেন একটা বিপদ করে বসো না। এমন জায়গায় থেকে, আর আমার কাছে যে— (এই পর্য্যন্ত বলেই সাম্‌নে নিয়ে বল্লেন) এই সব সাধুভক্ত, ঠাকুর, এমন স্থানে থেকেও যদিও তোর মনের অশান্তি না ঘুচে, তবে তুই কি চাস বল্ দেখি? * * * *

কি জীবন তুই পেয়েছিস বল দেখি?—কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। এ জন্মটা যে কিনে নিয়ে যেতে পার্‌তিস্। এ স্থান যখন চিন্‌লিনি—চিন্‌বি একদিন যখন অভাব হবে, তবে এখন বুঝলিনি। তোর পাপ মন, তাই শান্তি পাস্‌নে। কাজ কর্ম্ম না করে বসে থেকে থেকে মাথা গরম হয়ে উঠেছে। একটা ভাল চিন্তা কি তোর কিছু করতে নাই? কি অশুদ্ধ মন গো।—বলেই আবার হেসে উঠে আমার পানে তাকিয়ে বল্‌ছেন— "কি ঠাকুরের লীলা মা দেখচ! মায়ের বংশটি আমার কেমন দিয়েছেন। কি কুসংসর্গই কচ্ছি দেখ। একটি ত পাগলই, আর এইটিও পাগল হবার গতিক হয়েছে। আর ঐ দেখ আর একটি! কাকেই বা মানুষ করে-ছিলুম মা—একটুও বুদ্ধি নেই। ঐ বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কখন স্বামী ফির্‌বে। মনে ভয়, ঐ যে গান বাজনা যেখানে হচ্ছে, পাছে ঐ খানেই ঢুকে পড়ে! দিন্ রাত সাম্‌লে নিয়ে আছে কি আসক্তি মা! ওর যে এত আসক্তি হবে, তা জানতুম না।" আত্মীয়াটি বিষণ্ণমুখে উঠে গিয়ে শয়ন কর্‌লেন। মা—"কত সৌভাগ্যে মা এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাট্‌তে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজ কর্ম্মের মধ্যেও একটি সময় করে নিতে হয়। আমার কথা কি বলবো মা, আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটার সময় উঠে জপে বসতুম। কোন হুঁস থাক্‌তো না। একদিন জোছনা রাতে নবতে সিঁড়ির পাশে * বসে জপ কচ্ছি,—চারিদিক নিস্তব্ধ! ঠাকুর যে সে দিন কখন ঝাউ তলায় শৌচে গেছেন, কিছুই জান্‌তে পারি নি—অন্যদিন জুতোর

* শ্রীশ্রীনহবতের নীচের কুঠরীতে থাকিতেন। এবং উহার পশ্চিমের বারান্দায় সিঁড়ির পাশে গঙ্গার দিকে দক্ষিণ মুখ হয়ে ধ্যান করিতেন।

শব্দে টের পাই। খুব ধ্যান জমে গেছে। তখন আমারি অন্য রকম চেহারা ছিল—গয়না পরা, লালপেড়ে সাড়ি। গায়ে হতে আঁচল খসে বাতাসে উড়ে উড়ে পড়্ছে কোন হুঁস নাই। ছেলে যোগেন সে দিন ঠাকুরের গাড়ু দিতে গিয়ে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেছিল। সে সব কি দিনই গিয়েছে মা। জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড হাত কবে বলেছি—'তোমার ঐ জোছনার মত আমাব অন্তর নির্ম্মল করে দাও'। জপ ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে দেখ্‌বে—(ঠাকুবকে দেখিয়ে) উনি কথা কবেন—মনে যে বাসনাটি হবে তক্ষুণি পূর্ণ করে দেবেন—কি শান্তি প্রাণে আস্‌বে। আহা। তখন কি মনই ছিল আমার। বৃন্দে (ঝি) একদিন আমার সাম্‌নে একটি কাঁশি গড়িয়ে দিলে—আমার বুকের মধ্যে যেন এসে লাগ্‌লো। * সাধন কত্তে কত্তে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে, বাগ্‌দি, ডোমের মাঝেও তিনি—তবে ত মনে দীনভাব আস্‌বে। ওব (পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়ার) কথা কি বলবো মা, জয়বামবাটীতে ডোমেবা বিড়ে পাকিয়ে দিয়েছে, ঘরে দিতে এসেছে। আমি বল্লুম—'ঐ খানকে বাথ, তা তাবা কত সাবধান হয়ে রেখে গেল। ও বলে কিনা 'ঐ ছোঁয়া গেল, ও সব ফেলে দাও'—এই বলে তাদেব গালাগাল—'তোরা ডোম হয়ে কোন্ সাহসে এমন করে রাখতে যাস্' তারা তো ভয়ে মবে। আমি তখন বলি—তোদেব কিছু হবে না, কোন ভয় নেই'—আমি আবার তাদের মুড়ি খেতে পয়সা দি—এমন মন ওর। বাত তিনটাব সময় উঠে আমার ঐ দিকের (উত্তরের) বারান্দায় বসে জপ্ করুক না. দেখি কেমন মনে শান্তি না আসে। তাতো কর্‌বে না, কেবল অশান্তি, অশান্তি—কিসের অশান্তি তোর।"

"আমি ত মা তখন অশান্তি কেমন জান্‌তুম্ না। এখন ঐ ওদের জন্য, আর কিক্ষণে ছোটবউ ঘবে এল, আব তার মেয়েকে মানুষ কবতে গেলুম সেই হতে যত জ্বালা। যাক্ সব চলে যাক্ কাউকে আমি চাইনি।

* মা নবতে ধ্যানস্থ ছিলেন, তাই শব্দটা যেন বজ্রের মত লেগেছিল—কেঁদে ফেলেছিলেন।

এ কি মেয়ে সব হলো গা। একটা কথা শুনে না। মেয়ে লোক এত অবাধ্য ?"

গোলাপ মা "আবার কেমন করে সাজে দেখ না, ভাবে তবেই বুঝি বর ভালবাসবে। মা—"আহা, তিনি আমার সঙ্গে কি ব্যবহারই করতেন। একদিনও মনে ব্যথা পাবার মত কিছু বলেন নি। কখনও ফুলটি দিয়েও ঘা দেন নি। একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমি তাঁর ঘরে খাবার * রাখতে গেছি, লক্ষ্মী রেখে যাচ্ছে মনে করে তিনি বললেন—দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস্।' আমি বল্লুম—"আচ্ছা।" আমার গলার স্বর শুনে তিনি চমকে উঠে বললেন 'কে, তুমি ? "তুমি এসেছ বুঝতে পারি নি আমি মনে করেছিলুম লক্ষ্মী, কিছু মনে করোনি।" আমি বল্লুম—'তা বল্লেই বা।'

কখন আমাকে 'তুমি' ছাড়া 'তুই' বলেন নি। কিসে ভাল থাকবো তাই করেছেন। তিনি বলতেন—'কর্ম্ম কর্ত্তে হয়, মেয়ে লোকের বসে থাকতে নেই, বসে থাকলে নানা রকম বাজে চিন্তা কুচিন্তা সব আসে। একদিন কতকগুলি পাট এনে আমাকে দিয়ে বল্লেন—'এইগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও, আমি সন্দেশ রাখবো লুচি রাখবো ছেলেদের জন্য। আমি শিকে পাকিয়ে দিলুম আর ফেঁসোগুলো দিয়ে থান ফেঁড়ে বালিস করলুম। চটের উপর পটপটে মাদুর পাততুম—আর সেই ফেঁসোর বালিস মাথায় দিতুম। তখনও তাইতে শুয়ে যেমন ঘুম হোতো এখন এই সবে (খাট বিছানা দেখিয়ে) শুয়েও তেমনি ঘুমোই—কোন তফাৎ বোধ হয় না মা। তিনি বলতেন—ওরে হৃদু আমার বড় ভাবনা ছিল যে, পাড়া গেঁয়ে মেয়ে, এখানে কি কোথায় শৌচে যাবে, আর লোকে নিন্দা করবে, তখন লজ্জা পেতে হবে তো, ও কিন্তু এমন যে কখন কি করে কেউটেরই পায় না,—বাহিরে যেতে আমিও কখনো দেখ্‌লুম না।" তাঁর ঐ কথা শুনে আমার এমন ভাবনা হলো যে, "ওমা, উনি ত

* সেদিন সরু চাকলী পিঠে এবং সুজির পায়েস করে ঠাকুরের কাছে তখন অন্য লোক নাই দেখে শ্রীশ্রীমা নিজেই সন্ধ্যার পরেই ঐ সব ঠাকুরের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

যা চান, তাই 'মা' ওকে দেখিয়ে দেন, এইবার বাহিরে গেলেই ওঁর চোখে পড়তে হবে দেখচি। ব্যাকুল হয়ে জগদম্বাকে ডাকতে লাগলুম, "হে মা, আমার লজ্জা রক্ষা কর।" তা আমার এমনি মাটি যেন দুই পাখা দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখ্‌তেন। এত বছর ছিলুম একদিনও কারও সাম্‌নে পড়িনি। লোকে আমাকে ভগবতী বলে আমিও ভাবি সত্যিই বা তাই হবে। নহিলে আমার জীবনে অদ্ভুত অদ্ভুত যা সব হয়েছে। এই গোলাপ যোগীন এরা তার অনেক কথা জানে। আমি যদি ভাবি 'এইটি হোক্, কি এইটি খাবো' তা ভগবান কোথা হতে সব জুটিয়ে এনে দেন। আহা দক্ষিণেশ্বরে কি সব দিনই গেছে মা! ঠাকুর কীর্ত্তন কর্‌তেন,—আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবতের ঝাপড়ির ফাঁকের ভিতর দিয়ে * চেয়ে, দাঁড়িয়ে থাকতুম হাত জোড় করে পেন্নাম করতুম, কি আনন্দই ছিল। দিন রাত লোক আসছে—আর ভগবানের কথা হচ্ছে। আহা বিষ্ণু বলে একটি ছেলে, সংসারের ভয়ে আত্মহত্যাই কর্‌লে। তা ভক্তদের মধ্যে কে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ওযে আত্মহত্যা কর্‌লে ওর পাপ হলো না? তিনি বল্লেন—'ও ভগবানের জন্য দেহ দিয়েছে, ওর আবার পাপ কি? কোন পাপ নেই। তবে এ কথাটি সবাইকে বলো না। সবাই ভাবটি বুঝবে না,—তা দেখ এখন বইয়েই ছাপিয়ে দিয়েছে।

"মন না মত্ত হস্তী মা! হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে। তাই সদসৎ বিচার করে সব দেখতে হয়। আর, খুব খাটতে হয় ভগবানের জন্য। তখন আমার মন এমন ছিল—দক্ষিণেশ্বরে রাতে কে বাঁশী বাজাত, শুনতে শুনতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠতো, মনে হত সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশী বাজাচ্ছেন—অম্‌নি সমাধি হয়ে যেতো। আহা, বেলুড়েও কেমন ছিলুম। কি শান্ত জায়গাটি ধ্যান লেগেই থাকতো। তাই ওখানে একটি স্থান করতে নরেন ইচ্ছা করেছিল আর এই বাড়ীটি যে হলো এই চার কাঠা জমি কেদার দাস দিয়েছিল। এখন জমির দাম কত, এখন কি আর হয়ে উঠ্‌তো—কে জানে সব ঠাকুরের ইচ্ছা।"

---

* নহবতের বারান্দায় দরমার বেড়া দেওয়া ছিল।

এই সময়ে মাকু ছেলে কোলে করে এসে তাকে ঘরে ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে—কি করবো মা, ঘুম নেই—মা.. বল্‌চেন—"ও সত্ত্বগুণী ছেলে, তাই ঘুম নেই।"

শ্রীশ্রীমা আমবাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বললেন—"আঃ, আম্‌বাতের জ্বালায় গেলুম মা, মুখেও আবার বেরিয়েছে এই দেখো মুখে হাত বুলিয়ে। এ কি যাবে না? এই দেখো পেটেও উঠেছে, দেও তো পেটে ঐ তেলটি দিয়ে। ঐটি আমার প্রাণ গো,—দিলেই একটু কমে।"

তেল মালিস কত্তে কত্তে বল্লুম—"মা বাড়ীতে একদিন ঠাকুর পূজা করে সংসারের কাজ করতে গেছি, কিছু পরে পুনরায় ঠাকুরঘরে এসে দেখি ঠাকুরের ছবি বিন্দু বিন্দু ঘেমেছে, জানালা খোলা ছিল, ছবিতে রোদ লাগছিল। ভাবলুম্ পুজো করবার সময় হয়ত জল লেগেছিল। বেশ করে মুছে রেখে গেলুম। রোদে ঘেমেছে কি না বুঝবার জন্য কিছু পরে আবার এলুম। এবারও এসে দেখি ঠাকুর ঘেমে রয়েছেন। তখন জানালা বন্ধ করে দিলুম।

মা—"হ্যাঁ মা, তা অমন দেখা যায়। ঠাকুর বলতেন, ছায়া, কায়া, ঘট, পট সমান।

মা এইবার একটু চুপ করে রইলেন। বাসা হতে নিতে লক্ষ্মণ এসেছিল। মা বললেন, "তবে এস মা এস" প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে বাসায় ফিরলুম।

একদিন মা উত্তরের বারান্দায় বসে আছেন, জনৈক গৃহস্থ যুবক-ভক্ত মায়ের সঙ্গে কি কথা বল্‌চেন। তিনি মায়ের পায়ে মাথা রেখে বল্‌চেন—'মা আমি সংসারে অনেক দাগা পেয়েছি, তুমিই আমার গুরু, তুমিই আমার ইষ্ট, আমি আর কিছু জানি না। সত্যই আমি এত সব অন্যায় কাজ করেছি যে লজ্জায় তোমার কাছেও বলতে পারি না। তবু তোমার দয়াতেই আমি আছি।" মা স্নেহভরে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌চেন—'মায়ের কাছে ছেলে, ছেলে।" তিনি "হ্যাঁ মা। কিন্তু এত দয়া তোমার পেয়েছি বলে যেন কখন মনে না আসে যে, তোমার দয়া পাওয়া বড় সুলভ।"

২রা আশ্বিন, ১৩২৫—রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। মায়ের তক্তাপোষের পাশে নীচে মাদুর পাতা হয়েছে। মা শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমি যাইতেই বল্‌চেন—'এসো, এসো, আমার কাছে এসে বসো, একে একটু মিষ্টি দিয়ে জল খেতে দাওতো সরলা, সারা দিন খেটে আবার এই ছুটে আস্‌চে।" আমি জল খেতে আপত্তি করলুম, কিন্তু তাহা কাণেও তুল্লেন না। বল্লেন—"দেহের প্রতি একটু নজর রাখতে হয় মা, সুমতি তিন ছেলের মা হয়েই যেন বুড়ী হয়ে গেছে।" মা তাঁর আমবাতের কথা তুলে বল্লেন "এ কি হলো মা! লোকের হয় যায় আমার যেটি হবে সেটি আর ছাড়তে চায় না। ঠাকুর যে বল্‌তেন—"যত লোকে রোগ শোক, পাপ তাপ নিয়ে কত কি করে এসে ছোঁয় সেই সব এই দেহে আশ্রয় করে, তাই ঠিক মা— আমারও বোধ হয় তাই হবে। ঠাকুরের তখন অসুখ কে সব ভক্তেরা— (দক্ষিণেশ্বরে) মায়ের (কালীর) ওখানে পূজা দেবে বলে জিনিষ পত্র এনেছিল, তা ঠাকুর কাশীপুরে এনে সেই সব ঠাকুরের কাছেই ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পেলে। ঠাকুর বলতে লাগলেন—"দেখেছ কি অন্যায় করলে জগদম্বার জন্য এনে এখানেই সব দিয়ে দিলে।" * আমিত ভয়ে মরি, ভাবি এই ত অসুখ, কি জানি কি হবে। একি বাপু, কেন ওরা এমন করলে। ঠাকুরও তখন বার বার তাই বল্‌তে লাগলেন। কিন্তু পরে যখন রাত অনেক হয়েছে তখন আমাকে বললেন দেখো এর পর ঘর ঘর আমার পূজা হবে। পরে দেখবে একেই সবাই মানবে—তুমি কোন চিন্তা কোরো না'।

"সেই দিনই 'আমার' বলতে শুনলাম। কখনও 'আমার' বলতেন না। বলতেন, 'এই খোলটার', বা আপনার শরীর দেখিয়ে এই 'এর'।

"সংসারে কত রকমের লোক সব দেখলুম। ত্রৈলোক্য †

---

* কাশীপুরে এই ঘটনা হয়েছিল। কোন ভক্ত কালীর জন্য একদিন অনেক রকম মিষ্টি খাবার দাবার এনে হল ঘরে ঠাকুরের ছবির সামনে ভোগ দিয়েছিল।

† ত্রৈলোক্য বিশ্বাস—রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর পুত্র।

আমাকে সাতটা করে টাকা দিত। ঠাকুর দেহ রাখার পর (দক্ষিণেশ্বরে) দীনু খাজাঞ্চী ও অন্য সকলে লেগে ঐ টাকাটা বন্ধ করলে। * আত্মীয় যারা ছিল তারাও মানুষ বুদ্ধি করলে ও তাদের সঙ্গে যোগ দিলে। নরেন কত বলেছিল 'মায়ের ও টাকাটা বন্ধ কোরো না'। তবু করলে। তা দেখ ঠাকুরের ইচ্ছায় অমন কত সাত গণ্ডা এল গেল দীনু ফীনু সব কে কোথায় গেছে। আমার ত এ পর্য্যন্ত কোন কষ্টই হয় নি। কেনই বা হবে? ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন আমার চিন্তা যে করে সে কখনও খাওয়ার কষ্ট পায় না'।

ঠাকুরের দেহ রাখার পর তার সব ভাল ভাল জিনিষ পত্র—বনাত আলোয়ান জামা কাবা নেবে এই কথা নিয়ে গোল বাধে। তা ও সব হলো ভক্তদের ধন, তারা ও সব চিরকাল যত্ন করে রাখবে। তারাই শেষে ঐ সব গুছিয়ে নিয়ে বাক্সে পূরে বলরামের বৈঠক খানায় এনে রাখলে। কিন্তু মা ঠাকুরের কি ইচ্ছা সেখান থেকে চাকরদের কে চাবি দিয়ে খুলে তার অনেকগুলি চুরি করে নিয়ে বিক্রী করে ফেল্লে—কি, কি করলে। তা ওসব কি বৈঠকখানায় রাখতে হয়। বাড়ীর ভিতরে নিয়ে রাখলেই পারতো।

তাঁর ব্যবহারের জিনিষপত্র আর জামা কাপড় যা বাকী ছিল এখন তা বেলুড় মঠে আছে।

"আমার যে শ্বশুর ছিলেন মা, বড় তেজস্বী, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি অপরিগ্রাহী ছিলেন। কেহ কোন জিনিষ বাড়ীতে দিতে এলেও নেবার নিষেধ ছিল। আমার শাশুড়ীর কাছে কিন্তু কেহ কিছু লুকায়ে এনে দিলে তিনি রেঁধে বেড়ে রঘুবীরকে ভোগ দিয়ে সকলকে প্রসাদ দিতেন শ্বশুর তা জানতে পারলে খুব রাগ করতেন।

ঠাকুর যখন আর পূজা করতে পারলেন না, তখন হতে তার মাইনের টাকাটা বন্ধ না করে শ্রীশ্রীমাকে দিতেন।

* মা তখন বৃন্দাবনে। চিঠি যেতে মা বলেছিলেন "বন্ধ করেছে করুক। এমন ঠাকুরই চলে গেছেন, টাকা দিয়ে আর আমি কি করবো।

কি জ্বলন্ত ভক্তি ছিল তাঁর! মা শীতলা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন। শেষ রাত্রে উঠে ফুল তুলতে যাওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। একদিন লাহাদের বাগানে গিয়াছেন। একটি নবছরের মত মেয়ে এসে বল্ছে তাঁকে "বাবা এদিকে এস। এদিকের ডালে খুব ফুল আছে। আচ্ছা, নুইয়ে ধরছি, তুমি তোল।" তিনি বললেন 'এ সময়ে এখানে তুমি কে মা?' "আমি গো, আমি এই হালদার বাড়ীর।" অমন ছিলেন বলেই ভগবান তাঁর ঘরে এসে জন্মে ছিলেন। তিনি এসে ছিলেন—আর তাঁর এই সব সাঙ্গোপাঙ্গরাও এসেছিল—নরেন, রাখাল, বলরাম, ভবনাথ মনমোহন কত বলবো মা, ছোট নরেন শেষে বড় কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে পড়লো, টাকা পয়সায় জড়িয়ে পড়লো। ঠাকুর এদের যার যার সম্বন্ধে যা যা বলে গেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে।

কামারপুকুরে হরিদাসী বলে একটি মেয়ে নবদ্বীপ যাবে বলে এসে ওখানেই রয়ে গেল। আমাকে কত ভালবাসতো। তার কি বিশ্বাস ছিল মা! ঠাকুরের জন্মস্থানের ধূলো কুড়িয়ে রেখে ছিল—বলতো এইত নবদ্বীপ, স্বয়ং গৌরাঙ্গ এই খানেই এসে ছিলেন, আবার কি কর্ত্তে নবদ্বীপ যাব?" আহা কি বিশ্বাস। ঠাকুরের দেহ রাখিবার পর একজন উড়ে সাধু এসে কামারপুকুরে ছিলেন। আমি তাঁর জল চাল ইত্যাদি যা যা প্রয়োজন সব দিতুম, আর সকালে বিকালে খবর নিতুম, 'সাধু বাবা, কেমন আছগো'।

আহা তাঁর একখানি কুঁড়ে কি করেই যে বেধে ছিলাম মা। রোজ আকাশ ভরে মেঘ হতো, এই বৃষ্টি হয় হয় আর কি। তখন হাত জোড় করে বলতুম "ঠাকুর রাখ'গো রাখ, ওঁর কুঁড়ে টুক হয়ে যাক্, তার পর যত পার ঢেলো। তা, গ্রামের লোকও কাঠ কুটো যা লাগলো দিয়ে সাহায্য করলে। রোজ বৃষ্টি আসবো, আসবো কর'তো। যা হোক এমনি করে কুড়ে খানিত হয়ে গেল। কিন্তু তার কিছু দিন পরেই সাধুটি সেই কুড়েতে দেহ রাখলে।"

মা বলছেন "চল এখন ঘরে যাই।" উঠতে উঠতে বললেন "ঠাকুর বল্‌তেন এই দেহটি গয়া হতে এসেছে।" তাঁর মা দেহ রাখবার পর

আমাকে বল্লেন "তুমি গয়ায় পিণ্ড দিয়ে এস ।" আমি বল্লুম "পুত্র বর্ত্তমানে আমি দেবো সেকি হয় ? তা হকগো, আমার কি ওখানে যাবার যো আছে ? গেলে কি আর ফিরবো ?" আমি বল্লুম তবে গিয়ে কাজ নেই, পরে গয়া করতে আমিই গিয়েছিলুম । * রাত প্রায় ১৷৷•টা হয়েছে । প্রণাম করে বিদায় নিলুম ।

৩রা আশ্বিন ১৩২৫—মা—এসেছ মা এস ।" নবাসেনের বৌকে বলিলেন "তেলটি এনেছ ? দাওতো বৌমা পিঠে দিয়ে ।" বৌ আমাকে উহা দিতে বলায় মা বল্লেন "আহা, ও এই সারাদিন খেটে-খুটে, ছুটে আস্‌ছে, ওকে একটু বিশ্রাম করতে দাও । (আমাকে) বস মা বস ।" "এই ওরা ভাস্করানন্দের কথা বলছিল । আমিও কাশীতে তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম । সঙ্গে অনেক মেয়েরা ছিল । তখন মন খুব খারাপ, ঠাকুরের দেহ রাখার পর । সেই বারই বৃন্দাবনে প্রথম গেলুম । তা ভাস্করানন্দের ওখানে যখন গেলুম দেখি নির্ব্বিকার মহাপুরুষ উলঙ্গ হয়ে বসে আছে । আমরা যেতেই মেয়েদের সব বল্লেন শঙ্কা মৎ কর মায়ি, তোমরা সব জগদম্বা, সরম কেয়া ? এই ইন্দ্রিয়টা ? এর জন্য ? এত হাতের পাঁচটি আঙ্গুল যেমন তেমন একটি" আহা, কি নির্ব্বিকার মহা-পুরুষ । শীত গ্রীষ্মে সমান উলঙ্গ হয়ে বসে আছেন ।"

তেল মালিশ শেষ হবার পর বল্লেন—"চল, এখন ঠাকুরের বই একটু পড়বে । সরলাটি বোর্ডিংএ চলে গেছে মা (অন্য দিন সে পড়তো ।" পড়তে পড়তে সাধনের কথা, দর্শনাদির কথা উঠলো ।

"এই গোলাপ, যোগীন, এরা কত ধ্যান জপ করছে । এসব আলোচনা করা ভাল । পরস্পরের টা শুনে ওদেরও (ঢাকার বউ, নবাসেনের বৌ প্রভৃতি ছিল) এতে মতি হবে । দর্শনের কথা উঠলে,

---

* ঠাকুরের দেহ রক্ষার পর প্রথমবার বৃন্দাবন হতে ফিরে, কামার-পুকুর গেলেন । সেখান থেকে বছর খানেক পরে বেলুড়ে গঙ্গাতীরে রাজু গোমস্তার ভাড়াটীয়া বাড়ীতে বাস করেন । তারপর গয়া যাবার জন্যে মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ী এসে তথা হতে বুড়ো গোপালের সঙ্গে গয়া যান ।

মা অনেক কথা চেপে গেলেন। সকলের সামনে সে সব বলবেন না বলে বোধ হয়। নলিনী—পিসিমা, লোকের কত ধ্যান জপ হয়, দর্শন স্পর্শন হয় শুনি, আমার কিছু হয় না কেন? তোমার সঙ্গে এত দিন যে রইলুম, কই আমার কি হলো ?

মা ওদের হবে না কেন ?—খুব হবে। ওদের কত ভক্তি বিশ্বাস ! বিশ্বাস ভক্তি চাই, তবে হয়, তোদের কি তা আছে ? নলিনী—আচ্ছা পিসিমা, লোকে যে তোমাকে অন্তর্যামী বলে, সত্যিই কি তুমি অন্তর্যামী ? আচ্ছা, আমার মনে কি আছে, তুমি বলতে পার ? মা একটু হাসলেন। নলিনী আবার শক্ত করে ধরলেন। তখন মা বল্লেন "ওরা বলে ভক্তিতে।" তারপর বল্লেন "আমি কি মা ? ঠাকুরই সব। তোমরা ঠাকুরের কাছে এই বল (হাত জোড় করে ঠাকুরকে প্রণাম কল্লেন) আমার "আমিত্ব" যেন না আসে।"

মার ভাব দেখে হাসি এল, ধরা ছোঁয়া না দেওয়ার ভাণ, আর আমরা ত এক একটি অহঙ্কারে ভরা।—এ শিক্ষার মর্ম্ম বুঝবার আমাদের ক্ষমতা কোথায় ?

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও সার্ব্বভৌমিক বেদান্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তবেই দেখা যাইতেছে যে পরিপূর্ণ জ্ঞান ভাণ্ডারের অন্বেষণে মানুষ অবিরত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু উহা লাভ করা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। মানুষ যতই তীক্ষ্ণধী শক্তি সম্পন্ন হউক, প্রকৃতির সম্পূর্ণ রহস্যোদ্ভেদ করিয়া চিরাকাঙ্ক্ষিত পূর্ণজ্ঞান লাভে কখনই পরিতৃপ্ত হইবে না। গভীর গবেষণায় যতই মস্তিষ্ক

আলোড়িত করুক না কেন তাহার দুরারাধ্য জ্ঞানমাত্র আপেক্ষিক জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইবে। স্বামিজী যথার্থই বলিয়াছেন,—"জ্ঞান মানে শ্রেণীবদ্ধ করা; কতকগুলি জিনিষকে এক শ্রেণীর ভিতর ফেলা। আমরা এক প্রকারের অনেকগুলি জিনিষ দেখলাম,—দেখে সেই সব গুলিকে কোন একটা নাম দিলাম, তা-হইতেই আমাদের মন শান্ত হ'ল। আমরা কেবল কতকগুলি ঘটনা বা ব্যাপার আবিষ্কার ক'রে থাকি, "কেন" সেগুলি ঘটছে তা জান্‌তে পারি না। আমরা অজ্ঞানের এক প্রশস্ততর ক্ষেত্রে এক লাফে ঘুরে এসেই মনে করি—আমরা কিছু জ্ঞান লাভ করলাম। এই জগতে "কেন"র কোন উত্তর পাওয়া যেতে পারে না, "কেন"র উত্তর পেতে হ'লে ভগবানের কাছে যেতে হবে।" অন্যত্র বলিয়াছেন,— "জগতে যত প্রকার ভাব বা ধারণা আছে তার যে সূক্ষ্ম সার নিষ্কর্ষ, তাকেই আমরা ঈশ্বর বলি * * * সমুদয় জগতে প্রপঞ্চের চরম সামান্য আবিষ্কার সগুণ ঈশ্বর। মননশীল বা বিচার-শীল-প্রাণী মানব যুক্তি বিচার দ্বারা যাহা লাভ করে, তাহাই তাহার জ্ঞান-পদ বাচ্য। এখন বিচার বা যুক্তি কাহাকে বলে? "যুক্তি বিচারের অর্থ অল্প বিস্তর শ্রেণীভুক্ত করণ, এমন সব পদার্থ নিচয়কে উচ্চ উচ্চ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া শেষে এমন একস্থানে পঁহুছান, যার উপর আর যাওয়া চলে না। একটি সসীম বস্তু লইয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া যাও কিন্তু যতক্ষণ না তুমি চরমে অর্থাৎ অনন্তে পঁহুছিতেছে ততক্ষণ কোথাও শান্তি পাইবে না,"—(সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত)। ইহা হইতে দেখা গেল যে, কোন বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞানেচ্ছা হৃদয়ে লইয়া যাত্রা করিলে কোথায় যাইয়া উপস্থিত হইতে হয়।

সুখ সকল মানবেরই প্রধান কাম্য বিষয়। বিকৃত মস্তিষ্ক বা উন্মত্ত ভিন্ন জগতে কেহ দুঃখ কামনা করে না। পক্ষান্তরে মানুষ সুখের বিকৃত খেয়ালের বশেই উন্মাদগ্রস্ত হয়, সুতরাং উন্মত্তও প্রকারান্তের সুখের কামনা করিয়া থাকে। এই সুখ প্রত্যেক মানবের কর্ম্ম শক্তির পশ্চাতে থাকিয়া তাহাকে সকল কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছে। এই সুখলাভ করিতে যাহাকে যাহা বাধা প্রদান করে, তাহাই তাহার পক্ষে দুঃখ।

সুখ মানবের আদর্শ হইলেও পৃথিবীতে সর্ব্বজন অভীপ্সিত কোন প্রকার সুখ দেখা যায় না; একজন যাহাকে সুখ বলে অপরে আবার তাহাকেই দুঃখ বলিতেছে। আবার একজন যাহাকে দুঃখ বলিতেছে অপরে তাহাকেই সুখের কারণ বলিয়া মনে করিতেছে। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে বিদ্যা, অর্থ, রূপ, ভোগ, মান ও যশ প্রভৃতি ত সর্ব্বজন কাম্য?—উত্তরে বলা যাইতে পারে যে এই পৃথিবীতে এরূপ মহাজনেরও অভাব নাই, যাঁহারা এ গুলিকেও দুঃখ বা অনর্থের কারণ বলিয়া মনে করিয়া তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। একজন গো-গৃহে মলিন ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া, পুত্র ও কলত্রের মুখে অতিকষ্টে দু'মুঠো উদরান্ন তুলিয়া দিয়া আপনাকে সুখী মনে করিতেছে, অপরে আবার অভ্রভেদী-হর্ম্ম্যতলে দুগ্ধ ফেননিভ সুসজ্জিত শয্যায় শয়ন করিয়া দাসদাসী পরিবৃত হইয়া এবং চর্ব্ব্য চূষ্যলেহ্যপেয় দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়াও আপনাকে দুঃখী মনে করিতেছে। কাহারও বাহু অবশ হইলে সে উহার চিকিৎসা করিতেছে, আবার কেহ বা তাহার বাহুকে অবিরত ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলিত রাখিয়া স্বেচ্ছায় অবশ করিয়া ফেলিতেছে। কেহ মাঘের দুরন্ত শৈত্যে সর্ব্বাঙ্গে লেপের উপর লেপ জড়াইয়া হর্ম্ম্যতলে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও সুখ বোধ করিতেছে না, কেহ আবার ঐ সময়ে শৈত্য প্রধান হিমালয়ে তুষারাবৃত উপলখণ্ডের উপর অনাবৃত গাত্রে অবস্থান করিয়াও সুখ অনুভব করিতেছে। মানুষ বিকৃত সুখের খেয়ালে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আপন দেহে রোগের বীজ লইতেছে, আবার রোগ হইলে উহাকে দুঃখ মনে করিয়া চিকিৎসা করিতেছে। এই পৃথিবীর শত শত বিষয়কে মানবমণ্ডলী আপন আপন খেয়াল মত কোনটিকে দুঃখ এবং কোনটিকে বা সুখের উৎস বলিয়া মনে করিয়া থাকে। মনে করুন, একখানা ক্ষুরে কাহারও আঙ্গুল কাটিয়া গেল, ইহার জন্য দায়ী কে? ক্ষুর,—না ক্ষুরে হস্তার্পণ-কারী? ইহার জন্য যেমন ক্ষুর কখনও দায়ী হইতে পারে না, তেমন এই জগতের কোনও কিছু মানুষের দুঃখের জন্য দায়ী হইতে পারে না; প্রকৃতপক্ষে অনভিজ্ঞতামূলক কর্ম্মফলই ইহার জন্য একমাত্র দায়ী। (?)

এইজন্য পরিদৃশ্যমান কোন বস্তুতে সার্ব্বজনীন সুখ বা দুঃখের কারণ আরোপিত হইতে পারে না। সকলেই মনে করে যে বিদ্যা, অর্থ, রূপ, মান, যশ, ভোগ ও প্রভুত্বের মধ্যেই মানবেপ্সিত সর্ব্বপ্রকার সুখ নিহিত আছে, কিন্তু আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, উহাদের যে কোন একটির সঙ্গে অপর গুলির সংযোগ না ঘটিলে উহাকে প্রায়শঃই দুঃখের কারণ বলিয়া মনে করিতে দেখা যায়; আর ঐরূপ মনে না করিলেও উহাদের কোন একটির দ্বারা প্রকৃত সুখলাভের কোন সম্ভাবনা নাই; কারণ উহাদের প্রত্যেকটির প্রভাবই অনন্ত,—অসীম; সুতরাং বদ্ধশক্তি মানবের পক্ষে উহার পূর্ণতাপ্রাপ্তির প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। পক্ষান্তরে ঐ সকল বিশ্বগ্রাসী বিষয় গুলিকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিতে না পারিলে উহাদের দ্বারা প্রকৃত সুখলাভ হইতে পারে না। ক্রতদাসের ন্যায় চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বকের আবদার রক্ষা বা আদেশ পালন করাকে মানুষ সুখ নামে অভিহিত করিয়া থাকে বটে কিন্তু সকল বিষয়ে সর্ব্বদা উহাদের মন যোগাইয়া চলা কি কাহারও পক্ষে সম্ভবপর? পরন্তু দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের পরিবর্ত্তন ও শক্তিলোপ অবশ্যম্ভাবী, তাহারা কখনও মানুষের প্রকৃত সুখের কারণ হইতে পারে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মায়া, মদ এবং মাৎসর্য্যও সে মানুষকে যথার্থ সুখ প্রদান করিতে পারে না, তাহাও স্বতঃ প্রমাণিত।

সুখলাভের প্রবল প্রেরণায় মানুষ উন্মত্ত হইয়া যেখানে সেখানে যাহার তাহার মধ্যে এই সুখের আরোপ করিয়া এবং যাহাকে তাহাকে ভাল বাসিয়া,—যাহার তাহার উপর মন প্রাণ অর্পণ করিয়া বারংবার দুঃখ পাইতেছে বটে কিন্তু তথাপি তাহার চিরাগত স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছে না। সে বুঝিতেছে না যে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল কোনও বিষয় তাহাকে কখনও প্রকৃত সুখের অধিকারী করিতে পারিবে না; এবং এই হেতু কোন মানবের উপরও প্রকৃত ভালবাসা বা যথার্থ প্রেম আরোপিত হইতে পারে না। পরিণামে দুঃখ উৎপাদন করিলেও অপাত্রে প্রেম অর্পণ করিয়াই মানুষ আপাতরম্য সুখে যেরূপ ভাবে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে এই প্রেম

যোগ্যপাত্রে অর্পিত হইলে উহা যে কিরূপ আনন্দের কারণ হইত, তাহা বাক্য ও মনের অগোচর। অপাত্রে ন্যস্ত সুখের কণামাত্র অনুভব করিয়া মানুষ আত্মহারা হইয়া আছে; সে আনন্দ সমুদ্রের এক ফোঁটা পাইয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। বেদান্ত বলেন যে এই সুখ বা আনন্দ আত্মার একটি গুণ, কারণ আত্মা আনন্দস্বরূপ, সুতরাং আত্ম-দর্শনেই প্রকৃত সুখ সম্ভবপর। * মানুষ জগতের বিবিধ বস্তুকে ভালবাসিয়া প্রকৃত পক্ষে তাহার আত্মাকেই ভালবাসিতেছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় পত্নী বিদুষী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন,—"স্বামীর সুখের জন্য স্ত্রী তাহাকে ভালবাসে না আত্মার সুখের জন্যই স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসিয়া থাকে; স্ত্রীর সুখের জন্য নহে, আত্মার সুখের জন্যই স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাকে; সন্তানের সুখের জন্য নহে। আত্মার সুখের জন্যই সন্তানকে ভালবাসিয়া থাকে; ধনের সুখের জন্য নহে, আত্মার সুখের জন্যই ধনপ্রিয়; ব্রাহ্মণের সুখের জন্য নহে, আত্মার সুখের জন্যই ব্রাহ্মণকে ভালবাসিয়া থাকে; ক্ষত্রিয়ের সুখের জন্য নহে, আত্মার সুখের জন্যই ক্ষত্রিয়কে ভালবাসিয়া থাকে; আত্মার সুখের জন্য নহে, আত্মার সুখের জন্যই আত্মাকে ভালবাসিয়া থাকে; দেবগণের সুখের জন্য নহে, আত্মার সুখের জন্যই দেবগণকে ভালবাসিয়া থাকে; জীবগণের সুখের জন্য নহে, আত্মার সুখের জন্যই জীবগণকে ভালবাসিয়া থাকে, পৃথিবীর সুখের জন্য নহে; আত্মার সুখের জন্যই পৃথিবীকে ভালবাসিয়া থাকে।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ)।

মানুষ নিত্য সুখের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া সতত বিষয়া-

---

* [ক] "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"
—ছান্দোগ্যোপনিষদ্।

[খ] "রসো বৈ সঃ।"
—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্।

[গ] "স এব অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপঃ।"
—শ্রীমদ্ভাগবত।

ভিমুখে ধাবমান হয়, কিন্তু বিষয়জাত-সুখ যে কখনই নিত্য শাশ্বত হইতে পারে না তাহা তাহার ধারণা হয় না। বিষয়-ভোগ-জনিত-সুখ অপেক্ষিক মাত্র, সে সুখ নিশ্চিতই দুঃখমিশ্রিত। অনিত্য বিষয় সংস্পর্শে অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী স্নায়বিক সুখই লাভ হইতে পারে; পার্থিব সুখ যথার্থই দুঃখের মুকুট পরিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। সেই ক্ষণিক সুখ লাভ করিতে গেলে এই দুঃখটুকুও আত্মসাৎ করিতে হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। মানব-প্রকৃতির নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলতা এবং তাহার ভোগ্যবস্তুর অস্থিরতা মানুষের নিত্য সুখের একান্ত অন্তরায়, সুতরাং চিরসুখী হইতে হইলে আমাদিগকে পরিবর্ত্তনশীল মন ত্যাগ করিয়া অন্তরতম সত্যবস্তু নিত্যানন্দনিলয় আত্মায় যাইতে হইবে; তাহা হইলেই আমরা আত্মারাম হইয়া চিরাভীপ্সিত নিত্য সুখ বা নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হইব। যে বিন্দু বিন্দু সুখের জন্য লালায়িত হইয়া বিষয় মরীচিকায় ছুটিতেছিলাম, আত্মানন্দে সেই সুখ সিন্ধুতে নিমজ্জিত হইতে সক্ষম হইব। এই নিমিত্ত শ্রদ্ধাবান বীরবালক নচিকেতা যমরাজ প্রদত্ত বিরাট বিশ্বের একচ্ছত্র আধিপত্য, সুন্দরী অপ্সরা, যান বাহনাদি সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিয়া একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। তিনি জানিতেন, মানব দেহ ও জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। যাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সেই দেহ ও জগৎ লইয়া নিত্য সুখ অসম্ভব। "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ", (কঠোপনিষৎ) যাঁহাকে লাভ করিলে জগতের সমস্ত বস্তুই অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে সেই অনন্ত সুখের উৎসকেই আমরা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে চহিতেছি। প্রেমিক ভক্ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মধুর ভাষায় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতেছেন,—
"If you are a lover of beauty where can you find such beauty as in God? If you are a lover of eloqueuce who can be more eloquent than God from whom all the Vedas have come into existence? If you are a lover of power what being can be more powerful than God?

Every one loves one of these and all of these are to be found in an infinite degree in God. If you love a beautiful woman her beauty will only last for a short time, but God's beauty is perennial. So if you want perennial beauty indestructible life, all power and all knowledge you must go to God."

আমরা দেখিতে পাইলাম যে অমরত্ব, জ্ঞান ও সুখের শেষ সৎ, চিৎ ও আনন্দ। এই সৎ অবিনাশী, অজর এবং সর্ব্বাবস্থায় অপরিবর্ত্তনীয় সর্ব্বব্যাপী, শাশ্বতঃ এবং চিৎ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান এবং আনন্দ পূর্ণশান্তি, প্রেম ও সুখেরই রূপান্তর। অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-শক্তিই আত্মা। জগতের কোনও ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মশাস্ত্র ভগবান সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা উচ্চ ধারণা করিতে পারেন নাই, মানবীয় ভাষায় ভগবান ইহা অপেক্ষা উচ্চ বিশেষণে বিশেষিত হন নাই। পৃথিবীর এক একটি ধর্ম্ম ভগবানকে এক এক নামে অভিহিত করিলেও সকলেই মূলতঃ তাঁহাকে "সচ্চিদানন্দ" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগতের সকল ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যা যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় (ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ ইহার প্রধান সাক্ষী), আর অমরত্ব, জ্ঞান ও সুখ যদি সকল মানবের কাম্য হইয়া থাকে (মানব প্রবৃত্তি ইহার সত্যতার প্রধান সমর্থক), তাহা হইলে মানব নামধেয় সকলেই ভগবানকে লাভ করিবার জন্যই সকল কর্ম্মের অভ্যন্তর দিয়া চেষ্টা করিতেছে, এবং ভগবান সকল মানবের মধ্যে আত্মারূপে এবং সকল জীবের মধ্যে জীবাত্মা রূপে অধিষ্ঠিত আছেন। অতএব ধর্ম্ম বা ভগবানকে কোন মানুষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা জ্ঞাতসারে লাভ করিতে প্রয়াস করুক,—আর নাই করুক, কিন্তু পরোক্ষভাবে—আপনার অজ্ঞাতসারে সে তাঁহাকে লাভ করিতে,—আপনার প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত করিতে,—আপনার সচ্চিদানন্দরূপ সন্দর্শন করিয়া মুক্ত হইতে, অবিরত কঠোর চেষ্টাই করিতেছে। (ক্রমশঃ)

—ব্রহ্মচারী ধ্যানচৈতন্য।

সাংখ্য দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় ঈশ্বর কৃষ্ণকারিকায় * তত্ত্ব সমুদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে ; সমস্ত বিশ্ব ঐ সকল তত্ত্বে নির্ম্মিত,—তুমি, আমি, আকাশ, ভুবন বাহ্য আভ্যন্তর সমস্ত বস্তু উহার দ্বারা নির্ম্মিত। যাহা বহুর মধ্যে সাধারণ তাহার নাম তত্ত্ব। ঘট, সরা, হাঁড়ী, কলসী প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু আছে, কিন্তু মৃত্তিকাই উহাদের তত্ত্ব। সাংখ্য মতে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব সমুদয় জানিতে পারিলে দুঃখের সম্যক্ নিবৃত্তি হয় ; জানা অর্থে যথার্থ নিশ্চয় জ্ঞান। ছাদে উঠিতে হইলে "মইয়ের" দরকার, বিনা সাহায্যে ছাদে যাওয়া যায় না ; জ্ঞানলাভও বিনা সাহায্যে হয় না। কিসের সাহায্য ? প্রমাণের সাহায্য। প্রমাণ কি ? যদ্দারায় যথার্থ নিশ্চয় জ্ঞান (প্রমা) সিদ্ধ হয় তাহার নাম প্রমাণ। সাংখ্য প্রবর্ত্তক সংখ্যার বড় পক্ষপাতী ছিলেন ; তাঁহার মতে দুঃখের ন্যায় প্রমাণও ত্রিবিধ।

৪

দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনাঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি ॥

পদ-পাঠ—দৃষ্টম্ অনুমানম্ আপ্তবচনম চ সর্ব্ব প্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রমাণম্ ইষ্টম্ প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাৎ হি।

অন্বয়ঃ—দৃষ্টং অনুমানং চ আপ্তবচনং ত্রিবিধ প্রমাণম্ ইষ্টং। সর্ব্ব প্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ প্রমাণাৎ হি প্রমেয় সিদ্ধিঃ।

দৃষ্টম্—নিজের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। ঐ আগুন অর্থাৎ নিজে আগুন দেখিয়া আগুনের সত্ত্বার জ্ঞান হইল।

অনুমানম—(অনু=পশ্চাৎ+মা ধাতু=নির্ণয় করা+অনট) ঐ স্থানে ধূম দেখা যাইতেছে, আগুন অপাততঃ চক্ষে দেখা যাইতেছে না। আগুন ও ধূমের চির-সহচর সম্বন্ধ অর্থাৎ পণ্ডিতের ভাষায় ধূম বহ্নি বা

* বিগত পৌষের ১৩৬ পৃঃ ৮ ছত্রে 'চন্দ্র' স্থলে 'কৃষ্ণ' হইবে।

আগুনের ব্যাপ্য বা লিঙ্গ। ধূম যখন আছে তখন ধূমের পশ্চাতে আগুনও আছে। ধূম দেখিয়া পশ্চাৎ অগ্নির নির্ণয় নাম অনুমান।

আপ্তবচনম্ = আপ্ত জনের কথা। আপ্ত = যাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়। আগুন চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না, ধূমও দেখিতেছি না। আমি যাহাকে মহাপুরুষ ভাবি তিনি বলিলেন পর্ব্বতের অমুক স্থানে আগুন আছে। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া স্থির জানিলাম সেই স্থানে আগুন আছে, মহাপুরুষের কথা অর্থাৎ আপ্তবচন আমার প্রমাণ।

ইষ্টম্ = (সাংখ্য মতে) অভিপ্রেত। প্রমেয় = যাহা নিশ্চয় করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত বর্ণনায় আগুন প্রমেয়। 'এই নিশ্চয়' ত্রিবিধ প্রমাণ হইতে হয়। যত প্রকাব প্রমাণ থাকুক না কেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাবা দৃষ্টাদি—তিন প্রমাণের কোন না কোন শ্রেণীব মধ্যে পড়িবে।

সর্ব্বপ্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ = (৫মী বিভক্তি) সর্ব্বপ্রমাণ ওই তিন প্রমাণের মধ্যে থাকার দরুণ,

প্রমানাৎ হি = সাংখ্যের প্রমাণ হইতেই। কি হইবে ?—প্রমেয় সিদ্ধি অর্থাৎ প্রমেয় বা তত্ত্ব সকলেব যথার্থ নিশ্চয় জ্ঞান হইবে।

অর্থ :—

প্রমাণ ত্রিবিধ—দৃষ্ট, অনুমান ও আপ্তবচন। ইহারাই প্রকৃত পক্ষে (সাংখ্য মতে) প্রমাণ। অন্যান্য পণ্ডিতেরা যাহাদিগকে প্রমাণ বলেন তাহারা সকলই অর্থাৎ সর্ব্ববিধ প্রমাণই দৃষ্টাদি ত্রিবিধ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত। ত্রিবিধ প্রমাণের দ্বারায় পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে যথার্থ নিশ্চয় জ্ঞান ঘটিয়া থাকে।

প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতম্।
তল্লিঙ্গলিঙ্গি পূর্ব্বকমাপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু।

পদ-পাঠ—প্রতিবিষয় অধ্যবসায়ঃ দৃষ্টং ত্রিবিধম্ অনুমানম্ আখ্যাতম তৎ লিঙ্গ লিঙ্গিপূর্ব্বকম আপ্তশ্রুতিঃ আপ্ত বচনম্ তু।

অন্বয়ঃ—দৃষ্টং প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ঃ, অনুমানম্ ত্রিবিধং আখ্যাতম্ ;

তৎ লিঙ্গ লিঙ্গিপূর্ব্বকম ; আপ্তশ্রুতিঃ তু আপ্ত বচনম্।

দৃষ্টং = প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষের অর্থ কি ? বিষয়ে অধ্যাবসায় ; বিষয় = শব্দাদিকে বিষয় বলে - জ্ঞেয় বস্তু। প্রতি = প্রত্যেক।

অধ্যবসায়ঃ—ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান ; বিষয় ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা মনে আসিলে মন বিষয়ের আকার ধারণ করে ; উক্তবিধ মন চৈতন্যে প্রতি-ফলিত হইলে নিশ্চয় জ্ঞান ঘটিয়া থাকে। অধ্যবসায়ের অর্থ যত্ন বা উৎসাহ নহে, এস্থলে "নিশ্চয় জ্ঞান"। ইহা একরূপ বুদ্ধিবৃত্তি। শ্রবণাদি বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি জ্ঞান হয়। অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা ইচ্ছা দ্বেষাদি জ্ঞান হয়। উভয়ই প্রত্যক্ষ। মন অন্তরিন্দ্রিয়, বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের সর্দার ; ইন্দ্রিয়ের অপর একটি নাম করণ। ক্রিয়ার যাহা সাধক তাহাই করণ। শ্রবণ শক্তি শব্দ জ্ঞানের সাধক, সেইজন্য শ্রবণেন্দ্রিয় (শক্তি) শব্দজ্ঞানের করণ। করণ মানে কারণ নহে।

আখ্যাত = কথিত। ত্রিবিধ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত অনুমানও ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে, যথা শেষবৎ, পূর্ব্ববৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট।

তৎ = ঐ অনুমান , উহা লিঙ্গ লিঙ্গিপূর্ব্বকম, অর্থাৎ উহার উৎপত্তি লিঙ্গ লিঙ্গি জ্ঞানপূর্ব্বক। যে যাহাকে জানাইয়া দেয় সে তাহার লিঙ্গ। লিঙ্গ = লক্ষণ, হেতু, ব্যাপ্য। লিঙ্গী = হেতুমৎ, ব্যাপক। ধূম লিঙ্গ বা ব্যাপ্য, আগুন লিঙ্গি বা ব্যাপক। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সহিত যে চির-সহচর সম্বন্ধ আছে উহার নাম ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব। যে আগুন এবং ধূমের ব্যাপ্তি বা লিঙ্গলিঙ্গি ভাব জানে, সে ধূম্র জ্ঞান হইলেই পশ্চাৎ আগুনের অস্তিত্ব অনুভব করিবে।

ত্রিবিধ অনুমান ১ম শেষবৎ :—শেষ বা নিষেধ জ্ঞানযুক্ত ; "ইহা অমুক বস্তু নহে" এইরূপ নির্ণয় যদ্দ্বারা হয় তাহা শেষবৎ অনুমান। ক্ষিতিভূত-গন্ধবৎ, ক্ষিতি ভূতে গন্ধ আছে। যে ভূত সম্মুখে রহিয়াছে উহা গন্ধহীন, অতএব উহা ক্ষিতিভূত নহে এইরূপ অনুমানের নাম শেষবৎ।

২য় পূর্ব্ববৎ = পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানযুক্ত , ইহা অমুক বস্তু এইরূপ নির্ণয় যদ্দ্বারা হয় তাহা পূর্ব্ববৎ অনুমান। পূর্ব্বে অগ্নির সহিত ধূম

দেখিয়াছি। ধূম দেখিতেছি অতএব ইহার সন্নিকটে (পূর্ব্বদৃষ্ট) অগ্নি আছে এইরূপ অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ।

৩য় (সামান্যতঃ + দৃষ্ট) সামান্যতো দৃষ্ট।—সামান্য = জাতি; সামান্যতঃ তৎজাতীয়, তৎসদৃশ্য। কার্য্য দেখিয়া তৎসদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তির নির্ণয় যদ্দ্বারা হয় তাহা সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান। ইন্দ্রিয় কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই, সেই ইন্দ্রিয়ের যে অনুমান তাহা সামান্যতো দৃষ্ট। কাঠুরিয়া গাছ কাটিতেছে। 'কাটা' ক্রিয়া কুঠার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, অতএব কুঠারটিকরণ। ক্রিয়ার করণ থাকে। জ্ঞানও ক্রিয়া বিশেষ। দর্শনকারী গাছ-দেখিতেছে। গাছ-দেখা বা রূপ-জ্ঞান একরকম ক্রিয়া; এইরূপ জ্ঞানের করণ কি? অদৃষ্টপূর্ব্ব চক্ষু নামক ইন্দ্রিয় শক্তি।

আপ্তশ্রুতি:—আপ্ত পুরুষের নিকট শ্রবণ। (৪র্থ কারিকাদ্রষ্টব্য) আপ্তবচনও অতীন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানের প্রমাণ। আপ্তবচনে বক্তা ও শ্রোতা থাকা চাই। নিজের কাণে মহাপুরুষের বচন শ্রবণের ফল, এবং ছাপার হরপে মহাপুরুষের বচনামৃত পাঠের ফল—এই দুই ফলের প্রভেদ প্রমাণ হিসাবে বিস্তর।

অর্থ:—শব্দাদি প্রত্যেক বিষয়ে ইন্দ্রিয়ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে ঘটে। কার্য্য কারণ (লিঙ্গলিঙ্গী) জ্ঞানের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা অনুমান নামক প্রমাণ হইতে ঘটে। অনুমান প্রমাণ ত্রিবিধ। আপ্ত পুরুষের নিকট কথা শুনিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা 'আপ্তবচন' নামক প্রমাণ হইতে ঘটে।

৬

সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তবচনাৎ সিদ্ধম্॥

পদপাঠ—সামান্যতঃ তু দৃষ্টাৎ অতীন্দ্রিয়ানাং প্রতীতিঃ অনুমানাৎ।
তস্মাৎ অপি চ অসিদ্ধং পরোক্ষম্ আপ্তবচনাৎ সিদ্ধম্॥

অন্বয়—সামান্যতঃ দৃষ্টাৎ অনুমানাৎ তু অতীন্দ্রিয়ানাং প্রতীতিঃ (ভবতি)। তস্মাৎ অপি চ অসিদ্ধং পরোক্ষং আপ্তবচনাৎ সিদ্ধং।

পরোক্ষ:—(পর + অক্ষ, ইন্দ্রিয়) অপ্রত্যক্ষ; প্রত্যক্ষ (প্রতি + অক্ষ)

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে তাহা পরোক্ষ বা অতীন্দ্রিয়। ভূত সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অতীন্দ্রিয় বিষয় সমূহ যে আছে এইরূপ জ্ঞান অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়কে কোনরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহা অতীন্দ্রিয় পদার্থ। ইন্দ্রিয় যে আছে তাহা শব্দাদিজ্ঞানের দ্বারা অনুমান করি। কেবল ইন্দ্রিয়ই যে একমাত্র পরোক্ষ বা অতীন্দ্রিয় পদার্থ তাহা নহে। অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থ আছে যাহা সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। প্রকৃতি পুরুষাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থ প্রত্যক্ষ করা যায় না ; সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান দ্বারাও তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। ঐরূপ পদার্থ 'নাই' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। উহার বিশেষ জ্ঞান আপ্তপুরুষের বচনের দ্বারা ঘটিয়া থাকে। পদার্থ=আমরা যাহা কিছু মনে মনে চিন্তা করিতে এবং বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি তৎ সমুদায়ই পদার্থ। সিদ্ধং=জানা যায়।

অর্থ:—অতীন্দ্রিয় পদার্থের সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমানের দ্বারাই প্রতীতি ঘটে। সামান্যতোদৃষ্ট প্রমাণের দ্বারাও যদি পরোক্ষ বা অতীন্দ্রিয় পদার্থ সিদ্ধ বা নির্ণয় না হয় তাহা হইলে উহা আপ্ত বচনের দ্বারা নির্ণয় হইবে। অনুমান যাহা দেখাইতে পারে না আপ্তবচনে তাহা প্রকাশিত করে।

৭

প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা শব্দাদি স্থূল বিষয়ের নিশ্চয় জ্ঞান ঘটে। কিন্তু অনেক কারণে বর্ত্তমান বস্তুও আমরা জানিতে পারি না। যে সকল কারণ হইতে অনুপলব্ধি হয় তদসমুদায় ৭ম কারিকায় উক্ত হইয়াছে।

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্মাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ।।

পদ-পাঠ—অতিদূরাৎ সামীপ্যাৎ ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ মনঃ অনবস্থানাৎ সৌক্ষ্মাৎ ব্যবধানাৎ অভিভবাৎ সমান অভিহারাৎ চ

অন্বয়।—অতিদূরাৎ সামীপ্যাৎ, ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ মনোঽনবস্থানাৎ সৌক্ষ্মাৎ ব্যবধানাৎ অভিভবাৎ সমানাভিহারাৎচ (বস্তোর্নোপলব্ধির্ভবতি)

কি কি কারণ হইতে বস্তুর উপলব্ধি হয় না? যথা অতিদূরাৎ সামীপ্যাৎ ইত্যাদি।

অতিদূরাৎ (হেত্বার্থে পঞ্চমী) অতি দূরত্ব হেতু ; গঙ্গার পরপারে শুকপক্ষী বসিয়া থাকিলেও আমি তাহার সত্বা উপলব্ধি করিতে পারি না। অতিদূরত্বই অনুপলব্ধির (না জানার) কারণ। সামীপ্যাৎ=অতিশয় নিকট থাকাও না জানাব হেতু, যথা চোখের কাজল।

ইন্দ্রিয় ঘাতাৎ=ঘাত (হন্ ধাতু) হানি, ইন্দ্রিয়ের হানি, যথা অন্ধত্ব। অন্ধের রূপ উপলব্ধি হয় না।

মনোঽনবস্থানাৎ—মনের অনবস্থান বা অস্থিতি (অন্—অবস্থান, স্থিতি) অন্যমনস্কতা। শকুন্তলা অন্যমনস্কতার দরুণ দুর্ব্বাসার উপস্থিতি জানিতে পাবেন নাই, তজ্জন্য শাপগ্রস্থা হইয়াছিলেন।

সৌক্ষ্মাৎ—সূক্ষ্মতা হেতু, ধূলিকণা বায়ুতে আছে সূক্ষ্মতা হেতু দেখা যায় না।

ব্যবধানাৎ—মধ্যে 'আড়াল' থাকিলে। রুদ্ধদ্বার মন্দিরস্থিত দেবতাব বিগ্রহকে জানা যায় না।

অভিভবাৎ, অভিভব=পবাভব ; নক্ষত্রেব জ্যোতিঃ সূর্য্যের জ্যোতির নিকট পরাভূত হয়, তজ্জন্য আকাশে নক্ষত্র থাকিলেও আমরা দিবসে নক্ষত্র দেখিতে পাই না। সূর্য্যের প্রখর প্রভা নক্ষত্রেব আলোককে অভিভূত করে।

সমানাভিহারাৎ=সমান বা তুল্য বস্তুর সহিত মিশ্রণ, যথা মেঘের জল জলাশয়ের জলকে আক্রমণ করিল। কোনটুকু মেঘের জল তাহা উপলব্ধি করা যায় না। অভিহার=আক্রমণ।

অর্থ :—দূরত্ব, সামীপ্য, ইন্দ্রিয়হানী, অন্যমনস্কতা, সূক্ষ্মতা, ব্যবধান অভিভব, সমজাতিতে মিশ্রণ এই সকল কারণে বিদ্যমান বস্তুবও উপলব্ধি হয় না।

৮

অতি দূরত্ব সূক্ষ্মতাদি কারণে বর্ত্তমান বস্তুও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। কোনও বস্তু ব্যক্তরূপে জানা না যাইলেও উহা যে আছে তাহা জানা যায়। অব্যক্ত প্রকৃতি সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞেয়মান হয় না কিন্তু তাই বলিয়া উহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় নহে। অব্যক্ত প্রকৃতিব কার্য্য দেখিয়া

উহার সত্তার উপলব্ধি হয়। প্রকৃতি যে সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞেয়মান হয় না তাহার কারণ প্রকৃতির সূক্ষ্মতা, প্রকৃতির অভাব নহে। কার্য্য দেখিয়া কারণের উপলব্ধি হয়।

সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ।
মহদাদিতচ্চ কার্য্যং প্রকৃতি সরূপং বিরূপঞ্চ॥

পদ-পাঠ—সৌক্ষ্ম্যাৎ তৎ অনুপলব্ধিঃ ন অভাবাৎ কার্য্যতঃ তৎ উপলব্ধেঃ। মহৎ আদি তৎ চ কার্য্যং প্রকৃতি সরূপং বিরূপং চ॥

অন্বয়:—সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধিঃ, ন অভাবাৎ। কার্য্যতঃ তৎ উপলব্ধে। মহদাদিচ তৎ কার্য্যং প্রকৃতি সরূপং প্রকৃতি বিরূপংচ।

সৌক্ষ্ম্যাৎ = প্রকৃতির সূক্ষ্মতা হেতু, প্রকৃতি সূক্ষ্ম বলিয়া।

তৎ = তাহার; (প্রকৃতিব) অনুপলব্ধি হয়।

ন অভাবাৎ = অভাব হইতে নয়, প্রকৃতি নাই তজ্জন্য যে প্রকৃতির অনুপলব্ধি হয় এমত নহে।

কার্য্যতঃ = কার্য্য দ্বারা, তৎ = প্রকৃতি, উপলব্ধেঃ = উপলব্ধ হওয়াতে (প্রকৃতি আছে এই জ্ঞান হয়)।

প্রকৃতির কি-কার্য্য প্রকৃতির উপলব্ধি ঘটায়?

মহদাদি = মহৎ অহঙ্কারাদি তত্ত্ব। মহদাদিরাই সেই কার্য্য। সেই কার্য্য কি প্রকার? মহদাদি কার্য্য কতক প্রকৃতিব সরূপ, কতক প্রকৃতিব বিরূপ। কতক প্রকৃতির সমান কতক ভিন্ন।

সরূপ = প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়, মহৎ অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় তন্মাত্র ভূতেরাও ত্রিগুণময়।

বিরূপ = প্রকৃতি অব্যক্ত মহদাদিরা ব্যক্ত।

অব্যক্ত প্রকৃতি অচেতন; পুরুষ চেতন। অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যক্ত হয়, জীবের নিকট প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জগতের মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হয়। প্রত্যক্ষ জগৎ ভৌতিক পদার্থের সমষ্টি। ভৌতিক পদার্থের উপাদানের নাম ভূত। ভূত পঞ্চবিধ, যথা, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ বায়ু এবং আকাশ। ক্ষিত্যাদি নামে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচিত কোন বস্তু নহি। উহাদের অস্তিত্ব আমাদের

অনুভূতি সাপেক্ষ। ভৌতিক পদার্থ আমাদিগের অনুভূতির সমষ্টি মাত্র। ভৌতিক পদার্থকে বিশ্লেষ করিলে উহা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দ এই পঞ্চ অনুভূতিতে পরিণত হয়। শব্দ জ্ঞান হইতে আকাশ-ভূতের, রূপ জ্ঞান হইতে তেজ-ভূতের এবং গন্ধ জ্ঞান হইতে ক্ষিতি ভূতের কল্পনা। শব্দ স্পর্শাদির যে সূক্ষ্মতম অবস্থা তাহা তন্মাত্র বলিয়া উক্ত হয়। তন্মাত্রের সংঘাত বা প্রচিত অবস্থাই আকাশাদি স্থূল-ভূত। স্থূল-ভূত পঞ্চতন্মাত্রেরই পরিণাম; জগত রূপরসাদি পঞ্চতন্মাত্রের সমষ্টি। কোন ভৌতিক পদার্থই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয় না। উহাদের গতি প্রবাহ আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হইয়া পরে রূপরসাদি অনুভূতিতে পরিণত হয়। শব্দ জ্ঞানের মূলে আকাশের কম্পন, রূপ জ্ঞানের মূলে তেজঃ নামক ভূতের কম্পন। রূপরসাদি তন্মাত্রের মূলে কম্পন বা গতি বা ক্রিয়া। ক্রিয়া—শক্তির পরিণাম। ক্রিয়ার তিন অবস্থা। ইহা শক্তিরূপে ভৌতিক পদার্থে নিহিত থাকে, পরে ক্রিয়াশীল হয় এবং ক্রিয়াশীল হইয়া বোধের যোগ্য হয়। গ্রামোফোনের যে অংশে পিন সংযুক্ত থাকে তাহাতে শব্দ উৎপাদনের শক্তি স্থিত আছে। কল চালাইলে ঐ পিন রেকর্ডের উবড়ো খাবড়ো বৃত্তাকার দাগে চলিয়া পিনের নিকটস্থ পটাহকে ক্রিয়াশীল করে, এবং তখন ঐ পটাহ বোধের যোগ্য অর্থাৎ আমাদিগের শব্দ জ্ঞান উৎপন্ন করিবার উপযুক্ত হয়; নিশ্চল পটাহ চঞ্চল হইয়া শব্দজ্ঞান উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়; যাহাতে তমঃই প্রধান ছিল তাহাতে রজঃপ্রধান, পরে সত্ত্ব প্রধান হইল। সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন ভাবই পটাহে বিজড়িত ছিল, তবে প্রথমতঃ তমের অন্য দুই ভাবের উপর আধিপত্য ছিল। জ্ঞানগোচর পদার্থ মাত্রই শক্তি ক্রিয়া ও বোধের আবর্ত্তন মাত্র। শক্তির স্থিতিশীল, ক্রিয়াশীল এবং প্রকাশশীল এই অবিনাভাবী তিন ভাবের আবর্ত্তনেই ব্যক্ত জগতের যত কিছু বৈচিত্র্য। এই তিন ভাব যখন সাম্যাবস্থায় রহিবে ব্যক্ত জগতও তখন লুপ্ত হইবে। উক্ত তিন ভাবের নাম তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব;

প্রকাশশীল ভাব সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল ভাব রজঃ, স্থিতিশীল ভাব তমঃ। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন ভাবই প্রত্যক্ষ জগতের মূল কারণ—ইহাদের সাম্যাবস্থাই অব্যক্ত প্রকৃতি। অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষের সহিত যুক্ত হইবামাত্রই উক্ত ত্রিভাব বা ত্রিগুণের মধ্যে বৈষম্য বা ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়, এবং তাহার ফলে প্রথম ত্রিগুণাত্মক অথচ সত্ত্ব প্রধান মহতের আবির্ভাব হয়, পরে ব্যক্ত জগতের অন্যান্য তত্ত্বের উৎপত্তি হয়।

অর্থ :—প্রকৃতি যে উপলব্ধ হয় না তাহার কারণ উহার সূক্ষ্মতা,—উহার অভাব নহে। প্রকৃতির কার্য্য দেখিয়াই প্রকৃতি সত্তার উপলব্ধি হয়। মহৎ তন্মাত্রাদিরাই প্রকৃতির কার্য্য। কার্য্য প্রকৃতির সমানও বটে প্রকৃতি হইতে ভিন্নও বটে, কার্য্য প্রকৃতির ন্যায় ত্রিগুণময়, আবার প্রকৃতি যেমন অব্যক্ত কার্য্য তদ্রূপ অব্যক্ত নহে, কার্য্য ব্যক্ত।

৮ম কারিকায় বলা হইয়াছে প্রকৃতি সূক্ষ্ম হইলেও তাহার সত্তা তাহার কার্য্য দ্বারা উপলব্ধ হয়। ব্যক্ত জগৎ দেখিয়া অব্যক্ত জগতের সত্তার উপলব্ধি হয়। সাংখ্য মতে ব্যক্ত—জগৎ। যাহা অব্যক্ত জগতের কার্য্য, তাহাও সৎ। ১ম, আমি আছি ২য় আমি ছাড়া আর যা কিছু অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ, এবং ৩য় ব্যক্ত জগতের কারণ অব্যক্ত জগৎ। এই তিন পদার্থের সকলই সৎ। কার্য্য যে কেন সৎ তাহার কারণ ৯ম কারিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

৯

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্য্যম্॥

পদ-পাঠ—অসৎ অকরণাৎ উপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভব অভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণ ভাবাৎ চ সৎ কার্য্যম॥

অন্বয় :—অসৎ অকরণাৎ, উপাদানগ্রহণাৎ, সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ, শক্তস্য শক্য করণাৎ কারণ ভাবাৎ চ সৎ কার্য্যম।

অকরণাৎ, গ্রহণাৎ, অভাবাৎ, করণাৎ, সমস্তই হেত্বার্থে ৫মী। উক্তবিধ কারণ হইতে। কি হয়? প্রমাণ হয় যে কার্য্য সৎ। যাহা

আছে বলিয়া জ্ঞান হয় তাহার নাম সৎ। সৎএর বিপরীতের নাম অসৎ। যাহা উৎপন্ন হয় তাহার নাম কার্য্য। বস্তুর অবস্থান্তরের নাম কার্য্য। ধান্য কারণ, তণ্ডুল ধান্যের কার্য্য। ভুক্তান্ন কারণ রক্ত কার্য্য। রক্তই ভুক্তান্ন। কেমন ভুক্তান্ন? না অবস্থান্তরিত ভুক্তান্ন যথা বৃদ্ধ অবস্থান্তরিত শিশু, বয়স্থ গোপালের নাম কৃষ্ণ। কিছু নাই হইতে কিছুর আগমন মানুষ ধারণা করিতে পারে না। কিছু হইতেই কিছু হয়। শর্ষপ হইতেই তৈল আসে, বালুকণা হইতে তৈল আসে না। কার্য্য কার্য্যরূপে জ্ঞানগম্য হইবার পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে স্বীয় কারণে বর্ত্তমান থাকে। ঘট ঘটরূপে জ্ঞানগম্য হইবার পূর্ব্বে স্বীয় কারণ মৃত্তিকায় বর্ত্তমান থাকে। মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ; কুম্ভকার ও চক্র প্রভৃতিকে ঘটের নিমিত্ত কারণ বলে।

অসৎ অকরণাৎ=যাহা নাই, তাহার অকরণ হেতু, তাহা করা যায় না বলিয়া (করণ—করা, করণ অকরণের বিপরীত) যথা বন্ধ্যা পুত্র।

উপাদান গ্রহণাৎ=কোন কিছু করিতে হইলে উপাদান গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া, রুটি করিতে হইলে ভাণ্ডার হইতে ময়দা লইতে হয়।

সর্ব্বসম্ভব অভাবাৎ=এক উপাদান হইতে সর্ব্ববিধ বস্তুর সম্ভাবনা নাই বলিয়া; মৃত্তিকা হইতে ঘট কুম্ভাদির সম্ভাবনা, শাল জামিয়ারাদি অন্যান্য বস্তুর সম্ভাবনা নাই।

শক্তস্য শক্যকরণাৎ—শক্ত=শক্তি যুক্ত, শক্য=শক্তির বিষয়, যাহা করিতে পারা যায়। বীজে অঙ্কুররূপ কার্য্যের শক্তি নিহিত আছে তাই বীজের শক্য অঙ্কুর, অর্থাৎ বীজ হইতে অঙ্কুরের উদ্ভব হয়। যদি শক্তি না নিহিত থাকিত তবে অঙ্কুরের উদ্ভব হইত না। বীজ শক্ত, অঙ্কুর শক্য। যে যাহা জন্মাইতে শক্ত তাহাই তাহা হইতে জন্মে। শক্ত বস্তুই শক্যকে করে বলিয়া।

কারণ ভাবাৎ=কারণ থাকা আবশ্যক বলিয়া; কার্য্যং সৎ—কার্য্য বরাবর আছে ও থাকিবে। উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ইহার স্বকারণ সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল, বর্ত্তমানে উহা কার্য্য এবং ভবিষ্যৎ কার্য্যের কারণ।

অর্থ :—কার্য্যকে নানাবিধ কারণে সৎ বলা যায়, যথা—যাহা নাই তাহা কস্মিনকালেও নাই ; কিছু করিতে হইলে উপাদান গ্রহণ করিতে হয় ; সকল বস্তুতে সকল বস্তু জন্মে না, শক্ত বস্তুই শক্য বস্তুকে করে, এবং কার্য্য সকলের কারণ থাকা আবশ্যক।

জ্ঞ-ব্যক্ত-অব্যক্ত এই তিন তত্ত্বের কথা ৯ম কারিকা পর্য্যন্ত মোটামুটি ভাবে বলা হইল। এই তিন তত্ত্বের মধ্যে জ্ঞ এবং অব্যক্ত উভয়েরই সংখ্যা এক এক এবং অব্যক্তের তাত্ত্বিক সংখ্যা তেইশ। অতঃপর কারিকায় উহাদের বিশেষ বর্ণনা বিবৃত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

—ওমারথৈয়ামঃ।

বিবেকানন্দ তত্ত্ব বিচার

বিবেকানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া কোনও সাধুকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, "অন্তরে দিব্য কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করি, হৃদয়ে পূর্ণ জ্যোতিঃ উছলিয়া পড়ে, চিন্ময় গোপাল আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ান। ইঁহারই সেবায় আত্মহারা আমি। সংসারে কে না খাইল, কোন্ রাজ্যে মানব সমাজ নিপীড়িত হইল, কোন্ দেশ বিধবার জীবন্ত অগ্নিদাহের ব্যবস্থা করিল, এ সকল দেখিয়া আমার কি হইবে? বিবেকানন্দ সামান্য কর্ম্ম লইয়াছিলেন। ব্রজের মধুর প্রেমের আস্বাদ তিনি পান নাই। তাহা যদি পাইতেন, তাহা হইলে ঐ প্রকার ভূয়া "খোসা ভূষি" লইয়া থাকিতেন না।"

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, সাধুর এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। অন্তরে যে চিন্ময় গোপাল আছেন, ঐ শ্রেণীর সাধুরা থাকেন তাঁহারই সেবায় বিভোর। কিন্তু চিন্ময় গোপাল যিনি, যাঁহার জন্ম নাই মৃত্যু নাই, যাঁহার অভাব নাই, অভিযোগ নাই, স্বয়ং পূর্ণ যিনি, তাঁহার সেবা কিরূপে সম্ভবপর হয়? তিনি কিসের অভাবে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র

ব্যক্তির সেবার প্রার্থী হইবেন? ফলতঃ, চিন্ময়গোপাল সেবারপ্রার্থী নহেন, সেবার কাঙ্গাল বিশ্বের এই সকল লীলা-গোপাল। চিন্ময় গোপালের নামে ঐ সকল সাধু বস্তুতঃ কিন্তু করেন আত্মসেবা। * প্রকৃত কথা এই যে, ইঁহারা আনন্দের অত্যন্ত ভিখারী, দুঃখের ভয়ে সতত সন্ত্রস্ত। ইঁহারা চাহেন, দুঃখময় সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের নেশায় ভরপুর রহিতে, মনে করেন, আনন্দ ভগবানের সৃষ্টি, আর দুঃখ সৃষ্টি সয়তানের, জানেন না, আনন্দ যে মঙ্গল হস্তের দান দুঃখও তাহারই দান, তাই সর্ব্বপ্রযত্নে দুঃখকেই এড়াইতে চাহেন। অথচ বুঝিতে পারেন না, আনন্দ ও দুঃখ একই সত্তার দুই দিক, সেই নিরবচ্ছিন্ন অপার্থিব আনন্দ পাইতে হইলে, পাইতে হইবে তাহা এই পার্থিব সুখ দুঃখের মধ্যে থাকিয়াই। ইহা ভিন্ন তাহা পাইবার নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।   *   *   *   প্রেম ভিন্ন সেবার অধিকার পাওয়া যায় না। যথার্থ প্রেমিক শত লাঞ্ছনা, সহস্র গঞ্জনা অম্লানবদনে সহ্য করেন, অথচ তাহাতেও অতুলানন্দেরই অধিকারী হন। প্রকৃত সেবকের নিকটে সুখ ও দুঃখ, বিষ ও অমৃত তুল্য হইয়া যায়। এই যে আত্মবিস্মৃতি, সেব্যের জন্য এই যে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দেওয়া—ইহাই যথার্থ সেবকের লক্ষণ। সুতরাং ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় ঐ শ্রেণীর সাধুরা আর যাহাই হউন, প্রেমিক ও সেবক নহেন। ফলতঃ ইহারা ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরকে ভালবাসেন না ইঁহারা ঈশ্বরকে ভালবাসেন আত্মতৃপ্তির জন্য। আত্মতৃপ্তি যেখানে নাই, দুঃখ যেখানে, সেখানে ইহারা ভগবানকে দেখিতে পান না।

"দুঃখ যেখানে,   দৈন্য যেখানে,
তোমায়ে সেখানে ধরিব নিবিড় করিয়া।"

এ কথা ইঁহারা বুঝেন না। ইঁহারা সুখের কাঙাল। তাই, এই সুখের লালসাতেই ইঁহারা "কন্টকময় সংসারপথে" ছুটাছুটি করিয়া কোথাও

* আত্মসেবার অর্থ এস্থলে নিজের সেবা। প্রকৃত আত্মা সর্ব্বময়। সুতরাং আত্মার সেবা করিতে হইলে সকলেরই সেবা করিতে হয়।

উহার সন্ধান না পাইয়া অবশেষে শ্রান্ত-ক্লান্তদেহে আপনাকেই আপনার মাঝে রুদ্ধ করিয়া ফেলেন। ব্যাধ-বিতাড়িত শশক যেমন প্রাণভয়ে সমস্ত বন দৌড়াদৌড়ি করিয়া পরিশেষে আপন বাস-গহ্বরের প্রান্তে বিবশদেহে অবশচিত্তে মুদিত নয়নে শুইয়া পড়িয়া আপনাকে পরম নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ মনে করে, ইঁহারাও তেমনই কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করত মনে করেন, ইহাই বুঝি পরামুক্তি, পরাশান্তি, এবং পরম আনন্দ। কিন্তু হায়! যে স্থানে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত মানবের নিপীড়ন, বিধবার অগ্নিদাহন হইতেছে, নিরন্নের হাহাকার আর্ত্তের চীৎকার ধ্বনি উঠিতেছে—

"হেথা সুখ ইচ্ছ, মতিমান ?"

সমষ্টি যেখানে দুঃখী, সেখানে ব্যষ্টি তুমি, তুমি হইতে চাও সুখী? সমষ্টির সুখ ভিন্ন ব্যষ্টির সুখ নাই, হইতেও পারে না। জড়-বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলেও বলা যায়, একই বিদ্যুতিন (Electron) প্রকম্পনী শক্তির (Vibration) তারতম্যানুসারে এখানে হইয়াছে গাছ, সেখানে হইয়াছে পাথর; এখানে হইয়াছে পশু, সেখানে হইয়াছে পক্ষী; এখানে হইয়াছে সাধু, সেখানে হইয়াছে অসাধু; এখানে হইয়াছি আমরা, সেখানে হইয়াছেন তাঁহারা। হওয়া বাঁচা মরা, শোওয়া বসা খাওয়া, হাসা ও কাঁদা, এই যে আমাদের অসংখ্য কার্য্যকলাপ, এ সকল আর কিছুই নহে, নিত্য সত্য বিদ্যুতিন্‌কে আশ্রয় করিয়া নিত্যলীলারস রসময়ী রঙ্গিনী প্রকম্পনী শক্তির পলকে পলকে পরিবর্ত্তনশীল নব নব তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস। সুতরাং অনন্তবিশ্বের সর্ব্বপদার্থের (অতএব আমাদেরও) মূল উপাদান যখন একই, ঐ সাধুরা এবং আমরা যখন একই বস্তু, একই সূত্রে গ্রথিত, সমগ্রের আমরা যেমন এক অংশ; তখন আমরা যে দুঃখ ভোগ করিতেছি, তাঁহারাও সেই দুঃখের হাত কিরূপে এড়াইতে পারেন? আমাদের প্রত্যেকের—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একজনেরও—সদসৎ চিন্তা ও কার্য্যের ধারা অর্থাৎ প্রকম্পনী শক্তির প্রত্যেক তরঙ্গ উচ্ছ্বাস যখন তাঁহাদিগেতে—শুধু তাঁহাদিগেতে কেন,—নিখিলের সর্ব্বত্রই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে প্রসারিত হইতেছে, তাঁহারাও যখন আমাদের সেই সদসৎ চিন্তা ও কার্য্যের ফলে প্রতি মুহূর্ত্তেই তদনুগতভাবে অনুপ্রাণিত ও স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছেন

তখন বিশ্বের সকলকে দুঃখী রাখিয়া তাঁহারা একাকী কিরূপে সুখী, সকলকে অসৎ রাখিয়া একাকী কিরূপে সৎ এবং সকলকে বদ্ধ রাখিয়া তাঁহারা একাকী কিরূপে মুক্ত হইতে পারেন? ফলতঃ, যতক্ষণ বিশ্বের একজনও অভুক্ত, অভক্ত, অসুখী, অজ্ঞান এবং অমুক্ত থাকিবে, ততক্ষণ ভুক্তি, মুক্তি, ভক্তি, জ্ঞান এবং আনন্দের অধিকারী তাঁহারাও হইবেন না এবং আমরাও হইব না। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম ঋষি বিবেকানন্দের হৃদয়-সমুদ্রে এই মহাসত্যের তরঙ্গ উচ্ছ্বাস জাগিয়াছিল। তাই, তাঁহার ধ্যান ধারণা সমাধি যাহা কিছু সকলই নিয়োজিত হইয়াছিল এই মহাসত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য। তাঁহার "শুদ্ধমপাপ-বিদ্ধং" জীবন নিঃশেষে অর্পিত হইয়াছিল, এই মহাসত্যকে কর্ম্মের মধ্যে দিয়া মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিবার জন্য। আর তিনি স্বয়ংও ছিলেন এই মহাসত্যেরই পূর্ণপ্রকট মূর্ত্তি!

* * * * *

বাংলা আমাদের জন্মভূমি। জননী জন্মভূমির সেবা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু যিনি বঙ্গজননীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করেন, তিনি জননীর যথার্থ ভক্ত নহেন, তিনি শুধু প্রবর্ত্তক, আবার, যিনি মানস অন্তরে জননীর দিব্য স্বর্গীয় মূর্ত্তি দর্শন করত তাহাতেই বিভোর থাকেন, তিনিও প্রকৃত স্বদেশ-ভক্ত নহেন। মৃন্ময়ী মূর্ত্তি জড় জগতের আর মানসী মূর্ত্তি ভাব জগতের জিনিষ, ইহাই যাহা কিছু তফাৎ। সাধকের নানাবিধ miracle দর্শন হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল miracle দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ প্রকৃত স্বদেশ সেবক তাঁহাকেই বলা যায়, যিনি স্বদেশ বলিতে স্বদেশবাসীকে বুঝিয়া তাহাদেরই সেবায় কায় মনঃ প্রাণ অর্পণ করেন। প্রকৃত কথাও এই যে, স্বদেশের স্বরূপ স্বদেশবাসীদের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া চাই। এইরূপ ঈশ্বরের সেবা করিতে হইলে, বিশ্বের ঈশ্বর, এই কথা বুঝিয়া বিশ্ববাসীদেরই সেবা করিতে হয়। অন্যথা, ঈশ্বর সেবার অধিকারী হওয়া যায় না। এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই শিক্ষার শেষ হইল, এইরূপ মনে করা ভুল। বরং অধীত শিক্ষাকে কার্য্য-সফলতায় সার্থক করিয়া তুলিবার সময় ও সুযোগ তখন হইতেই পাওয়া গেল।

সমাধি লাভ ও সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যের এম-এ পরীক্ষা। সমাধির পর হইতেই প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ। সমাধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শুধু সাধনারই সময়। আগে সাধন, পরে ভজন। সাধনায় সিদ্ধ হইলে তখনই ভজন অর্থাৎ ঈশ্বরসেবার অধিকারী হওয়া যায়। তখনই চৈতন্তের ন্যায় "যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" এই অবস্থা লাভ হয়। বিশ্বেশ্বর তখনই হন বিশ্বময়, ঈশ্বর সেবার অবসর মেলে তখনই। ইহাই সাধনার চরম পরিণাম, যাহা শ্রীমদ্ বিবেকানন্দের জীবনে জলন্তরূপে প্রকটিত হইয়াছিল।

* * * *

সিদ্ধজীব দুই শ্রেণীর, সাধারণ সিদ্ধ সাধক এবং নিত্যসিদ্ধ অবতার পুরুষ। সাধারণ সাধকের চিত্ত বহু হইতে একের, সৃষ্টি হইতে লয়ের, লীলা হইতে নিত্যের দিকে ধাবিত হয়। ইঁহার চিন্তার ধারা নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে গমন করে। আর নিত্যসিদ্ধের মন এক হইতে বহুর অভিমুখে অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে, লীলার দিকে প্রসারিত হয়। ইঁহার চিন্তার ধারা ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে "অবতরণ" করে। সাধারণ সাধক সিদ্ধাবস্থায় যে চরম সত্য প্রাপ্ত হন, অবতার-পুরুষ জীবনের প্রারম্ভেই সেই সত্য মূলধন স্বরূপ পাইয়া থাকেন। একজন আপনাকে ভূমা হইতে বিচ্ছিন্ন অতএব আপনাকে ক্ষুদ্র ও বদ্ধ বলিয়া মনে করেন। অন্যজন আপনাকে ভূমার সহিত সংযুক্ত সুতরাং আপনাকে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ বলিয়া জানেন। একের উদ্দেশ্য হয় তাই সংসারের সুখ দুঃখ হইতে পরামুক্তি-জনিত পরাশান্তি লাভ। অন্যে কিন্তু স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, সুখ দুঃখের অতীত। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হয় তাই বিশ্বলীলায় যোগ দেওয়া, লীলার পুষ্টি সাধন করা। একজন শুধু আপনারই জন্য, অন্য জন আত্ম-বিস্মৃতি, সুতরাং তিনি বিশ্বের জন্য, "বহু জন হিতায়।" একজন "রজনীকান্ত", অন্য জন "রবীন্দ্রনাথ"। এক জনের গান—

আর কারো কথা কব না আমি
তোমারি কথা কব গো।

অন্তর্জনের গান,—

কণ্ঠ আমার সকল কথায়
তোমার কথাই কবে ।

একজন সংসারের সকলের কথাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শুধু একের কথাই কহেন। সুতরাং ইঁহার কথা অপূর্ণ। (?) অন্যের কিন্তু কাহারও কথা ঠেলিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয় না। ইনি সকলের কথাতেই সেই একেরই কথা শুনিতে পান বলিয়া, সকলের কথাই ইঁহার নিকটে সার্থক। একজন প্রতিমা দেখিয়া উহার মূলে কি আছে তাহাই জানিবার জন্য ব্যস্ত হন। অন্যে খড়খুঁটি দেখা নিষ্প্রয়োজন জানিয়া প্রতিমাখানিকেই সার্থক করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হন। অবতার পুরুষকে দেখিতেও তাই সাধারণ মায়িক জীব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ ইঁহারা দেখিতেই তলোয়ারের ন্যায়, সামান্য হিংসার কার্য্য ইঁহাদের দ্বারা হয় না।

*　　*　　*　　*

আত্ম সুখ তাৎপর্য্য কাম সেই হয় ;
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য প্রেম তারে কয়।

সাধক জপ-তপ দানধ্যান সাধনা সমাধি যাহা কিছু করেন, ধর্ম্ম, মোক্ষ, ঈশ্বর যাহা কিছু চান তাহার সকলই আত্মসুখের জন্য। সুতরাং তিনি যে তখনও কামনারই দাস থাকেন, তাহা কোনও প্রকারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যাঁহার আত্ম-সুখের আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত ঘুচিয়া যায়, সন্ধ্যা তাঁহার বন্ধ্যা হয়, সমাধিও ব্যাধিতুল্য হয়, তাঁহার তখন "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি" হয়। যশোদার ন্যায় নিজ বাঞ্ছিতের প্রতি, তখন তাঁহার ঈশ্বরত্ব জ্ঞান লুপ্ত হইয়া মমত্ব বুদ্ধির উদয় হয়। তবে এই যে মমত্ব বুদ্ধি সাধারণ সংসারী স্বামী স্ত্রী অথবা মাতা পিতা পুত্র কন্যার মধ্যে যে 'আমার' বোধ—ইহা কিন্তু তাহা নহে। ইহাতে সংকীর্ণতার গণ্ডি থাকে না, আত্মসুখেচ্ছার লেশ নাই। সুতরাং তিনি তখন তাঁহার বাঞ্ছিতকে পান, "ঈশ্বরের" মধ্যে নহে, যশোদার ন্যায়, হয়ত "সামান্য এক অক্ষম শিশুর" মধ্যের বাঞ্ছিত তখন তাঁহার নিকটে

ছোট হইয়া যায়। যশোদার ন্যায় তাঁহারও তখন মনে হয়, আমি না দেখিলে গোপালকে দেখিবে কে? ভক্তের এই যে বড় হওয়া, ইহা অহঙ্কারের নহে, প্রেমের ফল। মহাপুরুষের চিত্তের এই যে ভাব, বৈষ্ণবদের ভাষায়, ইহার নাম কাম-গন্ধ-লেশহীন ব্রজের ভাব। আর চিত্তের এইরূপ অবস্থায় মহাপুরুষ যাঁহার বাঞ্ছা করেন, বৈষ্ণবদের ভাষায়, তাঁহাকেই বলা হয় ব্রজের কৃষ্ণ। * * যিনি আপনাকে পাপী মনে করেন, তিনি পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন। ঈশ্বরও তখন তাঁহার নিকট হন দয়াময় পতিত-পাবন। আবার যিনি আপনাকে দুর্ব্বল মনে করেন, ঈশ্বর তাঁহার নিকটে হন সর্ব্ব-শক্তিমান। এইরূপ যাঁহার যেরূপ প্রয়োজন, ঈশ্বর তাঁহার নিকটে তদনুরূপ হন। কিন্তু যাঁহাব কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, যিনি অহেতুক নিষ্কিঞ্চিন, তাঁহার নিকটে ঈশ্বর যেরূপে প্রকটিত হন, তাহাই বৈষ্ণবদের ব্রজের কৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ। এ অবস্থায়, 'ঈশ্বর' 'দেবতা' 'অবতার' প্রভৃতি তাঁহার ততদূর বাঞ্ছিত হইতে পারে না, কারণ ইঁহারা ঐশ্বর্য্যবান্, ইঁহাদের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের ভাব বিজড়িত। এরূপ অবস্থায়, জগতে যেখানে যে যত ছোট আছে, তাঁহার বাঞ্ছিতই ঐরূপ ছোট হইয়া প্রকটিত হইয়াছেন,—তাঁহার সেবা লইবার জন্য, তাঁহার তখন এইরূপ দিব্য-দর্শন লাভ হয়। তাঁহার সর্ব্ব সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে "ঈশ্বর" ও "অক্ষম শিশু" ব্রহ্ম ও ক্ষুদ্র কৃমিকীট, ইত্যাদিরূপ ছোট বড় সমস্ত ভেদ ঘুচিয়া যায়। ইনি আমার স্ত্রী, এ আমার দাসী, আমাদের এই যে ভেদ বুদ্ধি, ইহা আমাদের প্রয়োজনের তারতম্য অনুসারে অর্থাৎ স্ত্রীতে আমরা যতখানি প্রয়োজন বোধ করি, দাসীতে আমরা ততখানি প্রয়োজন বোধ করি না বলিয়াই। কিন্তু এই আত্মপ্রয়োজন বোধ যাঁহার লুপ্ত হইয়া যায়, তাঁহার স্ত্রী ও দাসীতে সমদৃষ্টি হয়। যে অর্থে আমবা স্ত্রীর ঢাকাইশাড়ী কিনি, তিনি হয়ত তখন সেই অর্থে অথবা তদপেক্ষা অতি অল্প অর্থেও ক্রয় করেন স্ত্রীও দাসী উভয়েরই সামান্য লজ্জা নিবারণের পরিধেয় মাত্র। সুতরাং এরূপ অবস্থায়, নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ যে ঐশ্বর্য্যবান ভগবানকে ফেলিয়া নিঃস্ব দবিদ্রের মাঝেই নাবায়ণেব প্রকটমূর্ত্তির

অধিকতর সন্ধান পাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। ইহাই যথার্থ "কৃষ্ণের জন্য কৃষ্ণকে ভালবাসা।" ফলতঃ, মানবের যতক্ষণ স্বার্থবুদ্ধি থাকে—সে স্বার্থ যত বড়, যত মহৎ হউক—ততক্ষণই ঈশ্বর তাহার নিকটে সর্ব্বশক্তিমান্ বিভু দয়াময় ইত্যাদি বড় বড় নামে অভিহিত হন। ইহা ধনীর নিকটে ভিক্ষুকের কাঙাল বৃত্তিরই অনুরূপ। কিন্তু এই কাঙালপণা যাঁহার ঘুচিয়া যায়, মন্দিরের বিগ্রহের দিকে অথবা মন্দিরের সেবাইত মোহন্তপ্রভুর দিকে তাহার ততখানি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, যতখানি দৃষ্টি পড়ে তাঁহার,—মন্দিরের প্রাঙ্গণ পরিষ্কারক অস্পৃশ্য ঝাড়ুদারের প্রতি। *

যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই নিগূঢ় তত্ত্ব না বুঝিবেন, তাঁহারা বিবেকানন্দের এই কর্ম্মযোগ রহস্যও বুঝিতে পারিবেন না। আর কর্ম্মের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিবারও প্রয়োজন দেখি না। অনেক সাধু জ্ঞান ও কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া থাকেন এবং ভক্তির গুণ-কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কর্ম্ম ও জ্ঞান ব্যতীত যে ভক্তি, তাহার সার্থকতা কোথায়? সতী পতিকে ভক্তি করেন, কিন্তু পতি কি বস্তু, এ জ্ঞান না জন্মিলে পতির প্রতি সতীর ভক্তি আসিবে কিরূপে? আর সতী যদি পতির সেবা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন না করেন তবে তাঁহার সেই ভক্তির মূল্য কি? আবার পতি আর আমি অভেদ, তাঁহার কার্য্য আমারই কার্য্য, সে কার্য্য করিতে আমার স্বভাবতঃই আনন্দ হয়,

* বেদান্তমতে, ঈশ্বর নির্লিপ্ত সাক্ষী চৈতন্য-স্বরূপ দ্রষ্টামাত্র, সুতরাং তাঁহার দ্বারা কাহারও উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি মঙ্গলময়ও নহেন, অমঙ্গলময়ও নহেন। তিনি করুণাময়ও নহেন, অকরুণও নহেন। বৈষ্ণবেরাও আবার প্রকারান্তরে এই কথাই বলেন। তাঁহাদের মতে, ঈশ্বর, শিশু, সুতরাং তাঁহার দ্বারাতেও কাহারও উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদেরই কর্ত্তব্য তাই তাঁহার সেবা করা। অতএব, বৈদান্তিক ধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলতঃ কোনও বিরোধ নাই। উভয় ধর্ম্মেরই উপদেশ তাই, "নিষ্কিঞ্চন হও।"

এইরূপ ভক্তিভাব না থাকিলে সতীর পতিসেবা মধুরও হয় না। প্রকৃত সাধকের জীবনে তাই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, এই তিনের অপূর্ব্ব সমন্বয় হয়। আবার, জ্ঞান ও ভক্তির চরম পরিণাম একই। শঙ্করের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" আর চৈতন্যের "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে," এই দুই অবস্থার মধ্যে প্রভেদ নাই। বিরহোন্মত্ত অবস্থায় ব্রজ-গোপীরাও "আমিই কৃষ্ণ" এই কথাই বলিয়াছিলেন। যাঁহারা এ সকল কথা না বুঝিবেন, তাঁহাদের চক্ষে স্বামিজীর এই দরিদ্রসেবা, সাধারণ জীবের অনুষ্ঠিত সামান্য কর্ম্ম বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু তাঁহার নিকটে ইহাই ছিল তাঁহার যথার্থ কৃষ্ণসেবা। তাঁহার এই সেবার উৎস ছিল—দয়া নহে,—প্রেম—কামগন্ধলেশহীন ব্রজের প্রেম—যে প্রেমে আত্ম-সুখেচ্ছা দূরীভূত হয়, মুক্তি বন্ধন সুখ দুঃখ তুচ্ছ হইয়া যায়, নিজ বাঞ্ছিতের প্রতি ঈশ্বরত্ববোধ পর্য্যন্ত ঘুচিয়া যায়। ব্রজের সেই প্রেম—কৃষ্ণপ্রেম মানবের অন্তরে উদিত হইলে সেই ভাগ্যবানের জীবন কিরূপ হয়, মহাত্মা বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁহার জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি চৈতন্য-দেবের যুগোপযোগী নবসংস্করণ, একথা যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণপ্রেম কি বস্তু, তাহা আজও বুঝিতে পারেন নাই।

শ্রীচৈতন্য মুণ্ডিত মস্তক ছিলেন, তিনি বিশুদ্ধ দেব ভাষায় শ্লোক রচনা করিতেন, আর বিবেকানন্দ ছিলেন "বাবু বিশেষ," বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন ম্লেচ্ছ ভাষায়,—ভাব বিষয়ে দীনাতিদীন বাক্য সর্ব্বস্ব বদ্ধ-সংস্কার যে সকল ব্যক্তির যুক্তির দৌড় এই পর্য্যন্ত, তাহাদের নিকটে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তাহারা কবে হয়ত বলিয়া বসিবেন, বিবেকানন্দ ম্লেচ্ছদের গাড়ীতে চড়িতেন, সুতরাং তিনি সনাতন হিন্দু-সমাজে একান্তই অচল। বিবেকানন্দ কর্ম্ম লইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু চৈতন্যদেব কি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতেন। "কর্ম্মত্যাগ" কথার যথার্থ অর্থ কি, তাহা বুঝিয়া দেখিবার বিষয়।

সাধারণ সিদ্ধ সাধক যখন ব্রহ্ম-সমাধিতে মগ্ন থাকেন, ঈশ্বর কোটি মহাপুরুষ তখন হয় ত সামান্য এক অপরাধীর ন্যায় ক্রুশকাষ্ঠে "জগদ্ধিতায়" আপনার শরীর উৎসর্গ করিয়া দেন। অথবা অবধূত নিত্যানন্দের ন্যায়

মাধাইএর প্রহারে জর্জ্জরিত ও রক্তাক্ত দেহ হইয়া সামান্য এক দাঙ্গাকারী মাত্রে পর্য্যবসিত হন। উচ্চতম সাধক যখন সাত্ত্বিক পূজায় তন্ময় হইয়া থাকেন, অবতার পুরুষ তখন হয়ত সামান্য এক দুঃস্থের সেবায় আত্মহারা হইয়া যান। শয়নে, স্বপনে জাগরণে, নিত্য সমাধিতে অবস্থিত, হেয়োপাদেয়তা রহিত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাঁহারা। তাঁহাদের দৃষ্টি গভীর, বহুযুগ প্রসারিণী। তাঁহারা জীবনে যে সত্য উপলব্ধি করেন, সেই সত্যের পূর্ণ প্রকাশ হইতে বহু যুগ অতীত হইয়া যায়। তাই, সাধারণ লোকে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে মূর্খ, মুক, উন্মাদ অথবা পিশাচ বলিয়া মনে করে। * মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারা দূরে থাকুক, অল্পদর্শীরা তাঁহাদিগকে সাধারণ লোক অপেক্ষাও হীনতর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তাঁহাদিগকে যথার্থরূপে চিনিতে পারে তাহারা—যাহাদের অন্ততঃ শতাব্দীপরে জন্মিবার সৌভাগ্য হয়। সুতরাং বিবেকানন্দকে যথার্থরূপে চিনিবার শক্তি ভারতবাসীর এখনও হয় নাই। এই জন্যই তাহারা তাঁহাকে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম ঋষি বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। †

শ্রীসাহাজী।

---

* এই জন্যই, গান্ধির ন্যায় মহাত্মাকেও অল্পদর্শীরা "দার্শনিক বিপ্লবপন্থী" "নির্ব্বোধ" "উন্মাদ" ইত্যাদিরূপ আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

† "অর্চ্চনা" হইতে পুনর্লিখিত।

এরিষ্টটল ও আত্মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এরিষ্টটলের মতে Reason বুদ্ধি প্রজ্ঞা ও Sense-perception ইন্দ্রিয় প্রতীতি যে একই জিনিষ নয় তাহা বুঝা গেল। ইন্দ্রিয় দ্বার দিয় যে প্রতীতি ঘটে তাহাদের জন্য সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য স্থির করা, তাহাদিগকে নিয়মিত করা বা সুসজ্জিত করা না হইলে জ্ঞান লাভ হয় না। ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রজ্ঞার যে সম্বন্ধ প্রতীতির সহিত জ্ঞানেব সেই সম্বন্ধ। এরিষ্টটল আরও বলেন প্রতীতি গুলি সীমাবদ্ধ। এক একটি প্রতীতি এক একটি পরিছিন্ন বস্তু জন্য ঘটে এবং সেইটি আবার পরিছিন্ন দ্বার দিয়া উপস্থিত হয়। পরন্তু প্রজ্ঞা Reason সেরূপ পরিছিন্ন নয় ইহা এককালে অনেক গুলি প্রতীতিকে নিজায়ত্তে আনিতে পারে এবং যুগপৎ বহু প্রতীতির মধ্যে সংযোগ বা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। এই প্রজ্ঞা কেবলমাত্র প্রতীতি লইয়াই কারবার করে না তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ বা সংযোগ স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, ইহা অতীন্দ্রিয় পদার্থের অনুসন্ধান করে এবং সেই অনুসন্ধানে ও অনুশীলনে সে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করে। এরিষ্টটল বলেন এই প্রজ্ঞা বলে বস্তু বা পদার্থ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ হয়; বিশেষ বিশেষ গরু দেখিয়া 'গোত্ব' সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় সেটি বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার ব্যাপার। ইন্দ্রিয় প্রতীতি দ্বারা সেটি সম্ভব হয় না। প্রজ্ঞার সহিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির বা প্রতীতির সম্বন্ধ কি, বিচার করিয়া এরিষ্টটল বলেন প্রতীতি পদার্থের জড়াংশের সংবাদ দেয়, প্রজ্ঞা তাহার চিৎ অংশের সংবাদ দেয়। প্রতীতি ব্যাপারেও আত্মার কার্য্য লক্ষিত হয় কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়াই জগতের সহিত আদান প্রদান হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জড় ও চৈতন্যের মধ্যে এরিষ্টটলের মতে মূলতঃ কোন ভেদ নাই; জড়, চৈতন্যের আংশিক বা অপূর্ণ বিকাশ বা অভিব্যক্তি মাত্র; সুতরাং উভয়ের অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিব বা প্রজ্ঞার মধ্যে সম্বন্ধ

ঘটা অসম্ভব নয়। সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ হইলে সংযোগতা অসম্ভব হয়, এ আপত্তি এস্থলে উঠিতে পারে না।

বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার আর একটি বৃত্তি আছে, এটি তার শক্তি বিশেষ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এরিষ্টটল বলেন সূর্য্য যেরূপ আলোক প্রদান করিয়া পদার্থকে আলোকিত করে সঙ্গে সঙ্গে মানবের দৃষ্টি শক্তি প্রদান করে, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা সেইরূপ ইন্দ্রিয় প্রতীতিগুলিকে মানসচক্ষে প্রতিভাত করে সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতীতি হইতে বস্তু প্রকাশ করে বা সৃষ্টি করে। সূর্য্য না থাকিলে যেমন পদার্থের রূপ থাকে না এবং দ্রষ্টাও থাকে না, সূর্য্য যেমন যুগপৎ দ্রষ্টার দৃষ্টি শক্তির ও দৃশ্যের রূপের কারণ, সেইরূপ প্রজ্ঞা না থাকিলে বস্তু বস্তুরূপে প্রকাশ পায় না এবং সেই বস্তুর জ্ঞান লাভও হয় না। প্রতীতিগুলির সহিত বস্তুর সম্বন্ধ স্থাপন কার্য্য একমাত্র প্রজ্ঞারই কার্য্য সেই সম্বন্ধে স্থাপন না হইলে প্রতীতিগুলি হইতে বস্তু-জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। সুতরাং এক হিসাবে প্রজ্ঞাকে বস্তুর স্রষ্টাও বলা যাইতে পাবে। আধুনিক দার্শনিক বলিতেন প্রতীতি হইতে কতকগুলা দেশে ও কালে সম্বন্ধের পরিচয় পাই মাত্র সেই দেশ কালের সম্বন্ধ হইতে বস্তু-জ্ঞান আপনা আপনি হয় না। এরিষ্টটল কি এই কথারই আভাষ দিতেছেন না ?

আমরা জড়ও চৈতন্য বলিতে যাহা বুঝি ইংরাজিতে Matter ও Mind বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এক নয়। আবার মন Mind ও soul আত্মায় যে ভেদ আছে, Reason প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির যে ভেদ আছে দার্শনিক পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। এরিষ্টটল আত্মা বলিতে কথনও মনকে কথনও বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিলেও তাহাদের পার্থক্য অজ্ঞাত ছিলেন না। এই আত্মা এক না বহু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ? এ প্রশ্নের সদুত্তর এরিষ্টটলদর্শনে পাওয়া যায় না। দেহের সহিত দেহীব একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া তিনি এই প্রশ্নকে আবও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। যখন তিনি বলেন যে কোন দেহী বা আত্মা যে কোন দেহকে আশ্রয় করিতে পারে না তখন মনে হয় তবে বুঝি তিনি বহু জীববাদ স্বীকার করেন। কিন্তু যখন আবার তিনি বলেন

আত্মা অবিনাশী, অসীম তখন মনে হয় তিনি একমাত্র চিৎ পদার্থেরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। দেহ দেহীর সম্বন্ধটি বা জড় ও চেতনের সম্বন্ধ বিচার করিয়া এরিষ্টটল বলেন জড় চেতনের জন্যই বর্ত্তমান, জড়ের নিজের কোন প্রয়োজন নাই, চৈতন্যের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই তার অবস্থান। অন্য কথায় চৈতন্য আপনাকে বিকশিত করিবে বলিয়াই জড় দেহ গ্রহণ করে, কিন্তু দেহকে চালিত করে অনুপ্রানিত করে বলিয়াই চৈতন্যের Reality বা বাস্তবিক সত্তা একটিকে ছাড়িয়া দিলে অপরটির অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিলেও চলে। এরিষ্টটল বলেন ইন্দ্রিয় না থাকিলে যেমন অনুভূতি হয় না তেমনি দেহ না থাকিলে আত্মা বাস্তবিক অর্থাৎ ব্যক্তরূপে (as a reality) থাকিতে পারে না। আবার বলেন দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ যেন যন্ত্র ও যন্ত্রী সদৃশ ; যন্ত্রী ছাড়া যন্ত্রের দ্বারা কোন কাজ হয় না আবার যন্ত্রকে বাদ দিলে যন্ত্রীকে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িতে হয়।

আত্মার বা চিৎপদার্থের বৃত্তির সহিত আত্মাকে এক করিয়া ফেলিলে অনেক দোষ উপস্থিত হয়। প্রতীতির উদয় হয় তিরোভাব ঘটে, স্মৃতির উৎপত্তি লয় আছে, কিন্তু তাহাদের অন্তরালে যে চিৎ পদার্থ বর্ত্তমান তাহার উৎপত্তিও নাই লয়ও নাই। আত্মার সহিত তার বৃত্তিকে এক করিয়া ফেলিয়া এরিষ্টটল আত্মার মধ্যে একটি স্বগত ভেদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া তাহার একটি ভাবকে অবিনাশী ও অপরটি ধ্বংশশীল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বিনাশের তত্বটি বিচার করিলে দেখাযায় একই চৈতন্যের একটি অব্যক্ত অবস্থা ব্যক্ত হইয়া আবার অব্যক্ত হওয়াই—বিনাশ ; সুতরাং যিনি এই ব্যক্তাব্যক্ত অবস্থার অন্তরালে যিনি তাহা হইতে পৃথক থাকিবেন, তিনি চিৎ মাত্র। এরিষ্টটল ঠিক ইহা না বলিলেও আত্মাকে চিৎ মাত্র বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। তাঁর মতে এই চিৎ পদার্থ না থাকিলে জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব। ফলে ঈশ্বরের সহিত ইহার অভেদ উল্লেখ করিয়াছেন।

এরিষ্টটলের মতে যাহা বহু তাহা জড় (material) এবং জড় মাত্রেই

বিনাশী বা পরিণামশীল সুতরাং চিৎ পদার্থ বহু হইতে পারে না। তাঁর মতে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না সুতরাং পদার্থের আত্যন্তিক ধ্বংসও তাঁর মতে অস্বীকার্য্য।

উদ্ভিদের সহিত জীবের এবং মানুষের সহিত ইতর জীবের প্রভেদ বর্ত্তমান; এরিষ্টটলেব এই কথা হইতে মনে হয়, যে চিৎশক্তি মানুষে বর্ত্তমান ইতর জীবে ঠিক তাহাই নাই এবং ইতর জীবে যাহা আছে উদ্ভিদে আবার তাহাও নাই। এই কথাও যখন তিনি বলেন পশুর আত্মা ইচ্ছা করিলেই মনুষ্য দেহ ধারণ করিতে পারে না, তখন মনে হয় বুঝি তিনি বহু জীববাদ স্বীকার করিতেন। তাঁহাব দর্শন লেখকেরা এ বিষয়ে এক মত নহেন।

গ্রীকে ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ হইতে আমাদের এরিষ্টটল দর্শনের পরিচয় লাভ ঘটে তাহাকে আবার বঙ্গ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হয় সুতরাং অনেক সময় ঠিক পারিভাষা পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। এরিষ্টটলের মতেও প্রাণ মন বুদ্ধি ও আত্মার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তিনি সে পার্থক্যও সকল সময় বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন নাই; ফলে স্থল বিশেষে অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। থাক্ সে কথা। তিনি বলেন আত্মা বা চিৎ পদার্থ একটা দেহ বা জড় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেই থাকিবে। আত্মা ব্যক্ত অবস্থায় থাকিলে তাহার দেহ প্রয়োজন। ব্যক্তবস্থায় দেহ ছাড়া আত্মা থাকিতে পারে না। আত্মার বিকাশ হইতে গেলে দেহের মধ্য দিয়াই হইবে। অব্যক্তাবস্থায় দেহের প্রয়োজন না হইতে পারে। আত্মার ব্যক্ত ও অব্যক্তাবস্থায় বলিতে এরিষ্টটল কি বুঝিয়াছিলেন বলা সুকঠিন তবে ইহার সহিত জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়।

উপক্রমে বলা হইয়াছে পদার্থ মাত্রেরই যেটি সারাংশ তাহাই তাহার আত্মা অর্থাৎ সেইটিকে বাদ দিলে সেই পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়।

একই সূর্য্যের রশ্মি যেমন ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া প্রকাশ পাইয়া সামান্য

আলোক প্রদান করে মাত্র, সূর্য্যকান্ত মণির উপর পড়িলে যেমন তাঁহার শক্তির অধিকতর বিকাশ হয় তেমনি কি একই চিৎশক্তির উদ্ভিদে অল্প প্রকাশ, ইতর জীবে তদপেক্ষা অধিক ও মানুষে আরও অধিকতর বিকাশ ইহাই কি এরিষ্টটলের বক্তব্য?

শ্রীকানাইলাল পাল, এম্-এ, বি-এল্।

শ্রীশ্রীগোলাপমাতা।

শ্রীশ্রীমার জন্ম তিথি পূজার পরদিনে ৪ঠা পৌষ তারিখে অপরাহ্ন ৪টার সময় শ্রীশ্রীমায়েব প্রধানা সেবিকা পূজনীয়া গোলাপমাতা দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন—এ সংবাদ উদ্বোধন পাঠকবর্গ ইতঃপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার ভক্তগণের নিকটে গোলাপমাতা সবিশেষ পরিচিতা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠকগণও বোধ হয় প্রায় সকলেই জানেন যে ইনিই সেই 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' —যাঁর বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঠাকুবেব স্ত্রীভক্ত পূজনীয়া যোগেন মাতার সহিত পূর্ব্ব হইতেই গোলাপমাতার পবিচয় ও সদ্ভাব ছিল এবং তাঁহারই সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবকে প্রথম দর্শন কবিতে যান। গোলাপ মায়েদের সাংসাবিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। কিন্তু তাঁহারা কুলীন ছিলেন। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হ'বার পর গোলাপমার স্বামী মারা যান। ছেলেটি অতি অল্প বয়সেই মারা যায়। তখন অর্থাভাব হেতু তখনকার দিনের মহামান্য কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া গোলাপমা তাঁর একমাত্র কন্যাকে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশের সুবিখ্যাত সঙ্গীত-চর্চ্চা-প্রিয় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বিবাহ দেন। কন্যাটি সুশ্রী ও গুণবতী ছিল, দৈব প্রতিকূলে সেই কন্যারও মৃত্যুতে শোকে গোলাপমা পাগলের মত হইয়া পড়েন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ও সান্ত্বনা লাভে শোক কথকটা উপশম হইতে পারে মনে করিয়া যোগেনমাতা এই সময় তাঁহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান। ঠাকুরের দিব্য ঈশ্বরীয় ভাব সংস্পর্শে আকৃষ্ট হইয়া দু একবার যাতায়াতের পর হইতেই গোলাপমার মনের শোকাবেগ হ্রাস পাইতে থাকে, এই সময় নহবতে শ্রীশ্রীমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন "তুমি ওকে খুব ঠেসে পেট ভরে খেতে দিবে—পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে", এই সময় হইতেই গোলাপমা ক্রমশঃ মাঝে মাঝে নহবতে শ্রীশ্রীমার কাছে থাকিয়া যাইতেন।

শোক সন্তপ্তা গোলাপমাতা, তাঁহার বাটীতে একদিন শুভ পদার্পণ করিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ঠাকুরকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কথামৃতে ইহার এইরূপ বিবরণ আছে :—"আজ ঠাকুর গৃহে পদার্পণ করিবেন বলিয়া সমস্ত দিন ব্রাহ্মণী উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন'। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন যে নন্দবসুর বাটী হইয়া তাঁহার বাটীতে আসিবেন, যতক্ষণ ঠাকুর নন্দবসুব বাটীতে ছিলেন ততক্ষণ ব্রাহ্মণী ঘর বাহির করিতে ছিলেন—কখন তিনি আসেন; বিলম্ব হওয়াতে তিনি ভাবিতেছিলেন তবে বুঝি ঠাকুর অসিবেন না, তাই তিনি নিজেই খবর নিতে গেলেন, কেন এত দেরী হচ্ছে, ইতিমধ্যে ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে আসিয়া পৌছিয়াছেন। ব্রাহ্মণী তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া প্রণাম কবিয়া কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না, অধীর হইয়া বলিতেছেন 'ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচিনা গো, আমার চণ্ডী যখন এসে ছিল সেপাই শান্ত্রী নিয়ে, আর রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছিল, তখনও এত আহ্লাদ হয় নি গো, ওগো চণ্ডীর শোক এখন একটুও আমার নাই। যাই, সকলকে বলি গে—আয়রে আমার সুখ দেখে যা—যাই, যোগেনকে (যোগেনমাতা) বলিগে আমার ভাগ্যি দেখে যা, আবার আনন্দে অধীর হইয়া বলিতেছেন 'ওগো, খেলাতে (লটারীতে) একটা টাকা দিয়ে এক মুটে লাখ টাকা পেয়ে ছিল, সে যাই শুনলে একলাখ টাকা পেয়েছি, অমনি অহ্লাদে মরে গিছ্লো! সত্য সত্যই মরে গিছ্লো!

ওগো, আমার যে তাই হ'ল গো ! তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, না হলে আমি সত্য সত্যই মরে যাব !"

কত জন্ম ভগবৎ ধ্যান চিন্তায় ও ভগবানের সঙ্গ লাভে তবে এতখানি আত্মহারা আনন্দ ও অনুরাগ আকর্ষণ হয় ! শ্রীশ্রীমা বলিতেন "জন্মে জন্মে ভক্তের ভাব ঘনীভূত হয়" ।

ব্রাহ্মণী এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় উঁহাব ভগ্নী আসিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন 'দিদি, এসো না ! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হয় । নীচে এসো । আমি কি একলা পারি ।

ব্রাহ্মণী আনন্দে বিভোর ! ঠাকুর ও ভক্তদের দেখিতেছেন । তাঁদের ছেড়ে যেতে পাচ্ছেন না ।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পব ব্রাহ্মণী অতিশয় ভক্তিসহকারে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিলেন । ভক্তেরাও সকলে মিষ্টিমুখ করিলেন ।

রাত্রে ঠাকুর বলিতেছেন আহা, এদের (ব্রাহ্মণীদের) কি আহ্লাদ ! মণি—(জনৈক ভক্ত) 'কি আশ্চর্য্য, যীশুখ্রীষ্টের সময় ঠিক এই রকম হয়েছিল । তারাও দুটী মেয়ে মানুষ ভক্ত দুই ভগ্নী—মার্থা আর মেরী ।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—(উৎসুখ হইয়া) তাদের গল্প কি বল ত, মণি—যীশুখ্রীষ্ট তাদের বাড়ীতে ভক্ত সঙ্গে ঠিক এই রকম করে গিয়েছিলেন । এক ভগ্নী তাঁকে দেখে ভাবোল্লাসে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন, আর একটি বোন একলা খাবার দাবার উদ্যোগ করছিল, সে যীশুর কাছে নালিশ করলে—'প্রভু দেখুন দেখি দিদির কি অন্যায় ! উনি আপনার কাছে চুপ করে বসে আছেন, আর আমি একলা এই সব উদ্যোগ করছি', তখন যীশু বল্লেন তোমার দিদিই ধন্য ! কেননা মানুষ জীবনের যা প্রয়োজন (অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম) তা ওঁর হয়েছে !"

এই সব ঘটনা সাদৃশ্যে মনে হয়—ভগবানের সঙ্গে নর লীলার মহা মাধুর্য্য আস্বাদন ও আকর্ষণ সম্ভোগ করিয়া পুনঃ পুনঃ তৃপ্ত হইবার জন্য এবং ভক্তের অনুরাগ বিশ্বাসের আদর্শ সমুজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত

তিনিই তাঁর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ভক্তগণকে বিশেষ করিয়া সঙ্গে আনয়ন করেন। শ্রীশ্রীমা বলিতেন "যে যার, সে তাঁর—যুগে যুগে অবতার।"

গোপাল মা দক্ষিণেশ্বরে নহবতে যখন শ্রীশ্রীমার নিকট থাকিতেন তখন প্রায়ই অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন, রান্না হলে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের জন্য ভাতের থালা সাজিয়ে দিতেন, এবং এই সময় হইতে গোলাপ মাই উহা ঠাকুরকে দিতে যাইতেন, গোলাপ মা বলেছিলেন "এক দিন দেখি কি, খাবার সময় ঠাকুর যখনই মুখে গ্রাস দিচ্ছেন অমনি ঠাকুরের ভিতর থেকে একটা যেন সাপের মত উহা ছোবল মেরে মেরে নিয়ে খেয়ে ফেলছে! আমি ত দেখে হেসেই আকুল! ঠাকুর ও জিজ্ঞাসা কচ্ছেন। কিগো, বল দেখি—আমি খাচ্ছি, না কে খাচ্ছে?" আমি এতক্ষণ যা দেখছিলুম তাই বল্লুম—আপনার ভিতর থেকে একটা সাপে ছোঁবল মেরে নিচ্ছে।' ঠাকুব তাই শুনে মহাখুসী হয়ে বল্লেন 'ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। তুমি বলে দেখতে পেয়েছ, বুঝতে পেবেছ"—এই বলে আমাকে কত যে কি প্রশংসা কবতে লাগলেন। সর্পাকারা কুণ্ডলিনীর আহুতি গ্রহণ বলে না? এ তাই দেখেছিলুম!"

ইহাব পরে ঠাকুর অসুস্থ হইয়া যখন শ্যাম পুকুরের বাটীতে চিকিৎসার্থ থাকেন তখন গোলাপ মা ঠাকুরের পথ্যাদি কিছুদিন তৈয়ারী ক'রে দিয়েছিলেন। ঠাকুরের কাশীপুর বাগানে অবস্থান কালেও গোলাপ মা শ্রীশ্রীমাব কাছে প্রায়ই থাকিতেন। ঠাকুরের অদর্শনের পর গোলাপ মা শ্রীশ্রীমার সঙ্গে কাশী হয়ে বৃন্দাবন যান। তথায় প্রায় একবৎসর থাকেন। ইহার পরেও কাশী জগন্নাথ রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে ও কৈলোয়ার, কোঠার প্রভৃতি যে স্থানে যখন শ্রীশ্রীমা গিয়াছেন গোলাপ মা সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিলে ত কথাই নাই। কখন বা শ্রীশ্রীমাব সঙ্গে তাঁর দেশে যাইতেন। ঠাকুর যে শ্রীশ্রীমাকে বলেদিয়েছিলেন "তুমি এই ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে যত্ন কোরো—এই বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে।" শ্রীশ্রীমাও কোনও ভক্তবাড়ী বা কোথাও যেতে হলে গোলাপ মার সঙ্গে যেতেন। বলতেন গোলাপ না গেলে কি আমি যেতে পারি? গোলাপ সঙ্গে থাকলে আমার ভরসা"।

বাস্তবিক অনেক স্থলে ভক্তদের অবিবেচনার আবদার হতে গোলাপ মাই শ্রীশ্রীমাকে রক্ষা করিতেন। একবার ভক্তেরা শ্রীশ্রীমাকে ঘরে বসিয়ে ধূপ ধূনো দিয়ে স্তব পূজা করিতে ছিলেন। শ্রীশ্রীমা খুব ঘর্ম্ম-ক্লিষ্ট হয়েও সঙ্কোচে কিছুই বলিতে পারিতে ছিলেন না। গোলাপ মা একটু স্থানান্তরে ছিলেন। আসিয়া দেখিয়াই "তোমরা কি কাঠ পাথরের ঠাকুর পেয়েছ গা"—এই বলিয়া ভক্তদিগকে ধমক দিয়া মাকে বাহিরে বাতাসে লইয়া আসিলেন।

বাগবাজারের শ্রীশ্রীমার বাটী নির্ম্মিত হওয়ার পূর্ব্বে মাকে যখন কলিকাতা আনা হইত, তাঁর জন্য ভাড়াটিয়া বাটী ঠিক করা হইত। এইরূপে তখন বেলুড়ে, বাগবাজারে ও অন্যান্য যে স্থানে আসিয়া শ্রীশ্রীমা বাস করিয়া ছিলেন সর্ব্বত্রই গোলাপ মা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। মার ও ভক্তদের খাওয়া দাওয়ার দেখা শুনা করা এই তাঁর প্রধান কাজ ছিল। এক কথায় মার ভক্ত সংসারের তিনিই প্রধান গিন্নী ছিলেন। ভক্তদের প্রণামের সময় শ্রীশ্রীমার নিকট গোলাপ মা উপস্থিত থাকিতেন এবং শ্রীশ্রীমার অনুচ্চ উচ্চারিত আশীর্ব্বাণী ও ভক্তদের কুশলাদি প্রশ্নোত্তর তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতেন।

কোথাও যাতায়াত কালে গাড়ীতে উঠিবার ও নামিবার সময় গোলাপ মা শ্রীশ্রীমাকে হাতে ধরিয়া সাহায্য করিতেন এবং চলিবার সময় গোলাপ মার আঁচলটি ধরিয়া সলজ্জ বধুটির মত মা যাতায়াত করিতেন, এ দৃশ্য ভক্তেরা প্রায় সকলেই নিরীক্ষণ করিয়াছেন।

এই বাগবাজারের শ্রীশ্রীমার বাটীতে দেখিতাম গোলাপ মা শেষরাত্রে ৪টার পূর্ব্বেই উঠিতেন এবং শৌচাদি সমাপনান্তে নিজ ঘরে জপে বসিতেন। প্রায় তিন ঘণ্টা জপধ্যান করিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাকে প্রণাম করিয়া নীচে আসিয়া দৈনিক রান্নার ভাণ্ডার বাহির করিয়া দিয়া তরকারী কুটিতে বসিতেন। প্রথম রান্নার মত খানিকটা করে দিয়ে শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে গঙ্গা স্নানে যাইতেন ও আসিবার সময় তাঁর সেই ছোট পিতলের কলসীটি করে ঠাকুর পূজার জন্য রোজ গঙ্গাজল লইয়া আসিতেন। পুনরায় আসিয়া তরকারী কোটায় যেগেন মার সাহায্য

করিতে এবং পরে পান সাজিতে বসিতেন। ইদানীং কালেও রোজ এক শত খিলির কম পানে ওখানে হতনা। আমি অনেক সময় দেখিয়া অবাক হইতাম যে এ বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর আলস্য বা অন্য কেউ করছে না বলে বিরক্তি বা অনুযোগ করা ছিলনা

এদিকে পূজা শেষ হলে প্রায় রোজই (কদাচিৎ কখনও শ্রীশ্রীমা বা অন্য কেহ) ফলমিষ্ট প্রভৃতি প্রসাদ প্রথমে শ্রীশ্রীমার জন্য একটি থালায় রাখিয়া পরে শালপাতে ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া প্রথমে ভক্তদিগকে, তারপর চাকর সকলকে দিয়ে আসিতেন। দুপুরে সকলের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া আহারান্তে সামান্য একটু বিশ্রাম করিয়াই কখনও বা কোন শাস্ত্র-গ্রন্থ—মহাভারত, গীতা বা ঠাকুর স্বামিজীর বই পাঠ করিতেন। নয় ত বৈকালের রান্নার জন্য আলু ছাড়াচ্ছেন বা পানেব জন্য সুপারী কুঁচিয়ে রাখচেন, বা সাধু ব্রহ্মচারীদের বালিসের ওয়াড়, কি ছেঁড়া মশারী প্রভৃতি সেলাই করে দিচ্ছেন। বেলা পড়ে আসলে শ্রীশ্রীমা বা যোগেনমার কাছে গিয়ে বসে কথাবার্ত্তা ও মালা-জপ করিতেন। কদাচিৎ কখনও বা বলরামবাবুর বাড়ী বেড়াতে যেতেন। সন্ধ্যা হতে যাই ঠাকুর ঘরে আলো দেওয়া হল, অমনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাকে প্রণাম করিয়া একটু পরেই নিজের ঘরে গিয়া জপ ধ্যানে বসিতেন এবং রাত প্রায় ৯টা, ৯॥টা অবধি উহাতে নিবিষ্ট থাকিতেন। শ্রীশ্রীমাও বলিতেন "এই গোলাপ, যোগেন কত ধ্যান জপ করেছে—গোলাপ জপে সিদ্ধ" তৎপরে ভক্তদের আনীত ফল মিষ্টি প্রভৃতি থাকিলে ঠাকুরের রাত্রের ভোগের জন্য সে সব ঠিক করিয়া দিয়া শ্রীশ্রীমার ও ভক্তদের খাওয়া দাওয়ার সময় সেইসব প্রসাদী ফল মিষ্টি দেওয়ার ব্যবস্থা ও দেখা শুনা করিয়া তবে সেদিনকার মত নিশ্চিন্ত হইতেন।

কে কোন্ জিনিটি পেলে, কি না পেলে এ সব তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। কেহ হয়ত কার্য্যানুরোধে সকাল সকাল খেয়ে বেরিয়ে গেছে—কিন্তু সেদিনকার ঠাকুরের ভোগে বিশেষ কোন কিছু জিনিষ থাকিলে তিনি তার জন্য ঠিক সেটি মনে করিয়া রাখিয়া দিয়েছেন! যদি কেহ মনে

করেন এ সবে বিশেষত্ব কি ? তাহা এই যে, ঐহিক লোকে আপন সন্তানাদির জন্য যাহা করিয়া থাকে, তিনি এই ভক্ত ভগবানের সংসারে সাধু, ভক্ত, ভগবানের সেবায় তাহা করিতেন—মায়ায় নয়, ভক্ত, ভগবানের সেবায়। আমরা অনেক সময়ই কোথাও হয়ত হঠাৎ চলে গেছি, বিছানা বালিস মশারী কতক হয়ত উদ্বোধনের বাটীতেই পড়ে রয়ে গেল, গোলাপমাব চক্ষে পড়লে তিনি সে সব গুছিয়ে টুছিয়ে, অপরিস্কার হলে নিজেই সাবান দিয়ে বা ধোপা বাড়ী দিয়ে কাচিয়ে আনিয়ে ঠিক ঠাক করে রাখতেন। তিনি এমনি সব জিনিষ পত্রের হেপাজাত পোহাতেন বলিয়া আমরা কোথাও দূরে যাবার সময় তাঁর কাছে নির্ভাবনায় সব রেখে আস্‌তাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভের পর হইতে এইরূপে ভক্ত ভগবানের সেবায় আত্ম নিয়োগ করিয়া গোলাপমাতা স্বীয় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা ত এই এতকাল উদ্বোধনের বাটীতে ছিলাম, কিন্তু সেখানের থালা বাসন জিনিষপত্র, ঠাকুর সেবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কি আছে, না আছে বা কি দরকার সে সবের আমবা কোন ধার ধারিতাম না। আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম সে সব গোলাপমা দেখছেন, তিনি যথাকালে প্রয়োজনীয় সব জিনিষটি পত্রটি আনিয়ে রাখাতেন মায় শাল পাতাটি পর্য্যন্ত যদিও অনেক থালা ছিল, কিন্তু কখন হঠাৎ দরকার পড়ে, তাই, সাধু ব্রহ্মচারীদেব ছেঁড়া পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি কাচিয়ে এনে উহা এবং ভাঙ্গা বাসন প্রভৃতি বদলী করিয়া নূতন বাসনাদি বা অন্য কিছু কিনাইয়া রাখিতেন—অপচয় সহ্য হত না। এমন কি কমলা লেবুর খোসা, আকেব ছোলা এসবও শুকাইয়া রাখিতেন—উনুন ধবাতে লাগবে, শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষা ছিল "অপচয় করতে নেই, অপচয়ে মা লক্ষ্মী কুপিত হন"। তরকারী-পত্রের খোসা, ভক্তদের আহারের পর পাতে পরিত্যক্ত এসবও নিয়ে রাস্তার গরুকে ডেকে দিতেন। উদ্বোধনের বাটীতে কতকগুলি খরগোস গিনিপিগ আছে, পান সাজা হয়ে গেলে পানের বোঁটাগুলি তাদের দিতেন। এ নয়, যে তিনি গিনিপিগ ভালবাসতেন—ওরা পানের বোঁটা খেতে ভালবাসে, তাই। ভিখারী বৈষ্ণব আসলে

যথা সাধ্য দু একটি পয়সা দিতে ভুলিতেন না, মাঝে মাঝে এক আধ-খানা কাপড়ও দিতেন, তারা জানত, "মা" বলে ডাক দিলেই উপর হতে কিছু পড়বে। নিজে পাথুরিয়াঘাটার দৌহিত্রদের নিকট হতে মাসিক দশটি করিয়া টাকা পাইতেন। উহা হতে পাঁচ টাকা উদ্বোধনে নিজের খোরাকীর জন্য সাহায্য করিতেন। বাকী যা থাকিত তাহা ঐরূপ দীন দুঃখীকে দিতে ফুরাইত। নিজের বিশেষ কিছুই ব্যয় ছিল না। এক পাগলী আসিয়া "গোলাপের মা, আমি এইছি" বলে প্রায়ই মাঝে মাঝে হাঁক দেয়। কারণ, সে জানে এলে, যা থাকে তিনি কিছু খেতে দিবেন। কখন বা রাতে যখন সকলে শুয়েছে, তখন এসে পাগলী ডাক্‌ছে। সামনের দরজায় আমাদের ধমক খেয়ে সে পিছনের দরজায় গিয়া 'গোলাপের মা' বলে ডাক সুরু করলে! 'এত রাতে তোকে কি দেই?' বলে উঠে যা থাকে কিছু দিয়ে এলেন, বলতেন, "আহা পাগল, অনাথ, দুয়ারে দুয়ারে মেগে খায়, সময় হউক, অসময় হউক, এলে একমুঠো দিতে হয়"। অভাবে পড়ে কেউ কিছু চাইলে তিনি ভিক্ষা করেও কিছু দিতে চেষ্টা করতেন। গরীব প্রতিবেশী কাহারও অসুখ হলে "ও দুর্গাপদ, ও কাঞ্জিলাল একবারটি দেখে এস"—এই বলে ভক্ত ডাক্তারদের ডেকে নিয়ে তাদের দেখাতেন। এইরূপে যথাসাধ্য সকলের সেবা করিতেন। নিজে কিন্তু নেহাৎ অসমর্থ না হলে কখনও সেবা নিতে চাইতেন না, এবং তাহাও, একটু কেহ সেবা করিলে তাহা কতই মনে কবিতেন।

গোলাপমা নির্ভীক স্পষ্ট বক্তা ছিলেন, মা তাই কখনো কখনো তাঁকে বলতেন "ও গোলাপ, ও কি হচ্ছে তোমার? অপ্রিয় বচন সত্য কদাপি না কয়"। মা বলিতেন "গোলাপেব সত্য কথা বলতে গিয়ে গিয়ে চক্ষু লজ্জা ভেঙ্গে গেছে"।

তাহার চরিত্রে আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার ছিল যে তাঁর অভিমান ছিল না। চিকিৎসার্থ শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান কালে তিনি ভক্তদের কাছে কত লাঞ্ছনা সয়েছেন। কিন্তু অভিমান করে চলে যান নাই। গোলাপমা বলতেন "কি আশ্চর্য্য সেই সময়

কেহ ঠাকুরের কাছে আমার নামে কোন কথা লাগালে স্বপ্নে দেখতুম ঠাকুর সে সব আমাকে বলে দিচ্ছেন :—'ওগো, তোমার বিরুদ্ধে এই সব কথা বলছে—তুমি বল অমুক (জনৈক স্ত্রীভক্তের নাম করিয়া) তোমাকে খুব ভালবাসে, সেও এই সব বলেছে'। সমস্ত রাতি ঠাকুর-কেই স্বপ্নে দেখতুম। লোকের ভালমন্দ কথা আমার কানেও ঢুকতনা"। বর্ত্তমান কালেও আমরা অনেকে কত সময় রুক্ষ কথা বলে তাঁকে কাঁদিয়ে ছেড়েছি। তাতে তৎকালীন অসন্তুষ্ট হলেও তিনি সে সব কখনও মনে করে রেখে চটে থাকার ভাব পোষণ করিতেন না। সতের রাগ জলের দাগ—তাই তাঁর ছিল।

গোলাপমার খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে কোন ছুঁৎমার্গ ছিল না। শ্রীশ্রীমাই বলতেন "গোলাপের মনে কোন বিকার নেই, দিলে হয়ত খানিকটা দোকানীরই আলুব দাম খেয়ে!" আর মেয়েদের যে সাধারণতঃ একটু শুচিবাই থাকে তা তাঁর ছিলই না। শুচি অশুচি বিচার এক মনের নিম্ন অবস্থায় থাকে না, আর মনের উচ্চ অবস্থায় থাকে না। শ্রীশ্রীমার ভ্রাতুস্পুত্রী নলিনী একদিন শ্রীশ্রীমাকে বলছেন "একদিন দেখি গোলাপ দিদি পায়খানা সাফ করে এসে (মায়ের ব্যবহৃত উপরকার পায়খানা গোলাপমাই রোজ সাফ করতেন) আবার কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের ফল ছাড়াতে গেল, আমি বললুম 'ওকি, গোলাপ দিদি, গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস', গোলাপ দিদি বল্লে 'তোব ইচ্ছা হয়, তুই যা না'! শুনে শ্রীশ্রীমা বল্লেন "গোলাপের মন কত শুদ্ধ, কত উচু মন তাই ওর অত শুচি অশুচি বিচার নেই অত শুচিবাই টাইয়ের ধার ধারে না, ওর এই শেষ জন্ম, তোদের অমন মন হতে আলাদা দেহ দরকার!"

রাম প্রসাদের গানে আছে ঠাকুর গাইতেন, "শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি, (তাদের) দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি"—এক অজ্ঞানীর শুচি বিচার অত থাকে না, আর ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে থাকে না।

শ্রীশ্রীমা আরও বলেছিলেন "এই গোলাপের মনটি শুদ্ধ, বৃন্দাবনে·

মাধবজীর মন্দিরে আমরা দর্শন করতে গেছি, সঙ্গে ছেলে-যোগেন এরা সব, কাদের ছেলে মেয়ে যেন নোংরা করে দিয়ে গেছে। সবাই নাক সিঁটকুচ্ছে কিন্তু কেউ পরিষ্কারের চেষ্টা কচ্ছেনা। গোলাপ তা দেখে অম্‌নি নিজের নূতন মলমলের ধুতি ছিড়ে পরিষ্কার করলে।

মাগী গুলো দেখে বল্‌ছে "এ যখন ফেলেছে, তবে এরই ছেলে নোরা করেছেরে!" আমি মনে মনে বলছি "মাধব দেখদেখ কি বল্‌ছে!" কেউ বা বলছে "এরা সাধুলোক, এদের আবার ছেলে পিলে কি? এরা ফেল্‌ছেন সব্বায়ের দর্শনের অসুবিধা হচ্ছে—মন্দিরে ময়লা রয়েছে, এজন্য"

"এই গঙ্গার ঘাটেই যদি কোন ময়লা দেখেত গোলাপ হেথা সেথা থেকে ন্যাক্‌ড়া কুড়িয়ে এনে পরিষ্কার করে ঘটি ঘটি জল ঢেলে ধুয়ে দিলে! এতে দশ জনের সুবিধা হল। তারা যে শান্তি পেলে, ওতে গোলাপের ও মঙ্গল হবে, তাদের শান্তিতে এরও শান্তি হবে।"

"অনেক সাধন তপস্যা করলে, পূর্ব্বজন্মের বহু তপস্যা থাক্‌লে তবে এজন্মে মনটি শুদ্ধ হয়"।

মা গঙ্গার প্রতি গোলাপ মার অগাধ ভক্তি ছিল। এই অতি-বৃদ্ধ বয়সে অসমর্থ হইয়াও লাঠিভর দিয়া রোজ গঙ্গা স্নানে যাইতেন, পূর্ব্ব হতেই তিনি স্ত্রী ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন "যোগেন যাবে শুক্ল পক্ষে আর আমি যাব কৃষ্ণপক্ষে"। ঠিক্ তাহাই হইয়াছে—কৃষ্ণ পক্ষ অষ্টমী তিথি। আমি, বলিয়া আসিয়াছিলাম, "গোলাপ মা, আমি ফিরে এলে তবে যাবেন"। তা আমার ভাগ্যে তাঁর শেষ সময়ে উপস্থিত থাকা ঘটিল না!

শ্রীশ্রীঠাকুর ও সাধু ভক্তগণের সেবা করা যাঁর মুখ্য কাজ ছিল, যিনি ছায়ার ন্যায় প্রায় সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শ্রীশ্রীমার ৩৬ বৎসর সেবাধিকার পাইয়া ছিলেন, যিনি সঙ্গে থাকিলে শ্রীশ্রীমার ভরসা'—আহো ভাগ্য, তাঁর জন্ম জন্মান্তরীণ তপস্যা। নতুবা ৩৬ বৎসর সেবা করা—মূর্ত্তির নয়, সাক্ষাৎ শরীরী ভগবানের!!

এতাদৃশ গণের এখনও যাঁরা জীবিত রহিয়াছেন, হে মানুষ, এখনও তাঁহাদের চরণস্পর্শ করিয়া ধন্য হও!　　—স্বামী অরূপানন্দ

মাধুকরী

দুঃখ-বাদ ও জীবনের আদর্শ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

Evolution-তত্ত্বটা Biology (প্রাণীতত্ত্ব) আলোচনার ফল। কিন্তু কোন Biologistই বলেন না যে, Evolution মানে অনন্ত উন্নতি। সমস্ত বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করেন যে, এককালে জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে ; এবং যাহাকে আমরা উন্নতি বলি, কালের কবলে পড়িয়া তাহার চিহ্নমাত্র থাকিবে না। Evolution মানে কেবল উন্নতি নয়, Evolution মানে অবনতিও। Adaptation to Environment Evolutionএর Condition। পৃথিবীতে পূর্ব্বে কয়েকবার যেমন Glacial ageএর প্রমাণ Geologyতে পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিকদের মতে সেইরূপ Glacial age আবার আসিতে পারে এবং তখন lowest form of lifeই জীবন-সংগ্রামে দাঁড়াইয়া যাইবে। তাহারাই তখন fittest এবং তাহাদেরই তখন Survival হইবে। Biologyর fittest মানে জ্ঞান ও ধর্ম্মে fittest ত' নয়ই, এমন কি গায়ের জোরেও fittest নয়। Huxleyএ কথাটা খুব সুন্দররূপে বুঝাইয়া গিয়াছেন। জীবনের ধারা ও মানবেতিহাসের ধারা যে Rectilinear নহে, Curvilinear, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। Infinite Rectilinear Progressএর কোন প্রমাণ নাই। স্বামী বিবেকানন্দ Mathematicsএর সিদ্ধান্ত অনুসারে বলিয়া গিয়াছেন যে, a straight line infinitely produced is a circle। তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, Absolute unityর Conceptionএ পৌঁছানর পর Philosophyর আর কোন Forward movement হইতে পারে না। Conservation of Energy Scienceএর চরম Generalisation। Chemistry সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন Elements বা তথা কথিত মূল পদার্থ গুলিকে যখন একটা Elementএ পরিণত করিতে পারিবে, তখন Chemistryর উন্নতির

চরম। তাহার পর আর Chemistryর উল্লেখ যোগ্য উন্নতি হইতে পারে না। এইরূপ সব। পুরাতন হিন্দু দর্শন ও পুরাতন গ্রীক্ দর্শন এই Curvilinear movement, এই Cyclical movement অথবা অনন্তকাল ধরিয়া উত্থান ও পতন, সৃষ্টি ও লয় এই মতেরই পোষকতা করে। Infinite Rectilinear movementএর কোন প্রমাণ নাই। ওটাকে কবির কল্পনা বা দার্শনিকের মোহ মনে করাই উচিত।

এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, Evolution কথাটা বাজীকরদের "আত্মারাম সরকারের আজ্ঞা" কথাটার মত আওড়াইয়াও Moralityর Relativity দেখাইয়া Morality জিনিষটাকে তুড়ি মারিয়া লঘু করিবার যে একটা প্রয়াস দেখা যায়, সেটা বড়ই অনিষ্টকর। আমি অনেক চিন্তাহীন লোককে Evolution নামক সাপের মন্ত্রটিকে বিড়বিড় করিয়া আওড়াইয়া এইরূপভাবে Moralityর কথা বলিতে শুনিয়াছি, এবং তাঁহাদের লঘু, হাল্কা জীবনের সহিতও কথঞ্চিত পরিচিত আছি। তাঁহারা বলেন, Morality Convention মাত্র। তাই বড়ই দুঃখের সহিত এই কথাগুলি বলিতে হইতেছে। ও Morality জিনিষটা লঘু করিবার নয়। Kant বড়ই সত্য বলিয়াছেন—Two things fill me with wonder—the starry sky without and the moral principle within। দার্শনিক ত' Kant। তাঁহার starry sky withoutটা অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু Moral Principle withinটা যে কেন এত আশ্চর্য্য, তাহা সকলে বুঝেন না। মানব হৃদয়ে ইহার উদয়ের মত Mysterious বা রহস্যময় ব্যাপার আর নাই। Natureএ বা বহির্জগতে ইহার কোথাও সাক্ষ্য নাই। Nature মানে Instinct of Self preservation। Nature মানে Struggle for Existence. Nature মানে Reproduction of the Species। চুরি করা ও মিথ্যা কথা বলাটা অনেক সময়ে Biological Necessity হইতে পারে, কারণ সেটা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু Morality ঠিক্ ইহার উল্টা। Moralityর প্রথম কথা সংযম ও সত্য; দ্বিতীয় কথা Justice; এবং তৃতীয় ও শেষ কথা অহিংসা, প্রেম, ও সেবা। Morality is a protest against Nature।

Morality is Anti-natural অথবা Unnatural. Herbert Spencer Spontaneous Evolutionএর উপর যেমন তাঁহার Ethical theoryর সৌধ নির্ম্মান করিলেন, অম্নি Herbert Spencer অপেক্ষাও বড় Biologist ও তাঁহারই সম-সাময়িক Huxley তাঁহার Evolution and Ethics গ্রন্থে দুই কথায় সে সৌধ চুরমার করিয়া ফেলিলেন। Huxley Hurbert Spencer এর মত বক্‌বক্ করিতেন না, কিন্তু যা দু'চারটা কথা বলিতেন তাহা সার কথা। তিনি স্পষ্টই প্রমাণ করিলেন যে, Biological Lawর দ্বারা Morality বুঝান যায় না। তিনি খুব জোরের সহিত বলিলেন যে, Ethical Process is diametrically opposed to the Cosmic Process। Cosmic Process মানে, যাহা আছে ও স্বাভাবিক অর্থাৎ is; আর Ethical Process মনে, যাহা হওয়া উচিত অর্থাৎ ought, এবং সেই কারণে অস্বাভাবিক। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতে যে এত বড় একটা ব্যবধান,—James যাহাকে বলেন Disjunction সেটা স্বীকার করা ভিন্ন উপায় নাই। Hegelএর Block Universe কোথায়? কোন্ Dialecticএর কস্‌রতে তিনি এই দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন? শুধু die to live বলিলে চলিবে না। Epigram একটা Solution নয়। দেখাইতে হইবে কেমন করিয়া?

দেখান যায় না। তাই মায়া-বাদ। মায়া-বাদ স্বীকার ভিন্ন উপায় দেখিনা। কারণ Jamesএর Pluralism ও Multiverse বিচারসহ নহে। মায়া-বাদ ব্যাপারটাকে Ethicsএর দিক্ দিয়া এখনও প্রমাণ করা হইয়াছে বলিয়া জানি না। Laws of thought বা Pure Reason দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং সেই জন্যই অত ন্যায়ের কচ্‌কচি। আমাদের দর্শনের অধ্যাপকেরা যদি Ethical proof দিয়া এ মায়া বাদ প্রমাণ করিতেও একটা system নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে জগতে মস্ত বড একটা কাজ হয়। আমাদের দেশে বৈরাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনিই বেদান্তের অধিকারী—এই সত্যে বিশ্বাস থাকার জন্যই Ethical proofএর আবশ্যকতা বোধ হয় নাই। কিন্তু এখন যখন বৈরাগ্য সম্বন্ধেই প্রশ্ন উঠিয়াছে, তখন এইরূপ প্রমাণ ভিন্ন উপায় নাই।

Moral life, Life of conscience অথবা ধর্ম্ম জীবন মানেই Nature অর্থাৎ প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম ; এবং ধর্ম্ম জীবনে অগ্রসর হওয়ার মানেই প্রবৃত্তি অর্থাৎ অর্থ ও কামকে কিংবা রজো-গুণ ও তমোগুণকে তপস্যার বলে পরাজিত করিয়া সত্ত্ব গুণ অর্থাৎ নিবৃত্তির দিকে অগ্রসর হওয়া, অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি রিপুবর্গকে জয় করিয়া মনুষ্যত্বকে assert করা এবং পরিশেষে মোক্ষ লাভ করিয়া ত্রিগুণাতীত হওয়া। জীব জগতে কোথাও এই সংগ্রাম দৃষ্ট হয় না। Natureএ ইহা নাই। Nature Unmoral। Natureএর বিরুদ্ধে মানবের বিদ্রোহ deep discontent অর্থাৎ গভীর দুঃখ বোধ হইতে। এই discontentকেই ইংরাজীতে Divine Discontent বলে। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, হাই-কোর্টের জজ্ হইয়াছ, ধন দৌলৎ, মান সম্ভ্রম, পুত্র কন্যা হইয়াছে মনে করিতেছ বেশ আছি। ভগবানও বলিলেন 'বেশই থাক'।" ইহা অপেক্ষা moralityর ভাল ব্যাখ্যা জানা নাই। অনেক Types of Ethical Theory দেখা গেল—Utilitarianism, Endoemonism, Evolution, Intuition, Hegalএর Self Realisation যাহাতে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির নিয়মিত অনুশীলন আদর্শ, এবং যদনুযায়ী কোন প্রবৃত্তির বিলাপ সাধন অনুচিত। কিন্তু এই Pessimism বা দুঃখ বোধের ভিত্তির উপর যে Ascetic বা Absolute morality দণ্ডায়মান, তাহা অপেক্ষা কোন সন্তোষজনক আদর্শ সম্ভবপর নহে। Moralityর Evolutionএর ইহাই চরম পরিণতি। ইহার পর আর Moralityর Evolution হইতে পারে না। যদি সেটা কেহ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে অনুগৃহীত হইব। Human conduct অর্থাৎ মানবের কার্য্য ও ব্যবহারকে এই চরম আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করিলেই তাহার স্থান নির্দ্দেশ সম্ভবপর, নতুবা নয়।

Ascetic morality, Absolute morality, Total renunciation, অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগ ও সন্ন্যাসের আদর্শ শ্রেষ্ঠ আদর্শ কেন, এ প্রশ্নও, দুঃখের বিষয়, শুনিতে হয়। এ আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহের প্রধান কারণ Psychological বা মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া। সাধারণ মানব প্রবৃত্তিকে

এতই ভালবাসে যে, সমস্ত natural প্রবৃত্তি লোপের কথা শুনিলেই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। আরও একটি আনুষঙ্গিক কারণ এই যে, কতকগুলি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতারা ছিলেন গৃহী। তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভোগ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসকে গৃহাস্থাশ্রমের উপর স্থান দিলে তাঁহাদের ধর্ম্মগুলিকে ছোট করা হয়। সেজন্য সর্ব্বত্যাগের বা পূর্ণ বৈরাগ্যের কথা শুনিলেই এই সমস্ত পন্থীদিগের Self-love বা আত্ম প্রীতিতে আঘাত লাগে এবং ফলে তাঁহাদেব মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ও কোলাহলের সৃষ্টি হয়। তখন তাঁহারা সংহিতাকারদেব যে যে বচনগুলি গৃহাস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে, সে বচনগুলি খুব ভক্তিভরে উদ্ধৃত করেন, যদিও অন্য সময়ে সংহিতা-কারদের প্রতি তাঁহাদেব বিশেষ শ্রদ্ধা দেখা যায় না। আবার মধ্যে মধ্যে জনক রাজাকে লইয়াও টানাটানি করেন।

আশা করি, আমার কথা শুনিয়া কেহ ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি কার্য্য কারণের সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা কবিতেছি মাত্র। সর্ব্বত্যাগ, সন্ন্যাস বা Ascetic morality শ্রেষ্ঠ কেন, ইহা বুঝাইবার জন্য আমি কোন শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত-করা অনাবশ্যক মনে করি। সাধারণ বিচার বুদ্ধি সহায়ে আমি ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বা সংযম ধর্ম্ম-জীবনের সার তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, যিনি সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন উচ্চতম। Chastity যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিবাহিত জীবন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর আদর্শ Absolute Chastity বা চির-কৌমার্য্য। বিবাহিত জীবন মানে স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্বন্ধের কথাই বলিতেছি। পবমহংস রামকৃষ্ণদেবের বিবাহিত জীবন বলিতেছি না। সে সম্বন্ধ কাম-গন্ধ-হীন। তাঁহার স্থান জগতের সমস্ত সন্ন্যাসীর উর্দ্ধে। Spiritual marriage বা আধ্যাত্মিক বিবাহ কাহাকে বলে, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে কোন Miracleএর কথা একেবারেই অনাবশ্যক। তাঁহার বিবাহিত জীবন জগতের ইতিহাসে Greatest Miracle বা সর্ব্বাপেক্ষা অলৌকিক ঘটনা। এ আদর্শ জীবন যিনিই

পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই জানেন, ইহা কিরূপ কষ্টসাধ্য,—একরূপ অসাধ্য বলিলেই হয়। একমাত্র Plotinusএর শিষ্য Porphyryর Letters to Marcella হইতে জানা যায় যে, Porphyry জীবনে এই আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পালনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু, রামকৃষ্ণ জীবনে উহার যেরূপ সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায়, Porphyryর জীবনে সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যেরূপ কাম দমন করা ধর্ম্ম, সেইরূপ লোভ দমন করাও যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে যিনি সম্পূর্ণ নির্লোভ, যাঁহার আদর্শ Absolute Poverty—আবার Absolute Chastity না হইলে Absolute Poverty সম্ভবপর নয়—যাঁহার নিজের বলিতে কিছুই নাই, তিনিই শ্রেষ্ঠতম মানব। The Son of Man had not where to lay his head। অন্যান্য রিপু সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। আশা করি, আমার বক্তব্যটা বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে দেখিয়াছি বলিয়াই সর্ব্বত্যাগই যদি আদর্শ হইল, তাহা হইলে Idealটা ত' Nagative বা নেতি মূলক হইল। এ Idealএ আনন্দ কোথায়? অথচ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়—আনন্দ রূপং অমৃতং যদ্বিভাতি।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষ
আশ্বিন } —অধ্যাপক শ্রীকামাখ্যানাথ মিত্র, এম্ এ

পুস্তক-পরিচয়

শতবর্ষের বাঙ্গলা—শ্রীমতি লাল রায় প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস্, চন্দননগর। মূল্য বার আনা।

এই গ্রন্থ আমরা পাঠ করিলাম। অল্প পরিসরের মধ্যে ইহা সুপাঠ্য হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আনন্দ ও আশার সহিত ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। চলচ্চিত্রের মত একের পর আর গত শতাব্দীর মহাপুরুষদের চরিতালোচনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য রক্ষা করিবার একটা চেষ্টাও ইহাতে লক্ষিত হয়। এবং সেই সঙ্গে অসামান্য দুই একটি অতি মারাত্মক ক্রুটীও আমাদের দৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত, গত শতাব্দীর ইতিহাসের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। রাজা রামমোহনের চরিত্র বিশ্লেষণে এবং নিজচরিত্রের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশে তিনি দেবেন্দ্রনাথের নিম্নে নহেন।

ইতিহাস আলোচনা—বিশেষতঃ একটা জাতির শত বৎসরের ইতিহাস আলোচনায় যে বিজ্ঞান সম্মত নবাবিষ্কৃত পদ্ধতি দেখা দিয়াছে, এই গ্রন্থে তাহার কোন পরিচয় নাই। জাতীয় ভাবধারা এক মহাপুরুষ হইতে অন্য মহাপুরুষে সংক্রমিত হইবাব পথে—সন্ধিক্ষণে, যে ব্যবচ্ছেদ, তাহা লেখকের তুলিকায় নিপুণ ও নিখুঁত ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। গ্রন্থের কোন কোন স্থানে এরূপ চেষ্টা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা।

একটা জাতি একটা জীবন্ত প্রাণী বিশেষ। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী জাতিও একটা জীবন্ত জাগ্রত জাতি। ঘুমন্ত নহে। এই জীবন্ত বাঙ্গালী জাতি শতবর্ষে শত ধাবায় আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে। এই বিভিন্ন বিশেষ ধারার মধ্যে এক অচ্ছেদ্য অবিভাজ্য জীবনধারা প্রবহমান। জাতির এই প্রবহমান ধাবাই জাতির প্রাণ। এই জাতীয় প্রাণকে অবলম্বন করিয়াই অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ, বাহ্যদৃষ্টিতে বহুধা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত উপধারা সকল, চলন্ত ও জীবন্ত। কখনো ধর্ম্মে, কখনো সাহিত্যে, কখনো বা রাষ্ট্রে, কখনো বা সমাজ সংস্কারে এই সমস্ত ধারা গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে। এই গ্রন্থে এই সমস্ত বিভিন্ন ধারার উৎপত্তি ও লয়ের ঐতিহাসিক কারণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেখাইবার চেষ্টা করা হয় নাই। যেমন কেন ডিরোজিওর ধাবা প্রবাহ মুখে কিছুদূর আসিয়াই শুখাইয়া গেল এবং কেনই বা রামমোহণী ধারা আরও কিছু বেশীদূর অগ্রসর হইল—কেন মধ্যপথে আচম্‌কা বিদ্যাসাগরী খণ্ডধারার উদ্ভব ও লয়—বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত ব্রজের নির্ঘোষে বাঙ্গালীর চক্ষুকে প্রতিহত করিল, তাহার যথাযথ কারণ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। শ্রীরামপুরের খৃষ্টানীধারার ক্রমঃ-পরিনতি কোথায় তাহাও দেখান হয় নাই, রাজা

রামমোহনের ব্রহ্মসভার বিরুদ্ধে, স্যার রাধাকান্তের ধর্ম্মসভার ধারা কোথায় কিরূপে আসিয়া নিঃশেষ হইল—বা হইল কিনা—শতবর্ষের বাঙ্গলার লেখক তাহা আভাসেও ইঙ্গিত করেন নাই। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির প্রসঙ্গ তিনি উত্থাপন করিয়াছেন বটে কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতিবাদকারী হরিসভা বা তাহার পূর্ব্বযুগের রাধাকান্তের ধর্ম্মসভার সহিত স্থান কাল ও পাত্রভেদে ইতিহাস পথে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কোন যোগাযোগ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই গ্রন্থে হয় নাই অনেক বস্তু—যাহা হইতে পারিত, এবং হওয়া উচিত ছিল। কেননা ইহা যে শতবর্ষের বাংলা! ইহা রিবংসার দ্যোতক উপন্যাস নহে। যাহা হইয়াছে, তাহা আরও ভাল হইবে, ইহা আমরা আশা করি। এবং খুবমন্দ হইয়াছে, ইহাও আমরা বলি না। তবে এই গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি জিনিষ আমাদের দৃষ্টিকে সমধিক আকর্ষণ করে—ইহা কোন শত-বর্ষের বাংলা? ইহা কি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা? যদি তাই হয়, তবে ঐ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরের আলোচনা বড় অল্প হইয়াছে। রাজা রামমোহন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন। শতাব্দীর এই প্রথম ১৪ বৎসরের আলোচনা, আর যাহাই হউক, ইতিহাস নহে। অতি সাধারণ রকমের হেঁয়ালী মাত্র। তারপর উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইয়া গেল, তথাপি শতবর্ষের বাঙ্গলা ফুরাইল না। বিংশশতাব্দীর প্রথম কতিপয় বৎসরের আলোচনা,—ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গলার রাজনৈতিক স্বদেশীযুগকে বিস্তার করিল। এই যুগের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার সহিত স্বামী বিবেকানন্দ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় তাঁর সহানুভূতি ছিল, তাঁহার ইঙ্গিতও ছিল, কিন্তু স্বদেশীযুগ স্বামী বিবেকানন্দের মনোভিপ্রায়কে হুবহু প্রকট করিয়াছে, ইহা কল্পনামাত্র।

তথাপি এই গ্রন্থের সমধিক প্রচার আমরা বাঞ্ছা করি।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

সংঘ-বার্ত্তা

১। আগামী ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেবরুয়ারী মঙ্গলবার শুক্লা দ্বিতীয়া, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম তিথি পূজা এবং ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ রবিবার বেলুড় মঠে জন্মোৎসব।

২। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ বাঙ্গালোব হইতে মান্দ্রাজ মঠ পরিদর্শন করিয়া, ৭ই জানুয়ারী বোম্বাই রওনা হইয়াছেন। স্বামী সারদানন্দজী ভুবনেশ্বর মঠ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। স্বামী নির্ম্মলানন্দজী ৭ই জানুয়াবী ঢাকায় গমন করিয়াছেন। স্বামী সুবোধানন্দজী স্বামিজীর উৎসব উপলক্ষ্যে ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বেলিয়াটি রামকৃষ্ণ আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ শিলংএ অবস্থান করিতেছেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এলাহাবাদ হইতে কয়েক দিবসের জন্য বেলুড়ে আসিয়াছিলেন এবং পুনরায় এলাহাবাদে ফিরিয়া গিয়াছেন।

৩। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ সাল বেলুড়মঠ প্রাঙ্গণে সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাবেব বিস্তারের জন্য একটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে। স্বামী ওঁকারানন্দ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১। ভজন ২। কীর্ত্তন ৩। প্রবন্ধ পাঠ ৪। বক্তৃতা ৫। অবৃত্তি প্রভৃতি সভাব কার্য্যরূপে নিদ্ধারিত হইয়াছে। প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতায় কোন সম্প্রদায়কে আক্রমণ না করিয়া ববং সমন্বয় ভাব রক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়।

যাঁহারা উল্লিখিত বিষয়ে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ২৫শে জানুয়ারীর মধ্যে স্বীয় নাম ঠিকানা ও কোন্ কোন্ বিষয়ে যোগদান করিবেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিয়া জানাইবেন। সভায় ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছাত্র ও সাধাবণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাস

হে আচার্য্য !

ত্যাগের উজ্জ্বল পথে যেতে আমি বড় ভালবাসি।
জন্মজন্মান্তর হতে, ত্যগব্রতে সদা অভিলাষি ॥
মার চোখে আঁখি ধারা, নিরন্তর পড়িবে ঝরিয়া,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক রহিব হে কেমনে সহিয়া ॥
দূর হতে হেরি মোরে, কৃপা ক'রে, নিকটে ডাকিলে.
সন্ন্যাসীর সুলক্ষণ মোর অঙ্গে দেখিতে পাইলে,
কহিলে আমারে তুমি, মাতৃস্নেহ ভরা কণ্ঠস্বরে,
সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুপ্ততত্ত্ব দিয়ে দিতে তোরে,
হয়েছে আমার সাধ ; এস বৎস, সব পরমাদ,
নিমিষে দূরিত হবে, ব্রহ্মবস্তু, পাইলে আস্বাদ ॥
নিখিলের জননীর, আমি অতি আদরের ছেলে,
আঁখিটি পালটি কভু, হেরি নাই, তারে পাশে ফেলে,
তাই আমি কহিলাম, আছেন জননী স্নেহময়ী,
তাঁহার আদেশ আমি নিরন্তর নতশীরে বহি ॥
ঈষৎ হাসিয়া, মোরে আজ্ঞা দিলে, জিজ্ঞাস মায়েরে,
আমি ধীরে পশিলাম জননীর মন্দির দুয়ারে,
অজ্ঞ ভাবি তুমি মোরে, হাসিতে লাগিলে মনে মনে,
অরূপের উপাসক, বাদ তব, সদা রূপ সনে,
ভাবিলে এ সংস্কার তোমার প্রভাবে দূরে যাবে,
গুণাতীত, রূপহীনে বরণ করিব পূর্ণভাবে।

'এই সন্ন্যাসীরে বাছা, আমিই এনেছি তোর তরে,'
কহিলেন জগন্মাতা, হাস্যময়, স্নেহভরা স্বরে ।
রূপ আর অরূপের, দিব্যলীলা, জগতে প্রকাশ,
অদৃশ্য ইচ্ছায় হবে, গোপনের এই অভিলাষ ॥
আসিলাম, কাছে ফিরে, পূর্ণানন্দে ঝলমল মনে,
হতেছিল মাতৃকৃপা, বিচ্ছুরিত নয়নে নয়নে ॥
পুনরায় কহিলাম, "মাতৃ আজ্ঞা পাইলাম, হায়
প্রতিমূর্ত্তি, গৃহে তার কাঁদাইতে নারিব তাহায় ॥
গোপনে সন্ন্যাস মোরে, দাও যদি আচার্য্য প্রধান ।
সানন্দ অন্তরে নিব, অকুণ্ঠিত রবে মোর প্রাণ ॥
উত্তম ! দীক্ষিত তোরে মহামন্ত্রে করিব গোপনে,
মনে হয় জীবনের সাধনা যে, তোমার কারণে ।
চল্লিশ বৎসর ব্যাপি, তিলে তিলে তিলে, লভেছি যে ধন ।
এস বৎস নিঃশেষে তা, সব তোরে, করি সমর্পণ ॥
শুভদিনে পুণ্যক্ষণে মাতৃ পিতৃ আত্ম শ্রাদ্ধ করি,
আশায় ও অধিকারে, চির তরে, দূরে পরিহরি,
হে গুরু, হে মহিয়ান, ভগবান জীবনে আমার
মানিলাম তুমি বেদ, তুমি ব্রহ্ম, তুমি সর্ব্ব সার ॥
তব আজ্ঞা অনুসারে সন্ন্যাসের সব দ্রব্য গুলি ।
পঞ্চবটী তলদেশে, কুটিরেতে, রেখেছিনু তুলি ॥
মহানিশা ধীরে ধীরে যবে হয়ে এল অবসান ।
শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের, রক্তরাগে রঙিল পরান ॥
তুমি আমি বসিলাম, কুটিরেতে, গম্ভীর-বিরলে ।
সম্মুখে হোমাগ্নি শিখা, ধ্বকধ্বক মহোল্লাসে জ্বলে ॥
অদূরে বহিছে গঙ্গা ভারতের সাধনা-সুন্দরী ।
কলস্বরে দুই কূলে, নেচে ঢলে পড়িছে লহরি ॥
উষার অস্ফুটালোকে, ছায়াগুলি হেলিয়া দুলিয়া ।
কখন ডুবিছে নীরে, ক্ষণপরে, উঠিছে ভাসিয়া ॥

পাখীরা ঘুমায় নীড়ে, সুধু জানি কোকিল ডাকিছে।
"বঁধু আয়, বঁধু আয়, তোর লাগি পরাণ কাঁদিছে॥"
প্রিয় লাগি, সর্ব্বত্যাগ, ভারতের মহান সাধন।
প্রেমে তার কাছে আসা, প্রেমে তারে একত্বে বাঁধন,
দিয়েছে ভারত যোগী; কোন দূর আদি কাল হতে,
সব ছেড়ে, জটাশিরে, অজানারে, ডাকে পথে পথে॥
সেই মন্ত্র, যার বলে, পায় নর ব্রহ্ম দরশন।
সুদূর নিকট হয়, অদৃশ্যের পায় পরশন॥
সেই মন্ত্রগুলি পুনঃ, পঞ্চবটি বন উপবন,
মুখরিত করি তাহে, সঞ্চারিল নবীন জীবন॥
গঙ্গার উর্ম্মির পরে, ভেসে গেল দূর দূরান্তরে।
ভারত সাধন আজি, রূপ পেলে বহুকাল পরে॥
বাতাস সে মহাবার্ত্তা বুকে লয়ে, ছুটিয়ে চলিল।
সুদিনের আসিবার, শুভবার্ত্তা, দিগন্তে বহিল॥
গুরু করে মন্ত্রপাঠ, শিষ্য চিত্ত করে অনুভব।
জাগ্রত হইল ধর্ম্ম, নবভাবে আজি অভিনব॥
"পবব্রহ্ম, পরামন্ত্র, ব্রহ্মবস্তু, পাউক আমায়।
অখণ্ডেক-রস-মধু, মোর মাঝে যেন রূপ পায়॥
ব্রহ্মবিদ্যা-সহ-নিত্য বর্ত্তমান পরম আত্মন।
তব কৃপাযোগ্য শিশু, কর মোরে সতত রক্ষণ॥
সংসার দুঃস্বপ্নহারী, চিরন্তন, পরম মহেশ।
দ্বৈত ভাব দূর কর, সর্ব্বদুঃখ, করি দাও শেষ॥
যাবতীয় প্রাণবৃত্তি নিঃশেষেতে, প্রদানি আহুতি।
ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করি, তবচিত্তে, সমর্পিনু মতি॥
হে সর্ব্ব প্রেরক দেব! জ্ঞানবাধা, যত মলিনতা।
করি দাও দূরীভূত, শুদ্ধ মোরে, করহ দেবতা॥
অসম্ভব বিপরীত, ভাবনাদি, করহ রহিত।
অন্ধকার কর নাশ, তত্ত্বজ্ঞান, হোক উপস্থিত॥

সূর্য্য বায়ু নদীগুলি, শ্যাম স্নিগ্ধ সলিল শালিনী।
ব্রীহি যব আদি শস্য, বনস্পতি, সুহাস মেদিনী॥
সব তব নির্দেশেতে, অনুকূল হউক আমার।
তত্ত্বজ্ঞান লাভে নাথ! লভি যেন, সহায়তা তার॥
শক্তিমান হে ব্রহ্মন্! নানারূপে, তুমিই জগতে।
প্রকাশিত রহিয়াছ, বুঝাইয়া দাও বিধিমতে॥
এ শরীর শুদ্ধকর, তত্ত্বজ্ঞান, ধারণ যোগ্যতা—
দাও দেব এর মাঝে; তুমি অগ্নি আহুতি ও হোতা॥
পৃথ্বী, অপ্, তেজ, বায়ু, ভূতপঞ্চ, মোরে শুদ্ধ কর।
রজোজাত মলিনতা, মুক্তকরি, জ্যোতিঃ রূপে ধর॥ স্বাহা॥
"প্রাণ আদি বায়ু যারা, মোর মাঝে আছে অবস্থিত।
নিঃকলুষ হয়ে তারা, চিরতরে হোক অবহিত॥
রজোগুণ জাত নাথ, চিত্তব্যাপি, সর্ব্ব মলিনতা।
দূর করি, মোরে চির, জ্যোতীর্ম্ময়, করহ বিধাতা॥ স্বাহা॥
"পঞ্চকোষ, যাহা মোরে, চিরতরে বদ্ধ করিয়াছে।
শুদ্ধ কর, তারে নাথ, পুনঃ মোরে, পিছে টানে পাছে॥
রাজোগুণ বিমলিন করিয়াছে আমার স্বরূপ।
বিমুক্ত করহ মোরে, আবির্ভূত, হও জ্যোতিঃরূপ॥ স্বাহা॥
"রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ আদি, হায় যতেক সংস্কার।
ঘিরেছে আমার চিত্ত, শুদ্ধকর তাহারে সবার।
এই রজোগুণ মোরে, ম্লান ক'রে সুদূরে টানে যে।
কৃপা করি শুদ্ধ কর, রাখি তারে, জ্যোতিঃরূপ মাঝে॥ স্বাহা॥
"মন, বাক্য, কায়, কর্ম্ম শুদ্ধ হোক্, হউক নির্ম্মল।
তোমার চরণযোগ্য, কর মোরে, সুন্দর সবল॥
রজোভাব ঘেরি মোরে, করিয়াছে বিকৃত মলিন।
হে জ্যোতিঃ বিনাশ তারে চিত্তে মোর হইয়া আসিন॥ স্বাহা॥
"হে অগ্নি-শরীর-শায়ী-জ্ঞান-বাধা-হরণ-কুশল।
লোহিতাক্ষ হে পুরুষ, জাগরিত হও অচঞ্চল॥

ইষ্ট-দাতা-গুরু-মুখ-শ্রুত-জ্ঞান, থাক্ বর্ত্তমান ।
সর্ব্বক্ষণ চিত্তে মোর ; এই কর পুরুষ প্রধান ॥
যাহা কিছু মোর মাঝে বর্ত্তমান, সব শুদ্ধ হোক্ ।
রজোভাব দূরে যাক জ্যোতিঃরূপ মোরে ঘিরে রোক্” ॥ স্বাহা ॥
“চৈতন্যস্বরূপ আমি, পূর্ণব্রহ্ম, আমি দিব্য জ্ঞান ।
অতল অস্পর্শ আমি, সর্ব্বব্যাপী, আমি বিশ্বপ্রাণ ॥
দারা, পুত্র, লোক মান্য, বিলাসিতা, সম্পদ, শরীর ।
বাসনারে, সমর্পণ করিলাম, জিহ্বায় অগ্নির ॥” স্বাহা ॥
সর্ব্ব আশা, শিখা, সূত্র, দেশকাল হুতমুখে দিয়া ।
গুরু দত্ত, সুপবিত্র, কৌপিনেতে ভূষিত হইয়া ॥
কাষায় ধারণ করি, নব নাম, নব রূপ পেয়ে ।
গুরুর চরণ তলে, বসিলাম, স্বপ্নাবিষ্ট হ’য়ে ॥
নেতি, নেতি, মার্গ দিয়া গুরু মোরে নিয়ে গেল যথা,
বাক্য শেষ, অস্তিহীন, দিকহীন, ব্যাপ্ত নিরবতা ॥
সুধু গুরুবাক্য রহে, জ্যোতির্ম্ময়, অক্ষরে অক্ষরে ।
শান্তির পবিত্রবাণী, সর্ব্বকাল তথায় বিহরে ॥
নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, দেশ কালে, নাহি পরিচ্ছেদ ।
ব্রহ্ম সত্য, চিরন্তন, জীবব্রহ্মে, নিয়ত অভেদ ॥
অঘটন পটিয়সী মায়া সদা নাম রূপময় ।
ব্রহ্মের নাহিক দেশ, নাহি রূপ, নাহি কাল লয় ॥
সমাধি সময় এই, মায়া নাহি রহে বর্ত্তমান ।
অতএব ত্যজ মায়া, নিত্য বস্তু কর সদা ধ্যান ॥
নাম রূপ মাঝে যাহা, নিত্য তাহা কথনত নয় ।
নাম রূপ কর ত্যাগ, ব্রহ্মানন্দ তার পারে রয় ॥
মায়ার শৃঙ্খলাবদ্ধ, ব্রহ্ম সিংহে, দাও জাগাইয়া ।
আসিবে বাহির হয়ে, নাম রূপ পিঞ্জরে ভেদিয়া ॥
আপনাতে অবস্থিত, আত্মতত্ত্বে কর অন্বেষণ ।
সমাধী সহায় কর, নামরূপ ঘুচিবে তখন ॥

ক্ষুদ্র আমি বিরাটেতে, লীন হয়ে হবে স্তব্ধীভূত ।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দে, চঞ্চলতা, হইবে দূরিত ॥
যেই ক্ষুদ্র জ্ঞান লয়ে, অপরেরে, দেখে শুনে লোক ।
'অল্প' যাহা 'মর্ত্ত্য তাহা' তুচ্ছ তাহা তাহা দূর হোক ॥
যাহা স্বল্প কেন তুচ্ছ ?—পরানন্দ তার মাঝে নাই !
'ভূমা' যাহা, 'সুখ' তাহা, তাহা ছাড়া, কিছু নাহি চাই ॥
সর্ব্বব্যাপি-সর্ব্বরূপ-মায়াহীন-বিজ্ঞাতা মহানে ।
মনবুদ্ধি জানিতে কি পারে ? তারে বুঝিবে কেমনে ?
তোমার কৃপায় গুরু, মন বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে যায় ।
আশার বিনাশ হয়, ব্রহ্মজ্ঞানে, সার্থকতা পায় ॥
গুরু সত্য, গুরু নিত্য, গুরু ব্রহ্ম, গুরু সারাৎসার ।
গুরু কৃপা পরানন্দ, গুরুভক্তি সাধনার সার ॥

—স্বামী অসিতানন্দ ।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঢাকার বউ বল্‌ছেন—"মার কাছে আর কি বলবো, মা ত জগদম্বা, অন্তরের কথা সব জানেন, আমার ছেলে এই কথা বলে" ।

আমি বল্লুম—"অনেকেই ত মাকে জগদম্বা বলেন । কিন্তু কার কত বিশ্বাস তা ঠাকুরই জানেন । অবিশ্বাসী আমাদের মুখে এই কথা যেন নিতান্ত মুখস্থ করা কথার ন্যায় শুনায় ।"

মা হেসে বল্‌লেন "তা ঠিক, মা" ।

আমি—মা যে সাক্ষাৎ ভগবতী, একথা মা যদি নিজে দয়া করে

বুঝিয়ে না দেন, তাহলে আমাদের সাধ্য কি বুঝি! তবে মায়ের ঈশ্বরত্ব এইখানেই যে মায়ের ভিতরে আদৌ "অহং"কার নেই। জীব মাত্রেই 'অহং'এ ভরা। এই যে হাজার হাজার লোক মায়ের পায়ের কাছে "তুমি লক্ষ্মী, তুমি জগদম্বা" বলে লুটিয়ে পড়ছে, মানুষ হলে মা অহংকারে ফেঁপে ফুলে উঠতেন। অত মান হজম করা কি মানুষের শক্তি!

মা প্রসন্ন মুখে একবার আমার দিকে চাহিলেন মাত্র। মনে মনে বল্‌লাম, "মা, দয়া কর মা, মুখে বল্‌তে আমার লজ্জা করে, মনে যেন বল্‌তে পারি"।

যাবার সময় হয়ে এসেছে। মা উঠে প্রসাদ হাতে দিয়ে বল্লেন "প্রসাদে ও হবিতে কোন প্রভেদ নাই (আমার বুকে হাত দিয়ে) মনে এটি স্থির বিশ্বাস রেখো"। আজ বিশেষ করে কেন এটি বল্লেন! আজ তিন মাস হলো, প্রায় রোজই আসি—যাই। যাবার সময় মা রোজই হাত ভরে প্রসাদ দেন। অনেককে দেওয়ার জন্য কোন কোন দিন প্রসাদের অভাব হতেও দেখেছি। মা তাই নিজের তক্তাপোষের নীচে একটি সরায় করে প্রসাদ রেখে দিতেন এবং বলে রাখতেন "ওরটি রেখে আর সবাইকে দিও গো"। তাতেও আমার লজ্জা করত। এই লজ্জা ভেঙ্গে দিবার জন্যই কি আজ বিশেষ করে ও কথাটি বললেন?

১১ই আশ্বিন ১৩২৫ দেবীর বোধন—প্রাতে গিয়াছি, মা ফল কাটছিলেন, দেখেই বল্লেন "এসেছ মা, এস। আজ বোধন (আমার এই কথা মনেই ছিল না)। ঠাকুরের এই ফুলগুলি বেছে সাজিয়ে রাখ, ফলের থালা এই পাশটিতে রেখে দাও"। আদেশ পালন করিলাম। ফল ইত্যাদি কাটা হয়ে গেলে মা পাশের ঘরে এলেন। স্নান করবেন। তেলের ভাঁড়, চিরুণী নিয়ে আমার কোলের কাছে এসে বসলেন। মাথায় হাত দিতে আমি ইতস্ততঃ কচ্ছি দেখে মা বল্‌লেন "দাওনা গো মাথাটা আঁচড়ে"—যেন বালিকাটি। আদেশ পয়ে আমি আঁচড়ে দিচ্ছি। রাধু নেয়ে এসে বলছে "চিঁড়ে দিয়ে দই দে খাবো"।

মা সেখানেই একটি বাটীতে চিঁড়ে দই মেখে নিজে একটু মুখে দিয়ে রাধুকে দিলেন। বউ এসে বল্লে "মাও দুধ খাননি"। মা—"আন এখানেই"। খাওয়া হলে গায়ে তেল মাখিয়ে দিতে বল্লেন। আমি মাথা আঁচড়ান রেখে তেল মাখিয়ে দিচ্ছি। মা বলছেন "দেখ, জয়-রামবাটীতে কটি ছেলে দীক্ষা নিতে গিয়েছিল। তা, তাদের দিলুম না। তখন তারা কাকুতি করে বল্লে "তবে, পায়ের একটু ধুলো দেন মাতুলী করে রাখব"—এমনি তাদের ভক্তি বিশ্বাস।

মাথা আঁচড়াতে মায়ের অনেকগুলি চুল উঠে ছিল। মা বল্লেন "এই নেও গো রাখ"। বস্তুতঃই আমি ধন্য হয়ে গেলুম—আমার মনে উহা নেবার ইচ্ছা ছিল।

মায়েব সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে গেলুম। স্নান করে এসে পূজা শেষ হলেই মা প্রসাদ বিতরণ করতে লাগলেন। উহাতে অনেক সময় কেটে গেল।

কবিরাজ শ্যামাদাস রাধুকে দেখিতে আসিলেন। মা রাধুকে ডেকে দিতে বল্লেন। আমি ডাকৃতে গেলাম। একটু পরে রাসবিহারী মহারাজ গিয়ে কবিরাজকে ডেকে নিয়ে এলেন। দেখার পর মা রাধুকে কবি-রাজ মহাশয়কে প্রণাম করতে বল্লেন। রাধু নত হয়ে প্রণাম করিল। তিনি চলে যেতে, কেহ কেহ বল্লেন "উনি কি ব্রাহ্মণ?" মা—"না, বৈদ্য" "তবে যে প্রণাম করতে বল্লেন?" মা—তা করবে না? কত বড় বিজ্ঞ; ওঁরা ব্রাহ্মণ তুল্য, ওঁকে প্রণাম করবে না ত কাকে করবে? কি-বল মা?"

ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেল। মায়ের খাওয়া হয়ে যেতে আমরা সকলে প্রসাদ পেতে বস্‌লুম। মা আমাকে বললেন "কড়াইএর ডালটি বেশ হয়েছে, খাও"। নলিনী বলছেন "তুমি রোজ এসে চলে যাও, খাওত না, আজ বেশী কবে মাছ খাও" বলে অনেকগুলি মাছ দেওয়ালেন। মাছের চেয়ে ডালটাই আমার বিশেষ প্রিয়। মা ঠিকই ধরে ছিলেন।

মা এইবার বিশ্রাম করবেন। গোলমাল হবে বলে আমরা পাশের ঘরে গেলুম। খানিক পরে এসেছি। মা বলছেন "দেখ্‌ছ, সব দরজা

বন্ধ করে রেখেছে, গরমে প্রাণ গেল। খুলে দেওতো"। খুলে দিলুম। একটু পরেই মা উঠে কাপড় কাচতে গেলেন। ঠাকুরের বৈকালীন ভোগ দেওয়া হল। মা এসে উত্তরের বারান্দায় আসন পেতে বসলেন। কিছু পরে বউ, মাকু এঁরা সব থিয়েটার দেখতে গেলেন। মায়ের কাছে চুপ করে বসে তাকিয়ে দেখি মায়ের মাথার সামনে অনেকগুলি পাকা চুল দেখা যাচ্ছে। মনে হলো প্রাতে তখন যদি তুলতাম। মাও বলছেন "এসতো মা, আমার পাকা চুল তুলে দাও"। ঢের তোলা হলো, অনেক সময় লাগল। এইবার ভক্তগণ সব প্রণাম করতে আসবেন। আমারও গাড়ী এসেছে, কালীঘাটের বাসায় যেতে হবে। এখন হতে মায়ের কাছে এমন করে রোজ রোজ যখন তখন আসবার সুবিধা হবে না ভেবে কষ্ট হতে লাগল। প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় মা বল্লেন "মহাষ্টমীর দিন আসতে পার যদি, এসো"।

১৩ই আশ্বিন ১৩২৫—আজ মহাষ্টমী! মা আসতে বলেছিলেন। সকালেই আমরা দু বোনে এসেছি। এসে দেখি কয়েকটি স্ত্রীভক্ত ফুল নিয়ে এলেন। মায়ের শ্রীচরণ পূজা করিয়া তাঁরা গঙ্গায় নাইতে গেলেন। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি থাকবে ত? আজ মহাষ্টমী"। বল্লুম "থাকব"। কিছুক্ষণ পরেই পূজনীয় শরৎ মহারাজ মায়ের চরণে প্রণাম করিতে আসিলেন। আমরা পাশের ঘরে গেলুম। মা তক্তা-পোষে বসে আছেন। পা দুটি মেজেয় রেখে। আরও অনেক ভক্ত প্রণাম করিলেন।

পরে মাকু প্রভৃতির সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গেলুম। মা আজ বাড়ীতেই স্নান করিলেন। কারণ, মা একদিন অন্তর একদিন গঙ্গাস্নান করিতেন। বাতের জন্য রোজ যেতেন না। এসে দেখি বিস্তর মেয়েরা মাকে পূজা করছেন। অনেকেই কাপড় এনেছেন। কালীঘাটে মা কালীর গায়ে যেমন কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হয় পূজান্তে তেমনি করে সকলে মায়ের গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিচ্ছেন। মাও এক এক খানি করে দেখে নামিয়ে রাখছেন। কাউকে বা বলছেন, "বেশ কাপড়খানি"! একজন ব্রহ্মচারী সংবাদ দিলেন এখন সব পুরুষ ভক্তেরা মাকে প্রণাম করতে আসবেন।

সে কি সুন্দর দৃশ্য ! হাতে ফুল, প্রস্ফুটিত পদ্ম, বিল্বদল—একে একে সকলে পূজা প্রণাম করে সরে দাঁড়াচ্ছেন। এইরূপে অনেকক্ষণ গেল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল সপরিবারে (প্রথম পক্ষের স্ত্রী) এসেছেন। গোলাপমা বলছেন "যার জিনিষ সেই পেলে"। মাও বলছেন "হ্যা, যার, তারই হলো। মাঝখানে দুদিন কি গোলমাল হয়ে আর একজনের (পরলোকগতা দ্বিতীয়া স্ত্রীর) একটু ভোগ হয়ে গেল। এ জন্ম জন্মান্তরের যোগ"। বলরামবাবুর বাড়ীর সকলে এসে পূজা করে গেলেন। শেষে আমি গেলাম। পূজা করে কাপড়খানি গায়ে দিতে যেতেই মা বল্লেন "ওখানা পরবো। আজ ত একখানি নূতন কাপড় পরতে হবেই"—বলে কাপড়খানা পরলেন। আমার চোখে জল এল। সামান্য কাপড়খানা ; সকলে কত ভাল ভাল কাপড় দিয়েছেন। আমি মায়ের গরীব মেয়ে। মার অত স্নেহে আমার লজ্জাও কর্ত্তে লাগল। মা বলছেন "বেশ পাড়টি গো"।

একটি গেরুয়া বসনধারিণী মেয়ে মাকে পূজা করে দুটি টাকা পদতলে রাখতে মা বল্লেন "ও কি। তুমি আবার কেন গো। গেরুয়া নিয়েছ, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা"। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন "কোথায় দীক্ষিত হয়েছ ?" মেয়েটি বল্লে "দীক্ষা হয় নি"। মা বল্লেন "দীক্ষা না নিয়ে, কোন বস্তুলাভ না করে এই বেশ ধরেছ, এত ভাল কর নি। বেশটি যে বড়—আমারই যে জোড়হাত হয়ে প্রণাম আসছিল। ও করতে নেই। আগে বস্তুলাভ হউক। সকলে যে পায়ে মাথা দিতে আসবে, তা নেবার শক্তিলাভ হওয়া চাই"। মেয়েটি বল্লে "আপনার কাছেই দীক্ষা নেবার ইচ্ছা করেছি"। মা—"সে কি করে হবে ?" তথাপি সে মেয়েটি মিনতি কর্ত্তে লাগলো। গোলাপমাও একটু সহায় হলেন। মা অনেকটা সদয় হয়ে এসেছেন দেখলাম। বল্লেন "দেখা যাবে পরে"।

গৌরীমা তাঁর আশ্রমের মেয়েদের নিয়ে এসেছেন। সকলেই পূজা করে প্রসাদ নিয়ে বিদায় হলেন।

ঠাকুরপূজা শেষ করে বিলাস মহারাজ এসে চুপে চুপে মাকে

বলছেন "আজ ঠাকুর ভোগ নিলেন কি না, কি জানি মা। একটা প্রসাদী শালপাতা উড়ে এসে নৈবেদ্যের উপর পড়ল। এরূপ কেন হলো? অনেকেই বাড়ী হতে সব এনেছে, কি হলো কি জানি।" মা বল্লেন "গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়েছ ত?" "তা ত দিয়েছি" বলে তিনি চলে গেলেন। শুনে মনটা বড় খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। মহাষ্টমী—মায়েব শ্রীচবণ পূজা সমভাবেই চল্‌তে লাগ্‌ল। স্তূপাকারে ফুল বেল-পাতা বারান্দায় রেখে আস্‌তে না আস্‌তেই আবার তত ফুল পাতা শ্রীচবণতলে জমে উঠ্‌তে লাগল।

ক্রমে মধ্যাহ্ন ভোগেব সময় হল। এমন সময়ে দূর দেশ হতে তিনটি পুরুষ ও তিন জন স্ত্রীলোক মায়েব দর্শনার্থে এলেন। বড়ই দরিদ্র, এক বস্ত্রে, ভিক্ষা কবে টাকা সংগ্রহ কবে পথ খরচ চালিয়ে এসেছেন। উহার একজন পুরুষ ভক্ত মায়ের সঙ্গে গোপনে অনেক কথা বলতে লাগলেন। কথা আব ফুরায় না। শ্রীশ্রীঠাকুবেব মধ্যাহ্ন ভোগের বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে (কারণ মা ভোগ দিবেন) মায়েব ভক্ত ছেলেরা বিরক্ত হয়ে উঠ্‌তে লাগলেন। একজন স্পষ্টই বললেন, "আর যা বলবার থাকে নীচে মহারাজদের কাবো কাছে গিয়ে বলুন না"। মা কিন্তু একটু দৃঢ় ভাবেই বল্লেন "তা এখন বেলা হলে কি হবে, ওদের কথাটি ত শুন্‌তে হবে"—বলে বেশ ধৈর্য্যের সহিত তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। পবে ধীবে ধীরে কি আদেশ করলেন। তাব স্ত্রীকেও ডেকে নিলেন। অনুমানে যতটা বোঝা গেল স্বপ্নে কোন কিছু পেয়েছেন। পরে জানা গেল স্বপ্নে মন্ত্র পেয়ে ছিলেন। প্রায় একঘণ্টা পরে তাঁহারা প্রসাদ নিয়ে বিদায় হলেন। মা এসে বল্লেন "আহা, বড় গরীব। কত কষ্ট করে এসেছে"!

পরে ভোগ হলে সকলে প্রসাদ পেলাম। এবার মা একটু বিশ্রাম কর্‌বেন। আমরা পাশের ঘরে গেলাম।

চারটা বেজেছে। মা উঠলেন। ঠাকুরের বৈকালী ভোগ হয়ে গেল। রাসবিহারী মহারাজ এসে বল্লেন "একটি মেম আপনাকে দর্শন কর্ত্তে এসেছেন। নীচে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন।" মা আসতে

বল্লেন। মেমটি এসে মাকে প্রণাম করতেই মা "এস" বলে তার হাত ধরলেন (হ্যাণ্ডশেক করবার মত)। মা যে বলেন "যেখানে যেমন, সেখানে তেমন; যখন যেমন, তখন তেমন" সেটি প্রত্যক্ষ করা গেল। তারপর মেমটির মুখে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। মেমটি বাঙ্গলা জানেন। বল্লেন "আমিত আসিয়া আপনার কোন অসুবিধে করি নাই? আমি অনেকক্ষণ হইল আসিয়াছি। আমি বড় কাতর আছি। আমার একটি মেয়ে, বড় ভাল মেয়ে, তার কঠিন পীড়া হইয়াছে। তাই মা আপনার করুণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আপনি দয়া করিবেন মেয়েটি যেন ভাল হয়। সে এত ভাল মেয়ে মা!—ভাল বলিতেছি কেন—আমাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ভাল বড় একটা নেই। অনেকেই বড় বদমাইস, দুষ্ট—এ আমি সত্য বলিতেছি। এ মেয়েটি সেরূপ নহে। আপনি কৃপা করিবেন।" মা বল্লেন "আমি প্রার্থনা করবো তোমার মেয়ের জন্যে—ভাল হবে"। মেমটি এ কথায় খুব আশ্বস্ত হলেন। বল্লেন "তবে আর ভাবনা নাই। আপনি যখন বলিতেছেন 'ভাল হইবে" তখন ভাল হইবেই—নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়"। কথায় খুব জোর ও বিশ্বাস প্রকাশ পেল। মা সদয় হয়ে গোলাপ মাকে বল্লেন "ঠাকুরের ফুল একটি একে দাও, একটি পদ্ম আন"। বিল্বপত্রের সহিত একটি পদ্ম এনে গোলাপমা মায়ের হাতে দিলে মা ফুলটি হাতে করে চক্ষু বুজে একটু রইলেন, পরে ঠাকুরের পানে এক দৃষ্টে চেয়ে ফুলটি মেমটির হাতে দিয়ে বল্লেন "তোমার মেয়ের মাথায় বুলিয়ে দেবে"। মেম হাত জোড় করে ফুল নিয়ে প্রণাম করে বল্লেন "তারপর কি করিব"? গোলাপ মা বল্লেন "কি আর করবে! শুকিয়ে গেলে গঙ্গায় ফেলে দেবে"। মেমটি বল্লেন "না, না; এ ভগবানের জিনিব ফেলিয়া দিব! একটি নূতন কাপড়ের থলে করে রাখিয়া দিব, সেই থলেটি মেয়ের মাথায় গায়ে রোজ বুলিয়ে দিব"। মা বল্লেন "হাঁ, তাই করো"।

মেম—"ঈশ্বর সত্য বস্তু; তিনি আছেন। আপনাকে একটি কথা বলিতে চাই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার একটি শিশুর খুব জ্বর হয়। আমি খুব ব্যাকুল হয়ে একদিন বসিয়া বলি "হে ঈশ্বর, তুমি যে আছ

ইহাই আমি অনুভব করি। কিন্তু আমাকে প্রত্যক্ষ কিছু দাও, বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একটি রুমাল পাতিয়া রাখি। অনেকক্ষণ পরে দেখি সেই রুমালের ভাঁজের মধ্যে তিনটি কাঠি। আমি অবাক্ হয়ে সেই কাঠি তিনটি নিয়ে উঠে এসে শিশুটির গায়ে ক্রমান্বয়ে তিনবার দিলাম, সেইক্ষণে তার জ্বর ছেড়ে গেল"—বল্‌তেই টস্ টস্ করে মেয়টির চোখের জল পড়তে লাগল। তারপর বল্লেন "আপনার অনেক সময় নষ্ট করিলাম, আমায় মাপ করিবেন"। মা বল্লেন "না, না, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে আমি ভারী খুসী, তুমি একদিন মঙ্গলবারে এস"। মেয়টি প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

যোগেনমার পিঠে ফোড়া হয়েছে। অস্ত্র হয়েছে। মা বলছেন "আহা আজকের দিনে যোগেন পড়ে রইল! কত কি করবে মনে সাধ ছিল। একবার এ ঘরে আসতেও পারলে না।" আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি যোগেনের কাছে যাচ্ছ কি? বলো আমি একটু পরেই আস্‌ছি"। যোগেনমাকে দেখে মায়ের কাছে ফিরে এসে দেখি শ্রীমান্ প্রিয়নাথ প্রণাম করছে। মাতাদেবী মুখে হাত দিয়ে চুম খেলেন। প্রিয়নাথের চোখে ছাতির শিকে ভয়ানক খোঁচা লেগেছে, ব্যাণ্ডেজ করা রয়েছে। তাই দেখে মা ভারী ব্যস্ত হয়েছেন বারে বারে বল্‌ছেন "আহা, ভাগ্যে চোখটি নষ্ট হয়নি গো।" এইবার আমার বওনা হবার সময় হয়ে এসেছে। একটু পরে প্রণাম করে বিদায় চাইতে মা বল্লেন "আবার এসো"।

২০শে আশ্বিন ৺লক্ষ্মীপূজা ১৩২৫—সকালেই আমরা দুবোনে মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিতে গিয়াছি। সুমতির ছেলে মেয়েরাও সঙ্গে গিয়াছে। মা ঠাকুরঘরে বসে ফল কাটছেন। "এই যে সব, এসগো, বস। কবে এলে"। বললুম 'মহাষ্টমীর দিন রাতেই চলে গিয়েছিলাম আবার কাল রাতে এসেছি। মা—"এখন কি থাকা হবে?" "না, মা"। সুমতিকে—"বউমা ভাল আছ? ভাসুর ঝিটি কেমন আছে।"

দুটি মহিলা দীক্ষা নিতে এসেছেন। তাঁহারা এসে প্রস্তাব করিতেই মা বল্লেন "হ্যাঁ, আরও দুটি ছেলে আছে"। বলিতে বলিতে আর একটি

মহিলা এসে বল্লেন তিনিও দীক্ষা নিতে এসেছেন। মা বল্লেন "তবেত অনেকগুলি হল গো"।

সুমতি শ্রীশ্রীমাকে চণ্ডীজ্ঞানে পূজা করা ও লালপেড়ে সাড়ী দেওয়া স্বপ্নে দেখেছে। তাই দিবে বলে নিয়ে এসে লজ্জায় মাকে বলতে পাচ্ছে না। বলছে "দিদি তুমি বল"। আমি ঐকথা মাকে বলতেই মা হেসে বল্লেন "জগদম্বাই স্বপন দিয়েছেন, কি বল মা? তা দেও, সাড়ীখানি ত পরতে হবে"। চওড়া লালপেড়ে সাড়ীখানি পরলেন। কি চমৎকারই দেখাতে লাগ্‌ল। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম—চক্ষে জল এল। সুমতি বলছে "একটু সিঁদুর দিলে বেশ হত"। মা সহাস্যে বল্লেন "তা দেয় ত"। কিন্তু সিঁদুব নিয়ে যায়নি বলে দেওয়া হল না। আমরা বাসায় ফিরবো বলে প্রণাম করছি—মা বল্লেন "তুমিও যাবে এখুনি?" আমি—"হ্যাঁমা, যেতে হবে, বাসায় একটু বেশী রান্নার কাজ আছে।" মা—"আবার আসবে।" মা—"হ্যাঁ, বৈকালে আসবো।" মা অনেকগুলি রসগোল্লা নিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে ছেলেদের হাতে দিলেন। আমরা বিদায় নিলুম। বৈকালে, লক্ষ্মীপূজা বলে, নারিকেলের খাবার সব নিয়ে গেছি। দেখে মা বলছেন "কি গো, আজ লক্ষ্মীপূজা, তাই বুঝি এ সব"। ক্রমে ক্রমে অনেক স্ত্রীভক্ত নানারূপ মিষ্ট দ্রব্য নিয়ে মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিলেন। কোন বাড়ী হতে মিষ্টির সহিত ডাব চিঁড়ে এই সবও দিয়েছে। দেখে মা বলছেন "কোন্ দিনে কি দিতে হয়, তা ওরা সব বেশ জানে"। সন্ধ্যারতির পর ঠিক্ সময়ের মধ্যে ভোগ দেওয়া হল। শ্রীশ্রীমা নীচে ভক্তদের জন্য চিঁড়ে নারিকেল ইত্যাদি প্রসাদ সব পাঠালেন। উপরে মেয়েরাও সকলে পেলেন।

একটি স্ত্রীলোক লক্ষ্মীপূজার তাবৎ উপকরণ নিয়ে এসে মায়ের শ্রীচরণ পূজা করিলেন। পরে চারটি পয়সা পদতলে রাখিয়া প্রণাম করিলেন। আমাদের মা বল্লেন "আহা ওর বড় দুঃখ * মা, বড় গরীব"। মা তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

---

* একমাত্র পুত্র বি-এ পাস করে পাগল হয়েছে এবং তদবধি নিরুদ্দেশ। স্বামীও পুত্রশোকে প্রায় উন্মাদের মত হয়েছেন।

মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মঙ্গলবারে সেই মেমটী এসেছিল মা ?" মা—"হ্যাঁ, মা এসেছিল"। মেমটির উপর মায়ের বিশেষ কৃপা। তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন। ভাল বাসেন। তাঁর মেয়েটিও সেরে উঠেছে"।

রাত হলো দেখে প্রণাম করে বিদায় লইলাম।

১১ই চৈত্র, ১৩২৬—শ্রীশ্রীমা দেশে গিয়াছিলেন, প্রায় এক বৎসর পরে ফাল্গুন মাসে বাগবাজারের বাটীতে শুভাগমন করেছেন। শরীর নিতান্ত অসুস্থ। অনেক দিন যাবৎ মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছে—ম্যালেরিয়া। শ্রীচরণ দর্শন করতে গিয়ে দেখি মা কাপড় কাচতে গেছেন। কলঘর হতে বেরিয়ে বললেন "বস, আমি আস্‌ছি।" মিনিট পাঁচ পরেই কাপড় ছেড়ে সর্ব্ব দক্ষিণের ঘরে মায়ের বিছানা করা ছিল, সেখানে এসে দাঁড়ালেন। শ্রীচরণে প্রণাম করিতেই মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, বললেন "বস, কেমন আছ ?" সেবার জন্য কিছু দিলাম—টাকা হাতে করে নিয়ে রাখলেন। মায়ের শরীর দেখে আমার আর কথা বেরুচ্ছে না—শুধু মুখের পানে চেয়ে আছি, আর ভাব্‌ছি, সেই শরীর এমন হয়ে গেছে। সঙ্গে সুমতিদের ঝি গিয়েছিল, সে প্রণাম করিবার উদ্যোগ করতেই তাকে বল্লেন "তুমি ওখান হতেই কর।" সে দরজার গোড়ায় প্রণাম করে চলে গেল।

মা এত দুর্ব্বল, যেন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হলো। নীচেই বসে আছি। ইতিমধ্যে রাসবিহারী মহারাজ এসে মাকে বেশী কথা কহিতে নিষেধ করে গেলেন। তবু মা মাঝে মাঝে দু চারটি কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। যথা সম্ভব সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে বসে আছি। এই সময় রাধারাণী ছেলে কোলে করে এলেন। ছেলেটির অসুখ। আমি ছেলেটির হাতে কিছু দিয়ে দেখ্‌লুম। রাধুত কিছুতেই তা লইবে না। মা বল্লেন "সে কি রাধু ? দিদি আদর করে দিলেন, আর তুই নিবিনে"—বলে নিজেই তুলে রাখলেন। ছেলেটি শুধু মা ও দিদিমার জন্যই নাইবার খাবার অনিয়মে অসুখে ভুগছে বলে কত আক্ষেপ কল্লেন। রাধুত ঢের কটূক্তি করে তার প্রতিবাদ করতে লাগল। "ওকে বলে কোন ফল নেই"—বলে মা চুপ করে গেলেন। খানিক পরে সরলা,

কৃষ্ণময়ী দিদি প্রভৃতি আসিলেন। মা শুয়েই তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। সরলা কৃষ্ণময়ী দিদির নাতনীর অসুখে শুশ্রূষা করতে গিয়েছিলেন, সেই সব কথা হতে লাগলো।

১৭ই চৈত্র, ১৩২৬—পাঁচ ছয়দিন পরে গেছি, সন্ধ্যারতি হইতেছিল। শ্রীশ্রীমা খাটের উপর শুয়ে ছিলেন। নিকটে গিয়ে দাঁড়াইতে উঠে বসলেন। প্রণাম করিয়া আদেশ মত বসিলাম। ঘরে সরলা, নলিনী ও বউ আছেন—বউ ও নলিনী জপ করিতেছেন। কিছু সন্দেশ নিয়ে গিয়েছিলাম। আরতি শেষে মা বিলাস মহারাজকে উহা ভোগ দিয়ে দিতে বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "পরে দিলে হবে না?" মা—"না, এখনি দেও"। তিনি আদেশ পালন করিলেন। তিনি ৺সিদ্ধেশ্বরী কালী দর্শনে গিয়েছিলেন, প্রসাদ আনিয়াছেন। ঐ কথা বলিয়া ৺দেবীর প্রসাদ একটু মাকে দিয়ে আমাদের সকলকেও কিছু কিছু দিলেন।

মা, সরলা, নলিনী প্রভৃতিকে পূর্ব্বোক্ত প্রসাদ নিয়ে জল খেতে বল্লেন এবং আমাকেও দিতে বল্লেন। শেষে কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে বললেন "আজ দুদিন জ্বর হয় নি—একটু ভালই আছি মা। আর মা এই রাধুর জন্যই আমার সব গেল—দেহ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, অর্থ, যা কিছু বল। ছেলেটাকে ত মেরেই ফেল্‌বার যো করেছে। এই এখানে এসে সরলার হাতে দিয়ে তবে রক্ষে। আর কাঞ্জিলাল দেখ্‌ছে। কাঞ্জিলাল বলেইছে "এ রাধুর কাছে থাক্‌লে আমি চিকিৎসা করতে পারব না"। ঠাকুরের যে কি ইচ্ছে—ওকে আবার ছেলে দেওয়া কেন? যে নিজের দেহেরই যত্ন জানে না। আবার ত এক নূতন রোগ করে বসেছে। একি হলো মা? যা হোগ্‌গে, আমি আর ওদের নিয়ে পারিনে। বাড়ীতে কি অত্যাচারই করতো। আমাকে কি ওরা গ্রাহ্য করতো?" এমন সময় খবর এল ডাক্তার কাঞ্জিলাল এসেছেন। আমরা পাশের ঘরে গেলুম। ডাক্তারবাবু মাকে দেখছেন এমন সময় রাধু এসে বললে "আমার হাতটা দেখত। নীচে লোহার থামে লেগে ফুলেছে, ছড়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় রক্ত বেরিয়েছে"। বউ উহাতে একটা

ময়লা ন্যাকড়া রেড়ির তেলে ভিজিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। ডাক্তার বাবু বল্লেন "শীগ্‌গীর খুলে ফেলো, সাবান দিয়ে ধুয়ে দাও, অমন ন্যাকড়া দিয়েও বান্ধ্‌তে হয় ? এখনি বিষিয়ে উঠ্‌বে। কলকাতায় হওয়ার সঙ্গে বিষ চলে"—বলে তিনি উঠে গেলেন। মা তখন দুঃখ কচ্ছেন "আহা, বাছার আমার কতই লেগেছে! মরে যাই। আহা, ও জনম দুঃখী আমার। শরীর কি আর আছে। আহা, কাঞ্জিলালকে একটু ওষুধ দিতে বল। ভাল করে ধুয়ে দাও গো"।

একে একে ঠাকুর ঘর হতে সকলে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন "ভাল করে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে"।

পরে মা শুয়ে বললেন "পায়ে হাত বুলিয়ে দেও মা।" পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম "মা একটি কথা বলতে চাই—আপনার কোন অসুবিধা হবে না ত ?"

মা—"না, না, বলনা কি ?" আমি বললুম। * * শুনে মা বল্লেন, "আহা সে আনন্দ কি আর রোজ রোজ হয় মা ? সব সত্যি, সব সত্যি, কিছু মিথ্যে নয় মা—উনিই সব। উনিই প্রকৃতি, উনিই পুরুষ। ওঁ হতেই সব হবে।"

আমি—মা, এক একদিন মনে মন্ত্র জপ করবার পরে দেখি অনেক সময় কেটে গেছে! আর যে সব করতে বলেছেন সে সব কিছুই করা হয় নি! তখন তাড়াতাড়ি সেই সব সেরে উঠে পড়তে হয়, কারণ সংসারের কাজে ত্রুটী হলেত আবার চলে না—এতে কি অপরাধ হয় মা ?

মা—না, না, ওতে কোন অপরাধ হয় না।

আ—একজন বললে, কোন কোন দিন গভীর রাত্রে ধ্যানে একটা ধ্বনি শুন্‌তে পাই—বেশীর ভাগই শুনি যেন শরীরের ডানদিক হতে উঠ্‌ছে। কখনো (মন একটু নামলে পর) বাঁদিক হতেও হচ্ছে শুনি"। মা—(একটু চিন্তা করে) "হাঁ ডান দিক হতেই হয়। বাঁদিক দেহ ভাবের। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে এই সব অনুভব হয়—ডানদিক হতে যেটি হয়, ঐ-ই ঠিক"। "শেষে মনই গুরু হয়। মন স্থির করে দুমিনিট ডাক্‌তে পারাও ভাল"।

"দেহভাবের"—কথাটি যতটুকু বোঝা গেল, তা বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করিতে আর ইচ্ছা হলো না—মায়ের দেহ অসুস্থ।

বউ এসে মশারী ফেলে দিতে চাইলে। আমি বিদায় নেব ভাবছি। মা অমনি মাথাটি বালিস হতে তুলে বল্লেন "এই নেও গো, আমি মাথা তুলেছি"। শয়নাবস্থায় নাকি প্রণাম কবিতে নেই, তাই। প্রণাম করিতেই "এস, মা, আবার এসো। একটু বেলাবেলি এসো। কাজ কর্ম্ম সাবা হয়ে উঠে না বুঝি? দুর্গা, দুর্গা. এস মা এস"। বউ মশারী ফেলে দিয়েছে, তবু মশারী হতে শ্রীমুখখানি বাহির করিয়া বাখিয়া বিদায় দিচ্ছেন। ঘরের বাহিরে বারান্দায় এসেছি, তখনও শুনছি মা করুণাপ্লুত স্বরে বলছেন "দুর্গা, দুর্গা"। কি অসীম ভালবাসা। যতক্ষণ কাছে থাকা যায় সংসারের শোক তাপ সব ভুল হয়ে যায়!

মায়ের অসুখ সমভাবেই চল্‌ছে। শরীর ক্রমশঃ খুব দুর্ব্বল হচ্ছে। সে দিন বিকাল বেলা গেছি। মা উঠে কলঘবে যাবেন। বল্‌চেন "হাতখানা দেও ত মা. ধরে উঠি। প্রায়ই জ্বর হয়, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল"। কষ্টে উঠ্‌লেন। উঠে এসে বল্‌চেন "এই দেখগো, দোর গোড়ায় কে একগাছি লাঠি বেখে গেছে। কদিন হতেই ভাবছি একগাছি লাঠি পাই ত ভর দিয়ে একটু যেতে আসতে পারি। তা দেখ, ঠাকুর ঠিক এনে জুগিয়ে রেখে দিয়েছেন।" হাতে করে তুলে লাঠি গাছা দেখালেন। হাস্‌তে হাসতে বলচেন, "জিজ্ঞাসা করলুম 'কে লাঠি ফেলে গেছে গো? তা, কেউ বলতে পারলে না"।

আর একদিন গিয়ে শুনি, মায়ের এত কষ্ট দেখে মায়ের সাধু ছেলেরা বল্‌ছেন "এবার মা, ভাল হয়ে উঠ্‌লে, আর কাউকে দীক্ষা নিতে দেব না। যত লোকের পাপের ভোগ নিয়ে আপনার এই কষ্ট ভোগ!" মা শুনে মৃদু মৃদু হাস্‌লেন, বল্লেন "কেন গো? ঠাকুর কি এবার খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছেন!!" সকলেই নিরুত্তর। হায় মা, তোমার এ করুণাপূর্ণ কথায় যে কত কথাই না ব্যক্ত করলে, মূঢ় আমরা তার কি বুঝি!

এই কথায় মনে পড়ে—একটি সম্ভ্রান্ত কুলমহিলা কর্ম্মবিপাকে

দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণা হয়ে পড়েন, তবে তাঁর পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিও ছিল, তাই একদিন কোন সাধুর দৃষ্টিপথে পড়ে সদুপদেশ পেয়ে নিজের দুষ্কৃতি ও ভ্রম বুঝতে পেরে বিশেষ অনুতপ্তা হন এবং উক্ত সাধুর উপদেশে একদিন বাগবাজারের বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে এসে উপস্থিত হন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করতে সঙ্কুচিত হয়ে দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে নিজের সমস্ত পাপের কথা মায়ের কাছে ব্যক্ত করে বল্লেন,—"মা আমার উপায় কি হবে? আমি আপনার কাছে এই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করবার যোগ্য নই"। শ্রীশ্রীমা তখন অগ্রসর হয়ে গিয়ে নিজের পবিত্র বাহুদ্বারা মহিলাটির গলদেশ বেষ্টন করে ধরে সস্নেহে বল্লেন "এস মা, ঘরে এস। পাপ কি ত বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। এস আমি তোমাকে মন্ত্র দেবো—ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দেও—ভয় কি?"

মানুষের পাপতাপ রোগশোকের ভার নিজ স্কন্ধে লইয়া তাঁহার মত দয়াময়ী পতিতোদ্ধারিণীই হাসি মুখে বলিতে পারেন "কেন গো ঠাকুর কি খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছিলেন"!

১লা বৈশাখ ১৩২৭—সন্ধ্যারতি শেষ হয়ে গেছে। গিয়ে দেখি মায়ের জ্বর। রাসবিহারী মহারাজ মায়ের হাতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ব্রহ্মচারী বরদা পদসেবা কচ্ছেন। থার্ম্মোমিটার দেওয়া হয়েছে। মা চোখ বুজে শুয়ে আছেন। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে। মা একবার তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "কেন"? রাসবিহারী মহারাজ কি যেন মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন। বউও কাছে আছে। জ্বর দেখে ১০০ বল্লেন যেন শুনলাম।

সুধীরা দিদি নববর্ষ বলে মেয়েদের ভোজ দিচ্ছেন। তাই সরলা দিদি চারটার সময় স্কুল বোর্ডিংএ গেছেন। বরদা ব্রহ্মচারীকে মা বল্লেন সরলা দিদিকে ডেকে আনতে। তিনি এসে রাধুর ছেলেকে খাওয়াবেন। এখনও সময় হয়নি খাওয়াবার। কিন্তু কাঁদছে বলে রাধু আবার তাকে এখনি খাওয়াতে চাচ্ছে। মা বারণ করছেন বলে রাধারাণী রেগে তাঁকে গালাগাল দিতে লাগল—"তুই মর্, তোর মুখে আগুণ!" শুনে আমাদের মহা বিরক্তি বোধ হতে লাগল—মায়ের এই অসুখ! আর এই সময়ে অমন সব গালাগালি দেওয়া! রাধু কিন্তু আরও

কত কি বলে চেঁচাতে লাগ্‌ল। এইরূপ প্রায়ই হয়, কিন্তু মায়ের অসীম ধৈর্য্য—চিরদিনই চুপ করে সহ্য করে যান! কিন্তু দীর্ঘকাল অসুখে ভুগে আজ তিনিও উহাতে বড় ত্যক্ত হয়ে উঠলেন, বল্লেন "হ্যাঁ, টের পাবি আমি মলে তোর কি দশা হয়। কত লাথি ঝাঁটা তোর অদৃষ্টে আছে, জানি না। আজ এই বৎসরকার দিনে, আমি সত্যি বল্‌ছি তুই আগে মর, তারপর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই"। একথা শুনে রাধু যে সব কথা বল্‌লে তা আর লিখ্‌তে ইচ্ছা হয় না। খানিক পরে সরলা এলেন ও ছেলের ব্যবস্থা করিতে গেলেন। আমাদের মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। মা আবেগভরে বল্লেন "বাতাস কর মা, আমার হাড় জ্বলে গেল ওর জ্বালায়"। একটু বাতাস কর্ত্তেই আবার পায়ে হাত বুলুতে বল্লেন। পদসেবা কচ্ছি এমন সময় বাসবিহারী মহারাজ এসে মশারী ফেলে দিতে ব্যস্ত হলেন। অগত্যা আমি বল্লাম "তবে আসি মা"। মা বল্লেন "এস গে"।—এইই শেষ আদেশ ও শেষ কথা শুনে এলুম।

রাধুর সঙ্গে মায়ের এ লীলা কিসের জন্য তা তিনিই জানেন। আমাদের কিন্তু উহা দেখা অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

আমাকে কালীঘাট চলে আস্‌তে হলো। তাবপব সকলের অসুখ বিসুখে আর যাবার সুবিধা করেই উঠতে পারি নাই। ক্রমেই মায়ের দেহ খারাপ—খবর পাচ্ছি। শেষে যে দিন গেলুম দেখে মনে হল আমাদের সব শেষ!—তথাপি আশা!

স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন

(৺বারাণসী রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম)

১লা জুলাই, ১৯২০

আমাদের ঠাকুরের কথা হচ্ছিল:—

স্বামী তুরীয়ানন্দ। ঠাকুর বলেছিলেন, "মা, কাম যদি হয় গলায় ছুরি দেব।" কি কথা! ঠাকুরের একবার বুক একটু ছাঁৎ করে

উঠেছিল। অমনি আছাড় পিছাড় খেয়ে, এসে মার কাছে পড়লেন। ওঁর যে মন তাতে তিনি নিশ্চয়ই ঐরূপ করতেন—যা বলা তা করা। যিনি এরূপ বলতে পারেন তাঁকে কি মা ওতে ফেলেন? এরূপ বলতে পারলে নিশ্চয়ই হয়।—কে জানে!

"কামাদিদোষরহিতং কুরুমানসঞ্চ"– কি কথা!

বুড়ো বয়সে কাম হলে ত ভারি বিপদ! একজন বলেছিল বুড়ো বয়সে নাকি ওসব বেশী হয়। ইচ্ছা আছে অথচ ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি শিথিল, সেত ভারি বিপদ্। রোধ করবার strength (শক্তি) ও তখন কমে যায়।

আচ্ছা এই কামটা কি? একটা বৃত্তি বিশেষ বইত নয়!

ভক্ত। দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের একটা আনন্দ বিশেষ।

স্বামী তু। এর ভিতরে ত একটা Psychology (তত্ত্ব) আছে? সেটা কি—না এক হয়ে যাবার ইচ্ছা। এটাও সেই প্রেমের একটা aspect (প্রকাশবিশেষ)। তবে মানুষ ভুল করে। Gross (স্থূল) থেকে আরম্ভ করে বলে এটাকে সেই শুদ্ধ বস্তুতে নিয়ে যেতে পারে না। কারো কারো কিন্তু এ থেকেও হয়েছে, যেমন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের কথা শুনেছ ত?

"রজকিনীরূপ কিশোরীস্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়"—কামগন্ধ নাহি তায়।—কেমন কথা! আর বিল্বমঙ্গল, তুলসীদাস। তুলসীদাস বড় স্ত্রৈণ ছিলেন। স্ত্রী বাপের বাড়ী যাচ্ছিলেন আর তুলসীদাস তার পেছনে পেছনে যাচ্ছিলেন। স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন, এর এক তিলও যদি ভগবানে দিতে পারতে তবে তাঁকে লাভ করতে পারতে।' অমনি বিবেক এসে গেল। ওঁদের ওথেকেই বিবেক এসে যায়। প্রেম ও কাম দুটো খুব পাশাপাশি কিনা; তাই ঠাকুর বলতেন, 'কাম অন্ধ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।" মানুষবুদ্ধি থাকলে কাম, আর ভগবদ্বুদ্ধি থাকলেই প্রেম।

ভক্ত। আচ্ছা গোপীদের ত আর প্রথমে ভগবদ্বুদ্ধি ছিল না, প্রথমটা ত তাদের স্থূলেতেই আসক্তি ছিল?

স্বামী তু। তাত নয়। ভাগবতে গোপীদের স্তবে দেখা যায় যে গোড়া থেকেই গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভগবদ্ভাব ছিল। গোপীরা যখন তাঁর কাছে যান, তখন তিনি তাঁদের চলে যেতে বল্লে তাঁরা বল্লেন, "আমরা স্বামী, পিতাপুত্র, আত্মীয়, বান্ধব সব পরিত্যাগ করে তোমার কাছে এসেছি, আর যাবই বা কোথায়? তুমি যে অন্তরাত্মারূপে সকলের ভিতর।"

গোপীদের শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ concentration (মনের একাগ্রতা) হয়েছিল। একটাতে concentration হলেই ভগবদ্ভাব প্রকাশ পায়। কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ এর যে কোনটার দ্বারা তন্ময়তা হতে পারে। কাম—যেমন গোপীদের, ক্রোধ—যেমন কংসের, ভয়—যেমন শিশুপালের স্নেহ—যেমন মা যশোদার, ইত্যাদি।

"কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহং ঐক্যং সৌহৃদমেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥"

—ভাগবত ১০।২৯।১৫।

কিন্তু মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হলে কি ও সব হয়? তুমিও যেমন।

প্রেম যদি হয় তবে অবশ্য ভাজন,
আছে ক্ষুধা নাহি অন্ন না হয় এমন।

(স্থান ঐ)

২রা জুলাই, ১৯২০।

স্বামী তু। আজ বেদান্ত হল?

ভক্ত। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামী তু। কি হল? 'তত্ত্ব সমন্বয়াৎ'?

ভক্ত। আজ্ঞে হাঁ। 'পরিণামী নিত্য' ও 'কূটস্থ নিত্য,' নিয়ে যে বিচার সেটাই হল।

স্বামী তু। 'পরিণামী নিত্য' কথাটাই সোণার পাথর বাটীর মত। সাংখ্যের মত বুঝি এটা? সত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। সত্ব, রজঃ তমের বিকারই সৃষ্টি। ডাক্তার সুরেশ ভট্টাচার্য্য একদিন

ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করেছিল, তিন গুণ নিয়ে প্রকৃতি। গুণের যদি বিকার হল, তবে প্রকৃতির প্রকৃতিত্ব থাকে কই? আমি বল্লুম, সবটাই ত আর বিকার হচ্ছে না, কতকটা নিয়ে বিকার হচ্ছে। প্রকৃতি আর বিকৃত-প্রকৃতি। যেমন দুধ দই হলেও সব দুধ ত আর দই হয়নি—কোথাও না কোথাও দুধ থাকেই। বেদান্ত পুরুষ আর প্রকৃতিকে অভিন্ন বলেছেন। (নিজ শরীর দেখাইয়া) এখানেই দেখ না, প্রকৃতি পুরুষ দুই-ই রয়েছেন। যেমন—একটা ছোলার ভিতরেই দুইটা দানা। "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি" ইত্যাদি শ্লোক, "য এবং বেত্তি পুরুষং" ইত্যাদি। সাধন আর কি? এই প্রকৃতিকে শুদ্ধ করা। বৈষ্ণবেরা বলেন, এক কৃষ্ণই পুরুষ আব সবই প্রকৃতি। মহাপ্রভু বল্‌তেন, "প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ"—প্রকৃতি কি কখনও প্রকৃতিকে চায়? প্রকৃতিকে পুরুষপর করতে হবে। মাবাবাই বৃন্দাবনে গিয়ে সনাতনের সঙ্গে দেখা কত্তে চাইলে তিনি স্ত্রীলোক বলে সনাতন তাঁব সঙ্গে দেখা কত্তে অসম্মত হলেন। তিনি মহা বৈরাগী ছিলেন কিনা। তা শুনে মীরা বল্লেন, "বৃন্দাবনে এক শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ জানি। আবার কে পুরুষ এলো? তাকে দেখতেই হবে।" তারপরে দুজনের দেখা হল। উভয়ই উচ্চ সাধক কিনা, খুব আনন্দ হল। সনাতন এই বলে তাঁকে প্রণাম করলেন, "শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান ও আমার জন্মস্থান।" নিজের সঙ্গে না মিলিয়ে পড়লে বেদান্ত পড়া কিছুই হয় না।

এই সব কথা হইতেছে এমন সময়ে একজন যুবক তথায় আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইল। যুবক কুমিল্লা দেশীয়। তত্রত্য কোন মহাপুরুষের নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য্য ও মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া ১১ বৎসর চট্টগ্রামে কয়েকজন গুরুভাইয়েব নিকট থাকিয়া ভজন ও সৎসঙ্গে কালাতিপাত করেন।

(যুবকের প্রতি) তোমাতে বৈরাগ্যের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তোমার কি রকম বৈরাগ্য? ঠিক বৈরাগ্য কি 'কারণ' বৈরাগ্য? যদি কোন কারণে বৈরাগ্য হয়ে থাকে তবে সে কারণটা চলে গেলেই বৈরাগ্যও চলে যায়। তোমাকে intern (অন্তরীণ) করেছিল নাকি?

যুবক। আজ্ঞে না।

স্বামী তু। যা হক, বৈরাগ্য হওয়া, সেত সৌভাগ্যের কথা। বৈরাগ্য আর কি?—আত্মানাত্মবিবেক। আত্মানাত্মবিবেক, প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক—এইগুলো সব Synonimous terms (একার্থক শব্দ)

যুবককে কাশীতে থাকার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "সুবিধা হইলে সে কাশীতেই থাকিবে"।

স্বামী তু। সদ্ভাব থাক্‌লে ভারতবর্ষের ত কথাই নাই, সব দেশে থাকা যায়।

"সভী ভূমি গোপালকী জহাঁ মে অটক কহাঁ।
জাকে মনমে অটক হৈ তাকে অটক রহা॥"

—এটা খুব বড়লোকের কথা। জান কার? রণজিৎ সিংএর সেনাপতি হরি সিংএর কথা। আফ্‌গানরা Frontier এ (সীমান্ত প্রদেশ) নানা উৎপাৎ কর্ত্তে আরম্ভ করে। তাদের তাড়া করলে তারা আটক পার হয়ে থাকত। আটক পার হলে ধর্ম্ম নষ্ট হবার ভয়ে তাদের দমন করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তখন হরি সিংকে ডাকিয়ে তার প্রতিবিধানের পরামর্শ চাইলে তিনি ঐ কথা বলেন। তিনি আটক পার হয়ে ওদের রীতিমত শিক্ষা দিয়ে আসলেন। হরি সিং বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু কেমন জ্ঞানের কথা, পরমহংসের মত কথা! সদ্ভাব নিয়ে যেখানেই থাক্‌বে সেখানেই ভাল থাক্‌বে। তিনিই ত সৎ—তিনি ছাড়া সৎ কিছু কি আর আছে? আর একটি ছোট গল্প তোমাদের বল্‌ছি। মনে আছে ত, দণ্ডকারণ্যে সীতা-হরণের পর ভ্রমণ করতে করতে রাম-লক্ষ্মণ একটি মনোরম স্থান দেখ্‌তে পান। সেখানেই চাতুর্ম্মাস্য যাপন কর্ত্তে ইচ্ছুক হয়ে রাম লক্ষ্মণকে বল্‌লেন, লক্ষ্মণ, দেখে এস, এখানে কেউ আছেন কিনা! তাঁর বিনা অনুমতিতে কেমন করে থাকি? লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বন মধ্যে একটি শিবমন্দির দেখতে পেলেন, কিন্তু লোকজনের চিহ্নমাত্র দেখ্‌তে পেলেন না। ফিরে এসে রামকে বলায়—রাম সানন্দে বল্‌লেন "বেশ হয়েছে, শিবই এই স্থানের অধিষ্ঠাতা! তাঁর অনুমতি নিয়ে এস।" লক্ষ্মণ রামের আদেশে মন্দিরে গিয়া অনুমতি চাহিলে

লিঙ্গ হতে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বের হয়ে এলেন এবং এক বিশেষ ভঙ্গীতে কিছুক্ষণ নৃত্য করে অন্তর্হিত হলেন। লক্ষ্মণ অবাক হয়ে ফিরে এসে রামকে সকল বিষয় বল্লে রাম বল্লেন, কুটীর বাঁধ, অনুমতি হয়েছে"। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কিরূপ'? রাম বল্লেন, "রসনা ও কাম আপন বশে রেখে এখানে কেন, যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আনন্দে থাক।"

পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থনিমিত্তক

জিহ্বোপস্থ পরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনম্॥

যত কিছু গোল তাত ঐ রসনা ও কাম নিয়ে। হিমালয়ে কত নির্জ্জন সাধনার অনুকূল স্থান আছে, সাধুরা সেখানে থাকতে পারে না কেন? জিহ্বার দায়ে। খাবার লোভে তাদের সে সব স্থান ত্যাগ করে আসতে হয়। আর দেখনা, সাধুরা যে এক স্থানে নিরুপদ্রবে থাকতে পারে না, তার কারণ কি? হয়ত জিহ্বার দোষে লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে না হয় খাবার লোভ, না হয় কামের তাড়না। সেই জন্যই সাধু যদি এক স্থানে নিরুপদ্রবে বার বৎসর থাকতে পারে, তবে সে "আসন সিদ্ধ"। বার বৎসরের সংযম সে কি কম কথা। ইন্দ্রিয় জয় বড় শক্ত কথা। "মরবে নারী উড়বে ছাই তবে নারীর গুণ গাই"। একটি গল্প আছে। আকবর বাদশা একদিন বীরবলকে বলেছিলেন, "তোমার মার কাম গেছে কিনা জিজ্ঞাসা করে এস।" বীরবলের মার বয়স তখন ৮০ বৎসরের উপর। আর বীরবল কি করেই বা মাকে একথা জিজ্ঞাসা করে? অথচ বাদসার হুকুম। বীরবল মহা মুস্কিলে পড়ে গেল। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করল। বীরবলের মা মহা বুদ্ধিমতী —বীরবলের মা, বুঝাইতেই পার—তিনি কিন্তু সব বুঝলেন। বীরবলকে বল্লেন, "কোন চিন্তা নাই, তুই খা-দা। যখন দরবারে যাবি, আমার কাছ থেকে জবাব নিয়ে যাবি"। দরবারে যাবার সময় মা বীরবলের হাতে একটী বিষ-কৌটা দিয়ে সেটা বাদশাকে দিতে বল্লেন। কৌটা পেয়ে বাদশা সেটা খুল্লেন। তার মধ্যে একটার ভিতরে আর একটা করে অনেক কৌটা ছিল—সব শূন্য। সকলের শেষ কৌটাতে দেখলেন, একটু ছাই রয়েছে। বুঝলে ত?

রসনা আর কামকে জয় করলেই সব গোল মিটে গেল। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস নিতে কেশব ভারতীর কাছে গেলেন তখন কেশব ভারতী তাঁকে দেখে বল্লেন, "তোমার এই উদ্দাম যৌবন ও অতুলনীয় রূপ, তোমাকে কে সন্ন্যাস দেবে?" প্রভু বল্লেন "আপনারা ত অধিকারী দেখে সন্ন্যাস দিয়ে থাকেন। আমি যদি অধিকারী হই তবে আমাকে সন্ন্যাস দিতেই হবে। আপনি পরীক্ষা করে দেখুন, আমি অধিকারী কিনা।" ভারতী মহাপ্রভুকে বল্লেন, তোমার জিব দেখি। "মহাপ্রভু জিব বার কল্লে তিনি খানিকটা চিনি তাঁর জিবে দিলেন। যেমন চিনি তেমনি রইল। একটুও ভিজল না। ফুঁ দিতেই সব চিনি জিব হতে উড়ে পড়ে গেল। আর অপর পরীক্ষার দরকার হল না।

"তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥" ভাগবত, ১১।৮।২১

জিহ্বা জয় হলেই কামও জিত হয়। ইন্দ্রিয়সংযম না হলে কিছুই হবার যো নেই। সমগ্র গীতাতে একথা বার বার আছে—

"তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
আত্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং॥" গীতা, ৩।৪১

একটা ইন্দ্রিয়ও অসংযত থাকলে সব তপস্যা, সব আয়াস পণ্ড হয়ে যায়। যেমন কলসীতে একটি মাত্র ফুটো থাকলে সব জল তা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঠাকুরের সেই চাষার আকের ক্ষেতের জল দেওয়ার গল্প জানত? ঘোগ দিয়ে সব জল বেরিয়ে গেল, এক ফোঁটা জলও ক্ষেতে যায়নি।

"ইন্দ্রিয়াণাং হি সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং দৃতেঃ পাত্রাদিব োদকং॥"

"রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।" জোর করে কি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয়? তাঁকে পেলে তবে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-সংযম হয়। তবে প্রথমটা জোর করে চেষ্টা করে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হয়। পরে সেটা স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু সাহস কত্তে নাই।

বুদ্ধিমান ব্যাধ যেমন মৃগকে ধরে তাকে বেঁধে রাখে সেইরকম ইন্দ্রিয়-সংযম করে, শমদম অবলম্বন করে সাবধানে থাকতে হয়।

সিদ্ধাই সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তা হইল।

জিজ্ঞাসায় জানা গেল আগন্তুক যুবক অসিঘাটে থাকেন। কথায় কথায় মগ্নীরাম বাবার কথা উঠিল। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর একনিষ্ঠ হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। সম্প্রতি সন্ন্যাস লইয়া দুর্গাবাটীর নিকটে একটি বাগানে আছেন। মহা ত্যাগী, কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা বড় একটা বলেন না।

তারপর নিষ্ঠার কথা আসিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন—"দৃঢ় নিষ্ঠা না থাকিলে বস্তুলাভ হওয়া অসম্ভব।"

অপর একটি যুবক সাধুর কথা উঠিল। তিনিও কঠোর তপস্বী। কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৌনী হইয়া আছেন। তাঁর কথা হইতে লাগিল।

স্বামী তু—সে এখানে প্রায়ই আস্‌ত, কিন্তু মৌনী। আমি বল্লাম, "মৌনী টৌনী এ সব ত দেখে নিলে, আর কেন? এখন কথা টথা বল। সিদ্ধাই টিদ্ধাই—চাই না কি? সে হাসত। খুব দৃঢ়তা তার। আর খুব Sincere (অকপট)।

(আগন্তুক যুবকের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া) একে দেখে মনে হচ্ছে এ অভ্যাসী ছেলে। (অপর সকলের দিকে চাহিয়া) তোমরা কিছু বুঝতে পারছ না? আমি কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি। মন স্থির হওয়ার একটি লক্ষণ—দৃষ্টি স্থির হওয়া। মন স্থির হলেই দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। আকার প্রকারে চাঞ্চল্যের ভাব থাকে না।

(যুবকের প্রতি সহাস্যে) তোমার কি চাই। সিদ্ধাই টিদ্ধাই চাই না ত?

(সকলের প্রতি) শেষ রক্ষা হলেই রক্ষা। শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকা শক্ত। সাধকের এই সব আপনা থেকেই কখন কখন আসে। কিন্তু ঐটের দিকে মন দিলেই বস্, তার সব হয়ে গেল। সেটাও কিন্তু থাকে না। নিজের স্বার্থের জন্য ব্যবহার কল্লে ত কথাই নেই, অন্য রকমেও তা থাকে না। মানুষ বাড়ী থেকে বেরুল সাগরের রত্ন নেবে বলে। তীরে এসে নানা রকম রঙ্গ চঙ্গে পাথর, ঝিনুক, শামুক

দেখতে পেয়ে কোঁচড় ভরে তাই নেয়, সমুদ্রের রত্ন নেওয়া আর হয় না। মহামায়া সব ভুলিয়ে দেন।

কঠোপনিষদে নচিকেতাকে যম বলেছেন—

ইমা রামাঃ সরথাঃ সতুর্য্যা ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।

আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥

আর দেখ নচিকেতা কি বলেছেন— কঠ, ১।১।২৫

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং জরয়ন্তি তেজঃ।

অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ কঠ, ১।১।২৬

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষম চেত্বা।

জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব॥ কঠ, ১।১।২৭

যম যেমন নচিকেতাকে ভোলাতে চেষ্টা করেছেন সেইরূপে মহামায়া সকলকে ভুলিয়ে দিচ্ছেন। ঠাকুরের সেই কথা জানত? হৃদয় একদিন ঠাকুরকে বলেছিলেন—"মার কাছ থেকে কিছু সিদ্ধাই চেয়ে নাও না।" তাঁর বালকের স্বভাব—তিনি মার কাছে গিয়ে চাইতে, মা ভাবে দেখিয়ে দিলেন—একটা বেশ্যা মল ত্যাগ করছে, আর মা সেই বিষ্ঠার দিকে দেখিয়ে বলছেন—এই সিদ্ধাই, নেবে? ঠাকুর ফিরে এসে হৃদয়কে খুব গালাগাল দিলেন। কি ব্যাপার বোঝ একবার! বাস্তবিকই ত এসব অত্যন্ত ঘৃণিত বস্তু নয়ত কি? এতে আছে কি? ঠাকুর বলতেন—"ধোপা ভাঁড়ারী"—এতে তোমার কি? তাঁরই ত জিনিষ, তোমার ভিতর দিয়ে একবার pass করিয়ে চালিয়ে নিচ্ছেন বই ত নয়। সেই হাতী মরা-বাঁচার গল্প। হাতী মল বা বাঁচল তাতে তোমার কি? (যুবকের প্রতি) ওসব নয়। চাই ভক্তি। ভক্তি যদি হল তবে আর কি চাই? নারদ একবার খুব কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তখন তিনি দৈববাণী শুনতে পেলেন,—

"অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥" ইত্যাদি। নারদ-পঞ্চ-রাত্র

যদি অন্তরে বাহিরে হরি সর্ব্বদা বিরাজিত থাকেন তবে তপস্যা বৃথা শরীর পোষণাদি—করবে আর কিসের জন্য? আর অন্তরে বাহিরে

হরি যদি না রইলেন তবে তপস্যার দ্বারা কি হবে? অর্থাৎ তাকে অবলম্বন করে তপস্যা কত্তে হবে। আমাদের দেশে কিন্তু এখন তপস্যার বড় অভাব হয়েছে। কই, সে রকম তপস্যার কথা আর শুন্‌তেই পাওয়া যায় না। বেদান্ত-চচ্চড়ী হয়ে এ সব হয়েছে আরকি। তপস্যা না কল্লে কি বেদান্তের তত্ত্ব বোঝা যায়? এ "বিচার-সাগর" না 'বিগাড়-সাগর'—তাইতে দেশকে বিগড়ে দিয়েছে। মুখে লম্বা লম্বা কথা, সোই ত হ্যায়, জগৎ তো তিন কালমেঁ হ্যায় নহী।" আরে রাম, তুমিও যেমন! এগুলো কি একটা কথা? তপস্যা না কল্লে কি বেদান্ত বোঝাব জো আছে?

স্নানের সময় হইল। (যুবকেব প্রতি) মাঝে মাঝে এস। যুবকটিকে একটি আম দেওয়া হইল।

সাংখ্য দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১ কা) দুঃখ ত্রিবিধ। দুঃখ দূর করিবার উপায় কি। দৃষ্ট উপায় বিফল কেন না তাহা চরম নহে।

(২ কা) যাগ যজ্ঞাদি বৈদিক উপায়ও দৃষ্ট উপায় তুল্য বিফল। যথার্থ উপায় ব্যক্ত অব্যক্ত ও জ্ঞএর যথাযথ জ্ঞান। প্রকৃতির সুপ্ত অবস্থার নাম অব্যক্ত ও জাগ্রত অবস্থার নাম ব্যক্ত। ব্যক্ত প্রকৃতির অপর নাম জগৎ। জগৎ দ্বিবিধ—অন্তর জগৎ এবং বাহ্য জগৎ। অব্যক্তের নাম প্রধান এবং মূল প্রকৃতি। জ্ঞএর নাম চৈতন্য, পুরুষ এবং আত্মা। জ্ঞ চেতন বা আত্মা; ব্যক্ত এবং অব্যক্ত, প্রকৃতি এই উভয়

অবস্থাতেই জড়, অচেতন বা অনাত্ম। নড়ন চড়ন হীন জড়ের নাম প্রকৃতি। যেই প্রকৃতির নড়ন চড়ন আরম্ভ হইল তখনি অব্যক্ত প্রকৃতির ব্যক্তরূপে অর্থাৎ জগদ্রূপে দেখা দিল। জগৎ শব্দ গম ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে; গম ধাতুর অর্থ নড়া-চড়া। ঘুমন্ত প্রকৃতি পুরুষের স্পর্শে জাগ্রত হইয়া নানাভঙ্গীতে নানা বেশে পুরুষের নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রকৃতি যতই ভঙ্গী করুক না কেন, যতই রূপ ধারণ করুক না কেন, ঐ সমুদয় রূপ ভঙ্গী বিশ্লেষণ করিলে ২৩টি শ্রেণী বা পর্য্যায় বা তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(৩কা) (১) বুদ্ধি (১) অহঙ্কার (১১) মনাদি ইন্দ্রিয় (৫) তন্মাত্র, (৫) ভূত।

(৪ কা) পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বের জ্ঞান জন্মিলে দুঃখের অবসান হয়। জ্ঞান প্রমাণের উপর নির্ভর করে। প্রমাণ ত্রিবিধ যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন।

(৫, ৬ কা) স্থূল বিষয় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা নির্নীত হয়, সূক্ষ্ম বিষয় অনুমানের দ্বারা নির্নীত হয়; অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের সত্তা অনুমান এবং আপ্তবচনের দ্বারা উপলব্ধি হয়।

(৭ কা) বিদ্যমান বস্তুও ইন্দ্রিয় দোষ হেতু এবং বস্তুর সূক্ষ্মতা হেতু নাই বলিয়া মনে হয়। বস্তু কীটানু হইতে পারে, চক্ষুও ব্যাধিযুক্ত হইতে পারে।

(৮ কা) আমার চোখ ভাল থাকিলেও সূক্ষ্ম জিনিষ দেখিতে পাই না। সূক্ষ্ম জিনিষ দেখিতে পাই না বলিয়া কি সূক্ষ্ম জিনিষ নাই? কার্য্য আমরা দেখিতে পাই কারণ দেখিতে পাই না; কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না। শরীরের উত্তাপ একটি কার্য্য উহা আমরা অনুভব করিতে পারি। বিকৃত যকৃতের প্রত্যক্ষ আমাদের হয় না। শরীরের উত্তাপ দেখিয়া আমরা যকৃতের সত্তা উপলব্ধি করি। স্থূল কার্য্য দেখিয়া আমরা সূক্ষ্ম কারণের সত্তা অনুমান করি। পঞ্চভূত দেখিয়া পঞ্চ তন্মাত্রের সত্তা নির্ণয় করি। কার্য্য কারণের চিহ্ন বা লক্ষণ মাত্র।

(৯ কা) শক্তি ক্রিয়ার পূর্ব্বাবস্থা; ক্রিয়ার যাহা উপাদান কারণ

তাহাই শক্তি। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না। সৎএর কারণ সৎ। ঘটের কারণ মৃত্তিকা। এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা সূক্ষ্মের সত্ত্বা নির্ণয় করি অর্থাৎ ব্যক্ত হইতে অব্যক্তের সত্ত্বা উপলব্ধি করি।

দশমাদি কারিকা বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া সংক্ষেপে প্রথম হইতে নবম কারিকার বক্তব্য বিষয় বলিলাম। দশম হইতে ২১ কারিকা পর্য্যন্ত ব্যক্ত, অব্যক্ত ত্রিগুণ ও জ্ঞএর বিশেষ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যক্তের ধর্ম্ম কি, অব্যক্ত ও পুরুষের ধর্ম্ম কি, অব্যক্ত এবং পুরুষ যে আছে তাহার পক্ষে কি যুক্তি এই সমস্ত বিষয় নিম্নোক্ত কারিকা সমূহে বর্ণিত হইয়াছে।

১০

জগতে এক 'আমি' আছি—আর আমি ছাড়া আর যাহা তাহা আছে। জগতে আর কিছু নাই। আমি ছাড়া আর যাহা কিছু তাহার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির দুই অবস্থা ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। নিম্নলিখিত দশম কারিকায় প্রকৃতির এই দুই অবস্থার প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম ॥

পদপাঠ। হেতুং অনিত্যম্ অব্যাপি সক্রিয়ম্ অনেকম আশ্রিতং লিঙ্গং। সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতম্ অব্যক্তম্॥

অন্বয়ঃ—ব্যক্তং হেতুমৎ অনিত্যম্ * * * পরতন্ত্রম্। অব্যক্তম বিপরীতম্। (ব্যক্তস্য)

হেতুমৎ=(হেতু+মতুপ) হেতু বা কারণযুক্ত। বুদ্ধির কারণ প্রকৃতি, পঞ্চ ভূতের কারণ শব্দাদি তন্মাত্র। সমস্ত ব্যক্তই কারণযুক্ত। অব্যক্তের কোন কারণ পাওয়া যায় না। সমস্ত ব্যক্তের দুইটি কারণ, অব্যক্ত উপাদান কারণ, পুরুষ নিমিত্তকারণ।

অনিত্য=স্বকারণে লয়শীল। অব্যক্তের কারণ নাই, সুতরাং তাহার স্বকারণে লয় হয় না। যাহার আবির্ভাব তিরোভাব আছে তাহাকে অনিত্য বলা যায়।

অব্যাপী=মৃত্তিকা কারণ, ঘট কার্য্য। যত ঘট আছে তাহাদের সমস্ততেই মৃত্তিকা আছে, কিন্তু যত মৃত্তিকা তৎ সমুদয়ে ঘট নাই।

মৃত্তিকাই সমস্ত ঘটকে ব্যাপিয়া আছে ঘট সমস্ত মৃত্তিকাকে ব্যাপিয়া নাই। কারণই কার্য্যকে ব্যাপিয়া থাকে, কার্য্য কারণকে ব্যাপিয়া থাকে না। ব্যক্ত নিজ কারণের একাংশে অবস্থান করে, সমুদায় অংশ ব্যাপিয়া থাকে না। অব্যক্ত ব্যাপী, ব্যক্ত অব্যাপী।

সক্রিয়ম=স্পন্দনযুক্ত। কিন্তু অব্যক্ত স্পন্দন শূন্য। প্রকৃতির স্পন্দন শূন্য অবস্থার নাম অব্যক্ত, এবং স্পন্দন যুক্ত অবস্থার নাম ব্যক্ত। অব্যক্ত নিষ্ক্রিয়, এবং ব্যক্ত সক্রিয় হইলেও উভয়ই পরিণামী (১১ কারিকা); অব্যক্ত প্রকৃতিই ব্যক্তরূপে পরিণত হয়।

অনেকম্=একাধিক; ব্যক্ত জগত ২৩ শ্রেণীতে বা পর্য্যায়ে বিভাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু যে অব্যক্ত তাহা একমাত্র। সিন্ধু এক কিন্তু তরঙ্গ মালা হাজার হাজার।

আশ্রিতং=স্বকারণে আশ্রয় করিয়া থাকে। মহদাদি কার্য্য কারণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু অব্যক্ত কারণহীন বলিয়া নিরাশ্রয়।

লিঙ্গং=স্বকারণেব জ্ঞাপক। পঞ্চভূত পঞ্চ তন্মাত্রের লিঙ্গ। অব্যক্তের কারণ নাই, অতএব উহা অলিঙ্গ।

সাবয়বং=অবয়ব যুক্ত। দেশব্যাপী কালব্যাপী যাহা, অর্থাৎ যাহা এতখানি বা এতক্ষণ তাহাই সাবয়ব। আন্তরিক ভাব সকলের কাল-ব্যাপী অবয়ব আছে, বাহ্য বস্তু সকলের দেশব্যাপী অবয়ব আছে। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই ব্যক্ত। যাহা অনুভব হয় তাহাও ব্যক্ত। আমরা কি কি অনুভব করি? দেশ, কাল, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সুখ দুঃখ মোহ। সীমাহীনের অবয়ব নাই, অবয়ব আছে খণ্ডের, টুক্‌রার। অব্যক্ত অবয়ব শূন্য, ব্যক্ত সাবয়ব।

পরতন্ত্রং=পরাধীন (অমরকোষ অভিধান) কার্য্য ক্রিয়ার ব্যক্ত অবস্থা, কার্য্য কারণের অধীন। ব্যক্ত পরের অধীন বা পরতন্ত্র। অব্যক্ত বা প্রকৃতি কাহারও কার্য্য নয়, অর্থাৎ ইহার কারণ নাই সুতরাং অব্যক্ত স্বতন্ত্র বা অপরতন্ত্র। ঘট অব্যক্ত নহে, ঘট ব্যক্ত। কেন ঘট ব্যক্ত? নিম্নলিখিত কারণে। ঘটের হেতু আছে, যথা মৃত্তিকা, ঘটের আবির্ভাব তিরোভাব আছে, ঘট অনিত্য, ঘট অব্যাপী, ঘটের স্পন্দনে দর্শনেন্দ্রিয়

উদ্রিক্ত হয়, এবং জীবের রূপ জ্ঞান হয়, ঘট সক্রিয়; একাধিক ঘট দেখিতে পাওয়া যায়, ঘট মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়া থাকে; ঘট মৃত্তিকার জ্ঞাপক, ঘট দেশ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, ঘটের উৎপত্তি পরের অর্থাৎ মৃত্তিকার অধীন।

অর্থ—যাহা (১) হেতুমান (২) অনিত্য (৩) অব্যাপী (৪) সক্রিয় (৫) অনেক (৬) আশ্রিত (৭) লিঙ্গ (৮) সাবয়ব তাহাই ব্যক্ত *। যাহা ব্যাপী, ক্রিয়াশূন্য, এক, নিরাশ্রয়, অলিঙ্গ, দেশ-কালাতীত—এবং স্বতন্ত্র তাহাই অব্যক্ত।

১১

দশম কারিকায় ব্যক্ত এবং অব্যক্তের বিরূপ বা অমিল উক্ত হইয়াছে। অব্যক্তের অপর নাম প্রধান। একাদশ কারিকায় উহাদের স্বরূপ বা মিল বলা হইবে, এবং পুরুষ বা 'জ্ঞ'য়ের উহাদের সহিত কোথায় 'অমিল' তাহাও বলা হইবে। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়ই ত্রিগুণাত্মক এবং অচেতন; পুরুষ গুণাতীত এবং চৈতন্যস্বরূপ।

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীত স্তথা চ পুমান॥

পদপাঠ। ত্রিগুণম্ অবিবেকি, বিষয়ঃ সামান্যম্ অচেতনম্, প্রসব-ধর্ম্মি ব্যক্তং তথা প্রধানং, তদ্বিপরীতঃ তথা চ পুমান॥

অন্বয়—তথা ব্যক্তং ত্রিগুণং, অবিবেকি, বিষয়ং, সামান্যং অচেতনং প্রসবধর্ম্মি। তথাচ তদ্বিপরীতঃ পুমান্।

ত্রিগুণম্=অষ্টম কারিকায় ত্রিগুণের কথা বলা হইয়াছে যে জগৎ বিশ্লেষ করিলে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন পাওয়া যায়। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের নাম প্রকৃতি। ব্যক্ত অব্যক্ত উভয়ই ত্রিগুণাত্মক।

অবিবেকি=ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়ই ত্রিগুণ হইতে অবিবিক্ত বা অভিন্ন। উহারা কেহই কারণ-ভাব ত্যাগ করে না।

বিষয়=ভোগ্য, জ্ঞানগ্রাহ্য।

---

* যাহা ঐ সকলের বিপরীত অর্থাৎ অহেতুমান অনিত্য ইত্যাদি তাহাই অব্যক্ত।

সামান্যম্ = সাধারণ। অনেকের যাহা ভোগ্য বা জ্ঞেয়। বৃক্ষ, ঘট, নর্ত্তকীর ভ্রূলতাভঙ্গ্যাদি বস্তু বহু পুরুষের দ্বারা গৃহীত হইতে পারে, এই জন্য উহা সাধারণ।

অচেতনম্ = জড়।

প্রসবধর্ম্মি = প্রসব যাহার ধর্ম্ম। প্রসব = উৎপাদন। প্রসবধর্ম্মি = পরিণামী, পূর্ব্বে ধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া ধর্ম্মান্তরের উৎপত্তির নাম পরিণাম। জল বরফ হইলে তরলতা-ধর্ম্ম নিবৃত্তি হইয়া 'কাঠিন্য' উৎপত্তি হয়। প্রকৃতির স্বভাবই প্রসব বা পরিণাম। পরিণামের সহিত প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধ। প্রকৃতি এক ক্ষণও পরিণামগ্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্য প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় স্বতঃই বিচ্যুতি ঘটে।

তথাচ = এবং, আর।

তৎ বিপরীত :—পূর্ব্বোক্ত 'বিশেষণ' সমূহের বিপরীত হইতেছে পুরুষ। প্রকৃতিকে পরিণামী, জড়, সাধারণ, ভোগ্য, ঈক্ষাহীন, ত্রিগুণাত্মক বলা হইয়াছে। পুরুষ উহাদের বিপরীত অর্থাৎ চেতন, পরিণামশূন্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অসাধারণ এবং ত্রিগুণ হইতে ভিন্ন।

অর্থ—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয় বস্তুই ত্রিগুণ, ঈক্ষাহীন, জ্ঞানগ্রাহ্য সাধারণ, জড় এবং পরিণামী। পুরুষতত্ত্ব ইহার বিপরীত।

১২

ত্রিগুণের বিষয় ১২।১৩ কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে। ব্যক্ত অব্যক্ত প্রকৃতির উভয় ভাবই ত্রিগুণাত্মক। প্রকৃতির তিন অঙ্গ—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ।

প্রীত্য প্রীতি বিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয় জনন মিথুন বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥

পদপাঠ। প্রীতি অপ্রীতি, বিষাদ আত্মকাঃ, প্রকাশ প্রবৃত্তিনিয়ম অর্থাঃ।অন্যোন্য অভিভব আশ্রয় জনন মিথুন বৃত্তয়ঃ চ গুণাঃ।

অন্বয়—গুণাঃ (১) প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ; (২) প্রকাশ প্রবৃত্তি নিয়মার্থাঃ, চ (কিমন্তাঃ) (৩) অন্যোন্যা......বৃত্তয়ঃ। (বৃত্তির বহুবচনে বৃত্তয়ঃ)

আত্মকাঃ=(আত্মন+ক) স্বরূপ। সেই প্রকৃতি। সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের স্বরূপ কি ? যথাক্রমে প্রীতি, অপ্রীতি এবং বিষাদ।

প্রীতি=সুখ, আরামের ভাব। অপ্রীতি=দুঃখ, অস্বস্তির ভাব। বিষাদ=মোহ। ত্রিগুণের সুখ দুঃখ মোহ আছে। স্থূল পঞ্চভূত হইতে মূল প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমুদয় বস্তুই সুখের হেতু, দুঃখের হেতু, এবং মোহের হেতু হইয়া থাকে। জগতে এমন বস্তু নাই যাহা কেবলমাত্র সুখের হেতু, কিংবা কেবলমাত্র দুঃখের হেতু, কিংবা কেবলমাত্র মোহের হেতু। শুদ্ধমাত্র সত্বগুণাত্মক কিংবা রজগুণাত্মক কিংবা তমগুণাত্মক বস্তু নাই। অদ্বিতীয়া সীতাদেবী রামচন্দ্রের মনে সুখ, শূর্পনখার মনে দুঃখ এবং রাবনের মনে মোহ উৎপন্ন করিয়াছিল। অতিরিক্ত ভয়ে মানুষ এতদূর অভিভূত হইয়া পড়ে যে ব্যাঘ্র হাত চিবাইতে থাকিলেও তাহার অনুভূতি হয় না, ইহা মোহ ভাবের দৃষ্টান্ত। মোহ মানুষকে জড় করিয়া ফেলে। কতকগুলি ভাবের নাম প্রীতি—কতকগুলি ভাবের নাম অপ্রীতি, এবং কতকগুলি ভাবের নাম বিষাদ। তমগুণের নিদ্রা ভয় আলস্য বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি বহু ভেদ থাকিলেও সংক্ষেপের নিমিত্ত উহারা বিষাদাত্মক বলিয়া উক্ত হয়।

প্রকাশ প্রবৃত্তি নিয়মার্থঃ—প্রকাশ যাহার অর্থ বা প্রয়োজন ; প্রকাশশীল। সত্বগুণ প্রকাশশীল, রজঃ প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াশীল, তমঃ নিয়ম বা নিরোধশীল। সর্ব্ব বস্তুই প্রথমে অপ্রকাশ থাকে, পরে প্রকাশিত হইবার জন্য ক্রিয়াশীল হয় এবং তৎপরে প্রকাশিত বা জ্ঞানগম্য হয়। বস্তুতে তিন ভাব সতত টানাটানি করিতেছে, ফলে কেহ বা স্পষ্ট প্রকাশিত, কেহ বা ঈষৎ প্রকাশিত হইতেছে। মনুষ্য পশু এবং বৃক্ষ ইহারা সকলেই সত্ব রজঃ তমাত্মক ; তবে মনুষ্যের জ্ঞানেন্দ্রিয়, পশুর কর্ম্মেন্দ্রিয়, বৃক্ষের প্রাণেন্দ্রিয় (দেহ রক্ষার শক্তি) অর্থাৎ মনুষ্যের সত্বগুণ, পশুর রজোগুণ এবং বৃক্ষের তমোগুণ অন্য দুই গুণ অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট। গাছে ছুরিকাঘাত করিলে গাছের সহজে মৃত্যু হয় না।

অন্যোন্যাভিভববৃত্তিঃ=গুণসকল প্রত্যেকেই অন্যোন্যাভিভব বৃত্তি। অন্যোন্য=পরস্পর, অন্য অন্যের প্রতি, অভিভব=পরাভব গুণত্রয়ের

প্রত্যেকের বৃত্তি অন্য দুই গুণ বৃত্তিকে অভিভূত করিয়া উত্থিত হয়। জ্ঞান চেষ্টা সুখ দুঃখ আদিকে বৃত্তি বলে। বৃত্তি = ক্রিয়া।

অন্যোন্যআশ্রয়বৃত্তি = পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের ক্রিয়া হয়।

অন্যোন্যজননবৃত্তি = পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে বিকার বা কার্য্য জন্মায়।

অন্যোন্যমিথুনবৃত্তি = পরস্পব পরস্পরের নিত্য সঙ্গী, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক গুণের কার্য্যের ভিতর তিন গুণই থাকে।

অর্থ—সত্বগুণ প্রীতিস্বরূপ, রজঃ অপ্রীতি স্বরূপ এবং তমঃ বিষাদ স্বরূপ সত্বগুণের প্রয়োজন প্রকাশ, রজঃ গুণের প্রবৃত্তি, এবং তমগুণের প্রয়োজন নিরোধ। এই তিন গুণের বৃত্তি এই যে ইহারা পরস্পব পরস্পরকে অভিভূত কবে, পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পব পরস্পরের বিকার ঘটায় এবং পরস্পব পরস্পরের নিত্যসঙ্গী।

১৩

সত্বং লঘুপ্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥

পদপাঠ। সত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টং উপষ্টম্ভকং চলম্ চ রজঃ।
গুরু বরণকম্ এব তমঃ প্রদীপবৎ চ অর্থতঃ বৃত্তিঃ॥

অন্বয়—সত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টম্; রজঃ চলং উপষ্টম্ভকং; তমঃ গুরু বরণকম্ এব; প্রদীপবৎ (এষাম্) অর্থতঃ বৃত্তিঃ।

লঘু = গুরুর বিপবীত। হালকা ভাব। "শরীরের ইন্দ্রিয়ের ও অন্তঃকরণের যে আলস্যহীন হাল্কা হাল্কা ভাব, যাহা থাকিলে শরীরাদির কার্য্য সহজে ও সুখে করা যায় তাহাই তাহাদের লঘুতা। সাত্বিক ভাব ইষ্ট। তমঃ গুরু, বরণক অর্থাৎ আবরণক। শরীরের ইন্দ্রিয়ের ও অন্তঃকরণের যে জড়তাপূর্ণ ভারি ভারি ভাব যাহা থাকিলে শরীরাদির কার্য্য সহজে করা যায় না তাহাই তাহাদের গুরুতা। আবরণক প্রকাশক ধর্ম্মের বিরোধী। সত্ব প্রকাশ করে, তমঃ আবরণ করে।

রজঃ উপষ্টম্ভক=জড়তার নাশকারী ; চল=চঞ্চল। উপষ্টম্ভ= উদ্রেক, আরম্ভ। ক্রিয়ার দ্বারা অবস্থান্তর পাওয়াই রজঃগুণের স্বভাব।

প্রদীপবৎ=প্রদীপের ন্যায়। প্রদীপের তেল, বাতি আগুণ আছে। তেল বাতি আগুণ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী, অথচ সকলে মিলিত হইয়া রূপ প্রকাশ করিতেছে।

অর্থতঃ=কোন এক বিষয়ে। (তস্ প্রত্যয় ৭মীতে)

বৃত্তিঃ=কার্য্য সত্ত্ব রজঃ তমঃ ভিন্ন স্বভাব হইলেও পরস্পরের সঙ্গী এবং একই বিষয় আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে, উহাদের কার্য্য প্রদীপের তুল্য।

অর্থ :—সত্ত্ব লঘু প্রকাশশীল এবং ইহা সাংখ্যাচার্য্যদের অভিমত। রজঃ উপষ্টম্ভক এবং চল। তমঃ গুরু এবং আবরণক। প্রদীপের ন্যায় কোন এক বিষয়ে থাকিয়া উহারা কার্য্য করে।

১৪

অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ ত্রৈগুণ্যাত্তদ্বিপর্য্যয়েঽভাবাৎ।
কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্॥ (১৪)

পাদপাঠ—অবিবেকি আদেঃ সিদ্ধি ত্রৈগুণ্যাৎ তৎ বিপর্য্যয়ে অভাবাৎ। কারণ গুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য অব্যক্তম্ অপি সিদ্ধম্॥

অন্বয়।—ত্রৈগুণ্যাৎ অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ ; তদ্বিপর্য্যয়ে অভাবাৎ (অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ চ) ; কার্য্যস্য কারণ-গুণাত্মকত্বাৎ অব্যক্তম্ অপি সিদ্ধম।

ত্রৈগুণ্যাৎ=গুণত্রয় থাকাতেই। অবিবেক্যাদেঃ (অবিবেকী আদি শব্দের ৬ষ্ঠীর ১ বচন) অবিবেকিত্বাদি ধর্ম্মের। সিদ্ধিঃ=নির্ণয় (হয়)।

আর কি হইতে ঐ সকল ধর্ম্মের সিদ্ধি হয় ? তদ্বিপর্য্যয়ে অভাবাৎ। তৎ+বিপর্য্যয়ে (৭মী বিভক্তি) ; তাহার বিপর্য্যয়ে, অর্থাৎ অবিবেকির যাহা বিপরীত তাহাতে, অর্থাৎ পুরুষে (তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্ ১১ কারিকা)। অভাবাৎ=গুণের অভাবাৎ, পুরুষে ত্রিগুণের অভাব হইতে।

দুই প্রণালীতে ব্যক্ত এবং অব্যক্তের অবিবেকিত্ব সিদ্ধ হয়। ৫ম কারিকায় অনুমানকে "লিঙ্গ লিঙ্গি পূর্ব্বকম্" বলা হইয়াছে। ন্যায় দর্শন অনুসারে লিঙ্গ=ব্যাপ্য, এবং লিঙ্গি=ব্যাপক এবং ব্যাপ্য ও ব্যাপক ভাবের

নাম ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তি অর্থ অবিনাভাব. নিত্য সহচর সম্বন্ধ। ব্যাপ্তি তর্কের অঙ্গ বিশেষ। থাকিলে থাকে এইরূপ ব্যাপ্তির নাম অন্বয়ী, যথা, ধূম থাকিলে মূলে বহ্নি থাকে। না থাকিলে থাকে না এইরূপ ব্যাপ্তির নাম ব্যতিরেকী, যথা—বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না। কারণের অভাবে কার্য্যের অভাব হয়। ত্রিগুণ থাকিলে অবিবেকিত্ব থাকে—ইহা অন্বয়ী। অবিবেকিত্ব যথায় নাই ত্রিগুণও তথায় নাই—ইহা ব্যতিরেকী। পুরুষে ত্রিগুণের অভাব, সেই হেতু পুরুষে অবিবেকিত্ব নাই।

কার্য্যস্য কারণগুণাত্মকত্বাৎ=কার্য্যের কারণগুণাত্মকত্ব হেতু। কার্য্যে যাহা দেখা যায় তাহা কারণেরই গুণ বলিয়া ;

অব্যক্তং অপি সিদ্ধম্=অব্যক্তও সিদ্ধ হইল। ব্যক্তের ধর্ম্ম অনিত্যতা বা উদয়লয়শীলতা ; ইহা ত্রিগুণ হইতেই ঘটে ; কারণ, ত্রিগুণ থাকিয়ে কার্য্যে ত্রিগুণের পরিস্ফুট ভাব দেখা যায়। অতএব ত্রিগুণই ব্যক্ত বা বিশ্বের কারণ। যাহা ত্রিগুণাত্মক তাহার নাম অব্যক্ত।

অর্থ :—পুরুষে ত্রিগুণ নাই সেইজন্য পুরুষে অবিবেকিত্ব নাই। ব্যক্ত এবং অব্যক্তে ত্রিগুণ আছে সেইজন্য ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়ই অবিবেকি। অতএব ত্রিগুণই অবিবেকিত্বের কাবণ। কার্য্য কারণের গুণ পায়। উদয় এবং লয়শীলতা ব্যক্তের ধর্ম্ম। উহা ত্রিগুণের অবস্থা বিশেষ। ত্রিগুণ প্রকাশ প্রবৃত্তি এবং নিরোধাত্মক। কার্য্য প্রকাশ প্রবৃত্তি এবং নিরোধের আবার্ত্তন। অতএব ব্যক্ত বা বিশ্বের মূলকারণ ত্রিগুণরূপ অব্যক্ত তাহাও সিদ্ধ হইল।

১৫

ষোড়ষ কারিকার প্রথম পাদে "কারণমস্ত্যব্যক্তং" বাক্য আছে ; উহার অর্থ—অব্যক্তং কারণম্ অস্তি, এক অব্যক্ত কারণ আছে। উক্ত পদের সহিত ১৫ কারিকার সংযোগ আছে।

ভেদানাং পরিমাণাৎ, সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণ কার্য্য বিভাগাৎ অবিভাগাদ্ বৈশ্বরূপ্যস্য ॥

পদপাঠ। ভেদানাং .. ..প্রবৃত্তেঃ চ।
কারণ..............বৈশ্বরূপ্যস্য ॥

অন্বয়—ভেদানাং পরিমাণাৎ. সমন্বয়াৎ, শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ চ, কারণ কার্য্য বিভাগাৎ, অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য (অব্যক্তং কারণম্ অস্তি)।

ভেদানাং—(৬ষ্ঠী) ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর।

পরিমানাৎ=(৫মী) বস্তুর দীর্ঘতাদিকে পরিমাণ বলে।

সমন্বয়াৎ—সম অন্বয়=সম্বন্ধ, সমান সম্বন্ধ। বলয় কঙ্কন হারাদি ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কারের সহিত সুবর্ণের সমান সম্বন্ধ। ত্রয়োবিংশতি ব্যক্ত তত্ব এবং এক অব্যক্ত তত্ত্বেব মধ্যে সুখ দুঃখ মোহাত্মক যে ত্রিগুণ সেই ত্রিগুণ দ্বারা সমন্বয় ঘটিয়াছে।

শক্তিতঃ (শক্তি+তস্) শক্তি হইতে। প্রবৃত্তি শব্দের ৫মীর একবচন প্রবৃত্তেঃ ; প্রবৃত্তি=যত্ন, উৎপত্তি, শক্তি হইতে ক্রিয়া জন্মে বলিয়া। কার্য্যের কারণে স্থিত অব্যক্ত অবস্থার নাম শক্তি।

কারণকার্য্যবিভাগাৎ, অবিভাগাৎ :—বিভাগাৎ—ভিন্ন বলিয়া, ব্যবহার করা যায় বলিয়া ; অবিভাগাৎ—অভিন্ন বলিয়া. ব্যবহার করা যায় বলিয়া। উৎপত্তি এবং ব্যক্তরূপে স্থিতি অবস্থার কার্য্যকে কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয় ; উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রলয়ের পরে কার্য্যকে কারণ হইতে অভিন্ন বলিয়া ব্যবহার কবা যায় বলিয়া।

ঐ সকল হয় বলিয়া কি হয় ? সমস্ত মূর্ত্তির এক অব্যক্ত কারণ সিদ্ধ হয়। (বিশ্বরূপ, বিশ্ব—সমস্ত, রূপ মূর্ত্তির স্বার্থে ষ্ণ্য)

অর্থ :—বিভিন্ন বস্তুর পরিমাণ এবং সমন্বয় হেতু, শক্তি হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হেতু, কার্য্য কারণের বিভিন্ন অবস্থার ভেদা-ভেদ হেতু ইহাই সিদ্ধ হয় যে, বিশ্বের নানারূপ বস্তুর এক অব্যক্ত কারণ আছে।

১৬

ষোড়শ কারিকায় অব্যক্ত সম্বন্ধে আরও বিশেষ কথা আছে।

কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।

পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি প্রতি গুণাশ্রয় বিশেষাৎ ॥

পদপাঠ। কারণম্ অস্তি অব্যক্তম্ সমুদয়াৎ চ। ইত্যাদি

অন্বয় :—অব্যক্তং কারণম অস্তি। ত্রিগুণতঃ সমুদয়াৎ চ প্রবর্ত্ততে, প্রতি প্রতি গুণাশ্রয় বিশেষাৎ, পরিণামতঃ সলিলবৎ ॥

কতকগুলি যুক্তি দ্বারা 'অব্যক্ত এক কারণ আছে' ইহা দেখাইবার জন্য ১৫ কারিকায় চেষ্টা হইয়াছে। অব্যক্ত ত্রিগুণাত্মক। অর্থাৎ তিন গুণে মিলিয়া এক প্রকৃতি; প্রকৃতির কার্য্য তিনের সম্মিলিত ভাবে কার্য্য।

ত্রিগুণতঃ=(ত্রিগুণ+তস্, ৫মী) অব্যক্তের সেই ত্রিগুণ হইতে, ত্রিগুণের কিরূপ অবস্থা ? না সমুদয়াৎ=একত্রিত অবস্থা হইতে অর্থাৎ একত্রিত ত্রিগুণ হইতে। এবংবিধ ত্রিগুণ হইতে কি হয়—না প্রবর্ত্ততে, কি প্রবর্ত্ততে, কি উৎপন্ন হয়—না-সমস্তই। ত্রিগুণ একত্রিত বা সমবেত হইয়া এক একটি কার্য্য করে। কারণ ভিন্ন হইলেও কার্য্য এক হয়। এই যে সমবেত ত্রিগুণ হইতে যে বস্তু সকলের উৎপত্তি হয়, তাহারা কি সমস্তই এক ধরণের ? না। তবে কি ? উৎপন্ন বস্তু বিভিন্ন ধরণের। কেন এমন হয় ইহার হেতু কি ? উত্তর—প্রতি প্রতি গুণাশ্রয় বিশেষাৎ।

প্রতিপ্রতি গুণাশ্রয় বিশেষাৎ—প্রতিপ্রতি—একএকটি।

গুণাশ্রয় বিশেষাৎ—আশ্রয়ী গুণের বিশিষ্টতা অনুসারে, যে গুণ মহদাদিকে আশ্রয় গ্রহণ করে সেই গুণের বিশিষ্টতা অনুসারে। সত্ত্ব গুণের লঘুতা, রজোগুণের চঞ্চলতা এবং তমোগুণের গুরুতা ইহারাই হইতেছে ঐ সকল গুণের বিশিষ্টতা। পঞ্চ তন্মাত্রের শব্দে অপর দুইগুণ বিদ্যমান থাকিলেও তথায় সত্ত্বের, রূপে রজের এবং গন্ধে তমের বিশিষ্টতা আছে। অত সূক্ষ্ম সহজে বোধগম্য হয় না। স্থূল দৃষ্টান্ত কি নাই ? আছে। কি ?

পরিণামতঃ সলিলবৎ—পরিণামে মেঘ জল তুল্য। বৃষ্টিধারা ধরায় পতিত হইয়া নানা বৃক্ষে নানা ফলে সঞ্চিত হয়। ত্রিগুণাত্মক একই জল নানা ফলে নানা বিকার বা রস ঘটায়, যথা—জামরুল, আঙ্গুর এবং ধুতুরা।

অর্থ :—ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত হইতে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হয়। ত্রিগুণ সমবেত হইয়া এক একটি কার্য্য করে। প্রত্যেক গুণের বিশেষত্ব আছে, যথা সত্ত্বের প্রকাশ, রজের প্রবৃত্তি এবং তমের স্থিতি। গুণাদির বিশেষত্ব

অনুসারে কোন কার্য্য প্রকাশপ্রধান কোন কার্য্য ক্রিয়াপ্রধান এবং কোন কার্য্য স্থিতিপ্রধান হইয়া থাকে, যেমন মেঘবারি একরূপ, আধার বশে উাহার বিবিধ রস হইয়া থাকে ; গুণের পরিণামও সেইরূপ।

—ওমার

জীবন রহস্য

(২)

মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—সত্য ; দ্বিতীয় সম্পদ সৌন্দর্য্য। সত্যের সেবা ব্যতীত যেমন অন্তরেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হয় না ; সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি ব্যতিরেকে তেমনি বহিরিন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি ঘটে না। সুতরাং জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কল্পে সত্যের যেরূপ প্রয়োজন,—সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

যাহা সুন্দর তাহাকে সকলেই ভালবাসে। পুষ্প সুন্দর তাই পুষ্পের দ্বারা লোকে দেবতার অর্চ্চনা করে। প্রজাপতি সুন্দর—তাই পুষ্প তাহাকে আনন্দে মধু বিতরণ করে। লতা সুন্দর—তাই বৃক্ষ তাহার নিবিড় বেষ্টনে আনন্দলাভ করে! প্রকৃতি সুন্দর—তাই বিরাট পুরুষ তাঁহাতে আসক্ত।

দেবতারা চির সৌন্দর্য্যপ্রিয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বর্গের বিবরণ হইতে তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। স্বর্গে অসুন্দরের স্থান নাই ;—সেখানে সকলই সুন্দর। স্থান সুন্দর, কাল সুন্দর, বস্তুতঃ সেখানে চির বসন্ত বিরাজমান সেখানকার আকাশ সুন্দর, বাতাস সুন্দর ; ফল সুন্দর, ফুল সুন্দর ; লতা সুন্দর, বৃক্ষ সুন্দর ; প্রাসাদ সুন্দর, কানন সুন্দর ; রূপ সুন্দর, গুণ সুন্দর ; পক্ষী সুন্দর, পতঙ্গ সুন্দর ; পারিজাত সুন্দর, পরিমল সুন্দর—সুন্দরের ছড়াছড়ি।

মানুষ দেবতার আদর্শে গঠিত,—ইহা মহাপুরুষের মহৎ বাক্য।

সুতরাং দেবতার ন্যায় মানুষ যে সৌন্দর্য্যপ্রিয় হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

মানব মাত্রেই সৌন্দর্য্য প্রিয় ; শুধু সৌন্দর্য্যপ্রিয় নয়, সৌন্দর্য্য-পিপাসু। শিশু চাঁদ চায় ; সূর্য্য চাহে না। সূর্য্য জ্যোতিঃস্থান্—চন্দ্র স্নিগ্ধ। সুতরাং চন্দ্র সুন্দর। শিশু তাই চাঁদ ধরিবার বাসনা করে—ফুল লইয়া ক্রীড়া করিতে চাহে—প্রজাপতি ধরিতে ছুটে। তাহাকে বলিতে হয় না কোনটি সুন্দর সে স্বভাব হইতেই তাহা জানিতে পারে কিন্তু বিপদ তাহাব সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণে নহে,—আসক্তি তে। সে শুধু দেখিয়া তৃপ্ত নহে,—সে চাহে যাহা সুন্দর তাহাকে আরও করিতে। সে চাঁদ ধরিতে যায় ; ফুল ছিঁড়িতে যায়, পতঙ্গকে পীড়া দিয়া আনন্দ অনুভব করে।

শিশু সৌন্দর্য্য লইয়া ক্রীড়া করে ; যুবক সৌন্দর্য্যকে পীড়ন করে ; প্রৌঢ় সৌন্দর্য্য ভোগ করে, বৃদ্ধ এবং সাধু সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন মাত্র। ইহার কোন্ অবস্থাটি ভাল, এবং কেন ভাল, তাহাই আমরা বুঝিবার চেষ্টা কবিব।

আমরা সকলেই সৌন্দর্য্য-প্রিয়। কিন্তু সৌন্দর্য্যের আদর্শ সকলের এক নহে। ফুল সকলই সুন্দর। কিন্তু যে ফুল আমার প্রিয়, আমার প্রিয়তমের প্রিয় সে ফুল না হইতে পারে। না হইতে পারে বলি কেন ? প্রায়ই হয় না। আমি যে ফুলটি ভালবাসি, আমার পুত্র সেটি পছন্দ করে না। আমার পুত্রের যেটি মনোরমা, আমার কন্যার সেটি ভাল লাগে না ! আমার পত্নীর সেটি মনে ধরে না। এইরূপে সৌন্দর্য্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

প্রকৃতি সুন্দর সুতরাং প্রকৃতিজাত স্থাবর, জঙ্গম, সকলই সুন্দর। কিন্তু সকল প্রকার ফুল যেমন সকল প্রকৃতির লোকের প্রিয় নহে, তদ্রূপ সকল রকম ফলও সকলের প্রিয় নহে। ফল ফুলের ন্যায় পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ ব্রততী, জীব জন্তু, এমন কি দেব দেবীও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে।

কেহ অশোক ভালবাসে, কেহ চম্পক ভালবাসে, কেহ ফল ভালবাসে, কেহ ফুল ভালবাসে, কেহ শুক ভালবাসে, কেহ শালিক ভালবাসে, কেহ কুকুর ভালবাসে, কেহ বিড়াল ভালবাসে, কেহ সিংহ ভালবাসে, কেহ শার্দ্দূল ভালবাসে। ইহাদের সকলেরই স্ব স্ব শ্রেণীজাত অল্প-বিস্তর সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের নিকট শ্রেণী বিশেষের আদর হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেব দেবীকেও সকলে সমান ভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে পারে না। কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ সৌর, কেহ গাণপত্য, কেহ নিরাকার।

এই সকল সৌন্দর্য্য-উপাসকদের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। কেহ শ্বেত গোলাপ ভালবাসে, কেহ রক্ত গোলাপ ভালবাসে, কেহ গোলাপী রং ভাল বাসে, কেহ সোণালি রং ভালবাসে, কেহ "টেরিয়ার" কুকুর ভালবাসে. কেহ "বুলডগ" ভালবাসে, কেহ শিবের শান্ত সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিতে বিভোর হইয়া যায়; কেহ বা তাঁহার রুদ্ররূপে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করে। কেহ অর্দ্ধচন্দ্রে মুগ্ধ, কেহ পূর্ণচন্দ্রে পরিতৃপ্ত।

প্রকৃতি হিসাবে রুচি বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ সকলেই সৌন্দর্য্য-প্রিয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক, অথবা একদেশদর্শী, সৌন্দর্য্য-প্রিয়তায় কোন লাভ নাই। এরূপ সৌন্দর্য্য-পিপাসা কেবল ভোগের ইন্ধন যোগায় মাত্র। ভোগের পিপাসার নিবৃত্তি হয় না, প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। প্রবৃত্তির প্রাবল্যে ন্যায়ের সীমা সঙ্কীর্ণ হইয়া অন্যায়ের প্রসার বৃদ্ধি পায়। ফলে, সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে যাইয়া আমরা পাপের পিচ্ছিল পথে পতিত হইয়া অনন্ত নিরয়গামী হই। অনন্ত নিরয়গামী বলিয়া নরকের ভয় প্রদর্শন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার বক্তব্যের তাৎপর্য্য এই যে, আমরা জীবনকে সার্থক করা দূরে থাকুক, অশেষ প্রকারে যন্ত্রনাময় করিয়া তুলি।

সৌন্দর্য্যের উপাসনা বলিয়া আমরা যে বড়াই করি তাহার মূলে আমাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য কি? আমরা কি সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিয়া তৃপ্ত হই,—না সৌন্দর্য্যের সেবা মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হই? আমরা যে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই,—তাহা অতীব তরল সৌন্দর্য্য। সেই তরল সৌন্দর্য্যে-

মুগ্ধ হইয়া আমরা তাহা আয়ত্ত করিতে চাই—ভোগ করিতে চাই। ভোগে রোগ—রোগে মৃত্যু। আমরা অমৃতের মধ্য দিয়া মৃত্যুকে টানিয়া আনি।

সৌন্দর্য্যের উপাসনা—সৌন্দর্য্যের সেবা এই আখ্যা দিয়া আমরা কি যথার্থই সৌন্দর্য্যের উপাসনা অথবা সেবা করি? প্রকৃতির সৌন্দর্য্যাপেক্ষা মহান্ অথবা গরীয়ান্ সৌন্দর্য্য আর কোথা আছে? কিন্তু আমরা কি যথার্থই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপাসনা, অথবা সেবা করিতে প্রয়াসী?

যিনি যথার্থ সৌন্দর্য্যেব উপাসনা, অথবা সেবা করিতে সক্ষম তাঁহার নিকট একটি যুবক যেরূপ পবিত্র ভাবে প্রতীয়মান হয় একটি সুন্দরী নারীও ঠিক তদ্রূপ অথবা ততোধিক, পবিত্র ভাবে প্রতীয়মান হয়। আকাশের নক্ষত্র, তড়াগেব পদ্ম, হ্রদের কুমুদিনী, নদীগর্ভস্থ শৈবাল। সমুদ্রের অতল তলস্থ শুক্তি এবং শুদ্ধান্তঃপুরের সুন্দরী তাঁহার উদার হৃদয়ে এই পবিত্র ভাব উদ্বেলিত করিয়া তুলে। সে ভাব যেমন মহান্, তেমতি গরীয়ান্। সে ভাব ভগবৎ প্রেমের একটি অতি পূত স্পন্দন মাত্র। সে ভাব সেই অনন্ত সুন্দরীর অসীম সৌন্দর্য্যের বিলাশ ব্যসনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় পরিপূরিত। সে ভাব সেই অনাদি অনন্ত অক্ষয় অব্যয় সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম সৃষ্টি নৈপুণ্যের সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তির প্রতি সসম্ভ্রম ভক্তি অর্ঘ্য। সে ভাবের এবং তোমার আমার দৈনন্দিন ভাবের মধ্যে কত প্রভেদ? তত প্রভেদ—যত প্রভেদ আকাশে ও পাতালে, তত প্রভেদ—যত প্রভেদ উত্তর মেরুতে ও দক্ষিণ মেরুতে! আমরা কত মূঢ়!

সৌন্দর্য্যোপাসনা, অথবা সৌন্দর্য্য সেবা, সহজ কথা নহে। সৌন্দর্য্যকে কেবল মাত্র সৌন্দর্য্যোপলব্ধি করিবার নিমিত্ত ঈক্ষণ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে রিপুজয়ী হইতে হয়। ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবান আমাদিগকে দশ ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টি কলা উপভোগ করিবার নিমিত্ত। কিন্তু তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যের পবিবর্ত্তে আমাদের আছে প্রবল ষড়রিপু। এই ষড়রিপু আমাদের দশ ইন্দ্রিয় কে নিগৃহীত করিয়া ভোগ করিতে চায়

কাম। কাম হইতে কামনার উৎপত্তি এবং কামিনীতে তাহার পর্য্যবসান।

একটি সুন্দর ফুল দেখিলে আমাদের প্রথম প্রথম প্রবৃত্তি হয় তাহাকে বৃন্তচ্যুত করিতে। বৃন্তচ্যুত করিয়াই আমরা তাহাকে চাই আঘ্রাণ করিতে। কিন্তু, বৃন্তচ্যুত করিয়া আমরা তাহার প্রাণনাশ করি এবং পুনঃ পুনঃ আঘ্রাণ দ্বারা আমরা তাহাকে পীড়িত করিয়া বিশীর্ণ বিবর্ণ করিয়া ফেলি, সেদিকে আমাদের আদৌ লক্ষ্য থাকে না; কেন না, আমরা তখন কামান্ধ। যখন একটি ফুল দেখিলে আমাদের লোভ এত প্রবল হয়, তখন একটি সুন্দরী নারী দেখিলে আমাদের প্রথম এবং প্রধান রিপু যে কতদূর প্রমত্ত হয় তাহা বিশদ করিয়া বুঝাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

আমরা দূর হইতে সুন্দরকে দেখিয়া, তাহাকে অবনমিত মস্তকে সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা জানাইয়া, দৃষ্টি সংযত করিতে পারি না। আমরা তাহাকে চক্ষুদ্বারা গ্রাস করিতে চাই। তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। আমরা চাই তাহাকে ধর্ষন করিয়া ভোগ করিতে। কিন্তু উপাসনা, অথবা সেবাতে, তিল মাত্র ভোগের, অথবা লোভের, স্থান নাই। উপাসনা করিতে প্রয়োজন, ভক্তি;—সেবা করিতে প্রয়োজন শ্রদ্ধা। উভয়েরই ভিত্তি কঠোর সংযম, চিত্ত সংযত, মন বিশুদ্ধ এবং হৃদয় পবিত্র তবে উপাসনার আন্তরিক ভাবে যোগদিতে পারা যায়; অথবা সেবা ব্রতে ব্রতী হওয়া যায়। যেখানে দৃষ্টি ক্রূর, চিত্ত অসংযত, মন অবিশুদ্ধ এবং হৃদয় অপবিত্র, সেখানে উপাসনা, অথবা সেবার, অবসর কোথায়?

আমাদের মধ্যে সচরাচর কয়জন এমন মহৎ লোক আছেন, যাঁহাদের দৃষ্টি এরূপ সরল, চিত্ত এমন সংযত, মন এরূপ বিশুদ্ধ, এবং হৃদয় এমন পবিত্র যে সুন্দরী ললাম-ভূতা কোন শুদ্ধান্তঃপুরচারিণীর নিকটবর্ত্তী হইলে, সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর চিরসুন্দরের প্রতি অবনমিত মস্তকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে? যদি কেহ উচ্চৈস্বরে এই প্রশ্নে দশদিক মুখরিত করিয়া তুলে, তাহা হইলে প্রতিধ্বনি তাহার কি উত্তর দিবে? সৌন্দর্য্য যেমনই হউকনা—যে মুহূর্ত্তে যাহা কিছু তোমার চক্ষে সুন্দর বলিয়া

প্রতিভাত হইবে তন্মুহূর্ত্তেই তোমার মস্তক অবনত হইয়া সেই সর্ব্ব সৌন্দর্য্যাপর চির সুন্দরের চরণ-তলে তোমার শ্রদ্ধাঞ্জলি পৌঁছাইয়া দিবে। যখন তোমার চিত্ত এইরূপ দৃঢ় হইবে, মন এইরূপ সংযত হইবে, হৃদয় এইরূপ ভক্তি পূর্ণ হইবে, তখন তুমি সৌন্দর্য্যের উপাসনা, অথবা সেবায় অধিকারী হইবে। যাবৎ কাল তোমার অন্তরেন্দ্রিয়গণ এরূপ বশীভূত না হয়, তাবৎকাল তোমার সৌন্দর্য্যোপাসনা, অথবা সৌন্দর্য্য-সেবা, করিবার অধিকার জন্মিবেনা। অন্তরেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে শিখিলে বহিরিন্দ্রিয়গণকে আয়ত করিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না। এই জন্য ভাবুক কবি বড় দুঃখে গাহিয়াছিলেন—

মনেরে না বুঝাইয়ে,
নয়নেরে দোষ কেন,
আঁখি কি মজাতে পারে
না হলে মনো মিলন ?

মনকে সংযত করিতে পারিলে, আঁখি আপনা হইতেই সংযত হইবে। মন অন্তরেন্দ্রিয়—আঁখি বহিরিন্দ্রিয়। অন্তরেন্দ্রিয় প্রভু—বহিরিন্দ্রিয় ভৃত্য মাত্র।

আমরা সৌন্দর্য্য বলিতে সাধারণতঃ বুঝি রূপ। সে রূপ চিরসুন্দরের রূপ নহে—নারীর রূপ। সেরূপ ক্ষণস্থায়ী—ক্ষণ ভঙ্গুর—জলবুদ্-বুদের ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই রূপকেই আমি পূর্ব্বে তরল সৌন্দর্য্য আখ্যা দিয়াছি।

হায়! রমণীর রূপ! পতঙ্গ যেরূপ অনলের রূপ-জ্যোতিঃতে আত্ম-হারা হইয়া জীবনাহুতি দেয়। পতঙ্গ-বৃত্ত মনুষ্যও তেমনি রমনীর তুচ্ছ রূপে আকৃষ্ট হইয়া আপনার মৃত্যুর দ্বার আপনি উদ্ঘাটিত করিয়া লয়। ভ্রান্ত আমরা—মূর্খ আমরা; আমরা বুঝিনা যে শক্তির সংযোগে জন্ম, সেই শক্তির অপব্যবহারে মৃত্যু; অবস্থা ভেদে—অমৃতও বিষ, বিষও অমৃত!

রমণীর রূপে সৌন্দর্য্য আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে তরল-সৌন্দর্য্য তাহাকে গরল-সৌন্দর্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভগবান শ্রীরাম

চন্দ্র সীতা বিরহে কাতর; দুরাত্মা দশানন কর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা। মহর্ষি অগস্ত্য এই সংবাদ অবগত হইয়া শ্রীরাম চন্দ্রের নিকট আগমন পূর্ব্বক বলিলেন :—

যা তন্বঙ্গী মৃদুর্ব্বালা মলপিতাত্মিকা জড়া।
সা ন পশ্যতি যৎকিঞ্চিন্ন শৃণোতি ন জিঘ্রতি;
চর্ম্মমাত্রা তনুস্তস্যা বুদ্ধা বীক্ষস্ব রাঘব।
যা প্রাণাদধিকা সৈব হন্ত তে স্যাদ ঘৃণাস্পদম্॥

হে রাঘব, যাহাকে কৃশাঙ্গী কোমল-হৃদয়া বালা বলিয়া বিবেচনা কর, সেই রমণী মলপিণ্ডময়ী জড়াত্মিকা; সে কিছুই দর্শন করেনা। সে কেবল চর্ম্মময় দেহ মাত্র ধারণ করিতেছে। বুদ্ধি দ্বারা এই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, যে রমণীকে তুমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, সে তোমার ঘৃণাস্পদ।

পাঠক, একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখুন,—কে, কাহাকে, কাহার সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছে। বক্তা মহর্ষি অগস্ত; শ্রোতা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র এবং বক্তব্য বিষয়ী-ভূতা সতী শিরোমনি সীতা! যখন ত্রেতাযুগে সীতার ন্যায় সাধ্বী রমণীর প্রতি এই কথা প্রযুক্ত হইয়াছিল; তখন এই ঘোর কলিযুগে কাল স্বরূপিনী কামিনীগণের প্রতি ইহা কত অধিক পরিমাণে প্রযুজ্য। যে নারীর বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, যে কৃশাঙ্গী, যাহার পীনোন্নত পয়োধর ভারে মধ্যমাঙ্গ অবনমিত, যাহার কটী ক্ষীণ, নিতম্ব বিপুল বিস্তৃত এবং পদদ্বয় স্বভাবতঃ রক্তাভ, যাহার মুখমণ্ডলের তুলনা পূর্ণ-চন্দ্র. যাহার ওষ্ঠদ্বয় বিম্ববর্ণ সদৃশ, যাহার নয়নদ্বয় নীলপদ্ম তুল্য, যাহার কণ্ঠস্বর মত্ত কোকিলের কুজন ধ্বনিবৎ সুমিষ্ট এবং যিনি মরাল, অথবা মত্ত হস্তীর ন্যায় গমন শীলা—সেই নারী মল পিণ্ডময়ী জড়াত্মিকা! হায় রমণীর রূপ! তোমার সৌন্দর্য্য কোথায়? অমর কবির অমৃত প্রসবিণী বাণী স্মরণ কর;—সত্য—অতি সত্য, সে বাণী :—

এই নর দেহ জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় শৃগাল কুকুরে,

অথবা চিতাভস্ম উড়ায় পবনে ;

এই নারী—এরও এই পরিণাম !

মহর্ষি অগস্তও শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

দেহোঽপি মলপিণ্ডোঽয়ং মর্ত্ত্য জীবো জড়াত্মকা।

দহ্যতে বহ্নিনা কাষ্ঠৈঃ শিবাদ্যৈর্ভক্ষতেঽপি বা।

তথাপি নৈব জানাস্তি বিরহে তস্যকা ব্যথা।

জীবন বিনষ্ট হইলে, এই মলপিণ্ডময় জড়াত্মকা দেহ কাষ্ঠাগ্নি সংযোগে দগ্ধীভূত, অথবা শৃগালাদি জীব কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াও সুখ দুঃখাদি অনুভব করিতে পারে না, সুতরাং এই জড় দেহ বিরহে ব্যথা কি ?

ব্যথা কি তাহা মহর্ষি অগস্তের বুঝিবার শক্তি ছিল কি না জানি না ; কিন্তু ভগবান রামচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ রামানন্দ স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী, শৈবলিনীকে আমি কত ভাল বাসিতাম।" 'চন্দ্রশেখরের" প্রতাপাপেক্ষা চন্দ্রশেখর-তুল্য প্রতাপবান যে পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র, তিনি মহর্ষি অগস্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

মুনে দেহস্য নো দুঃখং নৈব চেৎ পরমাত্মনঃ।

সীতা বিয়োগ দুঃখাগ্নির্মাং ভস্মী কুরুতে কথম্ ॥

যদি দেহের ও পরমাত্মার দুঃখ-সম্বন্ধ না থাকে, তবে সীতা বিয়োগ জনিত ব্যথা আমাকে ভস্মীভূত করিতেছে কেন ?

মহর্ষি অগস্ত শ্রীরামচন্দ্রকে মায়াবাদ বুঝাইলেন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, স্বয়ং পূর্ণজ্ঞানী নারায়ণ নর দেহ ধারণপূর্ব্বক মনুষ্য ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, পূর্ণ চৈতন্যবান হইতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, মুনি, আপনি যাহা বলিলেন সকলই সত্য, কিন্তু মদ্য যেমন অজ্ঞানবান ব্রাহ্মণকেও মত্ত করে, তদ্রূপ প্রারব্ধাদৃষ্ট আমাকে দিবারাত্র পীড়া দিতেছে। যখন স্বয়ং ভগবানরূপী মানবের এই প্রকার আশক্তি, তখন সামান্য মানব আমরা,—আমরা যে রমণীর রূপ বহ্নিতে জীবনাহুতি দিয়া আত্মবিনাশ সাধন করিব, তাহাতে আর বিস্ময়ের অবকাশ কি ?

রূপ-মোহ স্বভাবসুলভ। স্বভাব-সুলভ বলিয়াই তাহাকে কঠোরতা অবলম্বন পূর্ব্বক ত্যাগ করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে যে রূপ—বিশেষতঃ রমণীর রূপ তরল সৌন্দর্য্য ,—শ্রেষ্ট সৌন্দর্য্য নহে। যিনি যথার্থ সৌন্দর্য্যো-পাসক তিনি তরল সৌন্দর্য্যকেও অপ্রীতির চক্ষে দেখিবেন না। তরল সৌন্দর্য্যও—সৌন্দর্য্য ; সুতরাং তাহাও উপভোগ্য। কিন্তু উপভোগ—ভোগ নহে। ভোগ ব্যসন—উপভোগ ব্যসন নহে। ভোগে অপচয়—উপভোগে বিমল আনন্দ।

অনাসক্ত হইয়া আনন্দ অনুভব করিবার নাম উপভোগ। ভোগ তাহা অপেক্ষা অতীব নিকৃষ্ট। ভোগে আসক্তি—আসক্তি মৃত্যুর নিদান।

পূর্ণচন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত বর্ষা পরিপুষ্ট দুকূলপ্লাবি জাহ্নবী বক্ষে মৃদু বৃষ্টি বিক্ষোভ দেখিলে হৃদয়ে যে আনন্দ রসের সঞ্চার হয়,—যে আনন্দে হৃদয় ভক্তি ভাবাবনত হইয়া শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির কলা কৌশলে মুগ্ধ হইয়া অপার্থিব সুখানুভব করে,—সুন্দরী রমণীর মুখপদ্ম এবং বিদ্যুদ্দাম সদৃশ দেহকান্তি নিরীক্ষণ করিলেও আমাদের হৃদয়ে সেইরূপ আনন্দ রসের সঞ্চার হওয়া উচিৎ। সদ্য ক্ষান্ত বর্ষণ সিগ্ধ বর্ষাপরাহ্নে রবিকরোদ্ভাসিত দিগ্‌বলয়ে ইন্দ্রধনু দর্শন করিয়া শিখী যেমন অনাসক্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করে, আমরা কি কোন রমণীর বিচিত্র বেশভূষা এবং অনিন্দনীয় অঙ্গ সৌষ্ঠব দেখিয়া তদ্রূপ উৎফুল্ল হই ? চিত্ত-জয়ী, রিপুজয়ী ঊর্দ্ধরেতা ব্যতীত কে ইহার সদুত্তর দিতে পারেন ?

রমণীর রূপ প্রধানতঃ দুই প্রকার—তরল ও গাঢ়। তরুণীর রূপ তরল—প্রসূতির রূপ গাঢ়। প্রসূতির রূপে যে সৌন্দর্য্য—সে সৌন্দর্য্য মাতৃত্বের। নারীত্বের পরমোৎকর্ষ এই মাতৃত্বে। কিন্তু, অভিশপ্ত আমরা—আমরা রমণীর যে সৌন্দর্য্য দেখিতে প্রলুব্ধ হই এবং দেখিয়া বিহ্বল হই—উদ্‌ভ্রান্ত হই—সে সৌন্দর্য্য, প্রসূতির স্নিগ্ধ গাঢ় সৌন্দর্য্য নহে, —তরুণীর তরল সৌন্দর্য্য। আধুনিক কবি এবং চিত্রকর এই তরল-গরল সৌন্দর্য্যের উপাসক। তাহার তীব্র প্রমাণ নব্য সম্প্রদায়ের কতিপয় চিত্রশিল্পীর "রূপ" নামক চিত্র-পঞ্জিকা। ত্রস্তবসনা, স্খলিতবসনা, অর্দ্ধাবৃতা, অথবা বিবসনা যুবতীর ভিন্ন ভিন্ন ভাবের মোহমদিরাময় অভিব্যক্তি

অধুনা আমাদের মার্জ্জিত শিল্পরুচির প্রকৃষ্ট—না অপকৃষ্ট পরিচয়? হায়, কাল!!

এই যে নব নব ভাবের নিত্য নূতন শিল্পের ব্যভিচার—এই যে নারীত্বের—মাতৃত্বের—অমর্য্যাদা, ইহার গতি কে রোধ করিবে? নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবান না হইলে—তা হউক সে তরুণী অথবা প্রসূতি—আমাদের জাতীয় পুনরভ্যুত্থান সুদূর পরাহত। নারীর প্রতি ভক্তিমান না হইলে—তাহার মাতৃত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ না রাখিলে, আমাদের যুবকগণের হৃদয়ে জাগিবে রূপ লালসা। লালসা এবং উপাসনায় কত প্রভেদ! সৌন্দর্য্যোকামনায়, অথবা সৌন্দর্য্য সেবায়, লালসার স্থান কোথায়? হে, নবীন শিল্পী—হে নবীন ভাস্কর, নারীত্বের সৌন্দর্য্য যে মাতৃত্বে—তাহা তুমি দেখাইতে এত কুণ্ঠিত কেন! যিশু ক্রোড়ে যিশুমাতা এবং গণেশ জননীর ছবিতে কি সৌন্দর্য্য নাই? সত্য বটে, তাহাতে তরল সৌন্দর্য্যের লেশ মাত্র নাই। কিন্তু, তাহাতে যে গাম্ভীর্য্যের—স্নেহের, করুণার পবিত্র সৌন্দর্য্য আছে তাহা শকুন্তলা ক্রোড়ে মেনকাতে আছে কি?

চিত্রকলার উদ্দেশ্য,—কান্ত কবির মধুর পদাবলীর ন্যায়,—সত্যের এবং সৌন্দর্য্যের বিশদ বিকাশ। যে মাতৃত্বের সৌন্দর্য্য সাধারণ দৃষ্টিতে বোধগম্য হয় না, চিত্রকর তাহা তুলির কোমল স্পর্শে পরিস্ফুট করিয়া নির্ব্বোধেরও বোধগম্য করিয়া দেন। এই ত শিল্পীর কাজ। যাহা সৎ সত্য এবং সুন্দর তাহাকে সহজে নর নারীর হৃদয় ফলকে লেখনী অথবা তুলির সাহায্যে প্রস্ফুটিত করিয়া দেওয়া হইতেছে কবি এবং শিল্পীর ব্রত। অতি মহৎ সে ব্রত—তাহার ব্যাভিচার ঘোর পাপ।

যে তরল সৌন্দর্য্যের মোহ-মদিরায় নিত্য শত শত নর নারী অনলাভিমুখিন পতঙ্গের ন্যায় আত্মাহুতি প্রদান করিতেছে, তাহার বিষময় উদ্দাম উদ্রেক করা কি পাপ নহে? এ যে সৌন্দর্য্যের বিকাশের নামে সৌন্দর্য্যের অবমাননা। ক্ষান্ত হও, চিন্তা কর—ভাবিয়া দেখ, বিবসনা রমণীর ক্ষণ বিধ্বংসী নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখাইয়া তোমার আমার পুত্র কন্যার মনে সৌন্দর্য্যের কিরূপ মূর্ত্তি অঙ্কিত হইবে। পঞ্চবিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে

মাতৃত্বের প্রতি আমাদের যে গভীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল—আজ সভ্যতার প্রসারের সহিত চিত্রকলার উত্তরোত্তর তথা-কথিত উন্নতি হেতু আমাদের সন্তান-সন্ততিগণের মনে তাহার কতটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে! আমরা স্ত্রীকে এখনও সন্তানের জননী বলিয়া শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকারিগণ, নগ্ন সৌন্দর্য্যের বিভ্রমের প্রভাবে, তাহাদের গৃহলক্ষ্মীগণকে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সহায়মাত্র মনে করিলে কি আমাদের বিস্মিত হওয়া সমীচীন হইবে?

সকলেই সৌন্দর্য্য প্রিয়। যে নিজে সুন্দর সে সৌন্দর্য্য-প্রিয় হইবে তাহাতে আর বিস্ময় কি? কিন্তু সৌন্দর্য্যের এমনই প্রভাব এবং মহিমা যে, যে স্বয়ং অতি কুৎসিৎ সেও সৌন্দর্য্যলাভ এবং সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার নিমিত্ত উন্মাদ। মসীবর্ণ পুরুষ যেমন গৌরাঙ্গী বনিতা লাভ করিতে ইচ্ছুক, ঘোরা কৃষ্ণা কুমারীও তেমনি কষিত-কাঞ্চন বর্ণ স্বামী লাভ করিতে প্রয়াসী। সুন্দর এবং সুন্দরী সুন্দরী ও সুন্দর লাভে যতটুকু লালায়িত, অসুন্দর এবং অসুন্দরী সুন্দরী ও সুন্দর লাভ করিতে তদপেক্ষা অনেক অধিক লালায়িত। যাহার যেটির অভাব, সে সেইটিই অধিক পরিমাণে আকাঙ্ক্ষা করে। যাহার নিজের রূপ নাই, সে রূপবান অথবা রূপবতী স্বামী অথবা ভার্য্যা, পুত্র অথবা কন্যা লাভ করিতে চায়;—কারণ ভোগের বাসনা সুন্দর, অসুন্দর, সুন্দরী, অসুন্দরী সকলেরই তুল্য প্রবল। সুতরাং আমাদের সকলেরই আন্তরিক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যে কাহারও মনে সৌন্দর্য্য-বিভ্রম না ঘটে।

সৌন্দর্য্য কি? অঙ্গ সৌষ্ঠবই কি সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা? আমরা সচরাচর যাহাকে কুৎসিৎ বলি তাহার কি কোন সৌন্দর্য্য নাই? কোকিলের বর্ণ কাল; কিন্তু তাহার কি কোন সৌন্দর্য্য নাই? সৌন্দর্য্য প্রধানতঃ দুই প্রকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ—রূপজ ও গুণজ। রূপজ অপেক্ষা গুণজ সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠতর, কিন্তু তাই বলিয়া কি রূপজ সৌন্দর্য্যকে আমরা উপেক্ষা করিব তাহা নহে। সৌন্দর্য্য যেখানে যে রূপেই পরিস্ফুট হউক না কেন—সর্ব্বাবস্থাতেই তাহা বরণীয়। তবে বিপদ এই যে, রূপজ সৌন্দর্য্যে আমরা সহসা আকৃষ্ট এবং আসক্ত হই; কিন্তু গুণজ

সৌন্দর্য্যে সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। রূপজ সৌন্দর্য্যের মোহ ক্ষণ-স্থায়ী,—গুণজ সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ চিরস্থায়ী। একে বিপদ, অন্তে সম্পদ।

যাহাতে বিপদ তাহা হইতে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যাহাতে সম্পদ তাহাতে লাভবান হইবার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। গোলাপ ফুল দেখিতে যেমন সুন্দর, গুণেও, অর্থাৎ গন্ধেও, তেমনি সুন্দর। পলাশ দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু তাহাতে গন্ধের লেশমাত্র নাই। আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি এরূপ নিরপেক্ষ হওয়া উচিত যে আমরা গোলাপের উভয় গুণ যেমন আন্তরিকতার সহিত উপভোগ করিব, পলাশের এক মাত্র গুণও তদ্রূপ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিব। উভয়েই সেই একই সৃষ্টিকর্ত্তার মহান বিধানানুযায়ী সৃষ্ট হইয়াছে, উভয়েরই উপকারিতা আছে, সুতরাং উভয়েরই সৌন্দর্য্য আমাদের তুল্য উপভোগ্য। একের মর্য্যাদা এবং অন্যের অমর্য্যাদা যেমন অশোভন, তেমনি অসমীচীন। কিন্তু উভয়ের সৌন্দর্য্যকে তুল্য রূপে উপভোগ করিতে হইলে অনাসক্ত হইতে হইবে। একের প্রতি আসক্ত এবং অন্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলে সেই মঙ্গলময় সর্ব্বনিয়ন্তার সৃষ্টি কৌশলের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে। শুধু তাহাই নহে, নিজের বিচার বুদ্ধির ও অপরিপক্বতা প্রদর্শিত হইবে।

আমাদের দেশে আজকাল দুই শ্রেণীর চিত্রকর আছেন। এক শ্রেণীর চিত্রকর বিলাতী পদ্ধতি অনুযায়ী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীর মোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দর্শকের চিত্তবিভ্রম উপস্থিত করেন। তাঁহারা দেখান দৈহিক রূপ—খোলস মাত্র। আর এক শ্রেণীর চিত্রকর ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির পক্ষপাতী। তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করেন—ভাব—অন্তরের রূপ, অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য। উভয়েরই উদ্দেশ্য—সৌন্দর্য্যের বিকাশ। কিন্তু, ফলে এই হয় যে, প্রথমোক্ত শ্রেণীর চিত্রশিল্পী প্রতিফলিত করেন অনিত্য সৌন্দর্য্য এবং শেষোক্ত সম্প্রদায় ফুটাইয়া তোলেন চিরন্তন সত্য—নিত্য সৌন্দর্য্য। আমাদের নিকট উভয়েই বরেণ্য। আমরা উভয়কেই চাই,—সুতরাং উভয়ের

শিল্প চাতুর্য্যের কলা কৌশল বুঝিবার বুদ্ধি বিবেচনা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আমরা কাহাকেও বর্জ্জন করিব না—সকলকেই গ্রহণ করিব। কিন্তু সকলকেই গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের হইতে হইবে অনাসক্ত। এবং সেইজন্য আমাদের শিক্ষাপ্রণালীকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যে আমরা রূপের অভিব্যক্তি কেমন অনাসক্ত, অথচ আন্তরিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ভাবের অভিব্যক্তিও তেমনি সহৃদয়তার সহিত উপভোগ করিতে পারি।

দুঃখের বিষয় এই যে বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমাদের আধুনিক শিক্ষা এমনই সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সংহত যে শিক্ষা শেষ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা স্বাভাবিক শিক্ষা প্রবৃত্তিকে এমন অযথা খর্ব্ব করিয়া ফেলি যে স্বভাবের নিকট—প্রকৃতির নিকট আমাদের যে যথেষ্ট শিক্ষা করিবার উপকরণ রহিয়াছে তাহা আমরা একেবারেই বিস্মৃত হই। আমরা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য—বিজ্ঞানের রহস্য—ইতিহাসেব ঘটনাবহুল বৈচিত্র্য—গণিতের জটিলতা যেরূপ আগ্রহের সহিত অনুশীলন করি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাহার শতাংশের একাংশের পরিমাণও শ্রদ্ধা সহকারে বুঝিতে চেষ্টা করি না। অথচ সাহিত্য বল, বিজ্ঞান বল, ইতিহাস বল, গণিত বল, ধর্ম্ম বল, রাজনীতি বল—এ সকলই সেই বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের রীতি নীতি ও রূপ লইয়া রচিত।

সৃষ্টির সৌন্দর্য্য এবং সৃষ্ট পদার্থের কলা কৌশল বর্ণনা করিবার জন্য সাহিত্যের আবশ্যক—বিজ্ঞানের আদর—ইতিহাসের প্রয়োজন এবং গণিতের গণনারম্ভ। তথাপি আমাদের বিদ্যামন্দিরে বালকবালিকাগণকে প্রকৃতির লীলা বুঝাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। তাহার ফল এই হয় যে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসাস্থল, আমাদের বংশধরগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াও বলিতে পারেন না :—

চিনি জন্মে ইক্ষুদণ্ডে মূলে কিংবা ফলে,
তুষ হইতে উৎপন্ন তণ্ডুল কি ফলে?

আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে কয়জন বলিতে পারেন কেন

চন্দ্রের দিন দিন হ্রাস বৃদ্ধি হয়? শতকরা কয়জন উপাধিধারী যুবক বলিতে পারেন কেন একপক্ষ কৃষ্ণ এবং অপর পক্ষ শুক্ল?

ভগবানের কৃপাবলে বালকবালিকাগণ স্বভাবতঃ অনুসন্ধিৎসু। কেহ কেহ এরূপ অনুসন্ধিৎসু যে তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে ধমক দিয়া নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। তাহারা প্রত্যেক দৃষ্ট চেতন, অচেতন অথবা উদ্ভিদ্ পদার্থের নিদান অনুসন্ধান করে। আমরা তাহাদের জ্ঞান পিপাসা তৃপ্ত করিবার জন্য তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেই। সেখানে তাহাদের স্বাভাবিক সতেজ বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক প্রস্ফুরিত হওয়া দূরে থাকুক, স্বল্প জ্ঞানাভিমানী গুরুমহাশয়গণের বেত্র দণ্ডের ঘন ঘন আস্ফালনে অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহাদের শিক্ষার প্রবৃত্তি—নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করিবার অভিলাষ অথবা কোন জটিল প্রশ্নের সমাধান করিবার আগ্রহ ক্রমে ক্রমে খর্ব্ব হইয়া অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়! কি গভীর পরিতাপের বিষয়! কি দুর্দ্দৈব!

সুদুর্লভ মানব জন্মলাভ করিয়া আমরা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে বিপুল সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই—তাহা জ্ঞানের প্রথম বিকাশ হইতে যদি আমরা অনুভব এবং উপভোগ করিতে শিক্ষা পাই;—তাহা হইলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা যথার্থ সৌন্দর্য্যের উপাসনা এবং সেবা করিতে সক্ষম হই। এই ভূমণ্ডলে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—বৃক্ষ, লতা, গুল্মে,—পত্রে, পুষ্পে, ফলে—শশী সূর্য্য তারকায়—নদ নদীতে, হ্রদে, তড়াগে; উপসাগরে, সাগরে; পাহাড়ে, পর্ব্বতে; অধিত্যকায়, উপত্যকায়; কাননে, কন্দরে; গ্রহে, উপগ্রহে; পশু, পক্ষীতে; কীট, পতঙ্গে; মানব মানবীতে বিবিধ, বিচিত্র, বিপুল সৌন্দর্য্য প্রকটিত। চক্ষু থাকিতেও আমরা সকল সময় এ সকল সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি না। মৃগ যেমন মৃগনাভির গন্ধে উন্মত্তবৎ ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। ফণী যেমন স্বশীর্ষস্থ মণির ঔজ্জ্বল্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করে—অথচ জানিতে পারে না বুঝিতে পারে না কোথা হইতে সেই প্রাণোন্মাদকারী গন্ধ অথবা দীপ্তির আবির্ভাব আমরাও তদ্রূপ এতাদৃশ অন্ধ যে ভগবান্ প্রদত্ত

দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু থাকিতেও বুঝিতে পারি না, জানিতে পারি না—দেখিতে পারি না—কোথা হইতে সৌন্দর্য্যের বিকাশ; এবং কিরূপে তাহার তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারা যায়। কি দুরদৃষ্ট!

একজন মহানুভব ব্যক্তি যিনি এই বিশ্বের সৌন্দর্য্য যথার্থ অনুভব করিয়াছিলেন, তিনি গাইয়াছেন :—

এই বিশ্ব মাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দি'য়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ;
বিবিধ বরণে, বিভূষিত করে,
তার উপর তোমার নামটি লিখেছ।
পত্র পুষ্প ফলে, রেখেছ যে সব রেখা,
বেথা নয়ত তোমার দয়াল নাম লেখা,
সুন্দব নামটি বিহঙ্গেব অঙ্গে আঁকা,
প্রেমানন্দ নামটি নয়নে লিখেছ।

এই স্বভাবের প্রগাঢ় প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে নির্ব্বিঘ্নে উপভোগ করিবার নিমিত্ত পুরাকালে মুনি ঋষিগণ পূর্ত্তকর্ম্ম বিভূষিত নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির লীলা নিকেতন নির্জ্জন কাননে আশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক পরমানন্দে পরমার্থ চিন্তা করিতেন। শান্ত, স্নিগ্ধ, সৌম্য, শান্তিপ্রদ বিরাট বিশাল বিপুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহারা পরাৎপর প্রকৃতি পুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। হায়! কোথায় সে তপোবন?

প্রভাতের সূর্য্যোদয়—মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ড ময়ূখ মালা—সায়াহ্নের সূর্য্যাস্ত—সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সমীরণ—রাত্রির রজত তারকা খচিত নীল নভোমণ্ডল—নিশীথের নিস্তব্ধতা—যামিনী অবসানে দিঙ্‌মণ্ডলের শিথিলতা ও শীতলতা—ইহাতে কত সৌন্দর্য্য আছে তাহা আমাদের মধ্যে কয়জন ভাগ্যবানের দেখিবার—বুঝিবার এবং হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর ঘটে? ব্রীড়ানম্র পুষ্পিত ব্রততী; ফল ভারাবনত সবুজ পত্র বিমণ্ডিত তরু; দীর্ঘ, ঋজু উচ্চশীর্ষ মহীরুহ স্বচ্ছন্দ জাত কানন; উন্মুক্ত প্রান্তর; শ্যামল সমতল; শস্যপূর্ণ হরিৎ ক্ষেত্র—ইহার কোনটি না নয়নানন্দকর সৌন্দর্য্যে সমুদ্ভাসিত? মৃদু কল্লোলে মুখরিত ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী; বর্ষা পরিপুষ্ট দুকূল

প্লাবী নদ, নদী; মৃদু গুঞ্জন গীতি নিরত শুভ্র গিরি নির্ঝরিণী; উত্তাল তরঙ্গ সমাকুল, অনন্ত বিস্তৃত, অতলস্পর্শ সমুদ্র—ইহারা প্রত্যেকেই স্নিগ্ধ গম্ভীর সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন। কিন্তু, কয়জন আমাদের মধ্যে এমন ভাগ্যবান আছেন যাঁহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, অথবা সূর্য্যাস্তের পরে, নদীতীরে অথবা সমুদ্র সৈকতে বালু শয্যায় উপবেশন করিয়া ইহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করেন? আমাদের মধ্যে কয়জন এমন সদাশয় ব্যক্তি আছেন যাঁহারা সায়ংকালে বায়ু সেবনার্থ নিস্ক্রান্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে অথবা গিরিপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া উদার উন্মুক্ত আকাশের নক্ষত্র খচিত নীল সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া পুলক প্রকম্পিত হৃদয়ে সেই মহামহিমান্বিত, মহিমার্ণব ভবকর্ণধারের শ্রীচরণ তলে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া তদ্গত চিত্তে, তন্নিবিষ্ট হইয়া, ধ্যান নিমগ্ন হইতে পারেন? প্রভাতের পক্ষী কাকলী, সায়াহ্নের বিহগ কুজন—নিশীথের চিত্ত বিহ্বলকারী কুহুরব—অথবা মধ্যাহ্নের "চোখ্ গেল" পাখীর আর্ত্তস্বর—ইহাতে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা কয়জন শ্রদ্ধাবানের 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে পারে'?

বিবিধ বিচিত্র সৌন্দর্য্যে আমরা পরিবেষ্টিত। আমাদিগকে দেখিতে হইবে,—শিখিতে হইবে এবং বুঝিতে হইবে—কোন বস্তু বা খেচর, জলচর উভচর—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ—যে কোন প্রকার চেতন কিংবা অচেতন পদার্থ হউক না কেন সকলেরই কিছু না কিছু অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য আছে। এই চিরসুন্দরের বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অসুন্দর কিছুই নাই। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই কিছু না কিছু অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য আছে। যিনি সেই সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া উপভোগ করিতে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ। কিন্তু, সকলেই মহাপুরুষ হইতে পারে না;—মহাপুরুষ হওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

যে সৌন্দর্য্য অনুধাবন করিয়া উপভোগ করিতে হয়, তাহা সকলের প্রণিধান যোগ্য নহে। তবে যাঁহার ভগবানের সৌন্দর্য্যে বিশ্বাস আছে—তিনি তৎসৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই যে কিছু না কিছু স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে তাহা অনুমান করিতে পারেন। যাঁহারা ততটুকু ক্লেশ স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা যেখানে সৌন্দর্য্য স্বতঃ প্রকাশমান—

সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রীতিমান ও শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন। যন্ত্রের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে কাহাকেও ক্লেশ পাইতে হয় না—এবং সে সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া কেহ আত্মহারা হয়েন না; সুতরাং যন্ত্রের সৌন্দর্য্যে বিপদ নাই। কিন্তু এমন অনেক সৌন্দর্য্য আছে যাহা দেখিলে লোভ হয়—লোভ লালসায়ে পর্য্যবসিত হয় এবং বাসনা অচিরে ব্যসনে পরিণত হইয়া লঘুচিত্ত লোকের চিত্ত বিভ্রম ঘটায়। চিত্ত বিভ্রম হইতে মোহ সঞ্জাত হয় এবং এই মোহ আমাদিগকে পাপের পিচ্ছিল পথে লইয়া যায়। উদার, মহান্ অথবা গাঢ় যে সৌন্দর্য্য তাহাতে বিপদ নাই—বিপদ তরল সৌন্দর্য্যে। তরল সৌন্দর্য্য আমাদিগকে সহজে প্রলুব্ধ করে এবং ইহার মোহিনী শক্তি এরূপ প্রবল যে দৃঢ় চিত্ত লোক ব্যতীত কেহই তদ্বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম নহেন। এইজন্য আমি পূর্ব্বে চিত্তজয়ে এবং রিপুজয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার কথা বলিতেছি।

সৌন্দর্য্য দেবভোগ্য। সৌন্দর্য্য দেখিয়া অন্তরে নন্দনের বিকাশ হওয়া উচিত। কিন্তু সচরাচর হয় কি? হয় নরকের বিকাশ। এই নরককে সর্ব্বদা সংযত চিত্তে দূরে রাখিতে হইবে।

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। যাঁহাদের দৃষ্টি অতি স্থূল, তাঁহারা শ্রীমতীর কৃষ্ণ প্রীতিতে রূপজ মোহের বিকাশ অনুভব করিয়া প্রেমানন্দানুভবে বঞ্চিত হয়েন। রাধিকা কৃষ্ণের দৈহিক রূপে মুগ্ধ ছিলেন না। তিনি কৃষ্ণের যে গাঢ় সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য ছিল, তাহাতেই আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন। তাই মেঘ দেখিলে, যমুনার কাল জল দেখিলে, তমালের শাখাপত্র দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রীতি জাগিয়া উঠিত। সে যে কি গভীর নিঃস্বার্থ অনাসক্ত প্রীতি তাহা বুঝিতে পারা যায় তাঁহার কাতর প্রার্থনায়ঃ—

মরিলে তুলিয়া রেখ তমালের ডালে।

তমালের সৌন্দর্য্যের সহিত কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যের সাদৃশ্য আছে সুতরাং তমালের সংস্পর্শেই কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যোনুভূতির সদৃশ তৃপ্তি নিশ্চিত। ইহাতে কাম, অথবা বাসনার, লেশ মাত্র তাড়না নাই, আছে অনাবিল

সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য-প্রীতি, গভীর এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভক্তি। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যের যথার্থ উপাসনা করিতেন, সেবাও করিতেন।

যদি শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-প্রীতি রূপজ সৌন্দর্য্যে পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণের স্বরূপ ব্যতীত তাঁহার তৃপ্ত হইতে পারিত না। কিন্তু তাহা নহে। শ্রীরাধিকার এ সৌন্দর্য্য-প্রীতি স্বভাবের সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ। সে সৌন্দর্য্য যেমন শ্রীকৃষ্ণের বর্ণে ছিল, তেমনি মেঘে ছিল, যমুনার জলে ছিল, তমালের শাখা প্রশাখায় ছিল; তাই শ্রীরাধিকার ভাব :—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন-তারা।

যদি কৃষ্ণের শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রতি শ্রীমতীর আসক্তি জন্মিত, তাহা হইলে, মৃত্যুব পরেও সে সৌন্দর্য্যের প্রতি এত আকর্ষণ থাকিত না। কিন্তু, এ সৌন্দর্য্য প্রীতি মৃত্যুব পর পর্য্যন্তও স্থায়ী। আমাদের প্রবৃত্তির প্রতাপ মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত; সুতরাং যে প্রীতি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থায়ী তাহা প্রবৃত্তিজাত হইতে পারে। কিন্তু, যে প্রীতি মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবার স্পর্দ্ধা রাখে—সে প্রীতি সৌন্দর্য্যের প্রতি অনাবিল আকর্ষণ—তাহাতে বাসনার লেশ মাত্র উদ্বেগ নাই।

বাসনা শূন্য যে সৌন্দর্য্য প্রীতি তাহাই যথার্থ সৌন্দর্য্যোপাসনা। বাসনা শূন্য না হইলে সৌন্দর্য্যের সেবা করা যায় না। বাসনা লইয়া সৌন্দর্য্যের সংস্পর্শে আসিলে ভোগ করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়। ভোগে সেবা অথবা উপাসনা, হইতে পারে না। বাসনা পূর্ণ হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের সেবা, অথবা উপাসনা, করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রই সৌন্দর্য্য প্রিয়, সুন্দরকে যে প্রীতির চক্ষে না দেখে—সে পাষাণ তুল্য কঠিন। এরূপ হৃদয়হীন ব্যক্তির সংস্পর্শে না আসাই মঙ্গল।

ভগবান আমাদিগকে ইন্দ্রিয় দিয়াছেন অনুশীলন করিবার নিমিত্ত। যদি তাহাদের কোন প্রয়োজন না থাকিত, তাহা হইলে তিনি ঐ

সকল ইন্দ্রিয় দিতেন না। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব এবং উপভোগ করিবার নিমিত্ত করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়াছেন। চক্ষুদ্বারা রূপ, জিহ্বাদ্বারা রস, নাসিকাদ্বারা গন্ধ, কর্ণদ্বারা শব্দ এবং ত্বকদ্বারা স্পর্শ; এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা এই পঞ্চ ভূতাত্মক দেহে পঞ্চ ভূতাত্মক জগতের সত্তা অনুভব করি। সুতরাং যদি আমরা চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন না করি; এবং দর্শন করিয়া দৃষ্ট দ্রব্যের সৌন্দর্য্যের অনুভব না করি, এবং সেই সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া হৃদয়ে পরমানন্দ লাভ না করি—তাহা হইলে আমাদের চক্ষুর সার্থকতা কোথায়? অতএব রূপ দর্শন—এবং দর্শন করিয়া সেই রূপের যথার্থ সৌন্দর্য্য অনুভব এবং উপভোগ ভগবানের অভিপ্রেত সন্দেহ নাই। তিনি আমাদিগকে হস্ত দিয়াছেন কর্ম্ম করিতে। কিন্তু আমরা যদি সেই হস্তদ্বারা নরহত্যা অথবা আত্মহত্যা করি তাহা হইলে সেই দুষ্কর্ম্মের জন্য শ্রীভগবান দায়ী নহেন।

সৌন্দর্য্য আমাদের উপভোগের নিমিত্ত। উপভোগ সংযম এবং মিতাচারে। সুতরাং সৌন্দর্য্যের সদ্ব্যবহার আমাদের অবশ্য কার্য্য। সৌন্দর্য্যের অবজ্ঞা, অথবা অমর্য্যাদা ভগবানের প্রদত্ত ঐশ্বর্য্যের অপব্যবহার। সৌন্দর্য্য দেখিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, উপভোগ করিতে হইবে; নতুবা জীবনের সার্থকতা সম্পূর্ণ হইবে না। জীবনে আমরা চাই—শক্তি, সুখ, আনন্দ। সৌন্দর্য্য ব্যতীত আনন্দ কোথায়? অতএব যদি সৌন্দর্য্যে আমরা আনন্দ না পাই, তাহা হইলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। অতএব সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্র দর্শন করিতে হইবে—অনুভব করিতে হইবে—উপভোগ করিতে হইবে; কিন্তু অনাসক্ত হইয়া।

সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিলে, স্রষ্টাকে মনে পড়িবে; মনে হইবে আরও কত সুন্দর তিনি। সুতরাং সৌন্দর্য্যের উপাসনা অথবা সেবা—সেই চিরসুন্দরের উপাসনা এবং সেবা। মনে এই ভাবটিকে দৃঢ়মূল করিতে হইবে।

উপাসনা অথবা সেবা—উপাসক অথবা সেবকের ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তির

উপর নির্ভর করে। কেহ ভগবানের উপাসনা করিয়া খুসী—কেহ তাঁহার সেবা করিতে পারিলে কৃতার্থ। কেহ তাঁহাকে পূজা করিতে ভালবাসে কেহবা তাঁহার সেবা করিয়া সুখী হয়।

যে সুন্দর যাহা সুন্দর—তাহার উপাসনা কর—সেবা কর ক্ষতি নাই; কিন্তু সাবধান, তাহার সৌন্দর্য্যে আশক্ত হইও না;—সে সৌন্দর্য্য কামুকের ন্যায় ভোগ করিতে চাহিওনা। উপাসনা কর—সেবা কর, কিন্তু নিষ্কাম হইয়া মনে মলিনতা আসিতে দিওনা; আনন্দকে নিরানন্দ করিওনা,—নন্দনকে নরকে পরিণত করিও না।

রূপ দেখ—নয়ন ভরিয়া দেখ, আত্মহারা হইয়া দেখ—কিন্তু কু অথবা অক্রূর দৃষ্টিতে দেখিওনা।

বালকের ন্যায় চাঁদ ধরিতে চাহিওনা; যুবকের ন্যায় প্রফুল্ল কুসুমকে বৃন্তচ্যুত করিয়া পীড়ন করিওনা—পদদলিত করিওনা; প্রৌঢ়ের ন্যায় পরম পুলকে সর্ব্বতোভাবে ভোগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইওনা;—পার যদি তাহা হইলে বৃদ্ধের ন্যায়, সাধুর ন্যায় নিষ্কাম—নিষ্পাপ চিত্তে দর্শন কর; দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হও; আনন্দে বিভোর হইয়া সেই সর্ব্ব সৌন্দর্য্যকর চির সুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে অতি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মস্তক বিলুণ্ঠিত কর। পারিবে কি? নিশ্চয় পারিবে। চেষ্টা কর—চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই।

মনে রাখিও—যাহা সুন্দর তাহা সৎ—যাহা সৎ তাহা পবিত্র—যাহা পবিত্র তাহা উপাসনার উপযুক্ত সেবার যোগ্য।

উপাসনা কর—সেবা কর—আপনার চিত্ত বৃত্তিকে প্রবুদ্ধ কর—সংযুক্ত কর—পরমাত্মাকে প্রণোদিত কর। কিন্তু সাবধান! সৌন্দর্য্যে আসক্ত হইও না।

যেখানে সৌন্দর্য্য—সেইখানে আনন্দ। যেখানে আনন্দ সেইখানেই সচ্চিদানন্দের অভিব্যক্তি। যেখানে আনন্দের অভাব, সেখানে সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে না। সুতরাং যেখানে সৌন্দর্য্য—সেইখানে সচ্চিদানন্দ। যেখানে সচ্চিদানন্দ নাই, সেখানে সৌন্দর্য্যও নাই। অতএব, যাহা কিছু আছে, তাহা সৎ, সত্য এবং সুন্দর।

মন স্থির কর—চিত্ত দৃঢ় কর—হৃদয় পবিত্র কর—বুদ্ধি মার্জ্জিত কর—তাহার পর দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া দেখ। যেদিকে নয়ন ফিরাইবে, দেখিবে সেদিক অসীম সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত।

দেখিতে চেষ্টা কর—দেখিতে পাইবে ভগবানের এই বিশাল সাম্রাজ্যে কত রূপ। কেবল রূপ;—রূপের পর রূপ। তখন প্রাণ ভরিয়া উচ্চকণ্ঠে গাহিতে পারিবে :—

ঐ রূপ দেখে মন মজে যে গেল।

রূপ শুধু দেখিবার নিমিত্ত নহে। রূপ দেখিয়া মন যখন মজিয়া যায় তখনই রূপ দেখা সার্থক হয়। কিন্তু যেমন করিয়া রূপ দেখিলে মন মজিয়া যায়, অথচ চিত্তে ভোগাসক্তি না জন্মে, তেমন করিয়া রূপ দেখিতে কয়জন পারে?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে দুর্য্যোধনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু সে রূপ দেখিয়া দুষ্টমতি মন্দভাগ্য দুর্য্যোধনের মনে কি ভাব জাগিয়াছিল? পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্ম্মনায়মান হইয়া সে আত্ম বিনাশার্থ—আত্মীয় স্বজন বিনাশ হেতু মহাত্মা পাণ্ডবদিগকে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও প্রদান করিতে বিমুখ হইল। যেরূপ দেখিলে বিষয় বাসনা বিমুক্ত হইয়া জীব স্বশরীরে স্বর্গে গমন করে;—দেবগণও যেরূপ দেখিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা লোলুপ সেই ঐশী অব্যয় রূপ দেখিয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধনের মনের মলিনতা দূর হইল না। সে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল না।

পরে, যখন কুরুক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজন বধ বিমুখ অর্জ্জুনকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখাইলেন তখন ভক্তিমান অর্জ্জুন, ভয়, ভক্তি এবং সানন্দে অভিভূত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। একই রূপ দেখিয়া উভয়ের মনোভাবের কত প্রভেদ! দুর্য্যোধনের অহংজ্ঞান প্রবল রহিল, অর্জ্জুনের পরমার্থ লাভ হইল।

রূপ দেখিলে হয় না,—রূপ দেখিয়া, সে রূপের সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার বুদ্ধি এবং বিবেচনা শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। কত শত সহস্র লোকে প্রতিদিন ভগবানের কত শত সহস্র রূপ অবলোকন করিতেছে,

কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন সেই রূপের মধ্যে ভগবানের রূপ অথবা সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে সক্ষম ? যে পারে সে দেবতা। তাহার মুক্তি অনিবার্য্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই অল্প বিস্তর অকৃত্রিম রূপ আছে। সেই রূপ দেখিয়া অনুভব এবং উপভোগ করিবার শক্তির অভাব যত বিপদের মূল। যাহার সে অভাব নাই, সে নিঃসন্দেহ ভাগ্যবান।

এই যে জগতে কোটী কোটী নর নারী ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট রূপ আছে এবং সে রূপ সেই চিরসুন্দর বিশ্বরূপেব রূপ। তথাপি আমরা সকলের রূপ দেখিয়া মোহিত হই না। যে নারীর রূপে আমি মুগ্ধ —অন্যের নিকট তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। আবার অন্যের নিকট যেরূপ অসামান্য আমার নিকট সেরূপ অতি সামান্য।

রূপ সর্ব্বজীবে—সর্ব্ব পদার্থে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান,—কেবল রুচিভেদে তাহার তারতম্য।

বিশ্বরূপের বিশ্ব কেবল রূপময়—সৌন্দর্য্যময়। যাহার দেখিবার যোগ্যতা আছে তাহার সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ;—যাহার সে সৌভাগ্য নাই, সে সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না। ফলে যেখানে সে তাহার মনোমত সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়, সেইখানে সে আসক্ত হইয়া পড়ে। আসক্তির গতি নিরয়গামী। যদি নরকের ভয় থাকে, যদি জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি এবং বিমল আনন্দ অনুভব করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে রূপ অনুধাবন করিতে—সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে যে অমোঘ ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন তাহা অর্জ্জন করিতে যত্নবান হও। ভোগ বাসনা সংযত কর নতুবা জীবনের প্রান্ত সীমায় উপনীত হইয়া দুঃখ করিতে হইবে—

জনম অবধি হামি রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল—

কি করিলে রূপ দেখিয়া নয়নকে তৃপ্ত করিতে পারা যায় তাহা অনুধাবন পূর্ব্বক অনুভব কর। মনে রাখিও—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয়োবাভিবর্দ্ধতে॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎ সর্ব্বামিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ॥

ভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না, ভোগে কাম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব ভোগ বাসনা সংযত পূর্ব্বক—প্রত্যেক সুন্দর পদার্থে সেই বিশ্ব রূপের রূপ অনুভব কর। যেখানে রূপ, অথবা সৌন্দর্য্য, সেইখানেই সেই বিশ্বরূপের সত্বা বিরাজমান। তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানা বিধানি দিব্যানি নানা বর্ণাকৃতীনি চ ॥

অতএব রূপ, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য দেখিবা মাত্র অবনমিত মস্তকে বলিবে—

ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়াততং বিশ্বমনন্তরূপ।

রূপ বিশ্বরূপের—সৌন্দর্য্য বিশ্বেশ্বরের।

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক-পরিচয়

প্রাচীন ভারতের অনুশীলন—স্বামী বশিষ্ঠদেবানন্দ প্রণীত। প্রচারই জাতীয় প্রাণ-স্পন্দনের লক্ষণ। মস্তিষ্ক সতেজ না হইলে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ অসম্ভব। এই মৌলিকতাই মানুষকে, ক্রমোন্নতির সোপানে অগ্রসর করায়। ইহার ফল জাতির দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। ইউরোপের জাতি সমূহ সকল অন্তর্বিপ্লব ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে স্বাধীন, কারণ মস্তিষ্কের মৌলিকতা ; প্রাচীন ভারতের স্বাতন্ত্র্য একই কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—এই গ্রন্থে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। দেখান হইয়াছে (১) সকল দেশের পুরাণের উৎপত্তি স্থল ঋক্‌বেদ, (২) রাম ও কৃষ্ণ অবতারে সভ্যতার প্রচার, (৩) মিশরে হরগৌরি উপাসনা, (৪) শিব লিঙ্গ পূজার উৎপত্তি, (৫) বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্মের অবিরোধিতা, (৬) হিন্দু দর্শন হইতে গ্রীক্ দর্শনের উৎপত্তি, (৭) শ্রীবুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম্ম, (৮) ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার (৯) ভারতীয় সাহিত্যের জগদ্ভ্রমণ। "ভারতীয় শিক্ষা" নামে ১৯১৮ সালে প্রবন্ধগুলি প্রথমে 'উদ্বোধনে' লিখিত হয়, পরে অন্যান্য প্রবন্ধসহ গঙ্গজলঘাটী জাতীয় বিদ্যালয়ের সেবকবৃন্দের উৎসাহে ঐ প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সমগ্র

আয় উক্ত জাতীয় বিদ্যালয়ের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্ম্মাণকল্পে ব্যয়িত হইবে। মূল্য ১৷৷• টাকা, প্রাপ্তিস্থল উদ্বোধন কার্য্যালয়।

সংঘ-বার্ত্তা

১। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথা নিয়মিতরূপে হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন মঠ-প্রাঙ্গণে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র ঘোষাল এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী বক্তৃতা করেন। ঐ দিবস ষ্ট্রেটসেটলমেণ্ট হইতে সিন্ধু এবং সিংহল হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত প্রায় বহু নগর ও পল্লীতে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে আনন্দ ঘোষিত হইয়াছে।

২। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষের সময় আর্ত্ত দুঃস্থ জনসাধারণের দুঃখমোচনে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মপ্রাণতায় মুগ্ধ স্থানীয় কতিপয় মহানুভব ব্যক্তির আগ্রহ ও সহানুভূতিতে মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী এই শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপীঠ ও সেবাশ্রম গড়বেতা, আমলাগোড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। সে আজ প্রায় [illegible]দের কথা। তদবধি এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থানুযায়ী লোক কল্যাণ-[illegible] থাকিয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছায় স্বীয় কর্ত্তব্যের পথে যথাশক্তি আত্ম নিয়োগ করিয়া আসিতেছে।

প্রথমে শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায় মহাশয় এই আশ্রমের জন্য তাঁহার একখানি বাড়ী বিনা ভাড়ায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর উক্ত উদারপ্রাণ ব্যক্তি এই আশ্রমের স্থায়ী বাড়ী নির্ম্মাণ-কল্পে ২৷৷• বিঘা জমি দান করেন। তদবধি সেই স্থানেই ৩ খানা খড়ের ঘরে আশ্রমের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। সুখের বিষয় কর্ম্মীদের অক্লান্ত যত্ন ও উৎসাহে এবং স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন-বোধে এই অনুষ্ঠানের কার্য্য দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। সম্প্রতি স্থানীয় বহু নিরক্ষর, দরিদ্র অধিবাসীর অকপট আগ্রহে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ বর্ষকাল যাবৎ কর্ম্মিগণ উক্ত আশ্রমের সংলগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ-সরদাপীঠ নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস স্থাপন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—দরিদ্র জনসাধারণের ভিতর শিক্ষা-বিস্তার এবং ঐ শ্রেণীর আগ্রহবান শিক্ষার্থীদের উক্ত ছাত্রাবাসে রাখিয়া লেখা-পড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম, নীতি, কৃষি ও গৃহশিল্প ইত্যাদি শিক্ষা দিয়া মানুষ গড়িয়া তোলা। বুকভরা আশা ও উদ্যম লইয়া কর্ম্মিগণ এই বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। ভরসা—পরমকারুণিক শ্রীভগবানের মঙ্গল আশীষ ও সহৃদয় দেশবাসীর সহানুভূতি।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

(২)

১৯১০ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে শিলং হইতে আমরা কয়েক জনে মিলিয়া জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন মানসে যাই। মায়ের পূর্ব্বেকার ফটোগ্রাফ আমরা সকলেই দেখিয়াছিলাম। এই সময়ে পথে মায়ের বর্ত্তমান সময়ের মূর্ত্তি একজনে স্বপ্নে দেখে এবং পরে জয়রামবাটী যাইয়া প্রত্যক্ষের সঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট চেহারার খুব মিল হওয়ায় অপার আনন্দ ও বিস্ময় হইল। আমাদের একজন পূর্ব্বেই জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তার দীক্ষার কথায় শ্রীশ্রীমা বলিলেন "সন্ন্যাসীর মন্ত্র—চৈতন্য হবে"। তিনি ব্যতীত আমরা সকলেই এবারে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মহামন্ত্র পাইয়া চৈতন্য হইলাম। আমরা দীক্ষার পরেই কামারপুকুর যাইবার ইচ্ছা করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি প্রার্থনা জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন—"তা কি হয়? আমি ছেলেদের আজ ভাল করে খাওয়াব।"

"কিংকর্ত্তব্যং কিমকর্ত্তব্যং কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ"—ইত্যাদি গীতায় পড়িয়াছি। অতএব ভব বন্ধন মোচনের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভের পরে আমাকে আর কি করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া উচিত ভাবিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা, আমাকে আর কি কর্ত্তে হবে?" মা—"তোমার কিছুই কর্ত্তে হবে না"। "আমার কিছুই কর্ত্তে হবে না?" মা—"না।" "কিছু না?" মা—"না কিছুই না"। বারত্রয় এই একই উত্তরে

তখনকার মত বুঝিলাম যে যিনি কৃপা করিয়াছেন, তিনিই ভববন্ধন মোচনের সব ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আমি ভানু পিসির * হাত দেখিয়া বলিয়াছিলাম—"পিসি, তুমি আরও ২৫ বৎসর বাঁচবে"। তিনি গিয়া মাকে বলিয়াছিলেন—"মা, তোমার ছেলে হাত গুণতে জানে"। মা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন—"বাবা, তুমি হাত দেখতে জান? বলত আমার পায়ের অসুখ (বাত) সারবে কি না?" প্রশ্ন শুনিয়া ত আমি অবাক। কারণ, জ্যোতিষের কিছুই জানি না। ভানু পিসিকে আন্দাজে অমনি একটা বলিয়াছিলাম। আমি শুনিয়াছিলাম ভক্তদের শরীরস্থ পাপ গ্রহণ করিয়াই শ্রীশ্রীমায়ের এই পায়ের অসুখ। তাই বলিলাম—"আমাদের জন্যই ত এই অসুখ, তা আমরা থাকতে উহা সারবে কি? শুনিবামাত্র মা নিতান্ত ব্যথিতা হইয়া দাঁড়ান অবস্থা হইতে হঠাৎ ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, বলে কি গো?" মাকে এইরূপ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলাম—"মা তোমার ভাল হতে ইচ্ছা হয়?" মা—"হাঁ।" আমি—"তবে ত ভাল হবেই"। তখন মার মুখে প্রফুল্লতা আসিল। ক্ষণপরেই বলিলেন "দেখ্‌ছ গা, কি ভক্তি, সবই আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর"।

দেশে ফিরিবার দিনে মাকে প্রণাম করিতে গেলাম। আমি বলিলাম "মা, আমি জপের সংখ্যা ঠিক রাখতে পারি না। হাত চলেত মুখ চলে না। হাত মুখ চলে ত মন স্থির হয় না"। মা উত্তর করিলেন "এর পর দেখ্‌বে হাত জিবও চল্‌বে না—শুধু মনে"।

আসিবার সময় প্রণাম করিয়া বলিলাম "মা, যাই"। মা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন "বাবা, 'আসি' বল, 'যাই' বল্‌তে নেই।"

ভুল সংশোধন করিয়া মায়ের প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করিয়া রওনা হইলাম।

১৯১২ খৃঃ দুর্গা পূজার পরে শ্রীশ্রীমা যখন কাশী গিয়াছিলেন সেই বার মায়ের জন্মতিথির সময় ডিসেম্বর মাসে আমরা কাশীতে যাই। জন্মতিথি দিনে সকাল বেলা 'লক্ষ্মী-নিবাসে' মাকে প্রণাম করিয়া ফুলের মালা দিয়া পূজা করিলাম। মা এক একটি প্রসাদী মালা সকলকে দিলেন। পরে

* জয়রাম বাটীর জনৈকা প্রাচীনা স্ত্রীভক্ত। ঠাকুরের সময়কার।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ (মিষ্টি) গ্রহণ করিয়া 'অদ্বৈতাশ্রমে' আসিলাম। তথায় জন্মতিথি পূজান্তে যখন হোম হইতেছিল এবং সকলে মিলিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দিতেছিলেন, আমরাও তখন আহুতি দিতে উদ্যত হইলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিলেন "তোমরা খেয়েছ, আহুতি দিও না"। কিন্তু আমি বাদে অপর সকলে আহুতি দিলেন। শ্রীশ্রীমাও এই সময়ে আশ্রমে আসিয়াছিলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া মা স্ত্রীভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন "এরা ত আমার প্রসাদ পেয়েছে, খেল কখন? আহুতি দেবে বই কি।" স্ত্রী ভক্তদের নিকট পরে এই কথা শুনিয়াছিলাম।

*   *   *

১৯১৩ খৃঃ মাঘী অষ্টমীতে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি পাইয়া পরিবার ও বিধবা ভগ্নীকে মায়ের কৃপালাভের আশায় তাঁহার শ্রীচরণ সমীপে লইয়া যাই। ঐ দিন মা উভয়কেই দীক্ষা দেন। পরিবার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "মা, আমার শিব পূজা করতে ইচ্ছা হয়। তা, করবো কি?" তদুত্তরে মা বলিয়াছিলেন "এখন তুমি ছেলে মানুষ, পারবে না। পরে সময় হলে শিক্ষা করে শিব পূজা কোরো। এখন শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা কর"। মা আমার ভগ্নীর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন "ওর মন খুব ভাল"। আমরা আম নিয়ে গিয়েছিলাম। ঐ সময় আমের মূল্য বেশী ছিল মা ঐ আম দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এত পয়সা দিয়ে আম কেন? আর এই আম এখন খেতেও ভাল নয়—টক্।"

*   *   *

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের জন্মাষ্টমীর ছুটীতে আমরা কয়েকজন গুরু ভ্রাতা মিলিয়া জয়রামবাটী যাই। সঙ্গে একজনের একটি অল্প বয়স্ক পুত্রও ছিল। সন্ধ্যায় কোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিলাম। ছুটীর সময় অল্প বলিয়া উক্ত মঠে থাকিবার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া সেই রাত্রিতেই জয়রামবাটী রওনা হইলাম। পথে মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভীষণ অন্ধকার। পথ ঘাট কাদা জলে পূর্ণ। এই সব দুর্যোগ অতিক্রম করিতে করিতে জয়রামবাটী পৌঁছিলাম। কিন্তু আমাদের পৌঁছিতে রাত্রি অধিক হইয়া

যাওয়ায় সে রাত্রে মাকে আর কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই। পর দিন সকালে যখন মাকে প্রণাম করিতে যাইলাম তখন মা এই সকল শুনিয়া আমাদের ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন—ঠাকুর রক্ষা করেছেন। অন্ধকারে অত বৃষ্টি-জল-কাদায় কত সাপ মাড়িয়ে এসেছ। এই ভাবে চলায় আমার কষ্ট হয়। গোঁ ভরে চলা ভাল নয়"। আমরা বলিলাম—"মা, তোমাকে দেখবার জন্য মন খুব ব্যাকুল হয়েছিল, তার উপর ছুটীও অল্প তাই অত তাড়াতাড়ি।" মা—"তোমাদের ত এরূপ ইচ্ছা হবেই, কিন্তু এতে আমার কষ্ট হয়।"

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধানা পরিচালিকা শ্রীযুক্তা সুধীরা দিদি তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন। এই দিন দুপুর বেলা মা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন "দেখ, সুধীরা তোমাদের সঙ্গে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত যাবে। খুব সাবধানে যেও। ওর গাড়ী তোমাদের দুই গাড়ীর মধ্যে রেখো তোমরা আমার আপনার জন, আমার ছেলে"।

আমি—হাঁ নিব বই কি। তুমি যেমন বললে ঠিক তেমনি ভাবে নিব"।

রাত্রিতে আহারের সময় মা আমাদের নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই ছোট ছেলেটির দীক্ষার কথা উত্থাপন করায় মা বলিলেন—"এখন ছেলে মানুষ, হেগে ছোঁচাতে পারে না (৭।৮ বছর বয়স) এখন কি দীক্ষা হয়? ছেলেটি ভক্ত, বেঁচে থাক্। ভক্ত দাস হোক্।" আমাকে বলিলেন—"ওর ভাত মেখে দাও।" আমি কথায় কথায় বলিলাম—"মা, আমরা যার তার খাই—এতে কোন হানি হয় কি?" মা—"শ্রাদ্ধের অন্নটা খেতে ঠাকুর বিশেষ নিষেধ কর্ত্তেন, ওতে ভক্তির হানি হয়। সকল কর্ম্মে যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের অর্চ্চনা হয় বটে, তবু তিনি শ্রাদ্ধান্নটি খেতে নিষেধ কর্ত্তেন," আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আত্মীয় স্বজনের শ্রাদ্ধে কি করবো?"

মা—"আত্মীয় স্বজনের বেলা না খেয়ে উপায় কি?"

পরদিন বৈকালে প্রায় ২টার সময় মাকে দর্শন করিতে গিয়াছে—মা আলু থালু ভাবে ভূমিতেই বসিয়া আছেন। ঐ বৎসরই উহার

কিছু দিন পূর্ব্বে দামোদরের ভীষণ বন্যা হইয়াছিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, বন্যায় লোকের কি খুব কষ্ট হচ্ছে?" খবরের কাগজ ও লোকমুখে যাহা জানিয়াছিলাম বলিতে লাগিলাম। নিবিষ্ট চিত্তে শুনিয়া করুণ কণ্ঠে বলিলেন—"বাবা, জগতের হিত কর, মায়ের এই কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁর এই বিরাট বিগ্রহের সেবাধিকার প্রার্থনা করিয়া বাহির বাটীতে আসিব বলিয়া প্রণাম করিতেই শুনি মা আপন মনে বলিতেছেন—"কেবল টাকা, টাকা, টাকা," মায়ের শ্রীমুখে "টাকা, টাকা" শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম, মা বোধ হয় আমার ভিতর ভাবের আতিশয্য লক্ষ্য করিয়াই এরূপ বলিতেছেন, অমনি মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"না বাবা, টাকাও দরকার এই দেখনা কালী (মামা) কেবল টাকা টাকা করে।"

১৯১৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে (২৪শে) সপরিবারে মাকে দর্শন করিতে উদ্বোধনে গিয়াছি। পরিবারের হাতে কিছু মিষ্টি ছিল। শ্রীযুক্তা গোলাপ-মা উহা অন্যদিন ঠাকুরকে দিবেন ভাবিয়া উঠাইয়া রাখিতে ছিলেন। মা নিষেধ করিয়া বলিলেন—"না গো, না; বৌমা যে মিষ্টি নিয়ে এসেছে তা এবেলাই ঠাকুরকে দাও, এতে বৌমার কল্যাণ হবে।" পরদিন প্রত্যূষে পরিবার মার নিকট গিয়াছিল এবং সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া আমাকে বলিল—"আজ মা আমাকে কত কৃপা করেছেন, জীবনে চিরকাল তা আনন্দ দিবে। বেলা ৯।১০টার সময় মা, তুই কি তিন পয়সার মুড়ি ও কড়াই ভাজা আনিয়ে আঁচলে নিয়ে ভূমিতে বসে ২।৪টি করে নিজ মুখে দিচ্ছিলেন ও এক মুঠো, এক মুঠো করে আমাকে দিচ্ছিলেন —"বৌমা খাও।" জীবনে অনেক ভাল জিনিষ খেয়েছি, কিন্তু আজকার ঐ মুড়ি খাওয়ার আনন্দের তুলনা মিলে না। দুপুরে আমাকে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বল্লেন এবং তাঁর বিছানা পত্র ঝেড়ে রোদে দিতে বল্লেন। এই সব ছোটখাট সেবা গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। আজ আমার সঙ্গে এই কথাবার্ত্তাও হয়েছে—আমি বলেছিলাম—"মা, ঠাকুরকে অন্ন ভোগ দিই। মা—'হাঁ ঠাকুরকে অন্ন

ভোগ দিবে। তিনি সুক্ত খেতে ভালবাসতেন।' আমি—'ঠাকুরকে মাছ ভোগ দিব কি?' মা—'হাঁ, তাঁকে মাছ দিবে। ঠাকুরের মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁকে নিবেদন করবে।' জিজ্ঞাসা করলেন—'ছেলে মাছ খায় কি?' আমি বল্লুম—'হাঁ, খান্।

মা—'খাবে বৈকি, খুব খাবে'।

কথায় কথায় আমি বলেছিলাম—'মা, এই যুদ্ধে দেশব্যাপী হাহাকার' লোকের কত কষ্ট, অন্ন বস্ত্র দুর্মূল্য। মা—'এতেও ত লোকের চৈতন্য হয় না'। আমি 'মা, এই যুদ্ধে কি আমাদের ভাল হবে?'

মা—'ঠাকুর যখনই আসেন, তখনই এইরূপ হয়ে থাকে। আরও কত কি হবে।"

ঐ দিন বৈকালে আমি যখন মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম, মা সেই জন্মাষ্টমীর ছুটীতে রাত্রি অন্ধকারে বৃষ্টিতে জয়রামবাটী যাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আবার তিরস্কার করিলেন "গোঁ ভরে চলা ভাল নয়।" আমি—'না আর যাব না'। মা বোধ হয় কথায় বুঝিলেন আমি আর জয়রামবাটী যাইব না। অমনি বলিয়া উঠিলেন "যাবে বই কি। বাবা তোমাদের পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার বুকে শেল বাজে। (পরিবারের দিকে চাহিয়া বলিলেন) "বউ মা, তুমি ওকে দেখো, এই ভাবে যেন না চলে"।

* * * *

১৯১৭ খৃঃ দুর্গা পূজার ছুটীতে উদ্বোধনের বাটীতে আমি ও আর একটি গুরুভ্রাতা (যতীন) শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাই। আমরা মায়ের জন্য দুইখানি বস্ত্র লইয়া গিয়াছিলাম বস্ত্র দুইখানি মায়ের শ্রীচরণ প্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিলাম। আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন "বাবা, তোমাদের অবস্থা খারাপ, তোমাদের কাপড় দেওয়া কেন?" উভয়ে কিছু মনঃক্ষুন্ন হইয়া বলিয়াছিলাম "মা, তোমার ধনী ছেলেরা তোমাকে মূল্যবান বস্ত্র দেয়। তোমার গরীব ছেলেরা এই মোটা কাপড় নিয়ে এসেছে। তুমি উহা গ্রহণ করে তাদের মনোবাসনা পূর্ণকর। শুনিয়াই সস্নেহে মা বলিলেন—"বাবা এই আমার গরদ, ক্ষীরোদ, নীরদ"। এবং

বস্ত্র দুইখানি সযত্নে হাত পাতিয়া লইলেন। মা দাঁতের বেদনায় তখন খুব কষ্ট পাইতেছিলেন। সেই কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের বলিলেন —"বাবা, ঠাকুর বলতেন 'যার দাঁতের বেদনা হয় নাই, সে দাঁতের যন্ত্রণা বুঝতে পারে না'।"

* * * *

১৯১৭ খৃঃ বাটীতে ঠাকুরের উৎসবের পূর্ব্বে মাকে পত্র লিখিয়া নিবেদন করিয়াছিলাম—যাহাতে উৎসব সুসম্পন্ন হয়। মা তদুত্তরে জানাইয়াছিলেন—"তোমাদের পত্র পাইয়া কত আনন্দিত হইয়াছি তাহা চিঠিতে লেখা অসম্ভব। তোমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান। তোমাদের এই সকল সৎকার্য্যের সহায় তিনি নিজে। তার জন্য তোমাদের ভয় ভাবনা কি।"

* * * *

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জ্যেষ্ঠমাসে জয়রামবাটীতে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"মা, ঠাকুরের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করলে তিনি শুনেন এবং তোমার নিকট না বলে ঠাকুরের নিকট বল্লে হয় কি ?"

তদুত্তরে মা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন "ঠাকুর যদি সত্য হন, শুনেনই শুনেন"।

এইবারে আমি শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া জয়রামবাটী হইতে রওনা হইবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলাম "যদি দিনের বেলা বলে গরুর গাড়ী না পাই, তবে কোতুলপুর হতে হেঁটেই বিষ্ণুপুর যাব মা"। মা বলিলেন—"বাবা, শরীরটাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন। গাড়ী পাবে। মায়ের কথা ঠিক হইল। গাড়ী পাইলাম। ইহাই দেহাশ্রিত মাকে আমার শেষ দর্শন।

শ্রী—

১৯১৬ খৃঃ মঠে দুর্গা পূজা। শ্রীশ্রীমা সপ্তমী পূজার দিন দুপুরে মঠে আসিয়াছেন এবং উত্তর পাশের বাগান বাড়ীতে আছেন। অষ্টমীর দিন সকাল বেলা ৮৷৯টার সময় মঠ ও প্রতিমা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। রান্নাঘরের পাশের হলে ভক্তেরা ও সাধুব্রহ্মচারিগণ অনেকে কুটনো

ফুটিতেছিলেন। মা দেখিয়া বলিতেছেন "ছেলেরাত বেশ কুট্‌নো কুটে"। জগদানন্দজী বলিলেন "ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতা লাভই হল উদ্দেশ্য, তা সাধন ভজন করেই হোক, আর কুটনো কুটেই হোক।

এই দিনে বহুলোকে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতেছিল। শ্রীশ্রীমাকে বারবার গঙ্গাজলে পা ধুইতে দেখিয়া যোগীন মা বলিয়াছিলেন "মা, ওকি হচ্ছে ? সর্দ্দি করে বস্‌বে যে। মা বলিলেন "যোগেন, কি বলবো, এক এক জন প্রণাম করে যেন গা-ঠাণ্ডা হয়, আবার এক এক জন প্রণাম করে যেন গায়ে আগুন ঢেলে দেয়। গঙ্গাজলে না ধুলে বাঁচিনে।"

পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "মা, একজন প্রণাম করলে তোমার খুব কষ্ট হয় একবার পূজার সময় তোমার এই উক্তি শুনেছিলাম"।

মা বলিলেন—"হাঁ, বাবা এক একজন প্রণাম করলে যেন বোলতায় হুল ফুটিয়ে দেয়। কাউকে কিছু বলিনি। এই কথা বলিয়াই সস্নেহ দৃষ্টিতে বলিলেন "তা, বাবা তোমাদের বল্‌ছি না"।

আমি বলিলাম "মা, ভয় হয়, তোমার মত মা পেয়েও কিছু যেন হলনা মনে হয়"। মা—"ভয় কি বাবা, সর্ব্বদার তরে জান্‌বে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকৃতে ভয় কি ? ঠাকুর বলেগেছেন—'যারা তোমার কাছে আস্‌বে, আমি শেষ কালে এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে যাব'।"

আবার বলিয়াছিলেন—"যে যা-খুসী করনা কেন, যে যে ভাবে খুসী চলনা কেন, ঠাকুরকে শেষ কালে আস্‌তেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, তারা ত ছুড়বেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই"। একবার ঠাকুরকে ভোগদিতে গিয়ে দেখি ছবি থেকে একটা আলোর স্রোত নৈবেদ্যের উপর পড়েছে। তাই মাকে জিজ্ঞিসা করেছিলাম "মা, যা দেখি, সেকি মাথার ভুল, না সত্যি ? যদি ভুল হয়, তবে যাতে মাথা ঠাণ্ডা হয় তাই করে দাও।"

মা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "না বাবা, ও সব ঠিক"।

"তুমি কি জান কি দেখি ?"

মা—"হাঁ।" ঠাকুরকে ও তোমাকে যে ভোগদিই তাকি ঠাকুর পান ? তুমি কি তা পাও ?"

মা—"হাঁ"। আমি—"বুঝবো কি করে ?"

মা—"কেন গীতায় পড় নাই ফল পুষ্প জল ভগবানকে ভক্তি করে যা দেওয়া যায়, তা তিনি পান"। *

এ উত্তরে বিস্মিত হইয়া বলিলাম "তবে কি তুমি ভগবান ?" এই কথায় মা হাসিয়া উঠিলেন। আমরাও হাসিতে লাগিলাম।

শ্রী—

* * * * *

সেদিন দুপুরে মা বিশেষ কিছুই খাইতে পারিলেন না। বাস্তবিক সারা বিকাল ঢেকুর তুলিতে লাগিলেন যেন খুব খাওয়া হইয়াছে। পরে জানা গিয়াছিল মঠে কোন ভক্তেরা নাকি মণ খানেক দুধের পায়েস ভোগ দিয়েছিল। *

* * * * *

২৭ চৈত্র ১৩২৩ জয়রামবাটীতে, সন্ধ্যার পর মায়ের সঙ্গে কথা হইতেছিল—আমি—মা, সবাই বলে কল্পতরুর কাছে গেলে কিছু চাইতে হয়। কিন্তু ছেলেরা আবার মার কাছে কি চাইবে ? যার যা দরকার মা তাকে তাই দেন। ঠাকুর যেমন বলতেন" "যার যা পেটে সয়, মা তাকে তাই দেন"। তা, কোনটা ঠিক ?

মা—মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি ? কি চাইতে কি চাইবে ;—শেষে কি শিব গড়তে বানর হয়ে যাবে। তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা ভাল। তিনি যখন যেমন দরকার, তেমন দিবেন। তবে ভক্তি ও নির্ব্বাসনা কামনা করতে হয়—উহা কামনার মধ্যে নয়"। আমি—ঠাকুর বলেছেন "এখানে যারা আসবে তাদের শেষ জন্ম"। আবার স্বামিজী

---

* (একবার জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা গোলাপ মা, যোগীন মার নিকট বলিয়াছিলেন "আজ এত খেয়েছি আর ক্ষুধা নাই। মঠে বুঝি পায়েস ভোগ দিয়েছে।"

বলেছেন "সন্ন্যাস না হলে কাহারও মুক্তি নাই"। গৃহীদের তবে উপায় ?

মা—হাঁ, ঠাকুর যা বলেছেন তাও ঠিক, আবার স্বামিজী যা বলেছেন তাও ঠিক। গৃহীদের বহিঃ সন্ন্যাসের দরকার নেই। তাদের অন্তর সন্ন্যাস আপনা হতে হবে। তবে বহিঃ সন্ন্যাস আবার কাহারও দরকার। তোমাদের আর ভয় কি ? তাঁর শরণাগত হয়ে থাক্‌বে। আর সর্ব্বদা জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে আছেন"।

* * * * *

১৩২১, চৈত্র—উদ্বোধন বাটীতে।—

একবার আমার গর্ভধারিণী মাকে তীর্থ দর্শনে কাশী নিয়ে যেতে ইচ্ছা করায় তিনি অকাল বলিয়া অমত করেন। আমি এই কথা শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন করিয়াছিলাম। তিনি তদুত্তরে বলিলেন "বাবা. অকালে তীর্থ দর্শন কর্‌লে পূর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয় বলে, কিন্তু আবার পুণ্য কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলা ভাল।"

মায়ের এই দ্ব্যর্থ বাক্য বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় সংশয় জ্ঞাপন করিলাম এবং এইরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলাম।

মা—সংসারীদের মতে একটা কথা আছে যে অকালে তীর্থ দর্শন করে না। দেখ, কালাকালের অপেক্ষা করে পুণ্যকার্য্য স্থগিত রাখা যায়, কিন্তু কালের (মৃত্যুর) নিকট কালাকালের বিচার নাই। মৃত্যুর যখন অবধারিত কাল নেই, তখন সুযোগ উপস্থিত হলেই কালাকালের অপেক্ষা না করে পুণ্যকার্য্য করে ফেলা ভাল"।

* * * * *

অপর এক সময়ে আমার একটি বন্ধুর হাঁসপাতালে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় অকালে মৃত্যু হয়। তাহার বিমল স্বভাব ও ঈশ্বরানুরক্তির কথা মার নিকট চিঠীতে জানাইয়া তার মুক্তি ভিক্ষা করিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমা তদুত্তরে জানাইয়াছিলেন "আমি আশীর্ব্বাদ করি যে তোমার বন্ধুটির মুক্তিলাভ হউক। ঠাকুর তাহাকে সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত করুন"।

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃনাং ভবতি মুক্তয়ে।

শ্রী—

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে কালীপূজার পূর্ব্বে শিলংএর চন্দ্রকান্ত ঘোষের অনুরোধে ও উৎসাহে আমি শিলং হইতে শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করিতে আসি। কলিকাতা আসিয়া জনৈক বন্ধুর সহিত (ইনি পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করিয়াছিলেন) উদ্বোধনের বাটিতে যাই। শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের পর উক্ত বন্ধুটি হঠাৎ আমার দীক্ষার কথা মায়ের নিকট উত্থাপন করেন। উত্তরে মা বলিলেন "বেশ ত কালকে হবে"। হঠাৎ এ উত্তরে আমি প্রথমে চমকিয়া উঠিলাম কারণ আমি দীক্ষার কথা বলিতে তাহাকে বলি নাই এবং আমার মনেও দীক্ষার কথা উঠে নাই। যাহা হউক পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনরায় তথায় যাইলাম। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে যাইতেছি, তখন শ্রীশ্রীমা বলিলেন "এখন নয়, আমি বলে দিব কখন দিতে হবে"। দীক্ষা হইয়া গেলে পর পা দুটি আমার সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন "এখন দিতে পার"। পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আমি অকপট ভাবে বলিলাম "আমি যে ফুল দিয়া পূজা করলুম এ আমার ভক্তি বিশ্বাস থেকে নয়, চন্দ্রকান্ত বাবু আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যেরূপ বলে দিয়েছেন তাই মাত্র করে গেলুম। চন্দ্রকান্ত বাবুই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন"। শ্রীশ্রীমা সহাস্যে বলিলেন "চন্দ্রকান্ত ত তোমায় ভাল পথই দেখিয়েছে, বাবা"। এই বলিয়া সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিলেন।

*　　*　　*　　*　　*

ইহার পর একবার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম। কথায় কথায় দুঃখ করিয়া মাকে বলিয়াছিলাম—"মা, সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাট, তার উপর চাকরী আছে, কাজেই জপতপ আর হয়ে উঠে না। মনের উন্নতিও হচ্ছে না"। মা অভয় দিয়া অমনি বলিলেন "এখন যাই হউক, শেষটায় ঠাকুরকে আসতেই হবে (তোমাদের নিতে)। তিনি নিজে বলে গেছেন, তাঁর মুখের কথা কি ব্যর্থ হতে পারে? যা প্রাণে আসে করে যাও"। "মা, যারা তোমার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে তাদের নাকি আর আসতে হবে না?"

মা—"না তাদের আর আস্‌তে হবে না। তোমরা সর্ব্বদা জেনো, তোমাদের পেছনে একজন রয়েছেন"।

"মা, তোমায় পেয়েছি, এই আমাদের ভরসা"।

মা—"তোমার চিন্তা কি বাবা, তোমাদের কথা আমার খুব মনে হয়।"

* * * * *

আর একবার কোয়াল পাড়া মঠে শ্রীশ্রীমার সহিত কথা প্রসঙ্গে মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, সাধন ভজন কিছু হয়ে উঠছে না।"

মা অভয় ও আশ্বাস দিয়া বলিলেন "তোমাকে কিছু কর্ত্তে হবে না, যা কর্ত্তে হয় আমি করবো"।

বিস্মিত হইয়া বলিলেন "আমার কিছু কর্ত্তে হবে না?"

মা—"না"। "তুমি তবে এখন হতে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতি আমার নিজকৃত কর্ম্মের উপর নির্ভর করে না?"

মা—"তুমি কি করবে? যা করতে হয় আমি করবো"। শ্রীশ্রীমায়ের এই অহেতুক কৃপায় আমি নির্ব্বাক হইলাম। পুনরায় কথা প্রসঙ্গে মায়ের পায়ের ব্যথার কথা উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"শুনেছি কেউ কেউ পা ছুঁলে তোমার কষ্ট হয় মা"—"হাঁ বাবা, কেউ কেউ ছুঁলে শরীরটি যেন শীতল হয়ে যায়, আবার একএকজন আছে ছুঁলে মনে হয় যেন বোলতায় কাম্‌ড়ে দিলে: কাউকে কিছু বলিনে"।

মনে হয় ভাব্‌ছি তবে আমরাও কি ঐ বোলতা শ্রেণীর? অন্তর্যামিনী বলিয়া উঠিলেন—"বাবা, তোমরা নও"।

* * * *

ইহার মাস খানেক পরে পুনরায় রথযাত্রার ছুটীতে কোয়ালপাড়া মঠে যাই, রথযাত্রার দিন শ্রীশ্রীমার সঙ্গে কথা হইতেছিল:—

আমি—"মা, তোমার কৃপা পেয়েছি এই আমার বল ভরসা।

মা—"তোমার চিন্তা কি বাবা, তুমি আমার অন্তরে রয়েছে।

কোন অভাব, প্রয়োজনে মনে চিন্তা এলে অমনি তোমাদের কথা মনে উঠে—ইন্দু টিন্দু রয়েছে, ভাবনা কি? তোমার কিছু কর্ত্তে হবে না। তোমার জন্য আমিই কচ্ছি"।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার যেখানে যত সন্তান আছে, সকলের জন্তই তোমার কর্ত্তে হয়?"

মা—"সকলের জন্তই আমার কর্ত্তে হয়।"

আমি—"তোমার এত এত ছেলে রয়েছে, সকলকে তোমার মনে পড়ে?"

মা—"না, সকলকে কিছু মনে আসে না।"

আমি—"তবে যে বল্লে তুমি সকলের জন্তই করে থাক?"

মা—"যার যার নাম মনে আসে, তাদের জন্ত জপ করি। আর যাদের নাম মনে না আসে, তাদের জন্ত ঠাকুরকে এই বলে প্রার্থনা করি—ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে অনেক যায়গায় রয়েছে, যাদের নাম আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, তাদের যাতে কল্যাণ হয়, তাহাই কোরো"।

—ইন্দুভূষণ সেন।

* উক্ত ভক্ত মাকে মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দিতেন। পরে যখন আমেরিকা হইতে টাকা আসা বন্ধ হয় (পূজনীয় শরৎ মহারাজের মারফত ঐ টাকা আসিত) তখন ইনি ২৫৲ টাকা করিয়া দিতেন। ইতি

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধি

(অনুবাদ)

ব্রহ্মচর্য্য বা আত্ম-সংযমন সম্বন্ধে কোন কিছু লেখা বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ভাণ্ডারের কিঞ্চিৎ শস্তসম্ভার পাঠকবর্গের সহিত আস্বাদন করি, এই বাসনা আমার মনে বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তদুপরি নানাস্থান হইতে এ সম্বন্ধে যে সব পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাও আমার ইচ্ছাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

অনেক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপারটা কি? ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালন কি সম্ভবপর? যদি তাহাই হয়, আপনি কি সেইভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন?"

ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃষ্ট ও প্রকৃত অর্থ ব্রহ্মের অন্বেষণ। সকল জীবেই ব্রহ্ম বর্ত্তমান; সুতরাং আত্মোপলব্ধি দ্বারা এবং আত্মায় নিমগ্ন থাকিয়াই ব্রহ্মের সন্ধান করা যায়। সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় সংযমন ব্যতিরেকে ব্রহ্মের উপলব্ধি অসম্ভব। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য অর্থে সর্ব্বত্র এবং সতত চিন্তা-বাক্য ও কর্ম্মে সকল ইন্দ্রিয়ের সংযমন বোঝায়।

যথাযথ ভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেই রিপুর হস্ত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে পারেন। বস্তুতঃ এরূপ লোকেব স্থান ভগবানের সন্নিকটে—এরূপ লোকই ঈশ্বরকল্প।

চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালন যে সম্ভবপর এতদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি দুঃখের সহিত প্রকাশ কবিতেছি যে, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা আমি এখনও লাভ করিতে পারি নাই—যদিও অধুনা জীবনেব প্রতি মুহূর্ত্তেই আমি তদবস্থা প্রাপ্তিব জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি। তবে ইহ জীবনেই সেই অবস্থা লাভ করিবার আশা আমি পবিত্যাগ করি নাই। এখন দেহটা আমার সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছে; জাগ্রতাবস্থায় নিজের উপর আমার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকে। রসনাকে সংযত রাখিতে, আমি কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছি, কিন্তু যে অবস্থা লাভ করিলে চিন্তাস্রোতকে দমন রাখা যায়. সে অবস্থা প্রাপ্ত হইতে এখনও আমার অনেক বিলম্ব আছে। চিন্তাপ্রবাহের উদ্ভব ও বিলয় আমার কথা মত ঘটে না। সুতরাং আমাব মনটাই দেখিতেছি সতত আত্মদ্রোহী।

জাগ্রতাবস্থায় আমি পরস্পর-বিরোধী চিন্তাগুলিকে দমন করিয়া রাখিতে পারি। জাগ্রতাবস্থায় আমার মন কুচিন্তার হস্ত হইতে মুক্ত বলিতে পারি। কিন্তু সুপ্তাবস্থায় চিন্তাপ্রবাহ সংযমের ক্ষমতা আমার অনেকটা কম দেখিতেছি। সুপ্তিসময়ে নানাবিধ চিন্তাই মনকে অধিকার করিয়া বসে। কখন অচিন্ত্যপূর্ব্ব স্বপ্ন, কখন ইতঃপূর্ব্বে রক্তমাংসের

দেহে যাহা উপভোগ করিয়াছি বা যে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি তৎসমুদায়ের ভোগ বাসনা মনকে বিচলিত করিয়া তোলে। আবার এই সকল চিন্তা বা স্বপ্ন যদি অপবিত্র রকমের হয়, তবে তাহার ফলে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটে। এইরূপ ঘটা যাহার পক্ষে সম্ভবপর তাহাকে সকল রিপুর হস্ত হইতে মুক্ত বলা চলে না। সত্য পথ হইতে আমার পদস্খলনের মাত্রা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু এখনও একেবারে বন্ধ হয় নাই। যদি চিন্তাপ্রবাহের উপর আমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব থাকিত, তবে ফুস ফুস প্রদাহ, আমাশয়, উপাঙ্গপ্রদাহ রোগে আমাকে বিগত দশ বৎসর এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। আমার বিশ্বাস, সুস্থদেহই বিশুদ্ধ আত্মার আবাসস্থল। ইন্দ্রিয় বৃত্তির হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মা যতই সুস্থভাব অবলম্বন করে, ততই দৈহিক স্বাস্থ্যও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুস্থদেহ বলিতে কিন্তু সকল সময়ে হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ বোঝায় না। অনেক সময় শীর্ণদেহেও তেজস্বিতা পরিলক্ষিত হয়। কিয়ৎকাল অন্তর এমন এক অবস্থা আসে, যখন আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই মাংসপিণ্ডও হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। সম্পূর্ণ সুস্থদেহও অতিমাত্র শীর্ণ হইতে পারে। বলিষ্ঠদেহে অনেক সময় নানা উপসর্গ সংঘটনের সম্ভাবনা থাকে। আপাত দৃষ্টিতে উহা নীরোগ বোধ হইলেও মহামারী বা সংক্রামক ব্যাধির কবল হইতে কখনই মুক্ত নহে। পক্ষান্তরে, প্রকৃত সুস্থদেহের উপর উল্লিখিত ব্যাধি মোটেই কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। নির্দ্দোষ শোনিতের মধ্যে সংক্রামক রোগ প্রতিষেধের স্বাভাবিক ক্ষমতা বিগুমান। এরূপ সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি বস্তুতঃই সুকঠিন। নতুবা আমিও সেই অবস্থায় পৌছিতে পারিতাম; কারণ তদবস্থা লাভের জন্য আমি যে শ্রমের ত্রুটি করিতাম না, এ বিষয়ে আমার অন্তরাত্মাই সাক্ষ্য দান করিবে। বাহিরের কোন অন্তরায়ই আমার উক্ত অবস্থালাভের পথে বাধা জন্মাইতে পারিবেনা। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সংস্কার মুছিয়া ফেলা সকলের পক্ষে সহজ নয়—অন্ততঃ আমার পক্ষেত নয়। তবে তদবস্থালাভে বিলম্ব ঘটিতেছে বলিয়া আমি বিন্দুমাত্র ও ভগ্নোৎসাহ হই নাই; কারণ সেই দোষ লেশশূন্য অবস্থার একটি চিত্র

আমার মানস-নেত্রে সততই প্রতিবিম্বিত হইতেছে ; এমন কি ইহার ক্ষীণদীপ্তিও আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এক্ষেত্রে যেটুকু উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছি তাহাতেই আমার অন্তর আশায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—নৈরাশ্য দূরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ আমার আশাপূর্ণ হইবার পূর্ব্বেও যদি এই নশ্বরদেহ ত্যাগ করিতে হয়, তথাপি আমি মনে করিব না যে আমার সংকল্প মোটেই সিদ্ধ হয় নাই। এই দেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার যেরূপ বিশ্বাস আছে, পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ বিশ্বাস। সুতরাং আমার ধারণা, অতি সামান্য প্রচেষ্টাও বিফলে যাইবে না।

নিজের বিষয়ে আমার এতকথা বলিবার একমাত্র কারণ এই যে ইহা শুনিয়া হয়ত আমার সঙ্গে এসম্বন্ধে যাঁহারা পত্র ব্যবহার করিতেছেন তাঁহারা এবং তদ্রূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গ হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিবেন ও আত্মবিশ্বাসী হইবেন। সকলের ভিতর একই আত্মা বর্ত্তমান। সুতরাং প্রত্যেকের পক্ষেই উন্নতি লাভের সম্ভাবনাও একইরূপ। তবে কাহারো মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। কাহারো মধ্যে ইহা প্রকাশের কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চেষ্টা করিলে সকলেই একইরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে একই রূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন।

এই পর্য্যন্ত আমি ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাপক অর্থ ধরিয়াই আলোচনা করিয়াছি। সাধারণ অর্থে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা কার্য্য বাক্য ও চিন্তায় ইন্দ্রিয়-লালসার নিরোধ বোঝায়। অর্থটি এই ভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। এরূপ ব্রহ্মাচর্য্য পালন সুকঠিন বলিয়াই লোকের ধারণা। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়াসক্তি দমন এত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে যে এই কাজটি একেবারে অসম্ভব বলিলেও হয়। রসনা পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা দমনের জন্য সাধারণের তেমন দৃষ্টি নাই বলিয়াই এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ভিষকগণও আপন আপন অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন যে ব্যাধি বিশীর্ণ দেহই ইন্দ্রিয়পরায়ণতার লীলা ভূমি। সুতরাং এই রোগজীর্ণ জাতির পক্ষে স্বভাবতঃ ব্রহ্মচর্য্য পালন সাতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আমি ক্ষীণাঙ্গ অথচ সুস্থকায় ব্যক্তি সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে আমি শারীরিক চর্চ্চাকে অবহেলার চক্ষে দেখিতেছি একথা যেন কেহ বুঝিয়া না বলেন। আমি আমার অমার্জ্জিত ভাষায় ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণতার দিকটা লইয়াই আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং আমারএ ব্যাখ্যাটা কেহ কেহ হয়ত ভুল বুঝিতেও পারেন। সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় দমন যাঁহার অভিপ্রায় তিনি রক্ত মাংসের দেহের হ্রাস প্রাপ্তিকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া না লইয়া পারেন না। স্থূল দেহের প্রতি আসক্তি বিদূরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক বল লাভের আকাঙ্ক্ষাও প্রশমিত হইয়া যাইবে।

পরন্তু, প্রকৃত ব্রহ্মচারীর দেহ সাতিশয় সতেজ ও সুদৃঢ় না হইয়া যায় না। আবার এরূপ ব্রহ্মচারীও পৃথিবীতে দুর্লভ। নিদ্রাবশেও যিনি কামরিপুর তাড়নায় বিচলিত না হন তিনি বস্তুতঃই সকলের পূজার্হ। অপরাপর রিপু দমনও তাঁহার পক্ষে সুসাধ্য হইয়া আসিবে। শেষোক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে অপর এক বন্ধু লিখিয়াছেন,—"আমি বড় শোচনীয় দশাগ্রস্ত। কুচিন্তা আমার মস্তকে চাপিয়া বসিয়াছে। কি আফিসগৃহে কাজ করিবার কালে, কি পথ চলিবার সময়, কি দিবসে, কি রজনীতে, কি অধ্যয়ন কালে, কি অন্তকালের সময়, কোন কালেই কুচিন্তা আমাকে পরিত্যাগ করেনা, এমন কি উপাসনার সময়েও নহে। এই বিপথগামী মনকে কিরূপে সংযত করিব? প্রত্যেক মহিলার প্রতি মাতৃভাব পোষণের শিক্ষা কোথায় লাভ করিব? চক্ষু কি ভাবে চতুর্দ্দিকে পবিত্র প্রেম বিকিরণে সক্ষম হইবে? কিরূপে অপবিত্র চিন্তা সমূলে উৎপাটিত হইবে? বহুপূর্ব্বে রচিত আপনার ব্রহ্মচর্য্য প্রবন্ধটি আমি সম্মুখেই রাখিয়া দিয়াছি; কিন্তু ইহাও আমাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করিতে পারিতেছেনা।"

এটি নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা বলিতে হইবে। অনেককেই এরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত মনটি কুচিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত থাকিবে, ততদিন নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। চক্ষু ঐরূপ অনিষ্টের কারণ হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ মুদ্রিত করিবে, কর্ণ

তদ্রূপ হইলে তাহাও বন্ধ করিয়া ফেলিবে। সতত অধোবদনে পথ চলাই শ্রেয়ঃ তাহা হইলে চক্ষুও বিপথগামী হইতে পারিবেনা।

যে স্থানে অশ্লীল কথা বা কুৎসিৎ সঙ্গীত হয় সে স্থান হইতে সতত দূরে থাকিবে। রসনাকে সম্পূর্ণ স্ববশে রাখিবে। রসনা পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা যে দমন করিতে পারে নাই তাহার পক্ষে ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধও অসম্ভব বলিয়াই আমার বিশ্বাস। রসনার উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকিলে, তৎ সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয় বৃত্তির উপর কর্তৃত্ব ও আপনা আপনিই সংস্থাপিত হয়। * রসনা সংযমনের একটি উপায় ব্যঞ্জনাদিতে যথাসম্ভব সর্ব্ববিধ মসলাবর্জ্জন। এতদপেক্ষা কঠিনতর আরও একটি পন্থা রহিয়াছে। সর্ব্বদা হৃদয়ে এই ভাবটি পোষণের চেষ্টা করিতে হইবে যে জীবনধারণের জন্যই আমাদের আহারের প্রয়োজন, রসনা পরিতৃপ্তির জন্য নহে। বায়ু সেবনের উদ্দেশ্য একটা সম্ভোগ নহে, নিশ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক জীবন ধারণই উহার উদ্দেশ্য। যেরূপ তৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে আমরা জল পান করিয়া থাকি, তদ্রূপ কেবল ক্ষুধা নিবারণের জন্যই আমাদের আহার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু শৈশব হইতেই আমাদের অন্যরূপ অভ্যাস গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। পিতামাতাই আমাদের ভিতর সর্ব্ব প্রকার সুস্বাদু আহার্য্য গ্রহণের অভ্যাস জন্মাইয়া দিয়া থাকেন। আমাদের দেহের পরিপুষ্টি বিধান তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, আমাদের প্রতি তাঁহাদের অতিমাত্র স্নেহের পরিতৃপ্তি সাধনই ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এরূপ ভাবেই আমাদের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত হয়। এই হেতু আমাদিগকে উক্তরূপে বদ্ধমূল কুনিয়মের বিরুদ্ধে সতত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়।

তবে কুবাসনা দমনের একটি উৎকৃষ্ট উপায়ও রহিয়াছে। পবিত্র 'রাম' নাম অথবা এরূপ কোন মন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণই সেই পন্থা। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' জপ করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহার নিকট যে মন্ত্রটি ভাল লাগে তিনি তাহাই জপ করিতে পারেন। আল্লা, গড যাঁহার যে নামে

---

* জিতং সর্ব্বং জিতে রসে (ভাগবত)।

রুচি তাহাই তাঁহার পক্ষে কার্য্যকরী হইবে। আমি প্রথমেই রাম নামের কথা বলিলাম; কারণ আশৈশব রাম এই নাম জপ করিতেই আমি অভ্যস্ত হইয়াছি। তদ্দ্বারা হৃদয়ে সতত কত বল পাইয়া থাকি। যিনি যে মন্ত্রই অবলম্বন করুন না কেন, উহা জপ করিবার সময় তন্মধ্যে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে হইবে। মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলেও ঐরূপ যে কোন মন্ত্র জপের ফলে পরিনামে সুফল লাভ যে সম্ভবপর, এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। মন্ত্রই লোকের জীবন বর্ত্তিকা, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের মহৌষধ। কিন্তু পার্থিব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এই সকল পূতমন্ত্রোচ্চারণ কথনই সমীচীন নহে। যদি শুদ্ধ নৈতিক বল লাভের জন্য ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারিত হয় তবে তাহার আশ্চর্য্য রকম ফল উপলব্ধি হইবে। কিন্তু তোতাপাখীর ন্যায় শুধু মুখে মুখে উক্তরূপে মন্ত্র জপ করিলে কোনই ফলোদয় হইবে না। মন্ত্রের মধ্যে একেবারে তন্ময় হইয়া থাকিতে হইবে। তোতাপাখীত শুধু যন্ত্রের ন্যায় বাক্যটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া যায়। অসৎ চিন্তা উদয়ের পথে বাধা জন্মাইবার জন্যই ঐ সমুদায় মন্ত্র জপ করা আবশ্যক; আর জপ করিবার কালে মন্ত্রেব কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

—শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়।

সংগীত *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিগত কার্ত্তিকে প্রাচীন সংগীত সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা উদ্বোধন পাঠক-পাঠিকাকে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে স্বরাধ্যায় প্রভৃতি সম্বন্ধে আরও একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক।

* উদ্বোধন, কার্ত্তিক, ১৩৩১

স্বরসমূহ যখন সংগীতে ব্যবহার হয় তাহাদিগকে বর্ণ বলে। সংগীত-দর্পণকার বর্ণ সকল চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) স্থায়ী, (২) আরোহী (৩) অবরোহী ও (৪) সঞ্চারী।

(১) ষড়জাদি গ্রামে যে সকল স্বরে কিছু কাল ধরিয়া অবস্থান করিতে হয় তাহাকে স্থায়ী স্বর বলে।

(২) স্বর-সমূহের উর্দ্ধগমনকে (সা রে গা মা ইত্যাদি) আরোহী স্বর বলে।

(৩) স্বর সমূহের নিম্নগমনকে (র্স নি ধা পা ইত্যাদি) অবরোহী স্বর বলে।

(৪) স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী এই তিনের সংমিশ্রণে স্বর সঞ্চারকে সঞ্চারী বলে। (সং, দ, ১৬০-৩)

বর্ণ সকলের অপর প্রকার ভেদ—(১) গ্রহ, (২) ন্যাস, ও (৩) অংশ এবং (১) বাদী, (২) সংবাদী, (৩) অনুবাদী ও (৪) বিবাদী, আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে কিছু বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে বাদী স্বরের সহিত সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদীর সম্বন্ধ কি বুঝিতে হইলে স্বর সম্বন্ধে আর একটু বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। কোন জিনিষে আঘাত করিলে বাতাসে কম্পনের সৃষ্টি করে, সেই কম্পন তরঙ্গাকারে ছড়াইয়া পড়ে। উহা যখন আমাদের কর্ণপটাহে আঘাত করে তখন আমরা শুনিতে পাই, এবং উহাকে আমরা ধ্বনি (Simple Tone) বলি। একটি ঘড়ি একটি কাচের আবরণের মধ্যে রাখিয়া যদি তাহার মধ্যস্থিত বায়ু আমরা যন্ত্র সাহায্যে বাহির করিয়া লইতে থাকি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যতই বায়ু কমিতেছে ততই শব্দও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে এবং যখন ঐ কাচের আবরণের মধ্যস্থিত বায়ু একবারে নিঃশেষিত হইবে তখন আর শব্দও শুনা যাইবে না। সেই জন্য বায়ুকে আমরা শব্দবাহী বলিতেছি। আকাশ শব্দবাহী হইলেও আমরা সাধারণ অবস্থায় উহার মধ্য দিয়া শুনিতে পারি না। এক্ষণে বাতাসে যদি পর পর একই সংখ্যায় প্রতিক্ষণে কোনও ধ্বনি তরঙ্গ সঞ্চার করে, এবং ঐ শব্দের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (Wave-length) যদি কম বেশী হয় তাহা

হইলে উহা আমাদের কর্ণে কর্কশ স্বরের সৃষ্টি করে। কাহারও গলার স্বর কর্কশ কাহারও মধুর তাহার কারণ ঐ। এখন এই শব্দগতির একটা নিয়ম আছে। ১ কম্পন বিশিষ্ট শব্দ এক সেকেণ্ডে ১,১২০ ফিট করিয়া দৌড়ায়। শব্দ বিভিন্ন প্রকারের আছে। এক্ষণে যদি আমরা বিভিন্ন শব্দের কম্পনের সংখ্যা দিয়া ১,১২০কে ভাগ দেই তাহা হইতে সেই সেই বিভিন্ন শব্দ-তরঙ্গের পরিসর আমরা প্রাপ্ত হই। যে শব্দের কম্পন সংখ্যা ২৪ তাহার তরঙ্গের পরিসর $\frac{১১২০}{২৪}$ = ৪৬$\frac{২}{৩}$। কিন্তু এই ধ্বনির (Simple Tone) দ্বারা সঙ্গীতের যথার্থ মাধুর্য্য বিকাশ হয় না। সংগীতে যাহাকে স্বর (Compound Tone) বলে প্রকৃত পক্ষে তাহাকে বিশ্লেষণ করিলে বহু ধ্বনিতে (Simple Tone) বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই ধ্বনিই বাদী স্বরকে সংবাদী অনু-বাদী স্বরের মধ্য দিয়া সাহায্য করে। সাদা রং যেন স্বর আর লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বেগুনী, কমলা, ধূসর যেন ধ্বনি। অথবা সবুজ যেন স্বর এবং হলদে এবং নীল যেন ধ্বনি। জগতে যেমন সাতটি রং (যদিও তাহারা মিশ্রিত) দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি সাতটি সুরও স্বাভাবিক ভাবেই আছে, উহা মানুষের কৃত নয় মানুষ উহার দ্রষ্টা মাত্র। এই ৭টি শুদ্ধ সুর+৫টি কোমল+১০টি অতি কোমল লইয়া আমাদের ২২টি শ্রুতি (upper partials) যাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে আমরা আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্ত (তামিল) ও গ্রীক-দিগের শ্রুতি বিভাগ উপস্থাপিত করিলে পাঠক পাঠিকার বিষয়টি আরও হৃদয়ঙ্গম হইবে।

	নি	সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি
		৪	৪	৩	২	৪	৩	২=২২ আর্য্যাবর্ত্ত
		৪	৩	২	৪	৪	৩	২=২২ দাক্ষিণাত্ত
		৪	৪	২	৪	৪	৪	২=২৪ গ্রীক
পরিবর্ত্তিত হইয়া		৪	৩	২	৪	৪	৩	২=২২ আর্য্যাবর্ত্ত

দক্ষিণ দেশীয় নাট্যশাস্ত্রে (প্রায় ৫০০ শতাব্দীতে রচিত) ষড়জের সহিত অপরাপর স্বরের শ্রুতি ও মাত্রা (?) ভেদ লিখিত আছে। যথা—

সপ্তক (সা হইতে নি)......২২ শ্রুতি বা ১২০০ মাত্রা

পঞ্চম (সা " পা)......১৩ " " ৭০২ "

চতুর্থ (সা " মা)......৯ " " ৪৯৮ "

মুখ্য-দ্বিতীয় { সা " রে / মা " পা / ধা " নি }...৪ " " ২০৪ " (Tone)

গৌণ-দ্বিতীয় { রে " গা / পা " ধা }...৩ " " ১৮২ " (Minor-Tone)

অতি-গৌণ দ্বিতীয় { গা " মা }...২ " " ১১২ " (Semi-Tone)

ষষ্ঠ (সা হইতে ধা) এবং তৃতীয়কে (সা হইতে গা) এই পর্য্যায়ে ধরা হয় নাই তাহার কারণ উহারা বিবাদী স্বর।

এক্ষণে বাদী সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী বুঝিতে হইলে ষড়জাদি সপ্তক ষষ্ঠাদির সম্বন্ধ আরও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রাচীন ঋষিরা হয়ত শব্দ বিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন বা অতি তীক্ষ্ণ শ্রুতি শক্তির দ্বারা ঐ সকল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন কিন্তু আধুনিক অধিকাংশ ওস্তাদজীদের উক্ত দুইটি শক্তির কোনটিই দৃষ্ট হয় না। সেই জন্য গণিত ও জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা ঐ সকল তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বায়ুতে কম্পন সৃষ্টির দ্বারা ধ্বনির উৎপত্তি হয়। বৈজ্ঞানিক সেভার্টের (Savart) পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছিল নিম্ন ধ্বনি (খাদ) সেকেণ্ডে ১৬ বার কম্পন না হইলে শ্রুতিগোচর হয় না এবং উচ্চ ধ্বনি (চড়া) সেকেণ্ডে ৯০০০ কম্পন পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয়; তাহার পর মানুষের কর্ণ পটাহ আর উহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। সেভার্ট বলিলেন নিম্নে ৭ এবং উর্দ্ধে ২৪০০০ কম্পন পর্য্যন্ত কর্ণ পটাহ ধারণ করিতে পারে। কিন্তু ডিপ্রেজ (Despretz) আপত্তি দেখাইলেন ১৬ কম্পনের কম হইলে কোনও শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। সাইরেন (Syren) নামক যন্ত্র সাহায্যে ধ্বনির কম্পন নির্ণীত হয়। ক্যাগনিয়ার্ড

লাটুর (Cagniard Latour) ইহার আবিষ্কর্ত্তা। যাহা হউক হেলম হলজ (Helmholtz) আসিয়া আরও নিকট সিদ্ধান্ত করিলেন ধ্বনির আরম্ভ ৩০ কম্পন হইতে এবং ইহা সংগীতে ব্যবহার করিতে হইলে ৪০ কম্পন বিশিষ্ট স্বর প্রয়োজন হয়। ইঁহার মতে উচ্চ ধ্বনি সেকেণ্ডে ৩৮,০০০ কম্পন পর্য্যন্ত শ্রুত হয়। অতঃপর (Preyer) আসিয়া ঐ মত আরও সম্পূর্ণতার দিকে লইয়া গেলেন। তিনি স্থির করিয়াছেন মানুষের কর্ণপটাহ ১৬ হইতে ২৪ কম্পনের মধ্যে নিম্নে (খাদে) শুনিতে পায় এবং উচ্চে ৪১,০০০ কম্পন পর্য্যন্ত শুনা সম্ভব। কিন্তু সাধারণতঃ ১২,০০০ হইতে ১৬০০০ কম্পনের মধ্যেই মানুষের কর্ণপটাহ বধির হইয়া যায়।

এক্ষণে সাইরেন নামক যন্ত্র সাহায্যে নির্ণীত হইয়াছে, যে কোনও স্বরকে আমরা ষড়জ ধরি না কেন, উহাকে ১ কম্পন বিশিষ্ট ধরিয়া উহার সহিত যদি আমরা অপরাপর স্বরের কম্পন সংখ্যা তুলনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই—

১ সা হইতে রে $\frac{৯}{৮}=১\frac{১}{৮}$ গুণ উচ্চ বা অধিক কম্পন বিশিষ্ট
রে „ গা $\frac{৫}{৪}=১\frac{১}{৪}$ „ „
গা „ মা $\frac{৪}{৩}=১\frac{১}{৩}$ „ „
মা „ পা $\frac{৩}{২}=১\frac{১}{২}$ „ „
পা „ ধা $\frac{৫}{৩}=১\frac{২}{৩}$ „ „
ধা „ নি $\frac{১৫}{৮}=১\frac{৭}{৮}$ „ „
নি „ সা ২ „ „

এক্ষণে মুদারা (প্রথম সপ্তক) সা এর কম্পন সংখ্যা (যদি প্রেয়ারের (Preyer)) ২৪ ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—

রে „ „ „ $২৪ \times \frac{৯}{৮}$ = ২৭
গা „ „ „ $২৪ \times \frac{৫}{৪}$ = ৩০
মা „ „ „ $২৪ \times \frac{৪}{৩}$ = ৩২
পা „ „ „ $২৪ \times \frac{৩}{২}$ = ৩৬
ধা „ „ „ $২৪ \times \frac{৫}{৩}$ = ৪০
নি „ „ „ $২৪ \times \frac{১৫}{৮}$ = ৪৫

(দ্বিতীয় সপ্তক) তারা এই প্রকারে

সা´ „ „ „ ২৪ × ২ = ৪৮

রে´ „ „ „ ৪৮ × $\frac{৯}{৮}$ বা ২৭ × ২ = ৫৪

গা´ „ „ „ ৪৮ × $\frac{৫}{৪}$ বা ৩০ × ২ = ৬০

মা´ „ „ „ ৪৮ × $\frac{৪}{৩}$ বা ৩২ × ২ = ৬৪

(তৃতীয় সপ্তক) এই প্রকার

সা´´ „ „ „ ৪৮ × ২ বা ২৪ × ৪ = ৯৬

রে´´ „ „ „ ৯৬ × $\frac{৯}{৮}$ বা ৫৪ × ২ = ১০৮

গা´´ „ „ „ ৯৬ × $\frac{৫}{৪}$ বা ৬০ × ২ = ১২০

(চতুর্থ সপ্তক) (অশ্রুত) এই প্রকারে

সা´´´ „ „ „ ৯৬ × ২ বা ২৪ × ৮ = ১৯২

রে´´´ „ ১০৮ × ২ বা ১৯২ × $\frac{৯}{৮}$ বা ২৪ × ৯ = ২১৬

গা´´´ „ ১২০ × ২ বা ১৯২ × $\frac{৫}{৪}$ বা ২৪ × ১০ = ২৪০

অথবা মা´´´ „ ৩২ × ৮ বা ২৪ × ১১ = ২৬৪

পা´´´ „ „ „ ৩৬ × ৮ বা ২৪ × ১২ = ২৮৮

ধা´´´ „ „ „ ৪০ × ৮ বা ২৪ × ১৩ = ৩১২

নি´´´ „ (কোমল নিষাদ) ২৪ × ১৪ = ৩৩৬

কারণ নি ১৮০ × ২ বা ১৯২ × $\frac{১৫}{৮}$ বা ৪৫ × ৮ বা ২৪ × ১৫ = ৩৬০

তাহা হইলে দেখা গেল প্রথম সপ্তক ৮ গুণিত কম্পন বিশিষ্ট হইয়া চতুর্থ সপ্তকে গিয়া পুনরায় ফুটিয়া উঠে। সেইজন্য ষড়জ গ্রামকে প্রাকৃতিক সপ্ত স্বর বলিতে হইবে।

কিন্তু ২৪ × ২ = ৪৮ স´

২৪ × ৩ = ৭২ পা´

২৪ × ৪ = ৯৬ সা´´

২৪ × ৫ = ১২০ গা´´

২৪ × ৬ = ১৪৪ পা´´

২৪ × ৭ = ১৬৮ নি´´

ইহার পর হইতে চতুর্থ সপ্তকের ষড়জ গ্রামের পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয়।

রসায়ণ শাস্ত্রেও অণু সকলের গুরুত্ব (Atomic weight) বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ধর্ম্মের (properties) পুনরাবৃত্তি দৃষ্ট হয়। সুরে যেমন ৮ গুণিত হইয়া চতুর্থ সপ্তকে পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হয়, আনবিক গুরুত্বানুযায়ী অণুগুলি পর পর ক্রমিক সংখ্যায় সাজাইলে, সংখ্যাগুলিতে ৮ যুক্ত করিলে সম ধর্ম্ম বিশিষ্ট অণু সকল দৃষ্ট হয়। যথা ৩ (Lithium), ১১ (Sodium), ১৯ (Potassinm) সম ধর্ম্মী ; ৪ (Beryllium) ১২ (magnesium) ২০ (Calcium) সম ধর্ম্মী ; ৫ (Boron), ১৩ (Aluminium) ২৯ (Scandium) সম ধর্ম্মী ; ৬ (Carbon) ১৪ (Silicon) ২২ (Titanium) সম ধর্ম্মী ; (পরে ১৮ যুক্ত হইলে সম ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়) ইহারই নাম রসায়ণ শাস্ত্রে Periodic Law। বর্ণ ছত্রেও (Spectrum) দেখা যায় ৭টি রঙকে (Vibegyor) যদি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (wave-length) আধিক্যানুযায়ী পর পর পর সাজান যায় তাহা হইলে দেখা যায় লোহিতের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেগুনীর তরঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ হইয়া পড়ে। পুনবাবর্ত্তন প্রকৃতির নিয়ম। বেদ জগতটাকেই কল্পে কল্পে পুনরাবর্ত্তন বলিতেছেন—যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ। এই হেতু Eternal and Infinite Evolution হিন্দু দার্শনিকদিগের নিকট একটা কথার কথা মাত্র।

এক্ষণে উক্ত স্পন্দন সংখ্যা হইতে কিরূপে সংবাদী (Consonant) বিবাদী (dissonant) নির্ণয় করিতে হয় বলা যাইতেছে। দুইটি স্বরের স্পন্দন সংখ্যা বিয়োগ করিলে বিয়োগ ফল যদি উদারা বা তন্নিম্ন সপ্তকের স্বরের স্পন্দন সংখ্যার সহিত মেলে, এবং মুদারার সামীপ্য ও দূরাত্বানুযায়ী, সম্বাদী অনুবাদী হইয়া থাকে ; যাহারা মিলে না তাহারা বিবাদী যথা—

সা (২৪) – গা (৩০) = ৬। এই অবশিষ্ট ৬ কম্পন দুই গ্রাম নিম্নের সা কে ধ্বনিত করে সুতরাং গা সায়ের অতিদূর পরিপোষক ; এই হেতু ইহা অনুবাদী। সা (২৪) – পা (৩৬) = ১২। এই ১২ অবশিষ্ট কম্পন উদারার সাকে ধ্বনিত করিয়া সায়ের অতি নিকট পরিপোষক ; এই হেতু ইহাকে সংবাদী বলে। এইরূপে সা এবং রের সম্বন্ধ থাকিলেও অপ্রকৃত ; এবং সা ও

ধার সম্বন্ধ বিবাদী ; মা ও সার সম্বন্ধ সম্বাদী ; সা নি, রে গা, রে নি রেমা বিবাদী ; মা ধা অনুবাদী।

একণে সরল, কোমল ও কড়ির স্পন্দন সংখ্যাও আমরা নিম্নে দিতেছি—

সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি	সা
২৪	২৭	৩০	৩২	৩৬	৪০	৪৫	৪৮

ঋ	জ্ঞ	ক্ষ	দ	ণ
২৬$\frac{২}{৩}$	২৮$\frac{৪}{৫}$	৩৩$\frac{৩}{৪}$	২৮$\frac{২}{৫}$	৪৩$\frac{১}{৫}$

সরল স্বর গণের আর একটি পরস্পর সম্বন্ধ আছে। তাহাও আমরা নিম্নে দিতেছি—

সা হইতে রে $\frac{২৭}{২৪}$ = $\frac{৯}{৮}$ গুণ চড়া

রে „ গা $\frac{৩০}{২৭}$ = $\frac{১০}{৯}$ „ „

গা „ মা $\frac{৩২}{৩০}$ = $\frac{১৬}{১৫}$ „ „

মা „ পা $\frac{৩৬}{৩২}$ = $\frac{৯}{৮}$ „ „

পা „ ধা $\frac{৪০}{৩৬}$ = $\frac{১০}{৯}$ „ „

ধা „ নি $\frac{৪৫}{৪০}$ = $\frac{৯}{৮}$ „ „

নি „ সা´ $\frac{৪৮}{৪৫}$ = ১$\frac{৪৫}{৪৮}$ „ „

একণে যাহাদের সম্বন্ধ পরস্পব $\frac{৯}{৮}$ গুণ চড়া (অর্থাৎ সা বে, মা পা ও ধা নি) তাহাদিগকে মুখ্য-দ্বিতীয় (Tone) বলে। যাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ $\frac{১০}{৯}$ গুণ চড়া (অর্থাৎ রেগা, পাধা) তাহাদিগকে গৌন-দ্বিতীয় (minor Tone) বলে। যাহাদেব পরস্পর সম্বন্ধ $\frac{১৬}{১৫}$ চড়া (অর্থাৎ গা মা) তাহাকে অতি-গৌণ (Semi-tone) বলে।

পুনশ্চ Chord স্বর সংযোগ দিয়া বাজনা বাজাইলে শ্রুতি মধুর হয় তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণ হইতেই প্রাপ্ত হই। ইহা নির্ণয় কবিবার একটি উপায় বলা যাইতেছে। যে সকল স্বরের কম্পন সংখ্যাকে ৬ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায় তাহাদিগকে ইংরাজীতে Major chord (মুখ্য স্বর সংযোগ) বলে। যথা—

সা : গা = ২৪ : ৩০ = ৪ : ৫

সা : পা = ২৪ : ৩৬ = ৪ : ৬

গা : পা = ৩০ : ৩৬ = ৫ : ৬

অতএব সা + গা + পা—মুখ্য স্বর-সংযোগ (Major chord)। আবার যে সকল স্বরের কম্পন সংখ্যাকে ৮ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায় তাহাদিগকে Chord of the Sixth (ষষ্ঠ স্বর সংযোগ) বলে। যথা—

সা : মা = ২৪ : ৩২ = ৩ : ৪

সা : ধা = ২৪ : ৪০ = ৩ : ৫

মা : ধা = ৩২ : ৪০ = ৪ : ৫

সেই জন্য স + মা + ধা—ষষ্ঠ স্বর সংযোগ (Chord of the Sixth)। ইহা ছাড়া আরও চারিটি সংযোগ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যথা—

সা + জ্ঞা + পা (Minor Traid)

সা + মা + পা (Chord of the fourth)

সা + জ্ঞা + দা

সা + গা + ধা

এক্ষণে আমরা সুবিখ্যাত গীত-সূত্র-সারের লেখকের বাদী বিবাদী সংবাদী সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা (পৃষ্ঠা ১২২) এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

শার্ঙ্গদেব, মতঙ্গ, দত্তিল, বিশাখিল, প্রভৃতি গ্রন্থকারের মতে যে দুই সুর ১২ কি ৮ শ্রুতি ব্যবধানে অবস্থিত, তাহারা পরস্পরের সংবাদী * ; যেমন সা-এর সংবাদী ম ও প, এবং মা ও পা এর সংবাদী সা, সেইরূপ রে ও ধা, এবং গা ও নি পরস্পর সংবাদী। এক্ষণে মনে কর, কোন চারিটি রাগে যদি রে বাদী হয় তবে সেই কয়রাগেই ধা সম্বাদী, পা অনুবাদী ও গা বিবাদী হইলে, ঐ চারি রাগের পার্থক্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে? এই জন্যই বলি, যে ঐ সকল শব্দের অর্থ ওরূপ নহে।

* শ্রুতয়ো দ্বাদশাষ্টৌ বা যয়োরন্তর গোচরা।
মিথো সম্বাদিনৌ তৌ—॥ সঙ্গীত রত্নাকর।

তবে সে কোন্ অর্থ ইহাও বুঝা কঠিন। আমার বোধ হয়, বাদী সংবাদী দ্বারা গ্রামস্থ সুর নিচয়ের পরস্পর মিলের সম্বন্ধ, অর্থাৎ হার্ম্মনি বুঝায়। কোন সুরের সহিত তাহার পঞ্চম ও মধ্যমের মিল অতি নিকট, সেই জন্য তাহারা সংবাদী। সা এর পঞ্চম ১২ শ্রুতি ব্যবহিত ; অবরোহণে ঐ পা ৮ শ্রুতি ব্যবহিত। আরোহণে ম-এর পর ১২ শ্রুতি ব্যবহিত যে পর সপ্তকের সা, তাহা ঐ ম-এর পঞ্চম ; অবরোহণে সেই সা ম হইতে ৮ শ্রুতি ব্যবহিত। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কোন সুরের সহিত তাহার পঞ্চমের যে সম্বন্ধ, তাহাই সংবাদী। কিন্তু উপরে বলিলাম যে, সা-এর উচ্চ ও নিম্ন পঞ্চমের শ্রুতি ব্যবধান দুই প্রকার,—১২ ও ৮। এই জন্যই শাস্ত্র কারেরা, বোধ হয়, সংবাদীর ঐ দুই প্রকার শ্রুতি ব্যবধানের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রকার ব্যবধানের যে দুই অবস্থা অর্থাৎ উচ্চ ও নীচ, মধ্য-কালীয় গ্রন্থকরেরা তাহার অভিপ্রায় না জানাতে, সা-এর দুই সংবাদী মা ও পা ধরিতে হইয়াছে, অথচ মা-এর পর ৮ শ্রুতি ব্যবহিত যে নি, তাহাকে মা-এর সংবাদী বলা হয় নাই। বস্তুত উল্লিখিত বিচার মতে নি মা এর সংবাদী হইতে পারে না, কেননা উহা মা-এর পঞ্চম নহে এই নিয়মই যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় ; কারণ বাদী-সুর দ্বারা যেমন রাগ প্রতিপন্ন হয়, তাহার অমাত্য প্রধান সাহায্যকারী যে সংবাদী সুর, অর্থাৎ বাদীর পা, সেও যে রাগ প্রতিপাদন বিষয়ে সাহায্য করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে রাগে সা-বাদী, তাহাতে পা—বর্জ্জিত হইতে পারে না ; সেইরূপ পা—বর্জ্জিত রাগে সা সুর বাদী হইবে না। যেমন আধুনিক প্রচলিত মালকোশ রাগে পা-বর্জ্জিত হওয়াতে মা বাদী হইতে পারে, কেননা মা এর পঞ্চম সা ঐ রাগের সংবাদীরূপে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই অর্থও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। ফলতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা ব্যতীত বাদী-সংবাদীর অর্থ সামঞ্জস্য হওয়াও দুষ্কর।

সংগীত-রত্নাকরের টিকাকার সিংহভূপাল লিখিয়াছেন যে, "বাদীর স্থানে তাহার সংবাদী প্রযুক্ত হইলে, জাতি রাগের হানি হয়" *, ইহার

* যস্মিন্ গীতে অংশত্বেন পরিকল্পিতঃ ষড়্জঃ তৎস্থানে মধ্যমঃ

অর্থ কি? টিকাকার অর্থ করিতে গিয়া ঐ প্রকার অনেক গোলমাল করিয়াছেন। মতঙ্গের মতে দুই শ্রুতি অন্তরে যে স্বর, তাহা বিবাদী যেমন রে-র বিবাদী গা, ধা এর বিবাদী নি, অর্থাৎ অর্দ্ধান্তর ব্যবহিত স্বর সকলের পরস্পর মিল নাই, তজ্জন্যই বিবাদী, কিনা শ্রুতি কটু। আবার "গা ও নি সকল স্বরেরই বিবাদী" বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে *, ইহার তাৎপর্য্য কিছুই পরিব্যক্ত হয় না।

"যে সকল স্বরের পরস্পর বিবাদিত্ব ও সংবাদিত্ব নাই, তাহারা অনুবাদী" †, যেমন সা—এর অনুবাদী রে ও ধা, পা-এরও রে ও ধা, রে এর মা ও সা ইত্যাদি; অর্থাৎ, ইহাতে বোধ হয়, অনুবাদীর মিল সংবাদীর ন্যায় নিকট নহে, এবং বিবাদীর ন্যায় অমিল ও নহে। পরন্তু সিংহভূপাল ইহাও বলেন যে, "যে বাদী স্বর দ্বারা রাগের রাগত্ব সমুদিত হইয়াছে, তাহাকে যে প্রতিপন্ন করে, সেই অনুবাদী ‡; যেমন সা স্থানে রে, কিংবা রে স্থানে সা প্রযুক্ত হইলে জাতি রাগেব বিনাশ হয় না।" ইহার অর্থ কি? কিছুই বুঝা যায় না।

(ক্রমশঃ)

স্বামী বাসুদেবানন্দ

ক্রিয়মানো রাগো ন ভবেৎ, যস্মিন্ বা অংশত্বেন মূর্চ্ছনাবশান্মধ্যমঃ প্রযুক্তঃ তৎস্থানে ষড়্জঃ প্রযুজ্যমানে জাতি রাগহানং ভবতি। সঙ্গীত রত্নাকর টীকা।

* নিগাবন্য বিবাদিনৌ ॥
　রি-ধয়োরেব সা স্যাতাং তৌ তয়ো র্বা রি-ধা বপি। সং, র।

† যেষাং পরস্পরবিবাদিত্বং সম্বাদিত্বং চ নাস্তি তেষামনুবাদিত্বম্। সং, র, টিকা

‡ যদ্বাদিনা রাগস্য রাগত্বং সমুদিতং তৎ প্রতিপাদকত্বং নাম অনুবাদিত্বম। ততশ্চ ষড়্জ স্থানে ঋষভঃ প্রযুজ্যমানঃ ঋষভ স্থানে ষড়্জঃ প্রযুজ্যমানঃ জাতি রাগ বিনাশ করো ন ভবতি। সং, র, টীকা।

এরিষ্টটল ও বাহ্যজগৎ

জগৎ বলিতে যাহা বুঝি এক কথায় সমস্ত বাহ্য পদার্থ তাহার অন্তর্গত। যাহা গতিশীল তাহা লইয়াই জগৎ। এরিষ্টটলও তাহাই বুঝিয়াছিলেন কারণ তিনি গতির (motion or movement) তত্ত্বের সাহায্যে জগতের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁর মতে গতি ছাড়া পৃথকভাবে জগতের আলোচনা অসম্ভব তিনি বলেন গতিতত্ত্ব বুঝিলেই জগৎ রহস্য বুঝা যাইবে।

প্লেটো ভাব (Idea) ও বাহ্য জগৎ (matter) কে পৃথকরূপে আলোচনা করিয়াছেন। এরিষ্টটল বলেন ওরূপভাবে আলোচনা অসম্পূর্ণ ও একদেশ দোষে দুষ্ট। এরিষ্টটলের মতে জড় (matter) ভাবের (Idea) অব্যক্ত বা অপরিপূর্ণ অবস্থামাত্র। কোনও শক্তি বলে সেই ভাবের (Idea) অভিব্যক্তি হইতেছে তাই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে বা সৃষ্টি হইতেছে। সুতরাং জগৎ আলোচনায় ভাবকে (Idea) বাদ দিলে চলিবে না।

জগৎ ব্যাপার ভাবের (Idea) অভিব্যক্তি। (Idea) ভাব পদার্থটি চিৎপূর্ণ সুতরাং ভাবের অভিব্যক্তির বা জগতের মধ্যে একটি নিয়ম থাকিবেই; চিতের অভিব্যক্তি বা কার্য্য কখনও এলোমেলো হইতে পারে না। এরিষ্টটল যখন বলেন জগতের প্রত্যেক ব্যাপারটি বা ক্রিয়াটি (self-determined) স্বয়াপেক্ষ ও (uniform) নিয়মবদ্ধ তখন মনে হয় এরিষ্টটল ঐ তত্ত্বই প্রকারান্তরে উল্লেখ করিতেছেন।

গতির তিন প্রকার প্রভেদ এরিষ্টটল স্বীকার করিতেন (Quantitative) পরিমাণগত (Qualitative) গুণগত ও (Spatial) দেশগত। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় পদার্থের আয়তন বা পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহার গুণের পরিণতি ঘটে—সেটি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে

যায়। এই 'গতি' 'শক্তিকে' অপেক্ষা করে। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায় পরিমাণ-গত পরিণাম দেশগত পরিণামেরই অন্তর্গত। গতি বলিলেই দেশ ও কালের কথা মনে পড়িবে। গতি হইলেই দেশে হইবে, কালে ঘটিবে। দেশ বলিতে এরিষ্টটল কোন পদার্থ (body) অথবা শূন্য (void) বুঝিতেন না। তাঁর মতে পদার্থের একটি উপাদান (matter) আছে, আকৃতি (form) আছে। দেশের কোন উপাদান নাই কোন আকৃতিও নাই। কোন পদার্থ নষ্ট হইলে সেই পদার্থ দ্বারা অধিকৃত দেশ নষ্ট হয় না। দেশ যদি কোন একটি পদার্থ হইত তাহা হইলে দেশ ও দেশাধিকৃত দুইটি পদার্থ একই স্থানে থাকিতে পারিত না। সুতরাং পদার্থ ও দেশ এক নয়। দেশ বলিতে এরিষ্টটল পদার্থের মধ্যে ব্যবধানকেও বুঝিতেন না। এরিষ্টটলের মতে শূন্য বলিয়া কিছু নাই। কোন স্থান শূন্য না থাকায় পদার্থের দেশগত পরিণাম বলিতে স্থানের পরিবর্ত্তন মাত্র বুঝায়। পরিণাম বলিলেই দেশকে অপেক্ষা করে সুতরাং যাহার পরিণাম নাই সেই পদার্থ অবশ্য দেশাতীত হইবে।

এরিষ্টটল বলেন জগতের প্রত্যেক বস্তুই দেশ ব্যপিয়া আছে অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুরই সীমা আছে। পরন্তু সমগ্র জগৎ বলিতে যাহা বুঝায় তাহাকে সীমাবদ্ধ করিবে কে? যাহার বাহিরে কিছু নাই তাহার সীমা থাকিতে পারে না, সুতরাং সমগ্র জগতের সীমা থাকিতে পারে না, সীমা না থাকায় তাহার অন্যত্র গতি নাই। তাই এরিষ্টটল বলেন এই জগৎ আপনার মেরুদণ্ডে আপনি ঘুরিতে পারে মাত্র, এবং সেইরূপ ভাবই ঘুরিয়া থাকে।

গতি যেমন দেশকে অপেক্ষা করে তেমনি কালকেও অপেক্ষা করে। একটি পদার্থ এই মুহূর্ত্তে এ স্থানে ছিল পর মুহূর্ত্তে ওস্থানে চলিল। ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকায় ঘটনায় পারম্পর্য্য ব্যাপারে পরিমাণ ঘটিত যে ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে সেটি কে স্থির করিবে? এরিষ্টটল বলেন "আত্মা"। 'মান' অর্থাৎ মাপ করা বলিতেই চৈতন্য সম্পন্ন কাহাকেও অপেক্ষা করে।

এরিষ্টটলের মতে দেশ সীমাবদ্ধ কিন্তু কাল সীমাহীন। তাঁর মতে জগৎ অনন্ত নয় সান্ত তাই দেশ সীমাবদ্ধ। পরন্তু কাল সীমাবদ্ধ হইতে পারে না, কারণ কোন ঘটনার পূর্ব্বে অপর কোন ঘটনা ঘ ট নাই বা অন্য কোন ঘটনা পরে ঘটিবে না এটি ধারণার অতীত। "কালকে সীমাবদ্ধ বা সান্ত বলিয়া ধারণা করা যায় না বলিয়াই অনন্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কাল অনন্ত সুতরাং গতিরও বিরাম নাই। গতি অবিরত চলিতেছে সুতরাং শক্তিও অনন্ত।

ক্রিয়া যেমন কর্ত্তার অপেক্ষা করে শক্তি তেমনি শক্তিমানের অপেক্ষা করে। অনবস্থ দোষ পরিহারের জন্যও গতি বা শক্তির আধার স্বীকার করা প্রয়োজন। অনবরত বা অনাদি কাল হইতে যে পরিণাম সাধিত হইতেছে সেটি কাহার দ্বারা সাধিত হইতেছে এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যাইবে না যদি শক্তিমান একজনের অস্তিত্ব স্বীকার করা না হয়। পরিণামকে অলীক বা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে শক্তিমান একজনের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন না হইতে পারে কিন্তু এরিষ্টটল পরিণামকে মিথ্যা মনে করিতেন না সুতরাং শক্তিমান একজনের অস্তিত্ব তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সেই শক্তিমান পুরুষ এরিষ্টটলের মতে সকল শক্তির মূলাশ্রয়, সুতরাং তিনি কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহেন। তিনি কালাতীত। যাহা কালাতীত তাহার পরিণাম নাই সুতরাং তিনি অপরিবর্ত্তনীয় ও অপরিণামী।

দেশ কাল ছাড়া জগৎ ব্যাপারে আর একটি পদার্থের প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যাপার যেমন দেশে হয়, কালে ঘটে, তেমনি কারণের অপেক্ষা করে। প্রত্যেক ব্যাপারের কারণ তাঁর মতে শক্তি বিশেষ। কারণের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে একটি মূল কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন হয়, নচেৎ অনবস্থা দোষ ঘটে। এই যুক্তি অনুসারেও মূল কারণ বা শক্তিমান পুরুষ একজন স্বীকার করা প্রয়োজন হয়। এরিষ্টটল বলেন জগতে যে সকল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে মোটামুটী দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি লঘু অপরগুলি গুরু। যাহারা গুরু তাহাদের গতি নিম্নদিকে যাহারা লঘু

তাহাদের গতি ঊর্দ্ধদিকে। আমরা আরও দেখিতে পাই যাহা শীতল তাহা গুরু, যাহা উষ্ণ তাহা লঘু। যাহা লঘু তাহাতে অগ্নি বা তেজের প্রাধান্য, যাহা গুরু তাহাতে পার্থিব বা ক্ষিতির প্রাধান্য বর্ত্তমান। উষ্ণ পদার্থের চরম—তেজ, শীতল পদার্থের—পৃথিবী বা ক্ষিতি। এরিষ্টটল এই দুইটি চরম পদার্থের মধ্যে অপর দুইটি পদার্থ স্বীকার করিতেন, একটির নাম অপ্ বা জল, অপরটির নাম বায়ু। পদার্থকে এই প্রকারে মোটামুটী ৪ ভাগে বিভাগ করিলেও এরিষ্টটল বলেন যে সেই ৪টি পদার্থ মূলতঃ একটি পদার্থের ৪ প্রকার অভিব্যক্তি মাত্র। উদাহরণ স্বরূপে তিনি বলেন বরফ গলিয়া জল হয়, জল গরম হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়। পরিমাণগত পরিবর্ত্তন বা পরিণাম যে দেশগত পরিবর্ত্তনের অন্তর্গত সে কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছিল। পদার্থের গুণগত পরিণাম যেমন পার্থিব পদার্থ বরফের জলীয় পদার্থ জলে পরিণতি শুধু দেশগত বা পরিমাণ গত পরিবর্ত্তনের পরিচয় প্রদান করে, সুতরাং গুণগত পরিবর্ত্তনকে ও দেশগত বা পরিমাণগত পরিবর্ত্তনের অন্তর্গত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। গুণগত, দেশগত, ও পরিমাণগত পরিবর্ত্তন ছাড়া আর একটি পরিবর্ত্তনের তিনি উল্লেখ করেন—সেটির নাম উৎপত্তি ও নাশ। বলা বাহুল্য ইহাকে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার পরিণামের অন্তর্গত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই স্থলে হিন্দু দর্শনের ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম পঞ্চ ভূতের কথা স্বভাবতঃ মনে পড়ে। এরিষ্টটল তন্মধ্যে ৪টি স্বীকার করিতেন বুঝা গেল। তাঁর দর্শনে Ether শব্দের পরিচয় পাই কিন্তু এটিকে তিনি পার্থিব পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁর মতে এটি স্বর্গীয় বা অপার্থিব পদার্থ এবং ইহা অপর ৪টি পদার্থের কারণ। হিন্দু দর্শন মতে ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্ বা জল এবং জল হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। ব্যোমে ১টি গুণ, মরুতে ২টি, তেজে ৩টি, জলে ৪টি ও ক্ষিতিতে ৫টি গুণ বর্ত্তমান। এরিষ্টটল কিন্তু এরূপ ভাবে পদার্থকে বিভাগ করেন নাই।

আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় যে ভাবে যে পদার্থ গ্রহণ করে সেই ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হিন্দুদার্শনিকগণ পদার্থগুলিকে বিভাগ করিয়াছিলেন— চক্ষু তৈজস পদার্থ তাই তেজ গ্রহণ করে ইত্যাদি। হিন্দুশাস্ত্রে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতার পরিচয় পাওয়া যায় চক্ষুর অধিষ্ঠাত— সূর্য্যদেব। সেই সূর্য্যদেব আবার শাস্ত্রমতে স্বর্গে থাকেন—এ পৃথিবীর বাহিরে। এরিষ্টটল যখন বলেন স্বর্গে পার্থিব পদার্থ নাই সেস্থান Ether অপার্থিব পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ সেখানে সূর্য্য (Sun-Jupiter) চন্দ্র (Moon) বাস করেন তখন গ্রীক দর্শনের সহিত হিন্দুদর্শনের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া চমকিত হইতে হয়।

এরিষ্টটল স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যে একটি প্রভেদ স্বীকার করিতেন। তাঁর মতে মর্ত্তের অর্থাৎ এ জগতের সবই পরিণামী বা পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু স্বর্গীয় পদার্থের এরূপ পরিবর্ত্তন বা পরিণাম নাই। স্বর্গে আবার ক্রম আছে; মূল পদার্থ শ্রীভগবান সর্ব্বোপরি ধামে বিরাজ করেন, তিনি চিৎপূর্ণ, আনন্দ পূর্ণ; স্বর্গবাসী দেবতাগণ সান্নিধ্য অনুসারে তাঁর অর্থাৎ মূল ভগবানের সাদৃশ্য লাভ করেন। হিন্দুশাস্ত্রের সহিত এবিষয়েও আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে পার্থিব পদার্থ মাত্রেই গতিশীল অপার্থিব পদার্থ স্থির অচঞ্চল। মূল পদার্থ অর্থাৎ শ্রীভগবানই একমাত্র স্থির দেশাতীত কালাতীত কারণাতীত; স্বর্গবাসী অন্য দেবতাগণ কিন্তু সম্পূর্ণ সেরূপ নহেন, পরন্তু তাহাদের সহিত মর্ত্তবাসীর প্রভেদ এই তাঁহাদের কার্য্য নিয়মবদ্ধ এত নিয়মবদ্ধ যেন যন্ত্র পরিচালিত যেমন চন্দ্র সূর্য্য ইত্যাদি। এরিষ্টটল বলেন নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে শুধু চৈতন্য সম্পন্ন জীবই পারে, যার জ্ঞান যত অধিক তার কার্য্য তত সুনিয়মিত, অজ্ঞানীই এলোমেলো ভাবে কার্য্য করে। কিন্তু একমাত্র শ্রীভগবান ছাড়া কেহই অনন্ত জ্ঞান সম্পন্ন নয়; তাই স্বর্গবাসী দেবগণের অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারকাদির কার্য্যে মধ্যে মধ্যে অনিয়মের পরিচয় পাওয়া যায়।

এরিষ্টটল দর্শনে এই সকল পৌরাণিক উক্তি থাকায় কেহ কেহ তাঁর

দর্শনে স্ববিরোধ দোষ প্রদর্শন করেন, কেহ বা এই সকলকে রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; বৈজ্ঞানিক শিহরিয়া উঠেন, কিন্তু ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ ইহার মধ্যেই সত্যের আভাষ পান ও এরিষ্টটলের বাক্যকে আপ্ত বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

—শ্রীকানাইলাল পাল এম-এ, বি-এল।

সাংখ্য দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৭

পরে কারিকা সমূহে প্রায়ই পুরুষার্থ শব্দ পাওয়া যাইবে। পুরুষার্থ মানে ভোগ এবং অপবর্গ। অর্থ মানে প্রয়োজন। প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ হইয়াছিল। এই সংযোগ দ্বারা কি বুঝায় তাহা প্রকাশ করা উচিৎ। স্বচ্ছস্ফটিক পাত্রের সন্নিধানে রঙ্গিন ফুলের স্থাপন এই সংযোগের দৃষ্টান্ত। পাত্র স্বচ্ছ কিন্তু নিকটস্থ ফুলের রং অনুসারে পাত্র বিভিন্ন বর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। রক্ত জবা পুষ্পে পাত্র রক্ত, নীল অপরাজিতায় পাত্র নীল। আমি দুঃখী, আমি সুখী যখন এই কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া ভিতরের ভাব প্রকাশ করে তখন যে আমি এবং আমার রূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া যে "আমি" কে জানাইতে চাহি সেই "আমি" চৈতন্য বা পুরুষ নহে—উহা অভিমান। আর একটি বাক্য গ্রহণ করা যাউক। "আমি জানি আমি দেখিতেছি"। এই বাক্যে দুইটি "আমি" আছে। প্রথম আমি দ্বিতীয় "আমি"র রেখারূপ কার্য্য জানিতেছে। কার্য্য মানে পরিণাম। আমি জানিতেছি

আমি দেখি, আমি জানিতেছি আমি শুনি, আমি জানিতেছি আমি শুঁকি, ইত্যাদি বাক্যে প্রথম আমি সর্ব্বদাই জানে, দ্বিতীয় আমি কখনও দেখে কখনও শুনে, কখনও শুঁকে ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্য করে বা পরিণাম পায়। যে আমি সতত জানে এবং যে আমি ক্ষণে ক্ষণে কখনও বা দেখে কখনও বা শুনে কখনও বা শুঁকে এই দুই আমি পরস্পর জড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ আলোকে দেখার মতন দুই আমি প্রতীত হয়, কিন্তু সে প্রতীতি অস্পষ্ট। প্রথম আমি চৈতন্য, দ্বিতীয় আমি মহতের পরিণাম অহঙ্কার। বিদ্যুৎ যদি ক্ষণদা না হইত তবে দুই আমির পার্থক্য স্পষ্ট হইত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত। জ্ঞান এবং আলোক একই কথা, যে জ্ঞান বা আলোকের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত দুই আমিকে বরাবর স্পষ্ট পৃথক দেখা যায় তাহাই হইতেছে বিবেক জ্ঞান বা অপবর্গ। যতক্ষণ সেই আলোক না আসে ততক্ষণ দুই আমি এক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে পড়ে, অর্থাৎ দ্বিতীয় আমির সুখ দুঃখ মোহ প্রথম আমির সুখ দুঃখ মোহ বলিয়া মনে হয়, ততক্ষণ এই ভুলের নাম পুরুষের ভোগ।

ইতিপূর্ব্বে অব্যক্তের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তি দেখান হইয়াছে। ১৭ কারিকায় 'সংঘাত পরার্থত্বাৎ' প্রভৃতি ৫ হেতু দ্বারা পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা হইয়াছে।

সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃ ভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥

পদপাঠ। সংঘাত পর অর্থত্বাৎ ত্রিগুণ আদি বিপর্য্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ। পুরুষঃ অস্তি ভোক্তৃ ভাবাৎ কৈবল্য অর্থং প্রবৃত্তেঃ চ ॥

অন্বয়—সংঘাত পরার্থত্বাৎ, ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়াৎ, অধিষ্ঠানাৎ, ভোক্তৃ ভাবাৎ, চ, কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ পুরুষ অস্তি।

পুরুষ আছেন। কি করিয়া জানিলে? জানিবার ৫ হেতু আছে যথা। (১) সংঘাত পরার্থত্ব (২) ত্রিগুণ বিপর্য্যয়, (৩) অধিষ্ঠান, (৪) ভোক্তৃভাব, এবং (৫) কৈবল্য প্রবৃত্তি।

সংঘাত পরার্থত্ব—সংঘাত বা সংহতের পরার্থত্ব। পর বা অপরের

অর্থত্ব বা প্রয়োজন। সম্মিলিত ভাবে দশের কার্য্য মূলে অপর কাহারও প্রয়োজন থাকে। রাজমিস্ত্রি, ছুতার মিস্ত্রি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে; সেই কার্য্য হইতেছে অট্টালিকা নির্ম্মাণ। অট্টালিকা ছুতারের কিংবা রাজমিস্ত্রির কিংবা কুলীমজুরের কিংবা ইহাদের মধ্যে কাহারও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য নির্ম্মিত হয় না। অট্টালিকাকে কেবলমাত্র ছুতার কিংবা রাজমিস্ত্রির কিংবা কুলী মজুর কেহই নিজকৃত বলিতে পারে না। কেবলমাত্র বৃক্ষের দ্বারা বৃক্ষজ্ঞান হয় না, কেবলমাত্র চক্ষু দ্বারা বৃক্ষ জ্ঞান হয় না কেবলমাত্র মনের দ্বারা বৃক্ষজ্ঞান হয় না। বৃক্ষজ্ঞান বৃক্ষ, চক্ষু, মন প্রভৃতির সম্মিলিত কার্য্যের ফল। এই জ্ঞান বৃক্ষের জন্যও হয় না, চক্ষুর জন্যও হয় না, মনের জন্যও হয় না। তবে কাহার জন্য হয়? নিশ্চয়ই একজন অপর কাহারও জন্য হয়। ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়=ত্রিগুণের মধ্যে রেসারেসি ধস্তাধস্তি। অব্যক্তে তিনগুণ সাম্যভাবে থাকে। ব্যক্তে তিনগুণে ধস্তাধস্তি হয়; কেন এইরূপ হয়? নিশ্চয়ই এই ধস্তাধস্তির মূলে অপর কেহ একজন আছেন। পুরুষ নিমিত্ত কারণ। বিপর্য্যস্ত শব্দের এবং বিপর্য্যয় শব্দের মূল এক। বিপর্য্যস্ত=ওলট পালট।

অধিষ্ঠান—রথ সজ্জিত, সারথি অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া বসিয়া আছেন রথী যেই রথে অধিষ্ঠিত হইলেন অমনি রথ চলিতে লাগিল। সারথি ও অশ্ব ব্যতীত নিশ্চয়ই অপর কেহ একজন আছেন যাঁহার অধিষ্ঠানে দেহ রূপ রথ চলিতেছে। চৈতন্যের সান্নিধ্য বশতঃ অচেতন মন চেতন তুল্য হয়।

ভোক্তৃভাব=ভোক্তার ভাব। জগতে এত রূপ, এত গন্ধ সুন্দরভাবে সজ্জিত আছে ইহা কি বৃথা সজ্জিত আছে। রূপ রূপকে ভোগ করে না, শব্দ শব্দকে ভোগ করে না, বিষয় বিষয়কে ভোগ করে না; এ বিষয় কে ভোগ করিবে? নিশ্চয়ই এই বিষয় ভোগের জন্য বিষয়ের অতিরিক্ত অপর কেহ একজন আছেন।

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি=যত্ন, চেষ্টা। কেবলের ভাব কৈবল্য। কেবল শব্দের অর্থ একমাত্র। বন্ধন শব্দে দুইটি বস্তু বুঝায় যথা রজ্জু এবং রজ্জু-বদ্ধ। রজ্জু-বদ্ধই রজ্জু ছিন্ন করিয়া একমাত্র হইতে চায়। সুখ দুঃখ এবং মোহ ইহারা রজ্জু স্বরূপ। তবুও তাহার কেন মধ্যে মধ্যে এই বন্ধন

ছিন্ন করিবার প্রবৃত্তি হয়। এই প্রবৃত্তি তো সুখ দুঃখ মোহাত্মক বুদ্ধির নহে। তবে কার প্রবৃত্তি? নিশ্চয় অপর কেহ একজন আছেন যাঁহার সন্নিধান বশতঃ এইরূপ প্রবৃত্তির আবির্ভাব হয়। এই অপর কেহ যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছিনা তিনিই পুরুষ।

অর্থ—সংহত কার্য্য পরের প্রয়োজনের জন্য ঘটে; ত্রিগুণের সাম্য ভাবের যে বৈষম্য হয় তাহার হেতু আবশ্যক; অধিষ্ঠাতা ব্যতীত রথ চলে না, ভোগ করিবার বস্তু থাকিলেই ভোক্তার আবশ্যক, হৃদয়ে সংসার ত্যাগের প্রবৃত্তি সময় সময় জাগে; এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পুরুষ আছেন।

১৮

সাংখ্য মতে আত্মা বহু জীবও বহু। বৈদান্তিকেরা বলেন আত্মা এক কিন্তু জীব বহু। ১৮ কারিকায় ত্রিবিধ যুক্তি দ্বারা আত্মার বহুত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

জন্মমরণ করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ বহুত্বংসিদ্ধং ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যয়াচ্চৈব॥

পদপাঠ। জন্ম মরণ করণানাং প্রতি নিয়মাৎ অযুগপৎ প্রবৃত্তেঃ চ। পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যয়াৎ চ এব॥

অন্বয়—জন্ম মরণ করণানাং প্রতিনিয়মাৎ, অযুগপৎ প্রবৃত্তেঃ চ, ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যয়াৎ চ এব পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং॥

জন্মমরণ করণানাং প্রতিনিয়মাৎ। করণ = ইন্দ্রিয়। প্রতি = প্রত্যেক, পৃথক পৃথক। নিয়মাৎ = নিয়ম হইতে, বিধান হইতে। নিয়মাৎ, প্রবৃত্তেঃ, বিপর্য্যয়াৎ এই তিন শব্দেই হেত্বার্থে পঞ্চমী হইয়াছে। জন্মাদি শরীরের ধর্ম্ম। শরীর আত্মার ভোগায়তন। জীবে জীবে জন্ম মৃত্যু এবং ইন্দ্রিয়ের পৃথক পৃথক নিয়ম বা ব্যবস্থা হেতু। যদি আত্মা বহু না হইত, তবে এক ভোগায়তনের নাশে যাবতীয় ভোগায়তনের নাশ ঘটিত।

অযুগপৎ প্রবৃত্তেঃ। অযুগপৎ (প্রবৃত্তির বিশেষণ) ন—যুগপৎ; যুগপৎ = এক সঙ্গে; অন্তঃকরণের চেষ্টার নাম প্রবৃত্তি। এক সঙ্গে প্রবৃত্তির অভাব হেতু। জীবগণের একসঙ্গে ধর্ম্মাদিতে প্রবৃত্তি হয় না

বলিয়া। ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যয়াৎ=ত্রৈগুণ্যের বৈষম্য হেতু। জীবে জীবে ত্রিগুণ ভাবের ভিন্নতা হেতু।

কেহ সত্বগুণ প্রধান অতএব সুখী, কেহ রজগুণ প্রধান অতএব দুঃখী, আবার কেহ বা তমোগুণ প্রধান অতএব মূঢ়। কেন এ বৈষম্য? উত্তর পুরুষের বহুত্ব। সুখ দুঃখ মোহ, ইন্দ্রিয়ের বিফলতা, জন্ম মৃত্যুর নানাত্ব দেখিয়া বহু পুরুষ সিদ্ধ হইয়াছে। যদি পুরুষ বহু না হইয়া এক হইত তবে এক জনের ইন্দ্রিয় বিফল হইলে, সকলের ইন্দ্রিয় বিফল হইত, একজন সুখী হইলে সকলেই সুখী হইত।

অর্থ—সকল জীবের এক সঙ্গে জন্ম মৃত্যু বা ইন্দ্রিয়ের বিকলতা দেখা যায় না; সকলের এককালে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না; এক পুরুষে এক গুণ প্রবল, অপরে অন্য গুণ প্রবল। অতএব পুরুষ বহু। ১৯ কারিকায় পুরুষের স্বভাব সংগৃহীত হইয়াছে। ১১ কারিকায় পুরুষ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯

তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থং দ্রষ্টৃত্বম কর্ত্তৃভাবশ্চ॥

পদপাঠ। তস্মাৎ চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বম্ অস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থং দ্রষ্টৃত্বম্ অকর্ত্তৃভাবঃ চ॥

অন্বয়—তস্মাৎ বিপর্য্যাসাৎ অস্য পুরুষস্য সাক্ষিত্বম্, কৈবল্যম্, মাধ্যস্থম্ দ্রষ্টৃত্বম্ অকর্ত্তৃভাবঃ চ সিদ্ধম্॥

তস্মাৎ=সেই, বিপর্য্যাসাৎ চ=বিপর্য্যয়, বৈপরীত্য হইতেই, অস্য= এই, পুরুষস্য=পুরুষের, সাক্ষিত্বাদি স্বভাব, সিদ্ধং=সিদ্ধ হয়। কি কি? স্বভাব, সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ, দ্রষ্টৃত্ব এবং অকর্ত্তৃভাব। সেই বৈপরীতৎ কোন বৈপরীতৎ? ১১ কারিকায় উহার উল্লেখ আছে। পুরুষ ব্যক্ত এবং অব্যক্তের বিপরীত। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়ই ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন এবং প্রসবধর্ম্মি। অর্থাৎ পুরুষ চেতন, গুণাতীত, অনুৎপাদক ইত্যাদি। পূর্ব্বে একাদশ কারিকায় অবিবেকি শব্দের অর্থ ভালো করিয়া দেওয়া হয় নাই। নাই বিবেক বা ভেদ যাহার, ইহারা

ত্রিগুণ হইতে ভিন্ন নহে; অথবা ব্যক্তেরা অভিন্ন হইয়া অর্থাৎ মিলিয়া কার্য্য করে। প্রধান গুণত্রয়ের স্বরূপ, ব্যক্তেরা গুণের কার্য্য। কার্য্যও কারণ অভিন্ন। সাক্ষিত্বম্। সাক্ষীর ভাব। অর্থী প্রত্যর্থীরা বিবাদের বিষয় সাক্ষাকে দেখাইয়া থাকে, সাক্ষী দেখিয়া থাকে। সাক্ষী—দ্রষ্টা হয়। দ্রষ্টৃত্বম্=দ্রষ্টার ভাব। অচেতন প্রকৃতি স্বীয় রূপ চেতন পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত করিলে পুরুষ তাহা দর্শন করে। পুরুষ চেতন বলিয়া সাক্ষী এবং দ্রষ্টা। দৃশ্ ধাতু হইতে দ্রষ্টা হইয়াছে (দৃশ+তৃণ)

কৈবল্যং—পুরুষ কেবল। কেবল=মুক্ত। ত্রিগুণ সুখ দুঃখ মোহাত্মক, যাঁহার সুখ দুঃখ মোহ ধর্ম্ম নহে তিনি মুক্ত। পুরুষ অ-ত্রিগুণ বলিয়া কেবল।

মাধ্যস্থং=মধ্যস্থের ভাব। বিবাদে অর্থী এবং প্রত্যর্থী কাহাকে মধ্যস্থ ঠিক করে?—না যিনি উভয় পক্ষের কোন পক্ষের দিকে টান দেখাইবেন না। সুখী সুখে তৃপ্ত হয়, দুঃখী দুঃখকে দ্বেষ করে, কিন্তু পুরুষ সুখ দুঃখ মোহাত্মক ত্রিগুণের অতীত, সুতবাং তিনি মধ্যস্থ বা উদাসীন।

অকর্ত্তৃভাব=অকর্ত্তার ভাব পুরুষ অকর্ত্তা—পুরুষ কর্ত্তা নহে। কর্ত্তা উৎপন্ন করে। জগতের যত কিছু পরিণাম বা কার্য্য তাহাদের মূলে ত্রিগুণ। কিন্তু পুরুষ অ-ত্রিগুণ অতএব তাঁহার ক্রিয়া নাই, তিনি অকর্ত্তা। গুণত্রয়ের বৃত্তির দ্বারায় অর্থাৎ বৃত্তির ক্রিয়া দেখিয়া জগতে গুণত্রয়ের কর্ত্তৃত্ব এবং পুরুষের অকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়।

অর্থ—পুরুষের স্বরূপ প্রকৃতির বিপরীত বলিয়া পুরুষ সাক্ষিমাত্র পুরুষ কেবল, পুরুষ উদাসীন, পুরুষ দ্রষ্টা, পুরুষ অকর্ত্তা।

পূর্ব্ব কারিকায় পুরুষকে অকর্ত্তা বলা হইয়াছে, কিন্তু পুরুষকে কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়। কেন এমন হয় তাহার কারণ ২০ কারিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। সাংখ্য মতে সৃষ্টি কালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। তাহার ফলে পুরুষেব গুণ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির গুণ পুরুষে উপচারিত হয়। সেই জন্য বস্তুতঃ প্রকৃতি অচেতন হইলেও চেতন বলিয়া মনে হয়, এবং বস্তুতঃ পুরুষ কর্ত্তা না হইলেও কর্ত্তা বলিয়া

মনে হয়। (গীতায় ঈশ্বর-বাদ)। এই কারিকায় বলা হইয়াছে যে একই ব্যাক্তি চেতন ও কর্ত্তা নহে।

২০

তস্মাৎ তৎ সংযোগাদচেতনংচেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥

পদপাঠ। তস্মাৎ তৎ সংযোগাৎ অচেতনম্ চেতনাবৎ ইব লিঙ্গম্। গুণ কর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তা ইব ভবতি উদাসীনঃ॥

অন্বয়—তস্মাৎ তৎ সংযোগাৎ অচেতনম্ লিঙ্গম্ চেতনাবৎ ভবতি; তথাচ গুণ কর্ত্তৃত্বে উদাসীনঃ কর্ত্তাইব ভবতি।

তস্মাৎ=সেই হেতু, পুরুষের চেতনত্ব হেতু; তৎ—তাহার, পুরুষের, সংযোগাৎ=সংযোগ হওয়াতে। বুদ্ধি অহঙ্কার মন প্রভৃতিকে ব্যক্ত বলা যায়। ১০ কারিকায় ব্যক্তকে অচেতন লিঙ্গ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। অচেতনম্ লিঙ্গম=অচেতন বুদ্ধি প্রভৃতি। পুরুষ এবং প্রকৃতির সংযোগে বুদ্ধি নামক যে প্রথম 'ব্যক্ত তত্ত্ব উদ্ভব হয়, যাহা অব্যক্তের জ্ঞাপক সেই বুদ্ধি অচেতন। সেই অচেতন বুদ্ধি সংযোগ হেতু 'চেতনাবৎ ভবতি'=চেতনের মত হয়। তথাচ=আরও অর্থাৎ ঐ সংযোগ হেতু আরও কিছু ঘটে। কি ঘটে? উদাসীনঃ=উদাসীন পুরুষ, গুণ কর্ত্তৃত্বে=ত্রিগুণের কর্ত্তৃত্ব যোগে, কর্ত্তা ইব ভবতি=কর্ত্তার মত হন। (কর্ত্তা শব্দের অর্থ কি?—"যে কার্য্যটি করিতে হইবে, তাহার অনুকূল যত্ন যাহাতে থাকে, তাহাকে সেই কার্য্যের কর্ত্তা বলে।" ত্রিগুণই সমস্ত ক্রিয়ার কারণ। ত্রিগুণই কার্য্য করে। ত্রিগুণ অচেতনের ধর্ম্ম। চেতন অচেতনের সংযোগে চেতন অচেতনের মত হয়, এবং অচেতন চেতনের মত হয়।

অর্থ—পুরুষের অতি সান্নিধ্যে বা সংযোগে অচেতন বুদ্ধি চেতনের মত হয়, এবং গুণ সকলের কর্ত্তৃত্ব সংযোগে উদাসীন পুরুষ কর্ত্তার মত হয়। ২০ কারিকায় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের কথা বলা হইয়াছে। কেন এই সংযোগ হয়, এই সংযোগের ফল কি এ বিষয় ২১ কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

২১

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।

পঙ্গবন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগস্তৎ কৃতঃ সর্গঃ ॥

পদপাঠ। পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।

পঙ্গু অন্ধবৎ উভয়োঃ অপি সংযোগঃ তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥

অন্বয়—পুরুষস্য কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য দর্শনার্থং উভয়োঃ অপি পঙ্গু অন্ধবৎ সংযোগঃ। তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥

প্রকৃতি এবং পুরুষের কেন সংযোগ হয়? ভোগ এবং পরমার্থের জন্য সংযোগ এবং তৎ ফলে সর্গঃ বা সৃষ্টি হয়। সর্গঃ (সৃজ ধাতু= বিসর্জ্জন) কারণ হইতে কার্য্যের বিসর্জ্জন বা পৃথক হওয়া। অর্থ— প্রয়োজন। পুরুষস্য কৈবল্যার্থং—পুরুষের মুক্তি বা অপবর্গের প্রয়োজন হেতু। তথা=সেই সঙ্গে।

প্রধানস্য দর্শনার্থং=প্রধানকে দর্শনের বা ভোগের প্রয়োজনে।

প্রধানস্য—কর্ম্মে ষষ্ঠি। পুরুষের ভোগ অপবর্গ এই দুই অর্থের জন্য কি হয়? না—সংযোগ। কাহার সংযোগ? উভয়োঃ অপি= উভয়েরি অর্থাৎ পুরুষ এবং প্রধানের। সে সংযোগের ফল কি? সর্গঃ। সে সর্গ কিরূপ? তৎকৃতঃ অর্থাৎ সেই সংযোগের দ্বারা কৃত। অব্যাকৃত গুণ সাম্য প্রকৃতি পুরুষকে বেষ্টন করে এবং তাহারি ফলে বুদ্ধি প্রমুখ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এই যে সংযোগের কথা বলিলাম, সে সংযোগ কিরূপ? অপঙ্গু-অন্ধ ও চক্ষুষ্‌মান-পঙ্গুর সংযোগ তুল্য। প্রয়োজন বশতঃ অন্ধ যেমন পঙ্গুকে স্কন্ধে করে, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয়।

অর্থ—পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের সাধনের জন্য পুরুষ এবং প্রকৃতির সংযোগ হয়। ক্রিয়াশীল চক্ষুহীন অন্ধের সহিত চক্ষুষ্মান অথচ ক্রিয়াশূন্য পঙ্গুর সংযোগের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ। এই সংযোগের ফলে সৃষ্টি ঘটে অর্থাৎ অব্যক্ত ব্যক্তে পরিণত হয়।

ইতিপূর্ব্বে জগতকে বিশ্লেষণ করিয়া যে জ্ঞ, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত পাওয়া যায় তাহাদিগের কি কি স্বভাব বলা হইয়াছে। এক অব্যক্ত এক পুরুষের

সহিত মিশিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। ব্যক্ত মহদাদি যে ২৩ পর্য্যায়ে বিভক্ত ২২ কারিকা হইতে তৎ বিষয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মৃত দেহ এবং জীবন্ত দেহ, উভয়েই দেহ—পার্থক্য এই যে একটি পচে আর একটি পচে না। এমন একটি বস্তু আছে যাহা দেহে অধিষ্ঠিত থাকিলে দেহ পচে না, এবং যাহা দেহে অধিষ্ঠিত না থাকিলে দেহ পচে। যাহার ভাবাভাবে দেহের এই পার্থক্য হয় তাহা হইতেছে চৈতন্য। দেহে যে সমুদায় আচরণ দৃষ্ট হয় তাহা শবে দৃষ্ট হয় না। জড়ে ও চৈতন্যে সংযোগ হইলে জড়ে কতকগুলি ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। উহাকে আমরা সাধারণতঃ বুদ্ধি বলি।

গোলাপ, পদ্ম, শেফালিকা বিভিন্ন হইলেও উহাদের সাধারণ ও সূক্ষ্ম ধর্ম্মের সংজ্ঞা হইতেছে ফুল। বিভিন্ন দেহে বুদ্ধি বিভিন্ন হইলেও বুদ্ধির সাধারণ ও সূক্ষ্ম ধর্ম্মের সংজ্ঞা হইতেছে বুদ্ধিতত্ত্ব।

জড়ে (প্রকৃতিতে) চৈতন্য সংযুক্ত হইলে প্রথমে যে জ্ঞানশক্তি জড়ে উৎপন্ন হয় তাহার নাম মহৎ। ব্যক্ত অবস্থার প্রথম জ্ঞান "আমি জ্ঞান"। বিষয় ভোগের সমস্ত শক্তি ইহাতে সূক্ষ্ম অবস্থায় নিহিত থাকে। আমি এইরূপ জ্ঞান হইতে, কিংবা আমি রূপ জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া অন্য যাবতীয় জ্ঞান চেষ্টা এবং সংস্কার ঘটিয়া থাকে। যত কিছু ব্যক্ত পদার্থ তাহার মূলে সাম্য-বিচ্যুত ত্রিগুণের সমষ্টি। মহতে সত্ত্বভাবের আধিপত্য থাকিলেও উহাতে 'রজঃ' গুণের ক্রিয়াশীল ভাব আছে। এই ক্রিয়াশীল ভাবের দ্বারা যাহা কেবলমাত্র 'আমি' জ্ঞান ছিল তাহা বাহ্য জগতের অর্থাৎ আমি ছাড়া (অনাত্ম) যে অবশিষ্ট জগত সেই জগতের সংস্রবে আসে। 'আমি' তখন বিকৃত হইয়া বহুবিধ প্রত্যয়ে পরিণত হয়, যথা আমার হস্ত আছে, আমি ব্রাহ্মণ, আমি দর্শক, আমি শ্রোতা ইত্যাদি। যদ্দ্বারা অনাত্ম ভাবের সহিত আত্ম সম্বন্ধ হয় তাহার নাম অভিমান বা অহঙ্কার। ইহা মহতের পরিণাম।

যাহারা মধ্যে থাকিয়া মহতের পরিণাম ঘটায় অর্থাৎ প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা জ্ঞান মহতের নিকট আনয়ন করে তাহাদিগের নাম ইন্দ্রিয়। অহং-কারের প্রথম পরিণাম মন নামক ইন্দ্রিয়, মন হইতে নানাবিধ ইন্দ্রিয় শক্তি

উৎপন্ন হইয়া বাহ্য প্রকৃতির সহিত কারবার করে। মন অপরাপর ইন্দ্রিয় শক্তির মিলন ক্ষেত্র এবং ইহাতে অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তির স্বভাব নিহিত আছে। ইন্দ্রিয় শক্তিগণের বাহ্য প্রকৃতির সহিত যে কারবার তাহার ফলে 'আমি শ্রোতা,' আমি দর্শক, ইত্যাদি জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ 'অহং' বিষয়ে পরিণত হয়। রূপ-রস গন্ধাদির নাম বিষয়। বিষয়ের সূক্ষ্ম ভাবের নাম তন্মাত্র, তন্মাত্রেরা পুঞ্জীভূত এবং সংহত হইয়া স্থূল ভূতে পরিণত হয়। জীব দেহ এক শক্তির নানারূপ বিকাশে কত বড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোথায় ত্রিগুণাত্মক 'মহৎ' শক্তি আর কোথায় একাদশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ। ইহাতে অবাক হইবার কিছুই নাই। কবে কোন আমেরিকা ফেরতের কাপড়ে এক টুকরা কচুরি পানা লাগিয়াছিল আর আজ সমস্ত বাংলা দেশ কচুরি পানায় প্লাবিত হইয়া সুখ বিলাসীকেও আতঙ্কিত করিতেছে। সূক্ষ্মের ক্ষমতা বর্ণনাতীত।

২২

জগতের যে অপরিচ্ছিন্ন আদি মধ্য হীন মূল উপাদান তাহাই প্রকৃতি বা প্রধান বা অব্যক্ত। অব্যক্তের ব্যক্ত অবস্থার নাম সৃষ্টি বা দৃশ্য প্রকৃতি। দৃশ্য প্রকৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়াত্মক। বুদ্ধি অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র, ইহারা, ইন্দ্রিয় ও মহাভূতের উপাদান।

(সর্গ)
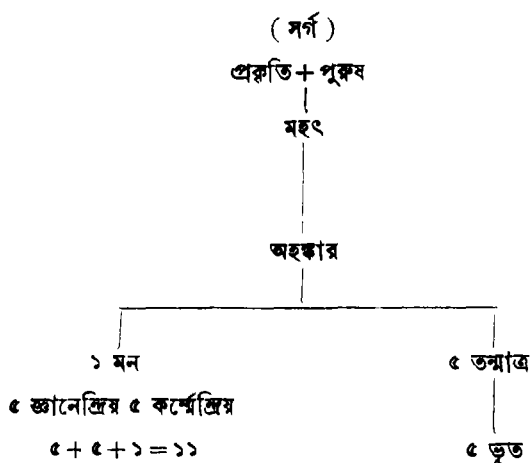
মহৎ-অহঙ্কার-মন ইহাদের নাম অন্তঃকরণ এবং চিত্ত। চক্ষু কর্ণাদির নাম বাহ্যকরণ। বাকপানি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও বাহ্যকরণ।

প্রকৃতে মর্হান্ ততোঽহংকার স্তস্মাদ্ গণশ্চ ষোড়শকঃ।

তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ॥

পদ পাঠ। প্রকৃতেঃ মহান ততঃ অহংকারঃ তস্মাৎ গণঃ চ ষোড়শকঃ। তস্মাৎ অপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ॥

অন্বয়—ঐ রূপই থাকিবে, কেবল দ্বিতীয় পাদে তস্মাৎ চ ষোড়শকগণঃ হইবে।

সর্গ=(সৃজ ধাতু বিসর্জ্জন করা) সৃষ্টি ; দার্শনিক সৃষ্টির কথা।

প্রকৃতেঃ=প্রকৃতি হইতে , মহান=মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব (ভবতি উহ্য)

ততঃ=তাহা হইতে অর্থাৎ মহৎ হইতে (তস্ যোগে পঞ্চমী) অহংকার (হয়) তস্মাৎ=অহংকার হইতে , ষোড়শক=ষোল ; গণঃ=সমূহ, বিকার সমূহ।

অনেক সময় দেখা যায় যে একজন মিষ্ট সঙ্গীত শুনিতেছে এবং তাহার সম্মুখে যাহা ঘটিতেছে তাহা দেখিতে পাইতেছে না। ইহার কারণ তখন মনের সহিত দর্শনেন্দ্রিয়েব যোগ নাই। চক্ষু কর্ণাদির ন্যায় মনও জ্ঞানের সাধক এইজন্য মনও ইন্দ্রিয়।

তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ=এগাব ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র এই ষোলর অপকৃষ্ট পাঁচ হইতে অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্র হইতে। পঞ্চভূতানি =পঞ্চভূত (হয়)

অর্থ—প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ষোড়শ তত্ত্ব (ইন্দ্রিয় ১১, তন্মাত্র ৫) সেই ষোড়শতত্ত্বের (অপকৃষ্ট) পঞ্চতত্ত্ব হইতে (স্থূল) পঞ্চভূতের উৎপত্তি।

২৩

অধ্যবসায়ো বুদ্ধি ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্।

সাত্তিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্ ॥

পদপাঠ। অধ্যবসায়ঃ বুদ্ধিঃ ধর্ম্মঃ জ্ঞানম্ বিরাগঃ ঐশ্বর্য্যম্।

সাত্বিকম্ এতদ্ রূপম্ তামসম্ অস্মাৎ বিপর্য্যস্তম্ ॥

অন্বয়। বুদ্ধিঃ অধ্যবসায়ঃ। (অস্ত) ধর্ম্মঃ জ্ঞানং বিরাগঃ ঐশ্বর্য্যম্
এতৎ সাত্ত্বিকরূপং। তামসম্ অস্মাৎ বিপর্য্যস্তং ॥

অধ্যবসায়=নিশ্চয় জ্ঞান, কর্ত্তব্য নিশ্চয়, রূপ=ভাব, মূর্ত্তি। নটের ন্যায় বুদ্ধি একাধিক রূপ ধরিয়া একাধিক ভাবে পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে। বুদ্ধির রূপ বা ভাব ৮ প্রকার। দুঃখ হেয়, যদ্বারা দুঃখ হানি হয় তাহা উপাদেয়। বুদ্ধি যে ভাব ধরিয়া কার্য্য করিলে দুঃখের হানি হয় তাহা বুদ্ধির সাত্ত্বিক ভাব, এবং যে ভাব ধরিয়া কার্য্য করিলে দুঃখের হানি হয় না তাহা বুদ্ধির তামসিক ভাব। বুদ্ধি প্রকৃতি হইতে পরিণত বলিয়া গুণাত্মক। যে সমুদায় কর্ম্ম দুঃখ হানির সহায় তাহাই ধর্ম্ম। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য কিংবা সরূপতা বুঝাই জ্ঞান। জ্ঞানে কি হেয় কি উপাদেয় তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ঐশ্বর্য্য=প্রভুত্ব; ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব। বিরাগ=নির্লিপ্ততা, বিষয়ে আসক্তি হীনতা। এতৎ সাত্ত্বিকরূপং=ধর্ম্ম জ্ঞান ঐশ্বর্য্য এবং বৈরাগ্য, ইহারা বুদ্ধির সাত্ত্বিক রূপ। তামসম্=তামসিক ভাব। তস্মাৎ= তাহা হইতে, সাত্ত্বিক হইতে। বিপর্য্যস্তং=বিপরীত।

অর্থঃ—অধ্যবসায়ই বুদ্ধি অর্থাৎ অধ্যবসায় বুদ্ধির বৃত্তি। ধর্ম্ম, জ্ঞান বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি সাত্ত্বিক রূপ, ইহার বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য বুদ্ধির তামসরূপ।

২৪

অভিমানোঽহংকারঃ তস্মাদ্ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণঃ তন্মাত্রঃ পঞ্চকশ্চৈব ॥

পদপাঠ। অভিমানঃ অহংকারঃ, তস্মাৎ দ্বিবিধ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশক চ গণঃ তন্মাত্রঃ পঞ্চকঃ চ এব ॥

অন্বয়—অহংকার (বা) অভিমানঃ, তস্মাৎ দ্বিবিধ সর্গ প্রবর্ত্ততে। একাদশকঃ চ গণঃ (একং) পঞ্চকঃ তন্মাত্র চ এব (অপরং সর্গং)

অহংকার :—অভিমানঃ=অহংকারের নিজস্ব বৃত্তি হইতেছে অভিমান, যেমন মহতের অধ্যবসায়।

অভিমান=ইহা আমারই বিষয়, ইহাতে আমি অধিকৃত" ইত্যাদি স্বামিত্ব বৃত্তির নাম অভিমান।

তস্মাৎ=অহংকার হইতে, প্রবর্ত্ততে=প্রবর্ত্তিত হয়; কি প্রবর্ত্তিত হয়; দ্বিবিধঃ=দুই রকম; সর্গঃ=সৃষ্টি; একাদশকঃ=একাদশ সংখ্যক; গণঃ বা ইন্দ্রিয়গণ এবং পঞ্চকঃ=পঞ্চ সংখ্যক; তন্মাত্রঃ=রূপরসাদির পরমাণুর তুল্য সূক্ষ্ম অংশ।

ঘুম ভাঙ্গার পর প্রথম অহংভাব উঠে তৎপরে ইন্দ্রিয় ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

অহংকার বৃত্তি হইতেছে অভিমান; অহংকার হইতে মন প্রমুখ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই দ্বিবিধ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ অহংকার হইতে ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রের উৎপত্তি হয়।

২৫

সাত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্র স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্॥

পদপাঠ। সাত্বিক......বৈকৃতাৎ অহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেঃ তন্মাত্রঃ স তামস তৈজসাৎ উভয়ম॥

অন্বয়—বৈকৃতাৎ অহংকারাৎ সাত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে ভূতাদেঃ (অহংকারাৎ) তন্মাত্রঃ সঃ তামসঃ, তৈজসাৎ উভয়ং।

কোন প্রাকৃতিক বস্তুতে শুদ্ধ বা নিছক সত্ত্ব কিংবা রজঃ কিংবা তমঃ গুণ নাই। সর্ব্ব বস্তুই ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্ব এবং তমঃ গুণ স্বয়ং ক্রিয়া করিতে অসমর্থ। রজঃ গুণ ক্রিয়াশীল। রজোগুণ সত্ত্ব এবং তমঃ গুণকে উদ্রিক্ত করিলে পরে তবে উহারা কার্য্য করে। অহঙ্কার ও অপরাপর বস্তুর ন্যায় ত্রিগুণের সমবায়ে গঠিত।

গুণের মিশ্রন এবং পরস্পরের উপর প্রভাবের মাত্রা অনুসারে একই বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দৃষ্ট হয়, ঐ সকল কার্য্য কেহ বা সত্ত্ব প্রধান কেহ বা তমঃ প্রধান; উভয়বিধ কার্য্যেই রাজসিকভাব স্বল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমিত হয়। কার্য্যের স্বাত্বিক অবস্থা দেখিয়া বুঝা যায় যে তাহাতে কারণের সত্ত্ব গুণের অংশ তমোগুণ

হইতে অধিক পরিমাণে প্রভাবশালী হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বার, এবং উহারা জ্ঞান আহরণের সহায়তা করে; উহারা জ্ঞানের ন্যায় প্রকাশশীল। সুতরাং উহারা অহঙ্কারের সত্ত্বগুণ-প্রধান অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অহঙ্কারের সত্ত্বগুণ-প্রধান অবস্থার নাম বৈকৃত বা সাত্ত্বিক। পঞ্চতন্মাত্র জড়, উহা বিষয়ের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং উহারা অহঙ্কারের তমোগুণ-প্রধান অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অহঙ্কারের তমগুণ প্রধান অবস্থার নাম ভূতাদি বা তামস। রাজসিক ভাব কর্ত্তৃক চালিত না হওয়া পর্য্যন্ত কি তমঃ কি সত্ত্ব কেহই কার্য্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রের অন্যতর কারণ অহঙ্কারের রজঃ প্রধান অবস্থা এবং উহা তৈজস নামে খ্যাত। ইন্দ্রিয়গণেও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ে সাত্ত্বিক ভাব বেশী, চক্ষুতে রাজসিক ভাব বেশী, ঘ্রাণে তামসিক ভাব বেশী। কর্ম্মেন্দ্রিয়ে যত রাজসিক ভাব দেখা যায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ে তত নয়। বাক্ এই কর্ম্মেন্দ্রিয়ে অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের তুলনায় অধিক সাত্ত্বিক ভাব দৃষ্ট হয়।

অহঙ্কার তত্ত্বের বিকারে তমোগুণ প্রবল হইলে ৫ তন্মাত্র এবং সত্ত্ব গুণ প্রবল হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

বৈকৃতাৎ = সাত্ত্বিক, অহঙ্কারাৎ এই পদেব বিশেষণ।

অহঙ্কারাৎ = অহঙ্কার হইতে।

সাত্ত্বিকঃ একাদশকঃ = সত্ত্ব গুণাধিক একাদশ ইন্দ্রিয়।

প্রবর্ত্ততে = প্রবর্ত্তিত হয়, উৎপন্ন হয়।

বৈকৃত অহঙ্কার হইতে সত্ত্ব প্রধান ১১ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

ভূতাদেঃ = ভূতাদি শব্দের পঞ্চমীর একবচন, ভূতাদি ভাবাপন্ন অহঙ্কার হইতে। তন্মাত্রঃ (প্রবর্ত্ততে)

সঃ তামস = তন্মাত্র হইতেছে তামসিক। ভূতাদি = তামসিক। উভয়ঃ = দুই বস্তুই, কি ইন্দ্রিয়, কি তন্মাত্র উভয়ই আবার উৎপন্ন হইয়াছে। কোথা হইতে? না তৈজসাৎ = তৈজস অহঙ্কার হইতে। তৈজস = তেজঃ বা রজঃ ভাবাপন্ন।

অর্থ—একাদশ ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক। তাহারা বৈকৃত অহঙ্কার হইতে অর্থাৎ অহঙ্কারস্থ সত্ত্বগুণকে অধিক পরিমাণে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মাত্র তামসিক। তন্মাত্র ভূতাদি অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মাত্রের কারণে অহঙ্কারের তমোগুণ অধিক পরিমাণ আছে। কি ইন্দ্রিয়, কি তন্মাত্র উভয়ই অহঙ্কারের রজঃ গুণের চালনা ব্যতীত হয় না, এই জন্য ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রের অন্যতর কারণ হইতেছে অহঙ্কারস্থ রজোগুণ বা তৈজস অহঙ্কার।

২৬

বুদ্ধীন্দ্রিয়ানি চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্রাণ রসন ত্বগাখ্যানি।
বাক্ পাণি পাদ পায়ূপস্থান্ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ॥

পদপাঠ। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াণি, চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্রাণ রসন ত্বক্ আখ্যানি।
বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থান্ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি আহুঃ॥

অন্বয়—কোন পরিবর্ত্তন নাই।

১১ ইন্দ্রিয়। মন ১ জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫। বুদ্ধি বা জ্ঞান ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয় সকল। তাহারা কে? যাহাদিগের "আখ্যা" অর্থাৎ নাম হইতেছে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা ত্বক। ইন্দ্রিয় (ইন্দ্ ধাতু অর্থ শক্তি থাকা) ইন্দ্রিয় অর্থ মনের সেই শক্তি যদ্বারা 'অহং' বাহ্যজগতের সহিত সংস্পর্শ আসে। জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থ যে শক্তি দ্বারায় বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান আহবিত হয়। কজ্জল শোভিত চক্ষু ইন্দ্রিয় নহে। ইন্দ্রিয় হইতেছে শক্তি বিশেষ।

চক্ষুঃ—যে শক্তি 'চোক'কে অধিষ্ঠান করিয়া রূপ জ্ঞান ঘটায় তাহার নাম চক্ষুরিন্দ্রিয়। যে শক্তির গুণে আমরা দেখিতে পাই তাহা চক্ষুঃ। যে শক্তিতে আমরা শুনিতে পাই, এবং যাহার কেন্দ্র বা অধিষ্ঠান কান তাহার নাম শ্রোত্র (শ্রু ধাতু—শোনা)। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শীত, উষ্ণ খর তীব্র প্রভৃতি স্পর্শ জ্ঞান জন্মে তাহার নাম ত্বক্। ত্বগেন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্থান চর্ম্ম। রসনেন্দ্রিয় দ্বারা কটু তিক্তাদি রসের অনুভব হয়। রসনা—জিহ্বা ঘ্রাণ নাসিকা এই ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র। এই ইন্দ্রিয়টির দ্বারায় আমাদের গন্ধ জ্ঞান হয়। চক্ষু কর্ণাদি বা জ্ঞানের

দ্বারস্বরূপ। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহার নাম আলোচন। কুণ্ডল শোভিত কর্ণ কিংবা কজ্জল ভূষিত চক্ষু বলিতে যে অবয়ব বুঝায় তাহা ইন্দ্রিয় নহে। সিংহাসন রাজা নহে; সিংহাসনে যাঁহার অধিষ্ঠান তিনিই রাজা।

মনের যে শক্তি দ্বারা বচন, আহরণ প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদিত হয় তাহা কর্ম্মেন্দ্রিয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানের আহরণে এবং জ্ঞানের বিস্তারে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রধান সহায়। ইহারা দৃশ্যমান হস্ত পদাদি নহে; হস্ত পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইলেও হস্তমাত্র কিন্তু পাণীন্দ্রিয় নহে। বাক্—মুখের স্পন্দন, যাহা হইতে বচন উদ্ভব হয়। আহুঃ—বলা হয়। পায়ুঃ—পায়ু সেই ইন্দ্রিয় যাহা দেহের মল মূত্র আহরণ করিয়া বাহির করে। উপস্থ—জননেন্দ্রিয়।

অর্থ—চক্ষু কর্ণাদিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত পদাদিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা হয়। ত্রিগুণের কম বেশী কিংবা ইতর বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বাহ্য বস্তু উৎপন্ন হয় এবং ইন্দ্রিয়গণও নানারূপে পরিস্ফুট হয়। স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক হইলেও কেহ বা সুহাসিনী কেহবা সুভাষিনী কেহবা গজেন্দ্রগামিনী সেইরূপ ইন্দ্রিয়শক্তি মূলতঃ এক হইলেও কেহবা চক্ষুরূপে কেহবা শ্রবণ প্রভৃতিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

২৭

উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণ পরিণাম বিশেষান্নানাত্বং বাহ্য ভেদাশ্চ॥

পদপাঠ। উভয় আত্মকম্ অত্র মনঃ সঙ্কল্পকম্ ইন্দ্রিয়ম চ সাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণ পরিণাম বিশেষাৎ নানাত্বং বাহ্য ভেদাঃ চ॥

অন্বয়=অত্র মনঃ সাধর্ম্ম্যাৎ ইন্দ্রিয়ম্ উভয়াত্মকং; সঙ্কল্পকং চ।
গুণ পরিণাম বিশেষাৎ নানাত্বং বাহ্য ভেদাঃ চ।

বাঘ এবং বিড়াল দেখিতে কত বিভিন্ন, বিভিন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে কতকগুলি সমান ধর্ম্ম আছে। বিভিন্ন আকার হইলেও উহারা মূলতঃ এক বুড়ো দাদা মহাশয়ের বংশধর এই জন্যই উহাদের মধ্যে কতকগুলি সমান ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন আপাততঃ

পৃথক মনে হইলেও উহারা একই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে আসিয়াছে এবং সেইজন্য উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি সমান ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। সমান ধর্ম্মের সংস্কৃত কথা সধর্ম্ম; সধর্ম্মের ভাবের নাম সাধর্ম্ম্য। হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হইলে সাধর্ম্ম্য সাধর্ম্ম্যাৎ হয়।

অত্র=এই ইন্দ্রিয় বর্গে। মনঃ অর্থাৎ মন। মনও ইন্দ্রিয় হয়। কেন? সাধর্ম্ম্যাৎ, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ যেমন অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মনও সেইরূপ হইয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ মনও ইন্দ্রিয়।

উভয়াত্মকম্=উভয় স্বরূপ; মনে কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও গন্ধ পাওয়া যায় জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও গন্ধ পাওয়া যায়। মন একাধারে জ্ঞান এবং কর্ম্মের ইন্দ্রিয়।

সঙ্কল্পকম্=সঙ্কল্পকারী। সঙ্কল্প করা কাহাকে বলে? সঙ্কল্প, সম্যক্ কল্পয়তি=বিশেষ্য বিশেষণ ভাবেন বিবেচয়তি, অর্থাৎ সঙ্কল্পের দ্বারা মন বিশেষ করিয়া বিষয়কে বিবেচনা করে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বস্তুর সামান্য ভাব গ্রহণ করে মাত্র। ইহার নাম আলোচন। পরে মন বস্তুর বিশেষ আকার ঠিক করে। মনের এই বিশেষ আকার ঠিক করা রূপ বৃত্তিকে সংকল্প বলে। "সংকল্পঃ কর্ম্মণো মানসম"—কর্ম্মের মানসকেও সঙ্কল্প বলে। মন কেবলমাত্র সংকল্পকারী নহে, উহা আবার সংস্কারের আধার। গুণ পরিণাম বিশেষাৎ—তিন গুণের পরস্পরের মিলন, রেসারিসি এবং পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তারের মাত্রা অনুসারে যে সমুদয় কার্য্য হয় তাহাদিগের বিভিন্ন ভাবের হেতুতে। ত্রিগুণের এইরূপ ব্যবহার হইতে কি হয়—নানাত্বং, এবং (চ) বাহ্য ভেদাঃ অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর ভেদ বা বহুত্ব।

অর্থ—মনের ব্যবহার ইন্দ্রিয়ের মতন অতএব মনও ইন্দ্রিয়। মন একাধারে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়। ত্রিগুণের মাত্রাও প্রভাব অনুসারে যেরূপ বহুবিধ বস্তু হয় সেইরূপ ইন্দ্রিয়েরও নানাত্ব হয়।

(ক্রমশঃ)

—ওমর খৈয়ামঃ।

ভুতুড়ে প্রেম

ঝড়ের রাত—টুপ্ টাপ্ বৃষ্টি ঝরচে।

চারিদিকে সোঁ সোঁ বাতাস, গাছপালার ছুড়াছুড়ির শব্দ। ভিতরে বাইরে আঁধারে আঁধার! আমার তরুণ ছেলে তরুণকুমারের কিছুতেই ঘুম আস্‌চে না। কেবলি প্রশ্ন কচ্চে—'ওটা কি?' 'অমন করে কেন?'

সে হঠাৎ বুকের মাঝে মুখ লুকিয়ে ব'লে উঠ্‌ল 'মা একটা গল্প বল্ না। আমি গত্যন্তর না পেয়ে আরম্ভ কল্লুম—'এক যে ছিল রাজপুত্তুর···তরুণকুমার না না করে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'ওটা না, ওটা ত অনেকবার শুনেছি।' আমি ধমক্ দিয়ে বল্‌লুম—'তবে ঘুমো', সে কিন্তু কিছুতেই ছাড়্‌বে না। শেষে বল্‌লে—'মা, সেই যে চারদিকে গল্প শুনি, দুইজনে প্রেম হয় শেষে কত আনন্দ, সেই একটা গল্প বল্‌না।' ব'লেই আমার চিবুক ধ'রে সোহাগ কত্তে লাগ্‌ল—'বল্ বল না মা'। সে এক নিছক প্রেমের কাহিনী।

প্রথম পর্ব্ব

সে দেশ ঘুমের দেশ—সেখানে অবিশ্যি দিন রাত হয় কিন্তু দিনকে কয়লার উনুনের ধোঁয়া ব'লে মনে হয় এতই কল্‌কারখানার সেদেশ আর রাতকে মনে হয় যেন কেবলি গ্যাসের আলো আর বুনো কচকচির মেলা, আলেয়ার আগুনে দপ্ দপ্ করে পুড়্‌চে। তরুণকুমার আবার প্রশ্ন কর্‌লে 'তাকে ঘুমের দেশ বল্‌চ কেমন ক'রে মা। সেখানে নাকি খুব কাজকারখানা' আমি বল্‌লুম—'সে ভারী মজা সেখানে সব কাজই হয় কিন্তু যেন স্বপনের মত কোন সাড়া নাই আনন্দ নাই। যাক্, এইবার শোন্—সেই দেশের নায়কের নাম হল জগৎকুমার চক্র আর যে প্রাসাদে তার বাস তার নাম হ'ল—'আধুনিক প্রাসাদ' একটা প্রকাণ্ড বদ্ধজলা ভূমিতে বদ্ধ পদ্মাসনে সে দিবারাত্তির চোখ্ কান্ বুঁজে

সত্যের মিথ্যা খোঁজে বা'র হয়েচে—গাময় বিস্ফোটের মত কি যেন ; দর্ দর্ পুঁজ ঝর্‌চে তবু তার খেয়াল নাই এমনি তার একাগ্রতা।

'জগতের' প্রেম না পোষাক মাঝে মাঝে ভূতের মত ঘাড়ে চাপে—তবে অঞ্জাল এই, সে ভূত ওঝার মন্ত্রে পালিয়ে যায় আর এভূত যখন চাপে তখন জ্যান্ত ব্যাধিকণার মত লক্ষ লক্ষ জীবন্ গোগ্রাসে উদর অনলে আহুতি দিতে থাকে।

সেদিন বিকেলবেলা কালো মেঘের ফাঁকে সূর্য্যের রেখা দেখে একটু আসা হচ্ছিল আবার ভয়ও হচ্ছিল জগতের জলাভূমি শুকিয়ে যাবে। শুকিয়ে গেলে 'জগতের' চিরবাদলের বিরহ দিন যে সব উবে যাবে। তাই সে তখন খুব জোর ক'রে একবার প্রেমের ভূতুড়ে পোষাকটা এঁটে চল্‌ল তার প্রণয়ীর কাছে। গিয়ে দেখে অপরূপ রূপসী 'কামিনী' বাইরে দাঁড়িয়ে ; আর অন্তরেও 'কামিনীর' ধাত্বর্থটা একেবারে গর্‌গর্‌। জগতের বিরহের বার্দ্ধক্যে এইবার যৌবন ফিরে এলো। সে অতিকাতর ভাবে থিয়েটারি ঢঙে ব'লে উঠ্‌ল—'ওগো তুমি কথা কও প্রাণ ঠাণ্ডা হোক! তোমার লাল সাড়ী লালরক্তের মত আমার অন্তর স্নান করিয়ে দিয়ে গেছে!' 'কামিনী' কিন্তু (অনেকদিন পর দেখা) কেবলি কাঁপ্‌তে লাগিল শেষে ঠিক্‌রে উঠে চলন্ত ট্রাম গাড়ীর মত হু হু করে বলে যেতে লাগল্

—'নিঠুর তুমি এতদিন পরে ফিরে এলে, আমি যে তোমারই পথ চেয়ে আছি, আজ যে নারীমর্য্যাদার দম্ভের উপর দাঁড়িয়ে ভেবেছিলুম 'কথা কইব না' যে দম্ভ তুমি এমনি করেই ধূলোয় লুটিয়ে দিলে, আমার জীবন যৌবন সব তোমায় দিইছি তুমি আমার সে আবেগ এমনি করেই মাড়িয়ে গেলে যে একটিবার আমায় চাইলেও না—তুমি যাও চ'লে যাও।'

'জগত' কর্‌ত কলের কারবার, তার সময় কোথায় সে দেখা করে। আজ কিন্তু ক্ষণিকের জন্য 'কামিনীর ঢলঢল, ছলছল, টলমল, ম্লান বিরস মূর্ত্তি তার সমস্ত ইন্দ্রিয় ঝল্‌কে দিয়ে গেল সে স্তম্ভিত হয়ে ব'লে উঠ্‌ল—'তুমি আজ আমায় গ্রহণ ক'রে ধন্য কর আমায় বিয়ে কর কামিনী!"

দ্বিতীয় পর্ব্ব

* * * *

'কামিনী'র মদির ছেঁচারসে সুরামত্ত 'জগৎ' আপনাকে আকণ্ঠ রক্ত তৃষ্ণাতুর দানবের মত ডুবিয়ে রেখেছে। এক একদিন এক একটি পলকের মত মহাকালের বুকে বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে যায়! জীবন যেন আনন্দের লোলুপ স্বপন; প্রাণ খরতর বেগে আকুল ব্যাকুল দিশাকুল সব হারিয়েছে। কলের কারখানা ভাঙ্গ ভাঙ্গ। পৃথিবী ভুল হ'য়ে গেচে প্রেমের পত্রপর্ণে 'কামিনী'কে সে কেবল বাঁধচে আর বাঁধচে।

তৃতীয় পর্ব্ব

* * * *

(শুনেচি) কোন্ এক আজব দেশে 'জগতে'রই একটা পরগনায় শূকরের গায়ে একরকম পোকা ছেড়ে দেয়। সেই পোকা নাকি আস্তে আস্তে শূকরের সমস্ত শরীর খেয়ে ফেলে কেবল হাড় কখানি রাখে। সেগুলো তখন খুব বিরাট আকার ধারণ করে। খাদকেরা সেই পোকা চপল চাঞ্চল্যে উদরস্থ করে আর বিক্রী কর্‌লেই নাকি তার দাম বিস্তর। বাস্তবিকই কলের দেশের কি চমৎকার বুদ্ধি।

'জগৎ'কুমারও সেই পোকার মত ধীরে ধীরে কামিনীকে গিল্‌তে সুরু কর্‌ল তার সবগুলো ইন্দ্রিয় কীটকে একসঙ্গে কামিনীর দেহে ছেড়ে দিলে; তারপর একদিন, শূকর মাংস পুষ্ট পোকার মতনই কতকগুলো ছেলে কামিনীকে ঘিরে শোভাপেতে লাগ্‌ল; তবে পোকা হয়েছিল বেশ সুস্থসবল, আর 'কামিনীর' ছেলেগুলো হ'ল পিলেপাণ্ডুর, শীর্ণঅস্থি শুষ্ক বাঁখারির মত! কামিনী ২৬ বছর বয়সেই প্রেমপর্য্যুসিত অস্থিকখানি নিয়ে জীবনের যৌবনেই মৃত্যুবোঝা বইতে যাত্রা সুরু কর্‌ল। হায়রে একি উৎকট বিধিলিপি।

* * * *

দিনশেষে রাত্রি এসেছে! সমস্ত শ্মশান এক উদাস কান্নার মত 'কামিনী'র ধূমায়মান চিতার উপর, কেঁপে কেঁপে জীর্ণ উত্তপ্ত রাঙা অশ্রুজলে ভ'রে চলচে; দেখে মনে হচ্ছে প্রমত্ত ভৈরবী উলঙ্গিনী

শ্মসানবাসিনী 'কমনীয় কামিনী দেহ ভস্মসাৎ করে 'নারী'র ভস্মমূর্ত্তি আপনার সাদা অঙ্গে লেপে দিচ্ছে। দূর হ'তে উদাস ক্রন্দন কামিনীর কাম অস্থির দাহক্রিয়া দেখ্‌চে আর থেকে থেকে দিগন্তের অন্তরালে উন্মাদের মত বিদ্যুতের প্রভায় অট্টহাসি হেসে উঠে বলচে "হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ"।

'জগৎ'কুমার ক্লান্তিবিমূঢ় চিত্তে চিতার পাশে ব'সে আছে! তার যাতনা-কাতর মুখ দেখে তাহার পাশের বন্ধুদ্বয় সান্ত্বনার ছলে বলে উঠ্‌ল—'ভাই তোর কি অতব্যথা, তোর স্ত্রী মরেছে, গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যাবে—আমার যে এই দুরাদৃষ্ট হ'ল, অমন বিদ্বান ভাইটি মারা গেল যার জন্যে কবি বলেছেন—'তত্ত দেশং নপশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদর'—কুচপরোয়া নেই ফূর্ত্তি সে কারখানা চালাও আবার দেখে শুনে দু'মাসের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাবে!"

গল্প শেষ ক'রে চেয়ে দেখি তরুণ ঘুমিয়ে পড়েছে, কতক্ষণ কেজানে। খুব মৃদুস্বরে ডাক্‌লুম 'তরুণ'! তরুণ আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে ঝর ঝর তপ্ত অশ্রুতে অমার কপোল ভিজিয়ে দিতে লাগল শেষে পুঞ্জীভূত বেদনা-রশ্মির মত বল্‌লে—'মা!' তার অনেকক্ষণ পরে অবসন্ন ভাষায় বল্‌লে—'প্রেমের গল্প আর শুন্‌বনা মা আমি তোর কোলেই আমার জীবন আনন্দের গেয়ানের পায়ে সঁপে দেব!"

বহুদিন পরে দেখা গেল 'আধুনিকের' জলাভূমির সমস্ত সাময়িক পত্রে, উপন্যাসে ওই সংবাদ ছত্রে ছত্রে বর্ণিত হ'ল কিন্তু কেবল মদির বাতুলতাটুকুই তাতে বিবৃত হয়েছে ব্যথার ক্রন্দন যে সকল, সেস্থান একবারে বাদ, যেন পুঞ্জীভূত দহনের আড়ালে উহা একটু হাসির উপহাস!

(সমাপ্ত)

—শ্রীনীরদবরণী দেবী সরস্বতী।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও সার্ব্বভৌমিক বেদান্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আস্তিক, নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী যিনিই হউন না কেন, তিনি যে বস্তুর অনুসন্ধানে মন প্রাণ নিয়োজিত করিয়াছেন, উহা সচ্চিদানন্দ লাভ ব্যতীত অন্য আর কিছুই নহে। নামে কি করে, উহার অন্তর্নিহিত 'বস্তু' বা তত্ত্বটির আলোচনা করিলেই এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হইবে। স্থিরভাবে ধারণা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে জীব ও জড়জগৎ উভয়েই এক সচ্চিদানন্দ সাগরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার Universal Religion নামক বক্তৃতায় এই তত্ত্বটি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন,—

"Those who are called Atheists and Agnostics are worshipping the same Eternal Truth though under a different name What they call matter is in reality, the same substance what we call the Soul If we ask them the definition of matter they do not know To them it is an unknown and unknowable substance But when properly known and realised it is found to be one with the essence of the universe, with the essence of the individuals, the soul, it is the same Sat-Chit-Anandam— Existence-Intelligence-Bliss Absolute In fact a works we are doing during our lives have one ideal, that of happiness and when that happiness becomes unconditioned it is Anandam Are we not all working for Anandam, though in a relative sense? Are we not try to get the necessaries of life to support our families? What for? Because at every moment we find a particle of this Anandam. All the pleasures that we receive though coming in contact with external objects, all are

in their essence but infinitesimal parts of that one Bliss which is called Brahman."

যিনি ধর্ম্মের আবশ্যকতা অনুভব করেন না, তাঁহাকে আমরা বলি,—হে আত্ম-প্রতারিত জড়বাদিন্! আপনার পক্ষেও ধর্ম্মের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা আছে,—আপনিও আপনার অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম বা ভগবানকেই লাভ করিতে ঐকান্তিক চেষ্টা করিতেছেন; আপনার সমগ্রজীবন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ; কেবল আপনি জানেন না যে আপনি কি করিতেছেন! ধর্ম্মের এই সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে ধর্ম্ম সমন্বয় একটা কৃত্রিম বিষয় নহে, কারণ মানবমাত্রই ধর্ম্মের এই সার্ব্বজনীন মুখ্য আদর্শে,—বেদান্তের এই অশ্রুতপূর্ব্ব সার্ব্বভৌমিক যুক্তি ভিত্তির উপর সমন্বিত।

অজ্ঞ জীবগণ "আমি" বলিতে সাধারণতঃ এই পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থূলদেহকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। বৈদান্তিক বলেন,—দেহ আত্মার প্রবাস-গৃহ স্বরূপ; প্রকৃত "আমি" দেহ বা ইন্দ্রিয় নহে,—উহা "আত্মা" ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব অজ্ঞ ব্যক্তির স্থূলদেহ বোধক "আমি" কে "কাঁচা আমি" এবং বিজ্ঞানীর চৈতন্য শক্তি-বাচক "আমি" কে "পাকা আমি" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বেদান্তমতে আত্মা অজর, অমর, শাশ্বত, সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, এবং সচ্চিদানন্দ ইহার স্বরূপ; সুতরাং "পাকা আমি" বা প্রকৃত "আমি" বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও ঐরূপ গুণসম্পন্ন। বেদান্ত আরও বলেন যে জগতের সর্ব্বভূতস্থিত ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা এক এবং অখণ্ড, সুতরাং প্রকৃত "আমি" তুমি, রাম, শ্যাম ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ অভেদ—জগৎ ব্রহ্মময়।

এখন প্রশ্ন এই—আমি যদি যথার্থই অজর, অমর, সচ্চিদানন্দরূপী ব্রহ্ম তাহা হইলে আমি এত দেহ সর্ব্বস্ব কেন? আমার স্বরূপকে কোন্ শক্তিবলে কে আমার নিকট এক দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে? আমি আত্মা—বেদান্তে ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের সঙ্গে অভেদ হইলে আমার দ্বৈত বা বিভিন্নতা জ্ঞান এত প্রবল কেন?—উত্তরে বেদান্ত বলেন,—

এই অদ্বৈত বা অভেদ জ্ঞান যিনি আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, এই একত্ব যাঁহার প্রভাবে বহুত্ব বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে—তিনিই মায়াশক্তি। এখন দেখা যাউক, এই মায়াশক্তি কেমন করিয়া কি উপায়ে আমাকে আমার সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীতে জড় ও চৈতন্য নামক দুইটি শক্তির ক্রিয়া দেদীপ্যমান। স্থূলদর্শনে স্পন্দবোধহীন পদার্থ নিচয় জড় বা অচেতন এবং এতদ্বিপরীত পদার্থসমূহ সচেতন নামে অভিহিত হইয়া থাকে বটে কিন্তু সূক্ষ্মদর্শনে জগতের স্থাবরজঙ্গমাত্মক কোন পদার্থই অচেতন নহে;—সকল পদার্থের মধ্যেই চৈতন্যের স্ফুরণ বিদ্যমান আছে। পৃথিবীর সকল পদার্থেরই জন্ম, মৃত্যু বা উৎপত্তি, লয় এবং গতি ও স্পন্দন আছে। যদি সর্ব্বভূতের অন্তরালে চৈতন্য শক্তির বিদ্যমানতা না থাকিবে, তাহা হইলে ঐ সকল ক্রিয়া কোন্ শক্তি বলে নিয়ন্ত্রিত হয়? যে জগত প্রসবিনী শক্তি দেশ-কাল-পাত্র-গত চৈতন্য শক্তিকে বিভিন্ন আবরণে নামরূপে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন সেই ব্রহ্মশক্তিই মায়া আখ্যায় পরিকীর্ত্তিতা।

বেদান্তকেশরী শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার "বেদান্ত" বক্তৃতায় সুস্পষ্ট ও সরলভাবে মায়াবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"মায়াবাদ প্রকৃত পক্ষে বাদ বা মত বিশেষ নহে উহা দেশ কাল নিমিত্তের নাম,—আর সংক্ষেপে উহাকে নামরূপ বলে। সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্র হইতে প্রভেদ কেবল নাম ও রূপ, আর তরঙ্গ হইতে এই নামরূপের কোন পৃথক্ সত্তা নাই, নামরূপ তরঙ্গের সহিত বর্ত্তমান। তরঙ্গ অন্তর্হিত হইয়া যাইতে পারে, আর তরঙ্গের অন্তর্গত নাম রূপ যদি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়, তথাপি সেই একই জল থাকিয়া যাইবে। প্রকৃত পক্ষে এই মায়াই যেন আমাকে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে। আর এই মায়া নামরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি ঐ গুলিকে পরিত্যাগ কর, নামরূপ দূর করিয়া দাও, তবে উহা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে, তখন তুমি প্রকৃতপক্ষে যাহা তাহাই থাকিবে, ইহাকেই মায়া বলে। আর উহা কোন মতবাদ নহে, উহা জগতের ঘটনাবলীর স্বরূপ বর্ণনা মাত্র।"

জগতের চৈতন্যশক্তি অনন্ত, অপার ও অখণ্ড। * যেরূপ অপার অনন্ত অখণ্ড আকাশ পাত্রভেদে "ঘটাকাশ" ও "পটাকাশ" প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ অখণ্ড চৈতন্যশক্তি বা আত্মা জীবরূপে মায়ার প্রভাবে বদ্ধশক্তি মনঃ সহযোগে খণ্ড খণ্ড বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ তুমি অখণ্ড অদ্বৈত শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, এবং "অহং" এই জ্ঞানের উপর তোমার সত্তা; কিন্তু জীব চৈতন্যের প্রভাবোৎপন্ন মায়ারূপী মন ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ মূলক অদ্বৈত জ্ঞানের উপর একটি দুর্ভেদ্য যবনিকা নিপাতিত করিয়া এই অভেদ ও অদ্বৈত জ্ঞানকে ভেদ বহুল ও দ্বৈতভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছে। "সর্ব্বং ব্রহ্ম ময়ং জগৎ" —জগৎ ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম যেন মৃত্তিকা, আর স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমগ্র পদার্থ যেন বিভিন্ন মৃন্ময়পাত্র। † এই অদ্বৈত ব্রহ্ম সত্তায় বহুত্ব আরোপই মায়া। ‡ তন্ত্রও বলেন,—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম ভিন্ন এই দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তুমি, আমি, রাম, শ্যাম, নামরূপ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দেহ, ইন্দ্রিয়, পাপ, পুণ্য, জ্ঞান, অজ্ঞান, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ই মায়াময়; এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড— মায়াবৃত §। এই মায়া যাঁহার প্রভাবোৎপন্ন, এই অবিদ্যা-যবনিকার অন্তরালে যিনি "তুষাবৃত তণ্ডুলের ন্যায়" অবস্থান করিতেছেন, তিনিই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ‖।

---

* "সর্ব্বস্থূল শরীরাভিমানী বিরাটঃ তদুপস্থিতং
বিশ্ববৈশ্বানরাদি পর্য্যন্তচৈতন্যমপি একমেব।"—বেদান্ত সার।

† "আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্ব্বং যদযমাত্মা দৃষ্টাস্তোহপি, যথা সৌম্যকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ।"
—ছান্দোগ্যোপনিষদ্।

‡ "মীয়স্তে পরিচ্ছিদ্যন্তে অনয়া পদার্থা ইতি মায়া।"—নিরুক্ত।

§ "বালক্রীড়ণকবৎ সর্ব্বরূপ-নামাদি কল্পনম্।"
—মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

‖ "জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ সজ্জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবেন তণ্ডুল॥"
—স্কন্দোপনিষদ্

জগতের সকল ধর্ম্মই কোন না কোন আকারে এই 'মায়াবাদ' স্বীকার করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রায় প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধধর্ম্ম যাহাকে "মায়াবাদ" বলিয়া স্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছেন, খৃষ্টধর্ম্ম তাহাকেই "Devil" এবং "Foulspirit" * এবং মুসলমানধর্ম্মও তাহাকেই "সয়তান" বলিয়া আপন আপন বিশেষত্বে অনুরঞ্জিত করিয়া এই 'মায়াবাদ'ই স্বীকার করিয়াছেন। পতিতপাবন খৃষ্ট বলিয়াছেন,—"The self, the I, the me, and the like, all belong to the Evil spirit"—(Theol Germ. 73) পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃকও এই 'মায়াবাদ' স্বীকৃত হইয়াছে। স্বনামধন্য পাশ্চাত্য দর্শনবেত্তা Parmenicles এবং Plato পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"It is a world of shadows." দার্শনিক পণ্ডিত Kant ও তদীয় সুযোগ্য শিষ্য Schopenhauer গণিতশাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিয়া জগৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—It is appearance only, not the thing-in- itself."

ইতিপূর্ব্বে পূজ্যপাদ স্বামিজীর মায়াবাদ ব্যাখ্যায় যে দেশ কাল নিমিত্তের উল্লেখ করা হইয়াছে, জার্ম্মান দার্শনিক ক্যাণ্টও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তন্নির্দ্দিষ্ট দেশকাল নিমিত্ত (time, space and casaulity) শঙ্করের মায়াবাদের নামান্তর মাত্র বলা যাইতে পারে। ক্যাণ্টের বা পাশ্চাত্যদর্শনের ইহাই শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার। ভুজঙ্গে রজ্জুজ্ঞান অধ্যাসিত হইলে যেমন ভুজঙ্গজ্ঞান তিরোহিত হয়, সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে মায়াজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া থাকে। মায়ার কুহকে জড় সৃষ্টি দর্শনে মন সম্মোহিত হইয়া আছে, এই মনরূপী বীজকে জ্ঞান-বিবেক বৈরাগ্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া উহার ক্রিয়াশক্তি নাশ করিয়া ফেলিলে,—মনকে উহার স্বকারণ আত্মার মধ্যে লয় করিতে পারিলে,—মন নিবৃত্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইলে এই জড়সৃষ্টি আর পরিদৃষ্ট হইবে না। তখন এক ভূমা নিত্য নিরঞ্জন আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বময়,—জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া জ্ঞান হইবে।

* New Testament,—St. Matheu from IV—I to II and St. Mark, V—III, IX and such other places.

এখন আপত্তি এই যে এক অখণ্ড-শুদ্ধ-চৈতন্য ব্রহ্ম মানবরূপে পরিব্যক্ত হইয়া থাকিলে জ্ঞানী অজ্ঞান, রাজা-প্রজা, স্বাস্থ্যবান রোগাক্রান্ত, আজন্ম সুখী ও আজন্ম দুঃখী ইত্যাকার শত শত বৈষম্য কেন? বেদান্ত বলেন,—'এই বৈষম্যের কারণ 'কর্ম্মফল'।' (ক্রমশঃ)

—ব্রহ্মচারী ধ্যানচৈতন্য।

মাধুকরী

দুঃখ-বাদ ও জীবনের আদর্শ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নির্গুণ বা সগুণ ব্রহ্ম, নিরাকার বা সাকার বাদ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে বিশেষ কিছু বলিব না। তবে মুক্তির আনন্দ আছে—সে কথাটা সকলেই বুঝিতে পারেন, এবং সে আনন্দের কাছে অন্য কোন আনন্দ আনন্দই নয়, যাহা লাভ করিলে অন্য কোন লাভ লাভই নয়—যঁল্লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। মুক্তির অভয় আছে, যে অভয়ের তুলনায় অন্য সমস্ত বস্তুই ভয়ান্বিত—সর্ব্বং ভয়ান্বিতং ভুবি বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। এই মুক্তির আনন্দ ও মুক্তির অভয় সম্বন্ধে সমস্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই সাক্ষ্য প্রধান করিয়াছেন। তবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আনন্দের কথাটা ধর্ম্ম জীবনের শেষ কথা; অর্থাৎ মোক্ষ বা নির্ব্বাণের অবস্থার কথা। প্রথম কথাটা নেতি-বাচক বা Negative। Eucken তাঁহার Truth of Religion গ্রন্থে সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন যে, Moral life এর প্রথম যেটা গতি, সেটা Negative movement বা rejection যাহাকে আমরা বলি "বৈরাগ্য সাধন"। মহাত্মা গান্ধী কবি রবিবাবুকে তাঁহার Young Indiaতে 'The poet's Anxiety শীর্ষক প্রবন্ধে কথাটা উত্তমরূপে বুঝাইতে

চেষ্টা করিয়াছিলেন। রবিবাবু বুঝিলেন কিনা, ভগবান জানেন। প্রথম হইতেই আনন্দের জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না। ব্রহ্ম আনন্দময়, অতএব এস আমরা আনন্দ করি, এস আমরা আনন্দে ভাসি,—"শুধু আনন্দে ভাসাও, শুধু আনন্দে ভাসাও"—এরূপ বলিলে চলিবে না। এরূপ কথা তাহারাই বলে, যাহাদের জীবন অত্যন্ত ভাসা ভাসা বা Superficial। ইহাদের Spiritual experience এত সামান্য যে, নাই বলিলেই হয়। ইহাদের Optimismএর মূল্য যে কিরূপ তাহা সুধীবৃন্দ বিচার করিবেন। আবার আর একটি হাস্যকর আপত্তি শুনা যায়। সেটা এই যে, absolute chastity ও absolute poverty যদি আদর্শ হইল, তাহা হইলে প্রজাবৃদ্ধি বা man power হইবে কিরূপে? এই যে politics, empire, commerce, industry, theatre, bioscope, লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, ছুটাছুটী ও হুটাপুটী—এ সমস্তই ত লোপ পাইবে। যাক, আর কিছু না হোক, অন্ততঃ বিবাহটা চাই। এ কথাটা অনেকটা সেকেলে ঠাকুরদাদাদের কথার মত যাঁহারা সর্ব্বদাই বংশলোপের বিভীষিকা দেখিতেন। যদি তাই হয়, অর্থাৎ সমস্ত লোকেই সারাজীবন অটুট ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারেন, তাহা হইলে সর্ব্বত্যাগী পবিত্রাত্মারা বলিবেন যে, "জগৎটাই ত মুক্ত হইয়া গেল, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? জগৎ আর কিসের জন্য? কিন্তু, ভাবগতিক যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় না যে, ও রকমটা হইবার শীঘ্র কোন সম্ভাবনা আছে। বংশবৃদ্ধি—ও পুরাদমেই চলিবে। ওটা Natureএর কাজ।" আমি এ পর্য্যন্ত দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে, moral lifeএর উৎপত্তি pessimism হইতে। এই moral lifeএর চরম পরিণতি সর্ব্বত্যাগে বা সন্ন্যাসে, এবং এই সন্ন্যাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। অবশ্য অনেকেই বলিবেন, ইহা বড় কঠিন আদর্শ। আবার অনেকে বলিবেন যে, ইহা অসম্ভব। ইহার উত্তরে মাত্র এই বলিতে পারি যে, আদর্শ যে অত্যন্ত কঠিন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই—দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। আদর্শ যদি কঠিন না হইত, তাহা হইলে সেটা আদর্শই হইত না। কিন্তু একেবারে

অসম্ভব নয়; যেহেতু, এ আদর্শ জীবনে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছি, যদিও যে মহাপুরুষদিগের জীবনে ইহা দেখিয়াছি, তাঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। রামপ্রসাদের ভাষায় বলিতে গেলে "ঘুড়ি লক্ষ্যের দুটো একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত চাপড়ী।"

(ক্রমশঃ)

পুস্তক-পরিচয়

১। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ)—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত। মহর্ষি বলিতেন ইহা তাঁহার "পথের-কথা"। ব্রহ্মলোক যাত্রীর ইহা অমৃত উপদেশ। মূল্য বার আনা।

২। প্রভাতী—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত। মূল্য বার আনা। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সম্বন্ধীয় নানা কথা যাহা লেখকের জীবন প্রভাতের সহিত জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাই অতি উপাদেয় রূপে গদ্যপদ্যে লিখিত হইয়াছে।

৩। ভগবৎ প্রসঙ্গ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত। এই গ্রন্থে ব্রহ্ম, সৃষ্টি, পরলোক, গীতা, অদ্বৈতবাদ, অবতার, সন্ধ্যা-গায়ত্রী, শক্তিপূজা, রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখক আলোচনা করিয়াছেন। কোন কোন প্রবন্ধ অদ্বৈত বাদানুসারে ব্যাখাত হইয়াছে, কোনও স্থলে বিশিষ্টাদ্বৈতকেও অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু লেখকের নূতন মতটি কি বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক গ্রন্থ পাঠে পাঠক-পাঠিকা বহু তথ্য জানিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নির্ম্মাল্য—শ্রীবিভূতিভূষণ দাস লিখিত। প্রত্যেক বালক বালিকার ইহা পাঠ করা উচিত। ঠাকুরের কথা লেখক অতি সোজা ভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। মূল্য ছয় আনা।

৫। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত "ভাব ও ভাষা" এবং "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত" পুস্তিকাদ্বয় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

সংঘ-বার্ত্তা

১। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজি মহারাজ বোম্বাই হইতে বেলুড়ে শুভাগমন করিয়াছেন।

২। বিগত ২৭শে ডিসেম্বর স্বামী বাসুদেবানন্দ নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কেশীয়াডাঙ্গা গ্রামের নৈশবিদ্যালয়ে বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ করেন এবং ২৮শে ডিসেম্বর দাহুপুর গ্রামে একটি দরিদ্র-ভাণ্ডার স্থাপিত করেন।

৩। এবার বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবে বিপুল ভক্ত সমাগম হয়। প্রায় ১৫ সহস্র ভক্ত প্রসাদ পান। নিম্নলিখিত স্থান হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবের খবর পাইয়াছি—কলিকাতা, রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি, ঝড়িয়া, ডিব্রুগড়, উটাকমণ্ড, সাতক্ষীরা, বোম্বাই, বেতিলা, রেঙ্গুন।

৪। বিগত ১লা মাঘ স্বামী বিদ্যানন্দ জয়রামবাটী আশ্রমে দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন।

৫। স্বামী বাসুদেবানন্দ ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী জানদি ও ভাঙ্গা আশ্রমের উৎসবোপলক্ষে গমন করিয়া ৪ঠা ফাল্গুন হইতে আরম্ভ করিয়া ৯ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদান করেন—(১) স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্ম্মযোগ (২) ভক্তি ও ভগবান (৩) বেদান্ত ও হিন্দু-ধর্ম্ম (৪) (ছাত্র সভায়) বর্ত্তমান যুগের ছাত্র জীবন (৫) হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তাহার প্রতীকার (৬) (মহিলা সভায়) নারী জাতির আদর্শ ও কর্ত্তব্য।

মৃত্যু-বরণ।

১

মরণে যে জন পিছনে ফিরিয়া চায়,
গত জীবনের পানে, কৃপণের মতো,
ফিরিয়া চাহে মুগ্ধ নয়নে হায়।
তাহারি মরণে, দুঃখ বেদনা ভয়।
মরণে কিন্তু সমুখে দৃষ্টি যার,
পুরাতন সব ভুলি, নব আগ্রহে,
নূতনের পানে করে যেই অভিসার,
মরণের ভয়ে ত্রস্ত সে কভু নয়।
নিশীথে মোরা যে দেহে ঘুমাই,
প্রভাতে সে দেহে জাগি।
ঘুমানো মোদের নূতন করিয়া
জাগিবারি শুধু লাগি।
মরণে শুধু এদেহে ঘুমায়ে
অন্য দেহেতে জাগি।
হেথায় মরিয়া, নূতন করিয়া
সেথায় বাঁচিয়া থাকি।
মরণে তবে শঙ্কা কি হেতু?
দুঃখ কি হেতু তায়?
নূতন দেশেতে নূতন করিয়া
কেই না বাঁচিতে চায়?

২

জীবন বৃক্ষে যতই লাগুক ঝড়,
জ্ঞান বিবেকের পক্ষ রয়েছে যার
পক্ষীর মতো, শঙ্কা নাহিক তার ।
ভাঙ্গিলে বৃক্ষ, মেলিয়া পক্ষদ্বয়,
অন্য বৃক্ষে উড়িবে সে নিশ্চয়
বৃক্ষ ভাঙ্গিলে দুঃখ কি হেতু তাব ?
পক্ষ-শূন্য বদ্ধ-সংস্কার—
বিশ্বে যে জন, মরণে তাহারি ভয় ।
অন্তঃশূন্য স্বার্থেনি শূন্য যেই,
মবণে তাহার শান্তি কোথাও নেই ।
মৃত্যু যাহাব চাঁদেব দেশেতে
তরণী বাহিয়া যাওয়া,
মাঝ সমুদ্রে মন্দ হাওয়ায়
পাল উড়াইয়া দেওয়া,
মরণ তাহার নূতন জীবন লাভ ।
কিন্তু যাহার মৃত্যু আবার
সংসার ছাড়ি যাওয়া,
"কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম,"
হতাশ পবাণে গাওয়া ।
মৃত্যু তাহার কেবলি মনস্তাপ ।
বীরেব মৃত্যু রক্তভাজা
তরুণের অভিসার,
বৃদ্ধের শুধু হিসাব খতান,
ফিরে চাওয়া বার বার ।
নদীর মৃত্যু বেয়ে যাওয়া শুধু,
গেয়ে যাওয়া কলতান,
পুকুরের হায় ! বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়া,
মাটি কেটে হয়রাণ ।
মরণের যেই মর্ম্ম বুঝেছে,
মরণে কি তার ভয় ?
মরণের মাঝে অমৃতের স্বাদ
লভিবে সে নিশ্চয় ।

—শ্রীসাহাজী ।

নদী ও পুষ্করিণী।

পুষ্করিণী নদীরে ডাকিয়া কয়,—
এম্‌নি করিয়া উজার হইয়া বোন,
আপনারে দেওয়া উচিত কখনো নয়।
জ্যৈষ্ঠের খরা মনে যেন সদা রয়।
আমি তো কখনো ধারিনে কাহারো ধার।
দিতে হয় পাছে কারেও বিন্দু জল,
শক্ত করিয়া তাই তো চমৎকার,
চৌদিকে দিছি উচ্চ করিয়া পাড়।
তটিনী কহে, দুঃখ কি কব মোর?
না দিয়া আমি থাকিতে পারি না ভাই,
দেওয়াই শুধু জীবন যেন রে মোর।
দেওয়ারি স্রোত চলেছে জীবন ভোর।
নিদাঘ শেষে দগধ ধরিত্রীর—
বক্ষের ছাতি ফেটে হলো চৌচির।
কাট ফাটা কি রৌদ্র ভীষণতর,
পুষ্করিণীর শূন্য ক্রমশঃ নীর।
কাঁদিয়া কহে, তুমি তো এখনো বোন,
তেম্‌নি চলেছ তুমি কল্লোল স্বন।
দুর্দ্দিনে শুধু আমিই গিয়াছি প্রায়,
আমারি শুধু শূন্য হৃদয় মন।
তটিনী কহে, তখন বুঝনি ভাই,
দেও নাই তুমি, তাই আজি তুমি নাই।
সিন্ধুর সনে রেখেছিনু আমি যোগ,
বিশ্বে আজিও বাঁচিয়া রয়েছি তাই।
দেওয়াতেই রয় ভূমার সঙ্গে যোগ,
দেয় যে সে তাই, না করে মৃত্যু ভোগ।

—শ্রীমাহাজী।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

(৬)

শ্রীশ্রীমা যখন কোঠারে ছিলেন সেই সময় আমার মেজ দাদা আমাদের গ্রামবাসী তাঁহার জনৈক বন্ধুকে পুরীধাম, শশি-নিকেতন হইতে পত্রে জানাইলেন "শ্রীশ্রীমা এখন কোঠারে আছেন, তোমরা তাঁহার দর্শনে যাইতে পার"। এর পূর্ব্বে একটা মোটামুটি ধারণা ছাড়া শ্রীশ্রীমা কিংবা শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতাম না, বা কোন পুস্তকেও পড়ি নাই। কিন্তু এই সংবাদ পাইয়া অবধি আমার মন তাঁহার দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দু চার দিন এইরূপ ব্যাকুল হওয়ার পর তাঁহাকে দর্শন করিতে কোঠারে গেলাম। তথায় বেলা প্রায় বারটার পর পৌছিলাম। কিন্তু সেখানে পৌছিয়া আর আমার এতটা ব্যাকুলতা ছিল না। এই সময় সব ভক্তদেব প্রসাদ পাওয়ার ডাক পড়ায় আমিও এই সঙ্গে গেলাম। প্রসাদ পাইয়া কৃষ্ণলাল মহারাজ, কেদার বাবা ও আমরা বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, এমন সময় রামবাবু (৺বলরাম বাবুর পুত্র) আসিয়া কৃষ্ণলাল মহারাজকে বলিলেন "যে ছেলেটি কটক থেকে এসেছে, মা ডাক্‌ছেন, সে এখন প্রণাম করে আসবে"। কৃষ্ণলাল মহারাজ বলিলেন "তাকে আমি বলেছি, বৈকালে মাকে দর্শন করতে যাবে"। রামবাবু বলিলেন "না, মা অপেক্ষা কচ্ছেন, দর্শন করে আস্‌লে তিনি খেতে যাবেন"। আমি রামবাবুর সঙ্গে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম—কোন কথাবার্ত্তা হইল না। পরদিন আমি বাড়ী চলিয়া আসি।

বাড়ী আসিয়া আবার মন ব্যাকুল হওয়ায় পুনরায় কোঠারে যাই এবং সেখানে দুই চারিদিন থাকার পর একদিন সকালে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে গিয়া মাকে বলিলাম "মা, কাল সকালে আমি বাড়ী যাব"। মা বলিলেন "আচ্ছা, কাল থেকো, পরশু যেয়ো"। এই কথার পর আমি

বাহিরে চলিয়া আসি। কিছুক্ষণ পর জনৈক সন্ন্যাসী মহারাজ আসিয়া আমাকে বলিলেন "তোমার উপর মায়ের দয়া হয়েছে, কাল সকাল বেলা স্নান করে প্রস্তুত থাক্‌বে"। আমি ভাবিতেছি 'দয়া' কি? কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া থাকিলাম। পরদিন সকালে স্নান করিয়া একা বসিয়া আছি এমন সময় রাধু দিদি আসিয়া বলিলেন "বৈকুণ্ঠবাবু কে? তাঁকে মা ডাক্‌ছেন"। আমি বলিলাম "আমারই নাম বৈকুণ্ঠ, আমি মায়ের নিকট যাব?" রাধু দিদির সম্মতি পাইয়া তাঁহার সঙ্গে শ্রীশ্রীমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলাম। মা দেখিয়া বলিলেন "এস, এ ঘরের ভিতরে এস"। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি মন্ত্র নেবে?" আমি বলিলাম "আপনার যদি ইচ্ছা হয়, দেন। আমি কিছু জানি না"। মা বলিলেন "বেশ, বস এখানে।" মা—"তুমি কোন দেবতার মন্ত্র নেবে?" আমি বলিলাম "আমি কিছুই জানি না"। তখন মা বলিলেন "বেশ, তোমার পক্ষে * * * এই মন্ত্রই ভাল"। মায়ের নিকট আমি সেই দিনই দীক্ষিত হইলাম। ১৩১৭ সালের মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে। এইখানেই একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "মা, যোগ শিক্ষার জন্য অন্য গুরু করতে পারা যায় কি না?" উত্তরে মা বলিয়াছিলেন "অন্যান্য বিষয় শিক্ষার জন্য তুমি গুরু করতে পার, কিন্তু দীক্ষাগুরু আর করতে নাই"। যেদিন কোঠার থেকে রওনা হইব, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে প্রায় বারটার সময় রামবাবু কিছু মিষ্টি হাতে লইয়া আমাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া বলিলেন "বৈকুণ্ঠ, মা এই মিষ্টি দিয়েছেন, তুমি সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। রাস্তায় কোন বাজারে-খাবার কিনে খেতে মা নিষেধ করলেন"।

* * * *

আর একবার আমি একা শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে গিয়াছিলাম। মা তখন কয়েক দিনের জন্য জয়রামবাটী হইতে কামারপুকুরে আসিয়াছিলেন। আমার ও কামারপুকুরে এই প্রথম যাওয়া। শ্রীযুত রামলাল দাদা ও লক্ষ্মী দিদি তখন কামার পুকুরে। প্রথম দিন রামলাল দাদা ও আমি বারান্দায় খাইতে বসিয়াছি, মা মাঝে মাঝে আমাদিগকে পরিবেশন করিতেছিলেন

এবং আমাকে বলিতেছিলেন "বৈকুণ্ঠ, সমস্ত খেয়ো, পাতে কিছু ফেলো না"। এই কথা বলিতে বলিতে আরো জিনিষ আমার পাতে দিতে লাগিলেন। রামলাল দাদাও "আরো খাও, লজ্জা কোরোনা" এইরূপ বলিতেছিলেন। তখন আমি এত খেয়েছি যে পেটে আর ধরে না, অথচ সঙ্কোচ বশতঃ কিছু বলিতেও পারিতেছি না। রামলাল দাদার এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন "থাক্, ও ক্ষ্যাপা ছেলে, যা খেয়েছে, খেয়েছে, আর কিছু বোলো না" এবং আমাকে বলিলেন "বৈকুণ্ঠ, এখন পাতা গ্লাস বাটী উঠিয়ে নিয়ে যাও গুরুগৃহে * ওসব রেখে যেতে নাই"।

দ্বিতীয় দিন যখন প্রণাম কবিতে যাই মা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি বাড়ী যাচ্ছ কবে?" আমি বলিলাম "মা, আমি বেলুড় মঠ দেখি নাই, মঠ হয়ে পরে বাড়ী যাব"। তাহাতে মা বলিলেন "এখন মঠে গিয়ে কাজ নেই, তুমি আজই বাড়ী যাও"। আমি বলিলাম "মা, এতদূর এসেছি। একবার মঠে না গিয়ে এখন বাড়ী ফিবছি না" মা বলিলেন "না, তুমি বাড়ী যাও, গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে নাই"। এ কথার পর আমি আর কোন আপত্তি করিলাম না। কিন্তু মনে মনে ভাবিয়া রাখিলাম এখান হইতে সরিতে পারিলেই মঠে যাব। তখন আর মা জানিতেও পারিবেন না। সেই সময় এলাহাবাদ হইতে একটি স্ত্রীভক্ত ও তাঁহার সঙ্গে একটি পুরুষ ভক্ত আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে মা সেইদিনই দীক্ষা দিয়াছেন। মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি এদের সঙ্গে যাও"। কিন্তু আমি সঙ্গে যাইলে তাঁহাদেব অসুবিধা হইবে বলায় আমি আর গেলাম না। তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য মা সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আমি আমার টাকার ব্যাগটি সদরের

---

* এখানে 'গুরুগৃহ' বলিতে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। কারণ তিনি নিজে এই সব ভক্তদের গুরু হইলেও জয়রামবাটী অবস্থান কালে কখনও তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট নিতে দিতেন না। ঝি চাকর দ্বারা পরিষ্কার করাইতেন, অনেক সময় নিজেই করিতেন—'গুরু হইলেও তিনি যে 'মা'। তবে উচ্ছিষ্ট পাতা হাওয়ায় উড়িয়ে অসুবিধা করবে বলে কখনো কখনো ভক্তেরা শুধু পাতাটা তুলে নিয়ে যেতেন।

কুলুঙ্গীতে রাখিয়াছিলাম। উক্ত কুলুঙ্গীতে মার দৃষ্টি পড়ায় তিনি উহা ঘরে নিয়ে রাখিয়াছিলেন। তারপর লক্ষ্মীদিদিকে দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন "বৈকুণ্ঠ তার টাকার ব্যাগ কি করলে?" এই কথা শুনিয়া আমি সেইখানে খুঁজিতে যাইয়া উহা পাইলাম না দেখিয়া লক্ষ্মীদিদি গিয়া মাকে এই সংবাদ জানাইলেন। মা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন "এত অসাবধান হলে কি সংসার চলে? এইটুকু সাবধানতা যার নেই, সে আবার কিসের সংসার করবে? তোমার টাকার ব্যাগ আমার কাছে আছে। তুমি তাদের সঙ্গে গেলে না কেন?" আমি কারণ বলায় মা তাঁদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। আমি মাকে বলিলাম "আপনি সেজন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আমি একটা লোক ঠিক করে কাল যাব"। মা এই কথা শুনিয়া নিজের ঘরে গেলেন।

সেইদিন দুপুর বেলা আমাকে ভিতরে ডাকাইয়া বলিলেন "এ চিঠীগুলি খুলে পড় দেখি, কি সংবাদ আছে"। আমি চিঠীগুলি পড়িলাম। তন্মধ্যে একখানির কথা বিশেষ মনে আছে—বাগবাজার মঠ হইতে আসিয়াছে, এই মর্ম্মে লিখা ছিল যে পূজনীয় শশী মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে একবার দেখিতে চান, ও মা তাঁহাকে যে চিকিৎসায় থাকিতে বলিবেন, তিনি সেই চিকিৎসায়ই থাকিতে চান। মা চিঠী শুনিয়া বলিলেন "আমি আর কি চিকিৎসার কথা বল্‌বো, শরৎ, রাখাল, বাবুরাম আছে, তারা পরামর্শ করে যেটি ভাল মনে করে, তাই করুক। আমি সেখানে গেলে ত রোগীকে সরাতে হবে। সেটা কি ভাল হবে? এমন রোগীকে কি সরাতে আছে? আমি যাব না। যদি শশীর কিছু ভাল মন্দ হয়, তবে কি আমি সেখানে থাকতে পারবো? তুমি বুঝিয়ে লিখে দাও ত—আমি এ জন্য যাব না"।

পরদিন প্রসাদ পাওয়ার পর বাড়ী রওনা হইবার জন্য বিদায় নিতে বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখি মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় পান সাজিতেছেন। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রঘুবীরকে প্রণাম করেছ?" আমি বলিলাম "না, মা"। তাহাতে মা বলিলেন, "এখানে এলে কিছু দিতে হয়, তুমি রঘুবীরকে প্রণাম করে সেইখানে কিছু প্রণামী দিও। তোমার

কাছে যদি টাকা পয়সা না থাকে, আমার কাছ থেকে নিও"। আমি বলিলাম "না, আমার কাছে টাকা আছে"। এই বলিয়া রঘুবীরকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। বিদায় নিবার জন্য মাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেছি, এমন সময় মা সহসা বলিয়া উঠিলেন "বৈকুণ্ঠ, আমায় ডাকিস্ ।" এই কথার পর মুহূর্ত্তেই আবার বলিলেন "ঠাকুরকে ডেকো, ঠাকুর কে ডাক্‌লেই সব হবে"। এই সময় লক্ষ্মীদিদি সেখানে ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন "না, মা, একি কথা ? এ—ত বড় তোমার অন্যায়। ছেলেদের এমন করে ভুলালে তারা কি কবরে ?" মা বলিলেন—"কই আমি কি কর্‌লুম ?" লক্ষ্মীদিদি—"মা তুমি এই মুহূর্ত্তে বৈকুণ্ঠকে বল্লে 'আমায় ডাকিস্', আবার বলছো "ঠাকুরকে ডেকো" মা বলিলেন "ঠাকুর কে ডাকলেইত সব হলো"। তখন লক্ষ্মীদিদি মাকে বলিলেন "মা এ রকম ভাবে ভুলানো তোমার অন্যায়," আর আমাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন "দেখ বৈকুণ্ঠ আমি আজ এই নূতন শুনলুম যে, মা বলেছেন 'আমায় ডেকো।" তুমি একথা যেন ভুলোনা। ঠাকুর আর কে ? তুমি মাকেই ডেকো। তোমার বড় ভাগ্য যে মা নিজে তোমায় এ কথা বল্লেন। তুমি মাকেই ডেকো"। আমাকে এইরূপ্ বলিয়া মাকে বলিলেন "কেমন মা, হয়েচে এখন ?" লক্ষ্মী দিদির এই কথায় মা মৌন রহিয়া সম্মতির লক্ষণ জানাইয়াছিলেন।

আসিবার সময় মা আবার আমাকে বলিলেন "তুমি এখান থেকে একেবারে ঘরে যেয়ো, এখন মঠে বা এখানে ওখানে কোথাও গিয়ে কাজ নেই। ঘরে গিয়ে বাপ মায়েব সেবা কর। এখন বাবার সেবা করা উচিত"। এই কথা বলিয়া আমার হাতে চার খিলি পান দিয়া আমাকে আসিতে বলিলেন। আমিও মার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আমার পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোয়াল পাড়া মঠ হইয়া বাড়ী আসিলাম। যাইবার সময় বাবার শরীর ভাল দেখিয়া গিয়াছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া দেখি বাবার বড়ই শক্ত ব্যাবাম হইয়াছে। আমার পৌছিবার ছয় সাত দিন পরেই বাবা দেহ রক্ষা করিলেন।

আমার এইবার কামার পুকুর যাবার সময় আমার এক গুরু ভাই

আমার হাতে মার নিকট একখানি পত্র দিয়াছিলেন। উক্ত পত্র মাকে দিবার সময় মা বলিলেন "তুমি খুলে পড়"। তাহাতে নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্ন ছিল। (১) "আমি চাকরী করিতে যাইতেছি, চাকরী করিলে মায়ায় জড়াইব কি মা?" শুনিয়া মা বলিলেন, "চাকরী করলে আবার মায়ায় কি জড়াবে?" (২) "আমার বিবাহ করিলে ভাল হইবে কি না?" মা এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু না বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি বিয়ে করেছ কি?" আমি বলিলাম "না মা, আমি বিবাহ করি নাই"। শুনিয়া বলিলেন "বেশত, তুমি বিয়ে কোরোনা, বিয়ে করা বড় জঞ্জাল।"

কামার পুকুরে অবস্থান কালে একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "মা, মাছ মাংস খেলে দোষ কি?" তদুত্তরে মা বলিলেন "এ দেশ মাছের দেশ, মাছ খেতে পার।"

সেই সময় আমি একবার মাকে বলিয়াছিলাম "মা আপনার পদ চিহ্ন নিতে চাই"। তাহাতে বলিয়াছিলেন "এখন এখানে সুবিধা নয়। তোমরা আমাকে যেমন (যে চক্ষে) দেখ, সকলে ত তেমন দেখে না। এই লাহা বাবুদের বাড়ীর অনেকে এখানে আসে টাসে। সে জন্য আমাকে লুকিয়ে থাক্‌তে হবে—পায়ে আলতার চিহ্ন থাকবে কি না"।

* * * *

অন্য এক সময় আমাদের দেশের কয়েকটি গুরু ভাই মিলিয়া জয়রাম-বাটী গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া আমার এইরূপ মনে হইতেছিল যে 'এত দূর ছুটিয়া আসিয়াছি। জীবনেত কিছুই করিতে পারিলাম না। শ্রীশ্রীমায়ের যদি সেবা করিতে পারিতাম, নিজকে বড়ই ধন্য মনে করিতাম!' একদিন সব গুরুভাইরা কামারপুকুর গেলেন। আমি কিন্তু গেলাম না। বৈকালে মার কাছে গিয়াছি। তিনি ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় (নূতন বাড়ীতে) বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন "বাবা ভাঁড়ার থেকে আটার হাঁড়িটা নিয়ে এসত"। আমি এনে দিলাম। তিনি খানিকটা আটা বাহির করিয়া জল মাখিলেন ও উহা ঠাসিতে বলিলেন। আমি আটা ঠাসিয়া দিয়া বাহির বাটীতে আসিলাম।

পুনরায় সন্ধ্যায় সময় মার কাছে গিয়াছি, তখন মা তাঁহার নিজের ঘরের বারান্দায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমি তথায় বসিয়া আছি, কিছুক্ষণ পরে মা আমাকে বলিলেন, "বৈকুণ্ঠ, পা-টা একটু টিপে দাও তো বাবা"। আমি পা টিপ্‌ছি, মা জিজ্ঞাসা করিলেন "ছেলেরা কামারপুকুর থেকে এখনো এলনা কেন? রাস্তা টাস্তা ভুলে গেল নাকি?" এই কথা বলিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। জ্ঞান ব্রহ্মচারিজীকে ডাকিয়া বলিলেন "জ্ঞান, একবার দেখতো, ওদের এত দেরী কেন হচ্ছে?" জ্ঞান ব্রহ্মচারিজী দেখিবার জন্য কিছু রাস্তা অগ্রসর হইয়া গেলেন। বাস্তবিক তাঁহাদের সেদিন রাস্তা ভুল হইয়াছিল। খোঁজ না লইলে তাঁহাদের বাটী পৌঁছিতে আরো অনেক দেরী হইত।

রাত্রিতে আমরা সকলে মায়ের সদর ঘরের বারান্দায় ঘুমাইয়াছিলাম। শেষ রাত্রে চারটার সময় আমাদের সকলের ঘুম ভাঙ্গিল। একজন বলিলেন "এই সন্ধিক্ষণে যদি একবার মায়ের দর্শন মিলতো।" এই বলিয়া তিনি একটি গান ধরিলেন:—"উঠ গো করুণাময়ী, খোল গো কুটীর দ্বার"—ইত্যাদি। গান শেষ হইতেই দেখি, মা বাহির দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা হঠাৎ তাঁহার দর্শন পাইয়া মহানন্দে একে একে সকলে প্রণাম করিলাম। মা আবার দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে গেলেন।

* * * *

আর একবার আমরা কয়েক জন মিলিয়া ৺বাসন্তী পূজার সময় জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। রাস্তায় সাদা পদ্মফুল দেখিতে পাইয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া লইয়া ছিলাম। যখন আমরা ঐ ফুল শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে অঞ্জলি দিব বলিয়া প্রস্তুত হইতেছিলাম, সেই সময় মা বলিয়া পাঠাইলেন "দেবীর পূজাতে সাদা ফুল লাগে না"। এ সংবাদ পাইয়া আমরা পুনরায় লালপদ্ম সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়াছিলাম।

একদিন তাঁহার সাংসারিক কোন কথায় শুনিলাম মা যেন কাহাকে বলিতেছিলেন "আমাকে বেশী জ্বালাবে না, কারণ আমি যদি চটে মটে কাউকে কিছু বলে ফেলি ত, কারো সাধ্য নাই যে আর রক্ষা করে!"

সেবার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "মা আজকাল সরকার যে ছেলেদের ধরে ধরে আটক করে রাখছে, এর পরিণাম কি হবে?" তদুত্তরে মা বলিয়াছিলেন "তাইত বড় অন্যায়। এর একটা প্রতীকার শীঘ্র হবে। আর বেশী দিন নয়—ভাল হবে"।

একদিন আমি মাকে বলিলাম "মা আমার একটা কিছু করে দিন"। তাহাতে মা বলিলেন "শরৎ, রাখাল এরা রয়েছে, ভয় কি?" তখন আমি বলিয়াছিলাম "মা আমার বড়ই ইচ্ছা হয়, কিছুদিন মঠে গিয়ে থাকি"। মায়ের মত হইল না, বলিলেন "এখন মঠে গিয়ে কাজ নেই, বাড়ীতেই থাকো"।

এইবার আমাদের গ্রামের ক্ষীরদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রীশ্রীমা কৃপা করিয়াছিলেন। ক্ষীরদ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, দীক্ষার সময় মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আজ থেকে তোমার ইহকাল ও পরকালের পাপ গেল"।

* * * *

একদিন কলিকাতায় বাগবাজারে মায়ের বাটীতে (উদ্বোধন কার্য্যালয়ে) মাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, মা জিজ্ঞাসা করিলেন "মাষ্টার মহাশয়কে প্রণাম করেছ?" আমি বলিলাম "না মা, আমি তাঁকে চিনি না"। মা বলিলেন "যাও, নীচে সে আছে। সে মহাপুরুষ লোক, তাকে প্রণাম করে এস"। এই বলিয়া পূজনীয়া গোলাপ মাকে আমার সঙ্গে পাঠাইলেন মাষ্টার মহাশয়কে চিনাইয়া দিতে। আমি নীচে আসিয়া মাষ্টার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আবার উপরে গেলাম। দুটী লোক এই সময় মাকে প্রণাম করিয়া নীচে চলিয়া গেলেন। মা ঠাকুর ঘরে নিজ তক্তাপোষে বসিয়াছিলেন। তিনি আপন মনে বলিতেছিলেন "যে সে লোক পা ছুঁয়ে বড় যন্ত্রণা দিলে।"

* * * *

একবার কোন বৈষয়িক ব্যাপার উপলক্ষে আমার সঙ্গে মেজ দাদার ঝগড়া হওয়ায় আমি কিছু দিনের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিবার ইচ্ছা করিয়া ঐ বিষয় শ্রীশ্রীমাকে জানাইতে ও তাঁহার অনুমতি লইতে বাগবাজার গিয়াছিলাম। মাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। মা

গোলাপ মাকে বলিতেছেন "ও গোলাপ, শুনেছ, বৈকুণ্ঠকে তার দাদা একটা চড় মেরেছে বলে সে এতদুর ছুটে এসেছে! ঘর করলে কি ঝগড়া হয় না? তার জন্য এতটা কেন?" আমাকে বলিলেন "যাও বাবা বাড়ী যাও। ঘর করলে একটু আধটু ঝগড়া হয় বৈকি"।

* * *

আমার এক গুরুভাই ঠাকুরের গায়ত্রী মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া আমাকে উক্ত মন্ত্র জিজ্ঞাসা করায় আমি মাকে চিঠীতে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম 'মন্ত্র কাহাকেও বলা যায় কিনা'। মা তখন মাদ্রাজে। তদুত্তরে চিঠীতে মা আমাকে জানাইয়াছিলেন "মন্ত্র কাহারও নিকট বলিতে নাই, তবে তোমার গুরু ভাইর নিকট বলিতে পার, তাহাতে দোষ নাই"।

* * *

একদিন মনের দুঃখে বাগবাজারে উদ্বোধনের বাটীতে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলাম "মা, আমি আপনার নিকট কিছু বল্‌তে এসেছি"।

মা—কি, বল।

আমি—মা, কবে আপনার এ অভাগা ছেলেকে দয়া হবে?

মা—বাবা, ঠাকুর দয়া করবেন, তাঁকে ডাকো। আর সৎসঙ্গ কর, সাধন ভজন কর। ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে।

আমি—ঐ করেত মা কিছু হলোনা। আমি ঠাকুরকে দেখিনি —কি ডাকবো? আপনার দয়া পেয়েছি—যদি আপনি বলছেন, তবে আপনার এ অভাগা ছেলের জন্য আপনি তাঁকে বলুন।

মা—জপধ্যান না করলে কি হয়? সে সব যে করতে হবে।

আমি—আর আমার জপটপ করতে মা ইচ্ছা নাই। করেত কিছুই হচ্ছে না। কাম ক্রোধ মোহ আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। মনের ময়লা একটুও কাটে নাই।

মা—বাবা, মন্ত্র জপ করতে করতে কাটবে। না করলে চলবে কেন? পাগলামি কোরো না। যখন সময় পাবে, মন্ত্র জপ কোরো। ঠাকুরকে ডেকো।

আমি—না, মা, আমার সে ক্ষমতা নেই। জপ করতে বসি ত মন চঞ্চল। হয়, আমার মন তন্ময় করে দিন্, যেন একটুও কুচিন্তা না আসে, না হয়, আপনার মন্ত্র আপনি ফেরৎ নিন্। বৃথা আপনাকে কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা নাই। কারণ, শুনেছি, শিষ্য মন্ত্র জপ না করলে তজ্জন্য গুরুকেই ভুগ্‌তে হয়।

মা—দেখ, একি কথা! তোমাদের জন্য যে আমি ভেবে ভেবে অস্থির হলুম। ঠাকুর তোদের যে কবে (অর্থাৎ পূর্ব্বেই) দয়া করেছেন।

এই কথা বলিতে বলিতে মার চোখে জল এল। আবেগ ভরে বলিলেন "আচ্ছা, তোমাকে আর মন্ত্র জপ করতে হবে না"—অর্থাৎ যা হয় তিনি নিজেই আমার জন্য করিবেন।

কিন্তু তখন তাঁহার কথার এ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ভয় ও আতঙ্কে আমার মাথা ঘুরে গেছে—ভাবলুম সব সম্বন্ধ বুঝি ফুরাল! প্রাণের আবেগে বল্লুম "মা আমার সব কেড়ে নিলেন? এখন আমি করি কি? তবে কি মা, আমি রসাতলে গেলাম?"

এই কথা শুনিয়া মা খুব জোরের সহিত বলিলেন "কি, আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে? এখানে যে এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই যে আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে।"

আমি—তবে মা এখন কি করবো?

মা—আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো। আর, এটা সর্ব্বদা স্মরণ রেখো যে তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন যিনি সময় আসলে, তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।

আমি বল্লুম, "মা, যতক্ষণ আপনার নিকট থাকি, খুব ভাল থাকি। সংসারের কোন চিন্তা আমার থাকে না। আর যেমন বাড়ী যাই, অমনি মনে নানা কুচিন্তা আসে। আবার সেই পুরাণো অসৎ সঙ্গীদের সঙ্গে মিশি, আর অন্যায় কাজ করি, যত চেষ্টা করি, কিছুতেই কুচিন্তা দূর করিতে পারি না"।

মা—ও তোমার পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারে হচ্ছে। জোর করে (হঠাৎ) কি ও ছাড়া যায়? সৎ সঙ্গে মেশো, ভাল হতে চেষ্টা কর, ক্রমে সব হবে। ঠাকুরকে ডাকো। আমি রইলুম। তুমি এ জনমে মুক্ত হয়ে রয়েছ, জানবে। ভয় কি? সময় আসলে তিনিই সব করে দেবেন।

স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ। *

আজ রবিবার ইংরাজী ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯১৫ সাল। বেলুড় মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারিবৃন্দের ধ্যান জপান্তে রাত্রি ৮॥০ ঘটিকার সময় সকলে Visitors' Room এ সমবেত হইলেন। কলিকাতা হইতে ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণ আসিয়াছেন। এবং আজ রাত্রে মঠ যাপন করিবেন। পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ নিরোদ মহারাজকে ঐ ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিতে লাগিলেন "তোকে বিকেলে বকলুম বলে কিছু মনে করিস্ নি তো? ত্যাখ, তোদের দেখে তবে নূতন ব্রহ্মচারীরা সব শিখবে। তোরা ideal হবি। * * * সাধু হলে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দরকার, ঠাকুর ময়লা দেখতে পার্ত্তেন না। (সম্মুখস্থ ব্রহ্মচারীদের দেখাইয়া) এদের সকল বিষয় শিক্ষা কর্ত্তে হবে—রাঁধতে, কুটনো কুটতে, ঠাকুরঘরের কাজ, পূজা, account রাখা, বক্তৃতা দেওয়া সকল কাজে expert হওয়া দরকার। এদের ওই রকম এখানে করিয়ে নিচ্ছি ও কত গাল মন্দ দিচ্ছি—ওদেরই ভালর জন্যে। মনে আমার এতটুকুও কারুর প্রতি রাগ নেই, এদের কত ভালবাসি। তোদের (ব্রহ্মচারীদের প্রতি) বকি ঝকি বলে কিছু মনে করিস্ নি!"

---

* জনৈক ব্রহ্মচারীর ডাইরী হইতে।

বাবুরাম মহারাজ—(নিজেকে দেখাইয়া) বে থা করলে আর কি হতো ? দুচারটে ছেলে মেয়ে হতো ; কেউ ভক্ত, কেউ বদমায়েস হয়তো হতো, তাতে কত কষ্ট হতো বল্ দেখিনি। আর এখন, দেখনা, সকল ভক্তকে ছেলের মতন ভালবাসি। সে নিজের দুটো একটার উপর টান্ হতো, এ দেশশুদ্ধ লোককে ভাল বাসতে পাচ্ছি। একজনকে দেখলুম ভাইপোর উপর ভারি দ্বেষ, অথচ নিজের ছেলেকে কত ভালবাসে। আমি তো দেখে ভারি চটে গেছলুম। সাধু হয়ে গেছি বলে আর কিছু বল্লুম না। গেরস্তদের এই সব সংকীর্ণতা। "আমার," "আমার," করেই মলো। "আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার ছেলে" ; অথচ চক্ষু বুজ্‌লেই কে কোথায় থাকেন্ তার ঠিক নেই। গৃহস্থরা সবই ঠিক কচ্ছে, কেবল মন মুখ এক করে ভেতর থেকে 'আমি, আমার' না করে যদি "তুমি," "তোমার" অভ্যাস করে, তা হলেই অনাসক্ত হয়ে যায়, সিদ্ধ হয়ে যায়। প্রভু, তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, তোমার ছেলে মেয়ে, এমন কি এই দেহটা পর্য্যন্ত তোমার, প্রভু, তোমার। "নাহং, নাহং, নাহং। তুঁহু, তুঁহু, তুঁহু।" "ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা"। ঠাকুর বলতেন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" এই অহংই সকল অনর্থের মূল। এই অহং শালাকে নাশ কর্ত্তে হবে, মেরে ফেলতে হবে, তা না করে এই অহং-সাপকে দুধ কলা দিয়ে পুষছি ! কাজেই তার দংশনে ছট ফট্ কর্ত্তে হচ্ছে, তবুও তাকে বুকে করে আঁকড়ে ধরে আছি। তাকে ত্যাগ করতে মায়া হয়, এমনি অজ্ঞান ! গীতা বল্‌ছেন,

"যৎ করোষি, যদশ্নাসি, যৎ জুহোষি, দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥"

এই ভাবটি পুষ্ট কর্ত্তে হবে, তবেই সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। "সব সমর্পিয়া একমন্ হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী" এই আত্ম-সমর্পণের ভাবটি ভেতরে আন্‌তে হবে।"

এক ঘর লোক, সব নিস্তব্ধ, চুপ। যেন সব ধ্যানস্থ, আলপিনটি পড়িলেও তাহার শব্দ শোনা যায়। সকলের মনকে যেন উর্দ্ধে ৩।৪ ধাপ

উর্দ্ধে তুলিয়া দিলেন। পরে কাঞ্জিলাল সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "শ্রীমৎ ভোলা গিরি East Bengal এ অনেক বড় বড় লোককে চেলা করেছেন। এমন বড় লোক আছে, যাঁরা আপনাদের বিষয় কিছুই জানে না, এমন কি কখনও শুনে নি।"

বাবুরাম মহারাজ—ভোলা গিরি ভালই কচ্ছেন। ঠাকুর বল্‌তেন জগতে যে যা কচ্ছে ভালর জন্যই কচ্ছে। ঠাকুর আমাদের অর্থ দেন নাই। আর আমরাও যেন কখনও ওতে না ভুলি। অর্থ পেয়েই তো লোকে ভগবানকে ভুলে যায়। অর্থই তো অনিষ্ট করে—দেখ্‌না কত বড় বড় মঠের মহন্তদের কত অর্থ ছ্যাঃ, ছ্যাঃ! ঠাকুর ও সব আমাদের দেবেন না। ছাখ্‌না, কত লোক সেবাশ্রমের জন্য জমী টাকা দিচ্ছে, কয়টা লোক আর মঠকে ছায়? (জনৈক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া) সেই ব্যক্তি কাশীর সেবাশ্রমে কত টাকা দিয়ে গেল, আর আমাদের বল্লে মঠের জন্য মাসে মাসে ১০০৲ টাকা will করে গেছি। পরে দেখা গেল সে টাকাও সেবাশ্রমের নামে। এ সব ঠাকুরের দয়া। টাকা হলে অভিমান হয়, অহংকার হয়, গোলা হয়, বারুদ হয়, দেখ্‌না ঐ সব যুদ্ধ। (তখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ চলিতেছিল)। ভোলা গিরি বড় লোক দেখে চেলা করেন, আমরা বড় লোক টড়-লোকের ধার ধারি না। আমরা young menদের চেলা করতে চাই। দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী যুবক চাই। যারা পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, সারা দুনিয়ায় ঠাকুরের এই পবিত্র ভাব প্রচারে ব্রতী হবে। বড় লোকগুলো কি আর মানুষ!

আমার ইচ্ছা করে এবং ঠাকুরকেও মাঝে মাঝে বলি, গৌরাঙ্গ অবতারে নদে ভাসিয়ে দিলে, কিন্তু কৈ ঠাকুরের ভাবে তো দেশটা এখনও ভাস্‌লো না, আমি এই দেখে মরতে পারি, তার সাধ হয়।

অমূল্য মহারাজ—যে জিনিষটা ধীরে ধীরে বাড়ে সেটা বহুদিন থাকে—খড়ের আগুন যেমন শীঘ্র জ্বলে তেমনি শীঘ্রই আবার নিভে যায়।

বাবুরাম মহারাজ—তোদের সিদ্ধ হতে হবে। আমরা বাবা সাধুগিরি টাধুগিরি কর্ত্তে চাই না। ঠাকুর বলতেন, "কোন্ শালা

সাধু।" "সাধু হয়েছি, এ অভিমানও তাঁর ছিল না—তিনি সাদা কাপড় পরিতেন।"

আমরা ঠাকুরকে ও স্বামিজীকে ideal নোব। হৃষীকেশী সাধুদের ideal স্বরূপ নিলে হবে না। তাদের বোল্ "জগৎ তো ত্রিকালমে হ্যায় নেই।" এদিকে সব নিজের নিজের স্বার্থের জন্য ছোটাছুটি, মারামারি। আমরা বাবা, সাধুও নই, গেরস্তও নই, বিরক্তও নই, ভোগীও নই। আমরা ঠাকুরকে জানি, আর তাঁকেই ideal স্বরূপ নিইচি। সেই জন্য ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, পবিত্রতা এই সবের দিকে লক্ষ্য না রেখে, শুধু হৃষীকেশ টিশিকেশে যারা যায়, তাদের উপর আমি ভারি চটা। ভিক্ষে করে খাবে আর কুড়েমি করবে বৈ ত নয়? ভগবানে মন স্থির করা কি চাট্টিখানি কথা রে, বাবা! নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন ধ্যান করলে একেবারে জমে যায়। তা না হলে—শুধু আকাশ পাতাল ভাবা। ঠাকুরঘরে দেখেছি তো ধ্যান কর্ত্তে বসে কেউ ঢুলছে—নয় তো কাসছে, গলা খাঁক্‌ড়ি দিচ্ছে ইত্যাদি। হৃষীকেশে ঝুপড়িতে থাক্‌লে বলে বিরক্ত সাধু। হয় তো দুপুরে কোথাও গল্প মেরে সন্ধ্যায় একটু জপ্ টপ্ করে শুয়ে পড়লো, ব্যাস্।

তোরা সব ভক্ত হবি, জ্ঞানী হওয়া কি সোজা? ঠাকুর বলতেন এক স্বামিজীই জ্ঞানের অধিকারী।

জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, তা না হলে চলবে না। দেখ না শশী মহারাজ কি ভয়ানক কর্ম্মবীর, এদের সব আদর্শ করে নে না। এই যে মঠ, ঠাকুরবাড়ী দেখছিস—এর গোড়া হচ্ছে শশী মহারাজ। আমি জোর করে বলতে পারি একমাত্র শশী মহারাজই ইহার কারণ।

Madras Presidencyতে শশী মহারাজ ও স্বামিজীর সুখ্যাতি ঘরে ঘরে। আহা! শশী মহারাজ ওদিক্‌কার দিক্‌পাল ছিলেন। মাদ্রাজীদের যে এত গোঁড়ামি, শূদ্রদের ছায়া পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা মাড়ায় না, শূদ্রেরা থুতু ফেলবার জন্য হাতে ভাঁড় নিয়ে তবে রাস্তায় বেরোয়, যাদের দেশে এমনি গোঁড়ামি, তিনি সেই দেশের ব্রাহ্মণকে দিয়ে

শূদ্রদের পরিবেশন প্রীতির সহিত করাইয়াছেন। (অমূল্য মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া) তোরা শশী মহারাজের জীবনী লেখ্‌বার চেষ্টা কর্ না?

অমূল্য মহারাজ—আপনারা যা বলছেন কেউ যদি লিখে নেয়, তাই তো বই হয়ে যায়।

বাবুরাম মহারাজ—আলমবাজার মঠে স্বামিজী প্রভৃতি সবাই তো ঠাকুরপূজার আপত্তি তুল্লেন। একমাত্র শশী মহারাজই প্রতিবাদ কল্লেন। তিনি সেই ছেঁড়া মাতুরের উপর ঠাকুরের ছবি রেখে পূজা করতেন। একদিন স্বামিজী প্রভৃতি সবাই তো ঠাকুরপূজা তুলে দিবার জন্য রাগ করে বলরাম বাবুর বাটী চলে গেলেন, একমাত্র শশী মহারাজ পূজার পক্ষপাতী ও তিনিই আলমবাজার মঠে রইলেন্। পরদিন বলরামবাবু আবার ওদের বুঝিয়ে সুজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

অমূল্য মহারাজ—একদিন শশী মহারাজকে Madras-এ দেখ্‌লুম খুব পরিশ্রম করে এসে কাপড় ফেলে দিয়ে, শুদ্ধ কৌপীন পরে, মাতুরে শুয়ে পড়্‌লেন। তার দুমিনিট পরেই দাঁড়িয়ে উঠে, স্বামিজীকে ঠিক যেন সামে দেখে বল্লেন, "দেখ্ দেখিনি, কোথায় পাঠিয়ে দিলি, খেটে খেটে প্রাণটা গেল, তোর জন্যই তো মাদ্রাজে এসেছি, আর পারি না," বলেই তখুনি একেবারে সাষ্টাঙ্গ হয়ে ঠিক যেন তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বল্লেন—"ভাই, আমি বুঝিনি, না বুঝে তোমায় এ সব কথা বলেছি মাপ করো। তুমি যা বলবে আমি ভাই তা কর্ত্তে প্রস্তুত।"

সকলে নিস্তব্ধ। পুনরায় বাবুরাম মহারাজ বলিতে আরম্ভ করিলেন—তোরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর চরিত্র অনুকরণ কর না। তিনি ত এখনও বেঁচে রয়েছেন। আর তোরাও ত তাঁর কৃপা পেয়েছিস, তাঁর দর্শন পেয়েছিস, একি কম ভাগ্যের কথা! সাক্ষাৎ জগদম্বার কৃপা। ফটোতে ত মা কত স্থানে ভোগ খাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর ঐ বেতো শরীরে, নিজে কাহারও সেবা নিচ্চেন না। পরিচিত হউক, অপরিচিত হউক, যে কেউ দেশে তাঁর কাছে যাচ্ছে তাকে কত যত্ন, কত সেবা। দেশে নিজে রাঁধেন, জল তোলেন, এমন কি ভক্তদের জন্য কোথায় ভাল দুধ, কোথায় ভাল আনাজ, আহা, তার জন্য এক মাইল পর্য্যন্ত খুঁজে

নিয়ে আসেন। ভক্ত খেয়ে গেল, বাড়ীতে ঝি-চাকর বাসন মাজবার কেউ নেই, তাঁর হুঁস নেই, শ্রীমা নিজে তাদের লুকিয়ে শকড়ি পাড়ছেন।

একজন লোক মার কাছে বাগবাজারে Complain করেছিল মঠে বড় কাজ করতে হয়। মা উত্তর দিলেন, "হাঁ, হাঁ, কাজ করবে বৈ কি, কাজ করলে মন ভাল থাকে।"

অমূল্য মহারাজ—আমি মাকে ভক্তদের সেবার জন্য তাঁর দেশে এক চুপড়ি বাজার মাথায় করে বাড়ীর পিছন দিয়ে নিয়ে আসতে দেখেছি।

বাবুরাম মহারাজ—আগে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হতো না, নিজেদের জন্যই রান্না হতো, পরে স্বামিজী introduce করে দেন। শশী মহারাজের আমলে, ঠাকুরের পূজা আরও বেশী ভাবে হতো। এখন তো সব ছাটকাট দিয়ে পূজা হয়; দাঁতন থেঁতলে তুলার মতন করে দেওয়া হ'তো, এখন ও সব মানসিক দেওয়া হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন।

৩রা জুলাই, সন্ধ্যা ৫ ঘটিকা ১৯২০। কাশী।

বাহিরের লোক আসিলে অনেক সময়ই মহারাজ শ্রোতার উত্থাপিত বিষয়ে আলাপ করিতে থাকেন। দুর্গাচরণ বাবু রাজনীতি বিষয়ের কথা পাড়িলেন। ঐ কথাই চলিতে লাগিল। এমন সময় বৃদ্ধ রক্ষিত মহাশয় আসিলেন। প্রণামান্তর রক্ষিত মহাশয় বলিলেন, "আপনাদের কি প্রসঙ্গ হচ্ছিল?"

হরিমহারাজ—উনি দেশের রাজনীতির কথা বলছিলেন। রক্ষিত মহাশয় ধর্মপ্রসঙ্গ উত্থাপনোদ্দেশ্যে বলিলেন, শেষ করে ফেলুন না?

হরিমহারাজ—যার আরম্ভ নেই তার আর কি শেষ থাক্‌বে ?

মনু বলেছেন—

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।

অসম্বদ্ধ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধম্‌ ॥”

অর্থাৎ বাঙ্ময় পাপ হচ্ছে এই চারিটি—কটু কথা, মিথ্যা কথা, বাজে আবোল তাবোল বকা ও পেঁচাও কথা।

উপনিষদেও বলেছেন, ‘অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ’ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের আলোচনা ব্যতীত অন্য আলাপ সব ত্যাগ কর—

গোবিন্দ! গোবিন্দ।

ফল preserve করা (কৃত্রিম উপায়ে বহুদিন রাখা) সম্বন্ধে কথা উঠিল। দুর্গাচরণ বাবু ঐ প্রসঙ্গে বলিলেন, বড় ডুমুর হালুয়ার মত খাওয়া যায়।

হরি মহারাজ—মাউন্ট আবুতে প্রথম শাক শবৃজী শুকিয়ে রাখ্‌তে দেখি। তারপর যখন অন্যান্য পাহাড়ে বেড়াই, তখন ত বিস্তরই দেখেছি। রান্নার আগে কিছু জল দিয়ে নেয়।

মধুতে ভিজিয়ে রেখে ফল রক্ষা করার কথা হইল।

হরি মহারাজ—কলকাতায় দেখেছি, দেশী লোক maple syrup (খেজুর রসের মত একপ্রকার বিলাতী গাছের রস—উহা হইতে চিনি প্রস্তুত হয়) খাচ্ছে। ওরাও (সাহেবেরা) লুচি, কচুরি, পোলাও খাচ্ছে, সন্দেশও খাচ্ছে। এই হচ্ছে আদান প্রদান।

তবে এখন কথা হচ্ছে—আমাদের বর্ত্তমানে কি রকম করে চলতে হবে। কেউ কেউ বলছে পাঞ্জাবের এই কাণ্ডের (জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের) পর আর কি মিলন সম্ভবপর হবে ? মোট কথা হচ্ছে, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে।

(দুর্গাচরণ বাবুর প্রতি) আপনি অরবিন্দ ঘোষের লেখা টেখা পড়েন ? ওঁরা বল্‌ছেন, ধর্ম্মকে এসবের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। আমি বলি এও কি কখনও হয় ? ওঁরা বলেন, বেদে ওসব কথা যদি না থাকে, নূতন বেদ তাঁরা তৈরী করে নেবেন।

নিজেদের প্রবুদ্ধ হতে হবে। পরের দিকে বেশী চাইলে চল্‌বে কেন? দেশে তেমন লোক নাই। সারা দেশে এক গান্ধী শিবরাত্রির সলতের মত টিম্ টিম্ করছে। আমাদের দেশে অন্নকষ্টে লোক না খেতে পেয়ে মরছে—আবার শুন্‌ছি ৬৲ টাকা সুদে লোন তুল্‌ছে। ব্রাহ্মণদের সাহেবদের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। ব্রাহ্মণেরা যে সকলের উপর অত্যাচার করেছে, এ কথাটা এরাইত নানা রকমে, আমাদের শিখিয়েছে। প্রকৃত কথা ত ঠিক তা নয়। প্রজার জন্যই ত রাজা। রঞ্জনাৎ রাজা—প্রজারঞ্জন করার জন্যই রাজা। আমাদেব ত আর রাজা নেই। তার জন্যই ত নাম দিয়েছে Bureaucracy (আমলাতন্ত্র শাসন)। এই যে Reform (শাসন সংস্কার) এতে Democracyর (গণতন্ত্রের) নামটিও নেই। এত কষ্ট রাজা থাকলে কি হত? এক মাথা সিধে করে আছে গান্ধী। Moderateরা (নরমপন্থীরা) ত অনেকটা Bureaucracyর (অমলাতন্ত্রের) দলে। তিলকও moderate partyর মত বলছেন, Co-operation when nesessary and opposition where required (প্রয়োজন হলে গবর্ণমেণ্টের সহযোগীতা আবার আবশ্যক হলে বিরুদ্ধাচরণ)।

সবত দেখা গেল, এখন আমাদের একমাত্র গতি হচ্ছে education, education (শিক্ষা, শিক্ষা)। স্বামিজী কি বলে গেছেন? দেখাইত যাচ্ছে, national line এ education চাই (জাতীয়ভাবে শিক্ষা)—ওদের line এ education দিলে হবে না। Dr P C Roy বলছেন বহু B A B Sc দেশে হয়েছে আর High education (উচ্চ শিক্ষা) দিয়ে কি হবে? এখন শিক্ষা দাও যা দিয়ে পেট ভরে দুমুটো খেতে পায়। খেতে দাও। কেবল টাকা টাকা করে লোকের কি দুর্দ্দশাই হয়েছে।

পূর্ব্বে দেশের অবস্থা কেমন ছিল!

গঙ্গা নাইতে দেখা হল, কত বিশ্বাস একের প্রতি অপরের হয়ে গেল। এখন বাবা, কাগজ লিখে দিলেও নিস্তার নেই। সুরেশ ডাক্তার বললেন, কলকাতায় কত জোচ্চোরেরা যোথ কারবার খুলছে। এ দিকে খাতা পত্রে সব ঠিক রেখেছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দেনার টাকা খেয়ে নিয়ে

নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করে। এ সব ওদেশের মন্দ লোকদের অনুকরণ বই আর কিছুই নয়। ভারী মুস্কিল। ওদের গুণগুলা আমরা শিখতে পারি নি, দোষ গুলা চট্ করে শিখে নিয়েছি। দেশের অবস্থা শোচনীয়। ভাল লোক জন্মাচ্ছেনা।

দৈবের প্রতি নির্ভর করে উপযুক্ত নেতার অপেক্ষা করা উচিৎ কি না—এ প্রসঙ্গে দুর্গাচরণ বাবু বল্লেন, "ভূদেব বাবু কল্কি অবতারের কথা বলে গেছেন। সেই প্রসঙ্গে বল্ছেন, দেশে সুলোকের প্রয়োজন। এক Voltaire Rousseauর লেখার চোটে কি সব কাণ্ড হল। দেশের লোকের যখন সুমতি হবে ও তারা এক কাট্টা হতে পারবে, তখন দেশে প্রকৃত নেতার আবির্ভাব হবে। বঙ্কিমবাবুও লিপি কুশলতাব কথা বলেছেন। কিন্তু লিপিকুশল লোক তেমন জন্মাচ্ছে না। হিমালয়েব ৫টা শৃঙ্গের মধ্যে যেমন একটা শৃঙ্গ সব চেয়ে উঁচু তেমনি একজন অতি শক্তিশালী নেতার দরকার"।

হরি মহারাজ—রুশিয়ার বিপ্লববাদের মূলে টলষ্টয়ের লেখনীচালনাকে অন্যতম প্রধান কারণ বলা যেতে পারে। তিনি একজন খুব সাধু পুরুষ ছিলেন এবং সাধারণ প্রজাদের যাতে কল্যাণ হয়, রাজশক্তি তাদের দাবিয়ে যাতে তাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট না করে দিতে পারে, তার জন্য তাঁর বিশেষ চেষ্টা ছিল। এমন কি তিনি নিজে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে সামান্য কৃষকজীবন যাপন করতে আরম্ভ করেছিলেন। রুষিয়ার রাজশক্তি শেষে রুষিয়া থেকে তাঁকে নির্ব্বাসিত করলে। কিন্তু দেখ্‌ছনা প্রজাশক্তি এখন চারিদিকে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে জগৎ গ্রাস কত্তে চাচ্ছে। এ সবকে আমরা অবশ্য অবিমিশ্র ভাল বলছি না। এটা একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। তবে কিনা কতকগুলা খারাপ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে বলে এরও একটা সার্থকতা আছে। এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে একটা সহজ স্বাভাবিক অবস্থা দাঁড়াতে পারে। আবার এখনকার বিপ্লববাদীরা টলষ্টয়কেও ছাড়িয়ে চলেছে। কথায় বলে না, বিশ্বকর্ম্মার বেটা বেয়াল্লিশকর্ম্মা—বাপের চেয়ে ছেলে দড়—কালে সব ঠিক হয়ে যাবে।

উপস্থিত—জনৈক ব্রহ্মচারী এবং অনাথাশ্রমের একটি বয়স্ক ছাত্র। স্থান—সেবাশ্রমের বটগাছতলায় মাঠের বেঞ্চে।

সময়—সন্ধ্যা ৭টা।

হরি মহারাজ—বড় গরম।

ব্র—এখন কিছু বৃষ্টিত পড়েছে।

হরি মঃ—কই, বেশী বৃষ্টি কোথায় হল? আজ বাহিরে শোব। কাল রাত্রিতে ছুটো অবধি বাহিরেই ঘুমিয়েছিলাম। ওরা মশারির উপর একটা চাদব দিয়ে দিয়েছিল। তারপর যখন মশারির ভেতর থেকে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে সুরু হল, তখন উপরে উঠে গেলাম। শরীরের সুখের জন্য লোক কত করে। দিনরাত ঐ কচ্ছে। তবু কি আর শরীর ভাল থাকে?

ব্র—মহারাজ, Elizabeth Hemansএর (এলিজাবেথ হিম্যানের) একটা কবিতার ভাব এই যে, ছুটি ছেলে ছুই বিভিন্ন অবস্থাতে জন্মালেও যদি উভয়কে একই প্রকার শিক্ষা দেওয়া যায় ও একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর রাখা যায় তা হলে ফল একই রকম হয়। ওরা ত সংস্কার টংস্কার মানে না। শরীরও প্রথম সকলেরই এক প্রকার থাকে—তারপরই যে যত প্রকৃতিব নিয়ম লঙ্ঘন করে সে তত ভোগে, এবং তাইতেই শরীরের ভেদ হয়ে যায়।

হরি মঃ—তাকি সব সময় হয়? এক সঙ্গে পাঁচটি ছেলে থাকলেও তারা পাঁচ রকম হয়ে যায়। ওদের পুনর্জন্ম ইত্যাদির ধারণা নেই কিনা—তাই সংস্কার টংস্কার বোঝে না। কেউ কি একটা Tabula rasa (দাগশূন্য ফলক অর্থাৎ কোন প্রকার সংস্কাররহিত মন) নিয়ে আসে?

ব্র—আমাদের শাস্ত্র বলে আত্মা ক্রমে হীন দেহ থেকে উচ্চতর দেহ আশ্রয় করে। ডারুইনের মত থেকেই ওদের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে ক্ষীণ আভাস এসেছে।

একটি শুদ্ধাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বালককে কেহ ডারুইনের অনুহাতে বানরের বংশধর বলায় হরি মহারাজ বলিলেন—

কি পাগলের মত বকছো ? ও সুসংস্কার সম্পন্ন ব্রাহ্মণের ছেলে—বানরের বংশধর হতে যাবে কেন ? পাণ্ডিত্যের বা আধুনিক বিজ্ঞানের মত বলেই কি তা সত্য বলে ধরে নিতে হবে ? বিজ্ঞান ত দেখছি, আজ যে সিদ্ধান্ত করে কালই তার কত উড়ে যায়। ডারুইনের মত যারা মানে মানুক, আমাদের শাস্ত্রে মানব সৃষ্টির দুটো মতবাদ পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে তবে মনুষ্য জন্ম পাওয়া যায়। এটা অনেকটা ডারুইনের মতের মত। তবে ডারুইন হচ্ছেন জড়বাদী আর আমাদের শাস্ত্র হচ্ছেন আত্মবাদী। ডারুইন বলেন, এই স্থূলশরীরটারই ক্রমোবিকাশ হয়। আর একটা হচ্ছে ভগবান থেকে নেবে আসা। সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা প্রথমতঃ সনৎকুমার প্রভৃতি কুমারদের সৃষ্টি করলেন। তাঁদের তখন ব্রহ্মা বল্লেন, 'সংসার কর।' তাঁরা ভগবান্ থেকে নেবে এসেছেন কিনা, তাই তাঁরা বল্লেন, 'ও কি কথা। আমাদের দ্বারা সংসার হবে না।' তারপর ব্রহ্মা প্রজাপতিদের সৃষ্টি করলেন। তাঁরা সংসার কত্তে রাজী হলেন। এ ত সোজা কথা, এ ত আমরাই দেখতে পাচ্ছি। এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কত লোকের জন্মাবার পর থেকেই বিয়ে টিয়ের ভাব টাব নেই। এরাই হচ্ছে কুমার। যাদের পুত্রোৎ-পাদনের শক্তি জন্মেনি তাদেরই সাধারণতঃ বলে—কুমার। ঐ কুমারবৎ অবস্থা সাধন বলে যে আজীবন বজায় রাখ্‌তে পারে, তাকেই যথার্থ কুমার বলা যায়। শাস্ত্রের এই দ্বিতীয় মতটাই সুন্দর। আমরা অমৃতের সন্তান, বানরের সন্তান হতে যাব কেন ? "যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি।" ঠাকুর হোমাপাখীর কথা বলতেন—শোননি ? ওরা আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পড়্‌তে পড়্‌তে আকাশেই ফুটে যায়। আরও পড়্‌তে পড়্‌তে পাখীটা যেই দেখে যে মাটীতে পড়ে যাচ্ছে অমনি তার মনে পড়ে যায়, তার বাপ মা উপরে আছে। অমনি উপর দিকে চোঁ চাঁ দৌড়। আর মাটীতে পড়তে পায় না। তেমনি অনেক মানুষও আছে যাদের একটু বয়স হতে না হতেই সংসারে আসক্তি শূন্য হয়ে ভগবানের দিকে দৌড়ে যায়। একটা হচ্ছে দৃষ্টান্ত, আর একটা হচ্ছে দ্রাষ্টান্তিক। আমার মনে পড়ছে আমার বয়স যখন ১০ বছর—আরও কম, বোধ

হয় ৮ বছর—তখন আমার বন্ধুকে বলেছিলাম, আমি বিয়ে করব না। সে বন্ধুও সাধু হয়ে গেল,—আমিও সাধু হয়ে গেলাম।

(বালকটির প্রতি) তুই সাধু হবি কি গৃহস্থ হবি বল্ ?

বালক—সাধু হব।

হরি মঃ—নিশ্চয়, সাধু হবি বৈ কি। এখন থেকে চেষ্টা করলে ঠিক ঠিক ভগবান লাভ হয়ে যাবে। মনের মধ্যে একটা প্রতিজ্ঞা থাকা চাই—তাঁকে পাবই পাব। এখন থেকে খুব জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হলে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয়ে যাবে। আর যদি সাধারণ লোকের মত হতে চাস তবে চারটি চারটি খাবি, ছেলে পুলে হবে, টাকাকড়ি করবি, মরে যাবি—ব্যস্ শেষ হয়ে যাবে। গৃহস্থের মান যশ চাস, না, সাধু হতে চাস ?

বালক—সাধুর কি মান যশ নেই ? সাধুরও ত মানযশ আছে।

হরি মঃ—নিশ্চয়ই সাধুর মানযশ আছে। দেখ্ দেখি স্বামিজীর যশ—কি বীরের মত জগৎটা জয় করে গেলেন। কি বীর ভাব। কি জিতেন্দ্রিয়তা। তেমনি হলেত হয়েই গেল। উঁচু উঁচু বিষয়ে মন ছিল বলে নীচু দিকে যেতেই পায়নি। ঠাকুর বলতেন্—লোকের মন বেশী পায়ু, উপস্থ, আর নাভিতেই থাকে। সাধকের মন হৃদয়ে উঠে যায়, তারপর আরও উপরে—কণ্ঠে, তারপর ব্রহ্মরন্ধ্রে মন উঠে গেলে সমাধি হয়ে একুশ দিনের মধ্যে দেহ ত্যাগ হয়ে যায়। ঠাকুর আরও বল্‌তেন, আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকলেও সোনা, ঘরে থাকলেও সোনা। যেখানেই ফেলে দাও, শক্তি থাকলে প্রকাশ হবেই হবে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাঁর কাছে ভক্তি চাইবি। (ব্রহ্মচারী প্রতি) ও শিবের কাছে পাশুপত অস্ত্র চায়। তুই পাশুপত অস্ত্র নিয়ে কি করবি ? তুই ক্ষত্রিয় নস, তুই যে ব্রাহ্মণ। তুই তাঁকে সন্তুষ্ট করে ব্রহ্মজ্ঞান চেয়ে নিবি। ব্রাহ্মণের এর চেয়ে বড় অস্ত্র কিছু নেই। বিশ্বামিত্র আর বশিষ্ঠের গল্প জানিস্ ? রাজা বিশ্বামিত্র একদিন ধনুর্ব্বাণাদি নিয়ে বশিষ্ঠের একশ ছেলে মেয়ে কামধেনু নিয়ে চললেন। কিন্তু বশিষ্ঠ সব দেখে কিছু না বলে ব্রহ্মদণ্ড হাতে নিয়ে বসে রইলেন। তখন বিশ্বামিত্র জোড়-

হাতে তাঁর পায়ে পড়ে বল্লেন—ক্ষত্রিয় বল ধিক্। এই বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌লেন।

বালকটি সন্ধ্যাবন্দনার জন্য বিদায় লইলে হরি মহারাজ বলিলেন—ছেলেটার বেশ শুদ্ধসংস্কার। ওর রজঃ মিশ্রিত সত্ব, আর অ—বেশ সত্বগুণী। এখন ঠিকমত চললে ভাল হবে, নইলে আর পাঁচজনের মত হয়ে যাবে। অদৃষ্ট বলে কিছু নেই। সবটাই বলতে গেলে পুরুষকার, যোগবাশিষ্টে পুরুষকারের খুব প্রশংসা করেছে। দৈব যে একেবারে নেই তা নয়। 'দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা'। দৈবও পুরুষকার সম্পন্ন ব্যক্তির অনকুল হয়ে যায়। God helps those who helps themselves (যে নিজে চেষ্টা করে ঈশ্বর তাঁকে সাহায্য করেন) দৈবের উপর নির্ভর করে লোকে নীচের দিকে যেতে বসে। লোকে নিজ দোষে গোল করে বসে, তারপর দৈবেব দোষ দেয়। বুঝ্‌তে হবে—আছাড় খাওয়াটা accident (আকস্মিক) গতিটাই স্বাভাবিক। ভুলভ্রান্তি হওয়াটা accident, উপরে উঠাই স্বাভাবিক।

ব্রহ্মচারী—কাঁচির দুখানা ফলার মধ্যে কোন্‌টা যে কর্ত্তনরূপ ব্যাপারের জন্য কতটা দায়ী তা যেমন আমরা জানিনা, সেইরকম আমাদের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য আমাদের দৈব অথবা পুরুষকার কোন্‌টা যে কতটা দায়ী তা ঠিক ঠিক নির্দ্ধারণ আমরা কত্তে পারিনে। তবে আমরা ধরে নিই যে দুখানা ফলাই কাটার ব্যাপারে সমান দায়ী। আমাদের পুরুষকারের ফলাটা আমাদের হাতে। এটাকে ধার করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত। দৈবের ফলাটা আমাদের সাধ্যের বাইরে—কাজেই নিজের আয়ত্ত ফলাটা ধার দিয়ে অপরটার অপেক্ষায় থাকাই আমাদের উচিত।

হরি মঃ—ঠিক কথা, ঐ ত উপায়। ঐরকম না হলে ত কোন ফলই হয় না। তবে ভক্তের নির্ভর বলে একটা জিনিষ আছে। সেটা দুর্ব্বলতা নয়। সে যেমন—'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হক্'।

সাংখ্যাচার্য্যগণ সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করের মতামত।

ঈশ্বর কৃষ্ণ সাংখ্য কারিকার রচয়িতা এবং পতঞ্জলি হইতেছেন যোগ সূত্রকার। এক্ষণে এই দুই শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া যে সকল দর্শন শাস্ত্র বিস্তৃত হইয়াছে সে সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া আচার্য্য শঙ্কর যে মতামত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্বোধন পাঠক পাঠিকার নিকট উপস্থিত করিব। সাংখ্য দর্শনকে কপিলের মত বলা হয়। কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্য কারিকার সহিত ভাগবতে শ্রীভগবান কপিল তাঁহার মাতা দেবহুতিকে যে ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছেন তাহার মিল নাই, তাহা সেশ্বর সাংখ্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৫।২) যে কপিলের উল্লেখ আছে তাঁহার মত আর ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকার মত যে একই তাহাও বলা যায় না। উক্ত উপনিষদে কপিলকে অগ্র-জ্ঞানী বলা হইয়াছে কিন্তু সে জ্ঞান সেশ্বর জ্ঞান। পক্ষান্তরে শ্রীশঙ্কর পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন ঐ স্থলে 'কপিল' অর্থ 'হিরণ্য-গর্ভ'। আবার গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেশ্বর-জ্ঞান-যোগকে সাংখ্য-যোগ বলিতেছেন। ব্যাস-সূত্র বা বেদান্ত-দর্শন দ্বারা সাংখ্য-দর্শন খণ্ডন তাহাও বলা যায় না; কারণ উক্ত ব্যাস-সূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের বহু ভাষ্য আছে এবং কোনটির সহিত কাহারও মিল নাই। অতএব ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কি তাহাও নির্দ্দেশ করা কঠিন। এবং কারিকা সম্বন্ধেও বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, সেই হেতু আমরা বলিতেছি উক্ত কারিকা ও সূত্র সম্বন্ধীয় যত প্রকারের ব্যাখ্যা আছে, সেই সকল সম্বন্ধে, ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া শঙ্করের মতামত। পতঞ্জলি সম্বন্ধে কোনও গোলযোগ নাই কিন্তু ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বীয় মত সজ্জন-গৃহীত করিবার নিমিত্ত কপিলের দোহাই দিয়া নানা আচার্য্যের মধ্য দিয়া যে জের টানিয়াছেন তাহা নিরর্থক। পিতামাতা ও আচার্য্য না থাকিলে সমাজে যেমন লোক সন্দেহজনক, শাস্ত্র সম্বন্ধেও তাহাই।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের পদার্থে প্রায় কোনও ভেদ নাই, পাতঞ্জলের ঈশ্বরবাদ ও কৈবল্যের প্রকার ভেদ আছে মাত্র। ঈশ্বরবাদ গৃহীত হওয়ায় পাতঞ্জল যেন সাংখ্যের পরিশিষ্ট এবং পাতঞ্জলে চিত্তবৃত্তির নিরোধের দ্বারা মুক্তি বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক হইতে মুক্তি। এতদ্‌ব্যতীত অপরাপব তত্ত্ব উভয় শাস্ত্রে সমান। ঈশ্বর কৃষ্ণ বলেন পুরুষ ও প্রধান উভয়ই অনাদি ও অনন্ত। পুরুষ নির্গুণ অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব উহাতে নাই, এবং উহা চেতন, নানা, অপরিণামী ও বিভু; পক্ষান্তবে প্রধান বা প্রকৃতি সগুণ, অচেতন, এক, বিভু ও পরিণামী। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রধান। সাম্যাবস্থা অর্থে উক্ত গুণত্রয়, কেহ কাহাকে অভিভব না করিয়া, বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক যখন মিত্রভাবে অবস্থান করে। পুরুষের সংযোগ দ্বারা উক্ত সাম্যাবস্থার তারতম্য বা বৈষম্য ঘটে। উক্ত প্রধানই বৈষম্যাবস্থায় প্রকৃতি নামধেয় হয়। উপাদান কারণকে প্রকৃতি বলে আর প্রকৃতির কার্য্যের নামই বিকৃতি। প্রধান মহত্তত্ত্বের কারণ বলিয়া প্রকৃতি এবং অনাদি বলিয়া বিকৃতি নহে। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিকৃতি। কারণ একটি অপরটির প্রকৃতি এবং অন্যটির বিকৃতি; পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এই ষোড়শ পদার্থ কেবল বিকৃতি। পুরুষ প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে। পুরুষ কাহারও হেতু নহে বলিয়া প্রকৃতি নহে, এবং কাহারও কার্য্য নহে বলিয়া বিকৃতিও নহে বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ঈশ্বর কৃষ্ণের তৃতীয় শ্লোকে ঐ ব্যাপারটি আছে। পাঠক পাঠিকার সুবিধার নিমিত্ত তাহা আমরা এখানে উল্লেখ করিব।

মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥ ৩

বাচস্পতি মিশ্র ইহার তত্ত্বকৌমুদী নামক টিকা রচনা করিয়াছেন। তাহার অনুবাদ এইরূপ—

"সাংখ্য শাস্ত্রের পদার্থ সমুদয় সংক্ষেপরূপে চারিভাগে বিভক্ত, কোন পদার্থ কেবল প্রকৃতি অর্থাৎ কারণই, কার্য্য নহে, কোন পদার্থ কেবল

বিকৃতি পদার্থ অর্থাৎ কার্য্যই, কারণ নহে, কোন পদার্থ প্রকৃতি-বিকৃতি উভয়রূপ এবং কোন পদার্থ অনুভয় রূপ অর্থাৎ কার্য্যও নহে, কারণও নহে। উক্ত চারি প্রকারের মধ্যে কোনটি কেবল প্রকৃতি এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হইয়াছে, মূল প্রকৃতি কার্য্য নহে, সম্যক প্রকারে কার্য্য-সকলকে যে উৎপন্ন করে, তাহাকে প্রকৃতি বলে, উহার আর একটি নাম প্রধান, উহা সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় উপলক্ষিত গুণত্রয়, উহা অবিকৃতি, কার্য্য নহে, কেবল, কারণ। মূল যে কারণ তাহাকে মূলা প্রকৃতি বলে, কার্য্য-বর্গ সমুদয়ের প্রকৃতিই মূল কারণ, ইহার আর মূল নাই, মূল কারণের মূল এরূপ হইলে অনবস্থা দোষ হয়।

কোন্ কোনটি প্রকৃতি বিকৃতি, উহাদের সংখ্যাই বা কত—এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হইয়াছে, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্যকারণ উভয়রূপ। তাহা এইভাবে হয়, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারের কারণ অথচ মূল প্রকৃতির কার্য্য। এইরূপ অহঙ্কার তত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের কারণ অথচ মহত্তত্ত্বের কার্য্য। এইরূপ পঞ্চতন্মাত্র আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের কারণ অথচ মহত্তত্ত্বের কার্য্য। কোন্ কোন্ পদার্থ কেবল বিকৃতি, উহাদের সংখ্যাই বা কত—এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হইয়াছে ষোলটি পদার্থ কেবল বিকৃতি, অর্থাৎ কার্য্য, কারণ নহে। ষোড়শকঃ তু—এই তু শব্দের অর্থ অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়, উহার ক্রম ভিন্ন ষোড়শকঃ বিকারস্তু বিকার এব এইরূপে অর্থবোধ হইবে। পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ সংখ্যা বিশিষ্টগণ কেবল বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য, কারণ নহে, ইহা হইতে অন্য কোন তত্ত্বের উৎপত্তি হয় না। যদিও পৃথিব্যাদির গো-বৃক্ষাদির কার্য্য আছে, গো বৃক্ষাদির কার্য্য দুগ্ধ বীজাদি, দুগ্ধ বীজাদির দধি অঙ্কুরাদিরূপ কার্য্য আছে সত্য, কিন্তু গবাদি বা বীজাদি পৃথিব্যাদি হইতে পৃথক তত্ত্ব নহে। কারিকার প্রকৃতি পদের অর্থ অন্য তত্ত্বের উপাদান, অতএব দোষ নাই। গো-ঘটাদি সমস্তেরই স্থূলতা ও ইন্দ্রিয়-বেদ্যতা পৃথিব্যাদির সহিত সমান অর্থাৎ পৃথিবী যেমন স্থূল ও চক্ষুঃ বা ত্বক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, ঘটাদিও সেইরূপ, অতএব পৃথক তত্ত্ব নহে।" (তত্ত্বজ্ঞানামৃত)

সাংখ্য মতে ঈশ্বর অসিদ্ধ সেইহেতু স্বতন্ত্রা প্রকৃতিই জগতের আদিকারণ পুরুষের ভোগের নিমিত্তই প্রকৃতির কার্য্য অর্থাৎ প্রকৃতির বিষয়রূপ পরিণামের দ্বারাই পুরুষের ভোগ হয়। বুদ্ধি দ্বারা যখন প্রকৃতি পুরুষের ভেদ উপলব্ধি হয় তখনই মুক্তি। এই বিচারকেই বিবেক বলে। পুরুষ অসঙ্গ সেই হেতু বন্ধ ও মোক্ষ তাহার অসম্ভব, তথাপি অবিবেক বশতঃ জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষাদি যাহা বুদ্ধির পরিণাম পুরুষ আপনাতে আরোপ করিয়া ঔপচারিক বন্ধ মোক্ষ ভোগ করে। পুরুষের বন্ধ মোক্ষ আরোপিত, পারমার্থিক নহে। 'বুদ্ধিই ভোক্তা ও বুদ্ধি আত্মা হইতে পৃথক' এই জ্ঞানই বিবেক, ইহার অভাবের নাম অবিবেক। কোনও কোনও সাংখ্যাচার্য্য পুরুষের পারমার্থিক ভোগের স্বীকার করেন।

পুরুষ ও প্রকৃতি সমন্তরাল ভাবে অনাদি ও অনন্ত। পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগে সৃষ্টি। উপাদান বা (সমবায়ী) কারণ অর্থাৎ অবয়ব দ্রব্যের গুণ অনুযায়ী কার্য্য-দ্রব্যে গুণ বর্ত্তায়। অতএব কার্য্যের গুণ অবলম্বনে কারণের গুণ কল্পনা করা যাইতে পারে। কার্য্যে যদি জ্ঞান, সুখ, প্রসাদ, প্রবৃত্তি, দুঃখ, মোহ ও আচরণ প্রভৃতি দেখা যায় তাহা হইলে কারণেও উহা স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃতির গুণত্রয় দ্রব্য পদার্থ বৈশেষিকদের রূপ রসাদির ন্যায় গুণ নহে। উহারা প্রকৃতির অবয়ব এরূপ নহে—উহারাই প্রকৃতি। উহারা নিত্য সহচর, সংযোগ-বিয়োগ রহিত, পরস্পর আশ্রয়, পরস্পর পরিণামের হেতু। জনৈক সাংখ্যাচার্য্য বলেন "গুণত্রয়ের ব্যক্তিগত বহুত্ব স্বীকার করিতে হয়, মাত্র একটি কার্য্য রূপ বস্ত্রের সূত্ররূপ অসংখ্য কারণ থাকে, অনন্ত-কার্য্য বিশ্ব সংসারের মূল কারণ ব্যক্তিরূপে এক, এ কথা কখনই বলা যায় না, অতি সূক্ষ্মতম মূল কারণ সমূহের সমষ্টি ভাবেই প্রকৃতিকে এক বলা হইয়া থাকে। অবয়বের বিভাগ হইতে যেখানে শেষ হয়, আর বিভাগ চলে না, সেইটিই মূল কারণ প্রকৃতি।"

ইঁহারা স্বীকার করেন অসৎ পদার্থ নাই এবং জন্মে না এবং সৎ বস্তুর বিনাশ নাই। দৃশ্যমান জগৎ প্রলয়ে প্রকৃতিতে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে সৃষ্টিতে পুনরায় কার্য্যরূপে আবির্ভূত হয়। এই উৎপত্তির নাম আবির্ভাব ও বিনাশের নাম তিরোভাব। পুরুষ প্রকৃতির সান্নিধ্যের হেতু অদৃষ্টঃ।

ইঁহারা নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না। : তাহা হইলে সমষ্টি সৃষ্টি প্রবাহ পরিচালিত করে কোন চেতন? ইঁহারা বলেন জন্মেশ্বর অর্থাৎ জীব তপস্যা বলে অনিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া জগৎ শাসন করিতে পারে। বুদ্ধি গুণত্রয় হইতে জাত বটে কিন্তু উহাতে সত্ত্বাংশ অধিক এই হেতু উহাতে জ্ঞান সুখাদির বিকাশ এবং উহাতে এমন একটি শক্তি থাকে যাহাকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি পুরুষের ছায়া গ্রহণ করিয়া স্বয়ং চেতনের ন্যায় জীব ভাব প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ জড় হইয়াও চেতনের স্বভাব বিশিষ্ট হয়। চিৎ ও জড়ের মিশ্রণে জীবভাবের আবির্ভাব হয়। তপ্ত লৌহ-পিণ্ডের লৌহ ও অগ্নিকে ভেদ করা যেরূপ কঠিন সেইরূপ পুরুষ ও বুদ্ধি বিষয়ে ঘটিয়া থাকে। অনাদি কাল ধরিয়া এক একটি পুরুষ মহত্তের এক এক অংশের সহিত জড়িত। ঐ সম্বন্ধ নাশের নামই লিঙ্গ শরীর নাশ বা মোক্ষাবস্থা। বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মভূত পঞ্চক লইয়া লিঙ্গ শরীর। এই লিঙ্গ শরীরই স্বর্গ নবক গামী হয়। স্থূল শবীর হইতে বহির্গত হওয়াব নাম মৃত্যু, নব স্থূল শরীরে প্রবেশের নাম জন্ম। পারমার্থিক ভাবে পুরুষ অনাদি অনন্ত তথা বিভু সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাঁহার জন্ম মৃত্যু কিছুই নাই। আত্মার গমনাগমন ব্যবহাব মাত্র। আত্মাব পরিমাণ মহৎ। কারণ অনু পরিমাণ হইলে সর্ব্বশরীরে এককালে শীত বা গরম বোধ হইত না; মধ্যম পবিমাণ হইলে ঘট পটাদির ন্যায় নশ্বর হইত—কারণ, যাহার অবয়ব আছে তাহা নশ্বর।

তাঁহারা আরও বলেন জগৎ-কারণ-বোধক বেদান্ত বা উপনিষৎ বাক্য সাংখ্যের প্রধানকেই বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম নয়। সর্ব্বশক্তিমত্বা প্রকৃতিতেই আছে। সর্ব্বশক্তিমত্বা অর্থে সর্ব্বজনন সামর্থ্য। উহা আবার প্রাকৃতিক বিকার সাপেক্ষ; কাজে কাজেই উহা প্রকৃতিতেই সঙ্গত। বেদান্ত বা উপনিষৎ, পুনরায়, কারণে সর্ব্বজ্ঞত্বও আছে বলিতেছেন উহাও প্রকৃতিতে, ব্রহ্মে নহে। উহা সত্ত্ব-ধর্ম্ম—সত্ত্বের অবস্থা ভেদে যত প্রকার জ্ঞান আছে উহার কারণ বা উপাদান হইতেছে সত্ত্ব। আর যদি ব্রহ্ম বা ঈশ্বর (পাতঞ্জল মতে) মানিতেই হয় তাহা হইলে এই সর্ব্বজ্ঞান এবং শক্তির আধার প্রকৃতিকে লইয়া। পুনরায় ব্রহ্মের জ্ঞান যদি নিত্য হয় তাহা

হইলে খণ্ড জ্ঞান ক্রিয়ার প্রতি ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য কর্তৃত্ব (অহং) থাকে না। আর যদি অনিত্য হয় তাহা হইলে জ্ঞান ক্রিয়ার উপরম কালে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতার উপরম হইবেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া যে খ্যাতি তাহা প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাকে আশ্রয় করিয়া।

আর যাঁহারা সৃষ্টির পূর্ব্বে কারকশূন্য বা সহায়শূন্য অথৈণ্ডক-রস ব্রহ্মের কল্পনা করেন, তাঁহাদের জানা উচিৎ যে জ্ঞান জন্মের প্রতি যে কারণ বা উপকরণ তাঁহার থাকা প্রয়োজন। বিষয় থাকিলে তবে ত তাহার জ্ঞান হইবে।

এক্ষণে যাঁহাদের যথার্থ সত্য লাভ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাঁহারা যাহাতে বিপথগামী না হন সেই হেতু ব্যাস সূত্র রচনা করিলেন—

ঈক্ষাতের্নাশব্দম্॥ ১ অধ্যায়, ১ পাদ, ৫ সূত্র।

সূত্রার্থ—“সাংখ্যপবিকল্পিতমচেতনং প্রধানং ন জগৎকারণমিত্যর্থঃ। যতস্তৎ অশব্দং শব্দাপ্রতিপাদ্যম্। অশব্দত্বাদিতি-যাবৎ। অশব্দত্বে হেতুঃ ঈক্ষতেঃ। যৎ জগৎকারণং তৎ ঈক্ষিতৃ। ঈক্ষণপূর্ব্বকস্রষ্টৃত্বাৎ অচেতনস্যে-ক্ষণাহসম্ভবাৎ অচেতনং প্রধানং ন জগৎকারণমিতি সমুদিতার্থঃ।—অর্থাৎ সাংখ্য কল্পিত প্রধান জগৎ কারণ নহে। কেননা, শ্রুতি অচেতনের জগৎ কর্তৃত্ব বলেন নাই। তৎপ্রতি হেতু এই যে শ্রুতিতে ঈক্ষণপূর্ব্বক অর্থাৎ আলোচনাপূর্ব্বক সৃষ্টি কর্তৃত্ব অভিহিত হইয়াছে। প্রধান জড়, তাহাতে ঈক্ষণ নাই, সুতরাং সৃষ্টি কর্তৃত্বও নাই।” (তত্ত্বজ্ঞানামৃত)

এক্ষণে আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের উপর যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই—

শব্দ প্রমাণ

“সাংখ্য পরিকল্পিত জড়া প্রকৃতি জগৎ কারণ হইতে পারে না এবং উহা উপনিষৎ বা বেদান্তের তাৎপর্য্য নহে। অচেতনের জগৎ কর্তৃত্ব অসম্ভব। কেননা—যিনি জগৎ কারণ তিনি ঈক্ষিতা এইরূপ শ্রুতি আছে। সেই হেতু জড়া প্রকৃতির ঈক্ষিতৃত্ব অশব্দ বা অবৈদিক। যিনি জগৎ কারণ তিনি ইহা ঈক্ষণ পূর্ব্বক—আলোচনা করিয়া বা জ্ঞান পূর্ব্বক সৃষ্টি

করিয়াছেন। সে কিরূপ? শ্রুতি, "সদেব [illegible]দেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছা, উ, ৬, ২, ১), "হে সৌম্য! শ্বেতকেতো! এ জগৎ পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ ছিল এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া, "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত" ইতি (ছা, উ, ৬, ২, ৩), "সেই এক অদ্বিতীয় সৎ ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব অর্থাৎ বিবিধ নামরূপে ব্যক্ত হইব। অনন্তর সেই সৎ আকাশের সৃষ্টি করিলেন, বায়ুর সৃষ্টি করিলেন, তেজের সৃষ্টি করিলেন।" ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় এই শব্দবাচ্য বিবিধ নামরূপ বিশিষ্ট ব্যক্ত জগৎ পূর্ব্বে সৎরূপে ছিল এবং সেই সৎই আলোচনা পূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ তিনিই এতদ্রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। এই ঈক্ষণ-পর শ্রুতি অন্যত্রও আছে, "আত্মা বা ইদমেক, এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিংচনমিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি, স ইমাঁল্লোকানসৃজত" (ঐ, উ, ১, ১, ১), "ইহা অর্থাৎ এই জগৎ, অগ্রে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে বা এতদরূপে ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, কেবল মাত্র এক আত্মা ছিলেন। সেই আত্মা ঈক্ষণ করিলেন, আমি লোক সমূহ সৃজন করিব। অনন্তর তিনি এই সকল লোক সৃজন করিলেন।" শ্রুতি অন্যত্র ষোড়শকল পুরুষ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "স ঈক্ষাং চক্রে। স প্রাণমসৃজত" ইতি (প্রশ্ন, উ, ৬, ৪)। পূর্ব্ব মীমাংসায় যেমন যজতি শব্দ ধাত্বর্থ বোধক এখানে ঈক্ষতি শব্দ সেইরূপ বুঝিতে হইবে। "য সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদে-তদ্‌ ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে" ইতি (মু, উ, ১১, ৯)—এইরূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বোধক জগৎ-কারণ শব্দ ঐ ঐ স্থলের অর্থের নিদর্শন।

অনুমান

পূর্ব্ব-পক্ষ—সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম জ্ঞান, তাহা লইয়া প্রধানই সর্ব্বজ্ঞ। (ঈশ্বর নহে)।

সিদ্ধান্ত পক্ষ—এ কথা অনুপপন্ন বা যুক্তিহীন; কারণ গুণ সাম্যরূপ যে প্রধানের অবস্থা তাহাতে সদৃশ-পরিণাম ভিন্ন বিসদৃশ-পরিণাম না থাকায় জ্ঞান-নামক সত্ত্ব-ধর্ম্ম থাকা অসম্ভব অর্থাৎ গুণত্রয়ের বৈষম্য অবস্থা ছাড়া কোনও গুণের কোন ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—জ্ঞান না থাকে থাকুক কিন্তু জ্ঞান শক্তি ত সুপ্ত থাকিতে পারে এবং সেই শক্তিকে লইয়াই প্রধানকে সর্ব্বজ্ঞ বল না কেন।

সিদ্ধান্ত পক্ষ—তাহাও বলিতে পার না। কারণ বিবেচনা করিয়া দেখ সত্ত্বাশ্রিত যে সর্ব্বজ্ঞান শক্তি লইয়া প্রধানকে সর্ব্বজ্ঞ বলিতেছ, তাহাতে রজস্তমঃ আশ্রিত জ্ঞান-প্রতিবন্ধ শক্তি যাহা (সম ভাবেই) বর্ত্তমান, তাহাকে লইয়া প্রধানকে অল্পজ্ঞও ত বলিতে পারি।

পুনশ্চ, নিরবচ্ছিন্ন সত্ত্ববৃত্তি জ্ঞান শব্দ বাচ্য হইতে পারে না। স-সাক্ষিক সত্ত্ব-বৃত্তিকে অর্থাৎ চৈতন্য প্রতিবিম্বিত সত্ত্ব বৃত্তিকেই জ্ঞান বলা যাইতে পারে। প্রধান যখন অচেতন, জড, তখন তাহার সাক্ষিত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব অসম্ভব। সূর্য্যকে বাদ দিয়া সমুদ্রে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব হইতে পারে না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যোগীরা ত ঈশ্বর নন তবে তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হন কি করিয়া ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাঁহারা চেতন বলিয়া। চেতন বলিয়াই তাঁহাদের সত্ত্বোৎকর্ষ নিমিত্তক সর্ব্বজ্ঞতা জন্মে, সুতরাং তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমরা দিতে পার না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—লৌহ অগ্নি সংযোগে যেমন দাহক হয়, তেমনি চেতন সম্বন্ধ নিমিত্ত প্রধানকে ঈক্ষিতা ও সর্ব্বজ্ঞ বলিতে দোষ কি ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—যাহার জন্য তাহাব ঈক্ষিতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব, তাহাকেই অর্থাৎ সেই সর্ব্বসাক্ষী ব্রহ্মকেই সর্ব্বজ্ঞ ও জগৎ কাবণ বলনা কেন ?

পূর্ব্ব-পক্ষ—ব্রহ্ম নিত্য জ্ঞানস্বরূপ হইলে জ্ঞান ক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য (কর্ত্তৃত্ব) না থাকায় ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা কিরূপে হইবে অর্থাৎ জ্ঞান যদি নিত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার ক্রিয়াও (পরিণাম) নাই ও তাহার বিষয়ও নাই কাজে কাজেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেব কর্ত্তৃত্বও নাই, সেই হেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—যাঁহাব সর্ব্ব প্রকাশক জ্ঞান নিত্য—তিনি যে অসর্ব্বজ্ঞ—এক কথা বিপ্রতিষিদ্ধ। যে জ্ঞান অনিত্য তাহাই কখন কিছু জানিতে পাবে বা কখনও কিছু জানিতে পাবে না, সেই স্থলে সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ হইতে পারে। কিন্তু যাহা নিত্য-জ্ঞান সেখানে ওরূপ দোষ সম্ভব নহে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু নিত্য-জ্ঞান বলিয়া জ্ঞান ক্রিয়া বিশেষে স্বাতন্ত্র্য (কর্ত্তৃত্ব) ব্যবহার উপপন্ন হয় না, তাহার কি হইল?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—সূর্য্য সতত উষ্ণ ও সতত প্রকাশ, অথচ লোকে বলে সূর্য্য দগ্ধ করিতেছেন, সূর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। এতৎ দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রে সতত-প্রকাশ-সূর্য্যের প্রকাশ ক্রিয়া কর্ত্তৃত্বের ন্যায় নিত্য-জ্ঞান ব্রহ্মেরও জ্ঞানক্রিয়া কর্ত্তৃত্ব ব্যপদিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু সূর্য্য প্রকাশ্য বস্তু আছে বলিয়া প্রকাশ করেন, দাহ্য বস্তু আছে বলিয়া দগ্ধ করেন। সেই হেতু তাহাকে প্রকাশক ও দাহক বলা যায়। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের জ্ঞানকর্ম্ম (জ্ঞান ক্রিয়ার কর্ম্ম জ্ঞেয় পদার্থ) না থাকা হেতু সূর্য্য দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় কি করিয়া?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—যখন কর্ম্ম বা প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ অবিবক্ষিত (ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা বর্জ্জিত) থাকে, তখন যেমন "সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন" এতদ্রূপ অকর্ম্মক কর্ত্তৃত্বের ব্যপদেশ (উল্লেখ বা ব্যবহার) করা হয়, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞান-কর্ম্ম (জ্ঞেয়-পদার্থ) না থাকিলেও "তৎ ঐক্ষত" তিনি ঈক্ষণ করিলেন, এরূপ অকর্ম্মক কর্ত্তৃত্ব ব্যপদেশ ত চলিতে পারে। যদিও কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞান ক্রিয়ার বিষয় অপেক্ষিত হইতেছে বা উহ্য থাকিতেছে, তাহা হইলেও ঈক্ষতি শ্রুতির অসঙ্গতি তোমরা দেখাইতে পার না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—সেই কর্ম্ম কি? অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ঈশ্বর-জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে এমন পদার্থ কি?

সিদ্ধান্ত পক্ষ—অনির্ব্বচনীয়ে নামরূপে অব্যাকৃতব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ব্রূমঃ। যৎ প্রসাদাৎ হি যোগিনামপি অতীতানগতবিষয়ং প্রত্যক্ষং জ্ঞানমিচ্ছন্তি যোগশাস্ত্রবিদঃ। সেই বস্তু এই অনির্ব্বচনীয়া, অব্যক্ত, অবিদ্যা, নামরূপাত্মিকা, প্রকাশিত জগতের বীজস্বরূপা মায়া যাঁহার প্রসাদে যোগীরা অতীত অনাগত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন, শাস্ত্রবিদেরা যাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ-জ্ঞান প্রার্থনা করেন। তিনি থাকাতে সেই নিত্য-সিদ্ধ ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার বিষয়ে নিত্যজ্ঞান থাকিবে তাহাতে আর

সন্দেহ কি ? কাজেকাজেই সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের শরীরাদি সম্বন্ধ না থাকায় ঈক্ষণ সম্ভব নহে এ আপত্তি আর উঠিতে পারে না।

শব্দ-প্রমান

সতত প্রকাশ সূর্য্যের সহিত ব্রহ্মের তুলনা কর—তাহা নিত্য—সে জ্ঞানের উৎপত্তি নাই এবং উপকরণের অপেক্ষাও নাই। জীবেরই শরীরাদি নিমিত্তক জ্ঞান হইয়া থাকে, জ্ঞান প্রতিবন্ধক রহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধে সে নিয়ম খাটে না। বেদ দুইটি মন্ত্রে বলিতেছেন ঈশ্বরের জ্ঞান (১) শরীরাদ্যনপেক্ষজ্ঞানতা (২) অনাবরণত্ব বা অপ্রতিহত জ্ঞানতা। "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ" ইতি (শ্বে, উ, ৬, ৮), "তাঁহার কার্য্যও নাই, করণও নাই, তাঁহার সমান নাই, অধিকও নাই, অর্থাৎ তিনি স্বজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদ রহিত। শ্রুতিতে তাঁহার বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট শক্তি এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানক্রিয়ার অস্তিত্ব অভিহিত হইয়াছে।" "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং নচ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্" ইতি (শ্বে, উ, ৩, ১৯) "তাঁহার হস্ত পদ নাই, অথচ তিনি বেগগামী ও গ্রাহক। তাঁহার চক্ষু নাই, তথাপি তিনি দেখেন। তাঁহার কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শুনেন। তিনি বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তু জানেন; কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা নাই। ব্রহ্মজ্ঞগণ তাঁহাকেই মহান ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া জানেন।"

অনুমান

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি ব্রহ্ম ভিন্ন পৃথক্ দ্রষ্টা ও বিজ্ঞাতা নাই তখন ঈশ্বরাতিরিক্ত জ্ঞান-প্রতিবন্ধক-হেতুযুক্ত (স্বল্পজ্ঞ) সংসারী আত্মাই থাকিতে পারে না। সুতরাং সংসারী আত্মার জ্ঞান শরীরাদি সাপেক্ষ, ঈশ্বরের জ্ঞান কোনও কিছুর অপেক্ষা করে না, ইহা কি প্রকারে সিদ্ধ হয় ?

সিদ্ধান্ত পক্ষ—যথার্থই ঈশ্বরের অতিরিক্ত পৃথক কোনও সংসারী নাই। আত্মার যে সংসারীত্ব প্রতীয়মান হইতেছে তাহা উপাধি সম্বন্ধ

বশতঃ। এক অদ্বিতীয়, অখণ্ড, সর্ব্বব্যাপী আকাশের যেরূপ ঘট, মঠ, শরাব, গিরি, গুহা, কমণ্ডলুর সহিত উপাধি সম্বন্ধ লইয়া ঘটাকাশ মঠাকাশ হইয়া থাকে, ব্রহ্মেও উপাধি কল্পনার দ্বারা ঐরূপ উপাধি সম্বন্ধ হেতু আত্মার সংসারীত্ব প্রতীয়মান হয়। ঘটাকাশ, মঠাকাশ কি আকাশ হইতে পৃথক ? মিথ্যা ভেদ-বুদ্ধি হইতে উপাধিকৃত ঘটাকাশাদির সৃষ্টি হয়। সেইরূপ দেহাদিসংঘাতোপাধিসংস্বন্ধাবিবেককৃতেশ্বরসংসারি ভেদমিথ্যাবুদ্ধিঃ, অর্থাৎ দেহাদি সংঘাতরূপ উপাধি সম্বন্ধের দ্বারা অবিবেক প্রযুক্তই ঈশ্বরত্ব ও সংসারীত্ব প্রভৃতি মিথা ভেদ বুদ্ধি হইয়া থাকে। অনাত্ম দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি মিথ্যা-বুদ্ধি হইতে হইয়া থাকে (ইহাই অনির্ব্বচনীয়া মায়া)। সংসারীত্বরূপ রূপ ভেদ যখন দেহাদি উপাধি সম্বন্ধের দ্বারা হইয়াছে, তখন এক আত্মা পারমার্থিকরূপে সত্য হইলেও ব্যবহারিকভাবে বহু জীব ও তাহাদের আপেক্ষিক জ্ঞানও আমরা স্বীকার করিতে পারি। অতএব বলিয়াছিলে যে প্রধান অনেকাত্মক বা সংহত বহুর সমষ্টি, সুতরাং মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্তে তাহারই জগৎকারণতা উপপন্ন, পরন্তু এক অদ্বিতীয় অসহায় ব্রহ্মের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয় না—এ কথা আর বলিতে পার না।

এক্ষণে যদি বল কেবলমাত্র তর্কের দ্বারা ব্রহ্মের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয় কি না তাহাও আমরা ন বিলক্ষণত্বাদস্য (২অ, ১পা, ৪সূ) প্রভৃতি সূত্রে আলোচনা করিব।

পূর্ব্বপক্ষ—ঈক্ষিতৃত্ব শ্রুতি ধরিয়াই তোমরা প্রধানের জগৎকারণত্ব নিষেধ করিতে পার না। ঐ শ্রুতিকে আমরা অন্য অর্থে ব্যবহার করিব। দেখিতে পাওয়া যায় অচেতন পদার্থে চেতনের ন্যায় উপচার বা চেতন পদার্থের ন্যায় সদৃশ ব্যবহার, দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, পতনোন্মুখ নদীকূল দেখিয়া লোকে বলে, 'ঐ উপকূল পড়িবার ইচ্ছা করিতেছে।' সেইরূপ সৃষ্ট্যুন্মুখ অচেতন প্রধানকেও চেতন যোগ্য শব্দ প্রয়োগ (তিনি ঈক্ষণ করিলেন) দ্বারা তাহার কার্য্য প্রকাশ করিতে পারা যায়। এবং সেই হেতু প্রধানের নিয়মপরিপাটি সৃষ্টি কার্য্য অনুসারে তাহাতে চেতন ধর্ম্ম আমরা উপচার করিতে পারি। অর্থাৎ মুখ্য ঈক্ষণ ত্যাগ করিয়া

আমরা গৌণ ঈক্ষণ প্রধানে প্রয়োগ করিতে পারি। শ্রুতিতেও সেই-রূপ গৌণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়—"তত্তেজ ঐক্ষত", (ছা, উ, ৬, ৩, ৪) তা আপ ঐক্ষন্ত (ছা, উ, ৬, ২, ৪) ইতি "সেই তেজ ঈক্ষণ করিলেন, সেই আপ ঈক্ষণ করিলেন"।

এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হওয়ায় ব্যাস সূত্র রচনা করিলেন—

গৌনশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ॥ অ ১, পা ১, সূ ৬

সূত্রার্থ—চেৎ যদ্যর্থে। যদ্যুচ্যতে সৎ—শব্দ বাচ্যমচেতনং প্রধানং, তস্মিন্ ঈক্ষিতৃ-শব্দোগৌণ ইতি, তৎ ন সাধীয় ইতি শেষঃ। কুত? আত্মশব্দাৎ ঈক্ষিতরি আত্মশব্দ শ্রবণাৎ। আত্মবিশেষণোনক্ষিতুরচেতনত্ব-বারণাদিতি ভাবঃ।

—"অচেতন প্রধানই জগৎ কারণ, তবে যে তাঁহাতে ঈক্ষণ কর্তৃস্বরূপ বিশেষণ আছে, তাহা গৌণ অর্থাৎ ঔপচারিক। উপচার ক্রমেই "তিনি ঈক্ষণ করিলেন" ইত্যাদি প্রকার বলা হইয়াছে। এরূপ বলিবার উপায় নাই। কেন না, তাঁহাতে আত্মশব্দ বিশেষণ দেওয়া আছে। আত্মশব্দ থাকাতে অচেতন প্রধানের গৌণ ঈক্ষিতৃত্ব নিবারিত হইয়াছে। অচেতন পদার্থে আত্মশব্দের প্রয়োগ হয় না এবং হইতেও পারে না"—

(তত্ত্বজ্ঞানামৃত)

শব্দ-প্রমাণ

ভাষ্য তাৎপর্য্য—সিদ্ধান্ত-পক্ষ—বাদিগণের এ কথা ঠিক নহে। কেননা শ্রুতির সেই স্থলে আত্মশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছা, উ, ৬, ২, ১) "হে সৌম্য শ্বেতকেতো! অগ্রে ইহা সন্মাত্র ছিল" এই রূপ আরম্ভ করিয়া, "তদৈক্ষত তত্তেজোঽ-সৃজত" "(ছা, উ, ৬, ২, ৩)" সেই সৎ ঈক্ষণ করিলেন এবং সেই সৎ তেজের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু সৎকে ঈক্ষিতা এবং সৃষ্ট তেজ প্রভৃতিকে দেবতা শব্দের দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। 'সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহ-মিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' ইতি (ছা, উ, ৬, ৩, ২,) "সেই দেবতা ইক্ষণ করিলেন, আলোচনা করিলেন যে আমরা তিনই দেবতা এবং এইরূপেই আমরা আপন স্বরূপে

অনুপ্রবেশপূর্ব্বক নাম রূপ ব্যক্ত করিব।" এই হেতু অচেতন প্রধান গুণবৃত্তির ক্রমানুযায়ী বা অলঙ্কারে ইক্ষিতা বলিয়া অভিহিত হইলে কখনই তাহাকে দেবতা, জীব ও আত্মশব্দের দ্বারা বিশেষিত করা হইত না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—জীব কি ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—জীব চেতন, শরীরের অধ্যক্ষ ও প্রাণ সমূহের ধারয়িতা। উহার প্রসিদ্ধি ও নির্ব্বাচনও ঐরূপ।

পূর্ব্ব-পক্ষ—আত্মা কি ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—স্বরূপ। লোকে ও শাস্ত্রে স্বরূপ বা নিজেকেই আত্মা বলিয়া থাকে। সুতরাং জীবকে অচেতন প্রধানের আত্মা বলিতে পার না এবং চেতনকে অচেতনের স্বরূপ বলিতে পার না। আর যদি ব্রহ্মকে ঈক্ষিতৃস্বরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তাঁহাতে মুখ্য ঈক্ষণ কার্য্যের প্রয়োগ ও হইতে পারে এবং দেবতা, জীব এবং আত্মা শব্দের প্রসিদ্ধি ও নির্ব্বাচনও রক্ষা হয়। শ্রুতি বলিতেছেন "স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি (ছা, উ, ৬, ১৪, ৩) "সেই সৎ এই, এ সমস্তই তদাত্মক, হে শ্বেতকেতো! সেই সত্য বা সৎস্বরূপ আত্মা তুমি।" অণু বা সূক্ষ্ম বা দুর্জ্ঞেয় জগৎকারণ সৎকে আত্মা বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। জল ও তেজঃ উভয়ই জড়; সুতরাং ইহাদের ঈক্ষিতৃত্ব গৌন। তবে জড়ে ঈক্ষণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে সদধিষ্ঠান বা চেতনাধিষ্ঠান হেতু। অর্থাৎ ব্রহ্মই আত্মা, জীব এবং দেবতা উপাধি লইয়া ঈক্ষণ করিতেছেন। এবং এইজন্য তেজঃ এবং অপ্‌কে দেবতা বলা হইয়াছে। পর সূত্রে আরও কারণ দেখান হইতেছে—

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ॥ অ ১, পা ১, সূ ৭॥

সূত্রার্থ—আত্মশব্দোঽপি প্রধানে গৌনো ভবিতুমর্হতীত্যাশঙ্ক্য তত্র পূর্ব্ব সূত্রস্থনঞমাকৃষ্য যোজ্যম্। আত্মোশব্দোঽচেতনে প্রধানে ন সম্ভবতীত্যন্বয়ম্। কুতঃ! তন্নিষ্ঠস্য আত্মনিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।—"আত্মনিষ্ঠ বা আত্মজ্ঞ পুরুষের মোক্ষ হইবার উপদেশ থাকায় অচেতন প্রকৃতিতে আত্মশব্দ প্রয়োগ অসম্ভব।" (তত্ত্বজ্ঞানামৃত)

পূর্ব্ব-পক্ষ—অচেতন প্রধানেও আত্মশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে,

যেমন রাজা অন্তরঙ্গ ভৃত্যের প্রতি আত্মশব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, যথা "অমুক মন্ত্রী আমার আত্মা।" ভৃত্য যেমন সন্ধি বিগ্রহাদি কার্য্যের দ্বারা রাজার উপকার করে, সেইরূপ প্রধানও পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ বিতরণ করিয়া উপকার করে। আবার আত্মা শব্দটি চেতন এবং অচেতন উভয়েই প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা প্রভৃতি। এবং দেখা যায় জ্যোতিঃ শব্দটি যজ্ঞ ও অগ্নি উভয় অর্থেই শ্রুতিতে প্রয়োগ আছে। সেইরূপ আত্ম শব্দটিরও চেতন অচেতন উভয় অর্থেই প্রয়োগ আছে। অতএব আত্ম শব্দের দ্বারা ঈক্ষণের মুখ্যতা তুমি কি করিয়া বলিতে পার? গৌণ ঈক্ষণ না হইবে কেন?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—হেতু এই, শ্রুতি "তাহাই আত্মা" এই ভাবে প্রকরণ প্রতিপাদ্য অণু (সূক্ষ্ম, অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়) সতের উপদেশ করিয়া "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সংপৎস্যে" ইতি (ছা, উ, ৬, ১৪, ২), "হে শ্বেতকেতো! সেই আত্মা তুমিই" এইরূপ, মোক্ষ হইতে পারে এমন যে চেতন শ্বেতকেতু, তাহার আত্মনিষ্ঠতা উপদেশ করিয়া "আচার্য্যবান পুরুষই এই তত্ত্ব জানিতে পারে এবং তাহার সেই কাল পর্য্যন্ত বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না তাহার দেহপাত হয়। দেহপাত হইলে সে সৎসম্পন্ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।" অচেতন প্রধান যদি এ স্থলে সৎ শব্দ বাচ্য হয় এবং মুমুক্ষু চেতনকে "তুমি অচেতন" এইরূপ যদি শ্রুতি উপদেশ করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রের শাস্ত্রতা থাকে কি করিয়া?

পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু শাস্ত্র ত যাহা জ্ঞান নয় এরূপ কর্ম্ম করিতে আদেশ করিয়াছেন।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে যাহারা ভোগার্থী, তাহাদের স্বর্গ সাধক অগ্নিহোত্রাদি যাগের সম্বন্ধে, পরন্তু যাহারা মোক্ষার্থী তাহাদিগকে তাহাদের নিকট আত্মার যথার্থ স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু শাস্ত্র আবার যাহা ব্রহ্ম নয় এরূপ পদার্থকে আত্ম-রূপে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু উপাসনার ফলের অনিত্যত্বও

দেখাইয়াছেন। অমুখ্য প্রাণে মুখ্য আত্মার উপদেশ হওয়া—"অহমুক্থম-স্মীতি বিদ্যাৎ" ইতি (ঐতেরেয় আরণ্যক ২, ১, ২, ৬), "আমি উক্থ" বা প্রাণ রূপ যে বিজ্ঞান তাহা অধ্যাস দুষ্ট হওয়ায় তাহার ফল অনিত্য, উহাতে তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তি হয় না। সুতরাং মোক্ষেচ্ছুর নিকট উহা নিরর্থক। অতএব মুমুক্ষুর নিকট উপদেশে অণিমা সৎ বস্তুকে গৌণ অর্থে প্রয়োগ করিলে হইবে না।

ভৃত্যে আত্মশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে, কিন্তু উপচার বা অলঙ্কার বাদ দিলে স্বামীর ও ভৃত্যের ভিন্নতা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। লৌকিক ব্যবহারে শব্দের গৌণ অর্থ প্রয়োগ হয় সত্য কিন্তু সর্ব্বদাই শব্দের 'শক্তিকে' ত্যাগ করিয়া 'লক্ষণা' করা যাইতে পারে না।

আর জ্যোতিঃ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ তাহাও অসঙ্গত। কারণ একটি শব্দ একই সময়ে বহু অর্থের বোধক হয় না। সেই হেতু চেতন বিষয়েই আত্ম শব্দের মুখ্য প্রয়োগ এবং ইন্দ্রিয়, ভূত বিষয়ে গৌণ প্রয়োগই ধরা উচিৎ। উভয়ার্থক যে সকল শব্দ আছে তাহার কোন একটিকে নিশ্চয় রূপে গ্রহণ না করিলে একতর বৃত্তিতা (নির্দ্দিষ্ট অর্থ বোধকতা) হয় না। প্রস্তাবিত প্রকরণে আত্ম শব্দটিকে অচেতন বলিয়া ধরা হইবে এমন কোও কারণ নাই। পরন্তু চেতন শ্বেতকেতুকেই যখন আত্মা বলা হইতেছে তখন আত্মা অর্থে অচেতন গ্রহণ করা উচিত নয়। তাহা হইলে অর্থ করিতে হয়, হে চেতন শ্বেতকেতো! তুমিই সেই অচেতন। প্রধান যে সৎ শব্দের বাচ্য নহে তাহার আরও হেতু আছে—

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ অ ১, পা ১, সূ ৮ ॥

সূত্রার্থ—হেয়ত্বস্য ত্যাজ্যতায়া অবচনাৎ অনভিধানাৎ চ অপি প্রধানাং ন সৎ-শব্দ বাচ্যম। ইত্যক্ষরার্থঃ। "ত্যাগোপদেশ না থাকাতে প্রধান সৎশব্দ বাচ্য নহে। (তত্ত্বজ্ঞানামৃত) সিদ্ধান্ত পক্ষ—অনাত্মা প্রধান যদি উপনিষদের সৎ শব্দের গৌণ অর্থ হইত এবং "তত্ত্বমসি" বাক্যের দ্বারা যদি প্রধানকেই শ্বেতকেতুর আত্মা বলিয়া লক্ষণা করা হইত তাহা হইলে শ্বেতকেতু ঐ উপদেশ শ্রবণে অনাত্মজ্ঞই হইয়াই থাকিতেন।

পূর্ব্বপক্ষ—যেমন বধূকে অরুন্ধতী দেখাইবার মানসে তাহার নিকটস্থ

বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী বলিয়া দেখাইয়া পরে তাহা অরুন্ধতী নহে বলিয়া উহা প্রত্যাখান করিয়া তাহার পার্শ্বস্থিত প্রকৃত অরুন্ধতীকে দেখান হয়, সেইরূপ শ্রুতি ঐরূপে মুখ্য আত্মার উপদেশ একেবারে না করিয়া গৌণ ভাবে তাহারই উপদেশ করিয়াছেন, এরূপ ত বলিতে পারি।

সিদ্ধান্ত পক্ষ—ছান্দোগ্য শ্রুতির ষষ্ঠ প্রপাঠকে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই সৎ স্বরূপ মুখ্য আত্মায় তাৎপর্য্য দেখা যায়। অতএব গৌণ-অর্থ স্বীকার করিয়া তাহার পর দ্বিতীয়বার মুখ্য উপদেশ স্বীকার করা সঙ্গত নহে। সূত্রস্থ চ শব্দ প্রতিজ্ঞা বিরোধ রূপ হেত্বন্তরের উদ্ভাবক বা নিবারক। হেয়ত্ব বা ত্যাজ্যত্ব বচন না থাকায় অর্থাৎ প্রথমে গৌণ অর্থ করিয়া পরে মুখ্য অর্থের জন্য উহা ত্যাগ করিবে এরূপ উপদেশ না থাকায় ঐ উপদেশ মুখ্যরূপেই লইতে হইবে। "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি. যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ইতি (ছা, উ, ৬, ১, ৩) শ্বেতকেতু গুরুকুলে বাস সমাপনান্তর গৃহে আগমন করিলে, পিতা আরুণি, তাহাকে অত্যন্ত দাম্ভিক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কি গুরুকে সেই বস্তু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যে বস্তু শুনিলে সমস্ত শুনা হয়, যাহা জানিলে সমস্ত জানা হয়, মনন করিলে সমস্ত মনন করা হয়?" শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান সে কিরূপ আদেশ"? পিতা উত্তর করিলেন, "হে সৌম্য! যেমন এক মৃৎপিণ্ডের দ্বারা সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ জানা হয় সেইরূপ। বিকার বা পরিণামী পদার্থ বাচারম্ভণ অর্থাৎ বাক্য বোধ্য নামরূপ মাত্র, সুতরাং মিথ্যা, মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য।" "এবং সোম্য স আদেশো ভবতি" "হে সৌম্য! সে আদেশ এইরূপ"। হেয় রূপে বা অহেয় রূপে প্রধানের (মৃত্তিকার) জ্ঞান হইলে কি ভোক্তৃ সমূহেরও (সাংখ্যের বহু আত্মার) কি জ্ঞান হয়? তোমাদের মতে আর একটি জ্ঞান হওয়ার প্রয়োজন উহা পুরুষের। কেননা ভোক্তা যে পুরুষ তাহা প্রধানের বিকার বা কার্য্য নহে। উহা প্রধান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সেই হেতু

"মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য" এখানে 'মৃত্তিকার' স্থলে 'প্রধান'কে বসাইতে পারিবে না।

অনুমান।

শ্রুতি ঐ মন্ত্রে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অর্থাৎ একটি মাত্র জগৎ কারণ আছে যাহাকে জানিলে সকল জানা হয়। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় যদি কারণই একমাত্র সত্য হয় এবং কার্য্য মাত্রেই অসত্য হয়। কারণ শ্রুতি বিকারের মিথ্যাত্ব উপদেশ করিয়া কারণেরই সত্যতা নিরূপণ করিয়াছেন। এই হেতু আমরা বলিতে বাধ্য কারণ—নির্ব্বিকার, কার্য্য—বিকার পদার্থ। তোমাদের প্রধান নির্ব্বিকার নহে, সবিকার এবং যখন সবিকার তখন শ্রুতির মতে তুচ্ছ। সেই হেতু বলিতে হয় জগৎ-কারণ প্রকৃতি-পুরুষ নহে, উহা এক এবং উহা ব্রহ্ম।

ক্রমশঃ

—বাসুদেবানন্দ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও সার্ব্বভৌমিক বেদান্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কোন কর্ম্ম বা উহার অবশ্যম্ভাবী ফলের সঙ্গে আত্মার কোনও সম্বন্ধ নাই, আত্মা সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত। আত্মার প্রভাবোৎপন্ন মায়ারূপী মনই পঞ্চেন্দ্রিয় সংযোগে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলভোগ করে। মন জড়পদার্থ, কারণ ইহা অনিত্য এবং পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু তথাপি দেহ ধ্বংসে মন বিলোপ হয় না; দেহত্যাগে মনোবৃত্তিগুলি সঙ্কুচিত হইয়া সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে।

যেরূপ উদ্ভিদাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকার মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইলেও উহার সত্তা মৃত্তিকাভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিয়া অপর পদার্থে পরিণত হয়,—যেরূপ বৃক্ষের বিনাশ হইলেও উহার বীজ নূতন বৃক্ষের কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও মনের মধ্যে মনোবৃত্তি বা কর্ম্মফলরূপ সত্তা অবস্থিত থাকিয়া মনের অনুরূপ নবদেহ পরিগ্রহ করে। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আহাব ও চিন্তা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কর্ম্মের মনই কর্ত্তা,—মনই ভোক্তা,—মনই কর্ম্ম সঞ্চয়কারী এবং মনই কর্ম্মফলগ্রাহী। কর্ম্ম মাত্রেরই একটা ফল আছে, যদি কর্ম্মফল না থাকিত তাহা হইলে স্মৃতি, জ্ঞানার্জ্জন ও পুস্তক পাঠ প্রভৃতি অসম্ভব হইত। কর্ম্মের ফল তোমার মধ্যে সূক্ষ্মাকারে বর্ত্তমান না থাকিলে গৃহের জানালা দুয়ার অর্গলবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিলেও তোমার মানস-পটে বহির্জ্জগতের দৃশ্যা-বলী আত্মপ্রকাশ করে কেমন করিয়া ?

বেদান্ত বলেন—"তুমি বর্ত্তমানে যাহা, তাহা তোমার অতীতকালের মনোবৃত্তির ফল এবং তোমার বর্ত্তমানকালের কর্ম্মশীল মন তোমার অলক্ষ্যে তোমার ভবিষ্যৎ গঠন করিতেছে। কর্ম্মফলের উপর জগতের কোনও শক্তির কর্ত্তৃত্ব নাই। কর্ম্মানুসারে ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী।*

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥"

—কঠোপনিষৎ।

পুনর্জ্জন্ম বা কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে হিন্দু ধর্ম্মের প্রত্যেক সম্প্রদায়, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মধ্যে সুফীগণ একমত। তথাকথিত নব্যখৃষ্টানগণ কর্ত্তৃক পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকৃত না হইলেও ভগবান যিশুখৃষ্টের জীবনীতে এবং বাইবেল গ্রন্থে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্যসভ্যতার অগ্রদূত প্রাচীন গ্রীকগণ পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন। বাইবেল গ্রন্থে আছে,—

"Jesus said unto them, verily verily I say unto you, before Abraham was I am"—(John. 9.—58). পুনশ্চ,—"And fear not them which kill the body but are not able to kill the soul." —(St. Mathew. 10—28.)

দার্শনিক সক্রেটিশ, প্লেটো, শোপেন্‌হাওয়ার পিথাগোরাস্, মোক্ষমূলর ও পল্‌ডুসেন্ (Paul Deussen) প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রবরগণ পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন। খৃষ্টধর্ম্মবাদী জার্ম্মান Mystic Suso বলিয়াছেন—

"Be sure thou will have to ensure many deaths before thou can't put thy nature under yoke,"

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে এক নির্দ্ধারিত বিচারের দিন (Judgement day) ভগবান স্বর্গরাজ্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচারকের ন্যায়—(As the Dispenser of heaven) মানবগণের পাপপুণ্যানুসারে পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার বিধান করিবেন। বিচার জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবান যদি পাপীকে ক্ষমা করিতেই না পারিলেন, তাহা হইলে "দয়াময়", "প্রেমময়" ও "ত্রাণকর্ত্তা প্রভৃতি বিশেষণ তাঁহার প্রতি আরোপ করা চলে না। অধিকন্তু জন্মান্ধ ও জন্ম দুঃখী ও চিররুগ্ন প্রভৃতি বিবিধ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিগণের অস্তিত্ব দ্বারা তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হয়। পরন্তু ভগবান পাপীকে ক্ষমা না করিয়া তাঁহার শাস্তি বিধান করেন, খৃষ্টানধর্ম্মের এই মতবাদ দ্বারাও স্বতঃ প্রমাণিত হয় যে ভগবান "দয়াময়" ও "প্রেমময়" হইলেও কর্ম্মফলই তাঁহার নিকট মানুষের পাপ-পুণ্য নির্ণয়ের মানদণ্ড। পক্ষান্তরে খৃষ্টানধর্ম্মের "বিচারবাদ" (Doctrine of justice) অপেক্ষা এই "কর্ম্মবাদ" ধর্ম্ম, নীতি, পবিত্রতা, বিশ্বপ্রেম ও পরার্থপরতা প্রভৃতি সমস্যার উৎকৃষ্ট সমাধান কারক। কর্ম্মবাদী ভাবের ঘরে চুরি করিয়া —অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করতঃ সাধু সাজিতে দ্বিধা বোধ করে। সে পৃথিবীর শেষ দিনের বিচারে বিশ্বাসী নহে, কারণ সে জানে যে তৎকৃত কর্ম্মের ফল তাহাকে জন্মজন্মান্তরে ভুগিতে হইবেই, কর্ম্মফল তাহাকে বারংবার জন্ম মৃত্যুর অধীন করিয়া সুখ দুঃখ প্রদান করিবেই। কর্ম্মই জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা,—কর্ম্মই জীবের জীবন,—কর্ম্মই ফলদাতা এবং কর্ম্মই ফলগ্রহীতা। গুটিপোকা যেমন স্বনির্ম্মিত আবরণে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া পরে আপনিই আপনার আবরণ ভেদ করিয়া সুন্দর প্রজাপতিরূপে বাহির হইয়া পড়ে, মানবও তেমনি স্বকৃত কর্ম্মাবরণে

আপনাকে আপনি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে,—এই স্বেচ্ছকৃত কর্ম্মাবরণ ভেদ করিতে পারিলে সেও এক অদ্বৈত নিত্যমুক্ত চৈতন্য ব্রহ্মরূপে বাহির হইয়া পড়িবে।

প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেমন "ইহ বাহ্য আগে কহ আর" বলিয়া ভক্ত চূড়ামণি রায় রামানন্দকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া অবশেষে তিনিই তাঁহার নিকট প্রেমধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ জগতের প্রধান প্রধান বহুল-প্রচারিত ধর্ম্মের বাহ্য বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিয়া উহাদের প্রত্যেকটির চরম সিদ্ধান্ত অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বেদান্তের অদ্বৈতভাবই সকল ধর্ম্মের একৈক চরম লক্ষ্য। বৈদান্তিক "নেতি" "নেতি" বিচার করিয়া বাহ্য বিষয় হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করতঃ আত্মসংস্থ হইয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি"—"সোঽহং" বা "তত্ত্বমসি" জ্ঞান-ভূমিতে আরোহণ করিয়া বলেন,—

> "অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
> বিভুত্বাচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
> ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়
> শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

বেদান্তের লক্ষ্য চৈতন্যরূপী এক অখণ্ড নিত্য শাশ্বত নিরঞ্জন সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সঙ্গে আপনাকে সম্পূর্ণ অভেদ রূপে সন্দর্শন করা; সকল ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য এক,—একই সিদ্ধান্তে সমন্বিত। প্রকৃত বৈদান্তিক বলেন,—"জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, আরাধনা, ধ্যান ও ধারণা প্রভৃতির যে কোন একটি বা একাধিক বা সমগ্র উপায়গুলি দ্বারা যে কোন প্রতীকের সাহায্যে অথবা কোন প্রতীক-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া আপনার বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" চৈতন্যরূপী বাক্য মনের অতীত পরম ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া এক করিয়া ফেল। কোনও ধর্ম্মের বাহ্য কোন বিষয়ের সঙ্গে বেদান্তের কোন বিরোধ নাই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, ব্যাস, পতঞ্জলি, বশিষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্কর প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া যুগাচার্য্য শ্রীচৈতন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণ

ধর্ম্মের গৌণ বিষয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াও ইঁহারা সকলেই বেদান্ত-ধর্ম্মের স্বনাম প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা ও উদ্যমশীল প্রচারক বলিয়া জগৎবিখ্যাত। বেদ, সংহিতা, দর্শন, গীতা, ভাগবত, যোগশাস্ত্র, পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি ভিন্ন পথে বেদান্তের অদ্বৈত জ্ঞানরূপ সর্ব্বধর্ম্মের চরমলক্ষ্যেই উপনীত হইয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম ও বেদান্ত সমার্থবাচক বলিলেও দোষ হয় না, বরং উহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব আরও সুব্যক্ত হয়। পূজ্যপাদ স্বামিজী "হিন্দু" শব্দ ব্যবহার না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে "বৈদান্তিক" শব্দ ব্যবহারের অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "অদ্বৈত বেদান্ত শেষের কথা, সব মতের সব পথের সেখানেই চরমগতি।" তাঁহার সাধক-জীবন আলোচনা করিলেও আমরা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। তিনি গোপীভাবে সাধনায় সিদ্ধ হইবার পরই মহাত্মা তোতাপুরীর নিকট ভাব সাধনার চরম পরিণতি স্বরূপ অদ্বৈত সাধনা গ্রহণ করেন। দ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যে ক্রম পরিণতিতে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদে পর্য্যবসিত হয় তাহা নিম্নোদ্ধৃত স্বামিজীর বাক্যে স্পষ্টীকৃত হইবে,—"উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়া যে সকল বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাত্র একটি মতের উপর "বেদান্ত" শব্দটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অন্যায়; বেদান্ত শব্দে প্রকৃতপক্ষে এই সকল মত গুলিকেই বুঝায়, অদ্বৈতবাদীর যেরূপ বেদান্তী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার, রামানুজীর ও তদ্রূপ। আর আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে উহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহে, আমাদের ষড়দর্শন যেমন মহান্‌তত্ত্ব সমূহের মহান্ ক্রমবিকাশ মাত্র;—আরম্ভ অতি মৃদুধ্বনিতে, শেষে অদ্বৈতের বজ্রনির্ঘোষে পরিসমাপ্তি, এরূপে পূর্ব্বোক্ত তিনটি মতেও আমরা দেখিতে পাই। মনুষ্যমন উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, অবশেষে সমুদায়ই অদ্বৈত বাদের সেই অদ্ভুত একত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে।" (ক্রমশঃ)

—ধ্যান চৈতন্য।

সাংখ্য-দর্শন।

২৮

শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।

বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্ ॥

পদপাঠ। শব্দাদিষু পঞ্চনাম আলোচন মাত্রম্ ইষ্যতে বৃত্তিঃ।

বচন আদান বিহরণ উৎসর্গ আনন্দাঃ চ পঞ্চানাম ॥

অন্বয়—শব্দাদিষু পঞ্চানাম্ বৃত্তিঃ আলোচনমাত্রম ইষ্যতে।

বচনাদান বিহরণ উৎসর্গানন্দাঃ চ পঞ্চনাম্ (কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাম বৃত্তিঃ)

শব্দাদিষু=শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে; পঞ্চানাম্=৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের; বৃত্তিঃ=ব্যাপার। বৃত্তিকে কি বলা যায়—আলোচণ মাত্রম।

ইষ্যতে (কর্ম্মবাচ্য ইষ্) এই ক্রিয়ার কর্ত্তা "সাংখ্যজ্ঞানীদ্বারা" উহ্য। অভিপ্রেত—ইহাই পণ্ডিতদের অভিপ্রেত।

চক্ষুর বিষয় রূপ, কর্ণের বিষয় শব্দ, নাসিকার বিষয় গন্ধ, জিহ্বার বিষয় রস এবং ত্বকের বিষয় স্পর্শ। ঐ ঐ বিষয়ের সহিত সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে যে বৃত্তি হয় তাহা নাম আলোচন।

শ্রোত্র—কর্ণের বৃত্তিঃ শব্দ আলোচন মাত্র, চক্ষুর রূপ আলোচন মাত্র, ত্বকের স্পর্শ আলোচন মাত্র, জিহ্বার রস আলোচন মাত্র, এবং নাসিকার ঘ্রাণ আলোচন মাত্র।

আলোচন=বিশেষ পরিচয় শূন্য সামান্য জ্ঞান মাত্র। চক্ষু কিছু দর্শন করে, কিন্তু তাহা কিরূপ এবং কিমাকার তাহা অবধারণ করিতে পারে না। অতি ক্ষুদ্র শিশুর চোখের সম্মুখে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলে দেখা যায় যে শিশুর চোখে অঙ্গুলির ছায়া পড়িয়াছে অথচ তাহার চোখের পলক পড়িতেছে না। এইরূপ অবস্থায় বয়স্কেরা সন্ত্রস্ত হইত এবং তাহাদের চোখে ঘন ঘন পলক পড়া দেখা যাইত। শিশুর (দৃষ্টান্ত স্থলে) যে জ্ঞান, তাহা বয়স্কের জ্ঞান হইতে বিভিন্ন। আলোচন

পূর্ব্ববর্ণিত শিশুর জ্ঞানের অনুরূপ। আলোচনের অর্থ প্রায় মুগ্ধ জ্ঞান, নির্ব্বিকল্প বোধ।

অর্থ—শব্দাদির আলোচনই শ্রোত্রাদি ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। বচন বা স্পন্দন কর্ম্মেন্দ্রিয় বাকের, আহরণ হস্তের, বিহরণ পদের, ত্যাগ পায়ুর এবং আনন্দ উপস্থের বৃত্তি।

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা।
সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥

পদপাঠ—স্বালক্ষণ্যংবৃত্তিঃ ত্রয়স্য সা এষা ভবতি অসামান্যা।
সামান্য করণ বৃত্তিঃ প্রাণ আদ্যাঃ বায়বঃ পঞ্চ ॥

অন্বয়—ত্রয়স্য স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিঃ, সা এষা অসামান্যা ভবতি,
প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ সামান্যকরণ বৃত্তিঃ।

ত্রয়স্য = তিনের ; বুদ্ধির, অহংকারের এবং মনের, এই তিনের।

স্বালক্ষণ্যং। স্ব = স্বকীয় ; লক্ষণ (লক্ষ = দর্শন করা) দর্শন, রূপ, চিহ্ন। স্ব, স্বকীয়, যাহা আর কাহারও নাই ; স্বলক্ষণের ভাব স্বালক্ষণ্য। ইতি পূর্ব্বে ২৩, ২৪ এবং ২৭ কারিকায় বুদ্ধি, অহংকার এবং মনের যে স্ব স্ব লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে তাহাই স্বালক্ষণ্য। বুদ্ধির স্বালক্ষণ্য হইতেছে অধ্যবসায়, অহংকারের অভিমান এবং মনের সঙ্কল্প। স্বালক্ষণ্য ঐ তিনের কি? উত্তর—বৃত্তি, ব্যবসায়, ব্যাপার। কিরূপ বৃত্তি? সা এষা অসামান্যা ভবতি—সেই ইহা অসামান্যা হয়। এতদ্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার ১ বচনে এষা। সেই অধ্যবসায়, অহংকার এবং সঙ্কল্প, বুদ্ধি অহংকার এবং মনের স্বীয় স্বীয় অসামান্য বৃত্তি।

-দশরথ রামের ভরতের এবং লক্ষণের পিতা, কিন্তু রামের জননী কৌশল্যা, ভরতের জননী কৈকয়ী এবং লক্ষণের জননী সুমিত্রা। সুমিত্রা-নন্দন লক্ষণের স্বলক্ষণ। সুমিত্রা নন্দন রামও নহেন ভরতও নহেন, কেবল মাত্র লক্ষণই সুমিত্রা নন্দন। কিন্তু দশরথ নন্দন রাম লক্ষণ এবং ভরত তিন জনেই। দশরথ, রাম লক্ষণ ভরতের সামান্য পিতা, কিন্তু কৌশল্যা রামের অসামান্যা জননী, কৈকেয়ী ভরতের অসামান্যা জননী, সুমিত্রা

রাম ও ভরতের তুলনায় লক্ষণের অসামান্যা জননী, কিন্তু শত্রুঘ্নের তুলনায় সামান্যা জননী।

বুদ্ধি, অহংকার ও মনের দ্বিবিধ বৃত্তি আছে। প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় অসামান্যা বৃত্তি এবং সকলের সামান্যা বৃত্তি। অসামান্যা বৃত্তির কথা বলা হইল। সামান্যা বৃত্তির কথা বলা হইতেছে।

সামান্য করণ বৃত্তি—করণ সকলের সামান্য বা সাধারণ বৃত্তি। অন্তঃকরণের সামান্য বৃত্তি। কি তাহারা? প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চবায়বঃ, প্রাণ প্রমুখ পঞ্চ বায়ুগণ। বায়ু অর্থ বাতাস নহে, উহা শক্তি বিশেষ। প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান এই পঞ্চ বায়ু। বায়ু শব্দের বহুবচনে বায়বঃ। যে শক্তির দ্বারা দেহ বিধৃত হয় তাহার নাম প্রাণ। বিধারণ শব্দের অর্থ নির্ম্মাণ, বর্দ্ধন ও পোষণ। প্রাণের বিধারণ শক্তি ৫ ভাগে বিভক্ত। প্রাণবায়ু যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানকে বিধারণ করে। রক্ত, রস, মাংস, মেদ, মজ্জা, শুক্র, উদান বায়ুর দ্বারা বিধৃত হয়। মাংসপেশী, শিরা, ধমনী প্রভৃতি ব্যান বায়ু দ্বারা বিধৃত হয়। অপান বায়ু দ্বারা মল অপনীত হয়, এবং সমান বায়ু দ্বারা বাহ্য বস্তুকে রস রক্তাদিতে পরিণত করা হয়।

অর্থ :—অধ্যাবসায় বুদ্ধির, অভিমান অহংকারের এবং সঙ্কল্প মনের অসামান্য স্বকীয় বৃত্তি। প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান এবং সমান এই পঞ্চ শক্তি ত্রি-অঙ্গ বিশিষ্ট অন্তঃকরণের অর্থাৎ বুদ্ধি অহংকার এবং মনের সামান্য বা সাধারণ বৃত্তিঃ।

৩০

যুগপৎ চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ॥

পদপাঠ—যুগপৎ চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ, ক্রমশঃ চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।
দৃষ্টে তথাপি অদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎ পূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ॥

অন্বয়ঃ—তস্য চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ যুগপৎ ক্রমশঃ চ নির্দ্দিষ্টা,
তথা অপি অদৃষ্টে, ত্রয়স্য তৎ পূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ।

জ্ঞান ইন্দ্রিয় মনের সাহায্য ব্যতীত স্ব স্ব কার্য্য করিতে পারে না।

কি কর্ম্মেন্দ্রিয় কি জ্ঞানেন্দ্রিয় মন ব্যতীত কার্য্য করিলে সেই কার্য্য নিষ্ফল হয়। তস্য চতুষ্টয়স্য = সেই চারিটির, অর্থাৎ তিন অন্তঃকরণ এবং ১ বাহ্য করণের। তু = পাদপূরণে "চ বৈ তু হি"

বৃত্তিঃ—(কর্ত্তৃকারক, কর্ম্মবাচ্যের) সেই চারি করণের বৃত্তি। বৃত্তির কি হইয়াছে? নির্দ্দিষ্টা, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? যুগপৎ ক্রমশঃ চ, যুগপৎ এবং ক্রমশঃ বলিয়া। কি সম্বন্ধে? দৃষ্টে বা প্রত্যক্ষ বিষয়ে। যুগপৎ = এককালে, ক্রমশঃ = পরপর। তিন অন্তঃকরণ এবং উহার সহিত কোন এক বাহ্যকরণ এই চতুষ্করণের বৃত্তি বিদ্যমান বিষয়ে কখনও বা এককালে কখনও বা পরপর আবির্ভূত হয়।

বাচস্পতিমিশ্র যুগপৎ এবং ক্রমশঃ বৃত্তির উদাহরণ নিম্নলিখিত ভাবে দেখাইয়াছেন। যুগপৎ—অন্ধকার নিশীথে বিদ্যুৎ আলোকে কেহ ব্যাঘ্রকে অতি সন্নিহিত দেখিল, এবং দেখিল যে ব্যাঘ্র তাহার দিকে মুখ করিয়া আছে। তৎক্ষণাৎ তাহার আলোচন (ইন্দ্রিয় বৃত্তি) সঙ্কল্প (মনবৃত্তি) অভিমান (অহংকারের বৃত্তি) এবং অধ্যবসায় (বুদ্ধিবৃত্তি) আবির্ভূত হইল, অর্থাৎ ব্যাঘ্র তাহার চক্ষু গোচর হইবামাত্রই সে 'চম্পট' দিল। ইহা হইল যুগপৎ বৃত্তির দৃষ্টান্ত।

ক্রমশঃ—অস্পষ্টালোকে দূরে কেহ দেখিল কি একটা বস্তু আছে (আলোচন)। তারপর বুঝিল সেই বস্তুটি তীরধনুকধারী চোর (সঙ্কল্প) তাহার দিকে আসিতেছে (অভিমান)। তখন সে সেই স্থান হইতে সরিয়া পড়ি স্থির করিল (অধ্যবসায়) এবং তথা হইতে অপসৃত হইল। ইহা হইল ক্রমশঃ বৃত্তির দৃষ্টান্ত।

পরোক্ষ বিষয়ে বাহ্যেন্দ্রিয় আবশ্যক হয় না। কেবল মাত্র অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা পরোক্ষ বিষয়ের ব্যবহার হয়। অতীত এবং অনাগত বিষয়ে অন্তঃ-করণ বৃত্তির যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। যে বস্তু সমীপে নাই চক্ষু কিংবা পাণি কেহই তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না কিন্তু অন্তঃকরণ তাহা পারে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে বস্তুকে পরোক্ষে ব্যবহার করা যায় না।

তথা অপি অদৃষ্টে—যথা দৃষ্টে তথা অপি অদৃষ্টে, যেমন প্রত্যক্ষ বিষয়ে বৃত্তি কখন যুগপৎ কখন ক্রমশঃ, সেইরূপ অদৃষ্ট বিষয় বা পরোক্ষ বিষয়েও

বৃত্তি কখন যুগপৎ, কখন ক্রমশঃ। কিন্তু পরোক্ষ বিষয়ের এক বাধা আছে। সে কি? ত্রয়স্তু তৎপূর্ব্বিকাবৃত্তিঃ—তৎ, সেই, দৃষ্ট ; তৎপূর্ব্বিকা =‘তৎ’, যাহার পূর্ব্ব (আদি বা মূল) তৎপূর্ব্বিক = প্রত্যক্ষ মূলক। অদৃষ্টে অর্থাৎ পরোক্ষ বিষয়ে, তিন অন্তঃকরণের যে বৃত্তি তাহা তৎপূর্ব্বিকা। পরোক্ষ বিষয়ে যে বৃত্তি তাহার আদিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আবশ্যক। পরোক্ষ অনুমানের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, অনুমান প্রত্যক্ষ মূলক। ধূম দেখিয়া পরোক্ষ অগ্নি যে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই তাহার কারণ প্রথমে আমি ধূম ও অগ্নির ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। যাহা যুগপৎ বলি প্রকৃত পক্ষে তাহা ক্রমশঃ। একশত পদ্মপত্রের বৃত্তাকার স্তূপ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা নিমেষে দুইটি অর্দ্ধবৃত্তাকার স্তূপে পরিণত হইল। আপাততঃ মনে হয় এক সঙ্গে এক কালে শত পত্র ভেদ হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক একটি পত্র ক্রমে ক্রমে ভেদ হইয়াছে। অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধার এবং তীব্র গতির জন্য বোধ হয় যেন শত পত্র ভেদ যুগপৎ ঘটিয়াছে। শতদল পত্র ভেদ ইহাই।

অর্থ—প্রত্যক্ষ বিষয়ে চতুষ্টয় করণের বৃত্তি লক্ষিত হয়, যথা তিন অন্তঃকরণ এবং এক বাহ্যকরণ। পরোক্ষ বিষয়ে কেবলমাত্র তিন অন্তঃকরণের বৃত্তি লক্ষিত হয়। কি প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ উভয় স্থলেই হয় বৃত্তির যুগপৎ আবির্ভাব কিংবা ক্রমশঃ আবির্ভাব হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে তবে উহাকে অবলম্বন পূর্ব্বক পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে।

(ক্রমশঃ)

—ওমর

সঙ্গীত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক্ষণে রাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। প্রতি রাগের চারিটি করিয়া অঙ্গ আছে, (১) রাগাঙ্গ (২) ভাষাঙ্গ (৩) ক্রিয়াঙ্গ ও (৪) উপাঙ্গ।

(১) রাগের ছায়ামাত্র অনুসরণের নাম রাগাঙ্গ।

(২) ভাষার ছায়ামাত্র আশ্রয় করার নাম ভাষাঙ্গ।

(৩) রাগাদির গান করণোৎসাহকে ক্রিয়াঙ্গ বলা হয়।

(৪) এই সকলের কিঞ্চিৎ মাত্র ছায়া অনুকরণের নাম উপাঙ্গ।

(সং, দ, ২৯৩)

গায়ক কাণ্ডারলা (অর্থাৎ তার বা উচ্চ স্বরোচ্চারণে তীব্রতা, বিবিধ গমকে কুশলতা) সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। (সং দ, ৪)

মতঙ্গ মতে সমুদয় রাগ তিন ভাগে বিভক্ত শুদ্ধ, ছায়ালাগ ও সংকীর্ণ এবং ইহার প্রত্যেকে আবার ঔড়ব, ষড়ব এবং সম্পূর্ণ। (সং, দ, ৫, ৬)

এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। উক্ত প্রত্যেক জাতি আলাপের সময় সমগ্র রাগ বা রাগিনী চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, (১) অস্থায়ী, (২) আভোগ, (৩) অন্তরা (৪) সঞ্চারী। গানের যে স্থানে রাগ উপবেশন করে তাহা অস্থায়ী। গানের শেষভাগ যেখানে গীত শেষ হয় তাহাকে আভোগ বলে। উক্ত তিনের মিশ্রিত যে সুর তাহাকে সঞ্চারী বলে। (সং দ,)

(১) আলাপের প্রথম অংশ অস্থায়ী, ভাষায় যাহাকে মহাড়া বা ধুয়া বলে। ইহার আরম্ভের কোনও সুর নির্দ্দেশ নাই। কিন্তু সাধারণতঃ রাগের উত্থান দেখাইবার জন্য মুদারা (মধ্য) সপ্তকের সা হইতেই আরম্ভ হয় এবং মুদারাতেই ক্রীড়া করে। রাগের রূপ অধিকাংশ এই

অস্থায়ীতেই প্রকাশ পায়, বাকি রূপ অন্তরা প্রভৃতিতে দেখাইয়া রাগকে মূর্ত্ত করা হয়।

(২) আলাপের দ্বিতীয় অংশ অন্তরা। ইহার একটি সাধারণ লক্ষণ—মুদারা সপ্তকের মধ্যস্থল (মা, পা) ইহাতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে তারা (চড়া) সপ্তকের দিকে আরোহণ করে। এবং ধীরে অবরোহণ করিয়া আস্থায়ীর সাতে সমাপ্ত হয়।

(৩) তৃতীয় অংশের নাম সঞ্চারী। ইহা সাধারণতঃ মুদারা সপ্তকের উচ্চ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে উদারা (খাদ) সপ্তকের দিকে অবরোহণ করিয়া পুনরায় মুদারায় আরোহণ করে।

(৪) চতুর্থ অংশ আভোগ। ইহা অন্তরারই প্রায় অনুরূপ। অন্তরা গাইয়া অস্থায়ী আবৃত্তি করিতে হয় কিন্তু সঞ্চারীর পরই আভোগ ধরিতে হয় এবং পুনরায় অস্থায়ী আবৃত্তি করিতে হয়। (ক্রমশঃ)

—বাসুদেবানন্দ।

মাধুকরী।

দুঃখবাদ ও জীবনের আদর্শ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এরূপ স্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন, "তাই যদি হয়, তাহা হইলে আদর্শটাকে ছোট করিয়া দাও না কেন—যেটাকে জীবনে পরিণত করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব।" ইহার উত্তর "তাহা হয় না; আদর্শকে ছোট করিলে জীবনে পরিণত করা অর্থাৎ Realisation আরও ছোট হইবে এবং মানবের দুর্দ্দশার আর অন্ত থাকিবে না।" মনে করুন, যদি একজন ছাত্রের আদর্শ হয় যে, সে প্রথম বিভাগে পাশ করিবে, তাহা হইলে

তাহার পক্ষে অন্ততঃ তৃতীয় বিভাগেও পাশ করা সম্ভব ; কিন্তু যে ছাত্র মনে করে যে, কোন রকমে চুকুড়ি সাতের খেলা রাখিলে বা তৃতীয় বিভাগে পাশ করিলেই হইল, তাহার ফেল হওয়া একরূপ অবশুম্ভাবী। আদর্শকে যেন ছোট করিতে প্রয়াস কখনও না পাই—আর এত বড় ভণ্ড যেন না হই যে আদর্শ কঠিন বলিয়া, কিংবা সে আদর্শ কোন সম্প্রদায় বিশেষের স্বাপরিতার জীবনে দেখিতে পাই না বলিয়া, সে আদর্শ টাকেই অস্বীকার করি। মনের উপর বড় কড়া পাহারা আবশুক। অন্সের প্রতি সদয় হও ; কিন্তু নিজের প্রতি নির্দ্দয় না হইলে চলিবে না। Introspection বা আত্মপরীক্ষা তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় মর্ম্মভেদী হওয়া আবশুক। সর্ব্বদাই যেন চিন্তা করি—'What I am and what I ought to be' অর্থাৎ আমি কি এবং আমার কি হওয়া উচিত ; এবং actualএ ও idealএ অর্থাৎ বাস্তবে এবং আদর্শে কত তফাৎ।

আদর্শটা যে খুব শক্ত, এ কথাটা প্রাচীন ঋষিরা অতি উত্তমরূপেই জানিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া আদর্শকে তাঁহারা অস্বীকার বা খর্ব্ব করেন নাই। Hegelএর in-and-through ব্যাপারটা যখন অতি সাধারণ মানবেরও বোধগম্য, তখন তাঁহারাই কি এ কথাটা বুঝেন নাই? অধিকাংশ লোকের পক্ষেই ত' in-and-through, কারণ অধিকাংশ লোকই যে দুর্ব্বল। সেই জন্যই চতুর্ব্বর্গের conception ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ইহার অর্থ ইহাই বুঝি যে, অর্থ ও কামকে অর্থাৎ nature বা প্রবৃত্তিকে ধর্ম্ম বা moral law দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবনটার মোড় মোক্ষের দিকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। ইহারই মানে গৃহস্থাশ্রম। চতুর্ব্বর্গের যেরূপ Conception, সেইরূপ চতুরাশ্রমের Conception। আবার গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী চাতুর্ব্বর্ণের Conception। কিন্তু মোক্ষ অর্থাৎ Transcendence and Conquest of nature যাঁহার হস্তামলকবৎ করতলগত হইয়াছে, তাঁহার কাছে আবার in-and-through কি? আর সকলকেই যে in-and-through করিতে হইবে, তাহারই বা অর্থ কি? যদি কেহ অসাধারণ শক্তিশালী হন তাহা হইলে তিনি তাহা করিবেন না। কোন শ্রেণীর

উৎকৃষ্ট ছাত্রের ন্যায় ভগবানের পাঠশালায় একেবারেই তাঁহার double promotion। যদি এক লাফেই কোন স্থানে পৌঁছান যায়, তাহা হইলে সমস্ত মাটিটা মাড়াইয়া যাইবার আবশ্যকতা কি? ইহার ন্যায় মূর্খতা আর কি হইতে হইতে পারে? বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল বলিতেছেন যে Evolution মানে gradualism নয়, ইহার মানে March by leaps and bounds; অর্থাৎ Evolution মানে Revolution. Bergson তাঁহার Creative Evolution গ্রন্থে De Vries এর এই মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। Mendel ও এই মতের পোষকতা করেন। শাস্ত্রে গৃহস্থাশ্রমের প্রশংসা আছে এবং থাকাই উচিত। কিন্তু "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"; অর্থাৎ যে মুহূর্ত্তে বৈরাগ্য হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে এটা আবার শ্রুতির বচন। সংহিতাকারদের মধ্যে অনেক স্থলে গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতার কথা আছে বলিয়া লাফাইলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, সংহিতাকারদের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যবহারিক জীবনকে চালিত করা। যাঁহারা তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য না বুঝিয়া গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা-সূচক বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন—যেরূপ সেদিন একটি সুপরিচিত বাঙ্গালা মাসিকপত্রে দেখিলাম—তাঁহাদের, যে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করা আবশ্যক, সে বিচার-বুদ্ধির একান্ত অভাব।

শাস্ত্রে এ কথাটাও আছে ;—

মেরু সর্ষপয়োর্যদ্ যৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎ সাগরয়োর্যদ্‌যৎ তথাভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥

অর্থাৎ মেরু সর্ষপে যে প্রভেদ, প্রচণ্ড সূর্য্য এবং খদ্যোতে যে প্রভেদ, অনন্ত সমুদ্র এবং ক্ষুদ্র গোষ্পদে যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী ও গৃহীতেও সেই প্রভেদ।

শাস্ত্রে এ কথাও আছে :—

সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।

অর্থাৎ পৃথিবীতে সকল বস্তুতেই ভয় আছে, শুধু মানবের বৈরাগ্যই ভয় রহিত।

শাস্ত্রে আবার এ কথাও আছে :—

ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।

অর্থাৎ, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

সন্ন্যাসের আদর্শ খর্ব্ব করিবার ধৃষ্টতা যাঁহাদের আছে, এবং সে ধৃষ্টতা সমর্থনের জন্য যাঁহারা স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করেন, তাঁহারা এই অধিকাংশ শ্রুতির বচন শুনিয়া এখন কি বলিতে চান? পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করিলে পুঁথিপাটা ঘাঁটিয়া রাশি রাশি এরূপ শ্রুতির বচন তাঁহারা উদ্ধৃত করিতে পারেন। আমার অত অবসর নাই। কেবল এইটুকু বলিয়া রাখি যে, যদি স্মৃতি বিশেষে গৃহস্থাশ্রমকে সন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদেরই শাস্ত্রানুসারে যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ, সেখানে শ্রুতিই গরীয়সী।

Asceticism, Absolute morality বা সন্ন্যাসের আদর্শ গ্রহণ না করিলে আমরা ব্যবহারিক moralityর ব্যাখ্যাই করিতে পারিব না। অথচ কি আশ্চর্য্য! এমন কথাও শোনা যায় যে, Asceticism anti-social! এরূপ বিকৃত ও ভ্রান্ত মত আর দ্বিতীয় নাই। Asceticism জিনিষটা ভাল করিয়া বুঝিলেই সমাজ চলিবে ভাল। সামাজিক উন্নতি, রাষ্ট্রীয় উন্নতি, সমস্তই absolute standard দ্বারা বিচার করিতে হইবে। Social Justice ও Political Justice কি, যাহা না হইলে সমাজ-সংস্কার ও রাষ্ট্রনৈতিক-সংস্কার হইতেই পারে না? ইহার মানে Giving every man his due অর্থাৎ নিজের গণ্ডাটা এবং সে গণ্ডাটা বেশ বেশী রকম ত্যাগ করিয়া অপরের প্রাপ্যটা অপরকে দেওয়া। Evil মানেই Principle of Individuation অর্থাৎ স্বার্থ ও প্রবৃত্তি। Good মানে পরার্থপরতা অর্থাৎ নিজেরটা ছাড়িয়া অপরকে দেওয়া। ছাড়িব ও অথচ চরম ছাড়া মানিব না, Social morality, Political morality বাক্যগুলি তোতাপাখীর ন্যায় আওড়াইব অথচ এ সমস্ত moralityর fundamental principle বা মূল-সূত্র সর্ব্বত্যাগ বা absolute morality মানিব না, ইহার ন্যায়

perversity অর্থাৎ হৃদয় মস্তিষ্কের বিকৃতি আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন ভয় নাই। Social reform, Political agitation, Political nationalism, Cconomic progress কিছুই বাদ যাইবে না—ও সমস্ত ব্যাপারই খুব উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবে, বিপথগামী হইবে না, যদি আমরা সর্ব্বত্যাগের আদর্শের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা সম্পন্ন হই।

(ক্রমশঃ)

অধ্যাপক শ্রীকামাখ্যানাথ মিত্র, এম-এ।

পুস্তক পরিচয়।

১। "ফল্গু"—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্-এ, বি-এল ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট প্রণীত। ৩০টি সুন্দর ছোট ছোট কবিতার বই। ছাপা বাঁধাই চমৎকার, দাম এক টাকা—প্রকাশক মনোমোহন প্রেস, ঢাকা।

কবির "কাণের পাশে কৃষ্ণকেশে ধরেচে পাক রূপালী" তাই তাঁর ভাব সংযত, কল্পনা উদার, ভাষা স্বচ্ছন্দগামিনী, ছন্দ মনোজ্ঞ। কবিতাগুলি বিভিন্ন ছন্দে লিখিত বলিয়া, weary uniformity নাই, পড়িতে ভাল লাগে। তাঁহার "হৃদয় বালুকার গোপন তলে সঞ্চিত" 'ফল্গুর' ক্ষীণধারা বাংলা সাহিত্যের যমুনা গঙ্গার অন্তরালে স্বাতন্ত্র্যাবস্থায় রাখিয়া প্রবাহিত হইবে, এ আশা করা যায়।

"জ্যোৎস্না-নিশীথে" শান্ত প্রকৃতির উচ্ছ্বসিত পুলক-সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া তিনি বিশ্বভরা বেদনার অরুন্তুদ করুণ সঙ্গীত' শুনিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন—"বুভুক্ষিত দরিদ্রের লক্ষকণ্ঠে কাতর ক্রন্দন বর্ষে বর্ষে তিলে তিলে মূকমৌন আত্মবিসর্জ্জন" তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল, 'হৃদয়-নিভৃতে দ্বিধা' জাগিয়া উঠিল—তিনি তাঁহার বিধাতাকে বলিলেন—

"ক্ষমিয়ো আমারে, প্রভু
এই শান্ত সুপ্ত রজনীতে
দ্বিধা যদি জেগে উঠে
চুপি চুপি হৃদয়নিভৃতে।
সবল দলিবে সদা
পদতলে দুর্ব্বলের প্রাণ
পিষ্টই পেষিত হ'বে—
বিশ্বতন্ত্রে এই কি বিধান ?
স্বার্থের উলঙ্গ মূর্ত্তি
লজ্জাহীন নাচিয়া বেড়ায়
বিদ্বেষ মুখোষ পরি'
ঢালে মধু দুষ্ট রসনায়
মিথ্যা হইয়াছে দড়,
প্রবঞ্চনা পর্ব্বত-প্রমাণ—
সত্যপন্থী ধর্ম্মভীরু
বল, প্রভু, কোথা পাবে স্থান।
বিলাস অযথা-স্ফীত
শোষিয়াছে দরিদ্রের গ্রাস,
বিবেক, প্রতিভা; মেধা
স্তব-তুষ্ট দাম্ভিকের দাস,
এ বৈষম্য তব রাজ্যে
সাজে কিহে রাজ রাজেশ্বর ?"

এই বৈষম্যের অবসান হইতে পারে এই 'পুরাতন্ জীর্ণ পৃথ্বী' ধ্বংস হইলে—তাই তিনি বলিতেছেন,

"হে রুদ্র, সংহার লীলা
পুনঃ তব কর অভিনয়
ধ্বংস হৌক দুষ্কৃতের
ভস্ম হোক পাপের নিলয়।

সেই ভস্মরাশি হ'তে
দীপ্ত দৃপ্ত নবীন জীবন
ফুৎকারি জাগায়ে তোল
ধরা হোক শান্তি নিকেতন ।
মহাসমুদ্রের নীরে
অবগাহি উঠুক ধরনী
ডুবায়ে অতল তলে
অতীতের কলঙ্ক কাহিনী ।
বুদ্ধের বৈরাগ্য দীক্ষা
চৈতন্যের প্রেমের বিজয়
যীশুর উদার ক্ষমা
আর যেন ব্যর্থ নাহি হয় ।"

কবির আশা পূর্ণ হইলে স্বর্গ মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিবে ; যুগযুগান্তের ইতিহাসে এই বিরাট সমস্যার সমাধান লিপিবদ্ধ নাই, তাই কবির হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইয়াছে "এ করুণ স্বর, টলেও ভূধর, শুধু তোমারই আসন অটল রয় ।" অবতারের পর অবতারের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সাধুর সংস্থাপন ও দুষ্কৃতের দমন সাধিত হইয়াছে কি ? "মহাসমুদ্রের নীরে" ধরণী পুনঃ অবগাহন করিয়া উঠিলেও ইহার মলিনতা ধৌত হইবে না—ইহার জ্বালা, ইহার বিভীষিকা, ইহার হৃদয়হীনতা ঘুচাইতে পারে শুধু প্রেম—যাহা নবীনের ভাষায় "প্রেমশিব, প্রেমশান্তি, প্রেম নিরবাণ" ; কবির মতে শুধু মঙ্গল মধুর প্রেমের পরশে ক্ষুদ্র জীবনের স্বার্থ, বন্ধন হারাইয়া অবারিত জগতের মাঝে ব্যাপ্ত হয় ও বিশ্বের নিশ্বাস লাগিয়া জীবনকুহরে আনন্দধ্বনি বাজিতে থাকে । বর্ণনার লীলাচাতুর্য্যে ও ছন্দ সৌন্দর্য্যে "চলিনু তরী বাহিয়া" কবিতাটি পরম উপভোগ্য ; ইহার তৃতীয় Stanza (শ্লোকটী) বাদ দিলে চলিত ।

'বাঙ্গালী পল্টন প্রশস্তি', 'জীবন-বলি', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'শেষ আশা'তে তাঁহার অন্তর্নিরুদ্ধ অনাবিল স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় পাই ।

'চারিদিকে ঘিরে অমঙ্গল
　　বজ্রবহ্নি গর্জ্জিছে অম্বরে
তারিমাঝে শুভলগ্নটুকু
　　আসিয়াছে বহুদিন পরে' ।

সেই শুভমুহূর্ত্তে "কার্য্যক্ষেত্রে একপ্রাণে নামিয়া আশা পূরাইবার" জন্য তিনি বাঙ্গালীকে আহ্বান করিয়াছেন ।

Thomas Moore এর Pro patria Moriর ছায়াবলম্বনে তিনি গাহিয়াছেন—

"ধন্য সে সন্তানগণ বেঁচে রবে যারা
　　তব শুভদিনে
আমি হেরিব না তব সে দিব্য মুরতি
　　এই দুঃখ মনে ।"

বর্ত্তমানের ঘনঘটা কাটাইয়া, ভবিষ্যতের গাঢ়তর তমিস্রা ভেদ করিয়া কবে কবির আশার অরুণিমা ফুটিয়া উঠিবে ?

"সমস্যা ও সমাধানে" অনেকগুলি খাঁটীকথা দেখিতে পাই—কাব্য লেখার গলদ কোথায়, 'রং বেরং'এ কবির খাতা ত্বরায় কেন ভরে ওঠে না, 'কল্পনাকে জমিয়ে নিয়ে কাব্যক্ষীর' করার অসুবিধা কি, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় । "তোমাতে ও আমাতে" 'বিংশবার্ষিকী', 'এস' তাঁহার মধুর বিবাহিত জীবনের উচ্ছ্বসিত আনন্দের মন্দাকিনীধারায় অনেক সংসারক্লিষ্ট দম্পতিকে পরিতৃপ্ত করিবে। তাঁহার মতে 'বিবাহ' একটা accident নহে ইহা "যুগযুগান্তের সাথীর" বিধিনির্দ্দিষ্ট পুনর্মিলন । 'আদিম প্রাতের সোণার অরুণ করে ক্ষীরোদ সিন্ধু-নীরে যে যুগল বিন্দু' ভাসিয়া উঠিয়াছিল, শত জনমের আবর্ত্তনেও তাহাদের 'সোহাগ আবেষ্টন' ছিন্ন হয় নাই । তাই তিনি তাঁহার 'পুরাণো বঁধু'কে 'নূতন আবাহনে' নিবিড় করিয়া বাঁধিতে চাহিয়াছেন ।

Narrative কবিতায় তাঁহার ছন্দ ও ভাষা অব্যাহত বলিয়া বোধ হইল না ; তাঁহার গীতি প্রবল, তাই কয়েকটি কবিতায় ছন্দের যতি-বিভাগ ও পদনির্ব্বাচনের ত্রুটি ঘটিয়াছে । "অতি-সতর্ক স্নেহ", "চক্রমধু ষ্টীমারের

ঢেউ লাগিয়া", "ধূসর শৃঙ্গের রাজি শালার্ক কিরণে ডোবে স্বর্ণতরঙ্গে", "নিশ্চেষ্ট ভীরুর বাহু পূজা" ইত্যাদির কথঞ্চিৎ সংশোধন আবশ্যক বলিয়া মনে হইল।

বইখানিতে ছাপার ভুল দেখিলাম না—প্রকাশককে ধন্যবাদ। ভরসা করি কবির অন্তর-বাহিনী "ফল্গুর" ক্ষীণধারা সংসারমরুর বহুযাত্রীর শুষ্ক-কণ্ঠ সরস করিয়া প্রবাহিত থাকিবে।

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
বি এল, এম্ আর, এ, এস।

২। মহর্ষি-চরিত—মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জীবন চরিত—শ্রীতারামোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত, কাশী ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশক কার্য্যালয় হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনকার এবং মহাভারতের রচয়িতার সমগ্র জীবনী সংক্ষেপে যাহারা জানিতে চাহেন তাহারা শীঘ্র এ পুস্তক কিনিয়া পাঠ করুণ। মূল্য এক টাকা।

৩। যোগদর্শন—সূত্র, সূত্রের বঙ্গানুবাদ এবং একটি বাঙ্গলা ভাষ্যের (?) সহিত ভারত ধর্ম্ম সিণ্ডিকেট লিমিটেডের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পাতঞ্জল সূত্র সম্বন্ধে যে ব্যাস ভাষ্য নামক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও দুর্ব্বোধ্য বিধায় সাধারণের ইহা অনুকূল করিবার জন্য, ঐ সূত্র সম্বন্ধীয় প্রচলিত অপরাপর টিকা অবলম্বনে উক্ত বাঙ্গলা ভাষ্য রচিত হইয়াছে। এ গ্রন্থ আমাদের মাতৃভাষায় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মূল্য দুই টাকা।

৪। নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি—(১) প্রকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত, মূল্য চারি আনা।

৫। কেশরী-নিনাদ—স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত, মূল্য দুই আনা।

সংঘ-বার্ত্তা।

১। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ডিসঙ্গ সেলা, পোঃ লাইট কিন্ সেও, খাসীয়া পাহাড়, আসাম। বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে খাসিয়া পাহাড়ে আমাদের কাজের এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে আমাদের প্রাথমিক ও নৈশ বিদ্যালয় ২টিরই যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। প্রথমে ৫টি মাত্র ছাত্র নিয়া একটি স্কুল আরম্ভ করা হয়, বর্ত্তমানে ৬০।৭০ জন ছেলে মেয়ে আমাদের Morning Schoolএ পড়িতেছে। এখন M.E School standardই পড়ান হইতেছে। আমরা দুই জন ও একজন খাসীয়া শিক্ষক এই তিন জনে স্কুলের কাজ চালাইতেছি। রাত্রের স্কুলে ৫।৬টি যুবক পড়ে এরাই পরে শিক্ষক হইতে পারিবে। আমাদের সব খরচ স্থানীয় লোকেরাই দিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা ও বাঙ্গালীর শিক্ষকতার প্রতি এদের আকর্ষণ দিন দিনই বাড়িতেছে। অন্যান্য খাসীয়া state থেকে ও শিক্ষক চাহিয়াছে কিন্তু উপযুক্ত লোক অভাবে আমরা কাজ বৃদ্ধি করি নাই। প্রত্যেক যায়গায়ই খ্রীষ্টান মিশন স্কুল থাকাসত্ত্বেও এরা আমাদেরই চায়। এখানে বিস্তর কাজ করিবার আছে এবং শিক্ষার ভিতর দিয়াই তাহা করিতে হইবে। নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়াও আমাদের কাজ দিন দিনই খাসীয়াদের অধিকতর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। আমাদের ভরসা আছে এখানে একটা স্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে পারিলে খাসীয়া পাহাড়ের সকল দিক হইতে এখানে ছাত্র পড়িতে আসিবে এবং কয়েক বৎসরের ভিতরই আমরা স্থানীয় লোকই কর্ম্মিরূপে পাইব। একাজে বিশেষ উৎসাহবান, সহৃদয় ২।১ জন লোকের সাহায্য পাইলে ২।৩টি মেয়েকে নিবেদিতা স্কুলে পাঠাইতে চেষ্টা করিব, তাদের সহায়তায় পরে মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল করা সম্ভব হইবে। আর এটি করতেই হইবে ; কারণ এখানে মেয়েদের ভিতর শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে কোনও কাজই স্থায়ী হইবে না। এখানে মেয়েরাই সর্ব্বে সর্ব্বা, সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী।

আলোচ্য বর্ষে প্রায় ৬০০ রোগীকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া

হইয়াছে। সম্ভব পক্ষে উপযুক্ত মূল্য নিয়া ও গরীবদিগকে বিনা পয়সায় দেওয়া হইয়াছে।

সপ্তাহিক অধিবেশন রীতি মত প্রতি রবিবার চলিতেছে। এদিকে লোকেরও আগ্রহ বাড়িতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত উপদেশ ও স্বামিজীর ২।১ খানি বই হইতে খাসীয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়া সভায় পাঠ করা হইয়াছে।

২। জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত থানা কোতুলপুর গ্রাম কোয়ালপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন-শাখাকেন্দ্রে যে একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাতে (১) বয়নাদি শিল্পশিক্ষা, (২) সাধারণ শিক্ষা, (৩) কৃষিশিক্ষা, (৪) চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগ আছে। তন্মধ্যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত বয়নশিক্ষালয়টি সাধারণের বিশেষ পরিচিত। উক্ত শিক্ষালয় হইতে কয়েকটি ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া বিভিন্ন স্থানে বয়নবিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক বয়নবিদ্যা শিক্ষা দিতেছে। কেহ কেহ বা তাঁত চালাইয়া স্বাধীন-ভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। এই বয়নশিক্ষালয়ে বস্ত্রবয়ন, বার্নিশ করা 'ব' প্রস্তুত এবং সুতা কাটা শিক্ষা দেওয়া হয়। বয়নবিদ্যালয়, তাঁত এবং কতকগুলি দরিদ্রছাত্রের অশন, বসনের ব্যয় আদিতে প্রায় সহস্রাধিক টাকা ঋণ হইয়াছে। দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা প্রযুক্ত দরিদ্র শিক্ষার্থিগণ অশন, বসন অভাবে বয়নশিক্ষা করিতে পারিতেছে না। উপস্থিত ৩টি ছাত্র বয়নাদি শিক্ষা করিতেছে। সহৃদয় ব্যক্তিগণের অর্থ সাহায্যে উক্ত শিক্ষা বিভাগগুলি চলিতেছে কিন্তু উপযুক্ত সাহায্য না আসায় এই প্রাচীন শিক্ষালয়টির কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে না। গৃহ-সংস্কার ও তাঁতগুলির সংস্কারের জন্য অর্থের প্রয়োজন। ফলতঃ বিদ্যালয়টি ঋণগ্রস্ত হওয়ায় এবং সাধারণের উপযুক্ত সাহায্য না পাওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা হওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব সহৃদয় জন-সাধারণের নিকট নিবেদন, মাসিক সাহায্য প্রদানে দরিদ্র শিক্ষার্থিগণের শিক্ষার সুবিধা করিয়া এবং সাময়িক বা এককালীন সাহায্যের দ্বারা বিদ্যালয়টিকে ঋণমুক্ত ও গৃহাদি সংস্কার কার্য্যে সহায়তা করিয়া জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি সজীব রাখুন।

মহা-প্রাণ।

হে বিরাট-আকাশ। তব একি দৃশ্য আজ
ব্যথার বেদন নিয়ে রক্তপূত সাজ।
বিফল দিবার শেষে
ব্যাকুল মলিন বেশে
একি আত্মনিবেদন?
নিয়ে ব্যথা নিয়ে শোক নিঃশব্দ রোদন?
যায় দেখা
মর্ম্মের প্রাঞ্জল পটে সুনিবিড় লেখা
দূর হতে দূর-দিগন্তরে।
প্রতি স্তরে স্তরে
ধ্বনি তার হ'তেছে স্পন্দিত
অন্তরে বাহিরে; রুদ্ধ আবেগে কম্পিত
ওই আত্মামাঝে।
ছাড়ি' সাজ
দিবসের সূর্য্যরাগ-মণিজালে ঘেরা
নিস্ফল বেদন আর কাজ
ওরা আসেনি, নীরবে
তাই দিগন্ত অঞ্চল টানি' লুকায়েছ হাহা রবে!
ছুড়ে ফেলে খুলে।
অন্তর সাজিটি ভরি' আনিয়াছ তুলে

ব্যথাক্ষত পদ্মদল,
নিস্পন্দ বিহ্বল
নাহি ঘটা
শুধু রাঙায় রাঙা রক্ত রাগছটা।
এ তব কাঁদন
নিরুদ্দেশী। স্তব্ধ হ'য়ে লুকাইয়া নীরব বেদন।
বক্ষ বিদারি দিয়া গুপ্ত নিরালায়
সীমান্তের প্রান্ত বোপে আজি অবেলায়
এ তব আকাশ
অস্ফুট আভাস
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ওরা যায়
করি হায় হায়
ভাবে কোন তথ্য কোন ভাষা বুঝিবার নাই।
তুমি তাই
স্তরে স্তরে পঞ্জরের রাঙা অস্থি মাঝে
সহস্র অতৃপ্তরব ক্লিষ্টতার সাজে
'ব্যথা—বড় ব্যথা'
লিখিয়াছ এই কথা।
আকাশের মধ্যকার সে রক্ত লিপিকা
জাননাকি দেছে জ্বালি কার প্রাণে শিখা ?
তুমি যেথা বারে বারে মৌন মনে চিত্ত-সিন্ধুসনে
নিভৃতে গোপনে
ফুলিছ ফুঁপিছ
নিঃশব্দে নিস্তব্ধে শুধু নীরবে কাঁদিছ ;
যেথা উচ্চ গ্রামান্তরে করি ভিড়
বাঁধি নীড়
বিশুষ্ক চঞ্চল ধূলি মাখা দেহে
যথা দগ্ধ মরু গেহে—

হেরি' সেথা সে মহা ক্রন্দন—
তুলি অন্তর স্পন্দন
প্রাণ কার আসিয়াছে ছুটে
হৃদয়ের গাঢ় হৃদিপুটে
বলিছে কাতরে—
"ভুলোনা মা ভুলোনা মা
"বেঁচে আছে সে এখনো লভি তোর চুমা !
"এই নে মা বীন্ তোর বিশ্ব-সঙ্গীতের
"এই নে মা প্রাণ তোর বিশ্ব-উদ্গীথের
"শান্ত স্থির মূক স্বরে
"কোলে নে মা এ সন্ধ্যার দিগন্ত প্রান্তরে।"
শুনি ধীরে—
আবেগের সেই পূর্ণবাণী
প্রিয়ের করুণ কথা লইতেছে জানি।
স্তব্ধ ক্ষুব্ধ মৌনমূক
নিভৃতে পাতিয়া বুক
সে গভীর ক্ষণিকের গানে
মরণের তানে
আঁকেনি এখনো বুকে বিশ্বধরণীর
উদ্ভ্রান্তের কালিমা গরল ব্যর্থ জয়শ্রীর !
ঘোর সুপ্তি অবিচার
ব্যর্থতার হাহাকার
জ্বালেনিরে এক হ'য়ে মৃত্যু অগ্নিলেখা
শতধারে শতরবে দুর্গন্ধের শিখা !

শ্রীসুধীরচন্দ্র চাকী।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

(৭)

শ্রীশ্রীমার প্রথম দর্শন লাভ হয় ইংরেজী ১৯১০ সনের ডিসেম্বর মাসে বড় দিনের সময় উড়িষ্যার কোঠারে *। আমার সঙ্গে শিলং হইতে আরও দুটি ভক্ত—হেমন্ত মিত্র ও বীরেন্দ্র মজুমদার ছিল। কোঠারে রামকৃষ্ণবাবু, স্বামী ধীরানন্দজী, স্বামী অচলানন্দজী, স্বামী আত্মানন্দজী, শ্রীশ্রীনাগমহাশয়েব ভক্ত শ্রীযুত হরপ্রসন্ন মজুমদাব প্রভৃতি ছিলেন। আমরা কিছু ফল ও কমলা মধু ইত্যাদি নিয়ে গিয়াছিলাম। বেলা প্রায় একটার সময় পৌঁছি। জিনিষপত্র রামকৃষ্ণবাবু শ্রীশ্রীমার নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। স্নানান্তে আমাদিগকে আহার করিতে ডাকা হইল। ইতি-মধ্যে উপস্থিত সন্ন্যাসিগণ পরস্পব বলাবলি কবিতে লাগিলেন, 'যখন এত দূরদেশ হতে এসেছে, মাকে দর্শন করতে দিতেই হবে—তবে বেশী কথাবার্ত্তার সুবিধা হবে না'। বীরেনবাবু শুনিয়া আমাকে এ কথা বলেন। আমি তাহাতে বলি "মার যা ইচ্ছা, তাই হবে—ভয় কি ?" সকলেই আহার করিতে গেলেন। আমি রামকৃষ্ণবাবুকে বলিলাম "শ্রীশ্রীমাকে দর্শন না করে আমরা কিছু খাব না।" রামকৃষ্ণবাবু মাকে ঐ কথা জানাইলেন এবং আমাদের দর্শনের অনুমতি লইয়া আসিলেন। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি শ্রীশ্রীমা বারান্দায় রীতিমত ঘোমটা টানিয়া চাদরমুড়ি দিয়া বসিয়া আছেন। নিকটে যাইতেই গোলাপমা বলিলেন "ছেলে মানুষ গো, ছেলে মানুষ মা,—কোথায় শিলং আর কোথায় কোঠার, তোমাকে দেখতে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসেছে।" এ কথা শুনিয়াই

---

* কোঠারে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ৺বলরাম বসুদের জমিদারী। শরীর সারিবার জন্য শ্রীশ্রীমাকে কিছুদিন তথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মা এইস্থান হইতেই পরে মান্দ্রাজ, রামেশ্বর, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

মা ঘোমটা খুলিলেন—মায়ের শ্রীমূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হইল। সেই হইতে শ্রীশ্রীমা আর কখনো আমাকে দেখিয়া ঘোমটা দেন নাই। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মনে মনে 'শরণাগত শরণাগত' এই কথা বলিলাম। মা মস্তকে শ্রীহস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—'ভক্তিলাভ হোক্'।

আমি বলিলাম "মা এখানে দু একদিন থাক্‌বো ইচ্ছা। বড় মানুষের বাড়ী, তোমাকে দর্শন করা বড়ই মুস্কিল"।

মা—আমি তোমাদিগকে ডেকে পাঠাব। এখন খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করগে।

আমরা আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম। বৈকালে পূজনীয়া গোলাপমা শ্রীশ্রীমার প্রসাদী পায়েস একটি বাটিতে আমাদের দিয়া গেলেন; বলিলেন "মা তোমাদের এই পায়েস দিয়েছেন।"

কিছুক্ষণ পরে একজন আসিয়া বলিলেন "মা আপনাদের ডেকেছেন।" আমরা পুনর্ব্বার দর্শন পাইলাম। প্রণামান্তে মাকে বলিলাম "মা, তোমাকে দু একটি কথা বল্‌ব, তা সকলের সাম্‌নে বল্‌তে ইচ্ছা হয় না।" মা বলিলেন "বেশ ত।" যিনি আমাদের ডাকিয়া আনিয়াছিলেন তাঁহাকে বলিলেন "তুমি একটু এখান থেকে যাও।" তিনি মার কথামত বাহিরে চলিয়া গেলেন।

আমি ইতি পূর্ব্বে স্বপ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে দর্শনাদি করিয়াছিলাম সেই সকল কথা বলিলাম। মা ঐ সকল শুনিয়া বলিলেন "ঠিক দেখেছ।" অপর ভক্ত দুটি সম্বন্ধে মা জিজ্ঞাসা করিলেন "এদের কি ইচ্ছা?" আমি বলিলাম "মা, তোমার কাছে এসেছে দীক্ষার জন্য, এখন তোমার যা ইচ্ছা।"

মা—বেশ, কাল সকালে স্নান করে এসো।

আমি—মা, ঠাকুর তোমার পাদপদ্ম পূজা করেছিলেন, আমাদেরও ইচ্ছা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করবো।

মা—আচ্ছা, তাই হবে।

আমি—ফুল কোথায় পাব?

মা—এরা যোগাড় করে দেবে।

আমরা প্রণাম করিয়া বাহির বাটীতে আসিলাম।

শ্রীশ্রীমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এদের কি ইচ্ছা?' কিন্তু আমার নিজের সম্বন্ধে কোন কথাই তুলিলেন না। মার নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পর আমার একটু চিন্তা হইল। ভাবিলাম মার যা ইচ্ছা তাই হবে, আমি নিজে কিছু বলিব না।

পরদিন আমরা স্নান করিয়া পুষ্পাদি সহ প্রস্তুত হইলাম। আদেশ হইল—এক একজন কবিয়া এস। আমিই প্রথম গেলাম। মা পূজাদি সাঙ্গ করিয়া বসিয়া আছেন মনে হইল। আমি প্রবেশ করিলে বলিলেন—"ঠাকুর তোমাকে যা দিয়েছেন, তা তুমি করবে। আমিও তোমাকে কিছু দিচ্ছি"—এই বলিয়া মহামন্ত্র দিলেন।

পবে শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিলাম। মা দাঁড়াইয়া পূজা গ্রহণ করিলেন। আমি বলিলাম 'মা আমি ত মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানিনা।' মা বলিলেন "অম্‌নিই দাওনা।" আমি 'জয় মা' বলিয়া পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। একটি ধুতুবা ফুল ছিল—মা বলিলেন "ওটি দিওনা—ও শিবের পূজায় লাগে।"

মার জন্য বস্ত্র নিয়া গিয়াছিলাম, তাহা দিলাম এবং একটি টাকাও দিলাম। টাকা দেওয়াতে মা বলিলেন "তোমাব টানাটানি, অভাব—আবার টাকা কেন?" সাংসারিক অভাব সম্বন্ধে কোন কথাই হয় নাই, অথচ দেখিলাম মা সবই জানেন! আমি বলিলাম "এ ত তোমারই টাকা, তোমাকেই দেওয়া হচ্ছে; আমাদের পরিশ্রমে যা কিছু আসে, তার সামান্যও যদি তোমাব সেবায় লাগে, আমরা ধন্য মনে করি।"

মা বলিলেন "আহা, কি টান গো, কি টান।"

আমি—মা, তোমাকে ভক্তগণ সাক্ষাৎ কালী, আদ্যাশক্তি ভগবতী এসব বলেন। গীতায় আছে "অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াছিলেন এবং স্বয়ং তিনিও 'আমি নারায়ণ' এই কথা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন।" * স্বয়ং ঐ কথা বলায় ঐ কথার মূল্য অধিক হইয়াছিল। তোমার কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহা আমি বিশ্বাস করি। তবে তুমি স্বয়ং যদি সে কথা বল, তা হলে আর কোনই

* আহুস্তামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥

সন্দেহ থাকিতে পারে না। তোমার নিজ মুখে শুনিতে চাই ঐ কথা সত্য কি না।

মা—হাঁ, সত্য।

ইহার পর ভবিষ্যতে আর কোন দিনই মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে আমি কোন প্রশ্ন করি নাই।

আমি বলিলাম "মা, আমি এই চাই—যেমন তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি, কথাবার্ত্তা বল্‌ছি, আমি যেন এইরূপই ইষ্টকে দর্শন, স্পর্শন, আলাপ করতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর।"

মা—হাঁ, তাই হবে।

তৎপর দিন বিদায় গ্রহণের সময় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া মায়ের বড়ই প্রসন্ন মূর্ত্তি ও হাসিমাখা মুখ দেখিলাম। গোলাপমা আমাকে বলিলেন "পুরীধাম দর্শন করে যাও না?" আমি বলিলাম "আর কি দেখবো?—মায়ের পাদপদ্মই আমার অনন্ত কোটী তীর্থ! আমি আর কিছুই চাই না।" মা আমার কথা শুনিয়া বলিলেন "থাক্‌গে, নাই বা গেল, দরকার নাই।"

* * * *

দ্বিতীয় দর্শন ১৯১২ সনের মে মাসে উদ্বোধনের বাটীতে। এই বারে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও আমার সহধর্ম্মিনীর দীক্ষা হয়। শ্রীমতী বাধুর অসুখ থাকায় বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। আমার গর্ভধারিণী এবং মাতামহী ও আমার দুটি ছেলেও সঙ্গে ছিল। তাহারাও শ্রীশ্রীমাকে দর্শন, স্পর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

* * * *

তারপর দর্শন জয়রামবাটীতে, শ্রীশ্রীমার ভ্রাতুষ্পুত্র ভূদেবের বিবাহের ৩।৪ দিন পূর্ব্বে, ১৯১৩ সনে। সেবারে কোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিয়া শুনিলাম সম্প্রতি একটি ভক্ত* শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় উক্ত মঠে দেহরক্ষা করিয়াছেন। কেশবানন্দজী বলিলেন "এখন জয়রামবাটী যাওয়া মার নিষেধ—বড় গরম পড়েছে, বৃষ্টি না হলে কাউকে যেতে

* ৺দ্বারকানাথ মজুমদার।

দেওয়া হবে না।" একটু চিন্তিত হইলাম—এতদূর আসিয়াছি, মার নিষেধ ঠেলিয়া কেমন করিয়া যাই। আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই মায়ের কৃপায় খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। পরদিন প্রাতে জয়রামবাটী পৌছিলাম। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলাম। কুশলাদি জিজ্ঞাসান্তে মা বলিলেন "বাবা, কাল বেশ বৃষ্টি হয়েছে—আজ বেশ একটু ঠাণ্ডা।" পরলোকগত ভক্তটির কথা তুলিয়া মা বলিলেন "সাধুর যা মৃত্যু, তা ওর হয়েছে, আমি তাকে এখনো দেখ্‌চি। তবে ওর বুড়ো বাপ আছে, তার জন্যই কষ্ট হয়"—এই বলিয়া মা অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

কাশীধাম হইতে ব্রহ্মচারী দেবেন্দ্রনাথ এই সময় জয়রামবাটী উপস্থিত হন। উক্ত ব্রহ্মচারী পূর্ব্ব জন্মের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, বলিতেন। চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন 'আমি নাকি পূর্ব্ব জন্মে তাঁহার গুরু ছিলাম।' আমি কিন্তু কিছুই জানি না। তাঁহার এবম্বিধ সকল কথাই পাগলের প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। আমরা দুজন একত্র হইয়া শ্রীশ্রীমার নিকট উপস্থিত হইতেই মা আপনা হইতে বলিলেন "তোমরা দুজন এক জায়গায় ছিলে, আবার ঠিক এক জায়গায় এসেছ।"

ইহা শুনিয়া দেবেন্দ্র চুপি চুপি আমাকে বলিলেন "কেমন, আমি যা বলেছিলাম, মায়ের কথায় বুঝলেন ত যে তা ঠিক্ ঠিক্।"

আমি—হবে, আমিত কিছু জানি না।

শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে বাহিরে আসিয়া দেবেন্দ্র আমাকে বলিলেন "আমি মায়ের নিকট সন্ন্যাস নিতে এসেছি, কিন্তু যতক্ষণ আপনি মাকে সে বিষয়ে অনুরোধ না করিবেন, ততক্ষণ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। ঠাকুরের ইচ্ছায়ই আমি এ সময় এসেছি। আপনি না বল্লে হবে না বলেই ঠাকুর আমাকে এ সময় উপস্থিত করিয়েছেন। আমি শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাকে কাশীতে প্রত্যক্ষ দর্শন করে এসেছি, কথাবার্ত্তাও হয়েছিল—এ সব সত্য কথা।"

আমি বলিলাম "আমি সহজে বলিব না—দেখি কি হয়।"

দেবেন্দ্র—কিছুতেই হবে না।

আমরা ৭।৮ দিন ছিলাম, দেবেন্দ্র ইতিমধ্যে বড়ই উতলা হইয়া পড়িল। আমারও উহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইল। যাহা হউক একদিন প্রাতে আমি একা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম "মা তোমাকে একটা কথা বল্‌বো।"

মা হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা একটু পরে এসো—যখন আমি তরকারী কুট্‌তে বস্‌বো তখন।"

কিছুক্ষণ পরে মা তরকারী কুট্‌তে বসিলেন এবং আমি উপস্থিত হইলে বলিলেন—তুমি কি বল্‌বে, এখন বল।

আমি বলিলাম "মা, তুমিত সবই জান—কাশীতে দেবেন্দ্রকে দেখাও দিয়েছ, ঠাকুরও দর্শন দিয়েছেন। এখন তার ইচ্ছা সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সেত আর সংসার করবেনা—তবে দাও না কেন ?"

শুনিয়া মা একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "ও যদি সন্ন্যাস নেয়, তবে কি কারো কোন কষ্ট হবে না ?"

আমি—তার পিতা মাতা কেউ জীবিত নাই। এক বড় ভাই আছে সে ব্রাহ্ম এবং উপার্জ্জনক্ষম। কারো যে কোন কষ্ট হবে এমন ত দেখি না।

মা—আচ্ছা তবে হবে। কোয়ালপাড়া থেকে নূতন কাপড় গেরুয়া রংএ ছুপিয়ে আন্‌বে। কালই হবে।

আমি আসিয়া দেবেন্দ্রকে সব বলিলাম। শুনে খুব আনন্দ—সকল জিনিষ যোগাড় করা হইল।

পরদিন শ্রীশ্রীমার ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া মা পূজাদি করিলেন এবং দেবেনকে গেরুয়া বস্ত্র কৌপীন দিয়া বাহিরে যাইয়া পরিধান করিয়া আসিতে বলিলেন।—আমি তখনো শ্রীশ্রীমার নিকট বসিয়া। আমার মন্দ ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিলাম এমন সময় মা সস্নেহে বলিলেন "বাবা, ঠাকুরের প্রসাদী সরবৎ খাবে ?" আমি—হাঁ, দাও।

মা সরবৎ লইয়া নিজে একটু পান করিয়া সরবতের গ্লাসটি সযত্নে আমার হাতে দিলেন। আমি শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদী সরবৎ পান করিয়া

ধন্য হইলাম—মনে হইল 'এর কাছে আবার সন্ন্যাস কি? এ যে দেব-দুর্লভ।' এক আশ্চর্য্য ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইল।

দেবেন্দ্র গেরুয়া পরিয়া মাকে প্রণাম করিতে আসিলে মা আমাকে বলিলেন "দেখেছ, যেন আর একটি হয়েছে, সে মানুষ আর নেই!"

কালী মামা (শ্রীশ্রীমার মধ্যম ভ্রাতা, ভূদেবের পিতা) আসিয়া আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, আমি যাহাতে ভূদেবের বিবাহে যাই—কিন্তু আমার নিজের ইচ্ছা, মাব নিকটই থাকি। ভাব বুঝিয়াই মা বলিলেন "না, ওর গিযে কাজ নেই, এখানেই থাকবে।"

বিবাহোপলক্ষে পাচক ব্রাহ্মণেরা রান্না কবিতেছিল। দেবেন্দ্র ও আমি একটু দূবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। তা'ই দেখিয়া মা উহাদের বলিলেন "এদের গলায় একটা পৈতা নাই—তাই ভাবৃছ এবা ছোট। আহা, এদের তুল্য কি আছে?"

বিবাহে খেলুড়েদেব একজন বুকে পাথব ভাঙ্গিয়া খেলা দেখাইয়াছিল। ভাঙ্গিবাব সময মা কেবল বলিতেছিলেন "ঠাকুব রক্ষা কর, ঠাকুর রক্ষা কর।" পাথর ভাঙ্গা হয়ে গেলে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা, ওরা কি মন্তর টন্তর জানে?"

আমি—না মা, মন্তর টন্তব কিছু নয়—এই বকম ক্রমে ক্রমে অভ্যাস কবেছে। আমি একটা গল্প শুনেছি আমেরিকায় কোন সাহেব একটি বাছুবকে প্রত্যহ কোলে কবে দূরে গোচারণের স্থানে নিয়ে যেত। ক্রমশঃ বাছুরটি বড হয়ে ষাঁড হল। তথনও সে কোলে করে নিতে পারতো, আর সকলকে এই খেলা দেখাত।—এ সবই অভ্যাসের কাজ।

মা—বটে, অভ্যাসের কত শক্তি। এম্নি, জপ অভ্যাস কবতে করতে মানুষ সিদ্ধ হয়—জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি।

নাগমহাশয়ের জীবনচবিতে আছে, শ্রীশ্রীমা স্বয়ং প্রসাদ করিয়া নিজ হাতে নাগ মহাশয়কে খাইয়ে দিয়েছিলেন তাহাতে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন "বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে

মা দয়াল !" ইহা পড়িয়া আমার মনে হইয়াছিল—মা কি আমাকে তেমন ভাবে খাইয়ে দিবেন ? একথা কিন্তু মাকে বলা হবে না, তিনি নিজে দয়া করিয়া দেন ত হবে।

আশ্চর্য্য, সত্য সত্যই একদিন তিনি আমার মুখে ঐরূপে প্রসাদ দিয়ে দিলেন !

এই সময় জয়রামবাটীতে একটি সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠের নহেন, কিন্তু দেখিলাম শ্রীশ্রীমার পরিচিত। একদিন সকলে খেতে বসেছি, উক্ত সন্ন্যাসীও পাশে একটু দূরে খেতে বসেছেন। মা আমাকে বলিলেন "বাবা, গেরুয়া কি নিলেই হ'ল ? (উক্ত সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া) ঐ দেখনা গেরুয়া নিয়েছে।"

আমাকে বলিলেন "তোমার এম্‌নিই সব হবে, গেরুয়ার দরকার কি ?"

শ্রীশ্রীমার জন্য এক জোড়া কাপড় নিয়ে গিয়েছিলাম। মাকে বলিলাম "মা, শুনেছি তুমি কাপড় সকলকে বিতরণ করে দাও। তুমি যদি নিজে কাপড় দুখানি পর তবে আমার খুব আনন্দ হয়।" শুনিয়া মা কিছু বলিলেন না—একটু হাসিলেন। পরদিন আমি যাইতেই বলিলেন "এই দেখ বাবা, তুমি যে কাপড় এনেছ তা পরেছি"।

আমার প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমা আমাকে তাঁহার ব্যবহৃত একখানি বস্ত্র দিয়া —বলিয়াছিলেন "বড় ময়লা, তুমি ধুইয়ে নিও।" আমি বলিলাম "না মা, তুমি যেমনটি দিয়েছ, ঠিক তেমনই রাখতে ইচ্ছা, ধোপার ঘরে দেওয়া হবে না।"

মা—আচ্ছা, সেই ভাল।

একদিন মা খাইতে বসিয়াছেন। আমি ও দেবেন্দ্র উপস্থিত হইলাম। মা বলিলেন "প্রসাদ নেবে ?" আমরা উভয়ে হাত পাতিলাম। একটু নিজমুখে দিয়া আমাদের হাতে প্রসাদ দিলেন। হাত হইতে পড়িয়া যায় দেখিয়া নিজেই বেশ করিয়া চেপে-চুপে দিলেন। মায়ের ব্রাহ্মণ শরীর, আমি কায়স্থ—কোন বর্ণবিচার নাই—আমার হাতে দিলেন। পরে নিজে খাইতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের দেখিতেন ঠিক যেন আপন ছেলে।

শ্রীশ্রীমাকে যখনই দর্শন করিতে যাইতাম, কিছু ফল কি অন্য জিনিষ যাহা সুবিধা হইত লইয়া যাইতাম। আমি শুনিয়াছিলাম যে, মা সকলের জিনিষ ঠাকুরকে দিতে পারেন না। এজন্য অনেক সময় মনে ভয় হইত—'কি জানি, আমরাত ভাল মানুষ নই, মা গ্রহণ করিতে পারেন কিনা কে জানে।' মা কিন্তু প্রায়ই বলিতেন "বাবা, তুমি যে অমুক জিনিষ এনেছিলে, ঠাকুরকে দিয়েছি, বেশ জিনিষ, বেশ মিষ্টি—আমি খেয়েছি।"

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম "মা, ভগবানের নাম করলেও কি প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না ?"

মা বলিলেন "প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয় যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল, সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল।"

মাকে বলিয়াছিলাম "মা, সাধন ভজন ত কিছুই করতে পারিনা, আর কখনো যে কিছু করতে পারবো এমনও মনে হয় না।"

মা ভরসা দিয়া বলিলেন "কি আর করবে, যা কচ্ছ, তাই করে যাও—মনে রাখবে, তোমাদের পেছনে ঠাকুর আছেন—আমি আছি।"

রাধু একদিন অসুখে একটু ছট্ ফট্ করিতেছিল। মা বলিলেন "দেখত বাবা, ওর কি হয়েছে ?" আমার কোন নাড়ী-জ্ঞান নাই, তবু মাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য আমি রাধুর নাড়ী ধরিয়া বলিলাম "বিশেষ কিছু নয়, একটু দুর্ব্বল হয়েছে। দুধ একটু খাইয়ে দাও।" মার ছেলে-মানুষের মত স্বভাব—তখনি দুধ খাওয়াতে বসলেন। একটু পরে রাধুর মা আসিয়া রাধুর নিকটে বসিলেন। তাহাতে রাধু বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল, কারণ তাহার ইচ্ছা নয় যে তাহার গর্ভধারিণী নিকটে থাকেন। মা রাধুর মাকে একটু সরাইয়া দিবার ইচ্ছায় হাত দিয়া ঠেলিয়া বলিলেন "তুমি এখন যাওনা।" উহাতে হঠাৎ শ্রীশ্রীমার হস্ত রাধুর মার পায়ে ঠেকিয়া যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে বলে উঠলেন "কেন তুমি আমার পায়ে হাত দিলে ? আমার কি হবে গো !" ইত্যাদি। তাঁহার ঐ ভাব দেখে মার হাসি আর থামে না ! রাসবিহারীদাদা নিকটে ছিলেন,

বলিলেন "মা, দেখেছ এদিকে পাগলী মামী তোমাকে এত গালাগাল করে, মারতে আসে, কিন্তু তোমার হাত তার পায়ে লেগেছে বলে কত ভয়!"

মা বলিলেন "বাবা, রাবণ কি জানতনা যে রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, সীতা আদ্যাশক্তি জগন্মাতা—তবুও ঐ কত্তে এসেছিল! ও (পাগলী) কি আমাকে জানে না? সব জানে, তবু এই কত্তে এসেছে।"

মায়ের পায়ের বাতের ব্যথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম "মা শুনতে পাই ভক্তদের পাপ গ্রহণ করেই তোমার এই ব্যাধি। আমার একটা আন্তরিক নিবেদন—তুমি আমার জন্য ভুগো না। আমার কর্ম্মের ভোগ আমারদ্বারাই ভোগ করিয়ে নাও।"

মা—সেকি বাবা, সেকি বাবা, তোমরা ভাল থাকো, আমিই ভুগি।

আহা সে সময় মায়ের কি এক অপূর্ব্ব করুণা মূর্ত্তিই দেখিলাম!

আমি একদিন ভাবিয়াছিলাম 'যারা মায়ের নিকটে থাকিয়া তাঁর সেবা করিতেছে তারাই ধন্য, আমাদের ভাগ্যে তা হল কই।' মা অন্তর্যামী—আমাকে ডাকিয়া সে দিন ভক্তদের লিখিত কতকগুলি চিঠিপত্র পড়াইয়া লইলেন।

জয়রামবাটী হইতে রওনা হইবার সময় মাকে গিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথায় জপ করিয়া দিলেন এবং স্নেহভরে বলিলেন "আহা, এদের ইচ্ছা আমার কাছে থাকে। কিন্তু কি করবে সংসারের অনেক কাজ করতে হয়।" ছেলে বিদেশে যাবার সময় মায়ের মত সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূর আসিলেন এবং সজল নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

সাংখ্য-দর্শন।

৩১

স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিম্।
পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎকার্য্যতে করণম্॥

পদপাঠ—(করণানি) স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পর আকূত-হেতুকাং বৃত্তিম্।
পুরুষার্থ এব হেতুঃ ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্॥

অন্বয়ঃ—(করণানি) পরস্পর আকূতহেতুকাং স্বাং স্বাং বৃত্তিং প্রতিপদ্যন্তে,
পুরুষার্থ এব হেতুঃ, ন কেনচিৎ করণং কার্য্যতে।

বৃত্তিং প্রতিপদ্যন্তে, করণানি কর্ত্তা উহ্য। করণ সকল বৃত্তি প্রতি-পাদন করে বা লাভ করে। বৃত্তিম্ = (স্ত্রীলিঙ্গ) জীবিকা, ব্যবসায়।

বৃত্তি কি প্রকার? পরস্পর আকূত হেতুকাং। আকূতের আভি-ধানিক অর্থ অভিপ্রায় (হেমচন্দ্র)। আকূত, কু ধাতু হইতে হইয়াছে।

কু = অস্পষ্ট শব্দ করা। অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা যাহা প্রকাশ পায় অর্থাৎ অভিপ্রায়। আকূতি বা আকূত = সমবেত অভিপ্রায়। অভি-প্রায় = প্রবণতা।

হেতুক = কারণ; হেতুকা বৃত্তির বিশেষণ।

বৃত্তির কারণ কি? করণ পরস্পরের সমবেত প্রবণতা। করণের যে বৃত্তি তাহা হইতেছে উহাদের পরস্পরের সমবেত অভিপ্রায় হেতু। কাঁচ ভঙ্গপ্রবণ অর্থাৎ কাঁচের অভিপ্রায় এই যে সে ভাঙ্গিতে চায়। করণেরা স্বাং স্বাং অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় বৃত্তি নিষ্পাদন করে। কি জন্য? পুরুষার্থ এব হেতুঃ = তাহার কারণ পুরুষার্থ। পুরুষ + অর্থ = পুরুষার্থ, পুরুষের প্রয়োজন। পুরুষার্থ = ভোগ এবং অপবর্গ।

অপবর্গের কথা পরে বলা যাইবে। পুরুষ বাহ্য জগৎ ভোগ

করিবেন বলিয়া করণ সমূহের স্বীয় স্বীয় বৃত্তি। বৃত্তির মূলে যে সমবেত অভিপ্রায় সে অভিপ্রায় হইতেছে যে পুরুষ জগৎকে ভোগ করুক।

ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্। কর্ম্মবাচ্য। করণ কাহারও দ্বারা কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় না। কেহ বা কোন কর্ত্তা করণদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করায় না। আকৃত = স্বকার্য্য জননে আভিমুখ্য (বাচস্পতি মিশ্র)।

অর্থ :—করণ সকল স্বীয় স্বীয় বৃত্তি লাভ করে। সেই বৃত্তির মূলে করণদিগের পরস্পরের সমবেত অভিপ্রায় আছে। পুরুষেব ভোগসাধন জন্যই করণদিগের এই আকৃতি। কোন স্বতন্ত্র কর্ত্তা করণদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে না। প্রকৃতি পুরুষেব ভোগের জন্য ব্যক্ত হয়েন, যেই তিনি ব্যক্ত হয়েন, তখন তাঁহার যত কিছু পবিণাম পুরুষের ভোগ জন্মাইবার উদ্দেশ্যে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। করণের বৃত্তি ও প্রকৃতির পরিণাম।

হারু কালু প্রভৃতি আত্ম এবং অনাত্ম বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ কি ভাবে প্রকাশ করে? হারু সচরাচর যাহা প্রকাশ করে তাহা বিশ্লেষণ কবিলে মোটামুটি এইরূপ পাওয়া যায়।

আমি চোখ দিয়া গাছ দেখিতেছি ;
আমি হাত দিয়া রুটি করিতেছি ;
আমি দেহ ধরিয়া আছি ;
আমি মনের দ্বারা চিন্তা করি, ইত্যাদি

চোখের দ্বারা দেখি সেইজন্য চোখের নাম করণ ; মনের দ্বারা চিন্তা করি, অতএব মনও করণ জাতীয়। হস্ত বা পাণি দ্বারা রুটি করি সেইজন্য পাণিও করণ। করণ বা ইন্দ্রিয়, শক্তি বিশেষ ; শক্তি স্বয়ং প্রত্যক্ষ না হইলেও উহার অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ হয়। চক্ষু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ঐ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ''চোক'কে প্রত্যক্ষ করি। পাণি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ঐ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান হস্তকে প্রত্যক্ষ করি। যে সকল ইন্দ্রিয় বা করণের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাদিগকে বাহ্য করণ বলে। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনও করণ, কেননা আমরা মনের দ্বারা চিন্তা করি। মনের অধিষ্ঠান মস্তিষ্ক আমাদিগের

প্রত্যক্ষ হয় না; উহার অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে বা অন্তরে; এইজন্য মনকে অন্তর করণ বা অন্তঃকরণ বলা যায়। অন্তঃকরণের তিন ভাব, যথা বুদ্ধি, অহংকার এবং মন। তিন ভাবযুক্ত অন্তঃকরণকে আমরা সচরাচর মন বলিয়া উল্লেখ করি, যথা সোণার বালা, সোণার কন্ঠি সমস্তকেই সোণার গহনা বলি। চিত্তও অন্তঃকরণের একটি নাম।

যখন বলি "আমি আম গাছ দেখিতেছি" তখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—কি দিয়া দেখিতেছ? তাহা হইলে উত্তর হইবে 'চক্ষুর দ্বারা'। যখন বলি "আমি দেহ ধরিয়া আছি" তখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কি দিয়া ধরিয়া আছ? তাহা হইলে উত্তর হইবে "ভিতরের শক্তি দিয়া।" আমরা অন্তঃকরণের (প্রাণবৃত্তির বা শক্তির) দ্বারা দেহ ধারণ করিয়া আছি। প্রাণের বিষয় ২৯ কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

আহরণ শব্দ হৃ ধাতু হইতে হইয়াছে; হরণ অর্থ আমার যাহা নহে তাহা নিজের করা, স্থানান্তরিত করা। আ উপসর্গের যোগে 'হৃ' ধাতুর কিছু পরিণাম ঘটিয়াছে। পাণি বাহ্য বস্তু স্থানান্তরিত করে; বাক্ ও বায়ুকে স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়। পায়ু শরীরের গ্লানি স্থানান্তরিত করে। আহরণ অর্থ কর্ম্ম বিশেষ। 'পা' ধাতুর অর্থ পান করা। 'পা'র বিশেষ্য পান। আ—হৃ ধাতুর বিশেষ্য আহরণ। জল হইতেছে পেয় বা পানের বিষয়, পা ধাতু ঞ্য প্রত্যয়ে পেয় সিদ্ধ হইতেছে। পা ধাতু হইতে পান শব্দ হয়; তাহার বিষয়কে বলে পেয়। সেইরূপ আ পূর্ব্বক হৃ ধাতু হইতে যে আহরণ শব্দ হয় তাহার বিষয়কে বলে (আ+হৃ+ঞ্য) আহার্য্য।

রাজা শান্তনু ধীবরকন্যাকে দেখিলেন নদীতটে। তিনি রাজপুরীতে আসিয়া বিজন মন্দিরে বসিয়া ধীবরকন্যাকে দেখিতে লাগিলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। কেন তিনি বস্তু সম্মুখে অবিদ্যমান থাকিলেও বস্তুকে বিদ্যমান দেখিলেন? উত্তর—সংস্কার ও স্মৃতি। সংস্কার নিদ্রিত জ্ঞান, স্মৃতি প্রবুদ্ধ বা জাগ্রত জ্ঞান। সংস্কার বা স্মৃতি একই বস্তু বা একই ছেলে, সংস্কার ঘুমন্ত ছেলে, স্মৃতি

জাগ্রত ছেলে, একই বস্তুর এক ভাবের নাম সংস্কার অন্য ভাবের নাম স্মৃতি। প্রত্যক্ষ যতটা স্পষ্ট ও পরিস্ফুট সংস্কার তত নয়, কিন্তু এইরূপ দেখা যায় যে প্রত্যক্ষ যে সকল খুঁটিনাটি ভাল করিয়া দেখিতে পায় না, সেই সকল খুঁটিনাটি সংস্কারে ধৃত হইয়া থাকে। তোমার ফটোগ্রাফ তুলিলাম, তোমার চোখ দেখিয়া এতদুর মুগ্ধ হইয়াছি যে তোমার চোখের নিকট যে নাক সেই নাকের নাকছাবি দেখিয়াও দেখি নাই অথচ ফটোগ্রাফ সেই নাকছাবি ধরিয়া রহিয়াছে। সংস্কার ফটো-গ্রাফের তুল্য। প্রত্যক্ষে নাকছাবি দেখিয়াও দেখি নাই, অথচ স্মৃতিতে নাকছাবি ফুটিয়া উঠে। সংস্কার মানে মনে বাহ্য বস্তুর যে ফটোগ্রাফ থাকে।

গায়ক গান গাহিল,—শুনিলাম, সেই সঙ্গে কলের গানের রেকর্ডে কতকগুলি দাগ পড়িল। গায়ক স্থানান্তরে, রেকর্ড ঘুরিতে লাগিল, গায়কের গান 'কাছে থাকা' গানের তুল্য শুনিতে পাইলাম। মধ্যাহ্নে গাছ ও চোখের সংযোগ হইল, তারপর আস্তে আস্তে বৃক্ষ জ্ঞান হইল। বৃক্ষ জ্ঞান অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম রেকর্ডে দাগ রাখিয়া গেল অর্থাৎ মনে সংস্কার থাকিয়া গেল। নিশীথে রুদ্ধ ঘরে সেই গাছ দেখিয়া আবার বৃক্ষ জ্ঞান হইল। মধ্যাহ্নের গাছ স্থূল, নিশীথের গাছ কাছে না থাকিলেও কাছে থাকার মতন, অতএব ইহা সূক্ষ্ম। গাছ বা বিষয় দ্বিবিধ, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম। বিষয় পঞ্চধর্ম্মাত্মক অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দময়। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে বিষয় দশবিধ, যথা স্থূল রূপরসাদি এবং সূক্ষ্ম রূপরসাদি। স্থূলরূপ, স্থূলরস, স্থূলগন্ধ, স্থূলস্পর্শ, স্থূলশব্দ, সূক্ষ্মরূপ, সূক্ষ্মরস, সূক্ষ্মগন্ধ, সূক্ষ্মস্পর্শ, এবং সূক্ষ্মশব্দ এই দশ বিষয় বা কার্য্য। আমরা স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয়বিধ বিষয়কে ব্যবহার করি।

৩২

করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণধারণপ্রকাশকরম্।
কার্য্যঞ্চ তস্য দশধাহার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ ॥

পদপাঠ—করণং ত্রয়োদশবিধং, তৎ আহরণ ধারণ প্রকাশকরম্।
কার্য্যম্ চ তস্য দশধা, আহার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যম্ চ ॥

অন্বয়—বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবে না।

করণম্—"যাহা দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাকে করণকারক বলে।" কর্ত্তা যদ্দ্বারায় কিছু করেন তাহা করণ। করণ=ইন্দ্রিয়।

ত্রয়োদশবিধং=তের রকমের। তের রকমের করণ আছে। তিন অন্তঃকরণ এবং দশ বাহ্য করণ। বুদ্ধি, অহংকার এবং মন এই তিনকে অন্তঃকরণ বলা যায়। চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ এই পাঁচ জ্ঞানের ইন্দ্রিয়, এবং বাক্, পাণি, পদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মের ইন্দ্রিয়, সর্ব্বসমেত দশ ইন্দ্রিয়কে বাহ্য করণ বলা যায়।

তৎ=(করণ) তাহা; করণ কি প্রকার, না—আহরণ ধারণ প্রকাশকরম্।

আহরণ ধারণ প্রকাশকরম্=করণের বিশেষণ পদ। করণে আহরণ করে, ধারণ করে এবং প্রকাশ করে। আহরণ শব্দের অর্থ কর্ম্ম-বিশেষ। কর্ম্মেন্দ্রিয় আহরণ করে, জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রকাশ করে, এবং অন্তরিন্দ্রিয় সর্ব্ববিধ জ্ঞান কর্ম্মের সংস্কার ধরিয়া রাখে, স্বীয় প্রাণ বৃত্তির দ্বারা শরীর ধরিয়া রাখে।

তস্য=কারণের; কার্য্যম্ চ=কার্য্যও, কি বলে তাহাদিগকে—না, আহার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যম্ চ, করণের কার্য্য বা বিষয়ও ত্রিবিধ। আহরণের বিষয়কে আহার্য্য, ধারণের বিষয়কে ধার্য্য এবং প্রকাশের বিষয়কে প্রকাশ্য বলা যায়।

কার্য্যম্ দশধা—কার্য্যম্ বা বিষয় পঞ্চধর্ম্মাত্মক, অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দময়; শরীর প্রাণবৃত্তির দ্বারা ধার্য্য, ঘট পাণি দ্বারা আহার্য্য, চন্দ্র চক্ষু দ্বারা প্রকাশ্য। রূপ রসাদির দুই অবস্থা স্থূল ও সূক্ষ্ম; স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে কার্য্য বা বিষয় দশধা বা দশবিধ। জাগ্রত অবস্থার বৃক্ষ স্থূল ও বাহ্য; স্বপ্নের বৃক্ষ সূক্ষ্ম এবং আভ্যন্তর।

অর্থ—করণ ত্রয়োদশবিধ। তাহারা আহরণ করে, ধারণ করে এবং প্রকাশ করে। তাহাদের কার্য্য—আহার্য্য ধার্য্য এবং প্রকাশ্য। বিষয় সকল স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দশবিধ, যথা স্থূলরূপ, সূক্ষ্মরূপ, স্থূল শব্দ, সূক্ষ্ম শব্দ ইত্যাদি।

৩৩

অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যং ত্রয়স্য বিষয়াখ্যম্।
সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালম্ আভ্যন্তরং করণম্॥

পদপাঠ—কোন সন্ধি নাই, যাহা কেবল (ম্) স্থানে (ং)।

অন্বয়ঃ—অন্তঃকরণং ত্রিবিধং, ত্রয়স্য বিষয়াখ্যং বাহ্যং দশধা।
বাহ্যং সাম্প্রতকালম্, আভ্যন্তরং ত্রিকালম্ করণম্॥

ত্রিবিধং—অন্তঃকরণ ত্রিবিধ যথা বুদ্ধি অহংকার এবং মন।

বাহ্যং—বাহ্যকরণ; দশধা=দশবিধ—৫টি ৫ প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে এবং ৫টি জ্ঞানে নিযুক্ত থাকে। এই বাহ্য করণের সহিত অন্তঃ-করণের কি কিছু সম্বন্ধ আছে—যে সম্বন্ধ ইতিপূর্ব্বে বলা হয় নাই?—আছে। কি তাহা? ত্রয়স্য বিষয়াখ্যম্।

ত্রয়স্য=উক্ত অন্তঃকরণত্রয়ের।

বিষয়াখ্যম্=বিষয় যাহার আখ্যা তাহা বিষয়াখ্য।

বিষয়—যেমন শব্দ স্পর্শাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, সেইরূপ বাহ্য করণেরাও অন্তঃকরণের বিষয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণ উহাদের সহিত ব্যবহার করে। শব্দাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তঃকরণে প্রবেশ করে। কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা অন্তঃকরণের ভাব বাহিরে প্রকাশ পায়। বাহ্য করণেরা উক্ত তিন অন্তঃকরণের বিষয় সাধক। বাহ্য করণেরা অন্তঃকরণের দ্বার স্বরূপ। বাহ্য করণের একরূপ কাজ, অন্তঃকরণের কাজ অন্যরূপ। কি প্রকার?

বাহ্যং সাম্প্রতকালং, আভ্যন্তরং হইতেছে ত্রিকালম্।

আভ্যন্তরং=আভ্যন্তর করণ বা অন্তঃকরণ।

সাম্প্রত কালম্=সমীপস্থ বিদ্যমান বিষয়ী; বাহ্য সমীপস্থ বিদ্যমান বিষয়েই কার্য্য করে, উপস্থিত বিষয়ই গ্রহণ করে। বাহ্যের বিষয় বর্ত্তমান কালব্যাপী। এই স্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে সাধারণ জগতে বর্ত্তমানের অতি নিকটবর্ত্তী অতীত কাল—বর্ত্তমান তুল্য।

ত্রিকালম্=অন্তঃকরণ অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালব্যাপী।
অন্তঃকরণ অবিদ্যমান এবং অসমীপস্থ বিষয়ও গ্রহণ করে।

অর্থ—তিন অন্তঃকরণ, দশ বাহ্য করণ। বাহ্যকরণ অন্তঃকরণের বিষয়।

অন্তঃকরণ যে সমুদায় উপাদান লইয়া কার্য্য করে, বাহ্যকরণ দ্বারা সেই সকল উপাদান সংগৃহীত হয়। বাহ্য করণ কেবলমাত্র বর্ত্তমান বিষয় গ্রহণ করে, কিন্তু অন্তঃকরণের ক্ষমতা অনেক। উহা কেবলমাত্র বর্ত্তমান নহে, অতীত এবং ভবিষ্যৎ বিষয় লইয়া ব্যাপার করে।

৩৪

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষাবিশেষবিষয়াণি।
বাগ্‌ ভবতি শব্দবিষয়া শেষাণি তু পঞ্চবিষয়াণি॥

পদপাঠ—বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষ অবিশেষ বিষয়াণি।
বাক্‌ ভবতি শব্দ বিষয়া শেষাণি তু পঞ্চ বিষয়াণি॥

অন্বয়ঃ—তেষাং পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি বিশেষাবিশেষ বিষয়াণি,
বাক্‌ শব্দ বিষয়া ভবতি; শেষাণি পঞ্চ বিষয়াণি।

তেষাং=তাহাদিগের মধ্যে, ১০ বাহ্যকরণগণের মধ্যে।

পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি=৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি, তাহারা কিরূপ? বিশেষাবিশেষ বিষয়াণি—বিশেষ এবং অবিশেষ যাহার বিষয় তাহা বিশেষা বিশেষ বিষয়; তাহার বহুবচন, (ফলম্‌, ফলে, ফলানি) বিষয়াণি। বিশেষ এবং অবিশেষ বিষয় কি? শব্দ স্পর্শাদির নাম ইন্দ্রিয়ের গোচর বা বিষয়।

বিশেষ=স্থূল; অবিশেষ=সূক্ষ্ম। স্থূলকে বিশেষভাবে দেখান যায়, এই জন্য স্থূলকে বিশেষ বলে। সা, রে, গা, মা স্থূল। কিন্তু কেবল শব্দ সূক্ষ্ম। তুমি আমি সা, রে, গা, কোমল শুনিয়া কত কথা বলি। কিন্তু সঙ্গীতবিদ্‌ সা, রে, গা, মা প্রভৃতিতে কেবলমাত্র বাতাসের ঢেউ দেখিয়া থাকেন। সুধীরা ২৪ বার কম্পনকে 'সা', ২৭ কম্পনকে রে, ৩০ কম্পনকে গা, ৩২ কম্পনকে মা, ৩৬ কম্পনকে পা, ৪০ কম্পনকে ধা, ৪৫ কম্পনকে নি, এবং ৪৮ কম্পনকে মুদারার সা বলিয়া দেখেন, এবং উহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রুতি শ্রবণ করেন। আমরা শব্দকে স্থূল শুনি, গুণিজনেরা শব্দকে সূক্ষ্ম ভাবে দেখেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় স্থূল এবং সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূত তন্মাত্র নহে। এই বার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বলা হইতেছে।

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়। বাক্, (স্ত্রীলিঙ্গ), ভবতি=হয়; শব্দবিষয়া=শব্দ যাহার বিষয় তাহা শব্দ-বিষয়; স্ত্রীলিঙ্গে শব্দবিষয়া। বাক্ কেবল মাত্র শব্দ লইয়া কারবার করে।

শেষাণি=শেষ কয়টি অর্থাৎ বাক্ ছাড়া আর যে কয়টি। তাহারা কে? পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ। বাক্ কর্ম্মেন্দ্রিয়, হস্তপদ প্রভৃতি-রাও কর্ম্মেন্দ্রিয়, কিন্তু বাকের বৃত্তি এবং অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তির মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

শব্দবিষয়া=বাকের বিষয় শব্দ। শব্দ যাহা অন্তঃকরণকে অনুবাদ করে—সেই শব্দ উচ্চারণ এবং পায়ুর মলত্যাগ এই দুয়ে কত প্রভেদ!

তু=কিন্তু, বাক্ শব্দবিষয়া হইলেও ইহার অন্যান্য কর্ম্মবন্ধুগণ কিন্তু। কিন্তু কি? তাহারা পঞ্চবিষয়াণি, পঞ্চভূত যাহার বিষয় তাহা পঞ্চবিষয়। তাহাদের বিষয় ভৌতিক।

পঞ্চভূতের সমষ্টি যথা ঘট, পট, মঠ ইত্যাদি।

অর্থ—দশ বাহ্য ইন্দ্রিয়েব মধ্যে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় স্থূল ও সূক্ষ্ম। পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়েব মধ্যে বাকের বিষয় স্থূল শব্দ, এবং অবশিষ্ট কর্ম্মেন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের বিষয় একেবারে গোটা জড়বস্তু, তাহারা ঘটাদি ভৌতিক বস্তুর সহিত ব্যবহার করে।

৩৫

সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি॥

পদপাঠ—স অন্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়ম্ অবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি॥

অন্বয়ঃ—যস্মাৎ সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়ম্ অবগাহতে,
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি, শেষাণি দ্বারাণি।

যস্মাৎ=যে হেতু

সান্তঃকরণা:—স=সহিত, অন্তঃকরণ, যাহা অন্তঃকরণের সহিত আছে তাহা সান্তঃকরণ। বুদ্ধির বিশেষণ। মন এবং অহংকার এই

দুই অন্তঃকরণ যুক্ত যেবুদ্ধি। সে কি করে? সর্ব্বং বিষয়ম্ অবগাহতে সমস্ত বিষয়কে স্নান করায়; (নিশ্চয় করায়)। বুদ্ধি সর্ব্ববিধ বিষয়কে স্নান করায়; জলের মধ্যে আনয়ন করে এবং জলের মধ্য হইতে বাহির করে; চক্ষুকর্ণাদি দ্বারা অন্তরে আনয়ন করে, এবং বাক্ পাণি দ্বারা বাহিরে প্রকাশ করে।

বিষয়=দশ বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়। প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিই কর্ত্তা। মন এবং অহংকার বুদ্ধির করণমাত্র। অন্তঃকরণে যাহা হয় বাক্ তাহা বাহির করে।

তস্মাৎ=সেই হেতু।

ত্রিবিধং করণং—অর্থাৎ বুদ্ধি এবং তাহার দুই সহচর মন এবং অহংকার। এই তিন করণ দ্বারী, এবং শেষাণি অর্থাৎ অবশিষ্ট করণ সমূহ তাহারা হইতেছে দ্বারাণি বা দ্বারসমূহ। দ্বারী যেমন দ্বার দিয়া লোকজন ভিতরে আনে এবং লোক জনকে দ্বার দিয়া বাহিরে পাঠায়; অন্তঃকরণ সেইরূপ বাহ্যকরণ দ্বারা বিষয়ের সহিত ব্যবহার করে।

দ্বারী=প্রধান, দ্বার=অপ্রধান। ১৩ করণের মধ্যে তিন অন্তঃ-করণ প্রধান।

অর্থ:—ত্রয়োদশ করণের মধ্যে অন্তঃকরণত্রয় প্রধান। বাহ্যকরণ সমূহ অন্তঃকরণের দ্বারস্বরূপ।

(ক্রমশঃ)

—ওমর

সাংখ্যাচার্য্যগণ সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করের মতামত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রধান সৎ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। আচার্য্য সে সম্বন্ধে আরও কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—

স্বাপ্যয়াৎ ॥ অ ১, পা ১, সূ ৯ ॥

সূত্রার্থ—স্বস্মিন্ অপ্যয়ঃ লয়ঃ তস্মাৎ। সুষুপ্তিকালে জীবস্য স্বস্মিন্ স্বরূপে আত্মনি লয়শ্রবণাৎ ন সৎশব্দবাচ্যং প্রধানমিতি সূত্রাক্ষরাণামর্থঃ। "সুষুপ্তিকালে জীব আপন স্বরূপে লীন হয়, সে স্বরূপ সৎ ও আত্মা, সুতরাং সৎশব্দ আত্মারই বাচক, প্রধানের বাচক নহে।" (তত্ত্ব-জ্ঞানামৃত)।

ভাষ্য তাৎপর্য্য। সিদ্ধান্ত-পক্ষ—শ্রুতি, জগৎ-কারণকে সৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, যথা—যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি, স্বমপীতো ভবতি; তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতি ইতি (ছা, ৬, ৮, ১), "সুপ্তিকালে এই পুরুষের 'স্বপিতি' নাম হয় এবং সেই সময়ে ইনি সৎ সম্পন্ন বা স্বরূপ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ তিনি সতের সহিত একীভূত হন। যেহেতু ইনি স্বরূপে অপীত হন, লীন হন, সেই হেতু ইঁহাকে 'স্বপিতি' বলে।" ইহার দ্বারা পুরুষ বা আত্মার স্বপিতি নামের ব্যুৎপত্তি দেখান হইল। এখানে স্বশব্দে—আত্মা। অতএব যাহা লইয়া প্রকরণ আরম্ভ তাহাই সৎ শব্দের অর্থ হওয়া উচিত। অপি+ই (লয়ে) -অপ্যয়।

পূর্ব্ব-পক্ষ—সুপ্তি কি ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—বাহ্য বস্তু সংস্পর্শে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের বিষয়াকারা বৃত্তি হইয়া থাকে (অর্থাৎ যেরূপ বস্তু দেখিতেছি, সেইরূপ আকারের বৃত্তি মনে উদিত হয়); সেই সকল মনোবৃত্তিকে মনঃপ্রচার বলে। আত্মা সেই মনঃপ্রচারে উপহিত অর্থাৎ তত্তৎভাব প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল

বিষয় গ্রহণ করতঃ জাগ্রৎ আখ্যা প্রাপ্ত হন। আবার তিনিই সেই জাগ্রদ্বাসনাবিশিষ্ট মনোমাত্রে উপহিত হইয়া স্বপ্ন অনুভব করেন (অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করেন তাহার সংস্কার মনের মধ্যে থাকে। যখন জড়তা বশতঃ নিদ্রাকর্ষণ হয়, তখন অন্তঃকরণস্থিত বাসনা বা ইচ্ছা বলে সেই সকল সংস্কার লইয়া আত্মা স্বপ্নময় রাজত্ব সৃষ্টি করেন। তমের আধিক্যবশতঃ জাগ্রত ও স্বপ্ন এই দুই উপাধিও যখন অস্পষ্ট বা বিলীন হইয়া যায় তখনই আত্মা সুপ্ত হন। এই অবস্থায় মনের বৈচিত্র্য থাকে না, সূক্ষ্ম অজ্ঞানবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি থাকে না, সেই হেতু ঐ সময়ে আত্মা বিস্পষ্ট ও বিচিত্র মনোবৃত্তিরূপ উপাধির অভাবে আপন স্বরূপ প্রাপ্তের ন্যায় হন অথবা আপনাতে যেন আপনি লীন হন। মনোবৃত্তির যখন লয় হয়, তখন যেন আত্মার স্বরূপ প্রাপ্তি হয় এবং মনের প্রচারে আত্মার প্রচার বা উত্থান আমরা কল্পনা করি মাত্র।

শ্রুতি 'স্বপিতি' শব্দের দ্বারা আত্মাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন—স্বং অপীতোভবতি (ছা, উ, ৬, ৮, ১) অর্থাৎ তিনি যেন আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হন, সেই হেতু তাঁহাকে স্বপিতি বলা যায়। শ্রুতি হৃদয় শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতেছেন, হৃদি অয়ং হৃদয়ং (ছা, উ, ৮, ৩, ৩,) যেহেতু সেই আত্মা এই হৃদয়ে, সেই হেতু ইঁহার অন্য নাম হৃদয়। তথা, জল অশিত দ্রব্য বা ভুক্তান্ন দ্রব করিয়া জীর্ণ করে, পরিপাক করে সেই হেতু তাহাকে অশনায় বলা হয় (ছা, ৬, ৮, ৩)। তেজঃ পীত জল শোষণ করে, সেই হেতু তাহাকে উদন্য বলা হয় (ছা, ৬, ৮, ৫)। পরিপাক হইলে ক্ষুধা বা ভোজনের ইচ্ছা হয় সেই হেতু লৌকিক অভিধানে অশনায়া অর্থে বুভুক্ষা ও তেজ দ্বারা পীত জল শুষ্ক হইলে পুনরায় জলপানের ইচ্ছা হয় বলিয়া উদন্যা শব্দে পিপাসাও বুঝায়। এই ভোজন ও পিপাসার ইচ্ছা হয় আত্মার, উদর বা জিহ্বার নহে।

সেই হেতু আত্মা প্রকৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হন, অচেতন হন, ইহা সম্ভব নহে। যাহা চেতন তাহা কখনও অচেতন হইতে পারে না। স্ব-শব্দের আত্মসম্বন্ধীয় অর্থ হইতে পারে, কিন্তু এস্থলে আত্ম-সম্পর্ক-বিশিষ্ট-প্রকৃতি এরূপ টানিয়া অর্থ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। অতএব যিনি

অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থাত্রয় এবং যে চৈতন্তে সমুদয় জীবের বা জীবধর্ম্মের অপ্যয় হয়, সেই ঈশ্বর-চৈতন্যই সৎ-শব্দের বাচ্য ও জগতের আদি কারণ। আরও কারণ আছে—

গতিসামান্যাৎ ॥ অ ১, পা ১, সূ ১০॥

সূত্রার্থ—গতিঃ অবগতিঃ। তস্যাঃ সামান্যং সমানতা। তস্মাৎ। যস্মাৎ সর্ব্বেষ্বপি বেদান্তবাক্যেষু সমানা চেতনকারণাবগতিঃ, তস্মাচ্চেতন এব জগৎকারণং নান্যদিতি সূত্রার্থঃ।—"যে হেতু সমুদায় সৃষ্টিবোধক বেদান্ত বাক্যে সমান রূপে চেতনেরই জগৎ-কারণতা প্রতীত হয়, সেই হেতু চেতন ব্রহ্মই জগৎ-কারণ, অন্য কিছু (প্রধান বা পরমাণু প্রভৃতি) নহে।" (তত্ত্বজ্ঞানামৃত)।

ভাষ্য তাৎপর্য্য। সিদ্ধান্ত-পক্ষ—যাঁহারা অনুমানকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই; কোনও তার্কিক বলেন—চেতন ঈশ্বর জগতের কারণ, কেহ বলেন—অচেতন প্রধান, আবার কেহ বা বলেন—পরমাণু। কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে এরূপ বিভিন্ন জগৎ-কারণতা না থাকায় প্রকৃতি-কারণবাদ রক্ষার জন্য ঈক্ষণ ক্রিয়া মহতে আরোপ করিতে পার না। নিরপেক্ষ ভাবে বুঝিয়া দেখ সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রে জগতের চেতন কারণতাই নির্দ্দেশ করিতেছে। "যথাঽগ্নের্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ" ইতি (কৌ, উ, ৩, ৩), "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি (তৈ, উ, ২, ১), "আত্মত এবেদং সর্ব্বম্" ইতি (ছা, ৭, ২৬, ১), "আত্মন এষ প্রাণো জায়তে" ইতি (প্রশ্ন, ৩, ৩), "যদ্রূপ জ্বলমান বহ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয়, হইয়া সর্ব্বদিকে গমন করে, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে প্রাণ সকল আবির্ভূত হইয়া স্বস্ব স্থানে গিয়া স্থিতি করে। এইরূপ প্রাণসৃষ্টির পর তদনুগ্রাহক দেবতার (সূর্য্যাদির) সৃষ্টি হয়, এবং সেই সেই সৃষ্ট দেবতা হইতে লোক অর্থাৎ ভোগ্য সকল জন্মে।" "সেই আত্মা হইতেই এই আকাশ আবির্ভূত হইয়াছে।" "যা কিছু জ্ঞেয় বা যা কিছু জ্ঞানগম্য সমুদয়ই আত্মা হইতে হইয়াছে।" "এই প্রাণ

আত্মা হইতেই জন্মে।" ইত্যাদি বহু ঋষি, নানা কালে, নানা দেশে, স্বাধীন প্রচেষ্টা এবং স্ব স্ব আচার্য্য সাহায্যে যে সত্যকে অনুভব করিয়াছিলেন তাহা এক এবং উহা জগতের চৈতন্য-কারণতা, কিন্তু তার্কিকেরা নানা কালে, নানা দেশে অনুমানের দ্বারা জগৎ-কারণতা সম্বন্ধে যে নিগমন করিয়াছেন তাহা পরস্পর বিরোধী। যেমন রূপাদি বিষয়ে চক্ষুরাদির সমান গতি সেই হেতু রূপাদি জ্ঞানে চক্ষুরাদি প্রামাণ্য অটল,—অর্থাৎ একজনের চক্ষু যাহা দেখিতেছে, অপর লোকের চক্ষুও যদি তাহাই দেখে তাহা হইলে তাহাকে যেমন আমরা সত্য বলি, তেমনি চেতন-জগৎ-কাবণতা বিষয়েও বেদান্ত বাক্য সমূহেব সমান গতি এবং সেই সমান গতিত্ব হেতুতে তত্তাবতেব প্রামাণ্যও অকাট্য। অর্থাৎ সমাধিলব্ধ বিভিন্ন ঋষির জ্ঞান যখন এক পদার্থেরই নির্দ্দেশক, তখন তাহা সত্যই)। অপর কারণ—

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ অ ১, পা ১, সূ ১১ ॥

সূত্রার্থ—সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং প্রকৃত্য, স সর্ব্বজ্ঞঃ কাবণমিতি শ্রুত্যা অভিহিতত্বাৎ নাচেতনং প্রধানং জগৎকাবণমিতি। "শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎ-কারণ এইরূপ অভিহিত বা উক্ত হওয়ায় চেতন ব্রহ্মই জগৎ-কারণ, অচেতন প্রধান জগৎ-কাবণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয়।" (তত্ত্ব-জ্ঞানামৃত)।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—"ঈশ্বরই জগৎ-কারণ" এ কথা শ্রুতি স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বের কথা বলিতে গিয়া বলিতেছেন, "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।" ইতি (শ্ব, উ, ৬, ৯) "সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কারণ এবং জীবগণের অধিপতি। তাঁহার জনক নাই এবং অধিপতিও নাই।"

(২)

এক্ষণে দেখান হইবে সাংখ্যের কয়েকটি শব্দ যাহা শ্রুতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা ভিন্নার্থক।

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন, শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দর্শয়তি চ ॥
অ ১, পা ৪, সূ ১ ॥

সূত্রার্থ—আনুমানিকং অনুমাননিরূপিতং অপি প্রধানং একেষাং

শাখিনাং কঠশাখিনামিতি যাবৎ শব্দবদুপলভ্যতে ইতি শেষঃ। চেৎ যদি শব্দ্যতে তন্মা শঙ্কিষ্টৈত্যর্থঃ। হেতুমাহ শরীরেতি। তত্র তৎ শরীর-রূপকবিন্যস্ততয়া গৃহ্যতে ন তু সাংখ্যপ্রসিদ্ধেন ত্রিগুণাদিত্বেন। সাংখ্য-প্রসিদ্ধং প্রধানং তত্র নোক্তং ততশ্চ তস্যাবৈদিকত্বমেব স্থিতমিতি ভাবঃ। দর্শয়তি রূপকং সাদৃশ্যং এব দর্শয়তি শ্রুতিরিতি যোজ্যম্।—"প্রধান অনুমান-গম্য সত্য; কিন্তু কোন কোন শাখায় তাহার উল্লেখ দেখা যায়। তদ-নুসারে তাহা শব্দ অর্থাৎ বৈদিক, এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই যে, সেখানে তাহা শরীরসম্বন্ধীয় রূপক বর্ণনার নিমিত্ত কথিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়, সুতরাং তাহা সাংখ্যের প্রধান নহে। শ্রুতিও রূপক বা সাদৃশ্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন বা দেখাইয়াছেন।" (তত্ত্বজ্ঞানামৃত)

পূর্ব্বপক্ষ—পূর্ব্বে যে প্রধানের অবৈদিকত্ব নিরূপণ করিয়াছ তাহা অসিদ্ধ। কারণ কোন কোন শাখায় অনুমানগম্য হইলেও উহা শাব্দ বা বেদসিদ্ধের ন্যায় দেখা যায়। কঠ শাখায় এইরূপ মন্ত্র আছে, "মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" (কঠ, উ, ৩, ১১) "মহতের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পরম পুরুষ।" সাংখ্য দর্শনেও এই ক্রম (মহৎ-অব্যক্ত-পুরুষ) দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা শব্দাদি বর্জ্জিত, যাহা ব্যক্ত নহে তাহাই অব্যক্ত, এইরূপ ব্যুৎপত্তির সহিত সাংখ্য পরিচিত। তবে প্রধান শব্দটিকে অবৈদিক কি করিয়া বলিতেছ? অতএব যতক্ষণ না সেই সকল শব্দের অন্য পদার্থ বোধকতা (ভিন্ন অর্থ) স্থির করিতে না পারিতেছ, ততক্ষণ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা সিদ্ধ হয় না বা স্থির হয় না।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—কঠ শ্রুতি ও সাংখ্যে কয়েকটি শব্দের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় সত্য কিন্তু উহার দ্বারা তাহাদের অর্থের প্রত্যভিজ্ঞা বা একতা সম্পাদন হয় না। যাহা ব্যক্ত নহে তাহাই অব্যক্ত। এক্ষণে এই অব্যক্ত শব্দটির যোগার্থ লইয়া আমরা যে কোনও সূক্ষ্ম, দুর্জ্ঞেয়, দুর্লক্ষ্য পদার্থে প্রয়োগ করিতে পারি। ইহাকে রূঢ়ি অর্থে প্রয়োগ করিয়া সাংখ্যের পরিভাষা বা প্রধানকেই লক্ষ্য করিতে হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই। ক্রম সমান হইলেই যে অর্থও সমান হইবে এরূপ কোনও হেতু নাই। কোন্ মূঢ় অশ্ব স্থানে গোকে দেখিয়া তাহাকে অশ্ব বলিয়া নির্ণয় করিবে?

যে স্থল হইতে কঠ শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে সেই স্থলের প্রকরণ পর্য্যালোচনা (অর্থাৎ কি বিষয় লইয়া আলোচনা হইতেছে) করিলে সাংখ্য-কল্পিত প্রধানের প্রতীতি হইবে না। ঐ স্থল পাঠ করিলে বুঝা যায় "শরীর"কে রূপক ভাষায় বর্ণনা করিতে গিয়া সাংখ্যের প্রধানের অনুরূপ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শরীরের সহিত রথের তুলনা করা হইয়াছে। কঠশ্রুতি অব্যক্ত শব্দ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বেই, আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব এবং শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় সমূহকে তাহার গোচর (বিচরণ স্থান) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনীষীরা বলেন, আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন এই ত্রিতয়ের নাম ভোক্তা। ঐ সকলের যদি সংযম না করা যায় তাহা হইলে জীব সংসারে নিপতিত হয়। যাহারা উহাদের সংযত করে তাহারা বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। তাহার পর প্রশ্ন হইয়াছে বিষ্ণুর পরম-পদ কি ? তখন ইন্দ্রিয়াদির পর পর উল্লেখ করিয়া পথের সমাপ্তির স্থলে বিষ্ণুর পরম-পদ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ কঠ, উ, ৩।৩
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩।৪

* * *

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৩।৯
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ৩।১০
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ৩।১১

"আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সমূহকে তাহার গোচর স্থান (ভ্রমণস্থান) বলিয়া জান। মনীষিগণ বলিয়াছেন, আত্মা, ইন্দ্রিয় ও

মন, মিলিত এই ত্রিতয়ের নাম ভোক্তা।" "যে নরের মনোরূপ লাগাম বিজ্ঞান সারথি কর্ত্তৃক ধৃত হয় সেই পথের পরপারে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়।" "ইন্দ্রিয়ের পর অর্থ (বিষয়), অর্থের পর মন, মনের পর বুদ্ধি, বুদ্ধির পর মহান্ আত্মা, মহান্ আত্মার পর অব্যক্ত (কর্ম্মবীজ বা কার্য্যসংস্কার), অব্যক্তের পর পরম পুরুষ (কেবল চিৎ) পুরুষের পর বা পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই। পুরুষই চরম, পুরুষই গন্তব্য পথের শেষ সীমা।" পূর্ব্বে যাহা অলঙ্কারে বলা হইয়াছে, তাহারই পর শ্লোকে সাধারণ ভাষায় ক্রম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহা না হইলে প্রকৃত পরিত্যাগ ও অপ্রকৃত গ্রহণ এই দুই দোষ হইবে। পর শ্লোকের ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও আগের শ্লোকের ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির সহিত সমান। শ্রুতি বলিতেছেন, ইন্দ্রিয় সকল গ্রহ এবং বিষয় অতি-গ্রহ। ইন্দ্রিয় সকল বিষয়ের দ্বারাই নির্ম্মিত এই হেতু বিষয় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার এবং বিষয়ের গ্রহণ হয় এই হেতু বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। মন বুদ্ধির দ্বারা নিয়মিত না হইলে বিষয় জ্ঞান হয় না এই হেতু বুদ্ধি মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহান্ আত্মা (মহৎ = মূল বুদ্ধি বা সমষ্টি বুদ্ধি) ভোগের বা বিষয় জ্ঞানের মূল কারণ এই নিমিত্ত উহা বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সমষ্টি বুদ্ধিকেই স্মৃতি বিভিন্ন স্থলে নাম দিয়াছেন, মন, মহান্, মতি, ব্রহ্মা, পূর, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, সংবিৎ, চিতি, স্মৃতি—

"মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূরবুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।
প্রজ্ঞা সংবিচ্চিতিশ্চৈব স্মৃতিশ্চ পরিপঠ্যতে॥"

এবং শ্রুতিও বলিতেছেন, "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি", (শ্বে, উ, ৬, ১৮) "যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদ প্রদান করিয়াছিলেন," তিনি সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানী হিরণ্যগর্ভ নামে বিখ্যাত, যাঁহার সমষ্টি বুদ্ধি আমাদের সকল ব্যষ্টি বুদ্ধির মূল। এস্থলে ইঁহাকেই মহান্ আত্মা বলা হইয়াছে। ব্যষ্টি বুদ্ধি উল্লেখ করিয়া শ্রুতি আরও স্পষ্টতর করিবার জন্য এই সমষ্টি-বুদ্ধি বা মহান্ আত্মার উল্লেখ করিয়াছেন। এই হেতু বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্-আত্মা শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে

তুলনায় আত্মাই রথী। এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মায় বাস্তবভেদ নাই ইহাও দ্রষ্টব্য। এক্ষণে 'শরীর' অর্থে অব্যক্তকে না বুঝাইলে পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত পর মন্ত্রের সামঞ্জস্য থাকে না। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়, বেদনা এই সকলকে সমবেত ভাবে ধরিয়াই অবিদ্যাযুক্ত জীবের শরীর, রথাদি রূপকে সংসারগতি বা মোক্ষপ্রাপ্তির হেতু বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণে এই রথরূপ শরীরকে অব্যক্ত নামে অভিহিত করার শ্রুতির অন্য একটি কারণ আছে—

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ॥ অ ১, পা ৪, সূ ২॥

সূত্রার্থ—তু-শব্দঃ শঙ্কানিষেধার্থঃ। যত্নুক্তং শরীরমব্যক্তং তৎ সূক্ষ্মং কারণং কারণশরীরমিত্যর্থঃ। ততশ্চ স্থূলত্বাৎ ব্যক্তশব্দার্হং শরীরং কথমব্যক্তশব্দেনোক্তমিতি শঙ্কা ন কার্য্যা। তদর্হত্বাৎ অব্যক্তস্যৈব সূক্ষ্মশব্দযোগ্যত্বাদিতি সূত্রার্থঃ। "শরীরই অব্যক্ত। যে শরীর রথ রূপকে বর্ণিত হইয়াছে, সে শরীর কারণ-শরীর অভিপ্রায়ে কথিত। কারণ-শরীর সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং অব্যক্ত। যাহা যাহা সূক্ষ্ম তাহা তাহাই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য।" (তত্ত্ব জ্ঞানামৃত)

পূর্ব্ব-পক্ষ—প্রকরণ, বাক্যশেষ ও পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া অব্যক্ত শব্দের স্থলে শরীর স্থির করিতেছ কিন্তু অতি ব্যক্ত স্থূল শরীরকে কি অব্যক্ত বা সূক্ষ্মের স্থানে বসান যায়?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ঐ শরীর স্থূল শরীর নয়, কারণ-শরীর। সূক্ষ্ম ও কারণ একই অর্থে প্রযুক্ত হইতে পাবে। যাহা সূক্ষ্ম তাহাকে অব্যক্তও বলা যাইতে পারে। স্থূল শরীরের আরম্ভক সূক্ষ্ম ভূতনিচয় অব্যক্ত শব্দের যোগ্য। বিকার পদার্থকে তাহার প্রকৃতি বাচক শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিতে দেখা যায়, "গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম (ঋ, বে, ৯, ৪৬, ৪), "সোম গাভীর সহিত মিশ্রিত করিবে।" এখানে দুগ্ধের প্রকৃতি গাভী। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এ সকল (ব্যক্ত জগৎ) অব্যাকৃত বা অব্যক্ত ছিল"—"তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ" (বৃ, আ, উ, ১, ৪, ৭)। এই অব্যাকৃত অবস্থা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জনয়িত্রী, নামরূপাদি বীজরূপে বা শক্তিরূপে ইঁহাতেই অব্যক্ত থাকে।

ইনিই ঈশ্বরের কারণ-শরীর। রথ যেমন অশ্ব, বল্গা, সারথি প্রভৃতি লইয়া, সেইরূপ কারণ-শরীরও ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি লইয়া।

তদধীনত্বাদর্থবৎ॥ অ ১, পা ৪, সূ ৩॥

সূত্রার্থ—যথেন্দ্রিয়ব্যাপারস্যার্থাধীনত্বাৎ পরত্বমেবং সূক্ষ্মশরীরাধীনত্বাৎ, বন্ধমোক্ষব্যবহারস্য। অথবা তস্যেশ্বরাধীনত্বাৎ ন কশ্চিদ্দোষ ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ। "সূক্ষ্ম শরীর স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহে ঈশ্বরাধীন, সুতরাং সিদ্ধান্ত হানি দোষ হয় না। আমাদের মতে বন্ধ মোক্ষ ব্যবহার সূক্ষ্ম শরীরের অধীন, সেইজন্য তাহা পর।"

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি অনভিব্যক্ত নামরূপ বা বীজরূপে অবস্থিত সৃষ্টি-প্রকাশের পূর্ব্বের জগৎ অব্যক্ত শব্দের দ্বারাই প্রকাশিত হয় এবং সেইরূপ বীজভূত শরীর বা মূল তত্ত্বকেও অব্যক্ত শব্দের যোগ্য বল তাহা হইলে সেই আমাদের প্রধানকেই ত স্বীকার করিলে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—যদি আমরা স্বতন্ত্রা প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলিতাম তাহা হইলে প্রধানবাদ স্বীকার করা হইত। আমরা যে বীজভূত জগতের পূর্ব্বাবস্থা স্বীকার করি তাহা পরমেশ্বরের অধীন। আবার সে অবস্থা ব্যতীত ঈশ্বরের সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। ব্রহ্ম নিরস্ত-সমস্ত-মায়া বা শক্তি। এই মায়া-শক্তি যোগে তিনি পরমেশ্বর।

পূর্ব্ব-পক্ষ—এই মায়া কি?

সিদ্ধান্ত পক্ষ—এই মায়া দ্বৈত সংসারের বীজভূতা দেশ, কাল, নিমিত্ত, নাম, রূপ, যাহা সর্ব্বব্যাপী, অখণ্ড ব্রহ্মে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায়, জীব জগৎ ও ঈশ্বরের আরোপ করিয়াছে। ইহাকেই আমরা অব্যক্ত বলিতেছি। তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে ইহা অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেহেতু ইহাকে আমরা অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলি। সুষুপ্তিকালে জীব যেমন নিজ বোধশূন্য হইয়া শয়ান থাকে মহাপ্রলয়েও সমগ্র বিশ্ব ইহাতে স্বরূপ প্রতিবোধশূন্য হইয়া অবস্থান করে। সেই হেতু ইহার অপর নাম মহা-সুষুপ্তি এবং এই বীজ-শক্তি পরমেশ্বরের অধীন। শ্রুতি ইহাকে আকাশ শব্দের দ্বারাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" (বৃ, আ, উ, ৩, ৮, ১১) "হে গার্গি! আকাশ কিসে

ওতপ্রোত ?” আবার অক্ষর শব্দের দ্বারাও ইহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” (মু, উ, ২, ১, ২,), “পর অক্ষর হইতেও পর” এবং মায়া শব্দের দ্বারাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, “মায়া স্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম” (শ্বে, উ, ৪, ১০) “মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।” এই অব্যক্ত মায়াশক্তি সৎ কি অসৎ, সত্য কি মিথ্যা, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কি অপৃথক্ নির্দ্দেশ করা যায় না বলিয়া অনির্ব্বচনীয়া। এই অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্ব জন্মে বলিয়া শ্রুতি বলিতেছেন “মহতঃ পরমব্যক্তম্।” হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির নাম মহান্ বা জীবকেও যদি মহান্ বল তাহা হইলেও সঙ্গত হয় কারণ জীব অব্যক্ত বা মায়ার অধীন। মায়াধীন বলিয়াই জীবের জীবত্ব এবং তাহার সমস্ত ব্যবহার সন্তানরূপে বা প্রবাহরূপে সিদ্ধ হয়।

পূর্ব্ব-পক্ষ—শরীর দ্বিবিধ, স্থূল ও সূক্ষ্ম (লিঙ্গ)। শ্রুতি রথোপমায় স্থূল শরীরকে রথ বলিয়াছেন এবং অব্যক্ত শব্দের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ সূক্ষ্ম শরীর অব্যক্ত শব্দের যোগ্য এবং জীবের বন্ধ মোক্ষ ব্যাপার সূক্ষ্ম শরীরঘটিত সেই হেতু জীব তাহার অধীন। অতএব সূক্ষ্ম কারণ-শরীর যাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীরের জনক তাহাকে ধরিবার প্রয়োজন কি? এবং কারণ-শরীর ধরিলে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই তদন্তর্গত হইয়া পড়ে।

সিদ্ধান্ত পক্ষ—শ্রুতি স্থূল ও সূক্ষ্ম বিভাগ না করিয়া শরীর-সামান্যকে রথ বলিয়াছেন ইহাতে স্থূল শরীর অগ্রহণ ও সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ কি করিয়া বুঝিলে ?

পূর্ব্ব-পক্ষ—শ্রুতি বাক্যের অনুযোগ (খণ্ডন) করিতে পারি না সত্য কিন্তু তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা ত করিতে পারি ?

সিদ্ধান্ত—শ্রুতি-বাক্যের অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে এক বাক্যতা নিয়মের অধীন হইতে হইবে, কারণ পূর্ব্বাপর বাক্য এক না হইলে কোন অর্থ স্থির হয় না, তাহাতে প্রকৃত-হানি ও অপ্রকৃতাগম দোষ হয়। বিনা আকাঙ্ক্ষায় বা প্রয়োজনে এক বাক্য অর্থাৎ বহু বাক্য মিলিত করিয়া একার্থবোধক হয় না। উভয় শরীর গ্রহণের যখন আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে

তখন সেইরূপে অন্বয় না করিলে অর্থের দোষ এবং এক বাক্যও হইবে না। শোধন অর্থাৎ দোষের পরিহার করা যায় না বলিয়া সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করিবে। কিন্তু এখানে বাক্য শোধন করিবার কিছুই নাই কারণ এই অব্যক্তের পরই বিষ্ণুর পরম পদের উল্লেখ আছে। অতএব ঐ অব্যক্ত শব্দে ব্রহ্মের নিম্নেই যে মায়া বা অজ্ঞান তাহাকেই বুঝিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

—বাসুদেবানন্দ।

"জীবন-রহস্য"।

(সমালোচনা)

"জীবন-রহস্য" প্রবন্ধটি পড়িলাম। লেখক লিখিয়াছেন—বেশ। ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয় অনেক আছে। কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যের ও নারীর কথা লিখিতে লিখিতে এমন কয়েকটি কথা বলিয়াছেন যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখা আবশ্যক বোধ করিতেছি। একটু দুঃখের সহিতই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে সেই কয়েকটি স্থলে তিনি গতানুগতিক চিন্তাধারারই অনুকরণ ও অনুগমন করিয়াছেন, নিজের মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। নারীর সম্বন্ধে গতানুগতিক চিন্তাধারা কি নারীজাতির, কি পুরুষ জাতির, কি দেশের, কি জগতের—কাহারও বিশেষ কোন উপকার করিতে পারিতেছে না, বরং অপকারই করিতেছে। তাই এ সম্বন্ধে জাতিকে ও দেশকে নূতনভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

লেখক বলিতেছেন, "আমরা সৌন্দর্য্য বলিতে সাধারণতঃ বুঝি—রূপ।

সে রূপ চিরসুন্দরের নহে, নারীর রূপ"। এখানে প্রশ্ন এই "আমরা" কাহারা? কি উদ্দেশ্যে লেখক এখানে "আমরা" কথাটার প্রয়োগ করিয়াছেন? শুনিয়াছি, প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনাকালে রচয়িতা "আমি"র স্থলে কখনও কখনও "আমরা"র ব্যবহার করেন। যদি এই ভাবেই এখানে "আমরা" কথাটার ব্যবহার হইয়া থাকে, তবে কাহারও কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু ঐ "আমরা"র মধ্যে সমগ্র মানবজাতিকে গাঁথিয়া ফেলিতে দুঃখ ও লজ্জা অনুভব করিতেছি। সৌন্দর্য্য বলিতে মানুষ সাধারণতঃ "নারীর রূপ" বুঝে, ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারিলাম না।

"হায়, রমণীর রূপ!"—"রমণীর" রূপ লইয়া এইরূপ "হা হুতাশ" আবহমান কাল হইতে অনেক হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন শুভোদয় হইয়াছে বা হইবার আশা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই পুরাতন—অতি পুরাতন চিন্তাধারা বিলুপ্ত হউক, শ্রীভগবানের চরণে এই ঐকান্তিক প্রার্থনা। যদি পারেন, মানুষের মনকে নারীজাতির সম্বন্ধে কিছু নূতন কথা ভাবিতে শিক্ষা দিন।

"রমণীর রূপে সৌন্দর্য্য আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সে তরল সৌন্দর্য্য, তাহাকে গরল সৌন্দর্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না"। শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয়কে ক্ষুণ্ণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতেই হইবে যে,—

'সকল সুন্দর মাঝে
মাধুরী তোমারি রাজে;
তোমা ছাড়া এজগতে কেহ নাই কিছু নাই'

—এই পরম সত্যটি তিনি যেন বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিতেছেন না। সৌন্দর্য্য অমৃত স্বরূপ *। তাহা কখনও "গরল" হইতে পারে না। কোন কোন তামসস্বভাব পুরুষের গরলভরা মনই নারীর সৌন্দর্য্যকে কোন কোন ক্ষেত্রে গরলবৎ করিয়া তুলে। স্বার্থের খাতিরে—আপনার

* লেখক নিজেই বলিয়াছেন, "যাহা সুন্দর, তাহা সৎ—যাহা সৎ, তাহা পবিত্র"। ইতি—সমালোচক।

গায়ে চোট লাগিবে বলিয়া—ইহার জন্ত পুরুষ জাতিকে দোষ হয়ত না দিতেও পারি, কিন্তু তাই বলিয়া সৌন্দর্য্যকে বা নারীজাতিকে তজ্জন্য দায়ী করা কতটা সমীচীন হয়, বলিতে পারি না।

তাহার পর লেখক মহাশয়ের শাস্ত্র হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধারের কথা। শাস্ত্র আমি পড়ি নাই। বিনয়ের 'বহর' দেখাইতেছি না, সত্যই বলিতেছি—বিশেষভাবে শাস্ত্রালোচনা করিবার সুযোগ কখনও পাই নাই। কিন্তু পরমারাধ্যা ভারত-ভারতীর ইষ্টদেবী ও মাতৃস্বরূপিণী রাম-রাণীর সম্বন্ধে লেখক "মহর্ষি অগস্ত্যের" মারফৎ আমাকে যে শ্লোকটি বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমার উক্ত "মহর্ষি"র ও শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হইল না, বরং শ্রদ্ধার হানি হইল। শাস্ত্র যদি এইরূপ শ্লোক সমূহের সমষ্টি হয়, তবে ভগবান্ আমাদিগকে শাস্ত্রের কবল হইতে রক্ষা করুন, ইহাই প্রার্থনা। অগস্ত্য কিরূপ "মহর্ষি" ছিলেন, জানি না। কিন্তু শোককাতর শ্রীরামচন্দ্রকে যে ভাবে তিনি শিক্ষা দিতে বসিলেন, তাহাতে তাঁহাকে আমার "মহর্ষি"ত কা কথা, ঋষি বলিতেও বাধ বাধ ঠেকিতেছে—তা তিনি গণ্ডূষে সমুদ্রবারি পান করুন বা অপর কোন miracleই দেখান। আমাদের বিশ্বাস এইরূপ যে শ্রীরামচন্দ্র যদি পরমহংসদেবের মত কোন সাধুত্তমের নিকট আপনার দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিতেন, তবে আন্তরিক সহানুভূতিসূচক স্বরে "তাইত গো, এ ত বড়ই ভাবনার কথা হ'ল"—এইরূপে কথা আরম্ভ করিয়া ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই তিনি তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতেন—মায়াবাদের কতকগুলা অসার বুলি আওড়াইয়া মাথাটা তাঁহার গুলাইয়া দিতেন না। তাই হে দেশবাসী! তোমার প্রতি অনুরোধ এই যে, শাস্ত্র বেশী পড় চাই নাই পড়, "শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ কথামৃত", "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ" প্রভৃতি বেশ মন দিয়া পড়—নূতন আলোক পাইবে, নূতন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিবে, জীবন এক অভিনব ভাবে গঠিত হইয়া উঠিবে। যাহা হউক, এখানে মূল বক্তব্য এই যে, নারীজাতির সম্বন্ধে "মহর্ষি অগস্ত্য" উক্ত শ্লোকটিতে বিশেষ কোন জ্ঞানগর্ভ কথা বলিতে পারেন নাই, যাহা বলিয়াছেন তাহা একজন হৃদয়হীনের কথা। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের তাৎকালিক অবস্থা বুঝিতেই

পারেন নাই কাজে-কাজেই তদুপযোগী কোন ব্যবস্থাও করিতে পারিলেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই জন্যই কি শুষ্কজ্ঞানের এত নিন্দা করিতেন?

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে" পড়িয়াছি কোন সাধুকে 'হলধারী' 'মাটির খাঁচা' বলায় পরমারাধ্য পরমহংসদেব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভক্তপ্রবর কৃষ্ণ-কিশোর এমনই আঘাত পাইয়াছিলেন যে দক্ষিণেশ্বরে আসিলে তিনি আর 'হলধারী'র দিকে তাকাইতে পারিতেন না বা তাকাইতেন না। আজ সীতাদেবীর সম্বন্ধে মহর্ষি-অগস্ত্যের শ্লোকে যাহা পড়িলাম, তাহাতে সেই কথাই মনে হইতেছে। ভাব ঘনীভূতা প্রেমময়ী সচল প্রতিমা। তিনি হইলেন 'মল-পিত্তময়ী জড়াত্মিকা" এবং কাজে-কাজেই "ঘৃণাস্পদা" !!! শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন না—হইতে পারিলেন না, ইহাতে লেখক "বিস্ময়" প্রকাশ কেন করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। যে ভাবে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করা যাইত অথচ আধ্যাত্মিকতাও নষ্ট হইত না, বরং গৌরবময় হইত, সে ভাবে "মহর্ষি-অগস্ত্য" যে আবশ্যই করিতে পারেন নাই।

লেখকের অভিমত এই যে, "জাতীয় পুনরভ্যুত্থানের" জন্য নারীর প্রতি ভক্তিমান্ হইতে হইবে—শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে, "তা হউক সে তরুণী অথবা প্রসূতি", তা না হইলে দেশের "যুবকগণের হৃদয়ে জাগিবে রূপলালসা"। সাধু! কিন্তু অগস্ত্যের মতে মত দিয়া "সতী শিরোমণি সীতা"কেও তিনি যখন ঘৃণাস্পদা "মল-পিত্তময়ী জড়াত্মিকা" করিয়া তুলিলেন, তখন "এই ঘোর কলিযুগের কালস্বরূপিণী কামিনী" কুলকে আমরা (যুবকেরা) শ্রদ্ধা ভক্তি করিব, ইহা কিরূপে আশা করিতে পারেন? কথাটা এই যে, নারী জাতির সম্বন্ধে চিন্তাধারাকে বদ্‌লাইতে হইবে—নূতন ছাঁচে ঢালিতে হইবে। নারীকে "কালস্বরূপিণী কামিনী"ও ভাবিব আবার তাহাকে ভক্তিশ্রদ্ধাও করিব, এ যে বড়ই অসঙ্গত কথা।

লেখক বলেন, "আমরা স্ত্রীকে এখনও সন্তানের জননী বলিয়া শ্রদ্ধা করি"—কথাটা অবশ্য মন্দ নয়, ভালই। কিন্তু স্ত্রী যদি "সন্তানের জননী" হইতে না পারেন বা না চান, তথাপি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা যায়—করা উচিত করিতে হইবে। পত্নীর 'পত্নীত্ব'ই শ্রদ্ধার জিনিষ, তা "সন্তানের

জননী” তিনি হউন চাই নাই হউন। সন্তানের জননী, তাই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, এরূপ যেন বাধ্যবাধকতা না থাকে। তাঁহার জন্যই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে—সন্তানের জন্য নয়।

উপসংহারে একটা কথা বলিতে চাই—কোন কোন লেখক মনে করেন, তাঁহাদের লেখাগুলি যেন পুরুষদের জন্যই—নারীদের জন্য নয়, তাই স্থলে স্থলে তাঁহাদের রচনা একদেশদর্শী হইয়া পড়ে। আলোচ্য লেখকের লেখাও সেই দোষ হইতে একেবারে মুক্ত নয়। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবন্ধের স্থলবিশেষে লিখিতেছেন, “কাম হইতে কামনার উৎপত্তি এবং কামিনীতে তাহার পর্য্যবসান”। ইহা চরম ও পরম সত্য কিনা সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে—অন্ততঃ আমার ত যথেষ্টই আছে। অধিকন্তু, “কামে” ও “কামনায়” প্রভেদ কি জানি না, “কামিনী” কথাটার সৃষ্টি কে করিল, কেন করিল—নারীজাতির দোষে করিল কি আপনার মনের দোষে কবিল, বুঝি না। (নারীকে নারীই বলুন, “কামিনী” “রমণী” প্রভৃতি কথাগুলা অনেকেরই আর ভাল লাগে নাই)। কিন্তু এ সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও—লেখকের ঐ উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, একটা প্রশ্ন উঠে,—নারীর কামনার পর্য্যবসান “কামিনী” তে হয় কি?

সর্ব্বশেষে বলিতে ইচ্ছা করি,—সাধনার সিদ্ধমূর্ত্তি মহাসমন্বয়রূপী ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের (মল-পিত্তময় জড়াত্মকের!!!) * বার্ত্তা লইয়া “উদ্বোধন” প্রতিমাসে আমাদের কাছে আসিবে, আমরা এইরূপই আশা করি। তাই “উদ্বোধনের” সম্পাদক, পরিচালক, পৃষ্ঠপোষক, লেখক, পাঠক সকলেরই প্রতি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, “উদ্বোধনের” পৃষ্ঠায় যেন কোন “একদেশী” “একঘেয়ে” মতের প্রচার না হয়। যদি কখনও দৈবাৎ হয়, তবে আমরা যেন তখনই তাহার প্রত্যাহারের চেষ্টা করি। আশা করি, ইহা বুঝিয়া “জীবন-রহস্যের” লেখক আমায় মার্জ্জনা করিবেন।

ইতি—　　　—শ্রীরমাপতি বিশ্বাস।

* সীতা যদি “মলপিত্তময়ী-জড়াত্মিকা”, তবে পরমহংসদেব “মলপিত্ত-ময় জড়াত্মক” নহেন কেন? ইতি—সমালোচক।

বঙ্গসাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ।

মানবজাতির গৌরবস্থল, দৈবীগুণসম্পন্ন অতি-মানবকে জগৎ বহুবার দর্শন করিয়াছে। বুদ্ধ, যিশু প্রভৃতি অবতারকল্প পুরুষ হইতে গান্ধী, লেনিন প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমিক মহাত্মাগণকে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন সময়ে পুত্ররূপে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। জীবন্মুক্তের পুণ্যরজে, দার্শনিকের উচ্চ চিন্তা-তরঙ্গে এবং বীর সৈনিকেব উষ্ণ হৃদয় শোণিতে এ ধরিত্রী পবিত্রা, পুলকিতা ও গর্ব্বিতা। যে পুত্ররত্নগণকে প্রসব করিয়া তিনি সার্থকজন্মা, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদিগেরই অন্যতম। গীতাকার বলিয়াছেন :—"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংঽশসম্ভবম্ ॥"

সুতরাং যথায় শক্তির বিকাশ তথায় শ্রীভগবান্ স্বপ্রকাশিত, ইহা মানিতেই হইবে। কিন্তু শক্তি এক হইলেও দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী উহার গতি বিভিন্নমুখী। যে শক্তি এক সময়ে বুদ্ধরূপে নির্ব্বাণদায়িনী, যিশুরূপে শোণিতদানে ধরিত্রীর কলুষহরা, সেই শক্তি আবার অন্য সময়ে নেপোলিয়নের ভীম অসি সঞ্চালনে অত্যাচারীকে শাস্তি দিয়াছে, লেনিনের মস্তিষ্কে বিপ্লবাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে এবং মহাত্মা গান্ধির উদার, বিশাল বক্ষে মানব-প্রেমরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। শক্তির এই তারতম্য ও রূপবৈচিত্র্য উক্ত মহাপুরুষগণের জীবনকে বৈশিষ্ট্য পূর্ণ করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য কি? ইহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, তাঁহার শক্তি সাগরনিপতিতা ভাগীরথির ন্যায় শত ধারায় বিভক্ত হইয়া উচ্ছ্বসিত ভাব প্রবাহে স্বদেশ তথা সমগ্র পৃথিবীকে শক্তিদান করিতেছে। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, তাঁহার অতি-মানবত্বের পরিচায়ক, তাঁহার সৌন্দর্য্য, তাঁহার গৌরব! ইহাই তাঁহার আসনকে শত দৈন্যকাতর, পৃথিবীর পঙ্কিল গর্ভসম্ভূত, জড়া প্রকৃতির ক্রীড়াকন্দুক আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল মর্ত্তবাসী হইতে বহু উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছে-

যথায় আত্মার জ্যোতিঃ চির উজ্জ্বল, মুক্তির মহিমা চির বিঘোষিত ও স্বাধীনতার স্পর্দ্ধা চির অক্ষুণ্ণ। মানবের যে সমস্ত গুণ মানবকে দেবতা করে তাহার একটি যাহার মধ্যে প্রকাশিত তিনি নরপূজ্য, কিন্তু দেখিতে পাই বিবেকানন্দের হৃদয়াকাশ তাহাদের সহস্র কিরণে সমুদ্ভাসিত; যে পঙ্কজবনে একটিমাত্র কমল প্রস্ফুটিত হয় তাহারই সুগন্ধে উহা সুরভিত, কিন্তু বিবেকানন্দের চিত্ত-সরোবর শতাধিক নীলোৎপলের বিমল গন্ধে স্বর্গের নন্দনকাননকেও লাঞ্ছনা দেয়। শুকদেবের ন্যায় ব্রহ্মানুভূতি, নারদের ন্যায় উর্জ্জিতা ভক্তি, বেদব্যাসের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞান, সর্ব্বোপরি বুদ্ধের ন্যায় বিশাল হৃদয় একাধারে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছে। বালক বালিকা যখন ছেলেখেলায় মত্ত থাকে তখন বহুমূল্য হীরককে যেরূপ তাহারা সামান্য উপলখণ্ড বলিয়া ভ্রম করে, তদ্রূপ সংসার ক্রীড়ামত্ত আমরা বিবেকানন্দের মত 'সাত রাজার ধন' মাণিককে চিনিব কিরূপে? অন্ধ মানব, কিরূপে দেখিব তাঁহার কত রূপ, কত ঐশ্বর্য্য, কত প্রতিভা? কিন্তু সেই বালক বালিকা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ রত্নকে আদর করিতে শিক্ষা করে, তদ্রূপ কালপ্রবাহে আমরাও কিছু কিছু বুঝিতেছি বিবেকানন্দের মত কোন্ পুরুষ-রত্নকে এই স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, একতাবিহীন, পরপদলেহী, গলিত শবের ন্যায় পূতিগন্ধময় বঙ্গসংসারে লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার ন্যায় কাম-গন্ধহীন সন্ন্যাসী, দিগ্বিজয়ী দার্শনিক, স্বার্থলেশশূন্য স্বদেশপ্রেমিক, শক্তি-মান্ নেতা ও বিশ্বস্তহৃদয় বন্ধুকে পাইয়া আমরা পুলকিত, গর্ব্বিত ও স্তম্ভিত। কিন্তু সন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, সেই রত্নপেটিকায় আরও বহুরত্ন লুক্কায়িত আছে যাহার একটিমাত্রই আমাদের সকল দারিদ্র্যদোষ চিরতরে অপনোদন করিতে সমর্থ। আমাদের বঙ্গভাষা স্বামী বিবেকা-নন্দের উচ্চ চিন্তায় শক্তিপ্রদ, ভাবসম্পদে এবং অগ্নিকণা সদৃশ প্রোজ্জ্বল বাক্যসম্ভারে কতখানি জয়শ্রীমণ্ডিতা, কতখানি তেজোদৃপ্তা তাহা দেখিবার ও বুঝিবার এখন সময় আসিয়াছে।

ভাষা—ভাববাহিনী। নদীবক্ষ শীর্ণ ও পঙ্কিলপূর্ণ হইলে যেরূপ সে বর্ষার বেগবতী জলধারা দুই কূলে আর আবদ্ধ করিতে পারে

না, তদ্রূপ ভাষা দীনা, দুর্ব্বলা হইয়া পড়িলে উচ্চ চিন্তা এবং বীর্য্যবান্ ভাবরাশিকে আত্মস্থা করিতে অক্ষমা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁহার মাতৃভাষার পঙ্কোদ্ধার করিয়া অনন্ত-ভাব-সিন্ধুর উচ্ছল জলরাশি যাহাতে তন্মধ্যে অবাধে প্রবাহিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বাগ্বাদিনীর শ্বেত চরণযুগলে ইহাই তাঁহার অর্ঘ্য, ইহাই তাঁহার পুষ্পাঞ্জলি।

আমাদের মাতৃভাষা অতি প্রাচীনা। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—"বঙ্গভাষা কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যেরূপ কোন ধর্ম্মবীর কি কর্ম্ম-বীরের আবির্ভাব সময় সম্বন্ধে অঙ্কপাত দৃষ্ট হয়, পাঠকগণের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ সেইরূপ একটা খৃষ্টাব্দ বা শতাব্দের প্রত্যাশা করিতেছেন; কিন্তু ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রশ্নের তদ্রূপ সহজ উত্তর দেওয়া যায় না। বঙ্গভাষা জননীর গর্ভ হইতে শিশুর ন্যায় কোন শুভ লগ্নে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। বহুদিন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার বর্ত্তমান রূপ গঠিত হইতেছিল। বঙ্গভাষা —আমরা এখন যেরূপ বলি, তাহার মুখ্যচিহ্নগুলি কোন সময়ে গঠিত হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ সহজ নহে।" বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি এবং অবনতি বঙ্গভাষার পরিবর্ত্তন ও পরিণতিতে বহুল পরিমাণ সাহায্য করিয়া-ছিল। এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার হেতু প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে 'প্রাকৃত' * রাজভাষা রূপে গৃহীত হইল। বহু শতাব্দী পরে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা নব বলে বলবতী হইয়া পুনর্ব্বার আবির্ভূতা হইলেন। গৌড়ীয় ভাষাগুলিও † তাঁহার গৌরবছটা অঙ্গে লাগাইয়া নিজদিগকে প্রভান্বিতা করিবার মানসে 'লাম' 'লাবণ' 'চলন' প্রভৃতি তাহাদের আদি প্রাকৃত বাক্যসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'রাম'

* "পূর্ব্বকালে কথিত ভাষা মাত্রই বোধ হয় "প্রাকৃত" সংজ্ঞায় অভিহিত হইত।" দীনেশ সেন।

† হর্নুলি সাহেব নিম্নলিখিত ভাষাগুলিকে "গৌড়ীয় ভাষা" এই সাধারণ সংজ্ঞা দিয়াছেন :—উড়িয়া, বাঙ্গলা, হিন্দী, নেপালী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, ও কাশ্মীরী। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

'রাবণ' 'চরণ' ইত্যাদি শুদ্ধ বাক্যাবলী আশ্রয় করিতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির পর হইতে বঙ্গের বাণীপুত্রগণ বিভিন্ন সময়ে জননীকে যে বিভিন্ন অলঙ্কারে ভূষিতা করিতেছিলেন তাহার আংশিক পরিণতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবের পর আমরা দেখিতে পাই। প্রেমিক বৈষ্ণব কবিগণের অন্তর্নিহিত সরসতা তাঁহাদের লেখনিমুখে বঙ্গভাষায় সঞ্চারিত হইয়া তাহার প্রতি ছত্রে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের বন্যা বহাইয়াছিল। কাব্যের ন্যায় গদ্য সাহিত্যেও এই সৌন্দর্য্যস্রোত তৎ-কালে বহুল পরিমাণে প্রবিষ্ট হয়। বৌদ্ধাধিকারে যে বঙ্গভাষার নিদর্শন—"পশ্চিম দুয়ারে কে পণ্ডিত। সে তাই জে চারি স এ গতি আনি লেখ্যা। চন্দ্রকটাল জে জে বসুয়া ঘটদাসী দুত নাহি ডরায় তুমারে দেখি আ। চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমাণ করে * ;" চৈতন্য-যুগে সেই ভাষা নব কলেবর ধারণ করিল যথা—"অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ, গন্ধগুণ, রূপগুণ, রসগুণ, স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধিকাতেও বসে। শব্দগুণ কর্ণে, গন্ধগুণ নাসাতে, রূপগুণ নেত্রে, রসগুণ অধরে ও স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণে পঞ্চ-রাগের উদয়। পূর্ব্ব রাগের মূল দুই, হঠাৎ শ্রবন ও অকস্মাৎ শ্রবন।" † কিন্তু এই অনিত্য সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এককালে যে রমণীর যৌবন-লাবণ্যে মহাযোগীরও ধ্যানভঙ্গ হয় কিছুদিন পরে জরা তাহাকে আশ্রয় করিলে অতি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। এইরূপ কালপ্রভাবে সংস্কৃত ভাষা যখন পুনরায় মরণ-সৈকতে উপনীতা তখন তাহার প্রবল আকর্ষণে বঙ্গভাষাও বিলুপ্ত-প্রায়া। ভাষা হইতে গাম্ভীর্য্য, শ্রী, সরলতা অন্তর্হিতা হইল, আসিল তাহার পরিবর্ত্তে পুষ্পাচ্ছাদিত রাশীকৃত আবর্জ্জনা। তৎকালীন পণ্ডিতগণ কতকগুলি উৎকট বিশেষণ ও জটিল সমাসে বঙ্গভাষাকে কিরূপ নিষ্পী-

---

* শূন্য পুরাণ—শ্রীরমাই পণ্ডিত বিরচিত।

† কারিকা—শ্রীরূপ গোস্বামি বিরচিত। "বর্দ্ধমান রায়না নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ এই পুস্তকের কথা প্রথম প্রকাশ করেন।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

ড়িতা করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ একটি প্রাচীন পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—"শিরোনামা প্রাণাধিকা স্বধর্ম্ম প্রতিপালিকা শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী সাবিত্রীধর্ম্মাশ্রিতেষু—পরম প্রণয়ার্নব গভীর নীরতীর নিবসিত কালবরাঙ্গ সম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেবশর্ম্মণঃ ঝটিত ঘটিত বঞ্চিতান্তঃকরণে বিজ্ঞাপনাঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রীকর কমলাঙ্কিত কমল পত্রী পঠিতমাত্র অত্র শুভম্বিশেষ। বহুদিবসাবধি প্রত্যবিধি নিরবধি প্রয়াস প্রবাস নিবাস তাহাতে কর্ম্মফাঁস ব্যতিরিক্ত উত্তক্তান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছি। অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সর্ব্বদা একতা পূর্ব্বক অপূর্ব্ব সুখোম্ভব মুখারবিন্দ যথাযোগ্য মধুকরের ন্যায় মধুমাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয়। প্রয়াস মীমাংসা প্রণেতা শ্রীশ্রীঈশ্বরেচ্ছা শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ পূর্ব্বক কালযাপন কর্ত্তব্য, বিত্তো-পার্জ্জন তদর্থে তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃক দুঃখিতা এতাদৃশ উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। জ্ঞাপনমিতি" *। যখন কমলা বিরূপা হন তখন গৃহের চতুর্দ্দিকে অলক্ষ্মীর চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। এখানে উর্ণনাভ তন্তুরচনা করিয়াছে, ওখানে সিংহদ্বার উইপোকার ভক্ষ্য হইতেছে, এখানে চামচিকা বাসা বাঁধিয়াছে, ওখানে জীর্ণছাদ হইতে ইষ্টক খসিয়া পড়িতেছে, দারিদ্র্যপ্রযুক্ত গৃহবাসিগণের শীর্ণ দেহ, পরিধানে মসিকৃষ্ণ শতছিন্ন বস্ত্রখণ্ড অথচ মস্তকে কেশের কি পারিপাট্য, যেন সকল দিকেই শনির দৃষ্টি ; তদ্রূপ যখন একটা প্রাচীন জাতির ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটে তখন তাহার সর্ব্বত্র মৃত্যুচিহ্ন আত্মপ্রকাশ করে। তাহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ, একতা বিচ্ছিন্ন, বুদ্ধি বৈষম্য, মৌলিক চিন্তার ব্যাঘাত এবং ভাষা শূন্যগর্ভা হয়। বঙ্গদেশের অবনতির সহিত বঙ্গভাষাও প্রাণহীনা হইয়া পড়িল। সাহিত্যিকগণ মৃত সংস্কৃত ভাষার কঙ্কাল সমূহকে ঘসিয়া মাজিয়া, স্রকচন্দন ভূষিত করিয়া বঙ্গসমাজের রত্নময় সিংহাসনে অভিষেক পূর্ব্বক তাহার পূজা করিতে লাগিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রাণহীনা বঙ্গভাষায় নবজীবন সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। যে সমস্ত সাহিত্যিক বিনষ্টপ্রায় সংস্কৃত ভাষার মাল,

---

* উপরোক্ত পত্রটি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

মসলা দ্বারা বঙ্গভাষার সৌধ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন তাঁহাদের জন্ত তিনি একটি আদর্শ, ছাঁচ বা model গঠিত করিয়াছেন। উক্ত সাহিত্যিকগণ সেই ছাঁচে নিজ নিজ রচনাভঙ্গি ঢালিয়া লইলে বঙ্গভাষা পুনর্ব্বার বীর্য্যশালিনী, গৌরবময়ী ও মহিমান্বিতা হইবেন। নিদর্শন স্বরূপ স্বামিজীর "হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ" নামক প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—"কালবশে সদাচারভ্রষ্ট বৈরাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্য্যসন্তান, এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ-শিক্ষার জন্য আপাতঃ প্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহু বিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্ম্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্ম্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া, যখন এই ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—তখন আর্য্যজাতির প্রকৃত ধর্ম্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতঃ প্রতীয়মান বহুধা বিভক্ত, সর্ব্বথা প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল সম্প্রদায় সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মখণ্ড সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বলৌকিক, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোক-সমক্ষে সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ একশ্রেণীর সাহিত্যিকগণের সমক্ষে বঙ্গভাষার এইরূপ একটি আদর্শ স্থাপন করিলেও কিন্তু তিনি স্বয়ং বিশ্বাস করিতেন যে ভাষাকে সরল ও সহজ করিলে উহা দেশের কল্যাণকারিণী হইবে। তাঁহার মত—"যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখ্‌বার ভাষা নয়? যদি না হয়,

ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে ওসকল তত্ত্ব বিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেই দিকে ফেরে তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না†।" শ্রীযুক্ত বিম্‌স্ সাহেবও সাধু ভাষা প্রয়োগকারী বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের উপর সন্তুষ্ট নহেন। কিন্তু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" লেখক বলেন—"আমাদের মতে এই আড়ম্বরপ্রিয়তা সর্ব্বস্থলে নিন্দনীয় নহে। বাঙ্গলা ভাষার কল্যাণ সাধন হেতু সংস্কৃতের নিকট সততই শব্দ ভিক্ষা করিতে হইবে। যদি বিষয় গৌরবজনক হয়, তবে একটু আড়ম্বরে ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ব্যতীত ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ ঠিক কথিত ভাষা কখনই লিখিত ভাষায় পরিণত হইতে পারে না। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার একীকরণ জন্য লিখিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য আবশ্যক। যদি কলিকাতার কথিত 'গেলুম' লিখিত রচনায় স্থান পায়, তাহা হইলে শ্রীহট্টের 'গ্যাছলাম' কি 'যাইবাম' সেই অধিকারে বঞ্চিত হইবে কেন? স্বদেশবৎসলগণ তাহাও চালাইতে কৃতসংকল্প হইতে পারেন। বঙ্গভাষা তাহা হইলে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পৃথক ভাব অবলম্বন করিয়া বহুরূপী হইয়া দাঁড়াইবে। লিখিত ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষা সেই জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু লেখনী লইয়া বসিলেই যে সাধারণ ভাব বুঝাইতেও ভাষার কুজ্ঝটিকাপূর্ণ আভিধানিক ঘোর সমস্যা প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে।" স্বামী বিবেকানন্দ এই সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করিতেন, যথা—"যদি বল ও কথা বেশ, তবে বাঙ্গলা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করবো? প্রকৃতির নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে, অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব্ব-পশ্চিম, যেদিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখ্‌ছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন্ ভাষা লিখতে হবে।

† স্বামী বিবেকানন্দের "বাঙ্গলা ভাষা" নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব্ব পশ্চিমি ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত ঐ এক কলকেতার ভাষাই চল্‌বে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতের বেশী নিকট সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি যে কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গলা দেশের ভাষা হয়ে যাবে তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত, বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ কর্‌বেন, এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাষাণ দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ মূল বঙ্গভাষায় "বর্ত্তমান ভারত" "প্রাচ্য-পাশ্চাত্য" "পবিব্রাজক" এই তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন কবেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত কতকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা যথাক্রমে "ভাববার কথা" এবং "বীরবাণী" নামক পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হইয়াছে। "বর্ত্তমান ভারত" এবং কয়েকটি প্রবন্ধ সাধুভাষায় লিখিত। তন্মধ্যে "বর্ত্তমান সমস্যা" নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"এই লেখা পড়িয়া মনে হয় সত্যই প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী।" অন্য পুস্তক দুইটিতে স্বামিজী কথিতভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার রচনাভঙ্গি ও লিপিচাতুর্য্য দেখিয়া বাস্তবিক বিস্মিত হইতে হয়। জটিল দার্শনিক তত্ব, বিভিন্নদেশেব উত্থান, পতন এবং সভ্যতার ইতিহাস এইরূপ সরল, সহজ ও মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করা যাইতে পারে উহা আমাদের ধারণা ছিল না। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" উভয়জাতিব তুলনামূলক একটি মূল্যবান ইতিহাস; উহাতে স্বামিজীব গভীর মনস্তত্ব ও ভূয়োদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু "পরিব্রাজক"কে ভ্রমণকাহিনী, ইতিহাস, বা কাব্য কি নামে অভিহিত করিব ভাবিয়া পাই না, বস্তুতঃ এই তিন নামই উহাতে প্রযোয্য হইতে পারে। সাধুভাষার পক্ষপাতী স্বর্গীয় সমাজপতি মহাশয় স্বামিজীর "বর্ত্তমান সমস্যা" নামক প্রবন্ধের উচ্চ প্রশংসা করিলেও "পরিব্রাজকের" ভাষাকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন—"উচ্চভাব ও জ্ঞানতথ্য 'রাখালী ভাষায়' সজ্জিত দেখিয়া দুঃখিত।" কিন্তু আমাদের

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া মনে হয়—অপূর্ব্বসৌন্দর্য্য-শালিনী, সর্ব্বগুণান্বিতা কাব্য-সুন্দরী যেন নিরাভরণা হইয়া সামান্য বস্ত্রখণ্ডে নিজ অঙ্গ আবৃত করিয়াছেন, উহার প্রতি রন্ধ্রের মধ্য দিয়া দেবীর ভুবনমোহিনী রূপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যে ব্যক্তি অসি সঞ্চালনে সুদক্ষ সে উহাকে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপেই চালিত করিতে সক্ষম, কিন্তু যে ততদূর সিদ্ধ হয় নাই সে বিশেষজ্ঞের নিকট যতটুকু শিক্ষা পাইয়াছে, মাত্র ততটুকুই অনুকরণ করিতে পারে; তদ্রূপ সাহিত্যিকগণের মধ্যেও যাঁহাদের উপর বাণীর বিশেষ কৃপা তাঁহারাই কেবল ভাষাকে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ ব্যবহার করিতে সমর্থ, অন্যে তাহার নিজস্ব ধারাকে মাত্র অনুসরণ করিয়া চলে। স্বামী বিবেকানন্দের উপর মা বীণাপাণির সেই করুণা ছিল যাহার বলে তিনি ইস্পাতের মত ভাষাকে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকেই বাঁকাইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"I have a message to fulfil" কিন্তু সেই message শুদ্ধ ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নহে, মাতৃভাষাকেও তাঁহার কিছু দিবার ছিল এবং তিনি তাহা দিয়াছেন। সেই দান কি? না—ভাষাকে প্রাণময়ী করিয়া তোলা। সহজ ভাষায় কি তেজ, গাম্ভীর্য্য থাকিতে পারে না? অগ্নিকণা অতি ক্ষুদ্র হইলেও কি তাহাতে সর্ব্ববিধ্বংসী শক্তি নিহিত নাই? "নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনিওয়ালার উনানের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত থেকে।......অতীতের কঙ্কাল চয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো, তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটী জীমূতস্যন্দী, ত্রৈলোক্য কম্পনকারী ভবিষ্যৎভারতের উদ্বোধন ধ্বনি—"ওয়াহ গুরু কি ফতে" *। এই কয়টি সরল বাক্যপুটে যে তীব্র সুরা আছে, তাহা

* 'পরিব্রাজক' হইতে উদ্ধৃত।

কি পাঠকের শিরায় শিরায় অগ্নিস্রোত প্রবাহিত করে না? যদি বঙ্গের উষর ও পরাধীন জীবনক্ষেত্রে সমৃদ্ধিকারিণী মুক্তি-গঙ্গার প্রবাহ আনিতে চাও, তবে হে সাহিত্যিক, সাগর কল্লোল সদৃশ গম্ভীর এবং বাতাসের ন্যায় মুক্ত ভাষার শঙ্খধ্বনি করিয়া ভগীরথের ন্যায় তুমি অগ্রবর্ত্তী হও।

—চন্দ্রেশ্বরানন্দ।

অস্পৃশ্যতা নিবারণ প্রসঙ্গে—শ্রীচৈতন্যদেব ও মহাত্মা হরিদাসের * মন্দির-গমন-সমস্যা।

(মঙ্গলাচরণ)

যাঁহার জীবন্ত আদর্শ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আমি এই প্রবন্ধ লিখিতে উৎসাহী হইয়াছি এবং লিখিতে বসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যাঁহাকে মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই মহাত্মা গান্ধির উদ্দেশ্যে প্রণতিপূর্ব্বক আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

(প্রথম অংশ)

মহাত্মা হরিদাস ছিলেন বিনয়ের অবতার। তিনি পুরীতে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার আশ্রমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নাই। ভূলুণ্ঠিত হইয়া দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক বহির্দ্দেশেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে,

---

* ইনি বৈষ্ণবগ্রন্থে "যবন হরিদাস" নামে প্রসিদ্ধ। মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের সন্তুষ্টির জন্য আমরা ইঁহাকে মহাত্মা নামে অভিহিত করিলাম। বিশেষতঃ, মহাপুরুষের জাতির কথা উল্লেখ করা অবৈধ। কেননা, তাঁহারা সমগ্র মানবজাতির।

তখনও তিনি আপনাকে তাঁহার পবিত্র স্পর্শের অযোগ্য মনে করিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। পরিশেষে, তাঁহাকে পুরীর শ্রীমন্দিরে লইয়া যাইবার কথা উঠিলে, তখনও তিনি তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। জগতে হরিদাসের ন্যায় কেহ পবিত্র হইতে পাবে না, চৈতন্যদেবের এ বিশ্বাস যথেষ্ট ছিল। তথাপি তাঁহার মন্দিরে যাইবার কথা উঠিলে, তিনি উহাতে তাদৃশ উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই, বরং 'বহির্মুখ জন' বিরক্ত হইতে পারে, মনে করিয়া, তাহা হইতে নিরস্তই হইয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর অন্তরের কামনা ছিল, জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া যায়। তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল, অস্পৃশ্যতা দোষ সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। অথচ কার্য্যতঃ তিনি হরিদাসের ন্যায় মহাত্মারও মন্দির-গমন সমর্থন করেন নাই।

যাহা হউক, তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের এই প্রকার আচরণের কারণ কি, তাহা বুঝিয়া দেখিবার বিষয়।

বৈষ্ণবভক্তেরা বলেন, 'মহাপ্রভু সর্ব্বশক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার অসাধ্য কিছুই ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই মহাত্মা হরিদাসকে মন্দিরে লইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু অকর্ত্তব্য বলিয়াই তিনি তাহা করেন নাই। পাছে তাঁহার উক্ত অকর্ম্ম লোকসমাজে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহীত হয়, এই ভয়েই তিনি তাঁহাকে মন্দিরে লইয়া যাইতে উৎসাহী হন নাই।'

তাঁহারা যাহাই বলুন, আমাদের কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস হয় না। যাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, তিনি যে ভগবৎসৃষ্ট কোনও জীবকে তাঁহারই মন্দিরে যাইবার অযোগ্য, অতএব অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহা কদাপি বিশ্বাস-যোগ্য নহে। মানবে মানবে অভেদ, এই মহামন্ত্র যাঁহার প্রচারের সর্ব্বপ্রধান বিষয় ছিল, তিনি যে মানবমাত্রকেই মন্দিরে যাইবাব অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহ। এবং আমাদের এই বিশ্বাস যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তিনি মনে মুখে এক ছিলেন না, তিনি বলিতেন একপ্রকার এবং করিতেন অন্যপ্রকার। সুতরাং তিনি মিথ্যাবাদী ও

কপটাচারী ছিলেন। কিন্তু ইহা অসম্ভব। তিনি আর যাহাই হউন, কিন্তু মিথ্যাবাদী ও কপটাচারী ছিলেন না। তদ্ব্যতীত কাহারও, বিশেষতঃ হরিদাসের ন্যায় পবিত্রাত্মার মন্দির গমন, তাঁহার মতে, কদাপি অকর্ম্ম ছিল না। অথবা, তাঁহার মন্দির গমন তিনি যদি অকর্ম্ম বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি শুধু সেই সময়ের জন্য ঐ প্রকার মনে করিয়াছিলেন। হরিদাসের মন্দির গমনে বিরক্ত হইবার মত 'বহির্মুখ জন' তখন অনেক ছিল, অবস্থার ইত্যাকার বৈগুণ্য বশতঃই, সেই সময়ে তিনি ঐ প্রকার মনে করিয়াছিলেন, নতুবা তিনি চিরদিনের জন্য ঐ প্রকার মনে করেন নাই। ফলতঃ, তিনি শুধু কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন করিয়াছিলেন, এই মাত্র। কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন করিতে হয়, কর্ম্ম যাহাতে সহজে সুন্দর-রূপে সম্পাদিত হয়, তাহারই জন্য। চৈতন্যদেবও, হরিদাসের মন্দির গমন যাহাতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয়, যাহাতে উহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনেরই কল্যাণকর হয়, তাহারই জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব, যে কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য তিনি এত অধিক সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই কর্ম্ম যে কদাচ অকর্ম্ম হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব, হরিদাসের মন্দির গমন তিনি অকর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন না।

আবার, তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হন, তথাপি যদি তিনি হরিদাসকে মন্দিরে না লইয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বভাবতঃই মনে হয়, তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে মন্দিরে লইয়া যান নাই এবং সামর্থ্য সত্ত্বেও ইচ্ছা করিয়া কাহারও কল্যাণ সাধনে তৎপর না হওয়া নিষ্ঠুরতার কার্য্য। কিন্তু প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব নিষ্ঠুর ছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

অতএব, তিনি যে হরিদাসকে মন্দিরে লইয়া যান নাই, তাহা ইচ্ছা করিয়াও নহে, অথবা তাহা অকর্ম্ম বলিয়াও নহে। বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়, তাঁহার হরিদাসকে মন্দিরে লইয়া যাইবার সামর্থ্য ছিল না এবং ছিল না বলিয়াই তিনি তাহা করিতে অগ্রসর হন নাই।

অবশ্য বৈষ্ণবভক্তেরা এস্থলে বলিতে পারেন, মহাপ্রভু হরিদাসকে যে

মন্দিরে লইয়া যান নাই, তাহা তিনি অসমর্থ ছিলেন বলিয়া নহে। হরিদাসকে মন্দিরে লইয়া গিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারিলে অস্পৃশ্যদের মন্দির গমন সহজসাধ্য হওয়ায় তাহাদের যথেষ্ট হিত হইত সত্য, কিন্তু অন্যদিকে স্পৃশ্যেরা মন্দিরের অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ায় তাহাদের আবার সেইরূপ যথেষ্ট অহিতও হইত। মহাপুরুষেরা সমদর্শী, তাঁহারা তাই "একের ববাত মারিয়া অন্যের পেট ভরান" নীতির পক্ষপাতী নহেন। মহাপ্রভু, হরিদাসকে মন্দিরে যদি না লইয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে এই কারণেই লইয়া যান নাই। সুতবাং তাঁহাকে অসমর্থ বলিয়া মনে করা ভ্রম।

কিন্তু তাঁহারা যাহাই বলুন, ইহাতে তাঁহাব অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য প্রকটিত হয়, নতুবা, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা ইহার দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় না। তিনি যত বড় মহাপুরুষ হউন, তাঁহার প্রচার কার্য্য যতই সুন্দর হউক, তথাপি জনসাধারণের চিত্ত তখনও অনুদার এবং অনুন্নত ছিল, মন্দির সম্বন্ধে তাহাদের সংস্কার তখনও সংকীর্ণ ছিল। বৈষ্ণব গ্রন্থের ভাষায়, 'বহির্ম্মুখ জনের' তখনও অসদ্ভাব ছিল না। পাছে তাহারা বিরক্ত হয়, এই ভয়েই তিনি হরিদাসকে মন্দিরে লইয়া যাইতে সাহসী হন নাই। তিনি যদি সে সময়ে সকলের মনকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া দিতে পারিতেন, মন্দিরের যথার্থ স্বরূপ বুঝাইয়া তাহাদের চিত্ত সমুন্নত করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে হবিদাসের মন্দিব গমনে তাহাদের আর কোনও প্রকার আপত্তি থাকিত না। কিন্তু তিনি যখন বস্তুতঃ তাহা করিতে সমর্থ হন নাই, তখন তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান্ ছিলেন না, তাহা কদাপি অস্বীকার করা যায় না। অধিক কি, তিনি স্বয়ংই তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি দরদী নিতাইকে কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন,—

"আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল, জীব উদ্ধার নাহি হল,
ঋণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়া যাই।"

প্রকৃত কথা এই যে, মহাপ্রভু সর্ব্বশক্তিমান্ ছিলেন না, তাঁহার কোনও বিষয়ে সামর্থ্য ছিল না, এ কথা ভাবিতে বৈষ্ণবভক্তদের চিত্ত ব্যথিত হয়। এবং এই জন্যই তাঁহারা, এমন সহজ সত্য কথা ঐ

প্রকারে ঘুরাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, তাঁহাদের এই প্রকার অন্ধ ভক্তির বস্তুতঃ কোনও মূল্য নাই। বিশেষতঃ, প্রকৃত বৈষ্ণবের নিকটে, সর্ব্বশক্তিমত্তার অভাবে তাঁহার ভগবত্তা ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবার কোনও রূপ সম্ভাবনাও নাই। বৈষ্ণবেরা অকিঞ্চন, তাঁহারা ভগবানের নিকটে কিছুরই প্রার্থী নহেন; বরং তাঁহারাই চাহেন ভগবানের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে। তাঁহাদের দৃষ্টিতে, ভগবান তাই "ব্রজের অক্ষম ক্ষুদ্র শিশু" হইয়া যান, তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য। তাঁহাদের নিকটে, সর্ব্বশক্তিমত্তার অভাবে তাঁহার ভগবত্তা তাই নষ্ট হইয়া যায় না, বরং উহার বৃদ্ধিই হয়। অতএব, শ্রীচৈতন্যভক্তদের ইহাতে দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। তাঁহার এই অসামর্থ্য বস্তুতঃই তাঁহার অগৌরবের বিষয় নহে। বরং, তাঁহার সামর্থ্য ছিল, তথাপি তিনি হরিদাসকে মন্দিরে লইয়া যান নাই, বিশেষতঃ, তাঁহাকে মন্দিরে লইয়া যাওয়া কোন রূপ অকর্ম্মও ছিল না—এইরূপ কথাই তাঁহার পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। ফলতঃ, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ হওয়ায়, * তাঁহার বস্তুতঃ

---

* সাধারণতঃ, ভগবান্ বলিতে লোকে যাহা বুঝে, সেই প্রকার ভগবান্ হওয়ায় ইত্যর্থ।

ভগবান বলিতে ভক্তেরা যাহা বুঝেন, তাহা, সাধারণ লোকে ভগবান্ বলিতে যাহা বুঝে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যিনি নিজকে দুর্ব্বল বলিয়া ভাবেন, তিনিই ভগবানকে সর্ব্বশক্তিমান্ মনে করিয়া তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। কিন্তু যিনি আপনাকে সবল বলিয়া জানেন, ভগবানের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাকেই সাহায্য করিতে তিনি তখন অগ্রসর হন। ভক্তের নিকটে ভগবান তাই বালকবৎ দুর্ব্বল।

বিশেষতঃ, আমাদের সকলেরই বিভিন্ন প্রকৃতি, আমাদের প্রার্থনার বৈচিত্র্যও তাই অসংখ্য। কৃষকেরা যখন জল চাহিতে থাকে, গতায়াতের অসুবিধা হওয়ায় অন্যে তখন রৌদ্র চাহে। এরূপ অবস্থায় উভয়ের ইচ্ছা পূর্ণ করা ভগবানের পক্ষে অসম্ভব। এবং তিনি সমদর্শী। এই জন্য, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা ইচ্ছা করি, তিনি সর্ব্বদা তাহা পূর্ণ করেন না। তিনি তাঁহার অনন্ত বুদ্ধির দ্বারা যাহা যথার্থ হিতকর বলিয়া

কোন রূপ মাহাত্ম্য নাই। তাঁহাকে ভগবান বলিয়া মনে করিলে, তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়, উহাতে তাঁহাকে ছোট বলিয়াই প্রতিপন্ন করা হয়। বরং, নর-দেবতা বলিয়া মনে করিলেই তাঁহাকে প্রকৃত বড় করিয়া দেখা হয়। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি অসাধ্য সাধন করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার মাহাত্ম্য। নতুবা, উহাতে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। "কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" অথবা, ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, তৎ প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সামান্য ভিক্ষোপজীবীর ধর্ম্ম হইয়াও মাত্র অষ্টাদশ বৎসরের মধ্যে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, অন্যান্য অনেক ধর্ম্ম বহু বৎসব যাবৎ অসি হস্তে মনুষ্যরক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়াও সেইরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাই তাঁহার অত্যদ্ভুত কৃতিত্বেব পরিচয়।

(দ্বিতীয় অংশ)

যাহা হউক, আমাদের এই কথার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অনেকে আবার বলিয়া থাকেন, মহাপ্রভু স্বয়ং যাহা কবিতে সমর্থ হন নাই, আমাদেব ন্যায় সামান্য ব্যক্তিব তাহা কবিতে যাওয়া শুধু বাতুলতা।

কিন্তু তাঁহাদের এই প্রকার বলিবার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। মহাপ্রভু অস্পৃশ্যতা নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহারা যদি এই প্রকার মনে কবিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি উক্ত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবাব জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং উহা অনেকাংশে সম্পন্নও

মনে করেন, তাহাই কবিয়া থাকেন, এই মাত্র। সুতরাং তাঁহাব সর্ব্বশক্তিমত্তাব আমবা সাধারণতঃ যে অর্থ করি, তাহা কদর্থ। অতএব, তাহাব অভাবে তাঁহার প্রকৃত সত্তার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। ফলতঃ সম্পূর্ণ নিষ্কাম ব্যক্তি ভিন্ন অন্যকেহ তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা বা ভগবত্তাব যথার্থ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। চৈতন্যদেবের সম্বন্ধেও এই কথাই বক্তব্য। সম্পূর্ণ অকিঞ্চন ভক্তের নিকটেই তিনি ভগবান, অন্যের নিকটে নহেন। সুতরাং অকিঞ্চন (অতএব প্রকৃত) ভক্তের ইহাতে দুঃখিত হইবার কিছুই নাই।

করিয়াছিলেন। তবে, তিনি উহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এই মাত্র। তাঁহার সেই আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার সামর্থ্য আমাদের যদি এক্ষণে নাও হয়, তথাপি উক্ত কার্য্য অন্ততঃ আরও কিছুদূর অগ্রসর করাইয়া দিতে আমরা অবশ্য সমর্থ হইব। তাহা হইলেই যথেষ্ট ; কেননা আমাদের কর্ত্তব্যও তাহার অধিক নহে। ফলতঃ কোন মহৎ কার্য্য সাধন করিবার জন্য প্রাণপণ না করাই দোষাবহ ; নতুবা, উহা সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হওয়া দোষের বিষয় নহে। শ্রীচৈতন্য-দেব যাহা করিতে পারেন নাই আমরাও তাহা করিতে পারিব না ভাবিয়া অলস হইয়া বসিয়া থাকা বস্তুতঃই অন্যায়। বিশেষতঃ, বৈষ্ণব-দের এই প্রকার ফলাফল চিন্তা করিবার কিছুমাত্রও অধিকার নাই। তাঁহারা অকিঞ্চন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাই "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি" জ্ঞানে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া যাওয়া। সুতরাং বৈষ্ণবদের মুখে ঐ প্রকার কথা কদাপি শোভা পায় না। উহা জড়বাদী অলসেরই উক্তি। *

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা যদি মহাপ্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাতিশয় প্রদর্শন করিবার জন্য ঐ প্রকার কহিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য, ঐ প্রকারে বস্তুতঃ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাতিশয় প্রদর্শন করা হয় না, উহার দ্বারা বরং তাঁহার হীনতাই প্রতিপাদন করা হয়।

* সকলের মন অন্তর্মুখ ছিল না বলিয়াই হরিদাসের মন্দির গমন সেই সময়ে সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু কথা এই, কোন সময়েই অন্তর্মুখ হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং হরিদাসের তথা অস্পৃশ্যদের কোন সময়েই মন্দির গমনের অধিকার লাভ করিবারও সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ বিশমণ তেল পুড়িবারও সম্ভাবনা নাই, রাধারও নাচিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, বিশ মণ তেল পোড়া এবং রাধার নাচা দুইই যদি চির অসম্ভবও থাকিয়া যায়, তাহা হইলেও ইহাতে দুঃখিত হইবার কিছু নাই। মানব শুধু কর্ম্ম করিতে পারে। ফলে তাহার অধিকার নাই। ফল ভগবানের। কর্ম্মই জীবন। কর্ম্মেই তাহার অধিকার। অনন্ত উন্নতি আমাদের সম্মুখে। আমরা চিরদিন ধরিয়া শুধু উন্নত হইতেই থাকিব, আমাদের এই উন্নত হওয়ার কোন দিনই অবসান হইবে না। এই জন্য, লীলাবাদী বৈষ্ণবেরা "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি" জ্ঞানে সাধনাকেই জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেন। সিদ্ধির অপেক্ষা তাঁহারা করেন না।

চৈতন্যদেব সেইক্ষণে যাহা করিতে পারেন নাই, আমরা এইক্ষণেও যদি তাহা করিতে না পারি, তাঁহার সময়ে যাহা অসম্ভব হইয়াছিল, আমাদের সময়েও তাহা যদি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হয়, তাঁহার প্রভাব আমাদের উপর কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই। এবং হয় নাই বলিয়াই, আজও আমরা তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হই না। সুতরাং, তাঁহার প্রচার কার্য্য নিষ্ফল, তাঁহার আগমনের প্রয়োজন ব্যর্থ, কার্য্যতঃ তাঁহার অবতারত্বও তাই মিথ্যা, প্রকারান্তরে এই কথাই সপ্রমাণ করা হয়। এইরূপে, আমাদের দ্বারা তাঁহার অকর্ম্মণ্যত্ব মাত্রই প্রকটিত হয়। অথচ, বস্তুতঃ তিনি অকর্ম্মণ্য ছিলেন না। তাঁহার কার্য্য তিনি যদি অসম্পন্নও রাখিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমাদিগকে তাঁহার শিষ্য, তাঁহার ভক্ত, তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি পথপ্রদর্শক হইয়া যে কার্য্য সহজসাধ্য করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে চলিয়া আমরা যদি তাহা সুসম্পন্ন করিতে না পারি, তাহা হইলে সেই দোষ, সেই দৈন্য আমাদেরই। কিন্তু উহাতে যদি শুধু আমাদেরই দৈন্য প্রকটিত হইত, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি ছিল না। আমাদের দৈন্যে তাঁহারও দৈন্য সূচিত হয়, এক্ষেত্রে ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান পরিতাপের বিষয়। ফল দেখিয়াই বৃক্ষের নির্ণয় হয়। শিষ্যকে দিয়াই গুরুর পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার শিষ্য, তাঁহার ভক্ত। সুতরাং, আমাদের অকর্ম্মণ্যতায় তাঁহারই অকর্ম্মণ্যত্ব প্রমাণিত হয়। এইজন্যই, আমাদের কর্ত্তব্য তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ করা। পিতার কার্য্য পুত্র সম্পন্ন করিবেন, ইহা সনাতন ধর্ম্ম। যিনি তাহা না করেন, অন্ততঃ, তাহা করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর না হন, তিনি পুত্র নামের অযোগ্য, তিনি কুপুত্র। কুপুত্রের দ্বারা পিতার নাম কলঙ্কিত হয়। অতএব, আমাদের কর্ত্তব্য, তাঁহারই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমাদিগকে যদি তাঁহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, তথাপি তাহা হইতে পশ্চাৎপদ না হওয়া। তাঁহার সেবা করিবার জন্য ভক্ত 'গোবিন্দ' যেমন তাঁহাকেও

উল্লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবার জন্য, এক্ষেত্রে আমাদেরও কর্ত্তব্য ঐরূপ করা। বিশেষতঃ, তাঁহারও তাহাই ইচ্ছা। "সর্ব্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।" পিতা নিজের গৌরব চাহেন না, পুত্রের গৌরবেই তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার শিষ্য, তাঁহার মানসপুত্র, তাঁহাব আধ্যাত্মিকতাব উত্তরাধিকারী। সুতরাং, তাঁহার উক্ত প্রকার ইচ্ছা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। রামচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছায় সমুদ্রবন্ধন একনিমেষেই সম্পন্ন হইয়া যাইত। তথাপি, তিনি সেরূপ ইচ্ছা করেন নাই। সমুদ্রবন্ধন উপলক্ষ্য করিয়া, শুধু তাঁহারই নহে, সকলেরই, সামান্য একটি কাঠবিড়ালেরও, সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। এবং এইজন্যই, তিনি কোনরূপ অলৌকিক উপায়ে সমুদ্রবন্ধন করিতে অভিলাষী হন নাই। চৈতন্যদেবেরও ছিল তাহাই ইচ্ছা। তাঁহার আবদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমরাও তাঁহার গৌরবের ভাগী হইব, অধিক কি, তিনি স্বয়ং যাহা করিতে সমর্থ হন নাই, আমরা তাহা সুসম্পন্ন করিয়া, জগতে "আমরা তাঁহারই পুত্র", এই কথাই সপ্রমাণ করিব—ইহাই ছিল তাঁহার অন্তরের কামনা। এবং এই জন্যই তিনি তাঁহার কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া, অথচ, তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য, আমাদিগকে তাঁহার শিষ্য, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন। আমাদেরও কর্ত্তব্য তাই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহার শিষ্য নামের যথার্থ যোগ্য হইবার জন্য চেষ্টা করা। বিশেষতঃ, আমরা যদি তাঁহার যথার্থ ভক্ত হই, তাহা হইলে, "আমাদের কার্য্য তিনি করিয়া দেন, আমাদের জন্য তিনি কষ্ট পান", এই প্রকার ইচ্ছা করা আমাদের উচিত নহে। সেরূপ ক্ষেত্রে, আমাদের বরং "তাঁহারই কার্য্য আমরা করিয়া দিব", এই প্রকার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। পিতা খাটিয়া মরে, পুত্র বসিয়া খায়,—এমন পুত্র হওয়ায় ধিক্।

সুতরাং, যাঁহারা ঐ প্রকার বলিয়া থাকেন, তাঁহারা কদাপি শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য নহেন। তাঁহারা কপটাচারী, তাঁহারা অস্পৃশ্যতা

নিবারণের বিরোধী, তাঁহারা স্বার্থপর। শ্রীচৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া ঐ প্রকার কপটোক্তি করতঃ তাঁহারা শুধু আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধিরই সুযোগ অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অতএব, প্রকৃত ভক্তগণ তাঁহাদের কপটোক্তিতে ভুলিয়া অস্পৃশ্যতা নিবারণ কার্য্যে কদাপি যেন শিথিল প্রযত্ন না হন। পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য হইয়া পতিতোদ্ধারণ-ব্রত গ্রহণ না করিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভুরই অবমাননা করা হয়, এ কথা তাঁহারা কদাপি যেন ভুলিয়া না যান। (ক্রমশঃ)

শ্রীসাহাজী—

মাধুকরী।

দুঃখবাদ ও জীবনের-আদর্শ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি)

Asceticism anti-social! জগতের উপকার কাহারা বেশী করিয়াছে? জগতের দুঃখে কাহাদের প্রাণ বেশী কাঁদিয়াছে? বুদ্ধদেব ও তাঁহার ভিক্ষুদিগকে কি আমরা ভুলিয়া গেলাম? বৌদ্ধ যুগের নালন্দা ও তক্ষশীলা, সহস্র সহস্র অনাথাশ্রম, পান্থনিবাস, দাতব্য চিকিৎসালয়, পিঁজরাপোলগুলির প্রাণ ছিলেন কাহারা? য়ুরোপের মধ্য-যুগের Monkদের কি Protestantদের আস্ফালনে ভুলিয়া যাইব? Carlyle ভুলেন নাই। সাক্ষী তাঁর Past and Present। মধ্য-যুগের লোকহিতকর সমস্ত কার্য্য, যথা—ধর্ম্ম-দান, বিদ্যা-দান, স্বাস্থ্য-দান, অন্ন-দান—এ সব ত তাঁহারাই করিতেন।

তাঁহারা না থাকিলে কোথায় থাকিত আজ Western Civilisation ? কোথায় থাকিত Greek যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় ইতিহাসের পারম্পর্য্য ও ধারা ? বর্ব্বর-বাহিনীর পদ-ভরে য়ুরোপ যখন বিপর্য্যস্ত ও নিষ্পেষিত, তখন কৃপণের ধনের ন্যায় Aristotle ও Plato, Homer ও Virgil কাহারা বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন ? Monkদের জীবনে ও Churchএর জীবনে পরে অনেক পাপ প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সে দোষ আদর্শের নহে। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামী যত হইয়াছে, হইতেছে ও হয়, এমন আর কিছুর নামে নয়। তাই বলিয়া কি ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতে হইবে, না, ধর্ম্মকে বুদ্ধি বিবেচনার সহিত সংস্কার করিতে হইবে ? Protestantরা বুদ্ধি-বিবেচনার সহিত ধর্ম্মসংস্কার করেন নাই। চৈতন্য দেবের "জীবে দয়া"র কথাটাও কি ভুলিয়া গেলাম ? আচ্ছা, বর্ত্তমান যুগের কথাই বলি। বর্ত্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মানবের দুঃখে কাহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল ? Ramkrishna Mission এর স্থাপন করিয়াছিলেন কে ? এবং এই Missionএর সন্ন্যাসীদের ন্যায় বহুজনহিতায়, বহুজন সুখায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন কয়জন ? এখনও একজন সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতে ভারত টলমল্ করিতেছে। ইনি পূর্ব্বে গৃহস্থ ছিলেন। এখন সন্ন্যাসী ছাড়া ইঁহাকে আর কি বলা যাইতে পারে ? বলিতে হইবে কি ইঁহার নাম মহাত্মা গান্ধী ? মহাত্মা গান্ধী নিজেকে হিন্দু ভিন্ন কিছুই বলেন না। তাঁহার আদর্শে ও হিন্দুর উচ্চতম আদর্শে কোনও প্রভেদ নাই। তাঁহার Scheme of life এবং হিন্দুর Scheme of lifeএ প্রভেদ এইটুকু মাত্র যে, ক্ষাত্রধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু তাঁহার Scheme of lifeএ ইহা আদৌ নাই। এখানে তিনি Tolstoyist তাঁহার সমালোচকেরা ইহাও বলেন যে, অধিকারীর বিচার না করিয়া তিনি দলভুক্ত করেন, এবং সে জন্যই বহু প্রকার অনর্থ ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত মহাত্মা গান্ধীর প্রভেদ এই যে, স্বামী বিবেকানন্দের অন্তর্দৃষ্টি প্রখরতর ছিল এবং

Common-sense বা কাণ্ডজ্ঞান প্রবলতর ছিল। ক্ষত্রিয়ের আদর্শকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, বর্জ্জন করেন নাই। মহাত্মা গান্ধী মাত্র Idealist বা আদর্শবাদী, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ Practical Idealist. অতি অল্প বয়সেই তিনি চলিয়া গেলেন—কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। তাঁহার সমস্ত চিন্তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করিবার মত লোক এখনও অবতীর্ণ হন নাই। তবে মহাত্মা গান্ধী চেষ্টা করুন। তাঁহার উদ্যোগ-পর্ব্বের আবশ্যকতা খুব বেশী রকমই আছে। জাতিটাব সংযমী হওয়া আবশ্যক। যদি Political movementএর ভিতর দিয়াই জাতিটার সংযমী হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে কাহার কি আপত্তি থাকিতে পারে? কিন্তু পারিবে কি?

সন্ন্যাস anti-social নয়। তবে যে এরূপ একটা ধারণা দাঁড়াইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা মুমুক্ষু হইয়া নির্জ্জন বাস করেন ও নির্জ্জন সাধনা করেন। তাঁহারা নিজেদের মুক্ত করিতে সমর্থ এবং নিজেদের মুক্তও করেন; কিন্তু অপরকে মুক্ত করিবার বা জগতের উপকার করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। এই জাতীয় সন্ন্যাসীদিগকে বৌদ্ধ গ্রন্থের "প্রত্যেক বুদ্ধ" বলা হইয়া থাকে। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় বলিতে গেলে "ইঁহারা ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় নিজে ভাসিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইতে পারেন কিন্তু যাঁহারা নির্জ্জন সাধনে সিদ্ধ হইয়া জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও অপরকে মুক্তি দিতে পারেন ও মানবের সর্ব্বপ্রকার হিতঃসাধন করিতে পারেন তাঁহারা বাহাদুরী কাষ্ঠ বিশেষ।" তাই বলিয়া, যাঁহারা সংসারের সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন, সংসারের ভালমন্দ কিছুতেই যাঁহারা নাই, যাঁহারা beyond good and evil, তাঁহাদিগকে anti-social বলা অন্যায়। তাঁহারা যদি কিছু নাও করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের নির্লিপ্ততা দেখিয়া আমরা কত শিখিতে পারি। আর তাঁহাদের কার্য্য আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া তাঁহারা যে কিছুই করেন না এমন কথা বলিবারই বা আমাদের অধিকার কি? সূক্ষ্ম, আধ্যাত্মিক শক্তির বিষয় আমরা কতটুকুই বা জানি? আর

জগতের হিতের কথা যে আমরা বড় গলা করিয়া বলিয়া থাকি, কিন্তু জগতের উপকারের সম্ভাবনা আমাদের ন্যায় স্বার্থান্ধ সংসারী মানবের দ্বারা, না, যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সেবা-ধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহার দ্বারা? এ কথাটা ত' সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যেও বুঝা যায়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? Modern Europe, Protestant Europe, কলকারখানার Europe, অর্থ-গৃধ্নু Mammon worshipping Europe, সাম্রাজ্য-বিস্তারকারী Europeএর নিকট হইতে আমরা যে শুনিয়াছি—Asceticism anti-social, এবং শুনিয়া শুনিয়া আমরা যে একেবারেই মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। হায়, ইহারই নাম Modernism! Slave mentality আর কাহাকে বলে?

Activism ও Quietismএর সমন্বয় Europe কবে করিবে? কর্ম্মযোগ ও নৈষ্কর্ম্ম্যের সমন্বয় ভগবদ্গীতায় যেরূপ প্রণালীবদ্ধভাবে পাওয়া যায়, এরূপ আর জগতে কোথাও পাওয়া যায় না। ভারতের নিকট হইতে Europeএর এ সত্যটা শিখিবার আছে।

(ক্রমশঃ)

অধ্যাপক শ্রীকামাখ্যানাথ মিত্র, এম-এ।

অনুতাপ

আমার প্রাণের মন্দিরে মাগো,

তোমার প্রদীপ খানি ;—

হয়ে স্নেহ হারা

জ্বলিল না আর জ্বলিল না !

এই রুদ্ধ দুয়ারে   হায় বারে বারে

কত না আঘাত হানি ,

এই পাষাণের কারা

টুটিল না আর টুটিল না ।

ভোগ বাসনার বিপুল পিয়াসা

বিপুল আবেগে মা ।

আকুল হইয়া ছুটিছে আঁধারে

রুধিতে যে পারি না ।

এ মহা আকাশে তোমার বিকাশ

নাহি যদি হয় মাগো !

সীমা হারা হায় শূন্যতা নিয়ে

অসীমের কোলে মরিব কাঁদিয়ে

এ মৌন পাষাণ-বক্ষ বিদারি

রুদ্র হইয়া জাগো ।

পাহাড়ের দৃঢ় জড়তার বোঝা

খর দাবানল জ্বালি,

ভস্ম করিয়া তোর পদতলে

কেন মা লও না ডালি ?

তোর নয়নের প্রদীপের শিখা

নিয়ে আজ মোরে দাও, দাও দেখা !

তোমার,—চরণ ধূলায় মুছে ফেল মাগো

যত কালিমার রেখা ।

তোমার পূজারী নিয়ে এসেছিল
শুভ আশীষের ফুল ;—
অবহেলা করি
ধবিল না তায় ধরিল না !
কতবার হেঁকে গেল ডেকে ডেকে
হায়রে এমনি ভুল ,
কেউ তো বারেক স্মরি
বরিল না তায় বরিল না ।
সেই ভুলে হায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া
মরিব এখন মা ।
শিশিরের মত একটি ফোঁটাও
আগুনে ঝরিবে না ।
চারিদিকে আজ কেবলি যে হেরি
শূন্য বিজন দেশ ।
এই, শক্ত মাটির শিখরে কেবলি
ভরে আছে শিলা কঙ্কর ধূলি
মরু সম এই ভূধরে নেই কো
একটু সবুজ লেশ ।
চাহি না শুনিতে আজ আর ওগো,
করুণ বেদন বাঁশী ।
রুধির রাগেতে রাঙিয়া উঠুক
তোমার মুক্ত অসি ।
লঙ্ঘিয়া এ ভুল, জড়তা রাশি
আয় মা অন্ধ তিমির নাশি
এ, কুহেলির মুখে তোমার আলোর
ফুটুক দীপ্ত হাসি ।
—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ।

সময়ের দান।

একটি ছোট ছেলে একটি পদ্মফুলের কুঁড়ি পাইয়াছিল। কুঁড়িটি সে প্রথমে ফুটাইবার অনেক চেষ্টা কবিল, কিন্তু পারিল না। দাদার নিকট গিয়া ছেলেটি বলিল, "দাদা, ফুলটি ফুটিয়ে দাও।" বড় ভাই কুঁড়িটি লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিল, কিন্তু উহা ফুটিল না। মায় কাছে ছুটিয়া গিয়া ছেলেটি ব্যাকুল হইয়া বলিল, "মা, ফুলটি ফুটিয়ে দাও।" মা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বোকা ছেলে, এ যে কুঁড়ি— একি ফোটে?" ছেলেটি কাঁদ কাঁদ হইয়া পিতার নিকট গেল। তিনি তথন নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ছেলেটি অধৈর্য্য হইয়া বারংবার তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "বাবা, ফুলটি ফুটিয়ে দাও, ও বাবা, কুঁড়িটি ফুটিয়ে দাও।" পিতা অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়াছিলেন, শেষে বিরক্ত হইয়া পুত্রের পৃষ্ঠে এক চপটাঘাত করিয়া বলিলেন, "যাঃ—দিক্ করিস্‌নে।" ছেলেটি ফুলেব কুঁড়িটি লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। বারে বারে আঘাত পাইয়া ও নিরাশ হইয়া ছেলেটির তথন খুব রোক্ হইয়াছে, সে যেমন করিয়া হোক্ কুঁড়িটি ফুটাইবেই। কথন মাটিতে ঘষিয়া, কথন ফুলের উপর আঘাত করিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করিল, তবুও সে ফুটিল না। শেষে ছেলেটি উহার পাঁপ্‌ড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল, কিন্তু ফুল তো নয়ন মেলিল না—অধিকন্তু কয়েকটা পাঁপ্‌ড়ি ছিঁড়িয়া গেল। তথন সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অভিমান ভরে কুঁড়িটাকে নর্দ্দমায় ছুড়িয়া ফেলিল। কয়েকদিন পরে ছেলেটি হঠাৎ অবাক্ হইয়া দেখিল, যাহাকে ফুটাইবার জন্ম সে এত চেষ্টা করিয়াছিল, তবুও ফুটে নাই, আর আজ নর্দ্দমায় পড়িয়া কুঁড়িটি কেমন করিয়া আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

—অজ্ঞ

পুস্তক পরিচয়।

গড্ডলিকা—পরশুরাম রচিত। মূল্য ১৷৹ সিকা। শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক, ১৪, পার্শীবাগান (কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত। পুস্তক খানিতে পাঁচটি গল্প আছে। গল্পগুলি সুন্দর, সরসতাপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। পুস্তকের ভাষা সরল, স্বাভাবিক ও প্রাঞ্জল।

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম, সমাজ ও ব্যবসায়ে জুয়াচুরি কিরূপ অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতেছে, লেখক ভাব ও ভাষার তুলিকা সম্পাতে তাহাকে রূপ দান করিয়া সাধারণের নয়ন সম্মুখে ধরিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পুস্তকখানির বিশেষত্ব, ইহা উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক কিন্তু কুরুচি বর্জ্জিত। "গড্ডলিকা" বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের গড্ডলিকা-প্রবাহে না ভাসিয়া যে নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে ইহা আনন্দের বিষয়। ইহার এবং এইরূপ নির্দ্দোষ, হাস্য কৌতুকপূর্ণ পুস্তকের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

বেলুড় মঠ হইতে প্রকাশিত স্বামী ত্র্যম্বকানন্দ প্রণীত 'বিদ্যার্থী বিবেকানন্দ' ও শ্রীসুশীলকুমার দেব প্রণীত 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' নামক পুস্তক দুইখানি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

———

সংঘ-বার্ত্তা।

১। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের গত বার্ষিক অধিবেশনে পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দ "রামকৃষ্ণ মিশনের" সহকারী-সভাপতি" (Vice President) মনোনীত হইয়াছেন।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে কাঁথিতে স্বামী গিরিজানন্দ "ব্রহ্মচর্য্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ঐ উপলক্ষে কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পক্ষ হইতে রচনা, চরকা ও সংগীত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রচনা প্রতিযোগিতায় ১৫ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক যুবকদের জন্য 'ব্রহ্মচর্য্য', বালকদের জন্য 'ধ্রুব', ও পুরনারীদের জন্য 'সাবিত্রী' এই তিনটি প্রবন্ধ মনোনীত হইয়াছিল।

৩। স্বামী বিজয়ানন্দ তমলুকে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে গিয়া "আনন্দের সন্ধান" এই সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তথা হইতে তিনি সরিষা (ডায়মণ্ডহারবার) যান এবং সেখানে "সার্ব্বভৌমিক হিন্দুধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৪। নিম্নলিখিত স্থান হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের সংবাদ পাইয়াছি—আবাদান্ (Persian Gulf), দিল্লী, কাশী, পাটনা, মালদহ, সরিষা (ডায়মণ্ডহারবার), ইটালী (কলিকাতা), গদাধর আশ্রম (ভবানীপুর), ক্ষেপুত (মেদিনীপুর), শিলচর, পুরী।

৫। গত ১৩ই বৈশাখ ইং ২৬ এপ্রেল রবিবার শুভ অক্ষয়তৃতীয়ার দিবস শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মস্থান জয়রামবাটীতে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার ৩য় বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের বহু ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

আষাঢ়, ২৭শ বর্ষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (শ্রীম) *

পঞ্চম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণেশ্বরে কেদারের † উৎসব।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেদারাদি ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। আজ রবিবার শ্রাবণ অমাবস্যা ১৩ই আগষ্ট ১৮৮২ খৃঃ অঃ। বেলা ৫টা হইবে।

ঠাকুর নিজের ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, মাষ্টার প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। কেদার আজ উৎসব করিয়াছেন। সমস্ত দিন আনন্দে অতিবাহিত হইতেছে। রাম একটি ওস্তাদ্‌ আনিয়াছিলেন, তিনি গান গাহিয়াছেন। গানের সময় ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া ঘরের ছোট খাটটিতে বসিয়াছিলেন। মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা তাঁহার পাদমূলে বসিয়াছিলেন।

---

† শ্রীযুক্ত কেদার চাটুয্যে। হালিসহরে বাটী। সরকারী Accountantএর কাজ করিতেন। অনেক দিন ঢাকায় ছিলেন; সে সময়ে শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী তাঁহার সহিত সর্ব্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় আলাপ করিতেন। ঈশ্বরের কথা শুনিলেই তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইত। তিনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন।

সমাধিতত্ত্ব ও সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় ।

ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে সমাধিতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। বলিতেছেন, "সচ্চিদানন্দ লাভ হলে সমাধি হয়। তখন কর্ম্মত্যাগ হয়ে যায়। আমি ওস্তাদের নাম কচ্ছি এমন সময় ওস্তাদ্ এসে উপস্থিত, তখন আর তার নাম করবার কি প্রয়োজন। মৌমাছি ভন্ ভন্ করে কতক্ষণ? যতক্ষণ না ফুলে বসে। কিন্তু সাধকের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ করলে হবে না। পূজা, জপ, ধ্যান, সন্ধ্যা, কবচাদি, তীর্থ সবই করতে হয়।

"লাভের পর যদি কেউ বিচার করে, সে যেমন মৌমাছি মধু পান করতে করতে আধ আধ গুন্ গুন্ করে।"

ওস্তাদটি বেশ গান গাহিয়াছিলেন। ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে বলিতেছেন, যে মানুষে একটি বড় গুণ আছে, যেমন সঙ্গীত বিদ্যা, তাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে বিশেষরূপে।

ওস্তাদ্। মহাশয়, কি উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তিই সার। ঈশ্বর তো সর্ব্বভূতে আছেন, তবে ভক্ত কাকে বলি? যার মন সর্ব্বদা ঈশ্বরেতে আছে। আর অহঙ্কার অভিমান থাকলে হয় না। 'আমি' রূপ ঢিপিতে ঈশ্বরের কৃপারূপ জল জমে না; গড়িয়ে যায়। আমি যন্ত্র।

(কেদারাদি ভক্তদের প্রতি) "সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্ম্মই সত্য। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠ্‌তে পার; কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠ্‌তে পার, বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠ্‌তে পার, আর দড়ি দিয়েও উঠ্‌তে পার। আবার একটি আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পার।

"যদি বল, ওদের ধর্ম্মে অনেক ভুল কুসংস্কার আছে; আমি বলি তা থাকলেই বা, সকল ধর্ম্মেই ভুল আছে। সব্বাই মনে করে আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে। ব্যাকুলতা থাকলেই হল; তাঁর উপর ভালবাসা টান থাকলেই হল। তিনি যে অন্তর্যামী, অন্তরের টান ব্যাকুলতা দেখতে পান। মনে কর এক বাপের অনেকগুলি ছেলে; বড় ছেলেরা কেউ বাবা

কেউ পাপা এই সব স্পষ্ট বলে তাঁকে ডাকে। আবার অতি শিশু ছোট ছেলে হদ্দ 'বা' কি 'পা' এই বলে ডাকে। যারা 'বা' কি 'পা' পর্য্যন্ত বলতে পারে বাবা কি তাদের উপর রাগ করবে? বাবা জানেন যে ওরা আমাকেই ডাকছে তবে ভাল উচ্চারণ করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।

"আবার ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুকুরে চারটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে এক ঘাটে তারা বলছে জল; মুসলমানরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে তারা বলছে পানি; ইংরাজরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে তারা বলছে ওয়াটার; আবার অন্য এক ঘাটে বলছে Aqua। এক ঈশ্বর তাঁর নানা নাম।"

ষড়ভুজ দর্শন ও শ্রীরাজমোহনের বাড়ীতে শুভাগমন। নরেন্দ্র।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গড়ের মাঠে যেদিন সার্কাস দর্শন করিলেন তাহার পর দিনেই আবার কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন; বৃহস্পতিবার ১৬ই নভেম্বর ১৮৮২ খৃঃ অঃ কার্ত্তিক শুক্লা ষষ্ঠী। আসিয়াই প্রথমে গরাণ হাটায় ষড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শন করিলেন। বৈষ্ণব সাধুদের আকড়া, মোহান্ত শ্রীগিরিধারী দাস। ষড়ভুজ মহাপ্রভুর সেবা অনেকদিন হইতে চলিতেছে; ঠাকুর বৈকালে দর্শন করিলেন।

সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর সিমুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহনের বাড়ীতে গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর শুনিয়াছেন যে এখানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ছোকরারা মিলিয়া ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা করেন। তাই দেখিতে আসিয়াছেন। মাষ্টার ও আরও ২।১ জন ভক্ত সঙ্গে আছেন। শ্রীযুক্ত রাজমোহন পুরাতন ব্রাহ্ম।

ব্রাহ্মভক্ত ও সর্ব্বত্যাগ বা সন্ন্যাস।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। আর বলিলেন, তোমাদের উপাসনা দেখব। নরেন্দ্র গান গাইতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত প্রিয় প্রভৃতি ছোকরারা কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। এইবার উপাসনা হইতেছে। ছোকরাদের মধ্যে একজন উপাসনা করিতেছেন। তিনি

প্রার্থনা করিতেছেন, ঠাকুর যেন সব ছেড়ে তোমাতে মগ্ন হই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার উদ্দীপন হইয়াছে। তাই সর্ব্বত্যাগের কথা বলিতেছেন। মাষ্টার, ঠাকুরের খুব কাছে বসিয়াছিলেন, তিনিই কেবল শুনিতে পাইলেন ঠাকুর অতি মৃদুস্বরে বলিতেছেন, 'তা আর হয়েছে'?

শ্রীযুক্ত রাজমোহন ঠাকুরকে জল খাওয়াইবার জন্য বাড়ীর ভিতবে লইয়া যাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ।

পরের রবিবারে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা, সুরেন্দ্র নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি ঘর বাহির করিতেছেন—কখন ঠাকুর আসেন। মাষ্টারকে দেখিয়া তিনি বলিতেছেন, "তুমি এসেছ, আর তিনি কোথায়?' এমন সময় ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। কাছে শ্রীযুক্ত মনোমোহনের বাড়ী, ঠাকুর প্রথমে সেখানে নামিলেন, সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া সুরেন্দ্রের বাড়ীতে আসিবেন।

মনোমোহনের বৈঠকখানায় ঠাকুর বলিতেছেন, যে অকিঞ্চন, যে দীন, তার ভক্তি ঈশ্বরের প্রিয় জিনিষ। খোল মাখান জাব যেমন গরুর প্রিয়। দুর্যোধন অত টাকা অত ঐশ্বর্য্য দেখাতে লাগল, কিন্তু তার বাটীতে ঠাকুর গেলেন না। তিনি বিদুরের বাটী গেলেন। তিনি ভক্তবৎসল; বৎসের পাছে যেমন গাভী ধায় সেইরূপ তিনি ভক্তের পাছে পাছে যান। ঠাকুর গান গাহিতেছেন।

গান।

সে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে॥

"চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ নামে অশ্রু পড়ত। ঈশ্বরই বস্তু; আর সব অবস্তু। মানুষ মনে করলে ঈশ্বর লাভ করতে পারে। কিন্তু কামিনী, কাঞ্চন, ভোগ কত্তেই মত্ত। মাথায় মাণিক রয়েছে তবু সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে।

"ভক্তিই সার। ঈশ্বরকে বিচার করে কে জানতে পারবে। আমার দরকার ভক্তি। তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অত জানবার আমার কি দরকার? এক বোতল মদে যদি মাতাল হই শুঁড়ীর দোকানে কত মণ মদ আছে সে খবরে আমার কি দরকার? এক ঘটি জলে আমার তৃষ্ণার শান্তি হতে পারে; পৃথিবীতে কত জল আছে সে খবরে আমার প্রয়োজন নাই।"

সুরেন্দ্রের দাদা ও সদরওলার পদ। জাতিভেদ Caste system and problem of the Untouchables. Theosophy.

ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া দোতলার বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সুরেন্দ্রের মেজভাই সদরওয়ালা তিনিও উপস্থিত ছিলেন। অনেক ভক্ত ঘরে সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুর সুরেন্দ্রের দাদাকে বলিতেছেন, "আপনি জজ, তা বেশ, এটি জানবেন সবই ঈশ্বরের শক্তি। বড় পদ তিনিই দিয়েছেন, তাই হয়েছে। লোকে মনে করে আমরা বড়লোক, ছাদের জল সিংহের মুখওলা নল দিয়ে পড়ে, মনে হয় সিংহটা মুখ দিয়ে জল বার কচ্ছে! কিন্তু দেখ কোথাকার জল। কোথা আকাশে মেঘ হয়, সেই জল ছাদে পড়েছে তার পর গড়িয়ে নলে যাচ্ছে; তার পর সিংহের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে!"

সুরেন্দ্রের ভ্রাতা। মহাশয়, ব্রাহ্ম-সমাজে বলে স্ত্রীস্বাধীনতা; জাতিভেদ উঠিয়ে দাও; এ সব আপনার কি বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের উপর নূতন অনুরাগ হলে ঐ রকম হয়। ঝড় এলে ধূল ওড়ে, কোন্‌টা আমড়া, আর কোন্‌টা তেঁতুলগাছ, কোন্‌টা আমগাছ বোঝা যায় না। ঝড় থেমে গেলে, তখন বোঝা যায়। নবানুরাগের ঝড় থেমে গেলে ক্রমে বোঝা যায় যে ঈশ্বরই শ্রেয়ঃ নিত্য পদার্থ আর সব অনিত্য। সাধুসঙ্গ, তপস্যা না করলে এ সব ধারণা হয় না। পাখোয়াজের বোল মুখে বল্‌লে কি হবে; হাতে আনা বড় কঠিন। শুধু লেক্‌চার দিলে কি হবে; তপস্যা চাই, তবে ধারণা হবে।

"জাতিভেদ ? কেবল এক উপায়ে জাতিভেদ উঠতে পারে। সেটি ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। অস্পৃশ্য জাত শুদ্ধ হয়—চণ্ডালে ভক্তি হলে আর চণ্ডাল থাকে না। চৈতন্যদেব আচণ্ডালে কোল দিয়াছিলেন !

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা হরিনাম করে, খুব ভাল ; ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লে তাঁর কৃপা হবে, ঈশ্বরলাভ হবে।

"সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। এক ঈশ্বরকে নানা নামে ডাকে। যেমন এক ঘাটের জল হিন্দুরা খায়, বলে জল ; আর এক ঘাটে খৃষ্টানরা খায়, বলে ওয়াটার ; আর এক ঘাটে মুসলমানেরা খায়, বলে পানি।"

সুরেন্দ্রের ভ্রাতা। মহাশয় থিওজফি কিরূপ বোধ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুনেছি নাকি ওতে অলৌকিক শক্তি হয়। দেব মোড়লের বাড়ীতে দেখেছিলাম একজন পিশাচ-সিদ্ধ। পিশাচ কত কি জিনিষ এনে দিত। অলৌকিক শক্তি নিয়ে কি করবো ? ওর দ্বারা কি ঈশ্বর লাভ হয় ? ঈশ্বর যদি না লাভ হলো তা হলে সকলই মিথ্যা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

৺ মণি মল্লিকের ব্রহ্মোৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিকের সিন্দুরিয়া পটীর বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। বৈকাল, বেলা ৪টা হইবে। এখানে আজ ব্রাহ্ম-সমাজে সাম্বাৎসরিক উৎসব। নভেম্বর ১৮৮২ খৃঃ অঃ। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অনেকগুলি ব্রাহ্ম-ভক্ত আর শ্রীপ্রেমচাঁদ বড়াল ও গৃহস্বামীর অন্যান্য বন্ধুগণ আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মণিলাল ভক্তদের সেবার জন্য অনেক আয়োজন করিয়াছেন। প্রহ্লাদ চরিত্র কথা হইবে। তৎপরে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা হইবে। অবশেষে ভক্তগণ প্রসাদ পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বিজয় এখনও ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত আছেন। তিনি অদ্যকার উপাসনা করিবেন। তিনি এখনও গৈরিকবস্ত্র ধারণ করেন নাই

কথক মহাশয় প্রহ্লাদ চরিত্র কথা বলিতেছেন। পিতা হিরণ্যকশিপু হরির নিন্দা ও পুত্র প্রহ্লাদকে বার বার নির্য্যাতন করিতেছেন। প্রহ্লাদ করজোড়ে হরিকে প্রার্থনা করিতেছেন আর বলিতেছেন, "হে হরি, পিতাকে সুমতি দাও"। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয় প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইয়াছে।

শ্রীবিজয় গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তদিগকে উপদেশ। ঈশ্বর দর্শন ও আদেশ প্রাপ্তি, তবে লোকশিক্ষা।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয়াদি ভক্তদিগকে বলিতেছেন, "ভক্তিই সার। তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন সর্ব্বদা করতে করতে ভক্তি লাভ হয়। আহা! শিবনাথের কি ভক্তি। যেন রসে ফেলা ছানা বড়া।

"এ রকম মনে করা ভাল নয় যে আমার ধর্ম্মই ঠিক; আর অন্য সকলের ধর্ম্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ অনন্ত মত।

"দেখ! *ঈশ্বরকে দেখা যায়।* অবাংমনসোগোচর বেদে বলেছে; এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। বৈষ্ণবচরণ বলত, তিনি শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর *। তাই সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, গুরুর উপদেশ এই সব প্রয়োজন। তবে চিত্ত শুদ্ধি হয়। তবে তাঁর দর্শন হয়। ঘোলা জলে নির্ম্মলি ফেল্‌লে পরিষ্কার হয়। তখন মুখ দেখা যায়। ময়লা আর্শিতে মুখ দেখা যায় না।

"চিত্তশুদ্ধির পর ভক্তিলাভ করলে, তবে তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন হয়। দর্শনের পর আদেশ পেলে তবে লোক শিক্ষা দেওয়া যায়। আগে থাকতে লেক্‌চার দেওয়া ভাল নয়। একটা গানে আছে।

---

* মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গি মোক্ষে নির্ব্বিষয়ম্ স্মৃতম্॥
মৈত্রায়নী উপনিষৎ।

গান।

"মন্দিরে তোর নাইকো মাধব,
পোদো শাঁক ফুকে তুই করলি গোল।
তায় চামচিকে এগার জনা,
দিবা নিশি দিচ্ছে থানা।

"মন্দির আগে পরিষ্কার করতে হয়, ঠাকুর প্রতিমা আনতে হয়, পূজার আয়োজন করতে হয়, কোন আয়োজন নাই, ভোঁ ভোঁ করে শাঁক বাজান, তাতে কি হবে।"

এইবার শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী বেদিতে বসিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিতেছেন। উপাসনান্তে তিনি ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। আচ্ছা, তোমরা অত পাপ পাপ বল্লে কেন? একশোবার আমি পাপী আমি পাপী বল্লে, তাই হয়ে যায়। এমন বিশ্বাস করা চাই, যে তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ কি? তিনি আমাদের বাপ মা, তাঁকে বলো যে পাপ করেছি, আর কখনও করব না। আর তাঁর নাম কর, তাঁর নামে সকলে দেহ মন পবিত্র কর—জিহ্বাকে পবিত্র কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাবুরাম প্রভৃতি সঙ্গে Free Will সম্বন্ধে কথা।

তোতাপুরীর আত্মহত্যার সঙ্কল্প।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিজের ঘরে পশ্চিমের বারান্দায় কথা কহিতেছেন। সঙ্গে বাবুরাম, মাষ্টার, রামদয়াল প্রভৃতি। ডিসেম্বর ১৮৮২ খৃঃ অঃ। বাবুরাম, রামদয়াল ও মাষ্টার আজ রাত্রে থাকিবেন। শীতের ছুটি হইয়াছে। মাষ্টার আগামী কল্যও থাকিবেন। বাবুরাম নূতন নূতন আসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। ঈশ্বর সব কচ্ছেন এ জ্ঞান হলে তো জীবন্মুক্ত। কেশব সেন শম্ভু মল্লিকের সঙ্গে এসেছিল, আমি তাকে

বল্লাম, "গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন নড়ে না। স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) কোথায়? সকলই ঈশ্বরাধীন। ন্যাংটা অত বড় জ্ঞানী গো, সেই জলে ডুবতে গিছলো। এখানে এগার মাস ছিল; পেটের ব্যাম হল, রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গঙ্গায় ডুবতে গিছ্‌লো। ঘাটের কাছে অনেকটা চড়া, যত যায়, হাঁটু জলের চেয়ে আর বেশী হয় না; তখন আবার বুঝলে, বুঝে ফিরে এলো। আমার একবার খুব বাতিক বৃদ্ধি হয়েছিল, তাই গলায় ছুরি দিতে গিছ্‌লুম। তাই বলি মা আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি রথ, তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি—যেমন করাও তেমনি করি।"

ঠাকুরের ঘরের মধ্যে গান হইতেছে। ভক্তেরা গান গাহিতেছেন।

গান।

১। হৃদিবৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি,
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।
মুক্তি কামনা আমারি হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোমতী।
আমার পাপ ভার গোবর্দ্ধন ধর ধর জনার্দ্দন।
কামাদি ছয় কংস চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি॥

২। আমার প্রাণ পিঞ্জরের পাখী গাওনারে।
ব্রহ্ম কল্পতরু মূলে বসেরে পাখী বিভুগুণ
গাও দেখি, গাও গাও।
আর ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সুপক্ক ফল খাওনা রে॥

নন্দন বাগানের ৺শ্রীনাথ মিত্র বন্ধুগণ সঙ্গে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "এই যে এঁর চক্ষু দিয়া ভেতরটা সব দেখা যাচ্ছে। সার্শীর দরজার ভিতর দিয়ে যেমন ঘরের ভিতরকার জিনিষ সব দেখা যায়।" শ্রীনাথ, যজ্ঞনাথ, এঁরা নন্দন বাগানের ব্রাহ্ম পরিবার-ভুক্ত। ইঁহাদের বাটীতে প্রতি বৎসর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইত। উৎসব দর্শন করিতে ঠাকুর পরে গিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইতে লাগিল। ঘরে ছোট

খাটটিতে বসিয়া ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন। ক্রমে ভাবাবিষ্ট হইলেন। ভাব উপশমের পর বলিতেছেন, "মা ওকেও টেনে নাও। ও অত দীন ভাবে থাকে। তোমার কাছে আসা যাওয়া কচ্ছে।"

ঠাকুর কি ভাবে বাবুরামের কথা বলিতেছেন? বাবুরাম, মাষ্টার, রামদয়াল প্রভৃতি বসিয়া আছেন। রাত্রি ৮টা ৯টা হইবে। ঠাকুর সমাধিতত্ত্ব বলিতেছেন। জড় সমাধি, চেতন সমাধি, স্থিত সমাধি, উন্মনা সমাধি।

বিদ্যাসাগর ও Gengish Khan. ঈশ্বর কি নিষ্ঠুর?

শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর।

সুখ দুঃখের কথা হইতেছে। ঈশ্বর এত দুঃখ কেন করেছেন।

মাষ্টার। বিদ্যাসাগর অভিমান করে বলেন, 'ঈশ্বরকে ডাকবার আর কি দরকার। দেখ, জেঙ্গিস খাঁ যখন লুট পাট আরম্ভ করলে তখন অনেক লোককে বন্দি করলে, ক্রমে প্রায় একলক্ষ বন্দি জমে গেল। তখন সেনাপতিরা এসে বল্লে মহাশয়, এদের খাওয়াবে কে? এদের সঙ্গে রাখলে আমাদের বিপদ। কি করা যায়। ছেড়ে দিলেও বিপদ। তখন জেঙ্গিস খাঁ বল্লেন, তাহলে কি করা যায়, ওদের সব বধ কর। তাই কচাকচ করে কাটবার হুকুম হয়ে গেল। এই হত্যা কাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন? কই একটু নিবারণ তো কল্লেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকারবোধ হচ্ছে না। আমার তো কোন উপকার হলো না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের কার্য্য কি বুঝা যায়, তিনি কি উদ্দেশ্যে কি করেন? তিনি সৃষ্টি, পালন, সংহার সবই কচ্ছেন। তিনি কেন সংহার কচ্ছেন আমরা কি বুঝতে পারি? আমি বলি, মা আমার বোঝবারও দরকার নাই, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দিও। মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য এই ভক্তি লাভ। আর সব মা জানেন। বাগানে আম খেতে এসেছি; কত গাছ, কত ডাল, কত কোটী পাতা, এসব বসে বসে হিসাব করবার আমার কি দরকার। আমি আম খাই, গাছ পাতার হিসাবে আমার দরকার নাই।

ঠাকুরের ঘরের মেজেতে আজ বাবুরাম মাষ্টার ও রামদয়াল শয়ন করিলেন।

গভীর রাত্রি, ২টা ৩টা হইবে। ঠাকুরের ঘরে আলো নিবিয়া গিয়াছে। তিনি নিজে বিছানায় বসিয়া ভক্তদের সহিত মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাস্টার প্রভৃতি। দয়া ও মায়া। কঠিন সাধন ও ঈশ্বর দর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)। দেখ, দয়া আর মায়া এ দুটি আলাদা জিনিষ। মায়া মানে আত্মীয়ে মমতা ; যেমন বাপ মা, ভাই ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র, এদের উপর ভালবাসা। দয়া সর্ব্বভূতে ভাল বাসা ; সমদৃষ্টি। কারুর ভিতর যদি দয়া দেখ, যেমন বিদ্যাসাগরের, সে জানবে ঈশ্বরের দয়া। দয়া থেকে সর্ব্বভূতের সেবা হয়। মায়াও ঈশ্বরের। মায়া দ্বারা তিনি আত্মীয়দের সেবা করিয়ে লন। তবে একটি কথা আছে ; মায়াতে অজ্ঞান করে রাখে, আর বদ্ধ করে। কিন্তু দয়াতে চিত্ত শুদ্ধি হয়। ক্রমে বন্ধন মুক্তি হয়।

"চিত্তশুদ্ধি না হলে ভগবান দর্শন হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, এসব জয় করলে তবে তাঁর কৃপা হয় ; তখন দর্শন হয়। তোমাদের অতি গুহ্য কথা বলছি, কাম জয় করবার জন্য আমি অনেক কাণ্ড করেছিলাম। এমন কি আনন্দ আসনের চারিদিকে 'জয় কালী' 'জয় কালী'—বলে অনেক বার প্রদক্ষিণ করেছিলাম। আমার দশ এগার বৎসর বয়সে যখন ও দেশে ছিলুম, সেই সময়ে ঐ অবস্থাটি (সমাধি অবস্থা) হয়েছিল, মাঠ দিয়ে যেতে যেতে যা দর্শন কল্লাম তাতে বিহ্বল হয়েছিলাম। ঈশ্বর দর্শনের কতগুলি লক্ষণ আছে। জ্যোতি দেখা যায়, আনন্দ হয়, বুকের ভিতর ভুপ্‌ড়ির মত গুর গুর করে মহাবায়ু ওঠে।"

পরদিন বাবুরাম, রামদয়াল, বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। মাষ্টার সেই দিন ও রাত্রি ঠাকুরের সঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। আজ তিনি ঠাকুর-বাড়ীতেই প্রসাদ পাইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাড়োয়ারী ভক্তগণ সঙ্গে।

বৈকাল হইয়াছে। কতকগুলি মাড়োয়ারী ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় ব্যবসা করেন। তাঁহারা ঠাকুরকে বলিতেছেন, "আপনি আমাদের কিছু উপদেশ করুন।" ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাড়োয়ারীদের প্রতি)। দেখ, আমি আর আমার এ দুটি অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর তোমার এই সব, এর নাম জ্ঞান। আর 'আমার' কেমন করে বলবে? বাগানের সরকার বলে, আমার বাগান; কিন্তু যদি কোন দোষ করে তখন মনিব তাড়িয়ে দেয়; তখন এমন সাহস হয় না যে নিজের আমের সিন্দুকটা বাগান থেকে বার করে আনে। কাম, ক্রোধ, আদি যাবার নয়, ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। কামনা, লোভ করতে হয় তো ঈশ্বরকে পাবার কামনা—লোভ কর। এদিকে বিচার করে তাদের তাড়িয়ে দাও। যেমন হাতি পরের কলাগাছ থেতে গেলে মাহুত অঙ্কুশ মারে।

"তোমরা ত ব্যবসা কর, ক্রমে ক্রমে উন্নতি করতে হয় জান। কেউ আগে রেড়ির কল করে, আবার বেশী টাকা হলে কাপড়ের দোকান করে। তেমনি ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যেতে হয়। হোলো, মাঝে মাঝে দিন কতক নির্জ্জনে থেকে বেশী করে তাঁকে ডাকতে হয়।

"তবে কি জান? সময় না হলে কিছু হয় না। কারু কারু ভোগ কর্ম্ম অনেক বাকি থাকে। তাইজন্য দেরীতে হয়। ফোড়া কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র করলে হিতে বিপরীত হয়। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার অস্ত্র করে। ছেলে বলেছিল, মা এখন আমি ঘুমুই আমার বাহ্যে পেলে তখন তুমি তুলো। মা বল্লে, বাবা বাহ্যেতেই তোমায় তুলবে।" (সকলের হাস্য।)

মাড়োয়ারী ভক্ত ও ব্যবসায় মিথ্যা কথা। রামনাম কীর্ত্তন।

মাড়োয়ারী ভক্তেরা মাঝে মাঝে ঠাকুরের সেবার জন্য মিষ্টান্নাদি

দ্রব্য আনেন ; ফলাদি, থাল মিছরি ইত্যাদি। থাল মিছরিতে গোলাপ জলের গন্ধ। ঠাকুর কিন্তু সেই সব জিনিষ প্রায় সেবা করেন না। বলেন, ওদের অনেক মিথ্যা কথা কয়ে টাকা রোজগার করতে হয়। তাই উপস্থিত মাড়োয়ারীদের কথাচ্ছলে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাড়োয়ারীদের প্রতি)। দেখ, ব্যবসা করতে গেলে সত্য কথার আঁট থাকে না। ব্যবসায় তেজী মন্দি আছে। নানকের গল্পে আছে যে অসাধুর দ্রব্য ভোজন করতে গিয়ে দেখলুম যে সে সব জিনিষ রক্তমাখা হয়ে গেছে। সাধুদের শুদ্ধ জিনিষ দিতে হয়। মিথ্যা উপায়ে রোজগার করে জিনিষ দিতে নাই। সত্যপথে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। *

"সর্ব্বদা তাঁর নাম করতে হয়। কাজের সময় মনটা তাঁর কাছে ফেলে রাখ্‌তে হয়। যেমন আমার পিঠে ফোড়া হয়েছে সব কাজ কচ্ছি, কিন্তু মন ফোড়ার দিকে রয়েছে। রাম নাম করা বেশ। যে রাম দশরথের ছেলে, আবার জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আর সর্ব্বভূতে আছেন ; আর অতি নিকটে আছেন। অন্তরে বাহিরে।"

'ওহি রাম দশরথকী বেটা,
ওহি রাম জগৎ পশেরা
ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা
ওহি রাম সব সে নিয়ারা।'

---

* সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যকজ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেন নিত্যম্। ৩।১।৫।
সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। মুণ্ডকোপনিষৎ। ৩।১।৬।

বৈরাগীর ঝুলি

অস্থির হইয়া আমি, সংসার জ্বালায়
পালাইনু গৃহ ত্যজি গভীর নিশায়।
বৈরাগীর ঝুলি আব হরিনাম-মালা
লইনু এগুলি সঙ্গে, ভুলিবারে জ্বালা।
কত তীর্থ হেরিলাম ভূধর, কানন,
ভাবিলাম হয়ে গেছি সাধু একজন।
বিস্ময়ে হেরিনু শেষে "বৈরাগীর ঝুলি"
হয়ে গেছে মস্ত এক বাসনাব থলি।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একবার আমি তিন সপ্তাহ কলিকাতায় থাকি। বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার বাটীতে গিয়া তাঁহাকে দর্শন ও প্রণামানন্তর বলিয়াছিলাম, "মা, কিছুদিন কল্‌কাতায় থাক্‌বো। এখানে তোমাকে দর্শন করবার নিয়ম হয়েছে সপ্তাহে মাত্র দু দিন। যদি অনুমতি কর, তবে মাঝে মাঝে আস্‌বো।"

মা—আস্‌বে বৈ কি। যখন সুবিধা হয় আস্‌বে, আমাকে সংবাদ দেবে।

মায়ের কৃপায় যতদিন গিয়াছি, দর্শন পাইয়াছি।

একদিন বলিলাম, "মা, আমার ত শান্তি হয় না। মন সর্ব্বদা চঞ্চল—কাম যায় না।" এই কথা শুনিয়া মা এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন—কিছুই বলিলেন না। মার মুখ দেখিয়া আমার

আত্মগ্লানি আসিল—কেন মাকে ইহা বলিতে গেলাম! তাঁহার পদধূলি লইয়া শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ী গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে উপস্থিত হইলাম। মাষ্টার মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "আপনি ঠাকুরের অনেক পদসেবা করেছেন, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিন—মাথাটা গরম।"

তিনি বলিলেন, "সেকি? আপনি মায়ের ছেলে, মা আপনাকে খুব স্নেহ করেন। আপনি আমার নিকট কিসের কাঙাল? মা কি আপনাকে চেয়ে দেখেন নাই?"

আমি—হাঁ, অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখেছেন।

মাষ্টার মহাশয়—তবে আর কি? 'সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়!'

তিনবার খুব আবেগের সহিত তিনি এই কথাটি বলিলেন। মার অনেকক্ষণ চেয়ে দেখিবার অর্থ বুঝিলাম। আমি শান্ত হইলাম। মনে হইল মা যেন তাঁহার কৃপাদৃষ্টির অর্থ বুঝাইতে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট আমায় পাঠাইয়াছেন।

একদিন ভোরে আমার পরিবার এবং একটি মেয়েকে শ্রীশ্রীমার নিকট লইয়া গিয়া বলিলাম, "মা, ওরা ত সর্ব্বদা আস্‌তে পারে না। এরা আজ সারাদিন তোমার এখানে থাক্‌বে, আমি বৈকালে এসে নিয়ে যাব।"

ম —আচ্ছা, বেশ ত।

আমার স্ত্রীর কপালে সিন্দুর ছিল না। স্ত্রীভক্তদের মধ্যে কে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হাঁগা, তোমার কপালে সিন্দুর নেই কেন?" ঐ কথা শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন, "তা, আর কি হয়েছে? ওর এমন স্বামী সঙ্গে, নাই বা পরেছে।" এই বলিয়া মা স্বয়ং তার কপালে সিন্দুর পরিয়ে দিলেন।

আমার স্ত্রীর মনে হয়েছিল—'মা যদি অনুমতি করেন তবে পদসেবা করি।' মা কিছুক্ষণ পরে তাহাকে বলিয়াছিলেন, "এস বৌমা, আমার গায়ে মাথায় তেল মাখিয়ে দাও।" তেল মাখিয়ে চিরুণী দিয়ে চুল আঁচ্‌ড়ে দিতে দিতে তার ইচ্ছা হয়েছিল যদি এই চুল কিছু নিতে অনুমতি দেন ত

নিই। মা ঈষৎ হাসিয়া নিজেই বলিলেন, "এই নাও মা।" তারপর চিরুণীর গাত্র সংলগ্ন চুল ছাড়াইয়া তাহার হাতে দিলেন।

একটি স্ত্রীভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই বৌটি কে মা ?"

মা—রাঁচিতে সু—থাকে, তার বউ। ঠাকুরের উপর সু—র অগাধ বিশ্বাস।

সে দিন মা তাহাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে যান। আমরা যে কাপড় গামছা মার জন্য লইয়া গিয়াছিলাম, ব্রহ্মচারিগণ তাহা অনেকগুলি নূতন কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন। মা কিন্তু উহার ভিতর হইতে আমাদের দেওয়া কাপড় ও গামছা লইয়া স্নান করিতে গেলেন। গঙ্গাস্নান করিয়া ঘাটের ব্রাহ্মণকে মা একটি পয়সা দিয়া বলিলেন, "বৌমাকে চন্দন পরিয়ে দাও।" আহারের সময় নিজ পাত হইতে তাহাকে প্রসাদ দেন এবং আহারান্তে বিশ্রামের সময় পদসেবা করিতে বলেন। আমার মেয়েটি একখানি কম্বলে শুইয়া তাহাতে পেচ্ছাব করিয়াছিল। আমার স্ত্রী তাহা ধুইয়া দিতে উদ্যত হইলে মা তাহার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া নিজে ধুইয়া আনিলেন। পরিবার বলিয়াছিল, "মা, তুমি কেন ধোবে ?" মা উত্তর করিয়াছিলেন, "কেন ধোব না, ও কি আমার পর ?"

বৈকালে আমি উদ্বোধন আফিসে গিয়া দেখি একমাত্র উ—বাবু রহিয়াছেন। শুনিলাম অন্য সকলে বিবেকানন্দ সোসাইটীর উৎসবে গিয়াছেন। আমি নিজেই উপরে উঠিয়া মাকে প্রণাম করিতে তিনি বলিলেন, "দেখ, আজ ছেলেরা কেউ নেই, ভক্তদের দর্শনের দিন। তুমিই আজ সকলকে ডেকে আনবে, প্রসাদ দেবে।" কিছুক্ষণ পরে আমি ভক্তদের ডাকিয়া আনিলাম ও প্রণামান্তে প্রসাদ বিতরণ করিলাম। ক্রমশঃ ভক্তগণ চলিয়া গেলেন।

মা বলিলেন, "আজ তুমি আমার ঘরের ছেলেটি হয়েছ—সকলকে ডেকে আনলে, প্রসাদ দিলে।"

আমি—কেন, আমি কি তোমার ঘরের ছেলে নই ?

মা—হাঁ, তা বই কি—তুমি আমার আপনার ছেলে।

এই বলিয়া আমার পরিবারকে বলিলেন "হাঁ মা, সকলেই আমার

ছেলে, তবে কারো কারো সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক। ওর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক। দেখ্‌চনা সর্ব্বদা যায় আসে, খুব আপনার।"

তারপর আমাদিগকে প্রসাদ ও পান দিয়া মা আমার চিবুক ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "আর ভয় কি? খুব সহজ হয়ে গেছে ত? তোমাদের এই-ই শেষ জন্ম।" আমি বলিলাম, "সহজ বই কি? তোমার কৃপা হলেই সব সহজ।"

আমার স্ত্রী শ্রীশ্রীমায়ের জন্য একখানা আসন তৈয়ারী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহা পাইয়া মার খুব আনন্দ। সকলকে দেখান আর বলেন, "আহা দেখ, বউমা কেমন সুন্দর আসন তৈরী করেছে।" ভক্তের একটি সামান্য জিনিষ পাইয়াই তাঁহার এত আনন্দ!

* * *

আর একবার অপর চারিজন ভক্তসহ জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। কোয়ালপাড়া মঠ হইতে এমন সময় রওনা হই যে বেলা থাকিতেই শ্রীশ্রীমার বাড়ী পৌঁছিবার কথা। সঙ্গে ঐদেশী একটি কুলিও ছিল। আমার জানা রাস্তা, কিন্তু মার বাড়ার নিকটে গিয়া পথ ভুল হইয়া গেল। কিছুতেই আর পথ খুঁজিয়া পাই না। ঐদেশী লোকটিরও গোলমাল হইয়া গিয়াছে। ক্রমে রাত্রি হইল। সঙ্গীরা প্রমাদ গনিলেন। তখন আমরা সকলেই ক্লান্ত। কি করি এক বাঁশবনের ভিতরে আমি কম্বল পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম, মার উপর বড় অভিমান হইল। 'মা, আমরাই শুধু তোমাকে খুঁজ্‌বো, আর তুমি কিছু দেখ্‌বে না?' এমন সময় দেখি, একটি আলো লইয়া রাসবিহারী ও হেমেন্দ্র ব্রহ্মচারিদ্বয় আসিয়া উপস্থিত! এই রাত্রিবে এ পথে তাঁহাদের আগমনে বিস্মিত হইলাম। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা এ দিকে আস্‌বো, কোন কথাই ছিল না, ভাগ্যে ত এ পথে এসে পড়েছি।" শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বাবা, তোমরা বুঝি খুব ঘুরেছ?"

আমি—হাঁ মা, পথ ভুল হয়েছিল।

তখন শ্রীশ্রীমার জন্য নূতন বাড়ী হইতেছিল। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারিদ্বয় ঐ কাজে খুব ব্যস্ত থাকিতেন। শ্রীহট্ট হইতে দুটি ভক্ত আসিয়াছিলেন।

তন্মধ্যে একটি পূর্ব্বে (অরুণাচলের) দয়ানন্দ স্বামীর ভক্ত ছিলেন। তিনি ইঁহাকে প্রহ্লাদের অবতার বলিয়া নিজ ভক্তগণ মধ্যে প্রচার করিতেন। আমি উক্ত ভক্ত দুটিকে শ্রীশ্রীমার নিকট লইয়া যাই। তাঁহারা প্রণাম করিলে আমি বলিলাম, "মা, অরুণাচলে দয়ানন্দ নামে এক সাধু নিজেকে অবতার বলেন, এটি তাঁরই ভক্ত ছিল। তিনি বলিতেন—এ প্রহ্লাদ।" মা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "অবতারই বটে!"

এইবার মা এই ভক্ত দুটিকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

আমি আর একজন সাধুর নাম করিয়া বলিলাম যে তিনিও অনেক লোককে দীক্ষা দিতেছেন। মা বলিলেন, "এ সব অনেকটা ব্যবসাদার সাধু। তবে কি জান? এতেও উপকার হবে। মানুষ ত কিছু করে না, এদের কথাতেও কিছু কিছু ভগবানের নাম করবে।

"আন্তরিক হলে শেষটা ক্রমে এখানেই এসে পড়বে। দেখ্ চনা এখন তারকব্রহ্ম নামের ছড়াছড়ি। একটুও সার থাক্‌লে কেউ বড় বাদ যাবে না।"

আমাদের সঙ্গী ভক্ত চারটিকে মা দীক্ষা দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি ছোকরা ভক্তকে মা দীক্ষান্তে বলিয়াছিলেন, "একশ আট বার জপ করবে।" তাহাতে সে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহার ইচ্ছা হাজার, লক্ষ বার জপ করে। মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এখন মনে করছো বটে—সেত তোমরা পারবে না, কত কাজ তোমাদের করতে হয়। বেশী পার, ভালই।"

মাকে পূজা করিবার জন্য একদিন কিছু পদ্মফুল সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। মা বলিলেন, "কয়েকটি সিংহবাহিনীকে দিয়ে এস, আর কিছু রেখে যাও।" একটি ভক্ত বলিলেন, "সব ফুল আপনার পায়ে দিয়ে পূজো করবো।"

মা—আচ্ছা, সে হবে। এইত আমার পা, তার আবার পূজো!

মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, ঠাকুর বলতেন—'শুদ্ধাভক্তি সকলের সার।' আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন তাই লাভ হয়।" নিকটে আরও কয়েকজন ভক্ত ছিলেন। মা চুপ করিয়া রহিলেন। ক্রমে সকলে চলিয়া গেলে মা

আমাকে একান্তে বলিলেন, "ও কি সকলেরই হয় গা? তবে তোমার হবে।"

মা রাধুকে বলিয়াছিলেন, "রাধু, তোর দাদা এসেছে, প্রণাম কর্।" আমি ভাবিলাম—'সে কি? আমি যে কায়স্থ!' সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল— 'মা ত আর আমার অমঙ্গল করবেন না।' তখন উভয়েই উভয়কে প্রণাম করিলাম।

এক দিন পান্তাভাত খাইতে ইচ্ছা হওয়ায় মার কাছে গিয়া চাহিলাম। মা বলিলেন, "দাঁড়াও, আমি লঙ্কা মরিচ আর বড়া ভেজে দিই। তোমাদের দেশে খুব লঙ্কা ভাল বাসে।" গ্রামোফোনের অনুকরণে—"অষ্ট গণ্ডার একটাও কম দিমু না" বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

জয়রামবাটীতে অন্য একদিন মা বলিয়াছিলেন, "বাবা, সারাদিন যেন কুস্তি কচ্ছি—এই ভক্ত আস্‌ছে ত, এই ভক্ত আস্‌ছে। এ শরীরে আর বয়না। ঠাকুরকে বলে 'রাধু, রাধু' করে মনটা রেখেছি।" আমার মনে হইল—'ঠাকুর যেমন 'জলখাব', 'তামাক খাব' বলিয়া মনকে বাহ্য জগতে একটু নামাইয়া রাখিতেন, এ কি তাই? এত কষ্ট সহ্য করিয়া মা বহুজন-হিতায় শরীর রাখিতেছেন?'

বিদায় গ্রহণের সময় বলিলাম, "মা, আমার মত তোমার লাখ লাখ ছেলে আছে, কিন্তু তোমার মত মা আর আমার নেই।" এই কথা শুনিয়া মা সজল নয়নে সস্নেহে আমার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন।

*　　*　　*　　*

একবার শ্রীশ্রীমার অসুখের পর হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে রাঁচি আনিবার প্রস্তাব করিতে আমি জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। তখন চৈত্র মাস। প্রস্তাব শুনিয়া মা বলিলেন, "চৈত্র মাসে কোথাও যেতে নেই। তারপর, শরৎ * নিতে এসে এতদিন থেকে গেল, কল্‌কাতা না গিয়ে আর কোথাও কি করে যাই।"

সেই সময় স্বামী কেশবানন্দের একটি ভগ্নী মারা যান। আমি মাকে

---

* স্বামী সারদানন্দ।

বলিয়াছিলাম,"মা, বুড়ো বয়সে স্বামী কেশবানন্দের মা একটা শোক পেলেন—বড়ই দুঃখের কথা।"

মা বলিলেন, "তার শোকে কিছু কত্তে পারবে না।"

মার কথা শুনিয়া ফিরিবার পথে কোয়াল পাড়ায় আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম—তাঁর শোকের নাম গন্ধও নেই, সেই সদা হাস্যমুখ! ভাবিলাম—'স্বয়ং বশিষ্ঠ ঋষির শোক হয়েছিল, এ ঘরের যেন সবই নূতন!'

* * *

উদ্বোধনের বাটীতে একবার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাই। মাকে প্রণাম করিবার পর মা করযোড়ে ঠাকুরকে প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর, এদের সকল বাসনা পূর্ণ কর।"

আমি বলিলাম, "সে কি মা, সকল বাসনা পূর্ণ করলে ত উপায় নেই! মনে যে কত কুবাসনা রয়েছে।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের সে ভয় নেই। তোমাদের যা দরকার, যাতে ভাল হয়, ঠাকুর তাই দিবেন। তোমরা যা কচ্ছ করে যাও, ভয় কি? আমরা ত রয়েছি।"

* * *

জয়রামবাটীতে একদিন রাত্রি প্রায় ভোরের সময় বহির্ব্বাটীতে একটি গোবৎস বড়ই চীৎকার করিতেছিল। দুধের জন্য তাহাকে তাহার মার নিকট হইতে দূরে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। চীৎকার শুনিয়া মা এই বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিলেন—"যাই মা যাই, আমি এক্ষুনি তোকে ছেড়ে দেবো, এক্ষুণি ছেড়ে দেবো।" আসিয়াই বৎসের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। আমি অবাক্ হইয়া জগন্মাতার সর্ব্বভূতে করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখিলাম। হায়! এমনি করিয়া ডাকিতে পারিলেই ত বন্ধন মুক্ত হয়।

শ্রীশ্রীমার অপার স্নেহ, অসীম করুণা এবং অনন্ত দয়ার কথা লিখিয়া বুঝাইবার ভাষা নাই। আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন, স্পর্শন ও কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি—কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। শত শত ভক্ত সেই পরশমণি স্পর্শে সোণা হইয়াছেন।

অস্পৃশ্যতা নিবারণ প্রসঙ্গে—শ্রীচৈতন্যদেব ও মহাত্মা হরিদাসের মন্দির গমন সমস্যা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(তৃতীয় অংশ)

অস্পৃশ্যতা নিবারণের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী হইয়াও শ্রীচৈতন্যদেব হরিদাসকে মন্দিরে লইয়া যান নাই। ইহার কারণ যাহাই হউক, তিনি তাঁহাকে মন্দিরে লইয়া না গিয়া ভাল করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়।

এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, তিনি যদি সে সময়ে কোনও প্রকারে হরিদাসকে মন্দিরে লইয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে অস্পৃশ্যতা নিবারণের পথ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া যাইত, এবং সম্ভবতঃ তাহা হইলে উক্ত মহাপাপ বর্ত্তমান সময়ে এ প্রকার প্রবলাকার ধারণ করিতে পারিত না। কিন্তু বহির্মুখজনের বিরক্তির ভয় তাঁহাকে এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার উক্ত কার্য্যের এইদিক বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই। তবে এস্থলে ইহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, তিনি যদি সে সময়ে হরিদাসকে মন্দিরে লইয়া যাইতেন, (সম্ভবতঃ, তাঁহার পরমভক্ত পুরীর অধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সহায়তায় এ কার্য্য তিনি সহজেই সম্পন্ন করিতে পারিতেন) এবং তাহারই ফলে, বহির্মুখ জনের সহিত উদারপন্থীদের সে সময়ে যদি মনান্তর বা বিরোধ ঘটিত, তাহা হইলে কি তাহা সুখের বিষয় হইত ? বিশেষতঃ, কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তাহার যখন স্থিরতা নাই ; সামান্য একটি সর্ষপ প্রমাণ বীজ হইতেও যখন বিরাটকায় অশ্বত্থবৃক্ষের উৎপত্তি হয়, এক মুহূর্ত্তের অনুষ্ঠিত সামান্য একটি কর্ম্ম হইতেও যখন যুগব্যাপী মহা অনর্থের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়, এবং প্রতাপরুদ্র তথা তিনি, কেহই যখন চিরস্থায়ী

নহেন, তখন তাঁহাদের সমসময়ে না হউক, পরবর্ত্তী কোন সময়ে সেই মনান্তর বা বিরোধ যদি খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে সংঘটিত বহুযুগব্যাপী "Ten crusades"এর আকার ধারণ করিত, তাহা হইলে কি তাহা অধিকতর দুঃখের বিষয় হইত না? সুতরাং, বর্ত্তমান্ প্রসঙ্গে তিনি যদি ভীরুর ন্যায় কার্য্যই করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার সেই ভীরুতা বস্তুতঃ তাঁহার সহৃদয়তারই পরিচায়ক। কোনও কর্ম্ম করিতে হইলে, উহার ফলাফল সবিশেষ চিন্তা করিয়া তবে উহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়া।" "Think twice before you do" এই সকল ক্ষুদ্র বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ফলতঃ, কর্ম্ম অল্প করা বা একেবারে না করাও বরং শ্রেয়ঃ, তথাপি চিন্তা না করিয়া সহসা কোনও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে। অনেক সময়ে, কর্ম্ম না করাই বরং যথার্থ কর্ম্ম করা। অচিন্তাপূর্ব্বক সহস্র কর্ম্ম করা অপেক্ষা সুচিন্তাপূর্ব্বক একটি কর্ম্ম করা অথবা একেবারে কর্ম্ম না করাও বরং শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ সকল সময়েই চিন্তার পরিমাণ কর্ম্মের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা চিন্তা অপেক্ষা কর্ম্মের ভাগ অধিক হইলে, সেই সকল অচিন্তিতপূর্ব্ব কর্ম্মে অনর্থই অধিক উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমান প্রতীচ্য জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আমাদের এই কথার স্বার্থকতা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কর্ম্মত্যাগ শব্দের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। গীতাও এইজন্য 'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মা' হইবারই উপদেশ দিয়া থাকেন। কর্ম্ম করায় দোষ নাই, যদি তাহা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া লওয়া যায়। বিশেষতঃ, কর্ম্ম কথনও নির্দ্দোষ হয় না একথা যেমন সত্য, সকল কর্ম্মেরই সম্পূর্ণ না হউক কিছু না কিছু স্বার্থকতা আছে, একথাও আবার তেমনই সত্য। আবার "নহি কশ্চিদকর্ম্মকৃৎ"—কর্ম্ম না করিয়া কাহারও ক্ষণমাত্র থাকিবার সামর্থ্য নাই। এই জন্য ভক্তেরা আবার কর্ম্মত্যাগ করিবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা শুধু জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা হইয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবার পক্ষপাতী। ভক্তপ্রবর চৈতন্যদেবও এই জন্য কর্ম্মত্যাগী ছিলেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহার কর্ম্ম তিনি তাঁহার জ্ঞানাগ্নিদ্বারা কিরূপ সাবধানতার সহিত পরিশুদ্ধ করিয়া লইতেন, হরিদাসের মন্দির গমন সমস্যায় তাহা পূর্ণমাত্রায়

প্রকটিত। আমাদের এই কথা বুঝিতে হইলে তিনি হরিদাসকে মন্দিরে লইয়া যাইবার পক্ষপাতী না হইয়া, না লইয়া যাইবার পক্ষপাতী কেন হইয়াছিলেন তাহাই বুঝিয়া দেখিতে হয়। তাঁহাকে মন্দিরে না লইয়া যাওয়ায় ভালও যেমন হইয়াছিল, মন্দও তেমনই হইয়াছিল। কিন্তু ফল যাহাই হউক, তিনি উক্ত কার্যে তাঁহার প্রেমিকতা, ত্যাগশীলতা, সমদর্শিতা, চিন্তার গভীরতা, জ্ঞানের প্রশস্ততা, সর্বোপরি তাঁহার নিরভিমানিতার যে অত্যদ্ভুত চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, বিস্ময়ে নির্বাক হইতে হয়।

হরিদাস তাঁহার পরম ভক্ত। তাঁহার প্রতি তাঁহার অধিক অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক। এরূপ স্থলে তাঁহাকে মন্দিরে লইয়া গেলে, তাঁহার সামান্য মায়িক জীবেরই ন্যায় কার্য্য করা হইত। সুতরাং, বহির্মুখ জনের সন্তুষ্টির জন্য তিনি নিজ জনের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া প্রকৃত প্রেমিকেরই কার্য্য করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, তাঁহার এই কার্য্য সকল দিক দিয়াই সুসঙ্গত হইয়াছিল। ইহাতে কাহারও প্রতি তাঁহার কোন প্রকার অবিচার করা হয় নাই। স্পৃশ্যাভিমানীদের মন্দিরের অধিকার পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং, তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদিগকে তাহা কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়াছিলেন। কমও কিছু দেন নাই, বেশীও কিছু দেন নাই। অতএব, ইহাতে তাঁহাদের ক্ষুব্ধ হইবার কিছুমাত্র কারণ ছিল না। মন্দিরের প্রয়োজন নিম্নাধিকারীর জন্য, সুতরাং মন্দিরের অধিকার তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গতই হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, হরিদাসের ন্যায় উচ্চাধিকারীদের —যাঁহাদের দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বই ভগবানের মন্দির, তাঁহাদের বাহ্য মন্দিরে যাওয়া না যাওয়ায় কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। তবে, হরিদাসকে মন্দিরে লইয়া গিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলে যে সকল ব্যক্তির সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত সহজে মন্দিরের অধিকার লাভ হইত, ইহাতে ক্ষতি যদি কাহারও করা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদেরই করা হইয়াছিল আপাত দৃষ্টিতে এই প্রকারই মনে হয়। বস্তুতঃ ইহাতে তাহাদের কোন ক্ষতিই করা হয় নাই। কেন না তাহারা বাহ্য মন্দিরে যাইবার জন্য

ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, চৈতন্যদেব শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠান ভূমি মানবের যে হৃদয় মন্দির, তাহাদিগকে তাহারই সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। হরিদাস মন্দিরে না গিয়াও পরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকেও তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। মন্দিরে না গিয়াও কেমন করিয়া বড় হওয়া যায়, কেমন করিয়া শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায়, তাহাদের সম্মুখে এই উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিবার জন্যই তিনি হরিদাসকে মন্দিরে লইয়া যান নাই। বস্তুতঃ অস্পৃশ্যেরা কাচ চাহিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে কাঞ্চন দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অতএব তাহারা যাহা চাহিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং হরিদাসকে মন্দিরে না লইয়া গিয়া তিনি অস্পৃশ্যদের স্বার্থ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেন নাই। আর যদি করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিজ জন ভাবিয়াই করিয়াছিলেন। মহাপুরুষগণ তাঁহাদের নিজের এবং নিজ জনের স্বার্থ ভিন্ন অন্যের স্বার্থ কদাপি ক্ষুণ্ণ করেন না। তাঁহার দ্বারা তাহাদের যদি ক্ষতিই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাঁহার নিজ জন হইবার সৌভাগ্যলাভ করায় তাহাদের সেই ক্ষতি সম্যক পূরণ হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় পতিত পাবন দীনবন্ধুর আত্মীয়তা লাভ করা দীনহীন পতিত জনের অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। তিনি ছিলেন বস্তুতঃ পতিতেরই বন্ধু। অভিজাত ব্যক্তি তাঁহার কেহই ছিল না। অস্পৃশ্যদের মন্দিরে যাইবার সুযোগ তিনি যদি নষ্টও করিয়া থাকেন, তথাপি তাহাদিগকে চিন্ময় মন্দিরের মণিকোঠায় যাইবার—প্রকৃত ভক্ত হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তাহাদের যাহা ক্ষতি করিয়াছিলেন, পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব বুঝিয়া দেখিলে ইহাতে তাহাদের দুঃখিত হইবার কিছুমাত্র কারণ ছিল না।

কিন্তু তাই বলিয়া অস্পৃশ্যদিগকে তিনি যে উচ্চতর সত্য দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, স্পৃশ্যাভিমানিগণকেও তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার প্রয়াস পান নাই। কাহাকেও তিনি ইতর বিশেষ করিয়া দেখিতেন না। পক্ষপাতিত্ব তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। তবে কাহাকেও কোন বস্তু দিতে হইলে, সেই বস্তু পাইবার জন্য তাহার আগ্রহ জন্মাইয়া দেওয়া

সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তাঁহারা স্পৃশ্য হইয়াও মন্দিরের যে অধিকার কৃপণের ন্যায় রক্ষা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, অস্পৃশ্যগণ এমন কি উচ্চতর সত্য লাভ করিয়াছিল, যাহার ফলে তাহাদের সেই চির ঈপ্সিত মন্দিরের অধিকারও তাহাদের নিকটে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়াছিল —চৈতন্যদেব অস্পৃশ্যদিগকে মন্দিরে যাইতে না দিয়া স্পৃশ্যাভিমানিগণকে এই কথাই বুঝিয়া দেখিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি তাহাদিগকে উচ্চতর সত্যের—ভক্তিমার্গের অধিকারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এই একই নির্বিবোধ উপায়ে তিনি অস্পৃশ্যদের মন্দির গমনও সম্ভবপর করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। মন্দিব সম্বন্ধে সংকীর্ণ সংস্কার বশতঃই স্পৃশ্যাভিমানিগণ অস্পৃশ্যদিগকে মন্দিবে প্রবেশাধিকার দিতে সম্মত হন না, এবং অস্পৃশ্যেরাও আবাব মন্দিরে যাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়—ঐ সংকীর্ণ সংস্কার বশতঃই। অন্যথা মন্দিরের যথার্থ স্বরূপ উভয়েই যদি বুঝিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আর মন্দির প্রবেশের অধিকার অনধিকাব লইয়া কোন কথাই উত্থাপিত হয় না। তিনি এই জন্যই মন্দিরেব যথার্থ স্বরূপ বুঝাইয়া সকলকেই প্রেমের একই সমভূমিতে আনয়ন কবিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বিবোধের দ্বারা পার্থক্যেরই শুধু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু মিলন সম্ভবপর হয় প্রেমেব দ্বারা। এই জন্যই, তিনি স্পৃশ্যাস্পৃশ্য কাহাকেও পৃথক্ দৃষ্টিতে না দেখিয়া, একই অভেদ নীতির দ্বারা উভয়কে একই উচ্চতর ভূমিতে উন্নীত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাব সমদর্শীতার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। ভূমাব নীতিই অভেদনীতি। সুতরাং কর্ম্ম করিতে গিয়াও তিনি ভূমাজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হন নাই। এস্থলে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বস্তুতঃই ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। অতএব, উহা নৈষ্কর্ম্মের স্থানই অধিকার করিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, অভেদ প্রচার করা ছিল মহাপ্রভুর জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত। তাঁহার অন্তরের কামনা ছিল তাই, হরিদাসকে মন্দিরে লইয়া গিয়া লোক সমক্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা—অস্পৃশ্যতা রাক্ষসীকে জগৎ হইতে দূরীভূত করিয়া দেওয়া। কিন্তু হায়! তাঁহার বিরোধী বহির্মুখ

জনেরই পরিতৃপ্তির জন্য তিনি জীবনের সেই চির পোষিত কল্যাণময়ী শুভ আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। লোক হিত সাধনার সেই পরম পুণ্যব্রত অপূর্ণ রাখিয়াছিলেন, স্বাভীষ্ট সিদ্ধির মূলে স্বয়ং কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। যাহার যাহা পরম শ্রেয়ঃ, পরের তৃপ্তির জন্য তাহার তাহাই পরিত্যাগ করা যদি প্রকৃত ত্যাগ হয়, তাহা হইলে তাঁহার এই ত্যাগ মাহাত্ম্যের তুলনা নাই। * * * জ্ঞানীর মন্দির সম্বন্ধীয় সংস্কার যতই উদার হউক, বহির্মুখ জন যতক্ষণ উহার সার্থকতা বুঝিতে সমর্থ না হয়, ততক্ষণ তাহাদের নিকট উহা নিরর্থক। পক্ষান্তরে, তাহাদের মন্দিরসংক্রান্ত সংস্কার আবার যতই সংকীর্ণ হউক এবং জ্ঞানীর নিকটে উহার মূল্য যতই অল্প হউক, তাহাদের নিকট উহার মূল্য কিন্তু অনেক অধিক। ফলতঃ, অল্প-বিস্তর সকল মতই সার্থক। সুতরাং, প্রত্যেক মতই সকলের জন্য না হউক অন্ততঃ কাহারও না কাহারও জন্য প্রয়োজনীয়। আবার, যতই উৎকৃষ্ট হউক কোনও মতই সকলের পক্ষে উপযোগী নহে। বৈচিত্র্যই সৃষ্টির নিয়ম। মত বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তাও তাই অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং আমার যাহা মত, আমি যাহা বুঝি, তাহাই উৎকৃষ্ট, অতএব সকলের গ্রহণীয়, এইরূপ মনে করা ভ্রম। বিশেষতঃ, 'আমার মত উৎকৃষ্ট, উহার মত নিকৃষ্ট', আমাদের এই প্রকার যে ভেদবুদ্ধি জন্মে, তাহা আমাদের স্বার্থবুদ্ধি বশতঃ। যে মত আমাদের স্বার্থের অনুকূল, তাহাই আমাদের নিকটে উৎকৃষ্ট এবং যাহা প্রতিকূল, তাহাই আবার আমাদের নিকটে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মহাপুরুষেরা অকিঞ্চন্, তাঁহারা সকল মতই তাই তুল্য সার্থক বলিয়া মনে করেন। চৈতন্য দেবও এই জন্য "আমার মতই শ্রেষ্ঠ (যদিও তাঁহার মত বস্তুতঃই শ্রেষ্ঠ ছিল) অতএব সকলেরই গ্রহণীয়" ইত্যাকার মিথ্যা গর্ব্বে অন্ধ হইয়া পর মতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই, বরং শ্রদ্ধাধিক্যই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "তোমাদের হিতের জন্য আমি যাহা বলি, অবোধ তোমরা, অবিচারে তাহা গ্রহণ কর" প্রতীচ্য নেতৃবৃন্দের ন্যায় এই প্রকার 'সবজান্তা হাম্‌বড়া' ভাবের পরিচয় দিয়া তিনি প্রকৃত জ্ঞানীর নিকটে হাস্যাস্পদ হন নাই। প্রতীচ্য

জগৎ যাহাই মনে করুন, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ইহা অল্প গৌরবের কথা নহে। চৈতন্যদেবও এই কারণে বরং ধ্বংসমূলক কার্য্যের পক্ষপাতী না হইয়া গঠন-মূলক কার্য্যেরই অধিক পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য পদ্ধতি অহিংসা নীতিরই উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাই তিনি যদিও ভক্তিবাদ এবং প্রেমধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তথাপি দেবতাবাদ এবং তথাকথিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কখন একটি কথাও বলেন নাই, বরং অনেক স্থলে উহার পোষকতাই করিয়াছিলেন। কেন না তিনি বুঝিতেন পুতুল বা প্রতীক, বাহ্য আচার বা অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র সার্থকতা নাই, মূল ভাব লইয়াই কথা। বিশেষতঃ, তিনি স্বয়ং ছিলেনও ভাবগ্রাহী মহাপুরুষ।

তৃতীয়তঃ, কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করিতে হইলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্য কোন বস্তু তাহাকে' দিয়া তবে উহা গ্রহণ করিতে হয়। অন্যথা, বল প্রয়োগ করিয়া উহা লইতে যাওয়া অন্যায়। স্পৃশ্যাভিমানীদিগকে 'চিন্ময় মন্দিরের' অধিকারী না করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে 'মৃন্ময় মন্দিরের' অধিকাব (তাহা যতই তুচ্ছ হউক) বল পূর্ব্বক গ্রহণ করতঃ অস্পৃশ্যদিগকে তাহা দিতে যাওয়া—বস্তুতঃ অন্যায়। কেননা, তাহাতে উভয়ের মধ্যে বিবোধ ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা ; এবং বিরোধের ফল কদাপি শুভ হয় না। অস্পৃশ্যদের মন্দিরে যাইবার উদ্দেশ্য, ভগবানের পূজা করা ; এবং স্পৃশ্যদের তাহাতে বাধা দিবার উদ্দেশ্য আবার, যাহাতে তাঁহাদের ভগবৎ পূজায় বিঘ্ন না হয়। সুতরাং উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—ভগবানের পূজা করা। বিরোধ হইলে উভয়ের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায় ; কাহারও ভয়ে কেহই তখন পূজা করিবার জন্য মন্দিরে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য যখন এক, তখন উভয়ের সিদ্ধিরও তাই একই পন্থা, এই কথা স্মরণ রাখিয়া ধীরচিত্তে সহিষ্ণুতার সহিত পরস্পর সুবিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে উভয়েরই উদ্দেশ্য তাহাতে সহজে সিদ্ধ হয়। এই জন্য যে স্থলে বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা, সেস্থলে জ্ঞানীদেরই কর্ত্তব্য রণে ক্ষান্ত দেওয়া—নিজেদের তথা বিপক্ষদের

উভয়েরই কল্যাণের জন্য। কোন দ্রব্য লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে স্নেহময় বুদ্ধিমান্ ভ্রাতার কর্ত্তব্য, উক্ত দ্রব্য তাঁহার নির্ব্বোধ ভ্রাতাকেই ছাড়িয়া দেওয়া। এই জন্য শ্রীচৈতন্যদেব মন্দিরের অধিকার স্পর্শাভিমানী দিগকেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; এবং এই জন্যই তিনি অস্পৃশ্যদিগকে মন্দিরে লইয়া যাইতে তত ব্যস্ত হন নাই, যত ব্যস্ত হইয়াছিলেন তিনি বহির্মুখ জনকে অন্তর্মুখ করিবার জন্য। বিশ্ব—বিশ্বেশ্বরের নিবাস ভূমি, মন্দির সেই বিশ্বেরই প্রতীক, এ কথা যিনি না বুঝেন, তাঁহাকে পৌত্তলিক ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। তিনি তাই প্রাণপণ করিয়াছিলেন পৌত্ত-লিকদিগকে প্রকৃত ভক্ত করিবার জন্য। মন্দির সম্বন্ধে তাঁহাদের সংকীর্ণ ধারণার যাহাতে পরিবর্ত্তন হয়, যাহাতে তাহারা পৌত্তলিকতার নিম্নভূমি অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিকতার—পরা ভক্তির উচ্চ সোপানোপরি আরোহণ করিতে সমর্থ হন, তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহারই জন্য। ফলতঃ, তিনি বাহ্য সংস্কারের জন্য ব্যতিব্যস্ত হন নাই। তিনি সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন অন্তরের দিক দিয়া। ফল পাকিলে বোঁটা যেমন আপনিই খসিয়া যায়, ভাব-বিপ্লব সম্পূর্ণ হইলে কার্য্যও তখন তেমনই স্বতঃই বন্ধ হইয়া যায়। অথবা, ভাব-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যও তদনুপাতে অগ্রসর হইয়া মন্দিরের যথার্থ স্বরূপ কি, লোকে অগ্রে যদি তাহাই জানিতে পারে, তাহা হইলে মন্দির গমন সমস্যার সমাধানও তখন আপনিই হইয়া যায়, তাঁহার অদ্ভুত মনীষা বলে একথা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় তিনি অন্তশ্চিকিৎসা করিতেই অধিক মনো নিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি তাই বোঁটা ছিঁড়িবার জন্য তত ব্যস্ত হন নাই, যত ব্যস্ত হইয়াছিলেন ফল পাকাইবার জন্য। এই প্রকার চিন্তা-শীলতা এবং জ্ঞান গভীরতার দৃষ্টান্ত জগতে অধিক আছে বলিয়া মনে হয় না।

সর্ব্বোপরি, শ্রীচৈতন্যদেবের নিরভিমানিতার বস্তুতঃ তুলনা নাই। 'Desire for fame is the last infirmity of man'—এ কথা তাঁহার সম্বন্ধে আদৌ খাটে না। তিনি দরদী নিতাইকে কাঁদিয়া

বলিয়াছিলেন—

"আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল, জীব উদ্ধার নাহি হল,
ঋণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়া যাই।"

তিনি জীবের উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের সকলের তিনি উদ্ধার সাধন করিতে পারেন নাই; সমস্ত বহির্মুখ জনকে অন্তর্মুখ করিবার সামর্থ্য তাঁহার হয় নাই। তাঁহার 'অল্প সঞ্চিত ধন' অল্প লোককে দিতেই ফুরাইয়া গিয়াছিল। তিনি তাই আপনাকে অক্ষম এবং দোষী মনে করিয়া নিতায়ের নিকট আপনার হৃদয়-বেদনা মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে আপনার অক্ষমতা অকপটে নিবেদন করিয়াছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যদিগকে স্পৃশ্য করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বহির্মুখ জনের প্রতিকূলতা বশতঃই তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন নাই। অথচ এ জন্য তিনি তাহাদিগকে দোষী বলিয়া মনে করেন নাই. তিনি নিজে কেন তাহা-দিগকে বুঝাইয়া অন্তর্মুখ করিতে পারেন নাই এইরূপ ভাবিয়া আপনাকেই ধিক্কার দিয়াছিলেন। অথচ হিন্দু সমাজের সেই 'অচলায়তনের' দিনে কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ অহিংস থাকিয়া তিনি যে মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন. তাহা তুচ্ছ বলিয়া মনে করিবার কিছু মাত্র কারণ নাই। তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা বস্তুতঃই অতুলনীয়। যাহা তিনি পারেন নাই, তাহা এ পর্য্যন্ত কোনও মহাপুরুষই করিতে সমর্থ হন নাই এবং ভবিষ্যতে কেহ হইবেন কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। সমস্ত জীবের উদ্ধার করিতে তিনি কেন, এ পর্য্যন্ত কোনও মহাপুরুষই সমর্থ হন নাই। মর্ত্ত্যদেহ ধারণ করিয়া তাহা করিতে সমর্থ হওয়া একান্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং ইহাতে তাঁহার দুঃখিত হইবার কিছুই ছিল না। অথবা জীবের দুঃখ চিরন্তন, তাহা দূর করিবার জন্য তাঁহার অন্তরেও বোধ হয় তাই ঐ প্রকার চিরন্তনী ইচ্ছা জাগিয়াছিল। বিশেষতঃ, তিনি জীবের দুঃখ দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া নহে। জীবের নিকট তিনি ঋণী ছিলেন। সেই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য উহা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। মানব মাত্রই ভূমার নিকটে এই

প্রকার ঋণী। যিনি এই ঋণ স্বীকার করিয়া তাহা পরিশোধ করিবার জন্য যত্নপর হন, তিনি ধন্য। এই 'জগৎ-রাধা'র ঋণের দায়ে অর্থাৎ সমষ্টির পরিত্রাণের জন্য যিনি মুক্ত স্বরূপ হইয়াও স্বয়ং অনন্ত বন্ধন মাগিয়া লন, তাঁহার মাহাত্ম্য যে কত অধিক তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু এত করিয়াও তিনি তৃপ্ত হন নাই; এবং জীবের জন্য তিনি বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

(উপসংহার)

পরিশেষে বক্তব্য এই, চৈতন্যদেব জাতিভেদ প্রথা আদৌ মানিতেন না। হরিদাসের মৃত দেহ তিনি স্বহস্তে পুরীর সমুদ্র তীরে সমাহিত করিয়াছিলেন। অস্পৃশ্যতা নিবারণের তিনি সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। অথচ, কার্য্যগতিকে তিনি হরিদাসের ন্যায় মহাপুরুষেরও মন্দির গমন সমর্থন করিতে পারেন নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় কর্ম্মের কি গহনা গতি * এবং যাহা ভাবা যায়, তাহা কার্য্যতঃ করা কত কঠিন। করিলেও তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয় না, বরং অনেক সময়ে বিকৃত হইয়া যায়। হরিদাসকে মন্দিরে না লইয়া গিয়া শ্রীচৈতন্যদেব যে কিরূপ গভীর দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ইহাই তাঁহার অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য এবং তাঁহার লোকপাবন অবতারত্বের যথার্থ পরিচয়। পরমহংসদেব এই জন্যই বলিতেন, "চৈতন্যদেব ব্রহ্মজ্ঞান আঁচলে বেঁধে তবে কাজে নেমে ছিলেন।" তাঁহার কর্ম্মে ভেদনীতির যথার্থই স্থান ছিল না। কর্ম্ম করিতে গিয়া তিনি ভেদ নীতির দ্বারা কুত্রাপি পরিচালিত হন নাই, সর্ব্বত্রই তাঁহার সাম্য ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সুতরাং, তিনি কর্ম্মকৃৎ হইয়াও যথার্থ ব্রহ্মবিৎ ছিলেন।

শ্রীসাহাজী।

---

* গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।

সাংখ্য-দর্শন

৩৬

এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি ॥

পদপাঠ—এতে প্রদীপকল্পা পরস্পর বিলক্ষণা গুণ বিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্য অর্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি ॥

অন্বয়ঃ—গুণ বিশেষাঃ প্রদীপকল্পাঃ পরস্পর বিলক্ষণাঃ এতে
পুরুষস্য কৃৎস্নং অর্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি।

এতে অর্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি—এই পাঁচটি শব্দ এই কারিকার প্রধান শব্দ। এই সকল করণেরা অর্থ প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে প্রদান করে।

এতে—ইহারা। কাহারা? বুদ্ধি ব্যতীত অপরাপর করণেরা। এই সকল করণেরা কিরূপ? গুণ বিশেষাঃ, পরস্পর বিলক্ষণাঃ এবং প্রদীপ কল্পাঃ। ইহারা করণ সমূহের বা 'এতে'র বিশেষণ।

গুণ বিশেষাঃ—গুণের বিশেষ, ত্রিগুণের বিকার। শব্দে সত্ত্বগুণের, পায়ুতে তমগুণের বিশিষ্টতা আছে।

পরস্পর বিলক্ষণা=পরস্পর হইতে পৃথক, পরস্পরের লক্ষণ পৃথক। রূপ প্রকাশক চক্ষুর লক্ষণ, শব্দ প্রকাশক কর্ণের লক্ষণ হইতে বিভিন্ন, যাহা চক্ষুর লক্ষণ তাহা কর্ণের বিলক্ষণ।

প্রদীপকল্পা=ব্যবহারে যাহারা প্রদীপের তুল্য। প্রদীপের অঙ্গ তৈল, বর্ত্তি এবং অগ্নি। তৈল অগ্নি শিখায় ঢালিয়া দিলে শিখা লোপ পায়। বর্ত্তি না হইলে শিখা হয় না। অগ্নি তেল এবং বাতি একত্রে মিলিয়া প্রদীপরূপে যেরূপ আলোক প্রদান করে, করণেরাও সেইরূপ ভাবে কাজ করে। এইজন্য করণগণকে প্রদীপকল্পা বলা হইয়াছে।

করণেরা সকলই একই উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বীয় বৃত্তি পরিচালনা করিতেছে।

করণেরা কি করিতেছে—প্রকাশ্য প্রযচ্ছন্তি প্রকাশ করিয়া অর্পণ করিতেছে। কি প্রকাশ করিতেছে? কৃৎস্নং পুরুষস্য অর্থং=পুরুষের ভোগ্য সমস্ত বিষয়। কৃৎস্নং=সর্ব্বং, সমস্তই। অর্থং=ভোগ্য। প্রকাশ্য= প্রকাশ করিয়া, আদায় করিয়া। বুদ্ধৌ=বুদ্ধিতে, প্রযচ্ছন্তি=অর্পণ করে। অর্থ—বাহ্য ইন্দ্রিয় মন এবং অহংকার ইহারা গুণত্রয়ের বিকার। যেমন বর্ত্তি, তৈল ও বহ্নি ইহারা অন্ধকার দূরকরতঃ রূপের প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মিলিত হইয়া প্রদীপ হয়, সেইরূপ উহারা পরস্পর বিভিন্ন লক্ষণ যুক্ত হইয়াও ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থ সম্পন্ন করিতে মিলিত হয়। বুদ্ধি ব্যতীত অন্যান্য করণেরা পুরুষের ভোগ্য সমস্ত বিষয় আদায় করিয়া বুদ্ধিতে অর্পণ করে।

৩৭

বুদ্ধি=চিত্ত, জ্ঞ=পুরুষ, চৈতন্য, আমি, চিৎ। বুদ্ধি প্রথম ব্যক্ত। ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্জগত এবং অন্তর্জগতের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। চিত্ত-বৃত্তি রূপরসাদির আকার ধরিয়া চিৎ সম্মুখে প্রকাশ পায়। উক্ত প্রকাশকে অনুভূতি বলে। তীরস্থিত বৃক্ষের সরোবরের জলে প্রতিবিম্ব পড়ে। বিষয় রঞ্জিত চিত্তবৃত্তির 'চিৎ' দর্পণে প্রতিবিম্ব হয়। চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব দ্বারা আচ্ছন্ন যে চিৎ তাহাই ভান, তাহাই অনুভূতি তাহাই ভোগ। (ভান=প্রকাশ) উক্ত ভোগ চিত্তবৃত্তিতে থাকে। বুদ্ধি চৈতন্যের সন্নিধান বশতঃ চৈতন্যের ন্যায় হয়, এবং স্বীয় অনুভূতি পুরুষে বা 'আমি'তে আরোপ করে। ইহার ফলে বুদ্ধি নিজেকে আমির সহিত এক করিয়া ফেলে, এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী বোধ করে। ইহাই হইল ভোগ। আমি অসঙ্গ, তবুও বুদ্ধি আমির সহিত নিজেকে অভেদ বোধ করিয়া আমি ভোক্তা কর্ত্তা বলিয়া, সঙ্গযুক্ত বলিয়া বোধ করে। এই বোধ ঠিক জ্ঞান নয়। বুদ্ধি ভ্রান্ত জ্ঞানবশে আপনাকে চৈতন্য হইতে অভিন্ন মনে করিয়া "আমি সুখী, আমি দুঃখী" মনে করে। ঐ ভুল জ্ঞান নষ্ট হইলে বুদ্ধি আপনাকে বা প্রকৃতিকে আমি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারে এবং তখন 'আমি' স্বরূপে অবস্থান করে। বুদ্ধির যে জ্ঞানে সে চিৎকে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে সেই জ্ঞানের

নাম বিবেক না বিজ্ঞান। বিজ্ঞান দ্বারা দুঃখের চরম নিবৃত্তি হয়। ইহাই হইল অপবর্গ। পঞ্চভূত হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত জড়বর্গ হইতে 'নেতি নেতি' রূপ স্বাতন্ত্র্য বোধের অভ্যাস দ্বারা বিবেক উৎপন্ন হয়। সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব সমুদায় পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন এবং ধ্যানের দ্বারা বিজ্ঞান বা বিবেক উপস্থিত হইলে প্রকৃতির আর কার্য্য থাকে না। পুরুষের ভোগের জন্য যে স্বর্গ বা সৃষ্টি তাহা নিরুদ্ধ হয়। পুরুষার্থ দ্বিবিধ, যথা ভোগ এবং অপবর্গ।

সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানপুরুষান্তরং সূক্ষ্মম্ ॥

পদপাঠ—সর্ব্বং প্রতি উপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সা এব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধান পুরুষ অন্তরং সূক্ষ্মম্ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মাৎ বুদ্ধিঃ সর্ব্বং পুরুষস্য প্রত্যুপভোগং সাধয়তি,
সা এব পুনঃ চ সূক্ষ্মং প্রধান পুরুষান্তরং বিশিনষ্টি।

যস্মাৎ=যে হেতু, বুদ্ধিঃ, সাধয়তি=সাধন করে। কি সাধন করে? পুরুষস্য প্রত্যুপভোগং=পুরুষের প্রত্যেক উপভোগ। সর্ব্বং =সমস্তই, উপভোগের বিশেষণ। সা এব=সেই বুদ্ধি। পুনঃ চ= পুনরায় কি করে? বুদ্ধিঃ বিশিনষ্টি=প্রকাশ করে। (বিশেষ করে) যাহারা জড়ান ছিল তাহাদিগকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখাইয়া দেয়। কি প্রকাশ করে? প্রধান পুরুষান্তরং=প্রধান ও পুরুষের মধ্যে যে অন্তর বা ভেদ। সে ভেদ কিরূপ? সূক্ষ্মং বা দুর্লক্ষ্য। প্রধান ও পুরুষ যখন জড়াইয়াছিল তখন কে কি করিতেছে বুঝা যাইত না।

পুরুষের ভোগ বুদ্ধি কর্ত্তৃক কিরূপে সাধিত হয় বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে আলোচনা সংকল্প অভিমান এবং অধ্যবসায়ের কথা বলা হইয়াছে। অন্তঃকরণের অপর নাম চিত্ত। চিত্ত আলোচনাদি প্রক্রিয়ার বিষয় দ্বারা উপরঞ্জিত হয়। বিষয়ের আলোচন, সংকল্প, অভিমান বিষয়ের আকারে পরিণত হইয়া বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার বুদ্ধির স্বকীয় ব্যাপার অধ্যবসায়ের সহিত এক ব্যাপার হইয়া যায়। ইহাই হইল বুদ্ধির উপরঞ্জন। বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত চিত্ত বৃত্তির প্রতিবিম্ব

চিৎ সরোবরে পড়ে, যেমন তীরস্থিত বৃক্ষ সকলের প্রতিবিম্ব সরোবরের জলে পড়ে। চিৎ, চৈতন্য পুরুষ, জ্ঞ এ সমুদায় একই পদার্থের ভিন্ন নাম। চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব পুরুষে পড়িলে চিত্তবৃত্তি পুরুষের জ্ঞানের বিষয় হয়। পুরুষ বুদ্ধির প্রতি সংবেদী। ধ্বনি প্রতিফলিত হইলে প্রতি-ধ্বনি হয়। পর্ব্বত নিকটে থাকিলে ধ্বনির যেমন প্রতিধ্বনি হয়, বুদ্ধিবৃত্তি বা সংবেদের সেইরূপ চৈতন্যের সন্নিধ্যবশতঃ প্রতিসংবেদ হয়। বিম্বের প্রতিবিম্ব হয়; দর্পণ, সরোবর প্রতিবিম্বের আধার বা ফলক। বুদ্ধি বৃত্তির যে প্রতিসংবেদ তাহাব আধার বা ফলক হইতেছে চিৎ বা পুরুষ। সরোবরেব জলে বৃক্ষাদি না থাকিলেও যেমন বৃক্ষকে সরোবরের বলিয়া লক্ষিত হয়, সেইরূপ সুখ দুঃখ মোহাত্মক বুদ্ধি বা বুদ্ধির সুখ দুঃখ মোহ প্রতিসংবেদ হেতু চৈতন্যে লক্ষিত হয়। সুখ দুঃখের, অনুভবকে ভোগ বলে। উক্ত ভোগ বুদ্ধি বৃত্তিতে থাকে। আমি সুখী, আমি দুঃখী এইরূপ যে বৃত্তি ইহা বুদ্ধি বৃত্তি। এই ভোগ চিৎ সরোবরে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিৎ বা পুরুষকে উপভোগ করায়। ইহা হইল পুরুষেব ভোগ। অনেকটা ঠাকুর ভোগের মত, সেবাইত বিগ্রহের নিকট নৈবেদ্য ধরে বিগ্রহ তাহা ভোগ করে। বিষয় সংযোগে বুদ্ধিতে সতত পরিনাম ঘটিতেছে, বুদ্ধি কখন বৃক্ষ কখন নদী, কখন সুন্দর কখন কুৎসিত। তজ্জন্য বুদ্ধির নানামূর্ত্তি বা ভাব হইতেছে। বুদ্ধির সম্মুখে চিৎ দর্পণ। বুদ্ধি স্বীয় সতত পরিবর্ত্তনশীল মূর্ত্তি লইয়া এক বিরাট স্বচ্ছ বস্তুর সান্নিধ্যে বসিয়া আছে। সে জানেনা যে তাহার সম্মুখে দর্পণ। দর্পণের যদি সে সীমা বা ফ্রেম দেখিতে পাইত, তবে তখনই বুঝিত তাহার সম্মুখে দর্পণ। কিন্তু এই স্বচ্ছ পদার্থ বিরাট। রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডব সভায় ময় দানব যে দর্পণ রচনা করিয়াছিল এবং যাহাতে দুর্য্যোধনেরও ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল তদপেক্ষা এই স্বচ্ছ পদার্থ কোটী কোটী গুণ বৃহৎ। বুদ্ধি প্রতিবিম্বকে বিম্বরূপে দেখিতে লাগিল। নকলকে আসল বলিয়া দেখিতে লাগিল। মুখ বিম্ব, এবং দর্পনস্থ মুখ প্রতিবিম্ব। ইহাই হইল ভোগ। বুদ্ধি যখন বুঝিবে একটি স্বচ্ছ পদার্থ আছে, তাহাতেই তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, বস্তুতঃ স্বচ্ছ পদার্থে বিম্ব নাই, তাহার যথার্থ জ্ঞান ঘটিবে,

পুরুষকে পৃথক বলিয়া জানিবে। এই জ্ঞানের নাম বিবেক জ্ঞান। ইহার অপর নাম অপবর্গ।

পূর্ব্ব কারিকায় বলা হইয়াছে অহংকারাদি সকলেই বুদ্ধিতে বিষয় অর্পণ করে; কেন না বুদ্ধিই সাধয়তি বিশিনষ্টি। যস্মাৎ = কেন না, যে হেতু।

অর্থ :—অহংকারাদি বুদ্ধিতে বিষয় অর্পণ করে, কেন না যে বুদ্ধি পুরুষের সমস্ত উপভোগ সাধন করে, সেই বুদ্ধিই পুনরায় প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে সেই ভেদকে প্রকাশ করে। বুদ্ধি দ্বারাই বিবেক জ্ঞান হয়। একই বুদ্ধি ভোগ বা প্রকৃতি পুরুষের অভিন্ন ভাব জন্মায় এবং বিবেক ঘটায়।

৩৮

ইতিপূর্ব্বে করণদিগের সম্বন্ধে কথা বলা হইয়াছে এইবার পঞ্চভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র সম্বন্ধে বলা হইবে।

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ ॥

পদপাঠ—তন্মাত্রানি অবিশেষাঃ তেভ্যঃ ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তাঃ ঘোরাঃ চ মূঢ়াঃ চ ॥

অন্বয়ঃ—তন্মাত্রানি অবিশেষাঃ ; তেভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি (জায়ন্তে)
এতে শান্তা ঘোরাঃ চ মূঢা চ স্মৃতাঃ।

(নরঃ, নরৌ, নরাঃ,—ফলম্, ফলে, ফলানি)

তন্মাত্রানি = পঞ্চ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, শব্দ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, গন্ধ তন্মাত্র এবং স্পর্শ তন্মাত্র।

ইহাদিগকে কি বলা হয়—অবিশেষাঃ। বিশেষের যাহা বিপরীত তাহা অবিশেষ।

তেভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ ; তেভ্যঃ পঞ্চভ্যঃর বিশেষণ। সেই পঞ্চ হইতে অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্র হইতে কি হয়? পঞ্চ ভূতানি জায়ন্তে—পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত। এতে = ইহারা ; এই পঞ্চ ভূতেরা ; কি প্রকার এই পঞ্চভূত? "শান্তাঃ,

ঘোরাঃ চ, মূঢ়াঃ চ"—শান্ত এবং ঘোর এবং মূঢ়। স্মৃতাঃ = বলা হয়। পঞ্চভূতকে কি বলা হয়? বিশেষাঃ = বিশেষ।

তন্মাত্রের এক রস। উহাদের কোন বিশেষত্ব নাই। রূপ তন্মাত্র কেবল মাত্র রূপ। লাল, নীল, হরিদ্রা যেমন উপভোগের বিষয় কেবল মাত্র রূপ সেইরূপ নয়। যাহা দ্বারা সুখ দুঃখ এবং মোহ ঘটে তাহাই উপভোগের যোগ্য। ভূত সকল সুখকর, দুঃখকর এবং মোহকর বলিয়াই বিশেষ। শব্দ মাত্র হইতেছে সূক্ষ্ম। কিন্তু সা, রে, গা, মা প্রভৃতির সংযোগে ও মিশ্রণে যে সঙ্গীত জন্মে তাহা সুখকর। এক শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ। শব্দ ও স্পর্শ দুই তন্মাত্র হইতে বায়ু; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তিন তন্মাত্র হইতে তেজ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস চারি তন্মাত্র হইতে জল; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে ক্ষিতি জন্মে। জল বলিতে যাহা বুঝি, ইহা যেন মনে থাকে সাংখ্যের জল সে জল নহে। চিনিও জল, তেঁতুল ও জল। যাহা দ্বারা রস জ্ঞান জন্মে তাহাই জল। তন্মাত্র সকল পরস্পর পৃথক ভাবে আমাদিগের দ্বারা অনুভূত হয় না, এই নিমিত্ত উহাদিগকে অবিশেষ বলা হইয়া থাকে। ভূত সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অর্থ—পঞ্চ তন্মাত্রকে অবিশেষ বলা হয়। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। পঞ্চভূতকে বিশেষ বলা হয়, যে হেতু উহারা সুখ, দুঃখ ও মোহকর।

৩৯

বিশেষ কতবিধ তাহা বলা হইতেছে। বিশেষ ত্রিবিধ, যথা—সূক্ষ্ম-শরীর, স্থূলশরীর এবং মহাভূত।

সূক্ষ্মা মাতা-পিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষা স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতা-পিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥

পদপাঠ—সূক্ষ্মাঃ মাতা-পিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈঃ ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাঃ তেষাং নিয়তাঃ মাতা-পিতৃজাঃ নিবর্ত্তন্তে॥

অন্বয়ঃ—সূক্ষ্মাঃ, মাতা-পিতৃজাঃ প্রভূতৈঃ সহ বিশেষাঃ ত্রিধাঃ স্যু।
তেষাং সূক্ষ্মাঃ নিয়তাঃ। মাতা-পিতৃজাঃ নিবর্ত্তন্তে।

সূক্ষ্মাঃ = সূক্ষ্মশরীর সকল।

মাতা-পিতৃজাঃ = পিতা মাতা হইতে জাত শরীর সকল।

প্রভূতৈঃ সহ = প্রভূতের সহিত। প্রভূতৈঃ = (তৃতীয়ার বহুবচন) স্থূল ভৌতিক পদার্থ সমূহের সহিত। বিশেষাং = পঞ্চভূত। ত্রিধাঃ = ত্রিবিধ স্যুঃ = হয়। পঞ্চভূত তিন শ্রেণীর পদার্থ লইয়া। যথা (১) সূক্ষ্মশরীর, (২) স্থূল শরীর, যাহা জীব পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত হয় এবং (৩) বাহ্য ভৌতিক জগৎ—এই তিন ভাগে বিভক্ত। যাহা স্থূল তাহা প্রত্যক্ষ গোচর। সূক্ষ্ম অনুমান গোচর। স্থূল শরীরকে ষাট-কৌশিক বলে (ষটকোশ + ষ্ণিক্) উহা ষট্ কোশে বা ছয় কোশে নির্ম্মিত। কোশ = আবরক। স্থূল দেহ অস্থি মজ্জাদি দ্বারা গঠিত। অস্থি মজ্জাদিকে কোশ বলে। সূক্ষ্ম শরীরের কথা ৪০ কারিকায় বলা হইবে। নদী, চন্দ্র, গিরি, মরু, ঘট, পট, মন্দির এ সমস্তই প্রভূত বা মহাভূতের অন্তর্গত। যাহা ভূতের দ্বারা নির্ম্মিত তাহা ভৌতিক। পঞ্চ-ভূত ব্যতীত বাহ্য জগতে আর কিছু নাই, এই জন্য পঞ্চভূতকে মহাভূত বলা যায়। ভৌতিকের অবস্থান্তর ঘটে কিন্তু পুরুষের মোটামুটি দেখিতে গেলে অবস্থান্তর ঘটে না। কেহ জন্ম হইতেই বিকলাঙ্গ, কেহ জন্ম হইতেই দুষ্ট। চৈতন্য বা পুরুষ বিকলাঙ্গ নহেন, দুষ্টও নহেন।

তেষাং = ঐ তিন প্রকার বিশেষে; কে কি প্রকার? সূক্ষ্মাঃ হইতেছে নিয়তাঃ। মাতা-পিতৃজাঃ নিবর্ত্তন্তে; নিয়ত = অবিশ্রান্ত, বিশ্রাম বিহীন। সূক্ষ্ম শরীরের বিশ্রাম নাই।

নিবর্ত্তন্তে = নিবৃত্ত হয়, কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, বিশ্রাম করিতে পারে। স্থূল শরীরের বিশ্রাম আছে, সূক্ষ্ম শরীরের বিশ্রাম নাই। স্বপ্ন সূক্ষ্ম শরীরের কাজ। নিবৃত্তি (বৃৎধাতু) বিশ্রাম। নিদ্রাকালে স্থূল শরীর বিশ্রাম করে বটে কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের বিশ্রাম নাই; সূক্ষ্মশীরর স্বপ্নাদি ব্যাপারে ক্রিয়াশীল থাকে।

অর্থ—পঞ্চভূত প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। দেহ এবং বাহ্য ভৌতিক জগত। দেহ আবার স্থূল সূক্ষ্ম ভাবে দ্বিবিধ। পিতা মাতা হইতে জাত দেহের নাম স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম দেহ প্রত্যক্ষের অগোচর।

সূক্ষ্ম দেহের বিশ্রাম নাই, স্থূল ভূতের বিশ্রাম আছে। অতএব বিশেষ বা পঞ্চভূত ত্রিবিধ, ভৌতিক জগৎ, স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম দেহ। পঞ্চ তন্মাত্রেব পরিণাম স্থূল দেহ এবং প্রভূত। সূক্ষ্মদেহ হইতেছে পঞ্চ তন্মাত্রের ত্রয়োদশ করণ সংযোগ বশতঃ যে পরিণাম সেই পরিণাম।

৪০

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্ ॥

পদপাঠ—পূর্ব্ব উৎপন্নম্ অসক্তম্ নিয়তম্ মহদাদিসূক্ষ্ম পর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগম্ ভাবৈঃ অধিবাসিতম্ লিঙ্গম্ ॥

অন্বয়ঃ—পূর্ব্বোৎপন্নম্, অসক্তম, নিয়তম্, নিরুপভোগম্
ভাবৈঃ অধিবাসিতম মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্ লিঙ্গম্ সংসরতি।

লিঙ্গম্ সংসরতি। লিঙ্গম্ = সূক্ষ্মশরীর; সংসরতি, সং = সম্যক, সরতি (সৃধাতু) বিচরণ করে। যথা তথা বিচরণ করিতে পারে। সে সূক্ষ্ম শরীর কি প্রকার? মহদাদি সূক্ষ্ম পর্য্যন্তম্ = মহৎ হইতে তন্মাত্র পর্য্যন্ত বস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত। পূর্ব্বে ২০ কারিকায় লিঙ্গম্ শব্দের অর্থ বুদ্ধি লিখিয়াছি। বুদ্ধি ইঁহাদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া বুদ্ধি লিখিয়াছি। ১০ কারিকায় লিঙ্গ অর্থ জ্ঞাপক।

সূক্ষ্ম শরীরের আর কি কি বিশেষণ আছে? যথা ভাবৈঃ অধিবাসিতং, নিয়তম্ ইত্যাদি।

ভাবৈঃ অধিবাসিতম্ = ভাবের দ্বারা নিবাসিত, ভাব যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। সূক্ষ্মশরীর ভাবময়। সূক্ষ্মশরীরে কি কি ভাব আশ্রয় করে? ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য এবং তাহাদিগেব বিপরীত অধর্ম্ম অজ্ঞান প্রভৃতি সূক্ষ্ম শরীরে সংস্কার রূপে বিদ্যমান থাকে। অসক্তম্ = অপ্রতিহত। সূক্ষ্মশরীরে স্থূলশরীরের ন্যায় বাধা নাই। নিয়তম্ = অবিশ্রান্ত। সূক্ষ্মশরীর বিশ্রাম হীন।

নিরুপভোগং = সূক্ষ্মশরীর নিরুপভোগ। স্থূল শরীর ব্যতীত ইহা স্বতন্ত্ররূপে সুখ দুঃখাদি জন্মায় না।

পূর্ব্বোৎপন্নম্—যে হিসাবে বৃক্ষের বীজ বৃক্ষের পূর্ব্বে জন্মে সেই

হিসাবে সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীরের পূর্ব্বে জন্মে। সূক্ষ্মশরীর পরে প্রস্ফুট হইয়া স্থূলশরীরে পরিণত হয়; কচ্ছপের ডিম পেটের ভিতরে নরম, তুল্ তুল্ করে, পরে শক্ত সাদা খোসা হয়। যেমন পঞ্চভূতের কারণ পঞ্চ-তন্মাত্র, সেইরূপ স্থূলশরীরের কারণ সূক্ষ্মশরীর।

অর্থ—সূক্ষ্মশরীর অপ্রতিহত, অবিশ্রান্ত; উহার উপাদান পঞ্চতন্মাত্র এবং তন্মাত্রে সংগ্রহিত বুদ্ধি, অহংকার, মন এবং ইন্দ্রিয় শক্তি। উহা ভাবময় এবং যথা তথা বিচরণ করিতে সমর্থ। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ মাত্রই সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি। স্থূলশরীর সূক্ষ্মশরীরের বাহ্য মূর্ত্তি। সূক্ষ্মশরীর ভাবময়, শক্তিময় এবং নিরুপভোগ। প্রথমে সূক্ষ্মশরীর পরে আবরণ রূপ স্থূলশরীরের উৎপত্তি হয়। স্থূল শরীর সূক্ষ্মশরীরের বাসা। গন্ধ যেমন পুষ্পকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভাব ও শক্তি তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

৪১

চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথাচ্ছায়া।
তদ্বদ্বিনাবিশেষৈর্নতিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥

পদপাঠ—চিত্রং যথা আশ্রয়ম্ ঋতে স্থাণু আদিভ্যঃ যথা বিনা ছায়া।
তৎ বৎ বিনা অবিশেষৈঃ ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ম্ লিঙ্গম্॥

অন্বয়:—যথা আশ্রয়ম্ ঋতে চিত্রং যথা স্থাণ্বাদিভ্যঃ বিনা ছায়া;
তদ্বৎ অবিশেষৈঃ বিনা লিঙ্গম্। (লিঙ্গম্) নিরাশ্রয়ং ন তিষ্ঠতি। (ন তিষ্ঠতি=তিষ্ঠতি ন=থাকে না)

যথা বা যদ্বৎ আশ্রয় বিনা চিত্র, যদ্বৎ স্থাণু বিনা ছায়া, তদ্বৎ বা তথা অবিশেষ বিনা লিঙ্গ। লিঙ্গ নিরাশ্রয় তিষ্ঠতি ন অর্থাৎ থাকে না।

চিত্রং=ছবি। ঋতে=বিনা, ব্যতীত, ব্যতিরেকে, ছাড়া, স্থাণু =ডালপালা শূন্য গাছ। ন=না, তিষ্ঠতি=থাকে। নিরাশ্রয়ম্= আশ্রয়শূন্য অবস্থা।

লিঙ্গম্=সূক্ষ্ম শরীর। অবিশেষ=পঞ্চ তন্মাত্র। অপাদানে বা 'হইতে' অর্থে ঋতে যোগে দ্বিতীয়া এবং বিনা যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। আশ্রয় হইতে পৃথক চিত্র তুল্য, স্থাণু হইতে পৃথক ছায়া তুল্য হইতেছে, পঞ্চ

তন্মাত্র হইতে পৃথক সূক্ষ্ম শরীর। যেমন ছবি দেওয়াল, পট কিম্বা একটা কিছুর পর আঁকিতে হয়, ছবির যেমন দেওয়াল পটাদির সহিত সম্বন্ধ, সূক্ষ্ম দেহেরও সেইরূপ অবিশেষের সহিত সম্বন্ধ।

অর্থ—চিত্র যেমন আশ্রয় ব্যতীত থাকে না, ছায়া যেমন বৃক্ষাদি ব্যতীত থাকে না, তেমনি সূক্ষ্ম শরীরও পঞ্চ তন্মাত্র ব্যতীত থাকে না। সূক্ষ্ম শরীর নিরাশ্রয় থাকে না, উহার আশ্রয় পঞ্চ তন্মাত্র। ভাবময় সূক্ষ্ম শরীব পঞ্চ তন্মাত্র'ক অবলম্বন করিয়া থাকে, যেমন কাপড়ের উপব বুটি।

(ক্রমশঃ)

—ওমর।

সাংখ্যাচার্য্যগণ সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করের মতামত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রুতি কথিত অব্যক্ত শব্দ সাংখ্যের প্রধান নহে তাহার অপর হেতুও আছে—

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ অ ১, পা ৪, সূ ৪ ॥

সূত্রার্থ—ব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্বাভিধানং নাস্তীতি নাত্রাব্যক্তশব্দঃ প্রধান-বাচীতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।—"উদাহৃত শ্রুতি অব্যক্ত-শব্দ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাকে জানিতে বলেন নাই। কাজেই বলিতে হয়, এ অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) নহে। সাংখ্যের অব্যক্ত জ্ঞেয় অর্থাৎ তাঁহাকে জানিতে হয়।" (তত্ত্বজ্ঞানামৃত)

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—সাংখ্যবাদীরা বলেন প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক বা ভেদ জ্ঞান মুক্তির কারণ। প্রকৃতি জ্ঞান না হইলে তদ্বিপরীত পুরুষ জ্ঞান কি করিয়া হইবে ? এই হেতু সাংখ্যের অব্যক্ত জ্ঞেয়। মুক্তি লাভের জন্যও তাহাকে জানিতে হয় এবং অনিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভের জন্যও তাহাকে জানিতে হয়। কিন্তু এস্থলে অব্যক্ত জ্ঞাতব্যও নহে এবং উপাসিতব্যও নহে, উহা কারণ শরীরকে (স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের জনয়িতা) রথোপমায় সূক্ষ্মত্ব ও দুর্জ্ঞেয়ত্ব বুঝাইবার জন্য মাত্র ব্যবহার হইয়াছে।

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ অ ১, পা ৪, সূ ৫ ॥

সূত্রার্থ—অশব্দমিত্যাদি শ্রুতৌ স্মৃতৌ চাব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্ববচনমস্তীতি চেৎ মন্যতে তন্ন মন্তব্যম্। হি যতঃ, প্রকারণাৎ প্রকরণবলেন তত্র প্রাজ্ঞ এবাত্মা প্রতীয়তে ন তু প্রধানমিতি সূত্রার্থঃ।—শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে যে অব্যক্ত জানিবার কথা আছে, প্রকরণ অনুসারে জানা যায়, তাহার অর্থ আত্মা প্রধান নহে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—শ্রুতিতে অব্যক্তকে জানিতে হইবে এবং উপাসনা করিতে হইবে এ কথা এখানে না থাকিলেও অন্যত্র আছে, "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরঃ ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ (কঠ, উ, ৩, ১৫) "যাহা শব্দ বর্জ্জিত, স্পর্শ রহিত, রূপহীন, ক্ষয়রহিত, রসবর্জ্জিত, গন্ধশূন্য, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, মহতের পর, ধ্রুব অর্থাৎ কূটবৎ নির্ব্বিকার উপাসকগণ তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যু গ্রাস হইতে মুক্ত হন।" এখানে দেখা যাইতেছে—মহতের পর অব্যক্ত এবং তাঁহাকে জানিতে হইবে এবং উপাসনা করিতে হইবে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—কিন্তু এখানে প্রকরণের আলোচ্য বিষয় দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়, এই অব্যক্ত প্রধান নহে পর আত্মা। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতি।" (কঠ, উ, ৩, ১১)। "পুরুষের পর আর কিছুই নাই, পুরুষই শেষ সীমা এবং পুরুষই পরম প্রাপ্য।" পরে আবার বলিতেছেন, "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে" ইতি (কঠ, ৩, ১২) "ইনি সকল ভূতে গুপ্তভাবে

বিদ্যমান আছেন, তাই এই আত্মা স্পষ্ট প্রতিভাত হন না।” শাস্ত্রে আত্মাকে দুর্জ্ঞেয় বলা হইয়াছে সুতরাং আত্মাই জ্ঞেয় ইহা আকাঙ্ক্ষার (তাৎপর্য্য) দ্বারা আকৃষ্ট হয় বুঝিতে পারা যায়। আত্মা দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই বাক্ সংযমাদির বিধান। আত্ম-বিজ্ঞানের ফল মৃত্যুকে অতিক্রম করা। কেবল প্রধানের জ্ঞানে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না ইহা সাংখ্যাচার্য্যগণও মানেন না। তাঁহাদের মতে পুরুষের বিজ্ঞানেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। তাহা ছাড়া প্রত্যেক বেদান্তেই প্রাজ্ঞ আত্মাকে অশব্দ অস্পর্শ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত দেখা যায়।

ত্রয়ানামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ অ ১, পা ৪, সূ ৬ ॥

সূত্রার্থ—মৃত্যুনা নচিকেত সম্প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষেত্যুক্তেস্ত্রয়াণামেব প্রশ্নো নচিকেতসা কৃতঃ। উপন্যাসঃ প্রত্যুত্তরোঽপি মৃত্যুনা ত্রয়ানামেব দত্তো নান্যস্যেতি নাব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্বং ন বা তস্য প্রধানার্থত্বমিতি সূত্রার্থোঽনুসন্ধেয়ঃ।—“অগ্নি, জীব, পরমাত্মা এই তিন পদার্থেরই প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর থাকায় প্রোক্ত অব্যক্ত জ্ঞেয়ও নহে প্রধানও নহে।”

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—শ্রুতি কথিত অব্যক্ত প্রধান বা জ্ঞেয় কোনটিই নহে। কঠ শ্রুতিতে, বরপ্রদান উপলক্ষে অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা সম্বন্ধে উপদেশ আছে। নচিকেতা ঐ তিন পদার্থই জানিতে চাহিয়াছিলেন। “স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম” (কঠ, উ, ১, ১৩), “নচিকেতা বলিলেন, হে যম! তুমি যদি স্বর্গ সাধক অগ্নি তত্ত্ব জ্ঞাত থাক তবে তুমি শ্রদ্ধান্বিত আমাকে বল” ইহাই অগ্নি বিষয়ক প্রথম প্রশ্ন। “যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥” (কঠ, উ, ১, ২০), “মনুষ্য মরিলে লোকে যে সন্দেহ করে, থাকে বা থাকে না, সেই সন্দেহ আমার বিদূরিত হউক। তোমার উপদেশে আমি যেন উহার তথ্য জ্ঞাত হই”—ইহাই জীব বিষয়ক দ্বিতীয় বর। “অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎপশ্যসি তদ্বদ॥” (কঠ, উ, ২, ১৪), “যাহা ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম হইতে যাহা কার্য্য কারণের অতীত, যাহা ভূত ভবিষ্যৎ হইতে অতীত

—তাহাই বল”—ইহাই পরমাত্ম বিষয়ক তৃতীয় প্রশ্ন। যম উত্তরও দিয়াছিলেন ঠিক ঐ সকল প্রশ্নের অনুরূপ, “লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা” (কঠ, ১, ১৫) “যম নচিকেতাকে লোক কারণ অগ্নি ও যত ইষ্টকা সমস্তই বলিলেন”—ইত্যাদি, অগ্নি বিষয়ক উত্তর। “হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্। যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥ যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥” (কঠ, ৫, ৬-৭) “আমি তোমাকে লোক গুহ্য সনাতন ব্রহ্ম বলিব। হে গৌতম। মরণপ্রাপ্ত আত্মা যাহা বা যে প্রকার হয় তাহা বলিতেছি। যেমন কর্ম্ম ও যেমন জ্ঞান, মরণপ্রাপ্ত আত্মা তদনুরূপ গতিই প্রাপ্ত হয়। দেহিগণ পুনঃ শরীর প্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়”—ইত্যাদি জীব বিষয়ক উত্তর।

পূর্ব্ব-পক্ষ—আচ্ছা, যে (জীব) আত্মা জন্ম-মরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু এবং সন্দেহবান, যেমন নচিকেতার আত্মা—সেই আত্মাই কি ধর্ম্মাধর্ম্মের, কৃতাকৃতের অতীত (ব্রহ্ম)? না উহা অন্য কোনও আত্মা (অর্থাৎ জীব আত্মা হইতে পৃথক অন্য কোনও পরমাত্মা)? যদি উক্ত আত্মাদ্বয় একই পদার্থ হয় তাহা হইলে শেষোক্ত জীব ও পরমাত্ম বিষয়ক দুইটি প্রশ্নের কি প্রয়োজন? অগ্নি বিষয়ক এবং জীব বিষয়ক দুইটি প্রশ্ন করিলেই ত হইত? আর যদি জীব হইতে ভিন্ন অন্য কোনও অভিনব আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে তাহা হইলে বরের অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তরের কল্পনা করিতে হয়। যদি বর ছাড়া প্রশ্নের কল্পনা কর তাহা হইলে সে প্রশ্ন পরমাত্মা সম্বন্ধে না হইয়া প্রধান সম্বন্ধেই হউক না কেন?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—বাক্যের প্রারম্ভ দেখিয়াই আমরা ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। যম-নচিকেতা সংবাদটি বরপ্রদান উপলক্ষে বলা হইয়াছে। নচিকেতার পিতা নচিকেতাকে মৃত্যুর নিকট প্রেরণ করিলে, মৃত্যুর অনুপস্থিত হেতু তাঁহার আবাসে নচিকেতা দিবস ত্রয় উপবাস করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে তিনটি বর দিতে স্বীকৃত হন।

প্রথম বরে পিতার সৌমনস্থ অর্থাৎ ফিরিয়া গেলে যেন নচিকেতার উপব সন্তুষ্ট হন, দ্বিতীয় বরে অগ্নি বিদ্যা এবং তৃতীয় বরে আত্মবিদ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বরাণামেষ বরস্তৃতীয়।

পূর্ব্ব পক্ষ—কিন্তু যদি "যাহা ধর্ম্মাদির অতীত তাহা আমায় বল" এই বাক্যে যদি নূতন প্রশ্নের সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে বিনা বরদানে অভিনব প্রশ্নের কল্পনা করায় বাক্যভেদ (দুই বাক্য বা, এক বাক্যের দুই অর্থ) দোষ হয়। আর যদি বল জিজ্ঞাস্য বস্তু যে জীব তাহা ছাড়াও উহার কারণ-স্বরূপ "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" প্রশ্নটি নূতন বা পৃথক, কারণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট জীব ও ধর্ম্মাতীত বস্তু এক নহে, প্রাজ্ঞ আত্মা ধর্ম্মাদিব অতীত সেই হেতু প্রাজ্ঞ আত্মাই "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" এই প্রশ্নের বিষয়। কিন্তু পূর্ব্ব বাক্যে বলা হইয়াছে 'থাকে কি না', সেই হেতু পূর্ব্ব ও পর বাক্যের সাদৃশ্যও নাই, এবং পূর্ব্ব ও পব বাক্যে একই বস্তু বিষয়ক প্রশ্ন হইয়াছে এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা (ঐক্য) হয় না; প্রত্যভিজ্ঞা (ঐক্য) না হইলে প্রশ্ন ও বস্তু উভয়ই বিভিন্ন হইয়া পড়ে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—জীব ও প্রাজ্ঞ একই বস্তু। জীব যদি প্রাজ্ঞ আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইত তাহা হইলে জিজ্ঞাসা ও জিজ্ঞাস্য-বস্তু বিভিন্ন হইত। উত্তর দান কালে, জন্ম-মৃত্যু নিষেধ করিয়া দেখান হইয়াছে জীব ও প্রাজ্ঞ একই বস্তু। অন্যত্র "তত্ত্বমসি," (ছা, উ, ৬, ৮, ৭,) "তুমি তাহাই" এবং বর্ত্তমান প্রকরণে "যাহা ধর্ম্মাতীত তাহা বলুন" এই প্রশ্নের উত্তরে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (ক, উ, ২, ১৮) "বিপশ্চিত পণ্ডিত জন্ম মরণ বর্জ্জিত" বলাতেই বেশ বুঝা যায়, জীব ও ঈশ্বর অভেদ। শরীর সম্পর্ক হেতু জীবের জন্ম মৃত্যু প্রতীয়মান হয়। যাহা যাহার নাই সে সম্বন্ধে তাহার নিষেধ হইতে পারে না। যাহার যাহা আছে সেই সম্বন্ধে নিষেধ হইতে পারে। শ্রুতির নিষেধ বাক্যের দ্বারা জীবের শরীর সম্পর্ক ত্যাগ হইলে জীবের প্রাজ্ঞতা সিদ্ধ হয়। শ্রুতি বলিতেছেন, "স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥" (কঠ, উ, ৪, ৪) জীব যে সাক্ষীর (চৈতন্যের) দ্বারা স্বপ্ন ও জাগ্রৎ উভয় অবস্থা দেখে, অনুভব করে,

ধীর ব্যক্তি সেই মহান্ ও বিভু আত্মার মনন করিয়া, মননের দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার করিয়া শোকমুক্ত হন।" এখানে দেখা যাইতেছে, শ্রুতি স্বপ্নজাগ্রদ্দর্শী জীবকেই মহৎ ও বিভু শব্দের দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। এবং জীবের ব্রহ্মত্ব মননের দ্বারা শোক মুক্ত হইতে আদেশ করিয়া, প্রাজ্ঞ ও জীবের অভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানের দ্বারাই শোকের নাশ হয় অন্য উপায়ে নহে। "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" (কঠ, উ, ৪, ১০) যাহা ইহলোকে, তাহাই পরলোকে যাহা পরলোকে, তাহাই ইহলোকে। ঈদৃশ আত্মার যে নানাত্ব দর্শন করে, ভেদ বুদ্ধি উৎপাদন করে, সে মৃত্যু হইতে মরণ প্রাপ্ত হয়।" আবার দেখা যায় নচিকেতা জীবের অস্তি নাস্তি বিষয়ক প্রশ্ন করিলে যম বলিয়াছিলেন, "অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব" (কঠ, ১।২১) "হে নচিকেতা, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর"। পরে নানা প্রকারে কাম-কাঞ্চনের দ্বারা নচিকেতাকে প্রলোভিত করিয়াও যখন তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইল না, তখন যম অভ্যুদয় (স্বর্গ) এবং নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) তথা বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত" (কঠ, উ, ২।৪), "তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী মনে করি, কারণ বহুতর কাম্য বস্তু তোমার লোভ উৎপাদন করিতে পারে নাই।" এই প্রশংসার পর জীব সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, "তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্ অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি" (কঠ, ২।১২), "ধীরগণ সেই দুর্দ্দশ গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ পুরাতন দেবকে মনন করতঃ অধ্যাত্ম যোগেজ্ঞাত হইয়া শোক হর্ষবর্জ্জিত হন।" এই হেতু বলিতে হয় এই শ্রুতির বিবক্ষিত (বলিবার ইচ্ছা) বিষয় জীবেশ্বরের অভেদ জ্ঞান। নচিকেতা জীব সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারেন না। অতএব "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে" এ প্রশ্নের উত্তরই হইতেছে, "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ।"

পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তর বিভিন্ন হইতেছে কেন?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—উহা আকার গত ভেদ যথার্থ ভেদ নহে। কারণ "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্ব জিজ্ঞাসিত "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা" জীব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন স্বরূপতঃ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে দেহের অতিরিক্ত আত্মা আছে কি না? এবং পরে ঐ আত্মা অসংসারী কিনা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—এই আত্মা সম্বন্ধেই দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছে। যতকাল না অবিদ্যা নাশ হয় ততকাল আত্মার জীবত্ব প্রতীয়মান হয় এবং ততকাল ধর্ম্মাধর্ম্মও আছে। তত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্য যখন আত্মার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করে তখন তিনি ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের অতীত হন। অবিদ্যাকালে বা তাহার অভাব কালে আত্মার কোনরূপ তারতম্য ঘটে না। মাত্র বস্তু সম্বন্ধীয় মিথ্যাজ্ঞান দূর হয়। আত্মা অবিদ্যাকালেও যাহা ছিলেন অবিদ্যার অভাবকালেও তাহাই থাকিবেন। অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইয়া যদি কেহ পলায়ন করিতে থাকে তখন যদি কেহ বলে, উহা রজ্জু, সর্প নহে, তাহা হইলে সর্পভয় অঙ্গকম্পনাদি নিবৃত্ত হয়। যখন রজ্জুতে সর্প বুদ্ধি হয় সেইকালে এবং যখন সর্প বুদ্ধি চলিয়া যায় তখন, এই উভয় কালে রজ্জুর স্বরূপের কোন ইতর বিশেষ হয় না। উভয় কালে রজ্জুর স্বরূপ সমানই থাকে। তেমনি আত্মাতে জীবত্বের ভ্রান্তিকালে এবং পরে সেই ভ্রান্তির অভাব বা অপগম কালে কোন ইতর বিশেষ ঘটে না। 'বিপশ্চিৎ জন্মেন না বা মরেন না' এই উপদেশ প্রকৃত পক্ষে অস্তি-নাস্তি প্রশ্নের উত্তর। জীব ও প্রাজ্ঞ আত্মা এক নহে, ভিন্ন, এই ভাব অবিদ্যা কল্পিত। অতএব মৃত্যুকালীন আত্মা সম্বন্ধীয় সন্দেহ উত্থিত হওয়ায় এবং সেই আত্মার কর্ত্তৃ-ত্বাদি সংসার ধর্ম্মের নিষেধ জিজ্ঞাসায়, বুঝিতে হইবে, পূর্ব্ব বাক্যের বিষয় জীবরূপ এবং পর বাক্যের বিষয় স্বরূপ। সেই হেতু এই শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা, প্রধান নহে।

মহদ্বচ্চ ॥ অ ১, পা ৪, সূ ৭ ॥

সূত্রার্থ—মহদ্বৎ মহচ্ছব্দবৎ। শ্রৌতোঽব্যক্তশব্দো ন সাংখ্যাসাধারণ-তত্বগোচরো বৈদিকশব্দত্বাৎ মহচ্ছব্দবদিতি। সূত্রার্থঃ।—"যেমন শ্রুত্যুক্ত মহৎ শব্দ সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের বোধক নহে, তেমনি, বৈদিক অব্যক্ত

শব্দও সাংখ্যাভিপ্রেত তত্ত্বের (প্রধানের) বোধক নহে। (তত্ত্ব জ্ঞানামৃত)

ভাষ্য-তাৎপর্য্য। সিদ্ধান্ত-পক্ষ—সাংখ্যের মহৎ শব্দ এবং বৈদিক মহৎ শব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। "বুদ্ধেরআত্মা মহান্ পরঃ" "মহান্তং বিভু-মাত্মানং" "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং", "বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ", "আত্মা মহান ও বিভু", "আমি মহান্ পুরুষকে জানি" প্রভৃতি স্থলে মহৎ শব্দ পুরুষের বিশেষণ—উহা কদাচ সাংখ্যের দ্বিতীয় তত্ত্ব নহে। এইরূপ বৈদিক অব্যক্ত শব্দও সাংখ্যের প্রধান নহে।

চমসবদবিশেষাৎ॥ অ ১, পা ৪, সূ ৮॥

সূত্রার্থ—শ্রুতাবজাশব্দঃ প্রধানাভিপ্রায়েণোক্ত ইতি নিয়ন্তুং ন শক্যতে অবিশেষাৎ বিশেষাবধারণকারণাভাবাৎ চমসবৎ যথা চমস-শব্দ ইত্যর্থঃ। "শ্রুত্যুক্ত অজাশব্দ প্রধানার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্য অর্থে নহে, ইহা নিয়মপূর্ব্বক বলিতে পার না। কারণ, সেরূপ নিশ্চয়ার্থের পোষক প্রমাণ নাই।"

পূর্ব্ব-পক্ষ—প্রধান অবৈদিক নহে। বেদ মন্ত্রে প্রধানের সমর্থক অজা শব্দ আছে। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বাহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্ত-ভোগামজোঽন্যঃ।" (শ্বে, ৪, ৫), "কোন কোন অজ (আত্মা) লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণা ও স্বসদৃশ বহু সন্তানপ্রসবিনী অজার প্রতি প্রীতি বিশিষ্ট হইয়া তাহারই অনুরূপ হইয়া আছে। অন্য অজ তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিতেছে।" উক্ত লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ—রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ। রঞ্জন-গুণ অনুযায়ী লোহিত রজের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে, প্রকাশ গুণানুসারে শুক্ল শব্দ সত্ত্বের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে এবং আবরণ স্বভাব হেতু কৃষ্ণ তমের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। যদিও ত্রিগুণসাম্যে অজা এক, তথাপি, অংশ বা অবয়ব-ধর্ম্ম অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত, লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ। যেহেতু জন্মে না সেই হেতু অজা। সাংখ্য কারিকা বলেন, "মূল প্রকৃতিরবিকৃতি" (সাং, কা, ৩), "মূল প্রকৃতি বিকার বর্জ্জিত অর্থাৎ তাহার জন্ম নাই। অজা শব্দ ছাগী অর্থে রূঢ়

হইলেও বিদ্যা-প্রকরণে সে অর্থের গ্রহণ নাই। ত্রিগুণা অজা ত্রিগুণা বহু প্রজা প্রসব করিতেছে। অজ অর্থাৎ জন্ম রহিত পুরুষ সেই প্রকৃতিকে ভোগ করিয়া অনুশায়িত অর্থাৎ অবিবেক বশতঃ সেই অজাকে আপনার ভাবিয়া তৎকৃত বিকার যে সুখ দুঃখ তাহা নিজের ভাবিয়া সংসারী হইতেছে। আবার অন্য অজ অর্থাৎ বিবেকী আত্মা বিরক্ত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতেছে অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের বিচ্ছেদ সাধিত হওয়ায় পুরুষ মুক্ত হইতেছে। এই সকল কথা যখন শ্রুতিমূলক তখন সাংখ্যের অজা বা প্রধান শ্রুতিমূলক।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—এরূপ অর্থ কল্পনা করার প্রয়োজন কি? অপরাপর শ্রুতি সাহায্যে অর্থ করিলে অজা শব্দের যোগার্থ বজায় থাকে। ঐ অজা শব্দ চমস শব্দের মত বুঝিবে। বেদে আছে "অর্ব্বাগ্ বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ" (বৃ, ২, ২, ৩) "চমস অধোগভীর ও ঊর্দ্ধে উচ্চ"—ইহার দ্বারা বলিতে পারি না কেবল অমুক বস্তুই চমস অন্য কিছু চমস নহে। অধোগভীর যে কোনও স্থান যথা গিরি গুহা প্রভৃতি সমস্তই চমস শব্দ বাচ্য হইতে পারে। অজা শব্দও সেইরূপ অনির্দ্দিষ্ট জানিবে। কিন্তু বেদ বলিতেছেন "ইদং তচ্ছির এষ হ্যর্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ", "ইহা তাহারই মস্তক, যেহেতু ইহা অধঃ খনিত ও উপরি উচ্চ, সেই হেতু ইহা চমস"—এইরূপে সমগ্র বাক্য আলোচনা করিয়া যেমন চমস পদার্থের প্রতীতি ও নিশ্চয় হয়, তেমনি শ্রুতির অন্যান্য বাক্যের আলোচনা করিয়া অজা শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা উচিৎ।

(ক্রমশঃ)

—বাসুদেবানন্দ।

ভারতীয় সভ্যতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

পাশ্চাত্য সভ্যতায় মুগ্ধ হওয়াতে আমাদের ভারতবর্ষের নিজস্ব কিছু "Culture আছে এ কথা একেবারেই বিস্মরণ হইয়া যাই। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের জীবনের অনেকদিকেব মধ্যে ইহাও একটা দিক যে ইহা আমাদের ভারতবর্ষের Cultureএর অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে এবং এই ভারতীয় Culture এর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। যে সময় পরমহংসদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এই ভারতীয় Cultureএর একরূপ ভাঙ্গনের যুগ বলা যায়। এই ভাবতীয় Cultureএ নানারূপ আবর্জ্জনা জমিয়াছিল। এক এক জন মনীষী তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য তাঁহাদের নিজের উপায়ে পথ খুঁজিতেছিলেন। তাহার ফলে এই Culture কে কিছু কিছু করিয়া ভাঙ্গিতে হইয়াছিল। হিন্দু স্কুলের প্রসিদ্ধ শিক্ষক Derozio তাঁহাব প্রতিভাবান উদ্যমশীল ছাত্র বৃন্দকে এই ভারতীয় Cultureএর সঙ্কীর্ণতা, পঙ্কিলতা এবং দোষ সমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া তাহাদের নবীন প্রাণে এই সমস্তকে দূর করিবার জন্য উৎসাহ দিতেছিলেন। ইহার ফলে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মত অপূর্ব্ব প্রতিভা সম্পন্ন কবিকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ীর মত চিন্তাশীল যুবকবৃন্দকে হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডির বাহিরে সত্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা কবিতে হইয়াছিল। যাহা হউক Derozioর এইরূপ মহা প্রাণতা ও শিক্ষার ফলে দেশের মধ্যে যে একটি স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার জন্য দেশবাসী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে, সন্দেহ নাই। এই স্বাধীন চিন্তার ফলে দেশের মধ্যে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সময়ে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, রামমোহন রায়ের এই চিন্তা-ধারা দেশের মধ্যে তখন বিকাশ করিতেছিলেন। তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গলার মধ্যেই যে কেশবচন্দ্র সেন চিন্তা রাজ্যের সম্রাট

বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন তাহা নহে, বিলাতে তিনি মহা পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিলের (John Stuart Mill) বিশেষ প্রশংসার পাত্র ও বন্ধু হইয়াছিলেন এবং মহারাণী ভিক্টোরীয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার প্রতিভার সম্মান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনই প্রথম শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দেশের মধ্যে প্রচার করেন।

এই ভাঙ্গনের যুগে ভারতীয় Culture নষ্ট প্রায় হইয়াছিল। তখন উহা এইরূপ অবস্থায় উপনীত, যে তন্মধ্য হইতে কোন Positive সত্য বস্তু পুনরাবিষ্কৃত না হইলে উহার আর রক্ষা হয় না। এই যুগসন্ধি-ক্ষণে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব ভারতীয় Culture এর মূর্ত্ত প্রকাশরূপে দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের মধ্যে ভারতীয় Culture এর যথার্থ স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল এমন একটি গণ্ডগ্রামে যথায় পাশ্চাত্য সভ্যতা তখনও প্রবেশ করে নাই, তিনি শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এমন একটি নিষ্ঠাবান শুচিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বংশে, যাঁহারা বর্ত্তমান অসংখ্য বিরুদ্ধ ভাব-বিপর্য্যয়ের মধ্যে তাঁহাদের নিষ্ঠার পাষাণ প্রাচীর তুলিয়া ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে যাহা কিছু সত্য বস্তু অবশিষ্ট আছে তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

পরমহংসদেব নিরক্ষর ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা দূরে থাক্, বাংলা শিক্ষার দ্বারাও পাশ্চাত্য সভ্যতা তাঁহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। ভারতীয় Culture বুঝিতে হইলে অগ্রে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু যেরূপ বাহ্যিক অর্থাৎ Meterial জগতের দিক্ দিয়া পরমহংসদেবকে বুঝা যায় না, তদ্রূপ ভারতীয় Cultureও বুঝা যায় না। ভারতবর্ষের চিন্তার ধারা পাশ্চাত্য জগতের চিন্তা ধারা হইতে বিভিন্ন। সাধনা সহায়ে এই ধারাকে জানিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝিতে হইলেও এই সাধনার পথই অবলম্বন করিতে হইবে। অন্তর্জ্জগতে, পাশ্চাত্য Culture এবং ভারতীয় Culture এর মূল বিভিন্ন, সুতরাং বাহ্যিক জগতেও উহাদের গতি বিভিন্নমুখী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই গতি বিভিন্নতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

পাশ্চাত্য জগৎ একরূপে মহাশক্তির উপাসক। মহাবীর নেপোলিয়নকে এই মহাশক্তির একটি প্রতীক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তিনি "অজেয় নেপোলিয়ন" এই উপাধির নিকট জীবন এমন কি জীবনের সুখও অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। শুধু তাহাই নহে, সেই অজেয় বীর এমনই অপরাজেয় থাকিবার দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষন করিতেন যে জয় পরাজয়, নিন্দা স্তুতি, সুখ দুঃখ প্রভৃতি যে কোন অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায় অবিচলিত থাকিতেন, বাহিরের কোন শক্তির নিকট স্বীয় উন্নত মস্তক অবনত করিতেন না। যে যশঃ গৌরবার্জ্জন তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত ছিল, তাহার নিকটেও স্বীয় ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। যে মহাশক্তির আবির্ভাবে আজ নব্য ইউরোপ জাগ্রত, কর্ম্ম-যজ্ঞের হোতা নেপোলিয়ন তাঁহার সমগ্র জীবনে সেই শক্তির উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের প্রসিদ্ধ জার্ম্মান দার্শনিক নিচে (Nietzsche) স্বাধীনতার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ইচ্ছাশক্তিতে আপনার নিকট আপনার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা। স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া না গিয়া ইচ্ছা শক্তির দ্বারা আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা। ইচ্ছাশক্তি সাধনায় যে দুঃখ, অভাব, এমন কি জীবনকেও তুচ্ছ বোধ করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুঃখ, কষ্ট ও অভাবে বিচলিত বা কঠোর দুর্দ্দশাতেও আত্মহারা হয় না, এমনকি মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়াও যে অবিচলিত থাকে, সেই স্বাধীন।

"যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি, উদ্দেশ্য সাধনের পথে আত্মত্যাগের বেদীতে সকলকেই এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও বলি দিতে পারে তাহাই স্বাধীনতা।"

অপর পক্ষে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ন্যায় মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন যে, জীবন্মুক্ত আপনার ব্যক্তিগত সত্তার ছায়া পর্য্যন্ত জগৎ হইতে মুছিয়া ফেলেন; তাঁহার জীবন কেবল অপরের জন্য এবং তিনি পরহিতার্থে মৃত্যুকেও বরণ করিয়া থাকেন। উৎপীড়ক ও অত্যাচারীর কল্যাণার্থ ভগবচ্চরণে প্রার্থনাই তাহার নিকট অত্যাচার প্রতিকারের একমাত্র উপায়। তাঁহার পরদুঃখকাতর প্রেমপূর্ণ হৃদয় মহাশত্রুর প্রতিও স্নেহশীল এবং তাহার

অকপট কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। পার্থিব জগৎ তাঁহার নিকট স্বপ্নমাত্র। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই জগতাতীত ভাবে মুগ্ধ, এবং এই দুঃখ যন্ত্রণাময় পৃথিবীর পরপারস্থ এক সুখময় রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর, এই জন্য মর-জগতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাঁহার শান্ত হৃদয় বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না। শত অত্যাচারেও তিনি ক্ষমাশীল, সেবাই তাঁহার হস্তের ভূষণ, হিংসা করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ তিনি করেন না।

এইরূপ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে কর্ম্মাদর্শে যেরূপ বিভিন্নতা আছে, জ্ঞানাদর্শে ও তদ্রূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। উদ্ভাবনী শক্তি সহায়ে নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল আবিষ্কারপূর্ব্বক অগ্রসর হওয়াই পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞানের পথ।

সাধন শক্তি বলে ইন্দ্রিয়াতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়া অলৌকিক সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভে ত্রিবিধ দুঃখ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করাই প্রাচ্য জগতে জ্ঞানের পথ। এইরূপ ভারতবর্ষের চিন্তা ধারায় এবং সাধন পদ্ধতিতে একটি বিশেষত্ব আছে।

রাজনীতি, যাহা পাশ্চাত্যের নিজস্ব সাধনা, সে ক্ষেত্রেও এই ভারতবর্ষে কি একজন প্রাচীন সাধকের বর্ত্তমানকালে অভ্যুদয় হয় নাই—যিনি পাশ্চাত্য অহং বিকাশের পথ, হিংসার পথ, জয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্ব প্রাচ্যাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদিগকে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে ভাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন?

এইরূপে, আমাদের নিজের যে বিশেষত্ব আছে তাহার ভিতর দিয়াই আমাদিগকে বিকাশ লাভ করিতে হইবে। আমাদের নিজের Culture ধরিয়াই জীবনের গতি আরম্ভ করিতে হইবে, শিশু স্বীয় মাতৃস্তন্যে পুষ্ট হইয়া পরে বাহিরের অন্য উপাদান আহরণপূর্ব্বক তাহার দেহ মনকে বর্দ্ধিত করে।

আজকাল Western Culture আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি না; Western Cultureএর মধ্যে যাহা কিছু ভাল আছে সে সমস্তই আমাদিগকে assimilate করিতে হইবে। কিন্তু এই Western Culture assimilate করার পথ ইহা নহে যে আমরা নিজেদের Culture পরিত্যাগ

করিয়া একেবারে Western Cultureএ গা ভাসাইব। আমরা যদি নিজের Culture assimilate করিতে পারি, তাহা হইলেই Western Culture assimilate করিতে সমর্থ হইব। আমাদিগের নিজের Culture assimilate করিবার প্রকৃষ্ট উপায় পরমহংসদেবের মত মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনাপূর্ব্বক তাঁহাদের ভাবের সহিত আমাদের ভাবের যোগসাধন করা।

শ্রীসরসীলাল সরকার।

মাধুকরী

প্রতীচ্যের তরুণ সম্প্রদায়

একটা কথা উঠিয়াছে যে, এ যুগটি স্বাধীনতার যুগ। কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে জার্ম্মাণ যুদ্ধ যে সকল জাতির মুক্তিলাভের সূচনা করিয়াছে, তাহা নহে, জার্ম্মান-যুদ্ধ যে কেবল The world safe for democracy করিবার মন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা নহে, প্রায় সকল ক্ষেত্রে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে এ যুগে যেন একটা স্বাধীনতার আবহাওয়া বহিয়াছে। ঘরে বাহিরে এই স্বাধীনতার প্রভাব প্রতীচ্য জাতিদিগের জীবনে অনুভূত হইতেছে।

প্রতীচ্যের জাতিবর্গের মধ্যে মার্কিণ জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা go-ahead দ্রুত উন্নতিশীল বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। য়ুরোপের ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি এখন 'প্রাচীন পন্থীর' দলে পড়িয়াছে। সুতরাং মার্কিণ জাতির মধ্যে স্বাধীনতা স্পৃহার পরিচয় কিরূপ প্রস্ফুট হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলে এই স্বাধীনতা যুগের কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

বাহিরের অর্থাৎ রাজনীতিক্ষেত্রের স্বাধীনতার সহিত এ প্রবন্ধের সম্পর্ক নাই। এই যুগে মার্কিণের গৃহস্থের ঘরে স্বাধীনতার স্পৃহা কিরূপ ভাবে জাগিয়াছে এবং তাহার ফল কি হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

কর্ত্তা, গৃহিণী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য পোষ্য লইয়া গৃহস্থের সংসার; এক একটি সংসারের সমষ্টি লইয়া সমাজ; সুতরাং ব্যষ্টিরূপে সংসারে যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগরিত হয়, সমষ্টিরূপে সমাজ-শরীরে তাহাই বিস্তার লাভ করে। এই হেতু মার্কিণ সংসারে পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবক-বর্গের এবং সন্তান-সন্ততি ও পোষ্যবর্গের মধ্যে সম্বন্ধের স্বরূপ নির্ণীত হইলে এই স্বাধীনতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে আয়াস স্বীকার করিতে হয় না।

কোনও মার্কিণ লেখক লিখিয়াছেন, দেশের দৈনিক পত্রসমূহ নিত্য-পাঠ করিয়া বুঝা যায়, মার্কিণ-গৃহস্থের ঘরে সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে পাপ ও অপরাধের পরিমাণ যেরূপ দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, মার্কিণ পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গ বিশেষ চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়া-ছেন। মার্কিণের তরুণ সম্প্রদায় সকল প্রকারের শৃঙ্খলা ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে, তাহারা যেরূপে আইন অমান্য করিতেছে ও সমাজের সাধারণ চিরাচরিত সংস্কার ও শালীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সকল অভিভাবকের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে। সকল বিষয়ে তরুণ সম্প্রদায় কোনও Restraint বা বন্ধনের মধ্যে থাকিতে চাহিতেছে না; তাহারা Liberty অর্থে Licenseকে ধরিয়া লইয়াছে, সমাজ-শরীরে এই বিষ বিসর্পিত হইয়া মার্কিণের তরুণ সম্প্রদায়কে ও তথা তাহাদের অভিভাবক গৃহস্থকে জর্জ্জরিত করিতেছে।

মার্কিণ লেখকের আক্ষেপের কারণ আছে। তিনি সখেদে বলিতে-ছেন,—যাহারা মার্ব্বলগুলী অথবা পুতুল লইয়া খেলা করিবে, সেই সকল বালক-বালিকা মার্কিণ দেশের জেল পরিপূর্ণ করিতেছে, ইহা কি কম দুঃখের কথা! এই সকল বালক-বালিকা, কিশোর কিশোরী এবং যুবক-

যুবতীর মধ্যে চোর-ডাকাত, এমন কি, খুনী আসামী পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

নিউইয়র্ক সহরে ফৌজদারী আদালত সমূহের বহু বিচারক দেশকে দেখাইয়া দিতেছেন যে, আধুনিক কালে ফৌজদারী মামলার আসামী অধিকাংশই বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরী (children in their early and middle teens)। নিউইয়র্কষ্টেটের জেল কমিশনার যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে তরুণ অপরাধীর সংখ্যাধিক্যই সপ্রমাণ হয়।

নিউইয়র্কের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাকাডু বলিয়াছেন, "আমার বহুকালের অভিজ্ঞতার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে, অনাচার-অত্যাচার অপরাধে দণ্ডিত আসামীদের মধ্যে ১৬ হইতে ২৫ বৎসরের নর-নারীই অধিক।" নিউইয়র্কের টুমস জেলের কয়েদীদিগের ১ শত ২২ জনের বয়স ১৬ হইতে ২২ বৎসরের মধ্যে, এইরূপ দেখা গিয়াছে। ব্রুকলিনের রেমণ্ড ষ্ট্রীট জেলের গত ৫ বৎসরের হিসাবে দেখা গিয়াছে যে ১৬ হইতে ২১ বৎসর বয়সের কয়েদীদিগের মধ্যে ১২ হাজার ৩ শত ৪২ জন পুরুষ এবং ১ হাজার ৩ শত ৪৬ জন নারী। ইণ্ডিয়ানাপোলিস সহরে ১০ বৎসরের মধ্যে ৬ প্রকার ভীষণ অপরাধে অপরাধীর বয়স গড়পড়তা ৩১ হইতে ২৪এ নামিয়াছে; অর্থাৎ এই দশ বৎসরে অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়স্ক নরনারী এই সকল গুরু অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে। মার্কিণ লেখক এই অবস্থা দেখিয়া চিন্তাকুল হৃদয়ে বলিতেছেন,—The hand-writing is on the wall. বর্ত্তমানের স্বাধীনতাকামী তরুণ সম্প্রদায় এই অবস্থায় আদৌ শঙ্কিত বা বিচলিত নহে; তাহারা বলে, এ সকল অভিযোগ 'বাইবেলওয়ালা' সেকেলে লোকদিগের তরুণ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার বিপক্ষে অভিযানের পরিচয় দেয়। অর্থাৎ তাহারা বলিতে চাহে, সে কালের বুড়ারা ধর্ম্মধ্বজী সাজিয়া তরুণদিগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দৃষ্টিতে হিংসান্বিত হইয়া এইরূপ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু লেখক বলিতেছেন, স্থির-মস্তিষ্ক চিন্তাশীল মার্কিণবাসীর সমাজের এই অবস্থা দেখিয়া—এই

going the pace লক্ষ্য করিয়া জাতীয় অবনতির আশঙ্কায় চিন্তান্বিত হইয়াছেন।

মার্কিণ সমাজ-শরীরে এই বিষ বিসর্পিত হইবার কারণ কি? এ বিষয়ে এই প্রকৃতির ফৌজদারী মামলার বিশেষজ্ঞ ব্যবহারাজীবিগণের অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই জবাব দিয়াছেন যে, "তরুণ সম্প্রদায়ের এই অবস্থা আনয়নের কারণ মার্কিণ গৃহস্থের বর্ত্তমান সংসারের অবস্থা।" ওমাহা সহরের উকীল-সরকার মিঃ ওব্রায়েন বলিয়াছেন, "ঘরে ধর্ম্ম শিক্ষার অভাবই তরুণ সম্প্রদায়ের অপরাধ বৃদ্ধির মূলে নিহিত। অধিকাংশ পিতামাতাই তাহাদের সন্তান-সন্ততির নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উদাসীন; তাহার কারণ এই যে পিতামাতারা নিজেদের সুখ ও বিলাস প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত থাকে, সন্তান-সন্ততিকে সুশিক্ষা দিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না।"

কি ভীষণ কথা! মিঃ ওব্রায়েন আরও খোলসা করিয়া কথাটা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি যে কয় বৎসর ওমাহা সহরে উকীল-সরকারের কার্য্যে ব্রতী আছি, সেই কয় বৎসরে আমি তরুণ অপরাধীর বিপক্ষে ৮ হাজারেরও উপর মামলা চালাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অপরাধী বালিকাগণের ধর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে যথা-সম্ভব খোঁজ লইয়াছি, তাহাদের বাল্য জীবনের পরিচয় লইয়াছি। তদ্দ্বারা আমি জানিয়াছি যে, অপরাধী বালিকাগণের মধ্যে শতকরা মাত্র ৩ জনও গৃহে বা বিদ্যালয়ে বাল্যজীবনে কোনও রূপ ধর্ম্ম শিক্ষা পায় নাই।"

কালিফোর্ণিয়া প্রদেশের লসএঞ্জেলেস সহরের শ্রীমতী এলিস ম্যাক-গিলও ঠিক এইভাবের কথা বলিয়াছেন। তিনি ঐ সহরের উকীল-সরকার জে, ফ্রায়েডল্যাণ্ডারের আফিসের কর্ম্মচারী, সুতরাং তাঁহারও অভিজ্ঞতা সামান্য নহে। তিনি বলেন, "দুইটি প্রধান কারণে তরুণদের মধ্যে এইভাবের পাপের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে:—

(১) বদমায়েসী করিবার অধিক অবসর প্রাপ্তি, (২) গৃহস্থের সংসারে নৈতিক শাসনের অভাব। প্রথম কারণের উচ্ছেদ সাধন করা

বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে, কারণ বদমায়েসীর অবসরপ্রদানের সঙ্কোচ সাধন করা সম্ভবপর ; অর্থাৎ যে সময় বালক-বালিকারা বদমায়েসী করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়, সেই সময় তাহাদিগকে এমন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়, যাহা তাহাদের পক্ষে বিরক্তিকর না হয়, অথচ লাভজনক হয়। কিন্তু দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। এই কারণের মূলোচ্ছেদ করা এখন অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে। কারণ তরুণদের অভিভাবকদের মধ্যেও উচ্চ আদর্শের অভাব ঘটিয়াছে। যদি ধর্ম্মশিক্ষা অর্থে উচ্চ আদর্শ, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, সাহিত্য, সদালাপ, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ, পিতৃমাতৃভক্তি, দেশপ্রেম, শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতি আগ্রহ বুঝায়,—তাহা হইলে আমি বলিব, এই ভাবের ধর্ম্মশিক্ষা আমাদের মার্কিণ-গৃহস্থের সংসার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বয়স্করা যদি নিত্য আইন ও নিয়মভঙ্গ করে এবং তরুণরা যদি নিত্য তদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে প্রতিকারের উপায় কি ?"

ফিলাডেলফিয়া জিলার উকীল-সরকার মিঃ সামুয়েল বোটান বলেন, "১৬ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালক-বালিকাদের মধ্যে পাপ কার্য্যের মাত্রা প্রতিদিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা পেনসেলভেনিয়া প্রদেশের কথা। পরন্তু অন্য সর্ব্বত্র ১৮ হইতে ২১ বৎসর বয়স্কদিগের মধ্যে যত অনাচারী অপরাধী দেখা যায় উচ্চ বয়স্কদের মধ্যে তত দেখা যায় না। এখন বয়স্ক ঝুনা পাপীদের লোমহর্ষণ চুরি-ডাকাতি ও খুন-জালিয়াতির কথা গোয়েন্দার কাহিনীতেই পাওয়া যায়, বাস্তব জগতে পাওয়া যায় না। তরুণদের এই অবনতির অনেকগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে এই কয়টি উল্লেখযোগ্য :—

(১) সংসারের জঘন্য অবস্থা।

(২) সংসারের দারিদ্র্যহেতু জননীকে উদরান্ন সংস্থানের জন্য বাহিরে চাকুরী করিতে হয় ও অধিক সময় বাহিরে অতিবাহিত করিতে হয় ; এ জন্য ছেলে-মেয়েদের উপর মায়ের নজর রাখিবার সময় হইয়া উঠে না, মায়ের নিকট শিক্ষাই ছেলে মেয়ের বাল্য জীবন গঠন করে।

(৩) পূর্ব্বকালের ধর্ম্মের শাসনের কড়াকড়ির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বর্ত্তমানে একটা বিশৃঙ্খলতা আসিয়াছে।

(৪) অবাধে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

(৫) জীবন যাত্রার ব্যয়ের হার বৃদ্ধি।

(৬) অসংযত বিলাস বাসনা।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে তরুণদের বিচারালয়ই একটা কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। এই সব আদালতে প্রায়ই বয়সের অল্পতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দণ্ডবিধান করা হয়। এজন্য দণ্ড প্রায় নাম মাত্র হয়। এই হেতু তরুণরা লঘুদণ্ডে ভীত না হইয়া পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করে, পরন্তু আদালতকে খেলার ঘর বলিয়া অবজ্ঞা করে।"

ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিষময় কারণ যে সংসারের জঘন্য অবস্থা ও ধর্ম্মশিক্ষার অভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই। অসংযত বিলাস বাসনার বৃদ্ধিও আর এক ভয়াবহ কারণ। সুতরাং যে জনক-জননী অথবা অন্য অভিভাবক সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণের মনে বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মশিক্ষার ভিত্তিপত্তন এবং পাপ ও বিলাসে ঘৃণার উদ্রেক সাধন না করিয়া কেবলমাত্র আপনাদের আমোদ প্রমোদের বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লালায়িত, সেই জনক-জননী বা অভিভাবকরাই যে মার্কিণে এই জঘন্য অবস্থা আনয়নের জন্য মূলতঃ দায়ী, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? বাল্‌টিমোরের উকীল-সরকার মিঃ হার্বার্ট ওকোনার পিতামাতার দায়িত্বের কথাটা আরও একটু খুলিয়া বলিয়াছেন :—

"পিতামাতার এলাকাড়ি (অর্থাৎ কর্ত্তব্যের শিথিলতা প্রদর্শন) যত অনিষ্টের মূল। তাহারা ছেলেমেয়েদের জন্য বাড়ীটিকে আকর্ষণের স্থলে পরিণত করিতে পারে না। ছেলেমেয়েরা এই জন্য সকল সময় বাহিরে অসৎ সংসর্গে কাটাইতে অভ্যস্ত হয়। তাহারা বাড়ীটিকে কেবল খাইবার, শুইবার ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিবার আড্ডা বলিয়া মনে করে। একে মাতার নিকট শিক্ষার অভাব তাহার উপর পিতা ও ছেলে-মেয়েদিগকে লইয়া সময় সময় ভ্রাতৃভাবে বা বন্ধুভাবে সংসারের সম্বন্ধে

কোনও পরামর্শ করিবার প্রয়োজন অনুভব করে না। তাহাতেই সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বালটিমোরে সকল প্রকার জঘন্য অপরাধে দণ্ডিত ৬ হাজার আসামীর মধ্যে শতকরা ৮০ জনই তরুণ সম্প্রদায়ের বলিয়া জানা গিয়াছে। যে বয়সে তাহারা এই পাপ কাজ করিয়াছে, পূর্ব্ব যুগে সেই বয়সের ছেলে-মেয়েরা সে সব পাপের কল্পনাও করিতে পারিত না।"

কি ভীষণ অবস্থা! এটালাণ্টার উকীল-সরকার বলিয়াছেন, "এখনকার পিতামাতা ঐহিক সুখসর্ব্বস্ব কেবল স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ায়, মোটর বিহারে, হোটেলের নাচে, রঙ্গ তামাসায়, থিয়েটারে, সিনেমায় বিলাস-লালসা চরিতার্থ করিয়া বেড়ায়, ছেলেমেয়ে শাসন করিবার অবসর পাইবে কোথায়?"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া 'ওয়াশিংটন ষ্টার' পত্র লিখিয়াছেন, "তরুণদের মধ্যে এই অনাচার ও পাপ বৃদ্ধি অতীব ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে। ডাকাইতি, দাঙ্গা, খুন প্রভৃতি ভীষণ অপরাধসমূহ আজকাল তরুণদের মধ্যেই অধিক পরিলক্ষিত হইতেছে। ওয়াশিংটনের বিশপ (পাদরী) সেদিন ধর্ম্মবক্তৃতা দান কালে বলিয়াছেন—এজন্য পিতামাতারা দায়ী; কারণ, তাহারা কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতেছে বলিয়াই দেশের ও জাতির এই সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। তাঁহার একথা অস্বীকার করা যায় না। দিন দিন আমাদের সংসারে পিতামাতার শাসন ও কর্ত্তৃত্ব লোপ পাইতেছে, সংসারে ছেলেমেয়েব সুখ নাই, তাহারা মাতাপিতার ভ্রাতাভগিনীর নৈতিক প্রভাব হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হইতেছে। পিতামাতারা স্বয়ং বিলাস-লালসাপরায়ণ হইয়া ছেলেমেয়েদিগকে সৎশিক্ষা ও সদ্দৃষ্টান্ত দিতে পারে না। তাই বর্ত্তমানে সমাজ পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সাধু নহে, নৈতিক হিসাবে বর্ত্তমানে তরুণরা অবনত হইয়াছে।"

এ অবস্থা কোন দেশেই বাঞ্ছনীয় নহে। যাঁহারা 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' ও 'স্বাতন্ত্র্য' বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে মার্কিণের স্থিরমস্তিষ্ক চিন্তাশীল সম্প্রদায় ইহাতে বিচলিত

হইয়াছেন। তাঁহারা এ অবস্থার প্রতিকারোপায় অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, এখন হইতে মার্কিণ পিতামাতাকে ছেলেমেয়েদের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য আবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, এজন্য তাহাদিগকে কিছু স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে, নিজেদের বিলাস-লালসা ও সুখ-কামনা সংযত করিতে হইবে; অন্যথা সমাজ অচিরে ধ্বংস মুখে পতিত হইবে। আটালান্টা বিভাগের উকীল-সরকার মিঃ পল কার্পেণ্টার বলিয়াছেন, ইহার ঔষধ,—"Home earlier in the evenings, more of the fire side, frank discussions and closer companionship with the family is the only salvation for posterity"

(মাসিক বসুমতী—বৈশাখ ১৩৩২)

উপরোক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আশা করি, "উদ্বোধনের" পাঠক-পাঠিকাগণ স্বদেশ সম্বন্ধে সাবধান হইবেন।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়

(১) কুমিল্লা অভয় আশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী। আশ্রমের আদর্শ—'মাতৃভূমির সেবাদ্বারা ভগবান লাভ।'

আকাঙ্ক্ষা—স্বরাজ প্রাপ্তি। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, অস্পৃশ্যতা ও জন্মগত জাতিভেদ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন, খদ্দর উৎপাদন ও পরিধান এবং জাতীয় শিক্ষার প্রচলন—ইহাই তল্লাভের উপায় স্বরূপ।

আশ্রমের বর্ত্তমান অবস্থা—আশ্রমে এখন ২০ জন সেবক আছেন। তন্মধ্যে ৮ জন চিকিৎসা বিভাগে, ৯ জন খদ্দর বিভাগে এবং ৩ জন শিক্ষা ও কৃষিবিভাগে। অন্যান্য বিভাগের সেবকগণকেও শিক্ষাবিভাগে

কিছু সময়ের জন্য কাজ করিতে হয়। আশ্রমে কোন বিষয়েই জাতিভেদ মানা হয় না। পাচক ও ভৃত্য নাই, সুতরাং আশ্রমের সকল কাজ সেবকগণকে স্বহস্তে করিতে হয়। সেবকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ৫ জন, কায়স্থ ১০ জন, তাঁতি ২ জন, তিলি ১ জন, সাহা ১ জন ও নমঃ শূদ্র ১ জন। আশ্রমে ৫টি বিভাগ আছে—(১) চিকিৎসা বিভাগ। (২) চরকা ও খদ্দর বিভাগ। (৩) শিক্ষা বিভাগ। (৪) গ্রন্থাগার ও পাঠ-ভবন। (৫) কৃষি ও গোপালন।

চিকিৎসা বিভাগে বর্ত্তমানে একটি Out-door dispensary এবং একটি Clinical Laboratory আছে ও ২০ জন রোগী থাকিবার মত একটি Surgical Hospital নির্ম্মিত হইতেছে। গতবৎসর Out-door dispensaryতে ৪১৭৫ জন রোগী ১৪৬৫৯ বার উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কালাজ্বর ৫৬৫, ম্যালেরিয়া ১০৮৬, কলেরা ১৬, আমাশয় ১৮, সিফিলিস গণোরিয়া ১১০, যক্ষ্মা ১৩, কুষ্ঠ ৮ ইত্যাদি। হিন্দু পুরুষ ১৪৫০, মুসলমান পুরুষ ২০৩২, হিন্দু স্ত্রীলোক ৩২৮, মুসলমান স্ত্রীলোক ৩৬৪। উপস্থিত রোগীদিগের শতকরা প্রায় ৭৫ জনলোকের নিকট ঔষধের মূল্য লওয়া হয় না। বাকী শতকরা ২৫ জন লোক হইতে তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী যে মূল্য লওয়া হয় তাহাতে Out-door dispensaryর সর্ব্ববিধ খরচ নির্ব্বাহিত হয়।

কার্য্যবিরণীতে প্রকাশ, চরকা ও খদ্দর বিভাগের তত্ত্বাবধানে গত ১ বৎসরে ২১০১৩॥৶০ টাকার খদ্দর উৎপন্ন এবং ২১৮২২৸/৫ টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে। সমস্ত সূতা এবং কাপড় আশ্রমেই রং করা হয়। দুইখানি তাঁত সেবকেরাই চালাইয়া থাকেন।

শিক্ষা বিভাগে বর্ত্তমান ছাত্রসংখ্যা দেড়শতের অধিক। তন্মধ্যে ১২০ জন আশ্রম বিদ্যালয়ে। মেথর পাড়ার বিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রী ২২ জন এবং আশ্রমস্থিত নৈশ বিদ্যালয়ে ১০ জন। আশ্রম বিদ্যালয়ে ১২০ জনের মধ্যে মুসলমান কৃষক ১২ জন, তাঁতি ১৩, ধোপা ১, নাপিত ২,নমঃ শূদ্র ২২.বৈরাগী ২, ব্রাহ্মণ ৭, সূত্রধর ১ জন। মেথর বিদ্যালয়ে— মেথর ১৪ জন, বেশ্যার ছেলে মেয়ে ৪ জন ও মুসলমান ৪ জন। নৈশ

বিদ্যালয়ে মুসলমান মজুর ৯ ও হিন্দু ১ জন। শিক্ষায়তনগুলি অবৈতনিক। ছাত্রগণ যাহাতে গান বাজনা, ক্রীড়া কৌতুক, চরকাকাটা, আচার ব্যবহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যনীতির দিকে আকৃষ্ট হয় আশ্রম কর্তৃপক্ষগণ সে বিষয়ে যত্ন লইয়া থাকেন।

গ্রন্থাগার ও পাঠভবন—গত বৎসর পাঠাগারে প্রায় দেড় হাজার পুস্তক ছিল, এই বৎসর আরও দুই শত বাড়িয়াছে। ইহার বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা দুইশত।

কৃষি ও গোপালন—আশ্রমের জমিতে কিছু কিছু তরিতরকারী উৎপন্ন হয়। আশ্রমে তিনটি গাই আছে।

গত বৎসরে আশ্রমেব মোট জমা—৩১৩৮৸৹ এবং মোট খরচ ৩১৩৮৸৹ —আয় ও ব্যয় সমান।

দেশের কতিপয় মহাপ্রাণ শিক্ষিত যুবকেব এই গঠন মূলক কার্য্যবিবরণী পাঠে আমবা অতীব আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। বঙ্গীয় যুবকগণ যাহাতে ইঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজের ও জাতির কল্যাণের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগপূর্ব্বক এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন—ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

(২) কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রথম দ্বিবার্ষিক কার্য্যবিবরণী—সেবাশ্রমে একটি পাঠাগার আছে। উহাতে ধর্ম্মপুস্তক ছাড়া বর্ত্তমান সময়োপযোগী আরও প্রায় ৭০০ শত পুস্তক রাখা হইয়াছে।

বর্ষদ্বয়ে আশ্রমের 'ছাত্র-ভবনে' তিনটি গরীব ছাত্র থাকিবার অনুমতি পাইয়াছে।

দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে রোগীগণ ২০৭৮ বার ঔষধ পাইয়াছে।

সেবকগণ চাল্‌তি, শালিমপুর ও মুকুন্দপুর গ্রামে কলেরা সেবাকার্য্যে গমন করিয়া ২৮ জন রোগীর সেবা করেন, তন্মধ্যে ২২ জন আরোগ্য লাভ করে। অন্য সময়ে তাঁহারা ২০ জন কলেরাক্রান্ত ও অন্যান্য রোগীর সেবা করিয়াছিলেন। আনন্দের বিষয় প্রায় সকলেই সুস্থ হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত আশ্রমের সেবকবৃন্দ গঙ্গাসাগর মেলায় ও সুন্দরবনে সেবাকার্য্য করেন।

১৯২২ মে হইতে ১৯২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত সেবাশ্রমের মোট আয়, ৩৯০৫।৭॥ এবং মোট ব্যয় ৩৯০৫।৭॥ টাকা। তন্মধ্যে আশ্রমের সেবকদের যাবতীয় খরচ ও শ্রীশ্রী৺পরমহংস দেবের সেবা পূজার যাবতীয় ব্যয়

—৮৯০৸১০

যাতায়াত খরচ—১৯০৵৫

আশ্রমের আসবাব খরিদ প্রভৃতি—৩৮৮৸১৫

পাঠাগারের আসবাব খরিদ—৩৩৪॥০

উৎসবাদির খরচ—৬৪২॥৶৭॥

মোট ২৪৪৬৸৶১৭॥

টাকা উপরোল্লিখিত বিষয়ে ব্যয়িত হইয়াছে, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় খুব ব্যাপক ভাবে ধরিলেও সেবাকার্য্যে ব্যয় করা হইয়াছে মাত্র ৮২০।/৫ টাকা। যথা—সাময়িক সাহায্য ২৩।/০, দাতব্য চিকিৎসালয়ের খরচ ৯০॥৶১০ রিলিফ খরচ ৮২॥৶৫, পাঠাগারের ব্যয় ১৮৩॥/০, বই খরিদ ২৭৮।/১০, বাড়ী ভাড়া ১৪৬॥৶, এবং ছাপা খরচ ১৫৲ টাকা। নূতন ও দরিদ্র আশ্রমের পক্ষে ৩৮৮৸১৫ টাকার আসবাব খরিদ এবং "সেবাশ্রমের" অর্থে উৎসব ও পূজাদিতে এত অধিক ব্যয় সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। আশা করি, সেবাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণ অতঃপর এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) মনোবিজ্ঞান—শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎমন্দির হইতে প্রকাশিত। মূল্য সাধারণ পক্ষে ১॥০ টাকা।

এই গ্রন্থ প্রধানতঃ পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের বিচার প্রণালী (Western psychology) অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। লব্ধ প্রতিষ্ঠ প্রায় সকল পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের তথা সাংখ্য, বেদান্ত ও নৈয়ায়িক হিন্দু ও বৌদ্ধপণ্ডিতগণের মতামত উল্লিখিত হওয়ায় পুস্তকখানি কলেজ-পাঠী ছাত্রগণের এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনোবিজ্ঞান যাঁহারা তুলনা করিয়া পড়িতে চাহেন, তাঁহাদের সমধিক উপকারে আসিবে।

গ্রন্থকার এই পুস্তকপ্রণয়ন করিয়া বঙ্গদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডারে একটি

বহুমূল্য রত্ন দান করিয়াছেন। ইহার ভাষা যতদুর মনোজ্ঞ ও সরল হওয়া সম্ভব গ্রন্থকারের সে বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা লক্ষিত হইয়াছে। আশা করি, বহিখানি দেশের মনীষিবৃন্দের নিকট আদৃত হইবে।

(৪) সাধন-সমর—তৃতীয় খণ্ড। শ্রীপ্যারীমোহন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা। পুস্তকটি নির্ভুল এবং উহার ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

সংঘ-বার্ত্তা

(১) গত বৈশাখী পূর্ণিমায় ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রমে তথাগত বুদ্ধের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটি সভা হইয়াছিল। উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অভয়-চরণ চক্রবর্ত্তী এম, এ. "দিব্যাবদান" হইতে মহারাজ অশোক ও তাঁহার অমাত্যের কথাপ্রসঙ্গ উদ্ধৃত করিয়া জন্মগত ও গুণগত জাতি সম্বন্ধে বৌদ্ধমত বিবৃত করেন। তদনন্তর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ, শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাব ও মহাপ্রয়াণের অতি সুস্পষ্ট চিত্র তাঁহাব স্বাভাবিক মনোজ্ঞ ভাষায় শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামমোহন চক্রবর্ত্তী ও স্বামী অচ্যুতানন্দ 'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ' এবং 'সমাজের উপর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রভাব" বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ যথাক্রমে পাঠ করিলে ব্রহ্মচারী অমলচৈতন্য 'বুদ্ধ-দেবের শিক্ষা' সম্বন্ধে একটি সুললিত বক্তৃতাদানে সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সঙ্গীত ও প্রসাদ বিতরণের পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

(২) গত ১৩ই বৈশাখ রবিবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জামালপুর (মৈমনসিংহ) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে ঢাকা হইতে ব্রহ্মচারী অমলচৈতন্য ও ব্রহ্মচারী ত্যাগচৈতন্য তথায় গমনপূর্ব্বক "সেবাধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রায় ৮ শত দরিদ্র-নারায়ণ এবং সমাগত ভক্তবৃন্দ 'সেবাশ্রমে' শ্রীভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (শ্রীম)

পঞ্চম ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ হরিকীর্ত্তনানন্দে।

হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় ও রামচন্দ্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার কাঁসারিপাড়ার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভায় শুভাগমন করিয়াছেন, রবিবার, বৈশাখ, শুক্লা সপ্তমী ১৩ই মে ১৮৮৩ খৃঃ। আজ সভার বার্ষিক উৎসব হইতেছে। মনোহরসাঁই কীর্ত্তন হইতেছে।

মান এই পালা গান হইতেছে। সখীরা শ্রীমতীকে বল্‌ছেন—মান কেন করলি, তবে তুই বুঝি কৃষ্ণের সুখ চাস্‌না। শ্রীমতী বল্‌ছেন—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাবার জন্য নয়। সেখানে যাওয়া কেন? সে যে সেবা জানে না।

পরের রবিবার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রের বাটীতে আবার কীর্ত্তন হইতেছে। মাথুর গান। ঠাকুর আসিয়াছেন। বৈশাখ, শুক্লা চতুর্দ্দশী। ৭ই জ্যৈষ্ঠ।

মাথুর গান হইতেছে, শ্রীমতী কৃষ্ণের বিরহে অনেক কথা বলিতেছেন। বালিকা অবস্থা থেকেই শ্যামকে দেখ্‌তে ভালবাসতাম! সখি, নখের ছন্দ দিন গুণিতে ক্ষয় হয়ে গেছে। দেখ, তিনি যে মালা দিয়েছেন সে মালা শুখায়ে গিয়েছে তবু ফেলি নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের উদয় কোথা হলো?

সে চন্দ্র, মান রাহুর ভয়ে বুঝি চলে গেল! হায়, সেই কৃষ্ণ মেঘকে আবার কবে দর্শন হবে; আর কি দেখা হবে? বঁধু প্রাণ ভরে তোমায় কখন দেখ্‌তে পাই নাই; একে দুটি চোখ, তাতে নিমিখ্, তাতে বারিধারা। তাঁর শিরে ময়ূর পাখা যেন স্থির বিজলী। ময়ূরগণ সেই মেঘ দেখে পাখা তুলে নৃত্য কর্‌ত।

'সখি, এ প্রাণতো থাকিবে না—'রেখ দেহ তমাল উপরে, আর আমার গায়ে কৃষ্ণ নাম লিখে দিও।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "তিনি আর তাঁর নাম অভেদ; তাই শ্রীমতী এইরূপ বলছেন। যেই রাম, সেই নাম"। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া এই মাথুর কীর্তন গান শুনিতেছেন। গোস্বামী কীর্ত্তনীয়া এই সকল গান গাইতেছেন। আগামী রবিবারে আবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঐ গান হইবে। তাহার পরের রবিবারে আবাব অধরের বাড়ীতে ঐ কীর্ত্তন হইবে।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিজের ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন ও ভক্ত সঙ্গে কথা কহিতেছেন। আজ রবিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা পঞ্চমী ২৭শে মে ১৮৮৩ খৃঃ বেলা ৯টা হইবে। ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। বিদ্বেষভাব ভাল নয়। শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক, এরা ঝগড়া করে, সেটা ভাল নয়। পদ্মলোচন বর্দ্ধমানের সভাপণ্ডিত ছিল; সভায় বিচার হচ্ছিল শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। পদ্মলোচন বেশ বলেছিল—আমি জানি না, আমার সঙ্গে শিবেরও আলাপ নেই, ব্রহ্মারও আলাপ নেই। (সকলের হাস্য)।

"ব্যাকুলতা থাক্‌লে, সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। তবে নিষ্ঠা থাকা ভাল। নিষ্ঠাভক্তির আর একটি নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি। যেমন এক ডেলে গাছ, সোজা উঠেছে। ব্যভিচারিণী ভক্তি যেমন পাঁচ ডেলে গাছ। গোপীদের এমনি নিষ্ঠা যে বৃন্দাবনের মোহন চূড়া, পীত-

ধড়া-পরা রাখাল কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভাল বাসবে না। মথুরায় যখন রাজবেশ, পাগড়ী মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন করলে তখন তারা ঘোমটা দিলে। আর বল্লে ইনি আবার কে; এঁর সঙ্গে আলাপ করে কি আমরা বিচারিণী হব?

"স্ত্রী যে স্বামীর সেবা করে সেও নিষ্ঠা ভক্তি; দেবর ভাসুরকে খাওয়ায়, পা ধোয়ার জল দেয়, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ। সেইরূপ নিজের ধর্ম্মেতেও নিষ্ঠা হতে পারে। তা বলে অন্য ধর্ম্মকে ঘৃণা করবে না। বরং তাদের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করবে।"

[জগৎ মাতার পূজা ও আত্মপূজা। বিপৎনাশিনী মন্ত্র ও নৃত্য।]

ঠাকুর গঙ্গাস্নান করিয়া কালী ঘরে গিয়াছেন। সঙ্গে মাষ্টার। ঠাকুর পূজার আসনে উপবিষ্ট হইয়া, মার পাদপদ্মে ফুল দিতেছেন, মাঝে মাঝে নিজের মাথায়ও দিতেছেন, ও ধ্যান করিতেছেন।

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর আসন হইতে উঠিলেন। ভাবে বিভোর; নৃত্য করিতেছেন। আর মুখে মার নাম করিতেছেন। বলিতেছেন, 'মা বিপদনাশিনী গো বিপদনাশিনী'। দেহ ধারণ করলেই দুঃখ বিপৎ; তাই বুঝি জীবকে শিখাইতেছেন তাঁহাকে 'বিপৎনাশিনী' এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কাতর হইয়া ডাকিতে।

[পূর্ব্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঝামাপুকুরের নকুড় বাবাজী।]

এইবার ঠাকুর নিজের ঘরের পশ্চিম বারাণ্ডায় আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন। এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে। কাছে রাখাল, মাষ্টার, নকুড় বৈষ্ণব প্রভৃতি। ঠাকুর, নকুড় বৈষ্ণবকে ২৩।২৪ বৎসর ধরিয়া জানেন। যখন তিনি প্রথম কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুরে ছিলেন ও বাড়ী বাড়ী পূজা করিয়া বেড়াইতেন তখন নকুড় বৈষ্ণবের দোকানে আসিয়া মাঝে মাঝে বসিতেন ও আনন্দ করিতেন। পেনেটীতে রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব উপলক্ষে নকুড় বাবাজী ইদানীং ঠাকুরকে প্রায় বর্ষে বর্ষে দর্শন করিতেন। নকুড় ভক্ত বৈষ্ণব, মাঝে মাঝে তিনিও মহোৎসব

দিতেন। নকুড় মাষ্টারের প্রতিবেশী। ঠাকুর কামারপুকুরে যখন ছিলেন, গোবিন্দ চাটুর্য্যের বাড়ীতে থাকিতেন। সেই পুরাতন বাটী নকুড় মাষ্টারকে দেখাইয়া ছিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার নামকীর্ত্তনানন্দে।]

ঠাকুর ভাবাবেশে গান গাইতেছেন।

কীর্ত্তন।

(১) সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মন মোহিনী
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ মা আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনি শূন্যরূপা শশিভালী
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন (তুই) মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি
যেমন করাও তেমনি করি মা যেমন বলাও তেমনি বলি।
নির্গুণে কমলাকান্ত, দিয়ে বলে মা গালাগালি
সর্ব্বনাশী ধরে অসি ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো খেলি।

(২) আমার মা ত্বংহি তারা
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি মা ও দীন দয়াময়ী তুমি দুর্গমেতে দুখহরা।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা
আছ সর্ব্বঘটে অর্ঘ্যপুটে সাকার আকার নিরাকারা।
তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি আদ্য মূলে গো মা
তুমি অকূলের ত্রাণ কর্ত্রী সদা শিবের মনোহরা।

৩। গোলেমালে মাল রয়েছে, গোল ছেড়ে মাল বেছে নাও।

৪। মন চল যাই, আর কাজ নাই, তারার ও তালুকেরে।

৫। পড়িয়ে ভবসাগরে, ডোবে মা তনুর তরী,
মায়া ঝড় মোহ তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী।

৬। মা পোয়ে দুটো দুখের কথা কই।
কারুর হাতির উপর ছই, কারু খাসা চিঁড়ের উপর দই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন, "সংসারীদের সম্মুখে কেবল দুঃখের কথা ভাল নয়। আনন্দ চাই। যাদের অন্নাভাব, তারা দুদিন বরং উপোস করতে পারে, আর যাদের খেতে একটু বেলা হলে অসুখ হয়, তাদের কাছে কেবল কান্নার কথা, দুঃখের কথা, ভাল নয়।

"বৈষ্ণব চরণ বলতো, কেবল পাপ পাপ এ সব কি ? আনন্দ করো।"

ঠাকুর আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতে না করিতে মনোহরসাঁই গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত।

[শ্রীরাধার ভাবে মহাভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ।
ঠাকুর কি গৌরাঙ্গ !]

গোস্বামী পূর্ব্বরাগ কীর্ত্তন গান করিতেছেন। একটু শুনিতে শুনিতেই ঠাকুর রাধার ভাবে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

প্রথমেই গৌরচন্দ্রিকা কীর্ত্তন। 'করতলে হাত—চিন্তিত গোরা—আজ কেন চিন্তিত—বুঝি রাধার ভাবে হয়েছে ভাবিত'।

গোস্বামী আবার গান গাইতেছেন।

গান।

১। ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আসে যায়।
কিবা মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়।
(রাই এমন কেন বা হলো গো)।

গানের এই লাইনটি শুনিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাবের অবস্থা হইয়াছে। গায়ের জামা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

কীর্ত্তনীয়া যখন গাইতেছেন।

গান।

শীতল তছু অঙ্গ।
তনু পরশে, অমনি অবশ অঙ্গ।

ঠাকুরের কম্প হইতে লাগিল।

(কেদার দৃষ্টে) ঠাকুর কীর্ত্তনের সুরে বলিতেছেন, "প্রাণনাথ, হৃদয়

বল্লভ, তোরা কৃষ্ণ এনে দে ; সুহৃদের তো কাজ বটে ; হয় এনে দে, না হয় আমায় নিয়ে চল্ ; তোদের চিরদাসী হব।"

গোস্বামী কীর্ত্তনীয়া ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি করজোড়ে বলিতেছেন, "আমার বিষয় বুদ্ধি ঘুচিয়ে দিন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। 'সাধু বাসা পাকড় লিয়া।' তুমি এত বড় রসিক ; তোমার ভিতর থেকে এত মিষ্ট রস বেরুচ্ছে !

গোস্বামী। প্রভু, আমি চিনির বলদ চিনির আস্বাদন করতে কই পেলাম ?

আবার কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। কীর্ত্তনীয়া শ্রীমতীর দশা বর্ণনা করিতেছেন।

কোকিল কুল কুর্ব্বতি কলনাদম্।

কোকিলের কলনাদ শুনে শ্রীমতীর বজ্রধ্বনি বলে মনে হচ্ছে। তাই জৈমিনির নাম কচ্ছেন। আর বলছেন সখি, কৃষ্ণ বিরহে এ প্রাণ থাকবে না, 'রেখ দেহ তমাল উপরে'।

গোস্বামী রাধাশ্যামের মিলন গান গাইয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় বলরাম, রাম ও অধরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দির হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন। বলরামের বাটী হইয়া অধরের বাড়ী যাইবেন। তারপর রামের বাড়ী যাইবেন। অধরের বাড়ীতে মনোহরসাঁই কীর্ত্তন হইবে। রামের বাড়ীতে কথকতা হইবে। আজ শনিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, কৃষ্ণা দ্বাদশী, ২রা জুন ১৮৮৩ খৃঃ।

ঠাকুর গাড়ী করিয়া আসিতে আসিতে রাখাল ও মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তদের বলিতেছেন, "দেখ তাঁর উপর ভালবাসা এলে পাপ টাপ সব পালিয়ে যায়, সূর্য্যের তাপে যেমন মেঠো পুকুরের জল শুকিয়ে যায়।

[সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের বিষয়াসক্তি।]

"বিষয়ের উপরে, কামিনী কাঞ্চনের উপর ভালবাসা থাকলে হয় না। সন্ন্যাস করলেও হয় না; যদি বিষয়াসক্তি থাকে। যেমন থুথু ফেলে আবার খাওয়া।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ীতে ঠাকুর আবার বলিতেছেন। "ব্রহ্মজ্ঞানীরা সাকার মানে না। (সহাস্যে) নরেন্দ্র বলে পুত্তলিকা। আবার বলে, 'উনি এখনও কালী ঘরে যান।'

ঠাকুর বলরামের বাড়ীতে আসিয়াছেন। বেলা ৪টার সময় যজ্ঞনাথ নন্দনবাগান হইতে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। নন্দন বাগানে তাঁহাদের বাড়ীতে ব্রাহ্ম সমাজের বর্ষে বর্ষে উৎসব হয়। যজ্ঞনাথ বলিতেছেন, "আপনি সকাল সকাল আসিবেন।" ঠাকুর বলিলেন, "শরীর যদি ভাল থাকে, সকালে আস্‌বার আপত্তি নাই।"

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরলীলা দর্শন ও আস্বাদন।]

যজ্ঞনাথ চলিয়া গেলে, ঠাকুর হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। বুঝি দেখিতেছেন, ঈশ্বরই জীব জগৎ হইয়া রহিয়াছেন, ঈশ্বরই মানুষ হইয়া বেড়াইতেছেন। জগৎ মাতাকে বলিতেছেন, "মা, একি দেখাচ্ছ। থাম আবার কত কি। রাখাল টাখালকে দিয়ে কি দেখাচ্ছ। রূপ টুপ সব উড়ে গেল। তা মা মানুষ তো কেবল খোলটা। খোলটা বইত নয়! চৈতন্য তোমারই।

"মা, ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা মিষ্টরস পায় নাই। চোখ শুকন, মুখ শুকন! প্রেমভক্তি না হলে কিছুই হোলো না।

"মা তোমাকে বলেছিলাম, এক জনকে সঙ্গী করে দাও, আমার মত। তাই বুঝি রাখালকে দিয়েছ।"

[অধরের বাটীতে হরি কীর্ত্তনানন্দে।]

ঠাকুর অধরের বাড়ী আসিয়াছেন। মনোহরসাই কীর্ত্তনের আয়োজন হইতেছে।

অধরের বৈঠকখানায় অনেকগুলি ভক্ত ও প্রতিবেশী ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলের ইচ্ছা ঠাকুর কিছু বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। সংসার আর মুক্তি দুই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনিই সংসারে অজ্ঞান করে রেখেছেন; আবার তিনিই ইচ্ছা করে যখন ডাকবেন তখন মুক্তি হবে। ছেলে খেলতে গেছে, খাবার সময় মা ডাকে।

"যখন তিনি মুক্তি দিবেন তখন তিনি সাধুসঙ্গ করিয়ে লেন। আবার তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা করে দেন।"

প্রতিবেশী। মহাশয়, কি রকম ব্যাকুলতা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কর্ম্ম গেলে কেরাণীর যেমন ব্যাকুলতা হয়। সে যেমন রোজ আফিসে আফিসে ঘোরে আর জিজ্ঞাসা করে—কোনও কর্ম্মখালি হয়েছে? ব্যাকুলতা হলে, ছটফট করে, কিসে ঈশ্বরকে পাব।

"গোঁপে চাড়া, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন, পান চিবুচ্ছেন, কোন ভাবনা নেই এরূপ অবস্থা হলে ঈশ্বর লাভ হয় না।"

প্রতিবেশী। সাধুসঙ্গ হ'লে এই ব্যাকুলতা হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ হতে পারে; তবে পাষণ্ডের হয় না। সাধুর কমণ্ডলু চার ধাম করে এল তবু যেমন তেতো তেমনি তেতো।

এইবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। গোস্বামী কলহান্তরিতা গাইতেছেন।

শ্রীমতী বলছেন, সখি প্রাণ যায়, কৃষ্ণ এনে দে।

সখী। রাধে, কৃষ্ণ মেঘে বরিষণ হতো, কিন্তু তুই মান ঝঞ্ঝাবাতে উড়াইলি। "তুই কৃষ্ণ সুখে সুখী নস্; তা হলে মান করবি কেন?

শ্রীমতী। সখি, মান তো আমার নয়। যার মান তার সঙ্গে গেছে!

ললিতা শ্রীমতীর হয়ে দুটা কথা বল্‌ছেন।

১। সবহু মিলি করয়লি প্রীত,
কোই দেখায়লি ঘাটে মাঠে,
বিশাখা দেখালি চিত্রপটে।

এইবার কীর্ত্তনে গোস্বামী বলছেন, যে সখীরা রাধাকুণ্ডের নিকট শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে লাগল। তারপর যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন, শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল সঙ্গে ; বৃন্দার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথা ; শ্রীকৃষ্ণের যোগিবেশ ; জটিলা সংবাদ ; রাধার ভিক্ষা দান ; রাধার হাত দেখে যোগীর গণনা ও ফাঁড়া কথন। কাত্যায়নী পূজায় যাওয়ার আয়োজন কথা।

[The Humanity of Avatars.]

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে আলাপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। গোপীরা কাত্যায়নী পূজা করেছিলেন। সকলেই সেই মহামায়া আদ্যাশক্তির অধীনে। অবতার আদি পর্য্যন্ত মায়ার আশ্রয় করে তবে লীলা করেন। তাই তাঁরা আদ্যাশক্তির পূজা করেন। দেখ না, রাম, সীতার জন্য কত কেঁদেছেন। 'পঞ্চ ভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।'

"হিরণ্যাক্ষকে বধ করে বরাহ অবতার ছানা পোনা নিয়ে ছিলেন। আত্ম বিস্মৃত হয়ে তাদের মাই দিচ্ছিলেন। দেবতারা পরামর্শ করে শিবকে পাঠিয়ে দিলেন। শিব শূলের আঘাতে বরাহের দেহ ভেঙ্গে দিলেন, তবে তিনি স্বধামে চলে গেলেন। শিব জিজ্ঞাসা করেছিলেন— তুমি আত্ম বিস্মৃত হয়ে আছ কেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, আমি বেশ আছি!"

অধরের বাটী হইয়া এইবার ঠাকুর রামের বাড়ীতে গমন করিলেন। সেখানে কথক ঠাকুরের মুখে উদ্ধব-সংবাদ শুনিলেন। রামের বাড়ীতে কেদারাদি ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। (দ্বিতীয় ভাগ—পঞ্চম খণ্ড।)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অতি আকস্মিক পরলোকগমন সংবাদে সমস্ত ভারতবর্ষ একসঙ্গে হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ এক সঙ্গে কাঁদিতেছে। একের মৃত্যুতে একটা জাতির শোকচ্ছ্বাস —জগতের ইতিহাসে সচরাচর ঘটে না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পুরুষসিংহ ছিলেন। ত্যাগে ও বীর্য্যে, দয়া ও প্রেমে তিনি সমগ্র জাতির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিলেন। জাতির প্রবুদ্ধ সমষ্টি-চৈতন্যের উপর তাঁহার প্রখর ব্যক্তিত্ব এক অনুপম বৈশিষ্ট্য লইয়া যে দাগ রাখিয়া গেল—তাহা বহুদিন অম্লান থাকিবে, সন্দেহ নাই।

ভাবুক ও কবি চিত্তরঞ্জন যে গুণে ভারতবর্ষের—বিশেষ ভাবে বাঙ্গলা দেশের হৃদয়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা মনুষ্য-চরিত্রে খুব সুলভ নহে। অসহযোগ আন্দোলনে বাঙ্গলার এক ও অদ্বিতীয় নেতারূপে তিনি ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন, সেই দুর্লভ পদ দেশবন্ধু দৈবক্রমে পথের ধুলায় কুড়াইয়া পান নাই, অতি মহনীয় ত্যাগের মূল্যে তাঁহাকে জাতির বিশ্বাস ক্রয় করিতে হইয়াছে। অনেকের সহিত তুলনায় বিচার বিশ্লেষণ করিয়া তবেই দেশ তাঁহাকে অবিসম্বাদী নেতৃত্বের আসন দিয়াছিল। স্বদেশসেবার জন্য, সর্ব্বোপরি স্বদেশকে চিনিবার জন্য স্বদেশী-যুগ হইতেই চিত্তরঞ্জন প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ পঞ্চদশবর্ষ-ব্যাপী সাধনার ফল, অসহযোগ আন্দোলনে পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যে বিকশিত হইয়াছিল।

প্রতিভাশালী আইন ব্যবসায়ী চিত্তরঞ্জনের ভিতরের মানুষটি প্রথম জাগিয়াছিল—স্বদেশী আন্দোলনের আলোড়নে। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙ্গালীর নব-উদ্বোধিত জাতীয়তার সিংহগর্জ্জনের মধ্যে, যুক্তি-পন্থী সন্দেহ-বাদী যুবক চিত্তরঞ্জন—বাঙ্গলার প্রাণের সাড়া পাইলেন। বাঙ্গলার প্রাণের এই বিচিত্র অনুভূতি তাঁহার চিন্তারাজ্যে এক আমূল পরিবর্ত্তন

আনিয়া দিল। বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া যে আন্দোলন জাগিয়াছিল—তাহা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন নহে, বাঙ্গালী-জীবনের সর্ব্বস্তরেরই একটা জাগরণের আন্দোলন। ধর্ম্মে, সাহিত্যে, সমাজে বাঙ্গালীর যাহা কিছু নিজস্ব, যাহা কিছু গৌরবের তাহাই বাঙ্গালী গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

যে সমস্ত শক্তি-কেন্দ্র হইতে সমুৎসারিত ভাবধারায় স্বদেশী আন্দোলন পুষ্ট হইয়াছে—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়যুগ তাহার অন্যতম। ফেরঙ্গ সভ্যতার আঘাতে ও মোহে বিপর্য্যস্ত বাঙ্গালী জাতিকে আত্মস্থ করিবার জন্য, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়। ইহা শুধু একটা ব্যক্তিগত প্রকাশ নহে—ইহা বিশেষ ভাবে একটা যুগধর্ম্মের সমন্বয়। বিপরীত সভ্যতা ও শিক্ষার আঘাতে যে জাতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তাহার প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে—তাহার মৃত্যু সন্নিকট। অনেকে বাঙ্গালী জাতিকেও তাহাই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের ভাগ্য বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ। এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায়, জাতি তাহার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত জাতীয় আদর্শকে অতি দ্রুত কেন্দ্রীভূত ও সংহত করিয়া লইল। বিবেকানন্দ সেই আদর্শে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সতেজ ও অটুট জাতীয় প্রাণশক্তিতে ওতপ্রোত 'যুবাবস্থ ভারতবর্ষের' প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া, জাতীয় আদর্শের ধারক ও বাহক রূপে ভারতের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ সমন্বয় যুগকে লইয়া আসিলেন। স্বদেশী আন্দোলন এই সমন্বয়যুগের আদর্শ প্রচার করিয়াছে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, ঋষি অরবিন্দ এই সমন্বয় যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও বিবেকানন্দের বাণী দিয়াই নব জাতীয়তার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। মনীষী চিত্তরঞ্জন এই সমন্বয়যুগেরই মানস-বংশধর। তিনি এই নবযুগের নূতন মানুষ ছিলেন। একথা তিনি বহুবার বহু চিত্রে আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি দেখিতেছি ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি, সেই বাঙ্গলার প্রাণধর্ম্ম ধীরে ধীরে কেমন লীলাচঞ্চল

স্রোতের মত চলিয়াছে, 'মাৎস্যন্যায়ের' অরাজকতার যুগে বাঙ্গলা যে গর্জ্জন করিয়াছিল, সে সুর বাঙ্গালী ভুলিয়া যায় নাই। আজ ফেরঙ্গ-যুগেও বাঙ্গলা সেই ধর্ম্মের আন্দোলন ভুলে নাই। কত শতাব্দী পরে আবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী মূলে বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম্ম যে প্রাণ মূর্ত্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই সময়েই এই নগরোপ্রান্তে (ঢাকা) সেই অদ্বৈতবংশধর গোঁসাই শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোণ্ডরিয়ার গহনবনে সেই প্রাণধর্ম্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেখিতেছি, পদ্মা-গঙ্গার লীলার স্রোত একই প্রাণের আন্দোলন।"

বাঙ্গলার বহু বিচিত্র সাধন ধারাগুলির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য অব্যাহত রাখিয়া সর্ব্ব সমন্বয়কারী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে যেদিন চিত্তরঞ্জন মাথা নত করিয়া দাঁড়াইলেন, সেইদিন মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব কাব্য তাঁহাকে এক নূতন আলোকে পথের সন্ধান দিল। প্রোথিতযশাঃ ব্যবহারাজীব চিত্তরঞ্জন বাঙ্গলার প্রাণধর্ম্মের ধর্ম্মী সাধক হইয়া উঠিলেন। তাই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার রাজনৈতিক সম্মিলনীতে চিত্তরঞ্জন যে অভিভাষণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রচলিত অর্থে রাজনীতি বলিতে যাহা তৎকালে বুঝাইত, তাহা নহে। নব্য ভারতের মন্ত্রগুরু বিবেকানন্দের প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে শুনাইয়াছিলেন,—

"ঐ যে বাঙ্গালী কৃষক, সমস্ত দিন বাঙ্গলার মাঠে মাঠে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাঙ্গলার কুটীরে কুটীরে, বাঙ্গলার গান গাইতে গাইতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অহঙ্কারী মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অবিশ্বাসী তোমার শুষ্ক প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! আততায়ি! তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও—জন্মের মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ। ডাক! ডাক। সবাইকে ডাক! প্রাণের ডাক শুনিলে কি কেহ না আসিয়া থাকিতে পারে? ওঠ! জাগ। ডাক। আপনার কল্যাণকে জাগাও।"

বিবেকানন্দ অনুপ্রাণিত সেবাধর্ম্মের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চিত্তরঞ্জন

নরের মধ্যে নারায়ণের সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও অধুনা-বিলুপ্ত মাসিক পত্রিকা 'নারায়ণ' সেই নরের মধ্যে নারায়ণের উদ্বোধন বাণীই প্রচার করিয়াছে। তাৎকালিক জাগ্রত যুবক-শক্তির অধিকাংশই বিবেকানন্দের সেবাধর্ম্মের পতাকাতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আমরা চিত্তরঞ্জনকেও দেখিয়াছি। এবং এইখানেই সেই সরল উদার আত্মভোলা প্রেমিক পুরুষটির সহিত আমরা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেকালে তাঁহাকে প্রায়ই বেলুড় মঠে আমরা দেখিয়াছি। অনেকদিন তিনি মঠে রাত্রি-যাপনও করিতেন। উৎসবের দিন, সর্ব্বসাধারণ দরিদ্র-নারায়ণের মধ্যে বসিয়া প্রসাদ ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন এবং ভাবানন্দে গদগদ হইয়া বলিতেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় আমার জাতির সহিত প্রাণের যোগসূত্র অনুভব করিয়া ধন্য হইলাম।'

এস্থলে এক রাত্রির একটা ঘটনা উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে আমরা মঠে আসিয়া দেখি, চিত্তরঞ্জন বসিয়া পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দ ও প্রজ্ঞানন্দজীর সহিত আলাপ করিতেছেন। রাত্রে তিনি মঠে থাকিবেন। মঠের সংলগ্ন উত্তরদিকের একটি বাড়ীতে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রেম ও স্নেহের মূর্ত্ত বিগ্রহ বাবুরাম মহারাজ এই অতিথির যত্ন ও সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মঠে কোন অতিথি আসিলে, তা তিনি যেই হউন—বাবুরাম মহারাজ তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ব্যস্ত হইতেন। তিনি বলিলেন, "অত বড় বিলাসী সাহেব; এই গরমে কেমন করিয়া ঘুমাইবে?" চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে ব্যস্ত হইবার জন্য যতই নিষেধ করুন না কেন, বাবুরাম মহারাজের মায়ের মত স্বাভাবিক হৃদয়ের উৎকণ্ঠা যেন কিছুতেই দূর হয় না। তিনি রাত্রে বাতাস করিতে এবং চিত্তরঞ্জনের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে জনৈক সেবককে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিলেন। চিত্তরঞ্জন শুইয়া আছেন, সেই ব্যক্তি তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল। চিত্তরঞ্জন নিষেধ করিলেও, সে বাবুরাম মহারাজের আদেশের কথা উল্লেখ করিলে, তিনি আর কিছু বলিলেন না। তখন রাত্রি ১২টা।

তাঁহার নিদ্রা আসে নাই। তিনি সহসা তাহাকে শয্যাপ্রান্তে বসিতে বলিলেন, সে সঙ্কুচিত হইয়া এক পার্শ্বে বসিল। চিত্তরঞ্জন স্নেহভরে তাহাকে বাড়ীঘরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আকর্ষণের কথা বলিলেন। প্রোথিতযশাঃ ব্যারিষ্টার চিত্ত-রঞ্জনের এমন সহজ সরল আলাপে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন সময়ে তিনি স্নেহভরে তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া কৌতুকের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি তুমি কাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাস ?"

প্রশ্ন শুনিয়া সে লজ্জায় মাথা নোয়াইল।

চিত্তরঞ্জন আদর করিয়া বলিলেন, "লজ্জা কি, তুমি বল, তারপর আমিও বলিব।"

সে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া অনেক বন্ধুর নাম করিল। চিত্তরঞ্জন হাসিয়া উঠিলেন, সে লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল। তখন চিত্তরঞ্জন প্রগাঢ় স্নেহে বলিলেন, "আমাকে যদি তুমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে, তবে আমি বলিতাম, আমার বাঙ্গলাকে আমি সব চেয়ে বেশী ভালবাসি। এই বাঙ্গলাদেশকে ভালবাস। ইতিহাস পড—বাঙ্গলাকে জানিবার চেষ্টা কর। যেখানেই থাক, আর যাই কর—এই বাঙ্গলাকে ভালবাসিও।

সব কথা ভাল মনে নাই কিন্তু সেই আবেগময়ী কণ্ঠস্বর, সেই বঙ্গ-মাতার একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের অপূর্ব্ব বাণীর ঝঙ্কার এখনো কানে লাগিয়া আছে। সেই স্বল্প পরিচয়ের মধ্য দিয়া এক অপূর্ব্ব মহান হৃদয়ের পরিচয়ের সৌভাগ্যে আমরা ধন্য হইয়াছিলাম। তারপর আরও নানাভাবে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছে। জলন্ত স্বদেশপ্রেমের সেই দীক্ষা—জীবনে ভুলিবার নয়! কালে আরও অনেক স্বদেশ প্রেমিক জ্ঞানী, গুণী, মনীষীর সহিত প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়াছে—কিন্তু এমন সতেজ প্রাণ, এমন অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

চিত্তরঞ্জনের রাজনীতি, যে জিনিষটাকে Politics বলে কেবল তাহাই ছিল না। তিনি ব্যক্তির জীবন বা জাতির জীবনের কোন খণ্ড সাধনায়

বিশ্বাস করিতেন না। তিনি জাতীয় বিলুপ্তপ্রায় সাধন ধারার সহিত জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন যোগস্থাপনকেই মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া ভাবিতেন এবং বলিতেন,—* * "রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় বলিতে হইলে, যে কথা অনেকবার শুনিয়াছি, তাহাই বলিতে হয়, বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া তোলা।" এই যে মানুষ করিয়া তোলা, এই চেষ্টাতেই চিত্তরঞ্জন তাঁহার জীবনের শেষভাগ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। "আমি এমন এক ধর্ম্ম প্রচার করতে চাই, যাতে মানুষ তৈরী হয়"— বিবেকানন্দের এই বাণী অনুসরণ করিয়াই চিত্তরঞ্জন অটল বিশ্বাসে আজীবন কর্ম্ম করিয়াছেন, অবশেষে সর্ব্বত্যাগী হইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহকর্ম্মিরূপে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাও সেই মহান উদ্দেশ্য লইয়াই।

দুঃসাহসী নির্ভীক চিত্তরঞ্জন—দোষে গুণে জড়িত মানুষ ছিলেন। তথাপি তাঁহার জীবনের প্রচণ্ড ও উদ্দাম গতিপথে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক নেতাগণের সহিত তুলনায় হীনপ্রভ তো নহেই বরং অনেক দিকে অধিকতর মহিমায় দেদীপ্যমান।

সহসা চিত্তরঞ্জন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে চলিয়া গেলেন—অকালে তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে সমগ্র বাঙ্গালীজাতি শোকার্ত্ত। স্থূলদৃষ্টি মানব আমরা—অদৃশ্য মহাশক্তির খেলা কেমন করিয়া বুঝিব। হয় তো চিত্তরঞ্জনের কার্য্য শেষ হইয়াছিল—তাই জগন্মাতা তাঁহার রণশ্রান্ত বীর পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। স্বদেশের সমষ্টি-মুক্তির সাধন-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া চিত্তরঞ্জন যে কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, আমাদের কর্ম্ম প্রচেষ্টায় যেন তাহা মলিন না হয়। তাঁহার পরিত্যক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে আজ ছোট বড় সকলকে দাঁড়াইতে হইবে, বাঙ্গালীকে মানুষ হইতে হইবে, তাহাকে সাধনায় সিদ্ধি অর্জ্জন করিতে হইবে। চিত্তরঞ্জনের স্মৃতির প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ইহাই একমাত্র পন্থা। শ্রীভগবান, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আত্মাকে শান্তি এবং তাঁহার পতাকা বহন করিবার জন্য পরবর্ত্তীদের শক্তি দিন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সাংখ্য-দর্শন

[ওস্তাদ বিনা কোন শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝা যায় না। আমি বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত একখানি "সাংখ্য দর্শনম্", ব্যকরণ কৌমুদী এবং দুইখানি অভিধান লইয়া অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে দু-একজন পণ্ডিত বন্ধুর মুখে কিছু কিছু পৌরাণিক গল্প শুনিয়াছিলাম। অনেক সময় কারিকায় যাহা নাই, অথচ কারিকার অর্থ বুঝিবার জন্য যাহা আমাকে ভাবিতে হইয়াছিল, তাহা প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উদ্দেশ্য—অপরের অর্থ বুঝিবার সুবিধা হইবে। আমি যেমন যেমন কারিকা পড়িয়াছি তাহার অনুবাদ করিয়াছি। একটি দুরূহ ভাষায় লিখিত পুস্তকের অনুবাদ কালে একস্থানে পাইয়াছি "নায়ক নায়িকাকে ছাড়িবার চেষ্টা করিতেছে।" আমি তাহাই অনুবাদ করিয়াছি। পুস্তকের অন্য স্থানে পাইয়াছি নায়িকা নায়ককে মুক্তি দিবার জন্য নায়কের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিতেছে; আমি সমালোচনা না করিয়া তাহাই অনুবাদ করিয়াছি। সমালোচনা পরে হইবে। সূক্ষ্ম বিষয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হয়। দৃষ্টান্ত কখনও নির্ভুল হয় না, যথা চন্দ্রমুখী নারী। দর্শন শাস্ত্রের তত্ত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব এবং আওড়ানোতে অনেক প্রভেদ। ওস্তাদ বিনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু কে আমাকে সাকরেদ করিবে? আমি একলব্য তুল্য, একলব্য জাতীয়দের জন্যই এই অনুবাদ করিতেছি।]

৪২

জীবন নাটকের অভিনয় হইতেছে; দর্শক হইতেছেন বহবঃ পুরুষাঃ। অভিনেতা, অভিনেত্রী অনেক হইলেও নটের বা অধিকারীর কথামত তাহাদিগকে রঙ্গমঞ্চে আসিতে যাইতে হইবে। নাটকে প্রকৃত অভিনয়ের পূর্ব্বে প্রস্তাবনা হইয়া থাকে। প্রস্তাব হইতে প্রস্তাবনা হইয়াছে। প্রস্তাব এবং প্রসঙ্গ একই অর্থবাচক শব্দ। প্রতিপাদ্য বিষয় যে

বাক্যাবলী দ্বারা উত্থাপিত হয় তাহাকে প্রস্তাবনা বা প্রসঙ্গ বলে। প্রস্তাবনায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংলাপ হইয়া থাকে। জীবন নাটকের প্রস্তাবনায় সংলাপ্য বিষয় হইতেছে নিমিত্ত এবং নৈমিত্তিক। নিমিত্ত=কারণ, নৈমিত্তিক=কার্য্য। প্রকৃতি হইতেছেন কারণ; তাঁহার কার্য্য কি? তিনি ব্যক্ত জগৎ রূপে পুরুষদিগের সুখ দুঃখ মুক্তি ঘটাইয়া থাকেন। প্রকৃতি—শক্তিশালিনী এবং সর্ব্বব্যাপিনী। এ অভিনয়ে তিনি অভিনেতা এবং অভিনেত্রী যোগাইয়া থাকেন এবং বুদ্ধি প্রধান-লিঙ্গ নটরূপে সমুদয় ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য কি নর বা নারী-দেহ উভয় দেহই পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত। যে দেহধারী মুক্তি অপেক্ষা ভোগ প্রিয়তর বোধ করেন, তাঁহার দেহ নর-লক্ষণ-যুক্ত হইলেও তাঁহাতে নারী-অংশ নর-অংশ অপেক্ষা প্রবলতর। দেহধারী কেহই কেবল নর কিংবা কেবল নারী নহেন।

পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন।
প্রকৃতের্ব্বিভুত্বযোগান্নটবদ্ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্॥

পদপাঠ—পুরুষার্থ হেতুকম্ ইদম্ নিমিত্তনৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন। প্রকৃতেঃ বিভুত্ব যোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্॥

অন্বয়:—পুরুষার্থ হেতুকং ইদং লিঙ্গং নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন প্রকৃতেঃ বিভুত্ব যোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে।

পুরুষার্থ হেতুকং=পুরুষার্থ যাহার হেতু বা প্রবর্ত্তক সেই। পুরুষার্থ যাহাকে প্রবৃত্ত করায়।

ইদং=এই। লিঙ্গং=সূক্ষ্ম শরীর।

নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন=নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রস্তাবনা দ্বারা। নিমিত্ত=কারণ। নিমিত্ত+ষ্ণিক্=নৈমিত্তিক (তত্র ভব এই অর্থে ষ্ণিক)=কার্য্য। প্রসঙ্গ=প্রস্তাবনা।

প্রকৃতেঃ=প্রকৃতির।

বিভুত্বের যোগ=বিভুত্ব যোগ; তাহা হইতে বিভুত্ব যোগাৎ।

বিভু=সমর্থ, সর্ব্বব্যাপী; বিভুর ভাব=বিভুত্ব; যোগ=সাহায্য।

২

নটবৎ=রঙ্গশালার অধিকারীর ন্যায়।

ব্যবতিষ্ঠতে=(বি+অব+স্থা ধাতু) ব্যবস্থা করে।

অর্থ :—পুরুষার্থই সূক্ষ্ম শরীরের প্রবৃত্তির হেতু। প্রকৃতির বিভূত্ব সূক্ষ্ম শরীরের আয়ত্ত। প্রকৃতি অভিনেতা অভিনেত্রী যোগাইতেছেন এবং বুদ্ধি প্রধান লিঙ্গ শরীর নাট্যাচার্য্যের ন্যায় পুরুষের ভোগাপবর্গের ব্যবস্থা করিতেছেন। নাটকে যেমন প্রস্তাবনা থাকে, প্রস্তাবনা দ্বারা নাটক আরম্ভ করিতে হয়, সাংখ্য যে নাটকের কথা বলিতেছেন তাহার প্রস্তাবনা বা প্রসঙ্গ হইতেছে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ।

৪৩

সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতিকাশ্চ ধর্ম্মাদ্যাঃ।
দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ কার্য্যাশ্রয়িণশ্চ কললাদ্যাঃ॥

পদপাঠ—সাংসিদ্ধিকাঃ চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতিকাঃ চ ধর্ম্ম আদ্যাঃ।
দৃষ্টাঃ করণ আশ্রয়িণঃ কার্য্য আশ্রয়িণঃ চ কলল আদ্যাঃ॥

অন্বয় :—ধর্ম্মাদ্যাঃ ভাবাঃ সাংসিদ্ধিকাঃ, (তে) প্রাকৃতিকাঃ চ বৈকৃতিকাঃ চ। (ধর্ম্মাদ্যাঃ) করণাশ্রয়িণঃ দৃষ্টাঃ। কললাদ্যাঃ চ কার্য্যাশ্রয়িণঃ।

ধর্ম্মাদ্যাঃ ভাব=ধর্ম্ম আদি ভাব। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য, জ্ঞান অজ্ঞান এই সকল ভাব।

সাংসিদ্ধিকাঃ=স্বতঃসিদ্ধ, ঐ ভাব যে মনের আছে তাহা সহজেই অনুভব হয়, উহার জন্য প্রমাণের আবশ্যক হয় না।

সংসিদ্ধ=সম্যকরূপে সিদ্ধ+ষ্ণিক্=সাংসিদ্ধিক। ঐ ভাব সকল দুই প্রকারে অন্তঃকরণের ভাব হইয়া থাকে, যথা প্রাকৃতিক এবং বৈকৃতিক।

প্রাকৃতিকাঃ=যাহারা প্রকৃতি জাত, যাহারা জন্মের সহিত উৎপন্ন। প্রত্যক্ষ জাত সংস্কার পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানুষের পূর্ব্ব পুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষ জাত সংস্কার সে তাহা কিয়দংশে প্রাপ্ত হয়। সেই সংস্কারের বীজ শরীরের অন্তর্গত মনে থাকে; প্রয়োজন মত সময়ে ঐ সংস্কার কার্য্যে পরিণত হয়।

বৈকৃতিকাঃ=যাহা শিক্ষা ও আচরণ রূপ নিমিত্তের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহার নাম বৈকৃতিকাঃ। (বিকৃত+ষ্ণিক্) কেহ অল্প বয়সেই গান শুনিয়া গান করিতে পারে, (স্বাভাবিক) কেহ তিন ওস্তাদকে বধ করিয়া অধিক বয়সে গান গাহিতে পারে। (বৈকৃতিক)

ধর্ম্মাদ্যাঃ করণাশ্রয়িণঃ দৃষ্টাঃ—করণ বা অন্তঃকরণকে যাহা আশ্রয় করে তাহাকে করণাশ্রয়ী বলে। করণশ্রয়িণঃ বহুবচন ধর্ম্মাদ্যাঃ শব্দের বিশেষণ।

দৃষ্টাঃ=দেখা হইয়াছে।

ধর্ম্মাদিরা অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া থাকে ইহা দেখা গিয়াছে। কোথায়? ২৩ কারিকায়।

কললাদ্যাঃ কার্য্যাশ্রয়িণশ্চ। কললাদিরা কার্য্যকে বা (এ স্থলে) দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দেহ পঞ্চভূতময়। পঞ্চভূতের কারণ যে পঞ্চ তন্মাত্র তাহা অহংকার নামক করণের পরিণাম বা কার্য্য, এই জন্য কার্য্যের অর্থ দেহ। কলল, অর্ব্বুদ প্রভৃতি গর্ভে থাকা কালীন অবস্থা; বাল্য যৌবন, জরা আদি জীবিত কালীন অবস্থা শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

অর্থ:—ধর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি অন্তঃকরণের রূপ। ইহা কতক জীব জন্মের সহিত প্রাপ্ত হয়, কতক বা শিক্ষা এবং আচরণ দ্বারা উপার্জ্জন করে। ধর্ম্মাদি অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভ্রূণ, বাল্য, শৈশব, যৌবনাদি দেহের অবস্থা। ইহা দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

৪৪

ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥

পদপাঠ—ধর্ম্মেণ গমনম্ ঊর্দ্ধং গমনম্ অধস্তাৎ ভবতি অধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চ অপবর্গঃ বিপর্য্যয়াৎ ইষ্যতে বন্ধঃ॥

অন্বয়:—ধর্ম্মেণ ঊর্দ্ধং গমনং ভবতি। অধর্ম্মেণ অধস্তাৎ গমনং (ভবতি)। জ্ঞানেন চ অপবর্গঃ বিপর্য্যয়াৎ বন্ধঃ চ ইষ্যতে।

ধর্ম্মেণ = ধর্ম্মের দ্বারা ; উর্দ্ধং গমনং ভবতি = উর্দ্ধে গমন হয়। জীব উচ্চ হয়। অধর্ম্মেণ অধস্তাৎ গমনং ভবতি। অধস্তাৎ = অধদিকে, নিম্ন। অধর্ম্ম দ্বারা অধঃগমন হয়। জীব নীচ হয়। (?)

জ্ঞানেন = জ্ঞানের দ্বারা, অপবর্গঃ = দুঃখের নিবৃত্তি।

বিপর্য্যয়াৎ = জ্ঞানের বিপর্য্যয় বা বিপরীত হইতে, অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে ; বন্ধঃ = বন্ধন। ইষ্যতে = অভিলষ্যতে, ইহাই সাংখ্য শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত।

অর্থ :—ধর্ম্মে জীবের সুখ, অধর্ম্মে দুঃখ, জ্ঞানে দুঃখের অবসান, অজ্ঞানে বন্ধন ঘটিয়া থাকে। ইহাই সাংখ্য শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত। (?)

৪৫

সাংখ্য মতে বিজ্ঞানই দুঃখ হানির প্রকৃষ্ট উপায়। কেবলমাত্র বৈরাগ্যে সর্ব্ব দুঃখ দূর হয় না। বিরাগের ভাব বৈরাগ্য। বৈরাগ্য = রাগশূন্যতা। সুখ অনুভবে মনে সুখের সংস্কার থাকিয়া যায়। সেই সংস্কার বশতঃ বিষয় অভিমুখে যে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য লোভ তৃষ্ণা তাহাই হইতেছে রাগ। বৈরাগ্য বশতঃ ব্যক্তি বিশেষ বীতরাগ হইলেও সে যে ভয় ক্রোধ দ্বেষে অভিভূত হইবে না ইহা কে বলিতে পারে। শুদ্ধমাত্র বৈরাগ্যের ফল প্রকৃতিলয়। জ্ঞান হীন বৈরাগ্যে জীবের যাহা চঞ্চল এবং চেতনাশূন্য সেই প্রকৃতিতে লয় হয় বা প্রকৃতি শ্রেণীতে দাঁড়ায় অর্থাৎ সে চঞ্চল জড়বৎ হইয়া থাকে। মূর্খ বৈরাগী জড় তুল্য। (?)

সংসার = সং + সৃ ধাতু। সৃ ধাতুর অর্থ সরা, ঘোরা। আবর্ত্তন করা, বৃত্ত পথে ঘোরা। বৃত্ত পথে আবর্ত্তন। বৃত্ত পথে আবর্ত্তনের ফল যেথান হইতে অগ্রসর হইয়া যায় সেইখানে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। সুখকর ভোগ্য বিষয়ের অভাব অনুভব করিলাম, অর্থাৎ তৃষ্ণা হইল, সুখকর বিষয় দেখিয়া ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইল, লোভ হইল ; বিষয় লাভ করিলাম, আবার তৃষ্ণা আসিল, চাঞ্চল্য আসিল ইত্যাদি ইত্যাদি। যে তৃষ্ণা হইতে অগ্রসর হইয়াছিলাম সেই তৃষ্ণায় আবার উপস্থিত।

তৃষ্ণার অবধি নাই, অন্তরে চিব অতৃপ্তি। ইহাই হইল সংসার। (?) সদা চাঞ্চল্য।

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাদ্রাগাৎ।

ঐশ্বর্য্যাদবিঘাতো বিপর্য্যয়াত্তদ্বিপর্য্যাসঃ ॥

পদপাঠ—বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয় সংসার ভবতি রাজসাৎ রাগাৎ।

ঐশ্বর্য্যাৎ অবিঘাতঃ বিপর্য্যয়াৎ তৎ বিপর্য্যাসঃ ॥

অন্বয় :—বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ ভবতি ; রাজসাৎ রাগাৎ সংসার (ভবতি)। ঐশ্বর্য্যাৎ অবিঘাতঃ (ভবতি) বিপর্য্যয়াৎ তৎ বিপর্য্যাসঃ (ভবতি)।

বৈরাগ্যাৎ = বৈরাগ্যমাত্রাৎ ; কেবলমাত্র বিষয় রাগের অভাব হইতে।

প্রকৃতিলয়ঃ = প্রকৃতিতে লয়, প্রকৃতির সহিত এক হওয়া—জড়ত্ব প্রাপ্তি।

ভবতি = হয়।

রাজসাৎ রাগাৎ = রাজসিক বাগ হইতে। সংসারঃ (ভবতি) = সদা চাঞ্চল্য (হয়)। (?)

ঐশ্বর্য্যাৎ অবিঘাতঃ (ভবতি) = স্বাধীনতা, প্রভুত্ব বা শক্তি হইতে।

অবিঘাতঃ = ইচ্ছার অপ্রতিবন্ধ (হয়)।

বিপর্য্যয়াৎ = ঐশ্বর্য্যের বিপর্য্যয়, (উল্‌টা) অর্থাৎ অনৈশ্বর্য্য।

অনৈশ্বর্য্য = দুর্ব্বলতা, পরাধীনতা। পরাধীনতা হইতে।

তদ্বিপর্য্যাসঃ (ভবতি)—তস্য অবিঘাতস্য বিপর্য্যাসঃ = তদ্বিপর্য্যাসঃ। ইচ্ছার বিঘাত বা ব্যাঘাত হয়।

অর্থ :—মাত্র-বৈরাগ্যে জড়ত্ব ঘটে। বিষয়ানুরাগে সদা চাঞ্চল্য হয়। প্রভুত্বে ইচ্ছার পূর্ণতা এবং দাসত্বে ইচ্ছার ব্যাঘাত ঘটে। যে পরাধীন সে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে না।

৪৬

বুদ্ধির আট রূপ বা ভাবের কথা বলা হইয়াছে। ঐ আট ভাবকে অন্য সংজ্ঞা দিয়া ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। চারি শ্রেণীর আখ্যা বা নাম হইতেছে বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি এবং সিদ্ধি। বিপর্য্যয়

শব্দে অজ্ঞান বুঝায়। ইন্দ্রিয় বিকল হইলে বুদ্ধির অসমার্থ্য বা অশক্তি ঘটে। সিদ্ধিতে জ্ঞানের আন্তর্ভাব আছে। বিপর্য্যয়ে অজ্ঞানের আন্তর্ভাব আছে। অশক্তিতে অনৈশ্বর্য্য, অবৈরাগ্য এবং অধর্ম্মের আন্তর্ভাব আছে। তুষ্টিতে ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের আন্তর্ভাব আছে। ধর্ম্ম, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য তুষ্টি শ্রেণীর অন্তর্ভূত। তুষ্টি=ইহাই যথেষ্ঠ, কেন বৃথা শ্রম এইরূপ মনোভাব জনিত আলস্য উত্তমহীনতা ॥

এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।
গুণবৈষম্যবিমর্দ্দাত্তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ ॥

পদপাঠ :—এষ প্রত্যয় সর্গঃ বিপর্য্যয় অশক্তি তুষ্টি সিদ্ধি আখ্যঃ।
গুণ বৈষম্য বিমর্দ্দাৎ তস্য চ ভেদাঃ তু পঞ্চাশৎ ॥

অন্বয় :—বিপর্য্যয়াশক্তি তুষ্টি সিদ্ধ্যাখ্যঃ এষ প্রত্যয় সর্গঃ। গুণ বৈষম্য বিমর্দ্দাৎ তস্য চ ভেদাঃ তু পঞ্চাশৎ।

বিপর্য্যয় শক্তি তুষ্টি এবং সিদ্ধি আখ্যা বা সংজ্ঞা যাহার তাহাকে বিপর্য্যয়-শক্তি-তুষ্টি সিদ্ধ্যাখ্য-কহে।

এষ=অয়ং পূর্ব্বোক্ত। (পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাদি ৮টি বিষয়)।

প্রত্যয় সর্গঃ—যাহাদ্বারা অর্থের বোধ হয় তাহাকে প্রত্যয় বলে—বুদ্ধি। সর্গঃ=কার্য্য। বুদ্ধির কার্য্য।

এষ প্রত্যয় সর্গঃ=পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধির কার্য্য।

গুণ বৈষম্য বিমর্দ্দাৎ=গুণ সকলের বিষমতা এবং অভিভব হইতে গুণ সকলের দুইটি এবং একটির অধিকবলতা কিংবা ন্যূনবলতাকে বৈষম্য বলে। উহাতে এক গুণ অন্য গুণের দ্বারা বিমর্দ্দিত হয়—কোন কোন গুণ অভিভূত হইয়া পড়ে। তস্য চ=তাহারও, বিপর্য্যয়াদিরও। ভেদাঃ—ভেদ, পঞ্চাশৎ (ভবন্তি)=৫০ প্রকার ভেদ হয়।

অর্থ :—পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাদি বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধির কার্য্যের অন্য সংজ্ঞাও আছে, যথা বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি, সিদ্ধি। গুণ বিষমতায় এবং অভিভবে উহাদের মধ্যে পঞ্চাশ প্রকার ভেদ আছে। *

(ক্রমশঃ) —ওমর।

---

* (?) চিহ্নিত স্থানগুলি সাংখ্য-দর্শনের আলোচনায় আমরা পরীক্ষা করিব।

সাংখ্যাচার্য্যগণ সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করের মতামত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে ॥ অ ১, পা ৪, সূ ৯ ॥

সূত্রার্থ—জ্যোতিরূপক্রমা তু জ্যোতিরাদ্যা এব অজা প্রতিপত্তব্যা। হি যতঃ, একে শাখিনঃ, তথা অধীয়তে আমনন্তি।"—পরমেশ্বরোৎপন্ন তেজঃ প্রভৃতি (তেজঃ, জল ও পৃথিবী) যাহা স্থূল সৃষ্টির উপাদান তাহাই অজা মন্ত্রের অজা। কারণ এই যে সামবেদের এক শাখা (ছান্দোগ্য) তেজঃ, অপ্ ও অন্নের উৎপত্তি বলিয়া সেই উৎপন্ন তেজঃ প্রভৃতিকে যথাক্রমে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"

সিদ্ধান্ত পক্ষ—শ্রীভগবান হইতে উৎপন্ন তেজ অপ্ অন্ন প্রভৃতি ভূত-সূক্ষ্ম, যাহা চতুঃপ্রকার জীব দেহের উপাদান, শ্রুতি তাহাকেই অজা বলিয়াছেন। কারণ সামবেদের এক শাখায় ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্ম হইতে তেজঃ, অপ, অন্ন এবং যথাক্রমে সে গুলিকে লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ রূপ উপদেশ করা হইয়াছে। "যদগ্নেরোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" (ছা, ৬, ৪)। "অগ্নির যে রক্তরূপ তাহা তেজের, অগ্নির যে শুক্লরূপ তাহা জলের, অগ্নির যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের বা ক্ষিতির।" এই গুলিই অজা মন্ত্র লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ নামে বর্ণিত। বর্ণত্রয়ের সমানতাই প্রত্যভিজ্ঞা (একতা) জ্ঞানের কারণ। অজা মন্ত্রে লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণ যুক্ত অজা, ছান্দোগ্যেও লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণ বিশিষ্ট ভূত সূক্ষ্ম। তেজঃ প্রভৃতি শব্দ রূপাদিতে রূঢ় (অর্থাৎ অগ্নির লোহিত্য, জলের শ্বেতত্ব এবং ক্ষিতির কৃষ্ণত্ব), সেই রূপাদি অর্থই উহাদের মুখ্য অর্থ। গুণ ধরিলে গৌণ অর্থ হয়। মুখ্য অর্থেই যদি সন্দেহ মিটিয়া যায় তাহা হইলে গৌণার্থের প্রয়োজন কি?

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন, "ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—কিং কারণং ব্রহ্ম"

(শ্বে, ১, ১) "ব্রহ্মবাদীরা বলেন, ব্রহ্ম কোন কারণ-শক্তি বিশিষ্ট।" তাহার পর বলিয়াছেন, "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢাম" (শ্বে, ১, ৩) "তাঁহারা ধ্যানযোগে দেখিয়াছেন, জানিয়াছেন, আত্মদেবের শক্তি-গুণের দ্বারা আবৃত।" শ্রুতি ইঁহাকেই জগদ্ধাত্রী পারমেশ্বরী শক্তি বলিয়া বাক্যের উপক্রম করিতেছেন এবং "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান মায়িনং তু মহেশ্বরম" (শ্বে, ৪, ১০) "মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে," "যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকঃ" (শ্বে, ৪, ১১) "যিনি প্রত্যেক যোনিতে প্রত্যেক প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত" এই রূপ বাক্য-শেষ করিতেছেন। ইহা দেখিয়াও অজার স্থলে কি ? সাংখ্যের প্রধানকে বসাইতে পারি। পূর্ব্বাপর অবস্থা দেখিয়া স্থির হয় অব্যাকৃত নামরূপিণী বীজশক্তি—যাহা ব্যক্ত জগতের পূর্ব্বাবস্থা, যাহা আত্মদেবতার সৃষ্টি-শক্তি—তাহাই অজামন্ত্রের অজা এবং তাহারই স্থূল বিকার ও অবয়ব অনুযায়ী ত্রিরূপ—তেজঃ, অপ্ এবং অন্ন।

পূর্ব্ব-পক্ষ—তেজঃ, অপ্ ও অন্ন এ তিনটি উৎপন্ন পদার্থ সুতরাং উহারা অজা হইতে পারে না। যাহা জন্মে তাহা অজা নহে 'জ'। 'জ'কে অজা বলিবে কি করিয়া ?

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥ অ ১, পা ৪, সূ ১০ ॥

সূত্রার্থ—কল্পনয়া তেজোঽবন্নানামজাত্বকথনাৎ মধ্বাদিশব্দ ইব বিরোধাভাবোজ্ঞেয়ঃ। যথা অমধুন আদিত্যস্য কল্পনয়া মধুত্বং তথা জাতায়া অপি ভূতপ্রকৃতেঃ কল্পনয়াঽজাত্বমিতি। "জন্মবান্ বস্তুকে কল্পনাক্রমে অজ বলা বিরুদ্ধ নহে। সূর্য্যদেব মধু নহে, তথাপি তাহাকে মধু বলিয়া কল্পনা করা হয়। তেমনি, জায়মান ভূত সূক্ষ্মকেও অজ বলিয়া কল্পনা করা হয়।"

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—অজা শব্দ যোগ-ব্যুৎপত্তি অনুসারে, জন্মহীন অর্থে, ব্যবহৃত হয় নাই—ঐ শব্দ ছাগী অর্থে রূঢ়। শ্রুতি সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি হেতু তেজঃ, অপ্, অন্নের সমবায়কেই ছাগী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। যেরূপ লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণা ছাগী তাহার অনুরূপ বহু

শিশু প্রসব করে, কোন ছাগ যেমন তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া তদীয় সুখ দুঃখে নিজেকে সুখ দুঃখ ভাগী মনে করে, তথা অন্য ছাগ তাহাকে ভোগ করিয়া বিরক্ত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করে, সেইরূপ তেজঃ-অপ্-অন্ন-লক্ষণা ত্রিবর্ণা ভূত-প্রকৃতিরূপা অজাও নিজানুরূপ বহু সন্তান প্রসবিনী, এবং অজ্ঞান জীব তাহাকে ভোগ করিতেছে এবং জ্ঞানী তাহাকে ত্যাগ করিতেছে।

অনুমান

পূর্ব্ব-পক্ষ—এক জীব ভোগ করিতেছে, অন্য জীব ত্যাগ করিতেছে এই বাক্যে ত আমাদেরই বহু জীবাত্মবাদ সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—জীবের ভেদ সমর্থন করা এই মন্ত্রের বিবক্ষিত (অভিপ্রেত) নহে। জীবের বন্ধ মোক্ষ নির্ণয় করাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। তথাপি বলিয়া রাখিতেছি, জীব এক কিন্তু জীবত্বজনক অজ্ঞান কল্পনা নানা। অজ্ঞান হেতু নানা জীব প্রতীয়মান হইতেছে বলিয়া যে জীবও বহু তাহা নহে। ব্যাষ্টি জীব অজ্ঞান নাশে মুক্ত হয় ও একত্ব অনুভব করে এবং অন্য অজ্ঞান-জীব সংসারী হইয়া ভোগ করে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—এই অজ্ঞান-জনিত ভেদ ইহা বাস্তব না কাল্পনিক?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—জীব এক, কল্পনায় নানা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যতক্ষণ অজ্ঞানের বশবর্ত্তী ততক্ষণ জীব নানা ইহা প্রত্যেক সংসারীকেই স্বীকার করিতে হইতেছে। শ্রুতি সর্ব্বজন-বিদিত জীব-ভেদ অনুবাদ (ব্যাখ্যা) করিয়া তাহাদের বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা করিতেছেন। জীবের ভেদ ভাব তাত্ত্বিক নহে উহা মাত্র ঔপাধিক। একই বস্তু বিভিন্ন উপাধি উপহিত (যুক্ত) হইয়া নানারূপ প্রতীয়মান হইতেছে। শ্রুতিও আমাদের উক্ত অনুমান সমর্থন করিতেছেন, "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (শ্বে, ৬, ১১), "একই দেব (আত্মা) সমুদয় ভূতে গূঢ় (দুর্ব্বোধ্য) রূপে অবস্থিত এবং সেই একই দেব সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।" সূর্য্য মধু না হইলেও যেরূপ মধুরূপে কল্পিত (ছা, ৩, ১) বাক্য ধেনু না হইলেও যেরূপ ধেনু রূপে কল্পিত

(বৃ, ৫, ৮), স্বর্গ অগ্নি না হইলেও যেরূপ অগ্নিরূপে কল্পিত (বৃ, ৮, ২, ৯) সেইরূপ তেজঃ-অপ-অন্নরূপিণী ভূত-প্রকৃতি বাস্তবিক অজা (ছাগী) না হইলেও অজার ন্যায় কল্পিত হইয়াছে।

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ অ ১, পা ৪, সূ ১১ ॥

সূত্রার্থ—পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে সংখ্যোপসংগ্রহাৎ সংখ্যয়া তত্ত্বানাং সঙ্কলনাৎ প্রধানাদীনাং বৈদিকত্বমিতি ন প্রতিপত্তব্যম্। কুতঃ? নানা ভাবাৎ অতিরেকাচ্চ। নানাভাবঃ নানাত্বম। অতিরেক আধিক্যম্। তেন সাংখ্যতত্ত্বসংকলনমসিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ।—"পাঁচ পাঁচজন এই মন্ত্রে সংখ্যা শব্দের প্রয়োগ থাকায় পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, এতদ্রূপে সাংখ্যের পঁচিশতত্ত্ব কথিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই যে, সাংখ্যের তত্ত্ব বহু, সুতরাং পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এরূপ অন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধ হইলেও আকাশ একটি অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ২৫ সংখ্যা অতিক্রান্ত হইয়া ২৬ সংখ্যা লব্ধ হয়। ২৬ তত্ত্ব সাংখ্যের অনভিমত। কাজেই স্বীকার করিতে হয়, উক্ত মন্ত্রে সাংখ্যাভিমত তত্ত্ব কথিত হয় নাই।"

ভাষ্য-তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু "যস্মিন পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥" (বৃ, আ, ৪।৪।১৭), "যাঁহাতে পাঁচ পাঁচ জন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত—সেই অমৃত ব্রহ্মাত্মাকে জানিয়া অমৃত (মুক্ত) হও," এই মন্ত্রে পাঁচের পর পাঁচ আছে; উহাদের গুণিত করিলে পঁচিশ সংখ্যা পাওয়া যায়। ইহাকে সাংখ্যের ২৫ তত্ত্বের সংখ্যা ধরা যাইতে পারে। "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ" (সাং, কা, ৩ সূ), "অবিকৃত মূল প্রকৃতি ১, প্রকৃতি-বিকৃতি ভাবাপন্ন মহৎ প্রভৃতি, কেবল বিকৃতি ১৬, প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে, এরূপ পুরুষ বা আত্মা ১।" অতএব আমরা বলিতে পারি সাংখ্য স্মৃতি শ্রুতি-মূলক।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—দুইবার পঞ্চ শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব বলা হইয়াছে এরূপ বলিতে পার না। কারণ তোমাদের ২৫

তত্ত্ব নানা ধর্ম্ম বিশিষ্ট এবং সকলের মধ্যে এমন কোনও পঞ্চক নাই যাহা পরস্পরের ব্যাবর্ত্তক (সাধাবণ) ধর্ম্মবিশিষ্ট, যে ধর্ম্মের দ্বাবা ২৫শের মধ্যে "পাঁচ পাঁচ" এইরূপ সংখ্যা সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। ১ সংখ্যা হইতেই ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যার সঙ্কলন হয়।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু অবয়ব গণনা করিলে বহুর মধ্যেও অল্প সংখ্যা গ্রহণ করিতে পারা যায়। যেমন "পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি ন ববর্ষ শতক্রতুঃ" "ইন্দ্র পাঁচ সাত বর্ষ বর্ষণ করেন নাই" এই বাক্য দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি কথিত হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ইহাতে দোষ হয়, মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণা গ্রহণ করিতে হয়। তাহাব পব পরবর্ত্তী পঞ্চশব্দ জনশব্দেব সহিত সম্বন্ধ। পঞ্চপঞ্চ এরূপ পদ নহে, পঞ্চশব্দ ও পঞ্চ-জন শব্দ একপদ, একস্বর ও একবিভক্তিও নহে। পঞ্চশব্দেব সহিত জনশব্দের সমাস হওয়ায় পঞ্চপঞ্চ এরূপ বীপ্সা 'ব্যাপ্তি' প্রয়োগ অসিদ্ধ। বীপ্সা-প্রয়োগ ছাড়া পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্ব-পক্ষ—এক পঞ্চ সংখ্যাব বিশেষণ অপর পঞ্চ সংখ্যা হউক।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—উপসর্জনেব সহিত অর্থাৎ অপ্রধানেব সহিত অপ্রধানের সম্বন্ধ হয় না। বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের সম্বন্ধ হয়। কেবল বিশেষণের সহিত বিশেষণেব সম্বন্ধ হয় না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু, পঞ্চ সংখ্যান্বিত (পাঁচ) ব্যক্তি পুনর্ব্বার পঞ্চ সংখ্যাব দ্বারা বিশেষিত হইলে পঁচিশ সংখ্যায় প্রতীতি হইতে পারে, যেমন পঞ্চ পঞ্চ পূল বলিলে—পঁচিশ পূল (সমষ্টিকৃত তৃণ, আঁটি ইতি ভাষা) বুঝায় এরূপ ত বলিতে পারি।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ঐ স্থলে ২৫ অর্থ ঠিক হইয়াছে। কারণ পঞ্চ পূল শব্দ সমাহার (সংগ্রহ) অভিপ্রায়ে গৃহীত। উহাতে সংখ্যা ভেদেব আকাঙ্ক্ষা থাকাতেই (কত সংখ্যা জানিবার ইচ্ছা থাকাতেই) পঞ্চ শব্দের বিশেষণতা সম্পন্ন হয়। কিন্তু পঞ্চজন বলিলেই সংখ্যা জানিবার আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গেল; তখন আবার কত? এ ভেদাকাঙ্ক্ষা হয় না। ভেদক ধর্ম্ম না থাকিলে তাহা বিশেষণ হয় না, যাহা একটিকে অপরটি হইতে

ভেদ করে তাহাই বিশেষণ। পুনরায় যদি পঞ্চশব্দ বিশেষণ হয় তাহা পূর্ব্ব পঞ্চকে কিরূপে ভেদ করিতেছে ?

তাহার পর আর একটি বিশেষ কারণ আছে যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উহা সাংখ্যের ২৫ তত্ত্ব নহে। মনে কর যদি উহা ৫ × ৫ = ২৫ ধরা যায় তাহা হইলেও শ্রুতি বলিতেছে যস্মিন্—যাহাতে এই ২৫ তত্ত্ব ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া মান। ইহাতে পাইতেছি যস্মিন (আত্মা) ১, তত্ত্ব ২৫ (৫ × ৫) এবং আকাশ ১ = ২৭। যস্মিন্ আধারে ৭মী। এই আধারকে শ্রুতি আত্মা বলিতেছেন। আত্মা, চেতন, বা পুরুষ, সাংখ্যের পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত। এক্ষণে পুরুষ যদি ২৫ এর অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে তিনি আধার ও আধেয় উভয়ই হইয়া পড়েন অতএব ইহা অসিদ্ধ। আবার আত্মাকে পৃথক তত্ত্ব তোমরা বলিতে পার না তাহা হইলে তোমাদের ২৫ তত্ত্ব, ২৬ হইয়া পড়িবে।

পুনরায় তোমাদের আকাশও ২৫ তত্ত্বের অধীন। উহাকেও পৃথক তত্ত্ব বলিলে পুনরায় আধিক্য ও সিদ্ধান্ত হানি দোষ ঘটিবে। আর জন-শব্দ তত্ত্ববাচী নহে, সুতরাং কেবল সংখ্যা শব্দের প্রয়োগের দ্বারা উহা সাংখ্যের তত্ত্ব তাহাই বা কি প্রকারে বুঝিলে ?

পূর্ব্বপক্ষ—জন-শব্দের অর্থ যদি তত্ত্ব না ধর তাহা হইলে তোমরাই বা কি প্রকারে অর্থ করিবে ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তত্ত্ব অর্থের গ্রহণ না করিলেও অন্যার্থের দ্বারা সংখ্যা শব্দের প্রয়োগ সাধুতা সিদ্ধ হইতে পারে। সংজ্ঞা (নাম), দিক বোধক (যাহা দেশে অবস্থিত) ও সংখ্যাবোধক শব্দের সমাস বিধান থাকায় পঞ্চশব্দের সহিত জনশব্দের সমাস হইয়াছে (দিক্ সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্, পাণিনি সূত্র ২।১।৫০) এক্ষণে আমাদের কেহ কেহ বলেন জনশব্দ রূঢ় অর্থে প্রযুক্ত।

পূর্ব্বপক্ষ—তাহা হইলে পঞ্চজন পদার্থ কি ? কোন অর্থে রূঢ় ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—যেমন সাত-সপ্তর্ষি সেইরূপ পঞ্চজন নামে বিখ্যাত এরূপ পদার্থ আছে, তাহাদের সংখ্যা পাঁচ। তাহা সূত্রকার বলিয়া-দিতেছেন—

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ অ ১, পা ৪, সূ ১২ ॥

সূত্রার্থ—বাক্যশেষাৎ পঞ্চজন শব্দেন প্রাণাদয় এব বিবক্ষ্যন্তে।—"পঞ্চজন মন্ত্রের পর-মন্ত্রে যে প্রাণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সন্নিধান প্রযুক্ত সেই প্রাণ প্রভৃতিই পঞ্চজন শব্দের বোধ্য। অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চককেই পঞ্চজন শব্দে বলা হইয়াছে।"

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—"যাহাতে পাঁচ পাঁচজন প্রতিষ্ঠিত" এই মন্ত্রের পরেই ব্রহ্ম নিরূপন উপলক্ষে প্রাণাদি পঞ্চকের উপদেশ। উপনিষদে মুখ্য প্রাণ ও একাদশ ইন্দ্রিয়কে প্রাণ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ" (বৃ, আ, ৪, ৪, ১৮), "যে উপাসক প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মনকে জানে"। বাক্য শেষবশে, (অতি নিকটে বলিয়া), প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র অন্ন ও মন এই পাঁচ জনকেই "পঞ্চজন" বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষ—প্রাণকে জন-শব্দ-বাচী করিতেছ কেন?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—জন-সম্বন্ধ আছে. এই হেতু জন শব্দ প্রয়োগের যোগ্য। জন-বাচী পুরুষ শব্দও প্রাণে প্রয়োগ দেখা যায়, "তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ" (ছা, ৩, ১৩, ৬), "প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা" (ছা, ৭, ১৫, ১), "এই পাঁচ ব্রহ্ম পুরুষ—এ বিষয়ে প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই স্বসা"—এই ব্রাহ্মণ (বেদের অংশ) বাক্যই প্রমাণ। আর তাহাছাড়া সমাসের প্রভাবেও সমুদয় শব্দের রূঢ় অর্থ গ্রহণ করিলে কোনও বিরোধ হয় না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—প্রথম প্রয়োগ ব্যতীত কিরূপে রূঢ়ি স্বীকৃত হইতে পারে?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—উদ্ভিদ প্রভৃতির ন্যায়। প্রসিদ্ধ পদার্থের নিকট অপ্রসিদ্ধ (অজানা) শব্দের প্রয়োগ থাকিলে সমভিব্যাহার (এক সঙ্গে উচ্চারণ) বলে সেই বিষয়েই সে শব্দের অর্থ সংগ্রহ হয়। যথা 'উদ্ভিদা যজতে,' 'যূপং ছিনত্তি,' 'বেদিং করোতি'। এই সকল স্থলে সমভিব্যাহার বলে বেদী প্রভৃতি শব্দের অর্থ ঠিক হয়। তথা পঞ্চজন শব্দও বাক্য শেষ বলে প্রাণাদিতে গৃহীত হয়। প্রথম সমাসানুকথন দ্বারা বুঝা

যায়, উহা একটি সংজ্ঞা, পশ্চাৎ সংজ্ঞী আকাজ্ক্ষা হওয়ায় সন্নিধিপ্রাপ্ত প্রাণাদিতে গিয়া তাহা শেষ হয়। ইহা ছাড়া মতান্তর আছে কেহ বলেন, দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অসুর এবং যক্ষ ইহারাই পঞ্চজন। কেহ বলেন, ব্রাহ্মণাদি ৪ বর্ণ ও নিষাদ ইহারাই পঞ্চজন। আবার কেহ বলেন, প্রজা অর্থে পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু ব্যাস বলেন, পঞ্চবিংশ তত্ত্বাদি নহে, বাক্যশেষ বলে স্থির হয় প্রাণাদি পঞ্চক।

পূর্ব্ব-পক্ষ-- মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ীদের পাঠে এরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে কিন্তু কান্ব শাখীদের পাঠে অন্ন শব্দটি নাই। এ স্থলে কি হইবে?

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ অ ১, পা ৪, সূ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—একেষাং কান্বশাখিনাং অন্নে অসতি অন্নশব্দে অবিদ্যমানেঽপি জ্যোতিষা জ্যোতিঃ-শব্দেন পঞ্চসংখ্যা পূর্য্যতে ইতি শেষঃ।—"যদিও কান্ব-শাখায় অন্নশব্দের পাঠ নাই, না থাকিলেও তাহাদের পাঠে যে জ্যোতিঃ-শব্দ আছে সেই জ্যোতিঃ শব্দেব দ্বাবা তাহাদের পঞ্চ সংখ্যাব পূরণ হয়।" (তত্ত্ব)

ভাষ্য তাৎপর্য্য। সিদ্ধান্ত-পক্ষ—অন্ন শব্দের পাঠ না থাকিলেও কান্ব শাখীরা ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণার্থ, জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা তাঁহারা "পাঁচ, পাঁচজনেব" অর্থ কবেন।

পূর্ব্ব-পক্ষ—সমানরূপে উভয় শাখায় জ্যোতিঃ-শব্দ পাঠ আছে অথচ এক শাখায় পঞ্চ সংখ্যা পূবণের নিমিত্ত গৃহীত হয়, অন্য শাখায় নহে, ইহার কাবণ কি?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—মন্ত্র সমান হইলেও অপেক্ষার (প্রয়োজনের) ভেদ থাকায় এক শাখায় জ্যোতিঃ-শব্দের গ্রহণ এবং অন্য শাখায় তাহাব অগ্রহণ হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমবা অতিরাত্র যাগের উল্লেখ করিতে পাবি। কোন শাখায় বলিতেছেন, অতিরাত্র যাগে ষোডশি-পাত্রের গ্রহণ আবার কোন শাখায় বলিতেছে অগ্রহণ। এই হেতু অতি প্রাচীন কাল হইতে ঐ সম্বন্ধে গ্রহণ ও অগ্রহণ উভয়ই হইয়া থাকে।

এরূপে অসংখ্য প্রমাণেব দ্বারা দেখান যাইতে পারে। সাংখ্য প্রতিপাদিত কোনও পদার্থ বেদে নাই এবং সাংখ্যাচার্য্যগণ বেদের অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ) —বাসুদেবানন্দ।

স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন

স্থান—রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী।

সময়—১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ, ৪ঠা জুলাই, রবিবার অপরাহ্ন—বেলা ৫টা।

এক ঘর লোক মহারাজের বাক্যালাপ শ্রবণ-পিপাসু হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একজন ভদ্রলোক আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। ভদ্রলোকটি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু। আলাপ পরিচয়াদির পর তিনি তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন। মহারাজ তাঁহার মুখে তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদি বিদ্যমান জানিতে পারিয়া বলিলেন,—

সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে এলেন? নিজে ভোগ টোগ করে সরে পড়লেন? ওদের একটা ব্যবস্থা না করে সরে পড়া যে cruel and cowardly (নিষ্ঠুরতা ও কাপুরুষতা) তা বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না। দস্ করে ত্যাগ কল্লেই হল?

ভদ্রলোক—এ ত ব্যবহারিক, এ ত অজ্ঞানের কাজ।

মহারাজ—আর পালিয়ে আসাটা বুঝি পারমার্থিক হল—এটা বুঝি জ্ঞানের কাজ হল? সংসারে থাকিলে কি ধর্ম্ম হয় না? একবার নারদ ভগবানের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আপনার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে?" ভগবান্ তাঁকে বলে দিলেন "অমুক গ্রামে একজন চাষা আছে সেই আমার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যাও দেখে এসো গে।" নারদ সেখানে এসে উপস্থিত। এসে দেখেন চাষা তখন মাঠে চলে গেছে, সারাদিন বাদে চাষা বাড়ী এসে একবার ভগবানের নাম নিয়ে রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়ল। এই দেখে নারদ ভগবানের কাছে এসে বল্লেন, "এ কেমন প্রভু? এ লোকটি সারাদিন বাজে সংসার কর্ম্মে থেকে একটিবার তোমার নাম নিয়ে কি করে শ্রেষ্ঠ ভক্ত হলেন?" ভগবান বল্লেন, "আচ্ছা নারদ, তোমার প্রশ্নের উত্তর পরে পাবে। এখন এই তৈল পূর্ণ বাটীটা নিয়ে পৃথিবীটা ঘুরে

এস দেখি।" নারদ অতি সন্তর্পণে ভূ-প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসলে ভগবান্ বল্লেন, কেমন নারদ, এখন বুঝলে ত ঐ চাষা কেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত? তুমি বাটীর তেল না পড়ে যায় এই চিন্তায় একবারও আমায় স্মরণ করনি, কিন্তু ঐ চাষা এত কর্ম্মে নিযুক্ত থেকেও দিনান্তে প্রতিদিন আমায় স্মরণ করে থাকে।"

ঠাকুর বলতেন—একবার দক্ষিণেশ্বরে এক মুখুয্যে ঘরবাড়ী ছেড়ে সদাব্রতে খেয়ে কালীবাড়ীতেই পড়ে থাকৃত। একদিন ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি বিয়ে করেছ—ছেলে পুলে আছে?" সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে ঠাকুর বল্লেন "তাদের কে দেখ্ছে?" মুখুয্যের মুখে যেই শুনলেন যে তার পরিবার শ্বশুড় বাড়ী পড়ে আছে, অমনি বলে উঠলেন, "তবে রে বেটা বিয়ে করবার বেলায় তুই, ছেলেপুলের বেলায় তুই, আর ভাত কাপড়ের বেলায় শ্বশুর? আর এখানে থেকে গরীবের জন্য যে অন্ন দেওয়া হয় তাই ধ্বংস করছিস্!" এ সব কথা শুনেই মুখুয্যে বাড়ী গিয়ে মন দিয়ে ঘর-সংসার করতে লাগল।

শাস্ত্রেও চতুরাশ্রমের কথা আছে। আগে গুরু গৃহে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করে বিদ্যাভ্যাস করতে হত। তখন গুরু শুশ্রূষা, অটুট ব্রহ্মচর্য্য, অধ্যয়ন ইত্যাদি কর্ত্তব্য সে গ্রহণ করত। কর্ত্তব্য শেষ হলেই ছুটি। গুরু গৃহে পাঠ শেষ হবার পরে তারা আত্ম-পরীক্ষা করে দেখত সংসারে ফিরে আস্বে কি না। যাদের মনে সংসার ভাব বেশী আছে বলে মনে করত তারা সমাবর্ত্তন স্নান করে সংসারে প্রবেশ করত। এখানেও দারপরিগ্রহ, পুত্রোৎপাদন, অতিথি সেবা, পরিবার পালনাদি কতকগুলি কর্ত্তব্য তার আছে। এগুলা করে শেষ করতে পারলেই ছুটি। এক জিনিষ কি চিরকাল ভাল লাগে? ভোগবাসনা যখন কমে গেল আর এ দিকেও আবার গৃহস্থের কর্ত্তব্য শেষ হল, তখন বানপ্রস্থ আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করতো। স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতো। তবে কি না তাদের ভাই বোনের মত থাকতে হত, কামভাবে নয়।

উপনিষদেও রয়েছে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী-সংবাদ। যাজ্ঞবল্ক্যের বিদ্বৎ-সন্ন্যাস হয়েছিল। তিনি দুই স্ত্রীকে বল্লেন, "আমার এখন প্রব্রজ্যার সময় এল, কাজেই আমার যা আছে তোমরা দুজনে বেঁটে নাও।" তখন মৈত্রেয়ী বল্লেন—"যা নিয়ে আমি অমৃত হব না তা দিয়ে আমি কি করবো? এ ঘটী বাটী ত আমাকে অমৃতত্ব দেবে না। এ কথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য বল্লেন, "মৈত্রেয়ী, আমি আগেও তোমাকে ভালবাসতাম, কিন্তু এখন তোমাকে আরও ভালবাসছি।" এই বলে তাকে উপদেশ করলেন। উনিও সন্ন্যাস নিলেন।

কিন্তু সংসার ভাল লাগছে না অথচ স্ত্রীপুত্র করে বসেছি, তখন কি ছাড়া চলে? ওদের কি হবে? এ তো ভারী স্বার্থপরতা। সংসারে থেকে তাদের পালন করা, নিজের কর্ত্তব্য পালন করা—এও যে ধর্ম্ম। ঝট্ করে ছেড়ে দিলে কিছু হবে না। ধপ্ করে ছাতে ওঠা যায় না, ধাপে ধাপে যেতে হয়। ঠাকুর বলতেন, "ফল কাঁচা অবস্থায় পড়লে পচে নষ্ট হয়ে যায়। কাচা ঘায়ের মামড়ি তুললে রক্ত পড়ে, শুকিয়ে গেলে আপনিই খসে যায়।" কি চমৎকার কথা, দেখ একবার। মন ছাড়া ত কিছুই নয়। বিবাহ করে ফেলেছে, তারপর আপশোষ করছে, সন্ন্যাস নিবার ইচ্ছা ঠাকুরকে জানাচ্ছে। ঠাকুর বলতেন, 'সবুর' ছাড়িসনে, আন্তরিকতা থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে। যেমন নিয়ম বাঁধা আছে, সেই মত ঠিক ঠিক চলে গেলেই হল।" বেশ মজা। ছেড়ে ছুড়ে দিলে চলবে কেন? ছেলে পুলে করেছ তুমি—কর্ত্তব্য করে যাও, নিঃস্বার্থ ভাবে কর। ভগবানকে ডাকব বলে সংসার ছাড়ছি, এ যে বিলকুল মিথ্যা কথা।

প্রথমে বর্ণাশ্রমবর্ণিত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে যখন চিত্ত শুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সদ্গুরুর নিকট যাবে। কর্ত্তব্যটা না করে ছুটি নেই। একটা ঠিক করলেই অপরটা চলে আসে। তবে বালককাল থেকে যারা সংসারে মোটেই প্রবেশ করল না, তাদের কথা পৃথক্।

অনেকানি সহস্রানি কুমার ব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রানাম কৃত্বা কুলসন্ততিম্॥ (মনু, ৫, ১৫৯)

তোমরা যে সংসারে গেলে না, পূর্ব্ব সংস্কার। আগে আগে যে সব করা রয়েছে। কেন যাবে? সব বুঝেছ, তাই ছেড়েছ। তোমরা যে অধিকার নিয়েই এসেছ। দেখ্ ছনা,—পৃথিবীটা পাগল হয়ে রয়েছে। টাকা ধার করেও বিয়ে করবে। ঋণ শোধ কর্ত্তে না কর্ত্তে হয়ত মরেই গেল। কেউ গৃহত্যাগের কথা বল্লে ঠাকুর বল্তেন, "তোর যদি আন্তরিক হয়—সব সুবিধা হয়ে যাবে।" তবু ঠাকুর বল্ছেন না, "ছেড়ে আয়।" 'তোর যদি আন্তরিক হয়'—টের পেতেন কিনা, তাই এ রকম বল্তেন। জোর করে করতে গেলে ভারী দোষ হয়। তিনি অন্তর্যামী, সকলের মধ্যে আছেন। তিনি নষ্ট মেয়ে মানুষের গল্প বলতেন। তারা সংসারের সকল কাজই করছে, কিন্তু মনটা ফেলে রেখেছে উপপতির উপর। এ রকম করে যখন উপপতিতে সব মনটা চলে গেল, তখন সে সংসার ছেড়ে ছুড়ে তার সঙ্গে চল্ল। দেখ্ ছনা কি চমৎকার গল্প। এক হাতে কাজ কর, অপর হাতে ভগবানের সেবা কর। সময় আসলে দুহাতেই তাঁর সেবা করতে পারবে। যদি আন্তরিক হয়, সময় এসেই যায়।

অনাদিকালোঽয়মহংস্বভাবো
জীবঃ সমস্ত ব্যবহারবোঢা।
করোতি কর্ম্মাণ্যপি পূর্ব্ববাসনঃ
পুণ্যান্যপুণ্যানি চ তৎ ফলানি॥

বিবেকচূড়ামণি।

মন-মুখ এক হওয়া চাই। মুখ এক কথা বলে, মন অন্য রকম বলে—তা হলে হবে না। মনও যা বল্বে, মুখও তাই বল্বে, মুখ যা বল্বে মন তাই করবে। একবার যা বলেছে তা করা চাই-ই। তার কাছে সব সুবিধা হয়ে যায়। তুমি যে কাল Pre-destination এর (অদৃষ্টবাদের) কথা বলেছিলে ও কিছু কাজের কথা নয়। তা হলে ত কোন কাজই চলে না। পাপ পুণ্যও থাকে না। আছে এক, পরম ভক্তের Resignation এর (নির্ভরের) কথা। যন্ত্রচালিত হয়ে সে কাজ করছে। তার ইচ্ছা ও ভগবদিচ্ছায় তো তফাৎ নেই। কিন্তু তারও Test 'পরখ্'

আছে তার দ্বারা কোন খারাপ কাজ হতে পারে না। তার পা বেতালে পড়ে না।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ (গীতা—৬।৫)
জ্ঞান-বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ (গীতা—৬।৮)

ঠাকুর অন্য আশীর্ব্বাদ কত্তেন না, বল্‌তেন, "মা, এদের চৈতন্য হোক, হুঁস্‌ হোক।" রাখাল মহারাজ তখন ঠাকুরের কাছে থাকতেন। তাঁর সম্বন্ধীরা তাঁকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু যখন তারা দেখ্‌ল উনি সংসার ছেড়ে দেবার মত হয়েছেন, তখন আর তাদের ভাল লাগল না। প্রথম ঠাকুরকে বললে ঠাকুর তাতে বড় একটা কান দিলেন না। সুরেশ মিত্তির তখন ঠাকুরের এখানে কিছু টাকা পয়সা খরচ করত। একদিন মনমোহন যাই বলেছে, "রাখাল যে এখানে থাকে সুরেশবাবু তা ভালবাসে না।" অমনি বলে উঠ্‌লেন "কি, সুরেশ কে? সুরেশ এখানে কি? ওরে, দেত ওসব (তাকিয়া প্রভৃতি) ফেলে দে, বার করে দে। (ঠাকুর যখন চটে উঠতেন তখন সকলের থরহরি কম্প হয়ে যেত। কেউ এগুতে পারত না) আমি বলি, মা, এসব ছেলের লক্ষণ ভাল তাই কাছে রাখি। এদের হুঁস্‌ হোক, এদের একটু চৈতন্য হোক। আমি বলি হুঁস হয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাক্‌।" সুরেশ শেষে হাতে পায়ে ধরে কেঁদে বল্‌ল যে সে ওকথা বলেনি, ওরা মিথ্যা বলেছে।

এখন না জেনে ডুবে যাচ্ছ—জেনে সংসার কর বন্ধ হবে না। সংসারটা কি খারাপ? না জেনেই ত গোল। পালাচ্ছ কোথায়? তা হলে ত 'ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হয়ে যাবে। কিছুই হবে না। যোগবাশিষ্ঠে আছে, বিশ্বামিত্র যখন দশরথের কাছে রামকে চাইলেন তখন দশরথ বল্‌লেন যে, রামের শরীর দিন দিন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় তার বৈরাগ্য উপস্থিত। এ অবস্থায় তাকে কি করে আপনার সঙ্গে রাক্ষস বধে পাঠাই? রাজার আদেশে রাম সভায় এসে সকলকে প্রণাম করে বস্‌লে বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "হে রাম, তোমার যদি বৈরাগ্য

উপস্থিত হয়ে থাকে সে ত অতি সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু বল দেখি, তুমি দিন দিন শীর্ণ ও মলিন হয়ে যাচ্ছ কেন? ওতে ত মলিন হবার কথা নয়।" রামের মনোগত ভাব জেনে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বলিলেন, "দেখ, তোমার আমার যুদ্ধের পর ব্রহ্মা আমাদের যে উপদেশ দেন তা রামকে উপদেশ কর। জ্ঞানলাভ করে সংসার ধর্ম্ম পালন করুক্।"

ঠাকুর বল্‌তেন, "সোনা হয়ে আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাক্। তা হলে সোনাই থেকে যাবি।"

সুখ হলোনা তাই বলে সংসার ছাড়া ঠিক নয়। জেগে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

আসলে মানুষের জ্ঞান হতে কি বেশী সময় লাগে? 'ঘুমিয়ে পড়ে', এর অর্থ হচ্ছে—সংস্কার প্রবল। দাঁতে দাঁতে জোর কোরে পুরুষকারের সহিত উঠে পড়তে হয়। স্বপ্নেতে স্ত্রীমূর্ত্তি দেখ্‌ছে কিন্তু বিপরীত সংস্কার এত প্রবল যে সে স্বপ্নেই রেগে উঠ্‌ছে। স্বপ্নেতে পর্য্যন্ত সজাগ। আমরা ত আর Machine (যন্ত্র) নই—সব অবস্থাতে আমরাও সজাগ হতে পারি। হবে কি হবে না, তার পরীক্ষা আন্তরিকতা বা আন্তরিকতার অভাব।

তোমার সাক্ষী ত তুমিই। যা ভুল হয়েছে তা হয়েছে—দৃঢ় করে বল, "আর করবো না।" যদি আর না কর, বস্ হয়ে গেল।

যেমন যেমন দুষ্কর্ম্মে ঘৃণা হবে অম্‌নি দৃঢ় ভাবে তা ত্যাগ কর্‌লে সে তা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। "নৈতৎ কুর্য্যাম" খুব তেজের সহিত বল্‌তে হয়। প্রায়শ্চিত্ত করে আবার পাপ করলে কিছুই হবে না। ঠাকুর মেদাটে ভাব ভালবাসতেন না। যেমন লেজে হাত দেওয়া, অমনি তিড়িং করে ওঠা।

স্বামিজী সম্বন্ধে বলতেন, "দেখ কি বীরের ভাব, যেমন মনে হওয়া অমনি বদ্ধপরিকর।" সুবিধা অসুবিধা যা হবার হোক, কোমর বেঁধে করতে হবে। At any cost (যাই হোক না কেন) করবো এ ভাব থাকলে মহা বিপত্তি যা তোমাকে গ্রাস কর্‌বে মনে করছ,

শেষে দেখবে তারাই তোমার বন্ধুর কাজ করে দিয়ে গেল। তবে আন্তরিক Struggle (চেষ্টা যত্ন) করা চাই। সুবিধা কি কখনও হয়? কর্ত্তব্য বুঝে করে যাবে। তুমি তো অজর অমর আছই। তুমি কেন সুবিধা খুঁজে বেড়াবে? এ সকল তো তোমারই সৃষ্ট।

য ইচ্ছতি হরিং স্মর্ত্তুং ব্যাপারান্ত গতৈরপি।

সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছতি দুর্ম্মতিঃ।

সমুদ্রে স্নান কর্‌তে হবে বলে বসে রইল। মতলব, তরঙ্গ থেমে গেলে স্নান করবে। Nonsence (বাজে কথা)। সে কি কখনও হয়? ধাক্কাধাক্কি খেয়ে তুমি স্নান করে এলে; সমুদ্র যেমন তেমনই রইল। সংসারের এই তরঙ্গের মধ্যেই ভগবানকে ডেকে নিতে হবে। সুবিধা খোঁজা কোন কাজের কথা নয়। Now or never (করতে হয়ত এখন, ভবিষ্যতের জন্য ফেলে না রেখে) লেগে যাও, অসুবিধা সুবিধা হয়ে যাবে।

কি চমৎকার বলেছেন। কর্ত্তব্য শেষ না কর্‌লে মুক্তি নেই, ছুটি নেই; না করে যেটা ফেলে দিয়েছ সেটা রইল—আবার আসবে। Face the brute (জানোয়ারটার সাম্‌নে মুখ করে দাঁড়াও) পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। সন্ন্যাস করে সুবিধা হবে, গার্হস্থ্যে অসুবিধা এ কাজের কথা নয়। একটা অবস্থার কর্ত্তব্য না করে আর একটা হবে না। Aspire কর,—Shirk করো না। (উচ্চ অবস্থা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা কর, কিন্তু উপস্থিত কর্ত্তব্যটা অবহেলা করো না), Don't do that (কখনই এমন কাজ করো না।)। কুমার বৈরাগীদের কথা পৃথক্। তারা যে সংস্কার নিয়ে এসেছে তাতে যদি ওরা সংসারেও থাকে, সেখানেও সন্ন্যাসীর মত থাকে। সে যা আছে—তাই আছে। Avoidance (কর্ত্তব্য-অবহেলা) ভাল নয়। Avoid করবার (পালিয়ে যাবার) জোও নাই।

নষ্ট মেয়ে মানুষের গল্প এদিক্‌কার (সংসারে থেকে ভগবানে মন রাখ্‌বার) দৃষ্টান্ত। ভগবানে যাতে ভক্তিনিষ্ঠা হয় তার জন্য প্রাণে আন্তরিক প্রার্থনা চাই। নিজেকে Ready (প্রস্তুত)

করবার জন্য সাধুসঙ্গ ও মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনবাস প্রয়োজন। আন্তরিক হলে তিনিই সব ঠিক করে দেন। এই মনটা তাঁকে দিতে হবে। মাখন তুল্‌তে হবে। তবেই জলে থাকলেও জলে মিশিবে না। যে Self-examination (আত্মপরীক্ষা) যত করেছে, যে নিজেকে ঠিক ঠিক যত জেনেছে, সেই তত বড় সাধু। Self-examination বড় কঠিন। মন যে জোচ্চুরি করে তা ধরা ভারি শক্ত। গোবিন্দ। গোবিন্দ। ভগবান্। ভগবান্।

আপনি মধ্যে মধ্যে এদিকে আসবেন।

মুক্তি

একি আনন্দ, একি এ অমৃতধারা, বহিতেছে হৃদি মাঝে
সুদূরে ফেলিয়া আসি, অভিমান, লাভালাভ, মান, ভয়, লাজে,
তোমারে বরণ করি লওয়া। হে মুক্তি, হে অনন্ত মহিমা মণ্ডিত,
ওগো প্রিয়, তোমার পরশ লভি হৃদি তন্ত্রী হতেছে স্পন্দিত।
যেথানে করেছি আশা সেইখানে সযতনে করেছ আঘাত;
ভাঙ্গিয়াছে আশার ছলনা মিলন হয়েছে আজি প্রিয় তব সাথ।
যেথানে আঁকড়ি ধরে রাখিতে চেয়েছি মোরে, টেনেছ তথায়,
এনেছ অনন্ত-তলে অসীম আনন্দ ধারা ঢালিয়া মাথায়।
আপনার বলে আমি চেয়েছি যাহারে স্বামী, করেছ বারণ,
নয়নের নীরে ভাসি তবু তারে যাচিয়াছি হে মৃত্যু-হরণ—
কভু দাও নাই তারে, ফিরায়ে এনেছ মোরে বুঝিয়াছি এবে,
আমি যাব ভুল করে তুমি মোরে বারে বারে যতনে বুঝাবে।
তুমি তন্ন তন্ন করে মোর ভুল খুঁজিছরে, লুকাতে চেয়েছি
আহ্লাদে ভেবেছি মনে এই মোর ভুল-ধনে রাখিতে পেরেছি।
হে বিরাট! তব আঁখি কিছু নাহি রাখে বাকি সব খুঁজে লয়,
কোথায় কি আছে হায় জোরে, স্নেহে কাড়ে তায় নাহিক সংশয়।
আকাশ মাথার পরে অদৃশ্য হয়েছে ঘেরে, দিক হলো হীন,
হে মুক্তি অমূল্য ধন, এস এস প্রিয়তম, রহ চির দিন
আমার আমিত্ব ঘিরি; সে যেন তোমারে ছাড়ি বাসনা কুহকে
কভু নাহি মজে হায়, ভালমন্দ নাহি চায় তোমা মাঝে থাকে।
এস হে আনন্দ-ঘন, পাবার চাওয়ার শেষ, হে মহা বিস্তার—
অনন্ত অমৃত সিন্ধু! ভেঙ্গে ফেল বিম্ববিন্দু আকাঙ্ক্ষা আশার।

—অসিতানন্দ।

জাগরণ

একটি পথিক পথশ্রমে কাতর হইয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন গোধূলির আলো অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। অবিলম্বে সন্ধ্যারাণী আঁধার অঞ্চলে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিলেন। নিস্তব্ধ রজনী। সকলের নয়নান্তরালে কালো, কালো মেঘ আসিয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিল। দামিনী চমকিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বর্ষণ ও ভীষণ বজ্রপাত আরম্ভ হইল। কিন্তু পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। ক্রমে নিশা শেষে উষার আলোক পথিকের চোখে, মুখে আসিয়া পড়িল। শিশু রবি মায়ের কোল ছাড়িয়া গগনাঙ্গনে খেলিতে আসিল, কিন্তু পথিক জাগিল না। নির্ঝরিণী মৃদুস্বরে বলিল, "পথিক জাগ"। পক্ষিগণ কলরব করিয়া ডাকিল, "পথিক জাগ"। ফুলগুলি পথিকের অঙ্গে ঝরিয়া বলিল, "বন্ধু জাগ", কিন্তু পথিক জাগিল না। ক্রমে বেলা বাড়িল। রবি কিরণ অগ্নি-বানের ন্যায় পথিককে বিদ্ধ করিতে লাগিল। বসুন্ধরা উত্তপ্তা হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিল। বায়ু অনল-শ্বাসে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝলসিয়া দিল, কিন্তু পথিক জাগিল না। সন্ধ্যা ফিরিয়া আসিল। পাখিগণ কুলায় আসিয়া ব্যথিত কণ্ঠে আবার বলিল, "পান্থ জাগ"। চাঁদ আকাশ হইতে ডাকিল, "সখা জাগ"। নক্ষত্রবালা নীরব ভাষায় বলিল, "ভাই জাগ," পথিক তবুও জাগিল না।

জননী পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। পুত্র আসিল না। তিনি উদ্বিগ্ন অন্তরে, আকুল নয়নে পথপানে চাহিলেন—পুত্রকে দেখিলেন না। নিবিড় অন্ধকার চারিদিক ঘিরিয়া আসিল। জননী আর থাকিতে পারিলেন না। পাগলিনীর মত তিনি পথে পথে ছুটিলেন। বহুদূর আসিয়া দেখিলেন—তাহার নয়ন-মণি ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। পুত্রের মাথায় হাত দিয়া জননী কাঁদিয়া ডাকিলেন, "বাবা জাগ"। সেই করুণ-কোমল-কর স্পর্শে পথিকের নিদ্রাচ্ছন্ন নয়ন দুটি ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইল। পুত্র অবাক্ হইয়া দেখিল—সে কেমন করিয়া কখন্ মায়ের কোলে আসিয়া পড়িয়াছে।

— অজ্ঞ।

মাধুকরী

মহাত্মার বাণী।

বঙ্গীয় যুবক-সম্মিলনীর ফরিদপুর অধিবেশনে মহাত্মাজী বাঙ্গলার যুবকদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া নিম্নলিখিত অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন :—

সভাপতি মহাশয় ও সমবেত যুবকবৃন্দ, আপনাদের এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিব কি না, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ ছিল। আপনাদের যুবক-সমিতির ইতিহাসের কথা আমি এইমাত্র অবগত হইলাম। আমি ভারতের যুবকবৃন্দের সহিত বহুদিন হইতে মিশিয়াছি। তাহার ফলে আমি একটি বিষয় বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। সেই বিষয়ের উপর যুবকবৃন্দের ভবিষ্যৎ জীবন বিশেষভাবে নির্ভর করে। যুবক অবস্থা হইতে যদি যুবকগণ সে বিষয়ে অবহিত না হন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও দেশের কোন উপকার করিতে সমর্থ হইবেন না।

আমি আপনাদের দীর্ঘ বক্তৃতা শুনাইয়া বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আপনাদের সহিত খোলাখুলিভাবে কয়েকটি কথা কহিতে চাই। বক্তৃতা করা আর আমার ভাল লাগে না। মনের কথা কহিলে সকলেরই তাহা ভাল লাগিবে। আপনারা যুবক-সমিতির সদস্য। আপনাদের মন হইতে সকল কুভাব দূর করা উচিত। আপনাদের জীবনের একমাত্র পণ এই হওয়া উচিত—সেবা, সেবা, সেবা। পুরস্কারের আশায় কাজ করিলে চলিবে না। যৌবনে কাহারও কোন লাভের, পুরস্কারের বা স্বার্থসিদ্ধির কথা মনে থাকে না।

আমার অধীনে শত শত যুবক বাস করিতেছে। যুবকগণের জীবনের অপরিহার্য্য সর্ত্ত এই হওয়া উচিত—অন্তরে-বাহিরে পবিত্রতা, জীবনের সকল কার্য্যে শুচিতা—এক কথায় ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য শুধু ভারতের ধর্ম্মের বাণী নহে—সকল দেশে, সকল ধর্ম্ম চিরদিন এই বাণী যুবকগণের

মধ্যে প্রচার করিয়া আসিয়াছে। আপনারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, হিন্দুধর্ম্মে যেমন ব্রহ্মচর্য্যের কীর্ত্তন গান করা হইয়াছে—মুসলমানধর্ম্মেও ঠিক ঐ ভাবের বাণী আছে—তাহা "পাপ-দমন।" আমি জানি, খৃষ্টান-ধর্ম্মে, পার্শীধর্ম্মে ও জুডাধর্ম্মেও ঐ ব্রহ্মচর্য্যের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। আজ ভারতের যুবকগণের মধ্যে ঐ একটি জিনিসের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। আমি জানি, ভারতের যুবকবৃন্দের জীবন পবিত্র নহে। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ জীবন পবিত্র রাখিতে না পারিলে কিছু করা যাইবে না, ব্যক্তিগত জীবন পবিত্র না থাকিলে সাধারণের কার্য্যে যোগদান করা উচিত নহে। যাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন না করে, তাহারা কখনও দেশের কাজ করিতে পারে না।

আমি পূর্ব্বেই আপনাদের নিকট বলিয়াছি যে, বহু যুবকের সহিত আমি গুপ্তভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি—অনেক পণ্ডিত, মেধাবী, কৃতী ছাত্র তাঁহাদের জীবনের কাহিনী আমার নিকট বলিতে যাইয়া ক্রন্দন করিয়াছেন। অপবিত্র জীবন তাঁহাদের সকল কার্য্য পণ্ড করিয়া দিয়াছে।

আমি একটি যুবকের কথা আপনাদের নিকট বলিব। সে বহু বৎসর আমার সহিত একত্র বাস করিত। সে ছাত্র-জীবনে বিশেষ খ্যাতিমান ছিল, পরে স্কুলমাষ্টারী করিত। কিন্তু দুষ্প্রবৃত্তি তাহাকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে—সে এখন কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। একজনের কথা আমি বলিলাম—আমি জানি, বহু যুবকই ঐ একমাত্র দোষের জন্য নিজেদের জীবন কলুষিত করিয়া থাকেন।

আজ আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করিতেছি, আপনারা আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করুন,—আজ হইতে সকল কুপ্রবৃত্তি দমন করিয়া পবিত্র জীবনযাপন করিতে কৃত সঙ্কল্প হউন।

গুজরাটে যাহারা দেখিতে কাল, তাহাদিগকে "কালীপরাজ" বলে, আর যাহারা দেখিতে সাদা, তাহাদের "উজলীপরাজ" বলে। বর্ণগত বৈষম্যের জন্য যে ঐ বৈষম্য হইয়াছে, তাহা নহে—কালীপরাজগণ,

উজলীপরাজদিগের নিকট চাকরী করে, সেই জন্যই ঐ বৈষম্য বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কালীপরাজগণ অনেক কুকর্ম্ম করিয়া থাকে। আমি তাহাদের এক সভায় তাহাদিগকে ঐ সকল কুকর্ম্ম ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার সম্মুখে সকলে তাহা করিতে সম্মত হইয়াছিল। আমি জানিতাম, তাহারা কুকর্ম্ম ছাড়িবে না, তথাপি তাহারা মিথ্যাচরণ করিয়া আমার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। ঐরূপ প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই।

আমি জানি, আমি আপনাদিগকে যে কাজ করিতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা খুব কঠিন। মদ্যপান ত্যাগ করা অপেক্ষাও ব্রহ্মচর্য্য-পালন আরও ভীষণ ব্যাপার। সেইজন্য আমার ভয় নাই—আশা করি, আপনাদের প্রতিশ্রুতি "কালীপরাজ"দিগের প্রতিশ্রুতির মত হইবে না।

এই ভীষণ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটিমাত্র উপায় আছে—তাহা ভগবানে বিশ্বাস। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস থাকিলে চিরদিন আপনাদের সকল কার্য্যের সুবিধা হইবে। আমার কথা সম্বন্ধে সকলে চিন্তা করুন—আমার কথা বুঝিতে হইবে। এই কথা বুঝিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিলে জীবনে আপনাদের অনেক উপকার হইবে।

সকালে উঠিয়া প্রথমে আপনারা ঈশ্বরের কথা ভাবিয়া সারাদিনের কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়া লইবেন—জীবনের এক মুহূর্ত্তও বৃথা ব্যয়িত হইতে দিবেন না—সমস্ত দিন কাজ থাকিলে অন্য কোন বিষয়ে মন যাইবে না।

আমি আবার সকলকে ঐ একই কথা বলিতেছি। আমি অসহযোগ আন্দোলনের অর্থ বুঝি—আত্মশুদ্ধি—৮ বৎসরের বালক বালিকাদিগকেও আমি আত্মশুদ্ধি করিতে বলি।

আমি আপনাদিগকে আমার সনাতন তিনটি কথা বলিতেছি—সকলে খদ্দর, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও হিন্দু মুসলমান একতার জন্য কাজ করুন—ইহাই শেষ অনুরোধ। আপনারা রাজনীতিক্ষেত্রে যান আর না যান, তাহাতে কিছু যায় আসে না। সকলে অনায়াসে ঐ তিনটি বিষয় পালন করিতে পারিবেন।

সকলকে আমি অবসরকালে চরকা ব্যবহার করিতে বলি—তাহা দ্বারা আপনাদের শুধু আর্থিক উপকার হইবে না—সকলের জীবন পবিত্র হইবে।

চরকা ব্যবহার সম্বন্ধে যুবকগণ আমাকে অনেক পত্র লিখিয়া থাকেন। চরকা কাটিতে অনেকে বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে অনেক পরামর্শ দিয়া থাকি। চরকায় সূতা কাটিলে অনেক কু-প্রবৃত্তি দমন হইবে। ভগবান আপনাদের আশীর্ব্বাদ করুন—আমার কথামত কাজ করিবার জন্য ভগবান আপনাদিগকে উপযুক্ত শক্তি প্রদান করুন।

(আনন্দ বাজার পত্রিকা)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিবিধ বিধি-ব্যবস্থার উপদেষ্টা ও নির্দ্ধারণকর্ত্তা ঘেরণ্ড-সংহিতাকার আপনার মধ্যস্থিত আত্মারূপী ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া বলিয়াছেন, "সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্।" মনুসংহিতা, যমসংহিতা ও পরাশর সংহিতার মধ্যেও এবংবিধ শত শত বাক্যাবলী দৃষ্ট হয়। বেদান্ত দর্শন "মুক্তস্ত ব্রহ্মণোঽভিন্নত্বম্" বলিয়া জীবেশ্বরে সম্পূর্ণ অভেদ অদ্বৈত ভাবকে যেমন মুক্তির লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, পাতঞ্জল দর্শন, "সত্ত্ব পুরুষয়োঃ শুদ্ধি-সাম্যে কৈবল্যমিতি" বলিয়া এবং বৈশেষিক-দর্শন "তদভাবে সংযোগাভাবঃ প্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ" বলিয়া ও সাংখ্য-দর্শন, "তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেক-সিদ্ধিঃ" বলিয়াও তেমনি অদ্বৈত ও একত্ব ভাবকেই মুক্তির লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নানা প্রকার মত-পথের সমর্থক সর্ব্বোপনিষৎসার গীতা "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং" দর্শন ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কর্ম্মজীবনে

বেদান্তধর্ম্মের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'জীবন' এবং ভক্তবীর অর্জ্জুনের 'বিশ্বরূপ দর্শন' বেদান্তের অদ্বৈতবাদের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। বৈষ্ণবের পরম পবিত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ ভাগবৎ প্রণেতা প্রেম-ভক্তির একনিষ্ঠ প্রচারক হইয়াও "অহং ব্রহ্মপরংধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদং" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা আপনাকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন এবং "অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু ব্রহ্মাত্ম-ভাবেন সমন্বয়েন" প্রমাণ করিয়া সর্ব্বভূতান্তরাত্মার সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। যোগশাস্ত্র-কর্ত্তা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যোগের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়া "অহমেব পরং ব্রহ্ম পরমাত্মানমব্যয়ং" বলিয়া বেদান্তের যে অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, শিবপুরাণ প্রণেতার পৌরাণিক আখ্যায়িকার "শিবমাত্মনিপশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিনঃ" প্রভৃতি বাক্যেও তাহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। চণ্ডীতে যিনি "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু আত্মরূপেণ সংস্থিতা" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, বৈষ্ণব-বেদ চৈতন্য-চরিতামৃতে তিনিই—

"প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি যত জীব রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল স্বরূপ॥

বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কেবল হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কেন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয় ও ইসলামীয় ধর্ম্মেও অদ্বৈতবাদ বিশেষরূপে পরিস্ফুট। ভগবান বুদ্ধের "নির্ব্বাণ মোক্ষ" বেদান্তের অদ্বৈতানুভূতিরই রূপান্তর। প্রেমাবতার যিশু খৃষ্ট অদ্বৈত রাজ্যে উপনীত হইয়া বলিয়াছেন, "And hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given us"—(John 3·24) খৃষ্টপন্থী কবি ইমারসনের লেখনী হইতেও বিনিঃসৃত হইয়াছে,—

"I am the owner of spheres of seven stars and solar years,
Of Lord Christ's heart and Shakespear's strain
Of Ceasar's hand and Plato's brain"

মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা মহম্মদও সাধন-প্রভাবে উচ্চসিদ্ধি

লাভ করিয়া "অনলহক্," "অনল ইয়েকিন্" (আমিই খোদা) বলিয়া আপনাকে খোদাতাল্লার সঙ্গে অভেদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। মোস্-লেম-পন্থী মহাপুরুষ মৌলানা তব্রেজ অদ্বৈত ভাবে বিভোর হইয়া "খোদায়েম হম্" বলিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তত্ত্বজ্ঞানী ইস্লামধর্ম্মাবলম্বী শমন তব্রেজ,—

"আঁহাকে তলব্গার খোদায়েম্, খোদায়েম্।
বেরুনে শুমা'নস্ত শুমায়েদ্ শুমায়েদ্॥"

(ঈশ্বরানুসন্ধানকারী, জান যে ঈশ্বর বাহিরে নহেন, তুমিই খোদা, তোমার বাহিরে কিছু নাই) বলিয়া সেই সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন।

এইরূপে প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ ও তৎসম্প্রদায়ের সিদ্ধ মহাপুরুষগণের উপদেশাবলী হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া নিঃসন্দেহে দেখান যাইতে পারে যে, ধর্ম্মরূপ নদী সমূহ অদ্বৈত বেদান্ত-সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হইয়াছে, সকল ধর্ম্মই অদ্বৈত-তত্ত্বে পৌছিয়া চরমে সমন্বিত হইয়াছে, পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী স্ব স্ব ধর্ম্মপথে সিদ্ধিলাভ করিয়া এক কথাই বলিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষানুভব করিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের আদর্শলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও এক সনাতন বিশ্ব-সত্য অদ্বৈত বেদান্ত মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করিয়াছেন। ধর্ম্ম হইতে দূরে থাকিয়া তথাকথিত ধার্ম্মিকগণ সম্প্রদায়গত গৌণমত-পথ লইয়া বিরোধ করিয়া বিদ্বেষ কালিমায় মানব সমাজ ও ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতেছে। জনাকীর্ণ হাট-বাজার দূর হইতে অত্যন্ত কোলাহলপূর্ণ বিশৃঙ্খল বলিয়াই অনুমিত হয়, কিন্তু উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে উহা যেমন সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখা যায়, বিভিন্ন ধর্ম্মও তেমনি দূর হইতে বিশৃঙ্খল ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু উহাতে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে উহার মধ্যে সুশৃঙ্খল, সামঞ্জস্য এবং অপূর্ব্ব সমন্বয় বিরাজিত। যদি ইহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তাহা হইলে মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনের মহান আদর্শে তোমার ঈপ্সিত বিষয় অনুসন্ধান কর। হে— বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ কীর্ত্তিপূত ভারত। যদি

তুমি ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনে সার্থকতা লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে বেদান্তের অদ্বৈত-সত্যকে তোমার জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া সাম্প্রদায়িক হিংসা বিদ্বেষ বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বধর্ম্মপথে তোমার মহান লক্ষ্য সন্ধানে যাত্রা কর।

অদ্বৈত-বেদান্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম বিরোধী বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। নিরীশ্বরবাদ মূলক বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়াও অনেকে মনে করেন না। অনেক খৃষ্টপন্থীর নিকট আবার অদ্বৈত বেদান্ত একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকা। এই জন্য অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে এই ত্রিবিধ ধর্ম্মমতের সম্বন্ধ সামান্য ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে উহাদের কোনটির সঙ্গেই অদ্বৈত বেদান্তের কোন বিরোধ থাকা দূরের কথা, উহাদের প্রত্যেকটি অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় এই অদ্বৈত বেদান্ত পৌছিয়াই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

বেদান্ত সম্বন্ধে তথাকথিত বৈষ্ণবদের একটা ভ্রান্ত ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদান্তিক বলিলেই তাঁহারা মনে করেন যে তিনি কেবল 'পঞ্চদশী', 'যোগ-বাশিষ্ঠ', 'বেদান্তদর্শন' প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের গ্রন্থনিচয় পাঠ করেন এবং 'তত্ত্বমসি', 'মায়া' 'বিবর্ত্তবাদ' এই সব জ্ঞান বিচারে মত্ত থাকেন, তিনি দ্বৈতবাদ ও প্রেম-ভক্তি প্রভৃতি কিছুই মানেন না, মোটের উপর তাঁহারা শুষ্ক অদ্বৈতবাদ লইয়াই নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু প্রকৃত বেদান্তীর বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ ভিত্তিহীন। জীব ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের ন্যায় বেদান্তেরও চরম লক্ষ্য। প্রকৃত বৈদান্তিক কোন মত-পথের উপর কটাক্ষ করেন না। বেদান্ত-কেশরী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—"দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত ব্রহ্মসূত্রের এই ত্রিবিধ ভাষ্যই বেদান্তদর্শনকে অবলম্বন করিয়াছেন।" বেদান্তের বিশ্ববিশ্রুত ভাষ্যকার ও প্রচারক আচার্য্য শঙ্করের জীবন অনুশীলন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি বৈদান্তিক হইয়া, অদ্বৈতধর্ম্মকে চরমাদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াও দ্বৈতভাব ও প্রেম-ভক্তি প্রভৃতিকে উপেক্ষা করেন নাই; পরন্তু তদ্বিরচিত নানা দেবদেবীর

স্তব ও বন্দনাদিতে দ্বৈত-জ্ঞান-মাহাত্ম্য মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ একদিকে যেমন বেদান্তের মূর্ত্ত বিগ্রহ স্বরূপ, অন্যদিকে তেমনি দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি সকল বাদের এবং ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভৃতি সকল পথের বৈশিষ্ট্য রক্ষক এবং সমন্বয় কারক ছিলেন। বেদান্তমূর্ত্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস; তিনি পূর্ণ, আমি তাঁব অংশ, তিনিই আমি, আমিই তিনি।" সহজ সরল, সোজাভাষায় আত্মদ্রষ্টা ঋষির এই অশ্রুতপূর্ব্ব সমন্বয় বাণী বর্ত্তমান ধর্ম্ম জগতের অমূল্য সম্পদ।

(ক্রমশঃ) —ধ্যান চৈতন্য।

ভারতের জাতি-ধর্ম্ম

ধৃ ধাতু মনিন্ প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম্ম' শব্দের উৎপত্তি, অর্থাৎ যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম। কোন জাতিকে যাহা ধারণ করিয়া রাখে তাহা সেই জাতির ধর্ম্ম। তুমি, আমি যাহার উপর নির্ভর করি, যাহার জোরে বাঁচিয়া থাকি, যাহাকে আশ্রয় করিয়া বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করি, যাহা আমাদিগকে ক্রমশঃ উন্নত করিতেছে, আত্মার আবরণ উন্মোচন করিয়া স্বস্বরূপ উপলব্ধির দিকে যাহা আমাদিগকে অগ্রসর করাইতেছে, তাহা তোমার ও আমার ধর্ম্ম। তুমি, আমি এবং তোমার আমার ন্যায় আরও অনেকের সমষ্টি হইয়া একটি জাতি গঠিত, সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত ধর্ম্মই সমষ্টিগতভাবে 'জাতি-ধর্ম্ম' রূপে পরিণত। এক্ষণে দেখা যাক্ তোমার বা আমার ধর্ম্ম কি? হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, মানব দেহ ধারণ করিয়া আমি এই প্রথম পৃথিবীতে আসি নাই। সৃষ্টির প্রথম হইতে কতরূপে, কত স্থানে আমি বারংবার আসিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। কত ভাবে, কত অবস্থায় বিপাকে পড়িয়া আমার

মনোবৃত্তির বিকাশ হইয়াছে, আমার চিন্তাশক্তি দৃঢ় হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। আমার বর্ত্তমান মন ও চিন্তাশক্তি দ্বারা ইহা বেশ বুঝিতে পারি, যেন কিছু পাইবার আশায় আমি বারংবার আসিতেছি, এই বিশ্ব-ভবনে বহুবার যেন কোন কিছুর অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু সে বস্তু কি, কোথায় আছে, তাহা আমার ধারণা নাই। কখন কাম কাঞ্চনে, কখন খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে, কখন শিল্প, কৃষি, সাহিত্যে, কখন পরোপকার, স্বদেশ সেবায় আবার কখনও বা যুদ্ধ বিগ্রহে, পরপীড়নে, এবং অত্যাচারে আমি তাহার সন্ধান করি, কিন্তু যতই তাহার পশ্চাদ্ধাবন করি ততই মরীচিকার মত সে আমাকে দূরে সুদূরে লইয়া যায়। ইহ জগতের সর্ব্বত্র খুঁজিয়া আমার ন্যায় আর এক ব্যক্তি মৃত্যুর পরপারে ঝাঁপ দিল, সেই রহস্যময় গহ্বর হইতে তাহার অভিষ্টকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য। আমি নচিকেতার কথা বলিতেছি। সে কি পাইল? পাইল সে 'আত্মাকে' 'নিজকে' 'আপনাকে'। সেই রহস্য দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক মৃত্যু-পুরে 'আপনাকে' দেখিয়া, তোমাতে, আমাতে, সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র আনন্দময়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী 'আপনাকে' পাইয়া সে স্থির, নিশ্চিন্ত ও শান্ত হইল। তাই শাস্ত্র বহুভাবে ইঙ্গিত করিতেছেন, আপনাকে অন্বেষণ ও স্বস্বরূপকে উপলব্ধি কর। কস্তুরী মৃগ মৃগনাভির গন্ধে আকুল হইয়া বনে বনে ছুটিয়া বেড়ায় অবশেষে স্বীয় নাভিদেশে সে উহাকে পাইয়া শান্ত হয়, তদ্রূপ আমি যাহাকে জন্মজন্মান্তর অন্বেষণ করিতেছি, যুগ যুগান্তর ধরিয়া দেশ বিদেশে যাহার জন্য ছুটাছুটি করিতেছি, সে যে 'আমি' ই। আমি আমাকে খুঁজিতেছি, তুমি তোমাকে খুঁজিতেছ, রাম রামকে, শ্যাম শ্যামকে খুঁজিতেছে অথবা সমষ্টিভূত আমি সেই বিরাট্ আমিকে খুঁজিতেছি। আমার আত্মাতে আমি বর্ত্তমান, উহা আমাকে ধারণ করিয়া আছে, সুতরাং আমার আত্মাই আমার ধর্ম্ম। আমিই বহুরূপে বিরাজিত, তাহাদিগকে একত্র করিয়া আমার জাতি গঠিত, অতএব আমার আত্মাই আমার জাতির আত্মা, আমার ধর্ম্মই আমার জাতির ধর্ম্ম। যাহাতে আমার কল্যাণ আমার জাতিরও তাহাতে কল্যাণ। শাস্ত্র আমাকে যাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন

আমার জাতিকেও তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন। আমি দুঃখ পাই কোন্ বস্তু হইতে? ভয় হইতে। রোগ ভয়, শোক ভয়, বিরহ ভয়, পরাজয় ভয় সর্ব্বশেষ মৃত্যু ভয় হইতে আমার সকল দুঃখের উৎপত্তি। দ্বৈত বোধ সর্ব্বপ্রকার ভয়ের কারণ। আমি আমাকে ভয় করিতে পারি না। অতএব জগতে যদি আমি ব্যতীত আর কিছু না থাকে তাহা হইলে আব কাহাকেও ভয় করিবার রহিল না, সেই সঙ্গে অনন্ত দুঃখেরও চির নিবৃত্তি সম্ভবপর হয়। শাস্ত্র বলেন একমাত্র 'আমি' বর্ত্তমান। বহু যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা ভ্রম মাত্র। বালক আপনার ছায়া দর্শনে উহাকে ভূত ভাবিয়া যেরূপ ভয়াকুল হয়, মাংস খণ্ডবাহী সারমেয় জল মধ্যে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনে উহাকে শক্র মনে করিয়া যেরূপ ক্রোধান্বিত হয়, তদ্রূপ মায়ামোহিত আমি সর্ব্বত্র আমার ছায়া বা প্রতিবিম্বকে দেখিয়া তাহাকে শক্র মিত্র জ্ঞানপূর্ব্বক ক্ষণে ক্ষণে হর্ষান্বিত ও ভয় ব্যাকুল হইয়া থাকি। এই হর্ষ-বিষাদ ও আলো-অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায় শুদ্ধ অদ্বৈত জ্ঞানের উপলব্ধি। ভারতীয় শাস্ত্র বহুমুখে, বহুভাষায় আদিকাল হইতে ইহাই ঘোষণা করিতেছেন —"আত্মানং বিদ্ধি।" অদ্বৈত আত্মাকে অবগত হওয়া অশেষ প্রকার ভয় হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়, সুতরাং জাতির পক্ষেও তাহা প্রযোজ্য। যেদিন হইতে জাতির সৃষ্টি সেইদিন হইতে সে আপন পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কোথায় যাইলে তাহার জন্ম সার্থক হইবে, পথেরও চলার শেষ হইবে, তাহার পূর্ণত্ব লাভ হইবে, সে তাহাই অন্বেষণ করিতেছে। পথের সন্ধান সে বহুদিন পাইয়াছে, জীবনের লক্ষ্য কি তাহা বহুবার শ্রবণ করিয়াছে, কিন্তু আমাব ন্যায় মায়ামোহিত সে, কখন কখন পথভ্রান্ত হইয়া বিপথে চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য হারাইয়া ফেলে। সেই আদিযুগ হইতে কত মহাপুরুষ কত গানে, কত ছন্দে, কত ভাষায় তাহার জীবন লক্ষ্য বলিয়া দিয়াছেন, কত পুস্তকে, কত স্তম্ভে ও কত প্রস্তর ফলকে তাহার পথ-চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছেন, তবু সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, পথ ভুলিয়া যায়। এইরূপ বহু আপদ-বিপদের মধ্য দিয়া জাতি তাহার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। জাতি যখন সম্পূর্ণরূপে বুঝিবে সে কে, তাহার স্বরূপ কি

তখন আর কেহ তাহাকে মুগ্ধ ও বদ্ধ করিতে পারিবে না। আজ যে গুরু বন্ধন ভারে সে নিপীড়িত তখন তাহা শতধা বিচূর্ণ হইয়া মাটিতে খসিয়া পড়িবে, আত্মবলে বলীয়ান হইয়া সমস্ত পশুশক্তিকে সে তখন করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে। আজ পশুশক্তি জাতির লাঞ্ছনার একশেষ করিতেছে, বহুবার সে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পরক্ষণেই তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া তাহার অপমান রাশিকে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে, যৎকর্তৃক নিপীড়িত, বুদ্ধি ভ্রম বশতঃ বহুবার মুক্তির আশায় তাহারই শরণাগত হইয়া সে শতবার বিতাড়িত হইতেছে, কিন্তু যখন সে আপনাকে চিনিবে তখন তাহার শুষ্ক হৃদয়-গঙ্গা শক্তির পূর্ণ জোয়ারে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিবে, সহস্র ঐরাবতের একত্র শক্তি তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াও সেই প্রবল স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইবে। শুদ্ধ কি তাহাই? আমার জাতি কি আপনার মুক্তানন্দে আপনি নিশিদিন বিভোর হইয়া থাকিবে? বিভিন্ন জাতির আকুল ক্রন্দনে তাহার করুণ হৃদয় কি বিগলিত হইবে না? তাহার তো তখন আত্মপর শত্রুমিত্র থাকিবে না। যে জাতি তাহাকে আজ সংহার করিতে উদ্যত প্রবুদ্ধ হইয়া দেখিবে সে যে তাহারই প্রতিবিম্ব বা তাহার নিজ জাতি-শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ।

মদীয় জাতির ন্যায় বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্ম্ম বর্ত্তমান, যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা বাঁচিয়া আছে। ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান, মার্কিন প্রভৃতি জাতি সমূহ কেহ বাণিজ্য, কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজনীতি কেহ বা জড় বিজ্ঞানের উন্নতিকে নিজ নিজ আদর্শ করিয়া তল্লাভে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। প্রাচীন রোম, ব্যাবিলোন, মিশর যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সভ্যতা গরিমায় একদিন জগতকে চমৎকৃত করিয়াছিল, আধুনিক ইউরোপ সেই খণ্ড বিখণ্ড প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রতম একাংশের উপর নিজ সভ্যতা গঠন করিয়াছে, যে শক্তিপ্রবাহ একদিন সমগ্র জগতকে ঘন ঘন প্রকম্পিত করিয়া শূন্যে বিলীন হইয়াছিল বর্ত্তমান ইউরোপ তাহার একটি স্ফুলিঙ্গকে ধরিয়া আজ বসুন্ধরা শাসন করিতেছে, কিন্তু ধ্বংসশীল বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে উন্নত হইতে চায়

তাহার আশা কতদূর সফল হইবে তাহা ভাবিবার বিষয়। কথিত আছে, কোন ধীবর ভাসমান একটি তিমি মৎস্যকে ক্ষুদ্র দ্বীপ মনে করিয়া তাহার উপর বিশ্রাম করিতেছিল, অবশেষে অকস্মাৎ তাহা সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হইলে সেই ব্যক্তি অকূল পাথারে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় প্রাণত্যাগ কবিল, তদ্রূপ যে শক্তি গ্রীক্ প্রভৃতি প্রাচীন জাতিসমূহকে স্বল্প কালের জন্য আকাশে উত্তোলনপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে লইয়া কাল ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাকে ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান ইউবোপে আজ যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছে তাহার পরিণাম বুদ্ধিমানের চিন্তার বিষয়। অনিত্যেব উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেহ কখন চিরকাল বাঁচিতে পারে না। তাই প্রাচীন মিশর, ব্যবিলোনের অস্তিত্ব আজ নাম মাত্রে পর্য্যবসিত। প্রাচীন ভারতেবও ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু সমূলে নহে। তাহার মূল যে অবিনশ্বর, তজ্জন্য বাবংবার কর্ত্তিত হইলেও অনুকূল আবহাওয়ায় উহা পুনরায় মঞ্জুরিত হইয়াছে। কিশোর বালকের প্রাণে যখন যৌবনেব প্রথম উন্মেষ জাগে, রূপ বস প্রভৃতি বিষয় পঞ্চকের মোহন স্পর্শে যখন তাহার ভোগ-কমল প্রস্ফুটিত হয়, তাহাব তরুণ মন বিষয় পিপাসায় যখন আকুল হইয়া উঠে, তখন শত আচার্য্যোপদেশ এবং সহস্র নীতিবাক্যও তাহাকে ভোগ-পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। সে তখন ছুটিয়া চলে মৃত্যুব দিকে, ধ্বংসের দিকে, পরিণাম চিন্তার তখন তাহার অবসর থাকে না। শিশু-ইউরোপ কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিয়া আজ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, সম্ভোগ তৃষ্ণায় তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত। সে চায়—জগতে যত ভোগ্যবস্তু আছে তাহা সে ভোগ করিবে, উহার বিন্দু পরিমাণও সে ত্যাগ করিবে না। তাহার মন-যমুনায় যৌবনের যে প্রমত্ত জোয়ার আসিয়াছে, কাহাব সাধ্য তাহাকে রোধ করে? রোধ করিবার আবশ্যকতাই বা কি? যৌবন তো মন্দ নহে। ভোগ-পিপাসা তো অনিষ্টকর নহে। শুধু উহার গতিকে ভিন্নমুখী করিতে হইবে; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় "মোড ফিরাইয়া দিতে হইবে।" মৃত্যুর পথ হইতে জীবনের পথে, অনৃতের পথ হইতে সত্যের পথে, নিরানন্দের পথ হইতে আনন্দের পথে বা বিষয়ানন্দের পথ হইতে ব্রহ্মা-

নন্দের পথে তাহার গতি ও শক্তিকে পরিচালিত করিতে হইবে। হে ভারত! সুমহান কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে। যে শক্তি বহুবার বহুবিপদ হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছে, বহু দুঃখ কষ্টে তুমি যে মহান অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ, যে অমৃতের সন্ধান পাইয়া তুমি ইহলোকের সুখ সর্ব্বস্ব পদতলে দলিত করিয়াছ, শত ঝঞ্ঝাবাত, শত বজ্রাঘাত শিরে বহন করিয়া তুমি যে আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছ—বিভিন্ন জাতিকে তাহার সন্ধান তোমায় বলিয়া দিতে হইবে। শুধু বলিলে চলিবে না, আচার্য্যের মত, গুরুর মত হাতে ধরিয়া তাহাদিগকে তোমায় সুপথে পরিচালিত করিতে হইবে। অগ্রে তুমি তোমার আত্মাকে অবগত হও, আত্মবলে বলীয়ান হইয়া সমগ্র পশুশক্তিকে করায়ত্ত কর, পশ্চাৎ জগতকে জাগ্রত ও মুক্ত কর। সে যে তোমার প্রতিবিম্ব, তোমার ছায়া, তোমার অর্দ্ধাঙ্গ। তাহার কল্যাণে তোমার কল্যাণ, তাহার আনন্দে তোমার আনন্দ, তাহার মুক্তিতে তোমার মুক্তি। বিস্মৃত হইও না— "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়চ" তোমার জন্ম—তোমার জাতি-ধর্ম্ম।

—চন্দ্রেশ্বরানন্দ।

প্রবাসীর পত্রাংশ

(১)

FYSIKA INSTITUTION UPSALA, SWEDEN.

প্রণামান্তর নিবেদন, আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আপনি এতদিনে বোধ হয় আমার Kristiana হইতে লিখিত পত্র পাইয়াছেন, তাতেই বেড়াবার কথা লিখিয়াছিলাম। আজকাল Stockholm এ World Postal Congress চলিতেছে, সেখানে ২ জন বাঙ্গালীও আছেন। তাঁহারা এখানে একদিন বেড়াইতে আসিয়াছিলেন,

তাই প্রায় এক বৎসর পর বাঙ্গলা কথা বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমি নিজের কাজের জন্য ২।৩ দিনের মধ্যে Stockholm যাব, সেখানে আবার দেখা হবে।

শীত কমিলেই ইহাদের 'উৎসব' আরম্ভ হয়, ইহার মধ্যে কত উৎসব গেল—যে বলিবার নহে। আজকাল 'Crab fortnight', এই উৎসবে সবাই গলদা চিঙড়ি মাছ খায়। Summer resturant সব লাল বাতি দিয়া সাজাইতেছে, আর সেখানে ভীড় কত, সবার মুখেই 'crab' 'crab'। এই সময়ে সমুদ্রে এটা পাওয়াও যায় খুব। তারপর মদ। ইহারা এত মদ খায় কি করিয়া—বুঝি না। এবং মদের খরচও খুব। কলেজের বন্ধুদের এই ৮।১০ দিনেই ৩৫।৪০৲ টাকা খরচ হইয়াছে শুধু মদে, ইহাদের estimate (মদের) এই মাসে ৮০৲ টাকা। অনেক সময় মনে হয় যে এই জাতটা মদের উপর ভাসছে।

Stockholmএ একটি মাত্র ১৫ তালা বাড়ী আছে, এবং সেই ১৫ তালায় ভাল একটি Resturant। দলে পড়িয়া গেলাম। খাওয়া হল, আমার বিল ৩।৷০ টাকা, মাছ, দুধ, রুটী, মাখন, sodaও কাফি। আর ইহাদের হল (৬ জনার) ৪২৲ টাকা, মাংস, মদ ও কাফি। যেরূপ মদ খায়, তাতে বড় একটা মাতাল হয় না, হলেও এত সামান্য যে ধরা কঠিন। রাত্রি ১২ টায় রাস্তায় গেলে বেশ মাতাল দেখা যায়, কেহবা গান করিতেছে, কেহবা কেবলই হাসিতেছে, কেহবা তাল সামলাইতে না পারিয়া দেওয়াল ধরিয়া চলিতেছে। একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ইহাদের নিমন্ত্রণ খাইয়া বলিলেন যে খাবার পূর্ব্বেই যত 'skon' বা 'cup' পান করা হয় তাতেই ত মাতাল হতে হয়, ইহারা তারপরও সমভাবে চালায় কি করিয়া বুঝা কঠিন। মাঝে মাঝে বন্ধুরা কলেজেও হুইস্কির বোতল আনেন—দেখিলে মনে হয় যেন শকুনির পাল পড়িয়াছে বোতল শেষ না হলে কেহ সে স্থান ত্যাগ করে না।

গরম এখানকার শেষ হল, আজকালই বেশ শীত শীত করে। মাত্র ১ মাস underwear ছাড়া চলা সম্ভব, পরে underwear ব্যবহার করা দরকার। Overcoat ৩ মাস ব্যবহার না করিলেও চলে, এই

মাসের শেষেই overcoat ভিন্ন চলা যাবে না। এই ৯ মাস শীত তার মধ্যে ৬ মাস বরফ ও ৩ মাস 'cold weather'—এ অবস্থায় ইহারা থাকেই বা কেমন করিয়া বুঝি না। এই cold weatherএর ২ মাস Springও একমাস Summer—এরা বলে। বৃষ্টিও মাঝে মাঝে হয়, সেদিন বেশ শীতই করে। ঘরে আগুন জ্বালিবার প্রয়োজন এখনও হয় না, কারণ ঘরের Temp +20 °C আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে +23 °C ছিল, ইহার বেশী ত এবার ঘরের Temp. দেখিলাম না। একদিন মাত্র রাস্তার Temp +36 °C হইয়াছিল। +30 °C উপরে এ বৎসর ৪।৫ দিন ছিল, সে কদিন ইহারা বলে 'furnace' 'Indian climate' ইত্যাদি। গরম বেশী হলে ইহাদের খুবই দুঃখ হয় যে মদ বেশী খাওয়া চলিবে না।

সভ্যতা ইহারা আমাকে শিখাইতে বেশ চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে আমি নিজের মত আছি, তাই আজকাল আমাকে বলে, 'You are hopeless'। কাহারও সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে হলেই বলে "Mr Ray, Von Kalcutta, A dogmatic Hindu" শেষোক্ত পদগুলি ইহারা নিরাশ হইয়াই ব্যবহার করিতেছে। আমার একটু হাসিই আসে, ইহাদের ধারণা যে এ সব না শিখিলে আমার জীবন দুর্ব্বহ হইবে। এবং মদ না খাইলে আমি ঠাণ্ডায় নিমুনিয়া হইয়া মারা যাব। এক শীত গেল, কিন্তু কিছুই হইল না দেখিয়া ইহারা ভারী অবাক্। কলেজে আসিতে একটু দেরী হলেই ভাবিত যে আমার নিমুনিয়া হইয়াছে। এই ভাবে ১ বৎসর ইহাদের দেশে সুখে দুঃখে চলিয়া গেল। আর কুড়ি দিন পর Denmark যাব।

পুঃ—আজকাল 'White Night' শেষ হইয়াছে, রাত্রি ১০ টার সময় রাস্তায় আলো দেয় ও আকাশে কিছু কিছু তারা দেখা যায়।

শ্রী—

(২)

HOTEL NORGE

KRISTIANIA DEN 19 JULI, 1924

প্রণামান্তর নিবেদন, আজ ৩ সপ্তাহ Norway ও Swedenএর ভাল ভাল জায়গা দেখিয়া পুনরায় Upsala রওনা হইলাম। একমাত্র Midnight sun ও Norway coast ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য স্থান বড় একটা নাই। Assam Railwayর মত Norwayর Railway, তবে ততটা সুন্দর নহে। যতটা Advertise করা হয় আসলে ততটা সুন্দর নহে। Abiscoতে Midnight sun ততটা ভাল দেখা যায় নাই। সমুদ্রে (North sea) বড়ই সুন্দর দেখিয়াছিলাম। আজকাল এখানকার weather বড়ই খারাপ, দিন রাতই বৃষ্টি। তাই ৮।১০ দিন পর হয়ত একদিন সূর্য্য দেখা যায় তাই ইহাদের Fine day। আমাদের অদৃষ্টে সমুদ্রে ১ দিন বড়ই Fine ছিল তাই খুবই Midnight sun দেখিলাম। রাত ২টা পর্য্যন্ত সেদিন জাগিয়া ছিলাম। Artic Zoneএ ১০ দিন ছিলাম, তন্মধ্যে ২ দিন Midnight sun দেখিয়াছি। Lat village ও Reindeer দেখিলাম। তাহারা এ সভ্যতার সংস্পর্শে মোটেই আসে নাই, হয়ত Coffeeটাই শুধু নিয়াছে এবং দিন ভরিয়া কেবল কফিই খায়। খাদ্য তাহাদের মাংস, মাছ, Goat milk ও রুটি। চেহারাটা অনেকটা নেপালী ও ভুটানীদের মত, তবে নাকটা বাঙ্গালীর। রং Swedeদের চেয়ে ঢের কাল এবং একটু লালচে। তাদের আচার ব্যবহার, ঘর বাঁধিবার প্রণালী সবই অন্য প্রকার। দিন রাত ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালিয়া থাকে।

Norway, Swedenএর চেয়ে অনেক সুন্দর, পাহাড়, ছোট ছোট ঝরণা, ও নদী বিস্তর আছে। Narvik হতে ওপারে Touristদের জন্য একটা রাস্তা করিয়া দিয়াছে, motorএ যাইতে হয়, বোধ হয় সেটাই Norwayর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাস্তা। প্রায় ১০০০ ফিট পাহাড়ে motor ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে, ৪ ঘণ্টা সময়

ওই পাহাড়ে বেড়াইয়াছিলাম, মাঝে মাঝে valleyতে লোক আছে, বরফ ওখানে এখনও গলে নাই, সবে গলিতেছে। North Capeএ Europeএর উত্তরবাসীরা থাকে, তার উত্তরে আর লোক নেই, যাইতে হয় সমুদ্র পথে, Narvik হইতে ৪ দিন ৪ রাত্রি, খরচ প্রায় ৫।৬ শত টাকা, খাবারের কষ্টও খুব, তাই আর যাওয়া হল না। Svolvar পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

এই Tourএ খরচ খুব, প্রত্যহ প্রায় ১ পাউণ্ড দরকার। তাতেও ভাল Hotel পাওয়া দুষ্কর। German ও Americanরা সবই দখল করিয়া আছে। তাদের Special জাহাজ, Special Train সবই আছে। ১ মাস পূর্ব্বেই সব Hotel engage করিয়া আছে। কত টাকা যে ব্যয় করে এই আমোদের জন্য, তাহা বলা যায় না। একটি American পরিবারের সঙ্গে আলাপে বুঝিলাম, তাহারা প্রত্যেকে ৩০০০ হাজার dollar estimate করিয়া আসেন এবং জিনিষপত্র কিনিতে হলে আরও দরকার। এই টাকাটা শুধু Norway ও Swedenএই ব্যয় করা হয়।

Steamerএ Seat পাওয়া দুষ্কর। তাই Cabin ছাড়া Saloonএ আসিয়াছি। ৩ দিন Steamerএ ছিলাম, ঘুম বড় একটা হয় নাই, তাই এখানে আসিয়া ৩ দিন বিশ্রাম লইয়াছি।

এই সব সহর খুবই ছোট। Sweden যত পরিষ্কার Norway তেমনি ময়লা। পাশাপাশি দুই প্রদেশের বিভিন্নতা বেশই চোখে লাগে।

Abiskoতে আমরা একটা পাহাড়ে (৪০০০ ফিট) উঠিয়াছিলাম. উপরে গাছ নেই, বরফও খুব, সে দিনের শীত জন্মে ভুলিব না, কোটের ভিতরে কাগজ দিয়া wind proof করিয়াছিলাম। আজও পায়ের বেদনা সম্পূর্ণ যায় নাই।

শ্রী—

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়

(১) নারীর প্রতি—লেখিকা শ্রীমনোরমা দেবী। প্রকাশক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৫।২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।৵০ আনা।

একজন বিদুষী রমণী তাঁহার স্বজাতীয়াগণকে কি বলিতেছেন, এই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করি। দেশের ভগ্নী ও দুহিতাগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা দর্শনে লেখিকার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে এবং সেই ব্যথা-কাতর কণ্ঠে তিনি সকলকে তাঁহাদের করুণ-কাহিনী শুনাইয়াছেন। লেখিকার লেখার অনভ্যাস হেতু ভাষা অত্যন্ত দীনা হইয়া পড়িলেও ভাব উন্নত ও মর্ম্মস্পর্শী। লেখিকার উদ্দেশ্য, সমগ্র হিন্দু-নারী-জাতিকে সমাজের কঠোর নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা করা। তিনি লিখিতেছেন, "আমাদের সমাজের নেতা পুরুষগণ যখন কিছুতেই এই সমাজের অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন না, তখন কাজেই নারীশক্তি জাগ্রত করিতে হইবে। নারী চিরদিন পুরুষের অধীন। হিন্দুনারী কখনও নিজেদের মতানুসারে চলিতে চাহে নাই, কিন্তু নারী আর কতদিন অত্যাচার সহ্য করিবে? নারী দেখিতেছে, পুরুষগণ কোথায় তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবেন, না বরং উত্তরোত্তর অত্যাচার-অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দিতেছেন, কাজেই নারী অসহায়া হইয়া নিজেদের নিজেই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।" খুব ভাল কথা। স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপ ইচ্ছাই পোষণ করিতেন। তিনি বলিতেন, পুরুষদের কাজ—মেয়েদের সুশিক্ষা দেওয়া। শিক্ষিতা হয়ে মেয়েরা নিজেদের বিষয় নিজেরা ভাববে, নিজেরাই তার সমাধান করবে। মেয়েদের ভালমন্দ কিসে হবে তা মেয়েরা পুরুষদের চাইতে ঢের বেশী বুঝে। সুতরাং পুরুষগণ যেন মেয়েদের কোন কাজে হস্তক্ষেপ না করে। স্বামিজীর হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ইচ্ছা আজ

ফলবতী হইতে দেখিয়া আমরা সমধিক আনন্দিত। হিন্দুরমণীগণের চরম দুর্দ্দশা একজন বিদুষী বঙ্গনারীর হৃদয়ে যে আঘাত দিয়াছে এবং সেই আঘাতে উদ্বুদ্ধা হইয়া তিনি নিজ ভগ্নীগণের দুঃখ দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা অতি আশার কথা।

প্রধানতঃ, লেখিকা বলিতে চান যে "বরপণ-প্রথা নিবারণ" করিতে হইবে। এই কু-প্রথার জন্য তিনি পুরুষ ও নারীকে সমভাবে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন, যথা—"এই পুরুষ জাতি রমণীর গর্ভে জন্ম লইয়া, রমণীর স্নেহে পালিত হইয়া পুণ্যবতী স্ত্রী পাইয়া, সেই রমণীকুলের প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিতেছে, পদতলে নিক্ষেপ করিয়া অত্যাচারের প্রবল তাড়নে পেষণ করিতেছে, তাহাদের সহিত টাকা লইয়া ওজন করিতেছে, এই কি বিবাহ? না টাকা লইয়া দর কসাকসি নারী লইয়া খেলা। চোখ রাঙ্গাইয়া বলিতেছে, বিবাহ করিব না। হায় হতভাগ্য রমণীকুল! আমাদের কত ঘৃণ্য, কত হেয় করিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি আমরা পুরুষের দুটা মিষ্ট কথায় ভুলিয়া এই অত্যাচারের পোষকতা করিয়া আসিতেছি।" লেখিকা দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বাঙ্গালী জাতি সর্ব্বদাই মুখে আস্ফালন করেন আমরা দেশোদ্ধার করিব, এইরূপ নানা প্রকার বীরত্ব কাহিনী সর্ব্বদাই শুনা যায় কিন্তু * * * যাহাদের ঘরে কন্যার বিবাহে ভিটা বিক্রয় করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে হয়, তাঁহাদের মুখে দেশোদ্ধারের কাহিনী শুনিলে বালকের বীরত্ব প্রকাশের ন্যায় হাস্যাস্পদ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।" রমণীর এই তীব্র বাক্যবাণ কি বঙ্গীয় যুবকগণের প্রস্তর সদৃশ কঠিন হৃদয়কে বিদ্ধ করিবে? বিবাহ সমস্যা কঠিন হওয়ায় পিতামাতার অসীম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণস্বরূপিণী মনে করিয়া কোন কোন স্থলে কোমল হৃদয়া বালিকাগণ আত্মহত্যা করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছে, আবার অন্য দিকে বয়স্থা অনূঢ়ার সংখ্যাও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকে ইহাকে শুভলক্ষণ মনে করেন। প্রতীচ্যের অনূঢ়াগণকে দেখিয়া তাহাদের সমাজের কলঙ্কের কথা শুনিয়া এবং

সেই সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা অনেক সময় ভয়াকুল হইয়া পড়ি। এই বিষয়টি লেখিকার নিজের কথাতেই বলা ভাল, "বিবাহ-প্রথা যতই কঠিন হইবে ততই অনূঢ়ার সংখ্যা বেশী হইতে থাকিবে। যেই স্থানে অনূঢ়ার সংখ্যা বেশী হইবে ততই ব্যভিচার দোষ আসিয়া সমাজকে দূষিত করিবে, ইহাতে কি বাঙ্গালী সমাজের বড় মুখোজ্জ্বল হইবে, পূর্ব্ব হইতে ইহার কি প্রতিকার করা উচিত নয়, অর্থ-লোভে কি বাঙ্গালী শেষে দেশের মুখে কালিমা লেপন করিবেন?" পুরুষজাতি ইহার উত্তরে কি বলিতে চান? হয়ত, তাঁহারা বলিবেন অল্প বয়সে পরিণীতা হওয়ায় দেশে বিধবার সংখ্যা এবং তৎসঙ্গে সামাজিক অনাচার বৃদ্ধি পাইয়াছে। কন্যাগণের অধিক বয়সে বিবাহ দিলে বিধবার সংখ্যা অনেক কম হইবে, সেই সঙ্গে দুর্নীতিও কমিবে। কিন্তু লেখিকার তরফ হইতে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, যে কারণে বিধবাগণের ব্যভিচারিণী হইবার আশঙ্কা আছে, ঠিক সেই কারণেই কি কুমারীগণেরও দুর্নীতিপরায়ণা হইবার আশঙ্কা নাই? যাহা হউক, এই উভয় যুক্তিই অতি তুচ্ছ বলিয়া আমাদের ধারণা। নির্ম্মল চরিত্র হইবার উপায় বিবাহ নহে—সমাজে উচ্চাদর্শের প্রচার। উচ্চাদর্শের যতই অভাব ঘটিবে, ততই কি কুমারী, কি সধবা, কি বিধবা সকলকে কলুষিত জীবন ভোগ করিতে হইবে। বিনা পণে বিবাহ দিতে পারিলেই নারী-জীবন সার্থক হইল ইহা একটি উৎকট প্রলাপ। আজীবন নির্ম্মল দেহ মন উপভোগ করা—কি নারী কি পুরুষ উভয়েরই বাঞ্ছনীয়। অসমর্থা হইলে কুমারীগণের যাহাতে পরিণত বয়সে বিবাহ হয় তাহা করা কর্ত্তব্য, নচেৎ তাহারা চিরকুমারী থাকিয়া শ্রীভগবান, স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করিয়া যাহাতে সার্থক জন্মা হয় তাহাই যথার্থ পিতামাতার কর্ত্তব্য। কিন্তু মূলে কোন উচ্চাদর্শের পরিবর্ত্তে যদি অর্থগৃধ্নুতা স্থান পায় তাহা হইলে ইহা সমাজে অনেক অনর্থের সৃষ্টি করিবে—তাহাতে সন্দেহ কি?

এই পাপ বরপণ প্রথা যাহাতে দেশ হইতে নিঃশেষে দূরীভূত

হয়, লেখিকা তাহার জন্য নারী জাতিকে অগ্রবর্ত্তিনী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। নারী সহধর্ম্মিণী, জননী; সুতরাং কাঞ্চনের প্রবল প্রলোভন হইতে যেরূপে হউক তাঁহারা নিজ স্বামী পুত্রগণকে রক্ষা করিবেন। এইখানে লেখিকার ভাষাটুকু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, "রমণীগণ সকল অমঙ্গল দূর করিতে সমর্থা, রমণীকে আর্ত্তের রক্ষাকারিণী, দুর্ব্বলের বলসঞ্চারিণী, সকলের দুঃখনিবারিণী হইতে হইবে। * * * * নারী সর্ব্বদা পুরুষকে লোভ মোহ হইতে রক্ষা করিবে, নারী শক্তি অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নারী পুরুষকে কখনও লোভ মোহের উৎসাহ দিবে না। পুরুষগণ যাহাতে এই লোভ মোহ হইতে রক্ষা পায়, নারীদ্বারা তাহারই চেষ্টা হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।" শক্তিরূপিণী জননীজাতির এই অভয় উক্তি সমাজের বড়ই মঙ্গলকারিণী।

"বরপণ প্রথা নিবারণে"র কার্য্যপদ্ধতি আলোচনা করিতে গিয়া লেখিকা প্রধানতঃ তিনটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ;—

(১ম) মহিলাগণ স্বামী পুত্রকে এই সৎ শিক্ষা দিবেন যাহাতে তাঁহারা কন্যাপক্ষের নিকট হইতে জোর করিয়া অর্থ গ্রহণ না করেন, কন্যার অভিভাবক স্বেচ্ছায় যাহা দিবেন তাহাতেই যেন তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন।

(২য়) "পতিহীনা দেবীগণ" তাঁহাদের ভগ্নীগণের ভিতর যেন এই সৎশিক্ষা বিস্তারে আন্তরিক চেষ্টা ও এই শুভ সংকল্পে উৎসাহ প্রদান করেন।

(৩য়) "কন্যাদের হৃদয়েও এরূপ বীজ বপন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিতে পারে—আজীবন কুমারী থাকিব, তথাপি যিনি টাকা লইয়া বিবাহ করিবেন, সেইরূপ পাত্রকে বিবাহ করিব না।"

কিন্তু, জেদ ও অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া Competitionএ চিরকুমারী জীবন-যাপন করা অসম্ভব। তাই, আমরা সুর আর একটু চড়াইয়া বলি, তাহারা যেন প্রতিজ্ঞা করে—আজীবন

কুমারী থাকিব, পাত্র টাকা 'না' লইয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেও বিবাহ করিব না। কারণ বিবাহ অপেক্ষা আরও উচ্চ-আদর্শ-জীবন আছে। তবে, যদি কখনও বিবাহ করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়, তখন পরিণীতা হইয়া মানব সমাজের কল্যাণের জন্য সৎ পুত্র কন্যার জননী হইব। এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য কঠোর তপস্যার প্রয়োজন, লেখিকার ভাষায় বলি,—"আমাদের কন্যাগণকে তপস্যা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে, প্রত্যহ কুমারীগণ ভগবৎ সমীপে করযোড় করিয়া প্রার্থনা কবিবে, হে ভগবান! আমরা যেন কঠোর সংযম-ব্রত আচরণ করিতে পারি, তোমারি শক্তিতে যেন আমবা বিবাহ না করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।"

পরিশেষে বক্তব্য, পুস্তকের স্থানে স্থানে পুরুষজাতির উপর একটা বিদ্বেষ ও রীশের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ, বিদ্বেষ ও রীশপূর্ণ অশুদ্ধ হৃদয় লইয়া কেহ কখন নিজেব ও সমাজের কল্যাণ সাধনে সক্ষম হয় না। একমাত্র—সহানুভূতি, স্বার্থত্যাগ, ধীরমস্তিষ্ক ও তপঃ-শুদ্ধ হৃদয় জগতে অসম্ভব সম্ভব কবিতে পারে,

'ঋত'।

---

(২) মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক বিগত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন। অভিভাষণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে অধুনাতন সাহিত্যিকগণের পূর্ব্বাপব সম্বন্ধ নির্ণয়পূর্ব্বক বাংলা ভাষার বর্ত্তমান পরিণতিতে তাঁহাদের সাধনা ও সিদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, স্বামী বিবেকানন্দ মাতৃভাষার উন্নতি কল্পে কি কিছুই করেন নাই? দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া

সাহিত্যিকগণ বঙ্গের সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে রত্ন সমূহ দান করিয়াছেন তাহা খুঁজিতে গিয়া সভাপতি মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের কোন দানেরই কি সন্ধান পাইলেন না? তাঁহার আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেই আধ্যাত্মিকতার সহিত যে অপূর্ব্ব লেখনী-শক্তি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কি হেমেন্দ্রবাবু অবগত নহেন? অভিভাষণ প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন,—'ভক্তিযোগের' অশ্বিনীকুমার দত্তের নাম আমরা যেন কখন বিস্মৃত না হই; সার আশুতোষ চৌধুরী ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের উভয়ের অনুরাগের অনেক প্রমাণ আমি পাইয়াছি; বাংলায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান যুগের বক্তা ও লেখক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের ও পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের নাম উল্লেখ না করিলে এই অসম্পূর্ণ বিবরণ আরও অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে, তারপর সাহিত্য রথিগণের ভিতর তিনি আচার্য্য বসু ও আচার্য্য রায়ের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। হেমেন্দ্রবাবুর অভিমত,—'ভক্তিযোগ' লিখিয়াছেন বলিয়া অশ্বিনীবাবুকে যদি আমাদের বিস্মৃত হওয়া না চলে, "হিতবাদীতে" দুই চারিটা প্রবন্ধ লিখিয়া ভূপেনবাবু এবং উল্লেখযোগ্য কিছু না করিলেও যদি আশুবাবু বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট সেবা করিয়া থাকেন, বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও আচার্য্য রায় যদি সাহিত্য মঞ্চে উচ্চ স্থান পান এবং ডাঃ বসু 'অব্যক্ত' লিখিয়া যদি এতদূর ব্যক্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে স্বামী বিবেকানন্দ "উদ্বোধন" পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া, বহু উচ্চ ভাবপূর্ণ ও সুললিত কবিতা লিখিয়া, 'পত্রাবলী' 'বর্ত্তমান ভারত' 'ভাববার কথা' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'পরিব্রাজক' নামক দার্শনিক ও ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থনিচয় রচনা করিয়াও কি বঙ্গ সাহিত্যের এমন কিছুই করিয়া যান নাই, যাহার জন্য তিনি সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি কর্ত্তৃক এতদূর অনাদৃত ও অবজ্ঞাত হইলেন? 'পরিব্রাজকে'র মত একখানি উৎকৃষ্ট ভ্রমণ-

কাহিনী, সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে কি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন? চলিত ভাষার এত জোর, দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক ও জটিল সমাজ-তত্ত্বের এমন সরল ভাবায় সমাধান, শব্দের মধ্যে অনন্ত ভাবধারা ঢালিয়া প্রাণের প্রতিষ্ঠা ও তাহার [illegible] রসকে অবলম্বন করিয়া স্বাধীন অপ্রতিহত গতির নির্দ্দেশ, [illegible] সূত্রাকারে নিবন্ধ, ইহার পূর্ব্বে কে করে করিয়াছিল? [illegible] শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের কেন্দ্র স্থল কোথায়? নিরপেক্ষের কি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, "হে ভারত ভুলি ও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী", "আর্য্যবাবাগণের জাঁকই কর বা ডডডং বলিয়া ডম্ফই কর," "বেরুক ঝোড জঙ্গল থেকে, ভুনিওয়ালার উনানের পাশ থেকে নূতন ভারত," "কোটী জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য কম্পনকারী ওয়াহ গুরু কি ফত" প্রভৃতি বাঙ্গালীর স্বদেশ মন্ত্র কি ভুলিলে চলে? উহারই উপর যে বাঙ্গালীর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত। "আবা কাবা চুস্ত পায়জামা তাজ মোড়াসার রঙ্গ বেরঙ্গ" দিয়ে মাতৃভাষা নূতন করে সাজালে কে? এ্যাভালেন্সের (Avalanche) মত ফেটে পড়ে, বম্বসেলের (Bomb shell) মত বার্ষ্ট (Burst) করে বেপরোয়া সাহিত্যের সৃষ্টি কে করে গেল? পাঁজি পুঁথি উল্টাইয়া সভাপতি মহাশয় একবার বিচার করিয়া দেখুন। বলি এ ভ্রম, বিস্মৃতি—কি—স্বেচ্ছাকৃত?

'শান্ত'।

(৩) শ্রীরামকৃষ্ণ ও সংসার—মূল্য /১০ আনা। "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" ও "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" হইতে ব্রহ্মচারী শশাঙ্ক চৈতন্য, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রভৃতি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত। পুস্তিকাখানি ভক্ত গৃহস্থগণের উপকারে আসিবে।

'শান্ত'।

সংঘ-বার্ত্তা

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজজী শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন গমন করিয়া এক্ষণে "শশী নিকেতনে" অবস্থান করিতেছেন।

২। বিগত ২৪শে মে ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী বেলিয়াটি গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পূজা পাঠ হোম কীর্ত্তনাদি ও প্রায় তিন সহস্র দরিদ্র নারায়ণের সেবা করা হইয়াছে। বৈকালে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের জনসাধারণকে লইয়া একটি সভার অধিবেশন হয়। স্বামী বাসুদেবানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঢাকা মঠের স্বামী হরিহরানন্দ "বিবেকানন্দ বিদ্যালয়" ও "সারদা-বিদ্যালয়ে"র বালক-বালিকাগণকে পারিতোষিক বিতরণ করিবার পর মালদহ মঠের স্বামী নির্গুণানন্দ ধর্ম্মোপদেশের সহিত পল্লীবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টা কালব্যাপী বক্তৃতা করেন।

৩। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের দেহত্যাগ দিবসের স্মারক স্বরূপ বেলুড় মঠে ক্ষুদ্রাকারে একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা আশা করি ইহা শীঘ্রই একটি বিরাট পুস্তকাগারে পরিণত হইবে।

৪। আগামী ৪ঠা ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রী শ্রীনাগ মহাশয়ের অশীতিতম জন্মতিথি পূজা শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ মিত্রের ৫।১।এ নং পাঁচু খানসামা লেনস্থিত বাড়ীতে সম্পন্ন হইবে।

যৌবন-জাগরণ

আজি, যৌবন মোর উন্মাদ হয়ে
জেগেছে বাঁধন টুটিয়া,
মুক্তির মহাযোগসাধনায়
চলিয়াছি আমি ছুটিয়া।
খাঁচার শিকল কাটিয়া এ পাখা
হেরিয়া মুক্ত রক্ত পতাকা
ভাঙ্গিয়া আপন নির্ভর শাখা
আকাশে ছুটিছে রে।
আজি, নূতন আলোকে হৃদয় কোরক
ফুটিয়া উঠেছে রে।
চরণ-আঘাতে চূর্ণিত করি
যত না শিলার রাশি,
যত না বাঁধন যত না কাঁদন
যত প্রলোভন হাসি,—
উদ্দাম হৃদি দুর্দ্দাম স্রোতে
পর্ব্বত-ঘেরা কর্দ্দম-পথে
ছুটিয়া চলিছে বজ্রের বেগে
সাগরের লাগিরে,
লুপ্তি-মাখান-সুপ্তিরে ছাড়ি
মুক্তিরে মাগি রে।

হায় খাঁচা, তুমি ভেবেছিলে মনে
দুইটি ছোলার কণা প্রলোভনে
থাকিব তোমার চির বন্ধনে
চির শৃঙ্খল-তলে ?
জান না কি তুমি যৌবন মোর
জেগেছে হৃদয়-দলে ?
আর কি তোমার সোণার শিকল
বিকল করিয়া মোরে,
সকল সুখেরে ব্যর্থ করিয়া
মৃত্যু আঘাতে জীবন ধরিয়া
রাখিতে কি পারে শক্তি হরিয়া
এমন তরুণ ভোরে ?
আমি যে এখন আপনার মাঝে
ফুটিয়া উঠেছি জগতের কাজে
স্বপনের মাঝে শুনিয়াছি আমি
প্রভাতী-আহ্বান-গীতি ।
আকাশ আমারে শুনায়েছে তার
মহান গভীর রাগিনী উদার
বাতাস আমারে জানায়েছে তার
শীতল অমল প্রীতি ,
আজি, মর্ম্মের মাঝে বাজিতেছে মোর
চির-চিন্ময়-স্মৃতি ।
এত দিন আমি অন্দরে বসি
যেই আলোকের হেতু
বাঁধিয়া ছিলাম কন্দর মাঝে
অন্ধকারের সেতু,
আজ সেই আলো আসিয়াছে দ্বারে
আর কি আমারে রোধিবারে পারে

খাঁচার শিকলে ঘিরি ?
জাগিয়াছি আমি বন্ধন ছেদি
উঠিয়াছি আমি প্রলোভন ভেদি
রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে কি
ক্ষুদ্র পাষাণ-গিরি ?
বক্ষ হয়েছে শক্ত এখন
শিকল ফেলেছি ছিঁড়ি।
পিঞ্জর। তোরে ভাঙ্গিয়া আমি—
ক্ষুদ্র বিহঙ্গ রে।
মুক্ত গগনে মেঘের সঙ্গে
করিব রঙ্গ রে।
কাঁপায়ে ধরণী আকাশ বাতাস
গর্জ্জিবে যবে প্রলয়ের শ্বাস
সর্ব্বনাশের সেই শ্বাস-সনে
বাজাব আমার বাঁশী।
তালে তালে তালে উড়িয়া উড়িয়া
বেড়াব বিশাল ধরণী জুড়িয়া
ঘূর্ণীবায়ুর ঘূর্ণন-পাকে
ঘুরিতেই ভালবাসি।
ওরে, উচ্ছৃঙ্খল হতে চাই আমি
ছিঁড়ি শৃঙ্খল রাশি।
আয় তোরা আয় কেরে যাবি আয়
আয় আয় মোর সনে।
আপনার মনে হাসিতে হাসিতে
এ সুখের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
কে আসিবি আয় শিকল ছিঁড়িয়া
এমন শুভক্ষণে।
মনিবের ঘরে গোলামগিরিতে

নাই, নাই কোন সুখ,
শির নোওাইয়া সেলাম করিতে
ভাঙে নারে কিরে বুক ?
ভিক্ষা করিতে গিয়ে রোজ্ রোজ্
যে ধিক্কার তুই খাসরে অবুঝ্
জীবন পত্রে সেই পদাঘাত
আঁকে না গভীর দাগ ?
সেই চরণের চুম্বন-লোভে
বাড়ে তোর অনুরাগ ?
এই পুঞ্জীভূত অপমান ব্যথা
চাবুকের ঘা খেয়ে,
দুরন্ত মরু-অশ্বের মত
উঠে নাকি গর্জ্জিয়ে ?
বিদ্রোহ-শিখা লক্ লক্ করি
আগুনের মত ওই বুক ভরি
দগ্ধ করিতে চায় নাকি হায়
অত্যাচারীর কর ?
ভীরুর মতন তুই বার বার
না মরিয়া, ওরে শুধু একবার
বীরের মতন মর ।
মৃত্যুর গলা ধরিয়া যখন
রুখিয়া দাঁড়াবি, যুঝি প্রাণপণ
তখন দেখিবি আপনা হইতে
মৃত্যু পেয়েছে ডর ।
ওরে, অত্যাচারকে বুক পাতি নিয়ে
অত্যাচারীকে ধর ।
হয় খাঁচা থাক্, নয় থাক্ তুই,
"গোলাম" "মনিব" রাখিস্ না দুই,

সেলাম ঠুকিয়া মরিতেই শুধু
মানব জীবন কিরে ?
এমন সলাজ বিজলীও হায়
ক্ষণেকের তরে বাহিরিতে চায়
ভীম ভৈরব বজ্রের রূপে
মেঘের পর্দ্দা চিরে,
মানুষ হইয়া মরিবি কি তুই
বেদনা-বদ্ধ-নীড়ে ?
যে দিন প্রথম জনম লভিলি
সে দিন আকুল হয়ে,
মা—মা বলে কেঁদেছিলি শুধু
মাতৃ মন্ত্র লয়ে।
কার মোহ-রসে হয়ে মস্‌গুল
সেই নাম তোর হয়ে গেল ভুল
কণ্ঠ বিদারি কেঁদে ওঠ আজ
তোর এ হাসির ঘরে,
এ নহে বাঁচন,—এ যে রে মরণ
বাঁচনের রূপ ধরে।
রাক্ষসী যথা রূপসীর বেশে
রাজার পুত্রে ভুলাইয়া, শেষে—
চিবায়ে খাইতে চেয়েছিল তার
রক্ত মাংস হাড় !
তেমতি তোমার সাধনার পথে
এসেছে পিশাচী মণিময় রথে
রে সাধক ! তুমি দূর হতে তার
চিনে লও অভিসার।
লাঞ্ছনা-শর খেয়ে খেয়ে তুমি
হয়েছ জীবনে মরা,

হায় রে ভণ্ড ! চোখ বুজি তোর
সাজে নাকি ক্ষমা করা ?
ক্ষমা-ক্ষমা-ক্ষমা-ক্ষমা বলে কারে ?
দুর্ব্বলে কখনো ক্ষমিতে কি পারে ?
প্রাণহীন শব ঢেকেছ নিজেরে
অহিংসা আবরণে ।
এ মহা জগতে নাহি আছে যার
হায় এক কণা ভোগ করিবার
সেই সে ভিখারী উদাসী হইয়া
যায় যদি ঘোর বনে,—
ত্যাগী অবতার বলিয়া তাহারে
পূজিব নাকি রে লয়ে ঘরে ঘরে
তারই চরণে দিব অঞ্জলি
মহা ভক্তির সনে ?
আঘাত পাইয়া যে পারে হানিতে
বিষম প্রত্যাঘাত ।
ক্ষমার জন্য তার শুধু সাজে
প্রেমের অশ্রুপাত ।
আপন ভায়ের রক্ত যে ঢালে
তার সে রক্ত খর তরবালে
ঢালিতে পারিলে, বুঝিব তখন
ওগো ক্ষমা অবতার ।
খাটিবে তোমার হৃদয়-মন্ত্র
প্রেম ও অহিংসার ।
ভুলিও না কভু, ভগবান তোমা
বিশাল ধরার পরে
পাঠায়নি হীন গোলামের সম
খাঁচায় বদ্ধ করে ।

উলঙ্গ হইয়া জনম লভিলি
সে অঙ্গে কেনরে শিকল পরিলি ?
রঙ্গের মোহে ভুলে হায় গেলি
এ মহা জীবন ভবে।
স্বাধীন হয়েই জনম লভেছ
স্বাধীনতা-ভোগ তরে।
অমৃতের সে যে পেয়েছে সন্ধান
সে কি চায় বিষ করিবারে পান ?
মুক্তির স্বাদ পেয়ে আমি আজ
বুঝিয়াছি ওরে স্থির—
অধীনতা-জ্বালা বিষেরই জ্বালা
ভীষণ শুষ্ক মরীচিকা মালা
জীবন দুগ্ধ দগ্ধ করিয়া
নষ্ট করে যে ক্ষীর।
হল্‌কা তাহার পলকে পলকে
চুষে নেয় রস ঝলকে ঝলকে
উগ্র আগুন তীব্র দাহনে
দেয় না তৃপ্তি-নীর !
এ বিষ ফেলিয়া পীযূষ লুটিয়া
নিয়ে যাও আজ বীর।
মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস
মুক্ত সাগর, ধরা,
তার মাঝে শুধু তুই কি রহিবি
খাঁচায় বন্ধ করা ?
আমি তো আগেই বিদ্রোহ করি
অসীমের বুকে উঠিয়াছি চড়ি
মহা শূন্যের বক্ষ মাঝারে
পক্ষ বিস্তারিয়া—

দূর গগনের নীলিমার কোলে
মিশিয়া যাইব গিয়া।
ভাঙ্গিয়াছে খাঁচা ভাঙ্গিয়াছে ঘর
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বাঁধনের ডর।
মানবের আর দয়ার উপব
করিতে হবেনা ভব।
নীচেতে সাগর, উপরে আকাশ
তার মাঝে আজ করিতেছি বাস
তাব মাঝে আজ বহিয়া বহিয়া
নাচিয়া উঠিছে হিয়া!
অসীমের সুখে যাহাব হৃদয়
ভবিয়া উঠেছে, তাবে কোন্ ভয়
তাবে আর কোন্ প্রলোভন পারে
বাধিবারে সামা দিনা?
ছাড়িয়া এমন সুখেব আকাশ
মুর্খ তোবাই ঘরে কব বাস,
ও অধীনতাব কারা-বন্দনায়
আর মোব কাজ নাই।
ক্ষুদ্র খাঁচায় বদ্ধ হইয়া
আর কি মরিতে চাই?
ওবে, যৌবন আজ ডাকিয়াছে মোবে
যাই। যাই।। ছুটে যাই।।!
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

(৮)

১৫ই পৌষ, সন ১৩২০ সাল · মঙ্গলবার, শুক্লপক্ষ—তৃতীয়া তিথি।

কয়েকদিন যাবৎ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দেখিবার জন্য মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু দেখিতে যাইবার কোন উপায় নাই, কাহাকে লইয়া যাই। মা যদি অধম সন্তানকে দয়া করিয়া দর্শন দেন তবেই দেখিব ইত্যাদি বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় ক—৩ বি—আসিয়া বলিল, "দিদি, তোমায় মা ডাক্‌ছেন।" এই কথা শুনিয়া আমার মনে হইল—অভীষ্ট সিদ্ধির বুঝি একটি পন্থা বাহির হইবে। কে যেন কানে কানে বলিয়া দিল—'ওরে মা ডেকেছেন।'

আমি শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া বি—দের বাড়ী গেলাম, তখন প্রাতঃকাল ৭টা হইবে। গিয়া দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমভক্ত ল—ও তাঁহার মা বসিয়া কথা বলিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই ল—র মা বলিয়া উঠিলেন, "এইতো বিনু এসেছে, মেয়ে আমার কি পাগল দেখ, অমনি ছুটে এসেছে।" ল—বলিল, "দিদি, আপনি নাকি শ্রীশ্রীমাকে দেখ্‌তে চেয়েছেন? যান তো, আমি আজ নিয়ে যেতে পারি।"

আমি—সে তোমার অনুগ্রহ।

ল—র মা বলিলেন, "সে কি গো? ছোট ভাইকে অনুগ্রহ বল্‌তে আছে?"

আমি বলিলাম, "তবে আর কি বলি বলুন, যদি ওদের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর না করবো তবে তো আমি অনেক আগেই মাকে দেখ্‌তে যেতে পারতুম্।"

যেন এই আনন্দের সংবাদ—সত্যি মাকে দেখ্‌তে যাব, সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, তাই ল—কে বলিলাম, "ভাই সত্যি বল, যাবে কি না? যদি যাও তো গাড়ী নিয়ে এস।" এই সময় আমি ল—কে

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, মাকে তুমি দেখেছ?" আমার এই কথায় ল—আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিল, "দিদি, আমি মাকে একবার দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, আহা। মায়ের কি দয়া, কি স্নেহ, আমায় কি খাওয়াবেন, কোথায় বসাবেন ঠিক পান না। মায়ের কি অপূর্ব্ব স্নেহ, দিদি তোমায় কি বল্‌বো। মা আবার আমায় যেতে বলেছেন।"

ল—গাড়ী আনিতে চলিয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল, "আমি গাড়ী আন্‌তে যাচ্ছি, তোমরা প্রস্তুত হয়ে থেকো।"

আমি, ল—র মা, ও তাহার ভগ্নীগণ মাকে দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গে পাঁচু গেল।

পা—বলিল, "দিদি তুমি সত্যি জানতো শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে আছেন?" আমি তাহার এই কথা শুনিয়া চমকিত হইলাম—মা আছেন কি না তাতো ঠিক জানি না। প্রাণ মহা শঙ্কিত হইয়া উঠিল, মনে মনে ঠাকুরকে বলিতে লাগিলাম, 'হে ঠাকুর, আমায় নিরাশ করো না।' বেলা ১০টার সময় গাড়ী 'উদ্বোধন আফিসের' সম্মুখে আসিয়া লাগিল। ইচ্ছা হইল—ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করি, মা আছেন কি না? গাড়ী থামিতেই আমি দ্রুত নামিয়া গেলাম। সম্মুখে 'উদ্বোধন আফিস' মহারাজগণ কাজ করিতেছেন, সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপ নাই, আমার তখন জগৎ শূন্যময় বোধ হইতেছে, যদি এখনই শুনি মা এখানে নাই, তবে আমি কি করিব ভাবিয়া যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি। সম্মুখে যাঁহাকে দেখিতেছি তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, "ওগো মা আছেন?" আমার কথা শুনিয়া মহারাজগণ মস্তক অবনত করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, কেহই কোনও উত্তর দিতেছেন না। ইতিমধ্যে ল—গাড়ী হইতে নামিয়া উপরে চলিয়া গেল দেখিয়া আমিও উহার পিছনে খানিক দূর গিয়াছি এমন সময় ল—ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মা আছেন।" আমার প্রাণের ভিতর হইতে একটা ভয়ানক দুশ্চিন্তা সরিয়া গেল, আমি তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সম্মুখের ঘর ডান দিকে রাখিয়া আমি বাঁ দিকের বারাণ্ডা দিয়া চলিলাম, সম্মুখে দেখিলাম একটি স্ত্রীলোক অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে দাঁড়াইয়া আছেন। দুই তিনটি

পুরুষভক্ত তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া আমি বুঝিলাম ইনিই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, যাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। আমি যে তখন কি করিয়াছি মনে নাই। আমাকে দেখিয়াই ভক্তগণ চলিয়া গেলেন, আমি তখন ছুটিয়া গিয়া মায়ের পা দুটি ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হ'তে এসেছ, কেন এসেছ?"

আমি—কেন এসেছি তা জানি না মা, আপনি এনেছেন তাই এসেছি।

এমন সময় ল—র মা প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, খানিক দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ইনিই কি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী?"

আমি—হাঁ।

তখন সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এইবার শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার ঘরে উপস্থিত হইলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলাম। মা সম্মুখের তক্তাপোষের উপর বসিয়া আমাদের বলিলেন, "বস মা বস।" আমরা তাঁহার পদতলে বসিলাম। ল—র মা সংসারী লোক, মা তাঁহার সহিত সংসারীর ন্যায় কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

ল—র মা বলিলেন, "মা, আমাদের ঠাকুরের কথা কিছু বলুন, আমরা সংসারী লোক আমাদের কিছু উপদেশ দিন।"

মা—আমি কিছুই জানি না মা, ঠাকুরের মুখে যা শুনেছি, তা মা ঠাকুরের কথামৃত পড়ো তাতেই সব উপদেশ পাবে।

নীচে গাড়ী ভাড়া মিটাইয়া ল—উপরে আসিয়াই একেবারে মায়ের শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িল এবং নিতান্ত আর্ত্তস্বরে দর্শকবৃন্দকে আকুলিত করিয়া অজস্র অশ্রুধারায় ভাসিয়া মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিল, "মা দয়াময়ি গো, দয়া করুন। মাগো, আপনি এই জগৎ উদ্ধার কর্‌তে এসেছেন, আমাকেও টেনে নিন্ মা। আমি আপনার চরণ ছাড়বো না, আমাকে পায়ে স্থান দিতেই হবে"—বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মা স্থির নিশ্চল প্রতিমার ন্যায়

দাঁড়াইয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "অমন করো না বাবা, ওঠ।"

ল—১৫।১৬ বৎসরের বালক মাত্র, যে মহাশক্তি বালকের ছদ্মবেশে আবরিত হইয়া নামরূপ উপাধি ধারণ করিয়াছে যেন সেই মহাশক্তি এখন বিকাশোন্মুখ। দিব্য শ্যামবর্ণ সুগঠন তাহার চেহারা, চক্ষু দুটি ভক্তিরসে সর্ব্বদা ঢুলু ঢুলু, ভিতরে ভগবদ্ভক্তিরূপ সুধাস্রোত প্রবাহিত যেন কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ, বাহিরেও সেই অনুরাগ প্রতিভাত হইতেছে। "আমায় শ্রীচরণে স্থান দিন মা, বলুন, না হলে আমি উঠ্‌বো না, বলুন আমায় নিয়েছেন,"—বলিয়া ল—আবার কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় সহসা একটি ঘিয়ের ভাঁড়ে পা ঠেকিয়া যাওয়ায় সে অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং বলিতে লাগিল, "আমি একি কর্‌লুম, কেউ ভক্তি করে মাকে ঘি দিয়েছে, আমার তাতে পা লেগে গেল, ছি! ছি! আমি একি করেছি"—বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই সময় ঠাকুরঘরে মস্তকের ঊর্দ্ধভাগে চুল বাঁধিয়া এক গৌরবর্ণা বিধবা ব্রাহ্মণী ঠাকুরের পূজায় নিবিষ্টা ছিলেন। তিনি বলিলেন, "বাবা তুমি মনে কোন দুঃখ করো না, পা লেগেছে তা আর কি কর্‌বে? পা তো আর সৃষ্টি ছাড়া নয়, এ সৃষ্টির ভিতরে পা দুটোও যে আছে, পা শরীরেরই একটা অংশ।" আমরা তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার সৌম্য মুখমণ্ডল ও সরল উদার কথাগুলি আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। ল—তাঁহার কথায় যেন অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিল এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া মাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।" "ঠাকুর তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন"—বলিয়া মা তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তার পর ল—নীচে চলিয়া গেল।

একটি ষোল সতের বছরের মেয়ের হাত ধরিয়া একটি প্রৌঢ় বয়স্ক ভদ্রলোক এই সময়ে দোরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাকে বলিলেন, "মা এটি আমার মেয়ে, এর একটি মেয়ে হয়েছিল, আজ প্রাতে সেটি মারা গিয়েছে, এ বড়ই শোক বিহ্বলা, তাই আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, সান্ত্বনা পাবে বলে"—শুনিয়া আমরা সকলে

*

চমকিত হইয়া উঠিলাম। মা বলিলেন, "এস মা এস।" মেয়েটি ঘরের মধ্যে আসিয়া মায়ের কাছে বসিল এবং পদধূলি লইবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিল। মা ঈষৎ সরিয়া গিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা, আমায় ছোঁবে কি? এর যে অশৌচ হয়েছে?" এই কথা শুনিয়া মেয়েটির মুখখানি আরও মলিন হইয়া গেল; সে অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিল। মা তাহার মুখ-পানে চাহিয়া বলিলেন, "আহা বাছারে! বড় কষ্ট পেয়ে আমার কাছে এসেছ সান্ত্বনা পাবে বলে, আমি তোমার মনে কি কষ্ট দিলুম। আহা! আয় আয়, আমার কাছে আয়, কর মা, প্রণাম কর"—বলিয়া মেয়েটির আরও কাছে সরিয়া বসিলেন। সে তখন অশ্রুজলে ভাসিয়া মায়ের শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, মাও তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মা মেয়েটির কাছে বসিয়া অত্যন্ত মিষ্টবাক্যে তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, "আমি তোমায় কি বল্‌বো মা, আমি তো কিছুই জানি না। একখানি ঠাকুরের ফটো নিজের কাছে রেখো, আর জানবে তিনি সত্য—ঠাকুর তোমার কাছে রয়েছেন। তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে মনের দুঃখ জানাবে, ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলো—ঠাকুর, আমায় তোমার দিকে নাও, আমায় শান্তি দাও। এরকম করতে করতে তোমার প্রাণে শান্তি আপনি আস্‌বে। ঠাকুরে ভক্তি রেখো, যখনই কষ্ট হবে ঠাকুরকে জানিও।" তার পর আমাদের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন, "আহা! আজই শোক পেয়েছে, আজ কি স্থির হতে পারে?" মেয়েটির পিতা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিলেন, পিতা-পুত্রী উভয়ে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক দুঃখ নিবেদন করিয়া শান্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

এখন ঘর নীরব দেখিয়া আমি বলিলাম, "মা আমার একটি কথা আছে। যদি আপনি আমার অপরাধ না নেন, মনে কিছু না করেন তবে বলি।" আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, সেই সেবা-নিরতা সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণীটি (পরে জানিলাম তিনি পূজনীয়া গোলাপ মা) কহিলেন, "বল মা বল, তোমার মনের কথা নিঃসঙ্কোচে মায়ের কাছে বল, মার কাছে লজ্জা কি?" তখন আমি বলিলাম, "মা, কথা আর

কিছু নয়, আমি স্বপ্নে ঠাকুরকে ও আপনাকে দেখেছিলাম, যেন আপনি আমায় মন্ত্র দিচ্ছেন কিন্তু তা সম্পূর্ণ হয়নি। সেই থেকে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় নেবার জন্য আমি বড় ব্যাকুল হয়েছি।" মা প্রসন্ন-মুখে বলিলেন, "বেশ তো, আমি আজ তোমায় দীক্ষা দিব, কিন্তু তোমার স্বামীর মত আছে তো?"

আমি—আমার স্বামীকে আমি একথা বলেছিলুম, তিনি বলেছেন, "আমার অমত নাই, আমি এখন দীক্ষা নেব না, তুমি নিতে পার।"

মা—তোমার স্বামী কোথায়?

আমি—বায়পুরে।

মা কলের ঘর দেখাইয়া বলিলেন, "ওখান হতে হাত পা ধুয়ে এস।"

আমি—মা, আমি এখনো স্নান করিনি।

মা—তা হোক্, স্নান করতে হবে না।

আমি কলঘর হইতে হাত পা ধুইয়া মায়ের নিকট ঠাকুর ঘরে গিয়া দেখি, মা দুখানা আসন পাতিয়াছেন, সাম্‌নে কোশাকুশীতে গঙ্গা জল লইয়া নিজে ঠাকুরের পানে মুখ করিয়া বসিলেন। তাঁহার বাম হাতের নিকট আসনে আমাকে বসিতে বলিলেন, কোশা হইতে গঙ্গাজল লইয়া মা আচমন করিলেন এবং আমায় সেইরূপ করাইলেন পরে বলিলেন, "কোন্ দেবতায় তোমার ভক্তি?" আমি বলিলে, তিনি আমায় দীক্ষা দিয়া কিরূপে জপ করিব দেখাইয়া দিলেন। সেই মুহূর্ত্তে একটা পরমানন্দের প্রবাহ হৃদয় মধ্যে বহিয়া গেল, ভিতরে বাহিরে বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিয়া আমায় অভিভূত করিয়া ফেলিল; আমি কিছুই জানি না মা সব শিখাইয়া দিলেন। দীক্ষান্তে মা বলিলেন, "দক্ষিণা দাও।"

আমি—মা, আমি তো কিছুই জানি না, আপনি বলে দিন আমি কি করবো, আমি তো কিছুই আনি নাই।

মা তখন উঠিয়া গিয়া ফুল, কমলালেবু, কুল প্রভৃতি দুই হাতে অঞ্জলি করিয়া আনিয়া আমার হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "বল—আমার পূর্ব্বজন্মের, ইহজন্মের জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ যাহা কিছু পাপ, পুণ্য করিয়াছি

তাহা তোমাকে সমর্পণ করিলাম।" আমিও তাই বলিলাম, মা হাত পাতিয়া ফল ফুল গ্রহণ করিলেন।

মাগো। এই দীন হীন কাঙ্গাল অধমের উপর একি অহৈতুকী দয়া তোমার? আমার প্রাণ মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, একি দেখিলাম? একি শুনিলাম? এমন কেহ কখনও দেখিয়াছে কি, না কেহ কখনো শুনিয়াছে? এমন কথা জগতে শুনিবেই বা কি করিয়া—আমার মত কাঙ্গাল কেহ নাই তো? যিনি এই কাঙ্গালকে উদ্ধার করিতে পারেন তিনি দীননাথ অনাথ-শরণ পতিত-পাবন দীনবন্ধু। আমি কায়-মন-প্রাণ মায়ের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া আজ ধন্য হইলাম। আমি কি দিলাম? মায়ের আমি, মা ডেকে নিলেন। মাকে প্রণাম করিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া আবিষ্টের ন্যায় ঘণ্টা খানেক রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সময় ঘরে একটি বালিকার চীৎকার কোলাহল আর মায়ের কথা শুনিয়া ঘরের ভিতর গেলাম। আমাকে দেখিয়া মা বলিলেন, "বস মা বস।" আমি বসিলে মা বলিলেন, "এটি আমার ভাইঝি, নাম রাধারাণী। ওর মা পাগল হতে আমিই ওকে মানুষ করি।" মা তাহাকে ধরিয়াছিলেন কিন্তু সে অস্থির হইয়া পলাবার চেষ্টা করিতেছিল। মা তাহাকে কত রকম বোঝাচ্ছিলেন। তাঁহার চুল বাঁধিয়া দিলেন তাহাকে কাপড় পরাইলেন, নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন আর কতই স্নেহপূর্ণ কথা বলিতে লাগিলেন। আমি শ্রীশ্রীমার এই প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। এই সময় আমায় গঙ্গাস্নান করিবার জন্য ডাকায় আমি উঠিয়া গেলাম। স্নানের পর ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মা ঠাকুরের ভোগ দিচ্ছেন। ঠাকুর ঘর হইতে আসিয়া তিনি ঠাকুরের ভোগের ঘরে গেলেন, সেখানে ভোগ সজ্জিত রহিয়াছে; পরে সেই ঘরের দোর বন্ধ করিয়া আমাদের ঘরে আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজগণ আহারে বসিলেন, গোলাপ মা পরিবেশন করিতেছেন, মা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে দোরের কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের খাওয়া দেখিতেছেন। আহার শেষ হইলে মহারাজগণ চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের ভোগের থালা মায়ের জন্য মায়ের ঘরে আনা হইল এবং আমরা

যে কয়েকটি স্ত্রীলোক আছি আর পাঁচু (পাঁচবৎসরের একটি বালক যে আমার সঙ্গে আসিয়াছিল) এই কয়জনের জন্য সেই ঘরে জায়গা হইল। শ্রীশ্রীমা, এবং আমরা সকলেই আহারে বসিলাম। আমার ইচ্ছা মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিব, তাই চুপ করিয়া বসিয়া আছি। সকলে ভাত মাখিয়া লইলেন, আমি হাতও দিলাম না। মা দুই তিন বার বলিলেন, "খাও খাও।" এমন সময় গোলাপ মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে গা?" তাঁহাকে বলিলাম, "আমায় দুটি প্রসাদ দিন।" মা তখন ভাত মাখিয়া অল্প দুটি খাইয়া আমার পাতে তুলিয়া দিলেন। আহা! কি অমৃতই খেলাম সে দিন, কি বল্‌বো? অড়হরের ডাল, কপির চচ্চড়ি, চাল্‌তের অম্বল, আর গোলাপ মা মাছ রেঁধেছিলেন ভারী সুন্দর হয়েছিল। পাঁচু তো "আরো চচ্চড়ি খাব"—বলিয়া গোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাকে চুপে চুপে ধম্‌কাইলেও শুনে না। এ সময় গোলাপ মা আবার আসিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে, অমন কচ্ছে কেন ছেলেটি?"

আমি বলিলাম, "ওকে আনতে চাইনি মা, আমি লুকিয়ে আসছিলুম, গাড়ী যেই কিছুদূর গিয়েছে, ও রাস্তায় খেলা কর্‌ছিল অম্‌নি ছুটে এসে গাড়ীতে উঠ্‌লো, আর এখন আরও চচ্চড়ি খাব বলে গোলমাল কচ্ছে।" এই কথা শুনিয়া মা, গোলাপ মা, সকলে হাসিতে লাগিলেন। গোলাপ মা বলিলেন, "তুমি ওকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে—পার্‌বে কেন? ওর সুকৃতি ছিল, তাই মাকে দেখতে পেলে, একি কম ভাগ্য গা? ওর ভাল হবে।" মাও, "হাঁ, তাই তো"—বলিয়া 'সায়' দিলেন।

আহারের পর আমি সারাদিন মায়ের কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার বায়পুর যাইবার কথা ছিল, সে দূরদেশ আর শীঘ্র যদি মাকে না দেখিতে পাই সেই আশঙ্কায়, পা—ও ক—আমায় ডেকেছিল তবুও আমি গেলুম না। ছাদে মা চুল শুকাইতে ছিলেন, শীতকাল তাই রোদে বসিয়াছেন আর আমার কাছে বাপের বাড়ীর গল্প করিতেছেন, "রাধুকে মানুষ কর্‌লুম, সেটি পাগল, খাইয়ে না দিলে খায় না; আর

আমারও শরীর ভাল নয় মা, বাতের বেদনায় কষ্ট পাচ্ছি এই অসুখের জন্য কাশী বৃন্দাবন গেলুম, কিন্তু কিছুই হল না।"

আমি—কাশী বৃন্দাবন গিয়েছিলেন ?

মা—কি করে বল্‌বো !

একথা সেকথার পর মা বলিলেন, "তোমার এই অল্প বয়স, ছেলে মানুষ তুমি, তোমার এ সময়ে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা কেন হলো ?"

আমি—কি জানি মা, সংসার আমার ভাল লাগে না। প্রাণ যেন সংসার চায় না, প্রাণে বড়ই অশান্তি ছিল আজ আমি শান্তি লাভ করেছি। আর এ সংসারও অনিত্য দুদিনের জন্য, দেখ্‌ছি সবই মিথ্যা, কি করে তাতেই বা মন বস্‌বে মা ?

এই সময় মায়ের সম বয়সী একটি স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার নিকট বসিলেন। আমি মার খুব কাছে বসিয়াছিলাম, তাঁহার ছায়া আমার গায়ে পড়িয়াছে দেখিয়া উক্ত স্ত্রীলোকটি আমায় ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তুমি কেমন মেয়ে গা, মায়ের ছায়ার উপর বসেছ ? পাপ হবে যে, সরে বস।" আমি ইহা জানিতাম না। মা যে আপন হইতেও আপনার তাই একবারে কাছে বসিয়াছিলাম, এখন একটু অপ্রতিভ হইয়া সরিয়া বসিলাম। উক্ত স্ত্রীলোকটি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কে ?"

মা—একটি মেয়ে, আজ দীক্ষা নিয়েছে, বড় ভক্তিমতী মেয়ে ওটি।

মায়ের এই কথায় আমি লজ্জিত হইয়া পাশের ঘরে পা—রা গল্প করিতেছিল সেখানে উঠিয়া গেলাম। এমন সময় ল—আসিয়া বলিল, "দিদি, চল গাড়ী প্রস্তুত, বেলা গিয়েছে।" আমি মায়ের নিকট বিদায় লইতে গেলাম।

মা বলিলেন, "আবার কবে আস্‌বে মা ?"

আমি—আপনি যেদিন মনে করে আনবেন সেই দিনই আস্‌বো ; আমার কোন সাধ্য নাই। মা, আশীর্ব্বাদ করুন। আমায় মনে রাখ্‌বেন মা।

মা—আবার এস মা !

আমি কাতর নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম; তিনি দুই খিলি পান আনিয়া আমায় দিলেন। আমি মায়ের পদতলে লুন্ঠিত হইয়া যেন আমাকে রাখিয়া দেহটি লইয়া বিদায় হইলাম। মাও সজল নয়নে সিঁড়িতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমার অন্তর বাহির আজ পরিপূর্ণ, গাড়ীতে বসিয়াও যেন তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। মায়ের কথা মা রক্ষা করাইয়াছিলেন, দুই বৎসর পরে রায়পুর হইতে ফিরিয়া মায়ের অসুখের সময় আবার তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম।

শ্রীমতী—

সাংখ্য-দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪৭

উক্ত ৫০ প্রকার ভেদের কথা বলা যাইতেছে।

পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ।

অষ্টাবিংশতিভেদা তুষ্টির্নবধাঽষ্টধা সিদ্ধিঃ॥

পাদপাঠ—পঞ্চবিপর্য্যয়ভেদা ভবন্তি অশক্তিঃ চ করণ বৈকল্যাৎ।

অষ্টাবিংশতি ভেদা তুষ্টিঃ নবধাঃ অষ্টধাঃ সিদ্ধিঃ॥

অন্বয়ঃ—বিপর্য্যয় ভেদাঃ পঞ্চ ভবন্তি। করণ বৈকল্যাৎ অশক্তিঃ চ অষ্টাবিংশতি ভেদা। তুষ্টিঃ নবধাঃ। সিদ্ধিঃ অষ্টধাঃ।

বিপর্য্যয় ভেদাঃ ভবন্তি পঞ্চ = বিপর্য্যয়ের ভেদ হইতেছে পঞ্চবিধ।

বিপর্য্যয় = মিথ্যা জ্ঞান।

করণ বৈকল্যাৎ = করণের বৈকল্য হইতে। করণের বৈকল্য = করণ বৈকল্য। বৈকল্য = বিকলতা, যথা চোখে ছানি পড়া।

অশক্তিঃ চ = অশক্তিও।

অষ্টাবিংশতি ভেদা = ২৮ প্রকারের ভেদ যাহার তাহা অষ্টাবিংশতি ভেদা। অশক্তির বিশেষণ।

তুষ্টিঃ নবধা = তুষ্টি ৯ প্রকার।

সিদ্ধিঃ অষ্টধাঃ = সিদ্ধি ৮ প্রকার

৫ বিপর্য্যয়, করণ বিকলতা হেতু ২৮ অশক্তি, ৯ তুষ্টি, ৮ সিদ্ধি। সর্ব্বসমেৎ (৫ + ২৮ + ৯ + ৮) পঞ্চাশৎ।

(৪৮, ৪৯, ৫০, কারিকা দ্রষ্টব্য।)

৪৮

বিপর্য্যয় ৫টি। তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্রঃ, অন্ধতামিস্রঃ। ইহারা সংজ্ঞা মাত্র। ইহাদের অন্য সংজ্ঞাও আছে। যথা তমঃ = অবিদ্যা, মোহ = অস্মিতা, মহামোহ = রাগ, তামিস্রঃ = দ্বেষ, অন্ধতামিস্রঃ = ভয়। এই পাঁচ বিপর্য্যয় বা মিথ্যা জ্ঞানের মূলে অবিদ্যা। অবিদ্যা যেন ক্ষেত্র, এবং অস্মিতাদি চতুষ্টয় ক্ষেত্রের ফসল। ৪৮ কারিকায় তমঃ এবং মোহের প্রত্যেকটিকে ৮ প্রকারে বা শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে; মহামোহকে ১০ এবং তামিস্রঃকে ১৮ এবং অন্ধতামিস্রঃকে ১৮ শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। শ্রেণী বিভাগ করিতে গেলে অনেক বিপদ ঘটে। যে যে ভাবে দেখে সে সেইভাবে শ্রেণী ভেদ করে। কেন যে এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা হইল তাহার উত্তর কারিকায় নাই।

এক বস্তুতে অন্য বস্তু জ্ঞানের নাম তমঃ। দুইটি বিভিন্ন বস্তুকে এক স্বরূপ জ্ঞানের নাম মোহ। রজ্জুতে সর্প জ্ঞান তমের উদাহরণ। চিত্ত এবং চৈতন্যের এক-স্বরূপতা জ্ঞান মোহের উদাহরণ। সুখকর ভোগ্য বিষয়ের জন্য লোলীভাব, তৃষ্ণা এবং লোভের নাম মহামোহ। দুঃখ এবং ভয় অনেকটা এক শ্রেণীর। যদ্দ্বারা দুঃখ ঘটে তাহা ভয়প্রদ। চাবুকে দুঃখ হয় বলিয়া চাবুক ভয়প্রদ। দুঃখকর বিষয়ে যে চিন্তাবস্থা হয় তাহাই তামিস্রঃ অন্ধতামিস্রঃ হইতেছে ভয়ের একটি সংজ্ঞা।

ভয় ১৮ প্রকার যথা ১ মৃত্যুভয়

১১, ইন্দ্রিয় হানিব ভয়, একাদশ ইন্দ্রিয়।

১, দেহ কষ্টের ভয়, যথা পিঠে চাবুক।

৫, বিষয় হানির ভয়, শব্দাদি পঞ্চ বিষয়।

১৮

যাহা হইতে ভয় হয় তাহাব প্রতি দ্বেষ বা তামিস্রঃ জন্মে; বাঘ দেখিলে ভয় হয় তাহাব প্রতি দ্বেষ হয় অর্থাৎ বাঘকে মারিতে ইচ্ছা হয়। ভয় ১৮ প্রকাব অতএব দ্বেষ বা তামিস্রঃও ১৮ প্রকার।

সুখকব বিষয় জীব দশ বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বাবা ভোগ কবে এইজন্য মহামোহ বা রাগ ১০ প্রকার।

ত্রি-অঙ্গযুক্ত অন্তঃকবণের মন এক অঙ্গ। মনেব বৃত্তি ত্রিবিধ যথা সংস্কার এবং দ্বিবিধ সংকল্প। কর্ম্মেব মানস এক প্রকার সঙ্কল্প এবং আলোচন জ্ঞানকে সবিকল্প জ্ঞানে পবিণত কবা অন্য প্রকারের সঙ্কল্প। অহংকাবের বৃত্তি অহংতা ও মমতা ভেদে দ্বিবিধ। অহংকাবেব বৃত্তিব নাম অভিমান। বাহ্যবস্তু বহুবিধ, আমাব চৈতন্য এক। বহুবিধ বাহ্য বস্তুব সহিত একমাত্র চৈতন্যের সংযোগ বশতঃ বহুবিধ সংযোগ হইলেও উহাদিগের মধ্যে যে সাধাবণ ভাব থাকে অর্থাৎ বহু পুষ্প এক মাল্যরূপে যে সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ হয় সেই সূত্রই আমি বা অভিমান। দেহ সম্বন্ধে অর্থাৎ চৈতন্য যাহাকে আশ্রয় কবিয়া আছে সেই দেহ এবং দেহের অতিবিক্ত যে বাহ্য জগৎ আছে এই দুই বস্তুর সহিত চৈতন্যের দুই প্রকার সম্বন্ধ। এক প্রকারের সম্বন্ধের নাম অহংতা অন্য প্রকারের নাম মমতা। উভয় সম্বন্ধেব সাধারণ নাম অভিমান যাহা অহংকারের লক্ষণ। বুদ্ধির বৃত্তির নাম অধ্যবসায়। আত্মা ও বুদ্ধির এক-স্বরূপতা জ্ঞান যত ভ্রমের আকর। এই ভ্রমের নাম অস্মিতা। কখন বুদ্ধির সহিত কখন অহংকারেব সহিত চৈতন্য অভিন্ন হয় বলিয়া মোহ অষ্টবিধ।

যথা—১ অস্মিতা।

১ অধ্যবসায়।

১ অহংতা।

১ মমতা।

২ মনের সংকল্প।

১ মনের সংস্কার।

১ আলোচন বা বাহ্যকরণের কার্য্য।

—

৮

তমঃ ৮ প্রকার। একটিকে আর একটি বলিয়া জানা। অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, এবং ভয় আমারা এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া মনে করি। তমের এই হইল চারি ভাগ বা প্রকার। অপর চারি প্রকার কি? অপর চারি প্রকার হইতেছে যথা—

(১) অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করা,

(২) অশুচিকে শুচি জ্ঞান করা,

(৩) দুঃখকে সুখ জ্ঞান করা,

(৪) অনাত্মকে আত্ম জ্ঞান করা,

প্রথমের দৃষ্টান্ত—চন্দ্র সূর্য্যকে নিত্য জ্ঞান করা,

দ্বিতীয়ের দৃষ্টান্ত—প্রেমাস্পদের থুথুকে সুধামৃত জ্ঞান করা,

তৃতীয়ের দৃষ্টান্ত—গরমকালে রাজদরবারী পোষাকে গৌরব বোধ করা,

চতুর্থের দৃষ্টান্ত—দেহকে আপন জ্ঞান করা।

ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ।

তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ॥

পদপাঠ—ভেদঃ তমসঃ অষ্টবিধঃ মোহস্য চ দশবিধঃ মহামোহঃ।

তামিস্রঃ অষ্টাদশধা তথা ভবতি অন্ধতামিস্রঃ॥

অন্বয়ঃ—তমসঃ মোহস্য চ অষ্টবিধঃ ভেদঃ। মহামোহঃ দশবিধঃ।

তামিস্রঃ তথা অন্ধতামিস্রঃ অষ্টাদশধা ভবতি॥

তথা = সেই সঙ্গে। অষ্টাদশধা = অষ্টাদশবিধ, ১৮ প্রকারের।

অর্থ :—তমের এবং মোহের উভয়েরই ৮ রকম ভেদ। তামিস্রঃ এবং (তথা) সেই সঙ্গে অন্ধতামিস্রের ১৮ রকম ভেদ। এ ভেদ উভয়েরই। মহামোহ ১০ রকমের।

৪৯

একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টা।
সপ্তদশ বধা বুদ্ধের্বিপর্য্যয়াত্তুষ্টিসিদ্ধীনাম্॥

পদপাঠ—একাদশ ইন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈঃ অশক্তিঃ উদ্দিষ্টা।
সপ্তদশবধাঃ বুদ্ধেঃ বিপর্য্যয়াৎ তুষ্টি সিদ্ধীনাম্॥

অন্বয় :—বুদ্ধিবধৈঃ সহ একাদশেন্দ্রিয় বধাঃ অশক্তি উদ্দিষ্টা।
তুষ্টি সিদ্ধীনাম্ বিপর্য্যয়াৎ বুদ্ধেঃ বধাঃ সপ্তদশ॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অশক্তি ২৮ প্রকার। বধাঃ বধ শব্দের অর্থে বিঘাত, ব্যাঘাত, হানি, প্রতিবন্ধ। ইন্দ্রিয় সকলের হানি এবং বুদ্ধির হানিকে অশক্তি বলে। বধিরতা এক প্রকার ইন্দ্রিয়বধ, ইহা শ্রবণশক্তির অভাব। বধিরতা অন্ধতা জ্ঞানার্জ্জনের অনুকূল নহে। যাহা জ্ঞানার্জ্জনের প্রতিকূল বা শত্রু তাহাকে অশক্তি বলা যায়। তুষ্টি ও সিদ্ধি বুদ্ধিবরূপ। সিদ্ধি যথা জ্ঞানের অনুকূল হইতেছে অধ্যায়ন। অধ্যয়নের বিপর্য্যয় বা অভাব বুদ্ধি হানিকর; অতএব সিদ্ধির অভাব বুদ্ধিবধ নামে অশক্তি বলিয়া কথিত। তুষ্টিও বধিরতার ন্যায় জ্ঞানের প্রতিকূল। যথেষ্ট অধ্যয়ন করিয়াছি, ইহাতেই লোকে পণ্ডিত বলিবে আর অধিক অধ্যয়নের আবশ্যক নাই এইরূপ ভাবের নাম তুষ্টি। ৮ প্রকার সিদ্ধি আছে। ৮ প্রকার সিদ্ধির অভাবকে বুদ্ধিবধ বলা যায়। ৯ প্রকার তুষ্টিও জ্ঞানের অনুকূল নহে বলিয়া বুদ্ধিবধ নামে আখ্যাত। ৮ এবং ৯ সর্ব্বসমেত ১৭ বুদ্ধিবধ। জ্ঞানেন্দ্রিয় বধ হইলে জ্ঞানে অশক্তি হয়। এইজন্য বধকে অশক্তি বলে। বধিরতা হইলে শব্দ জ্ঞানে অশক্তি হয়।

বুদ্ধিবধৈঃ সহ = বুদ্ধির অসামর্থ্য, যে অপূর্ণতা, তাহা বুদ্ধিবধ। বুদ্ধির অসা[illegible]রূপ বধের সহিত। সহযোগে তৃতীয়া।

একাদশ ইন্দ্রিয় বধাঃ—যথা বধিরতা, কুষ্ঠ, অন্ধতা, জড়তা, অজিঘ্রতা, মূকত্ব কৌণ্য, পঙ্গুতা ইত্যাদি . . এবং মন্দতা (মনের দোষ)।

বুদ্ধিবধ এবং ১১ ইন্দ্রিয় বধকে কি বলে ? অশক্তিঃ উদ্দিষ্টা, ইহারা অশক্তি বলিয়া উদ্দিষ্ট বা কথিত।

তুষ্টি = নববিধ তুষ্টি (৪ আধ্যাত্মিক এবং ৫ বাহ্য তুষ্টি) ৫০ কারিকা দ্রষ্টব্য।

(এবং) সিদ্ধীনাম্ বিপর্য্যয়াৎ = সিদ্ধির অভাব হইতে, ৮ সিদ্ধির বিপর্য্যয় হইতে।

বুদ্ধেঃ বধাঃ = বুদ্ধির বধ (ভবন্তি উহ্য) হইতেছে।

সপ্তদশ = ১৭ প্রকার।

অর্থ—৮ তুষ্টি

৯ সিদ্ধি বিপর্য্যয়

১৭ বুদ্ধিবধ

১১ ইন্দ্রিয়বধ

২৮ অশক্তি।

বুদ্ধিবধ ১৭ প্রকার—যথা ৮ তুষ্টি এবং ৯ সিদ্ধি বিপর্য্যয়।

ইন্দ্রিয়বধ, ১১ ইন্দ্রিয়ের ১১ হানি বশতঃ ১১ প্রকার। ১৭ বুদ্ধিবধ, ১১ ইন্দ্রিয়বধ, মোট ২৮ বধকে অশক্তি বলে।

৫০

৫০ কারিকায় তুষ্টির বিষয় বলা হইয়াছে।

আধ্যাত্মিকাশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।

বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ॥

পদপাঠ—আধ্যাত্মিকাঃ চতস্রঃ প্রকৃতি-উপাদান-কাল-ভাগ্য-আখ্যাঃ।

বাহ্যাঃ বিষয়-উপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়ঃ অভিমতাঃ॥

অন্বয় :—কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবে না।

আধ্যাত্মিকাঃ = আত্মবিষয়ে (তুষ্টি)।

চতস্রঃ = চারি প্রকার।

"প্রকৃতির অতিরিক্ত আত্মা আছে ইহা (প্রতিপাদ্য) অবগত হইয়া

যে ব্যক্তি অসাধু উপদেশে তুষ্ট হইয়া শ্রবণ মননাদির দ্বারা বিবেক সাক্ষাৎকারের জন্য প্রযত্ন করেন না সেই ব্যক্তির চতুর্ব্বিধ আধ্যাত্মিক তুষ্টি হয় (বাচস্পতিমিশ্র)। আধ্যাত্মিক তুষ্টি চতুষ্টয় কি কি ?

প্রকৃত্যুপাদান কাল ভাগ্যাখ্যাঃ—প্রকৃতি উপাদান কাল এবং ভাগ্য আখ্যা বা সংজ্ঞা যাহাদের তাহারা।

প্রকৃতি তুষ্টি, উপাদান তুষ্টি, কাল তুষ্টি, এই চতুর্ব্বিধ তুষ্টির নাম আধ্যাত্মিক তুষ্টি।

সহজ সহজ কাজ করিব অথচ কোন শ্রম করিব না আর বলিব সহজ কাজেই হইবে, শ্রমের কাজের দরকার নাই, উদ্যমের দরকার নাই, ইহাই হইল তুষ্টি। তুষ্টি অর্থ— এতেই হইবে আর দরকার নাই।

প্রকৃতিই অপবর্গ নিষ্পন্ন করেন, অতএব ধ্যান অনুশীলন নিরর্থক— এইরূপ ঠিক করিয়া যিনি নিশ্চেষ্ট তাঁহাকে প্রকৃতি তুষ্ট বলা যায়। কেহ বলেন, বিবেক খ্যাতি প্রকৃতির কর্ম্ম বটে, কিন্তু বিবেক খ্যাতির জন্য প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা ঠিক নয়। উহার জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ আবশ্যক। প্রব্রজ্যায় দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিতে হয়। যিনি ধ্যান অনুশীলন না করিয়া প্রব্রজ্যা তুষ্ট তাঁহাকে উপাদান তুষ্ট বলা যায়। কেহ বলেন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেই সদ্য সদ্য বিবেক আসিবে, তাহা নহে। বিবেকের জন্য কালের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। কাল মুখাপেক্ষী যে তুষ্টি তাহার নাম কালতুষ্টি। কেহ কেহ বলেন, ভাগ্যে না থাকিলে কোন কালেও বিবেক হইবে না, বিবেকের জন্য প্রযত্ন নিরর্থক, ভাগ্যে যদি থাকে বিবেক অদ্য হইতে পারে, ভাগ্যে যদি না থাকে তবে কোনও কালেও বিবেক হইবে না। ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া যে নিশ্চেষ্টতার তুষ্টি তাহার নাম ভাগ্যতুষ্টি।

উপরম = যদ্দ্বারা উপরত বা উদাসীন হয় তাহাকে উপরম বলে— বৈরাগ্য।

বিষয় = শব্দাদি পঞ্চ ভোগ্য বিষয়।

বাহ্যাঃ = বাহ্য তুষ্টিসমূহ।

পঞ্চ = পঞ্চবিধ।

বিষয়োপরমাৎ বাহ্যাঃ পঞ্চ = বিষয় বৈরাগ্য হইতে যে সব তুষ্টি হয় তাহাদিগকে বাহ্য তুষ্টি বলে। বাহ্য তুষ্টি পঞ্চবিধ।

মহদাদি অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া জানেন এইরূপ ব্যক্তির বিষয়-বৈরাগ্য হইলে যে তুষ্টি হয় তাহাকে বাহ্য তুষ্টি বলে। শব্দাদি বিষয় ৫ প্রকার, উহা হইতে উপরমও ৫ প্রকার। বিষয় উপার্জ্জনে, বিষয় রক্ষায় বিষয় ক্ষয়ে, বিষয় উপভোগে এবং বিষয় ভোগের সহচর পীড়নে যে সমুদয় দুঃখ এবং দোষ দৃষ্ট হয় তাহা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উপরমকে পঞ্চবিধ বলা যায়।

(১) ধনোপার্জ্জনের উপায় সকল দুঃখকর (২) উপার্জ্জিত ধন দস্যু অগ্নি, জল-প্লাবনাদি হইতে বিনষ্ট হয় সুতরাং উহার রক্ষা করা কষ্টকর, (৩) কষ্টে উপার্জ্জিত ধন উপভোগে ক্ষয় হয়, এবং ক্ষয়ের চিন্তা কষ্টকর, (৪) ভোগে তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে উপভোগ্য বিষয়ের অভাবে বিষয় লোলুপের দুঃখ হয়, (৫) প্রাণিগণের পীড়ন না করিয়া বিষয়ের উপভোগ সম্ভব হয় না, সুতরাং উপভোগে হিংসা জনিত দুঃখ হয়। যাহা দুঃখকর তাহা দোষযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ দোষ চিন্তা করিতে করিতে যে বৈরাগ্য হয় তাহাকে বাহ্যতুষ্টি বলে। নববিধ তুষ্টি মোক্ষের অনুকূল নহে। অনেকের বিশ্বাস বৈরাগ্যেই অপবর্গ এবং ঐ বিশ্বাসে ধ্যান অনুশীলন না করিয়া প্রাগুক্ত বৈরাগ্যতুষ্ট থাকেন।

অর্থ :—তুষ্টি নয় প্রকার। তাহার মধ্যে ৪টি আধ্যাত্মিক এবং ৫ টি বাহ্য। আধ্যাত্মিক ৪টির নাম—প্রকৃতিতুষ্টি, উপাদানতুষ্টি, কালতুষ্টি এবং ভাগ্যতুষ্টি। উপার্জ্জনাদি দোষজাত ৫ তুষ্টির নাম বাহ্যতুষ্টি।

৫১

ঊহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখ বিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ॥

পদপাঠ—ঊহঃ শব্দঃ অধ্যয়নং দুঃখ বিঘাতাঃ ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তি।
দানম্ চ সিদ্ধয়োঃ অষ্টৌসিদ্ধেঃ পূর্ব্বঃ অঙ্কুশঃ ত্রিবিধঃ॥

অন্বয়ঃ—সিদ্ধয়ো অষ্টৌ শব্দঃ, অধ্যয়নং, ঊহঃ, সুহৃৎপ্রাপ্তি
দানম্ চ ত্রয়ঃ দুঃখ বিঘাতাঃ, সিদ্ধেঃ পূর্ব্বঃ ত্রিবিধঃ অঙ্কুশঃ।

সিদ্ধি অর্থ যাহা সাধন করিতে হইবে। পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহাই সিদ্ধি। ৮ সিদ্ধির মধ্যে তিন দুঃখবিঘাত মুখ্য প্রয়োজন, অপর ৫টি গৌণ প্রয়োজন।

শব্দঃ = শাস্ত্র শ্রবণ।

অধ্যয়নং = শাস্ত্র পাঠ।

উহঃ = মনন, বিচার (নিজে নিজে যুক্তি প্রয়োগে শ্রবণ ও পঠিত জ্ঞানের আলোচনা)।

সুহৃদ্প্রাপ্তি = জ্ঞানার্থী বন্ধু সহ তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য আলাপ, ইহাও মনন।

দান = (দৈধাতু) শোধন, ধ্যানের দ্বারা শ্রবণ মননজ জ্ঞানকে শোধন বা বিশুদ্ধ করা। দ্বিবিধ শ্রবণ দ্বিবিধ মনন এবং ধ্যান দ্বারা, এই পঞ্চ গৌণ সিদ্ধি দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখ বিঘাতাঃ সিদ্ধি ঘটিবে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, এবং আধিদৈবিক দুঃখের নিবৃত্তি হইবে।

সিদ্ধেঃ = সিদ্ধির পূর্ব্বঃ ত্রিবিধঃ = বিপর্য্যয়, অশক্তি তুষ্টি হইতেছে সিদ্ধির পূর্ব্ব ত্রিবিধ। বিপর্য্যয়াদি ৪ ভাবের প্রথম ত্রিবিধ ভাব। উহারা কি? অঙ্কুশ, প্রতিবন্ধক। বিপর্য্যয়, অশক্তি তুষ্টি সিদ্ধির প্রতিবন্ধক।

অর্থঃ—তত্ত্ব কথা শ্রবণ, তত্ত্ব কথা পাঠ, তত্ত্ব কথা স্বয়ং মনন, সুহৃদগণের সহিত মনন, ধ্যান এই পাঁচটি গৌণ সিদ্ধি। ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশ এই তিনটি মুখ্য সিদ্ধি। বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি এবং সিদ্ধির মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ বিপর্য্যয়, অশক্তি এবং তুষ্টি হইতেছে সিদ্ধির প্রতিবন্ধক। (একাগ্রমনে বহুক্ষণ ধরিয়া কোন বিষয় চিন্তন এবং মননের নাম ধ্যান)।

৫২

ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥

পদপাঠঃ—ন বিনা ভাবৈ লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাব নির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গ-আখ্যঃ ভাব আখ্যঃ তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥

অন্বয়ঃ—ভাবৈঃ বিনা ন লিঙ্গং, লিঙ্গেন বিনা না ভাব নির্বৃত্তিঃ।
তস্মাৎ লিঙ্গাখ্যঃ ভাবাখ্যঃ দ্বিবিধঃ সর্গঃ প্রবর্ত্ততে।

ভাবৈঃ বিনা ন লিঙ্গং = ভাব বিনা না সূক্ষ্ম শরীর = ভাব বিনা সূক্ষ্ম শরীরের কার্য্য হয় না। কেবল সূক্ষ্ম শরীর ধর্ম্মাদি ভিন্ন কোন ভোগ জন্মাইতে পারে না।

লিঙ্গেন বিনা ন ভাব নিবৃত্তি = সূক্ষ্ম শরীর যাহা পঞ্চ তন্মাত্র এবং ত্রয়োদশ করণের সমষ্টি, যাহার অপর নাম লিঙ্গ, সেই লিঙ্গ ব্যতীত (বিনা) ভাব নিবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ ধর্ম্মাদি ভাব নিষ্পন্ন হয় না। পুরুষের ভোগের জন্য উভয়ই আবশ্যক। তস্মাৎ = সেই নিমিত্ত। কি হয়? দ্বিবিধঃসর্গঃ প্রবর্ত্ততে = (বীজ এবং অঙ্কুরের ন্যায়) দুই রূপ সর্গ ঘটিয়া থাকে। উহার কি দুই রূপ? লিঙ্গ এবং ভাব, লিঙ্গ যাহার আখ্যা সে লিঙ্গাখ্য। ভাব যাহার আখ্যা সে ভাবাখ্য। লিঙ্গ এবং ভাব সহভাবী, লিঙ্গ শক্তি, ভাব শক্তির ব্যক্ত ভাব বা ক্রিয়া জনিত সংস্কার। চিত্র এবং কাগজের ন্যায় ভাব এবং লিঙ্গ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া আছে। সত্য বটে সমস্ত সৃষ্টি প্রকৃতি হইতে হয় কিন্তু ঐ সৃষ্টি দুই দিক হইতে দুরকম দৃষ্ট হয়। ভাবের দিক হইতে দেখিলে সৃষ্টি এক রকম দেখায়, আবার সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গের দিক হইতে দেখিলে ঐ সৃষ্টি আর এক রকম দেখায়। দেখার দিক হইতে সৃষ্টি দ্বিবিধ—লিঙ্গ সর্গ, ভাব সর্গ।

অর্থঃ—ধর্ম্মাদি ভাব বিনা লিঙ্গের কল্পনা হয় না। লিঙ্গ বিনা ধর্ম্মাদি, ভাব নিষ্পন্ন হয় না এই জন্য সৃষ্টি দ্বিবিধ, লিঙ্গ নামক সৃষ্টি, এবং ভাব নামক সৃষ্টি।

৫৩

অশেষ বিচিত্রতাময় প্রকৃতির সীমা সাধারণ মানুষের কল্পনায় আসে না, এই প্রকৃতির গর্ভে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, লক্ষ লক্ষ গ্রহ তারা বিচরণ করিতেছে। এই বিশাল প্রকৃতির গর্ভে বিভিন্ন মূর্ত্তির আবরণে লক্ষ লক্ষ জীব জীবনের খেলা করিতেছে। মূর্ত্তি সকল ইন্দ্রিয়-ভূমি এবং অবয়ব বিশিষ্ট। প্রত্যেক মূর্ত্তির অভ্যন্তরে আবার যত মূর্ত্তি তত সূক্ষ্ম শরীর বিরাজ করিতেছে। সূক্ষ্ম শরীর ভাব ও শক্তিময়। মাতা-পিতৃজ মূর্ত্তি সংক্ষেপতঃ চতুর্দ্দশ প্রকার।

অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্যাগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি ।

মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ ॥

পদপাঠ :—অষ্টবিকল্পঃ দৈবঃ তৈর্য্যাগ যোনঃ চ পঞ্চধা ভবতি ।

মানুষ্যঃ চ একবিধঃ সমাসতঃ ভৌতিকঃ সর্গ ॥

অন্বয়ঃ—দৈবঃ অষ্ট বিকল্পঃ, তৈর্য্যাগ্ যোনঃ চ পঞ্চধা,

মানুষ্যঃ একবিধ, সমাসতঃ ভৌতিক সর্গঃভবতি ।

সমস্ত শরীরই বিশ্লেষণ করিলে তন্মাত্র এবং ভাবে পরিণত হয়। মনুষ্যদেহ মাঝামাঝি অবস্থা, দৈব দেহ ভাব প্রধান, তৈর্য্যাগ্ দেহ তন্মাত্র প্রধান। ৮ বিধ ভাবের কোন একটির প্রাবল্য হেতু দৈব যোনি অষ্টবিধ। যে দৈবদেহে জ্ঞানের প্রাবল্য তাহার নাম ব্রাহ্ম। যে দৈব দেহে অজ্ঞানভাব প্রাবল্য তাহার নাম পৈশাচ। পঞ্চ তন্মাত্রের কোন একটির প্রাবল্য বশতঃ তৈর্য্যাগ দেহ পঞ্চবিধ। পশুর ঘ্রাণশক্তি, অন্যান্য তৈর্য্যাগ্‌জাতি অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর। তৃণজীব মৃগের শ্রবণ শক্তি, পক্ষীর দৃষ্টিশক্তি, কীটের (যথা কেন্নো) স্পর্শ শক্তি, উদ্ভিদের রস শক্তি প্রবল।

সমাসতঃ ভৌতিক সর্গঃ ভবতি=সংক্ষেপতঃ (ইহাই) দেহ সম্বন্ধীয় সৃষ্টি হইতেছে। পঞ্চভূত হইতে দেহ এবং প্রভূতের সৃষ্টি। ঘট, পট, চন্দ্র, সূর্য্যাদি প্রভূত। মাতা পিতৃজ দেহও ভৌতিক।

অষ্ট বিকল্প=অষ্টবিধ।

তির্য্যাগ্ যোনৌ ভব=তৈর্য্যাগ যোনঃ তির্য্যাগদেহ হইতে জাত, অর্থাৎ তির্য্যাগ্‌জাতি। পঞ্চধা=পাঁচ প্রকার। (মনুষ্য+ষ্ণ) মানুষ্য।

অর্থ :—দৈবজাতি ৮ প্রকার, তির্য্যাগ্ জাতি ৫ প্রকার, মনুষ্য জাতি ১ প্রকার সংক্ষেপতঃ ভৌতিক সর্গ ১৪ প্রকার।

৫৪

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।

মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ ॥

পদপাঠ—ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালঃ তমঃ বিশালঃ চ মূলতঃ সর্গঃ ।

মধ্যে রজঃ বিশালঃ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ ।

অন্বয় :—ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্তঃ (ভৌতিক সর্গঃ স্যাৎ)

ঊর্দ্ধং সত্ত্ব বিশালঃ, মূলতঃ তমো বিশালঃ মধ্যে রজো বিশাল সর্গঃ (স্যাৎ)

ঊর্দ্ধং = ঊর্দ্ধে, মূলতঃ (মূল + ৭মীতে তস্) মূলে বা নীচে। মধ্যে = মাঝখানে।

স্তম্ব = তির্য্যক জাতীয় উদ্ভিদের সর্ব্বনিম্ন যে তৃণ তাহার পত্র।

ব্রহ্ম = ব্রাহ্ম দেহধারী জাতি, দেবজাতি। সত্ত্ব যাহাতে বিশাল অর্থাৎ রজঃ তমঃ হইতে প্রবল যাহা তাহা সত্ত্ব বিশাল, সত্ত্ব প্রধান।

অর্থ :—দৈব ব্রহ্ম হইতে তৈর্য্যক তৃণ জাতি পর্য্যন্ত (ভৌতিক সর্গ বিস্তৃত) ১৪ সর্গ এই ভৌতিক সর্গের সর্ব্বোর্দ্ধে সত্ত্ব প্রধান ব্রহ্ম, সর্ব্ব নিম্নে তমঃ প্রধান তৃণ সর্গ। মধ্যে ইন্দ্র মনুষ্যাদি ১২ বিধ সর্গ রজঃ প্রধান। ঊর্দ্ধে জ্ঞানময় দৈব দেহধারী ব্রহ্মা, নিম্নে অজ্ঞান তির্য্যগ্ দেহধারীতৃণ, মধ্যে রাগযুক্ত ইন্দ্র, প্রজাপতি, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ রাক্ষস পিশাচ মানুষ পশু পক্ষী মৃগ সরীসৃপ এবং উচ্চজাতীয় উদ্ভিদ।

৫৫

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন॥

পদপাঠ—প্রথম ছত্রে সন্ধি নাই।

লিঙ্গস্য অবিনিবৃত্তেঃ তস্মাৎ দুঃখং স্বভাবেন।

অন্বয় :—তত্র জরা মরণ কৃতং দুঃখং লিঙ্গস্য অনিবৃত্তেঃ চেতনঃ পুরুষঃ প্রাপ্নোতি, তস্মাৎ দুঃখং স্বভাবেন।

প্রধান পদ—পুরুষঃ দুঃখং প্রাপ্নোতি—পুরুষ দুঃখ পায়। পুরুষ কিরূপ ?—চেতন।

কোথায় = তত্র, পূর্ব্বোক্ত দৈবাদি দেহে, পূর্ব্বোক্ত দেহ ধরিয়া কিরূপ দুঃখ পায় ?

জরা মরণ কৃতং দুঃখং = জরা মৃত্যুর ভয় হেতু যে দুঃখ। ব্যাধি শোক তাপ হেতু যে দুঃখ। কেন ? লিঙ্গস্য অনিবৃত্তেঃ = "লিঙ্গ শরীরস্য পুরুষাৎ

ভেদ অগ্রহাৎ।" লিঙ্গ শরীরের অনিবৃত্তি হেতু; লিঙ্গ শরীরের পুরুষ হইতে যে ভেদ তাহা না বুঝিবার নিমিত্ত।

তস্মাৎ = পূর্ব্বোক্ত কারণে, ভেদ বুঝিতে না পারার দরুণ। কি হয়? দুঃখং স্বভাবেন = দুঃখই যেন মামুলি বন্দোবস্ত ইহা মনে হয়।

অর্থ:—পুরুষ চেতন। শরীরে অবস্থিত হইয়া সে নানাবিধ দুঃখ পায়। এই দুঃখ প্রাপ্তির কারণ হইতেছে লিঙ্গ শরীর এবং চৈতন্যের অভেদ জ্ঞান। জরা মরণাদি দুঃখ চৈতন্যের ধর্ম্ম নহে। বুদ্ধির অবিবেকতা বশতঃ লিঙ্গ শরীরের সুখ দুঃখ মোহ পুরুষের উপরে পতিত হয়।

৫৬

ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহদাদিবিশেষভূতপর্য্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ॥

পদপাঠ—ইতি এষ প্রকৃতি কৃতঃ মহৎ-আদি বিশেষ ভূত পর্য্যন্তঃ।
প্রতি পুরুষ বিমোক্ষার্থং স্বার্থে ইব পরার্থে আরম্ভঃ॥

অন্বয়:—মহদাদি বিশেষ ভূত পর্য্যন্তঃ ইতি এষ আরম্ভঃ
প্রতি পুরুষ বিমোক্ষার্থং স্বার্থে ইব পরার্থে প্রকৃতিকৃতঃ॥

আরম্ভঃ প্রকৃতিকৃতঃ। আরম্ভ = চেষ্টা, সৃষ্টি, প্রকৃতিকৃতঃ = প্রকৃতির দ্বারা কৃত অন্য কাহারও দ্বারা কৃত নহে। আরম্ভ কি? মহদাদি বিশেষ ভূত পর্য্যন্তঃ = মহৎকে আদি করিয়া বিশেষ ভূত বা পঞ্চভূত পর্য্যন্ত যে সকল চেষ্টা। কি মহৎ, কি মন, কি চক্ষু, কি রূপ, কি ভৌতিক পদার্থ সমুদায়ই প্রকৃতির কার্য্য।

প্রকৃতির আরম্ভ কেন? প্রতি পুরুষ বিমোক্ষার্থঃ = প্রত্যেক পুরুষের বিমোক্ষ বা মুক্তির জন্য। এই আরম্ভ কিরূপে হয়?

"স্বার্থে ইব পরার্থে" = দেখিতে প্রকৃতির স্ব বা নিজ অর্থে প্রয়োজনবশতঃ বস্তুতঃ পরার্থে, পরের প্রয়োজন বশতঃ। পর = পুরুষ।

ইব = মতন। শুভাকাঙ্ক্ষী পাচক যখন পরিপাটি ভাবে রন্ধন করে মনে হয় যেন সে নিজের জন্যই রন্ধন করিতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ সে প্রভুর প্রয়োজন বশতঃ রন্ধন করে।

অর্থ:—মহৎ হইতে পঞ্চভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতির যে বিকাশ তাহা

প্রত্যেক পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত। প্রকৃতির চেষ্টা নিজের হইলেও ইহা পর বা পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য ঘটিয়া থাকে।

৫৭

বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষ-বিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥

পদপাঠ—বৎসবিবৃদ্ধি নিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিঃ অজ্ঞস্য।
পুরুষ-বিমোক্ষ নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥

অন্বয় :—যথা বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং অজ্ঞস্য ক্ষীরস্য
প্রবৃত্তিঃ (উপজায়তে) তথা পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং
প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ (উপজায়তে)।

যথা = যেমন , বৎস = বাছুর। বিবৃদ্ধি = পোষণ, বৃদ্ধি করা, বড় করা। অজ্ঞস্য ক্ষীরস্য শব্দের বিশেষণ। ক্ষীরস্য শব্দের সহিত প্রবৃত্তির সম্বন্ধ কারক।

অজ্ঞ = অচেতন , ক্ষীর = দুগ্ধ।

বৎস বিবৃদ্ধি নিমিত্তং = বাছুরকে বড় করিবার জন্য।

প্রবৃত্তি = কার্য্যে প্রেরণা। উপজায়তে (জন্মে উহ)।

তথা = সেইরূপ , পুরুষ বিমোক্ষ নিমিত্তং = পুরুষের মুক্তির জন্য , প্রধানস্য = প্রধান বা প্রকৃতির।

অর্থ :—বৎস পোষণের জন্য বাট হইতে জড় দুগ্ধের নিঃসরণ হয়, ইহা যেরূপ, সেইরূপ পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতির চেষ্টা হয়। বৎস বড় হইলে আর দুগ্ধ নিঃসৃত হয় না। বিবেক জ্ঞানের পর প্রকৃতির আর চেষ্টা হয় না, বিবেকী পুরুষের নিকট প্রকৃতি থাকিয়াও নাই।

৫৮

ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তম্ ॥

পদপাঠ—ঔৎসুক্য নিবৃত্তি-অর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষ-অর্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বৎ অব্যক্তম্ ॥

অন্বয় :—যথা লোকঃ ঔৎসুক্য নিবৃত্ত্যর্থং ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে,
তদ্বৎ অব্যক্তম্ পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং (সৃষ্টি ব্যাপারে)
প্রবর্ত্ততে।

যথা—যেইরূপ, লোকঃ=লোক, জন, মানুষ, ব্যক্তি।

ঔৎসুক্য নিবৃত্তি-অর্থং , ঔৎসুক্য=ইষ্টার্থে ব্যগ্রতা , ব্যগ্রতা থামাইবার জন্য। ক্রিয়াসু=ক্রিয়াতে, প্রবর্ত্ততে=প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রবর্ত্ততে ধাতুর বিশেষ্য প্রবৃত্তি, ইহা নিবৃত্তির বিপরীত।

ব্যগ্রতা হয় কেন ? একটা কিছু ফলের জন্য। সেই হেতু লোকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যখন অভীষ্ট ফল লাভ হয় তখন কার্য্যও স্থগিত হয়।

অব্যক্তম্=প্রকৃতিও, তদ্বৎ=সেইরূপ।

পুরুষস্য বিমোক্ষার্থম্=পুরুষের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য, (সৃষ্টি ব্যাপারে) প্রবর্ত্ততে।

অর্থ :—সাধারণ লোক যেমন ব্যগ্রতা নিবৃত্তির জন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সৃষ্টি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়।

প্রকৃতির অভিপ্রায় হইতেছে যে পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন করে। সেইজন্যই প্রকৃতির এত চেষ্টা।

৫৯

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥

পদপাঠ :—(১ম ছত্রে সন্ধি নাই)।

পুরুষস্য তথা আত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ।

অন্বয় :— যথা নর্ত্তকী রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নৃত্যাৎ নিবর্ত্ততে,
তথা প্রকৃতিঃ পুরুষস্য আত্মানং প্রকাশ্য (সৃষ্টি ব্যাপারাৎ)
নিবর্ত্ততে।

যথা=যেইরূপ , নর্ত্তকী=নাচওয়ালি, নটী, প্রকৃতি যেন নর্ত্তকী,
রঙ্গস্য=(কর্ম্মে ষষ্ঠী) রঙ্গ, হাব ভাব নাচ। দর্শয়িত্বা=দর্শন

করাইয়া, দেখাইয়া। নৃত্যাৎ = নৃত্য হইতে, রং তামাসা ঢং নাচ হইতে। নিবর্ত্ততে = নিবৃত্ত হয়। (সভাজন উহ্য)

তথা = সেইরূপ। প্রকৃতি। প্রকাশ্য ক্রিয়ার দুইটি কর্ম্ম, পুরুষ এবং আত্মা।

পুরুষস্য আত্মানং প্রকাশ্য = পুরুষকে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, পুরুষকে স্বরূপ দেখাইয়া। (সৃষ্টি ব্যাপার হইতে উহ্য) নিবর্ত্তিত হয়।

অর্থ ঃ—নর্ত্তকী সভাজনকে রঙ্গ দেখাইয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতি নর্ত্তকী তুল্য। তিনি পুরুষকে নানারূপে আপনাকে দেখাইয়া সৃষ্টি ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হন।

৬০

নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকঞ্চরতি ॥

পদপাঠ ঃ—নানাবিধৈঃ উপায়ৈঃ উপকারিণী অনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবতী অগুণস্য সতঃ তস্য অর্থম্ অপার্থকং চরতি ॥

অন্বয় ঃ—উপকারিণী গুণবতী নানাবিধৈঃ উপায়ৈঃ তস্য অনুপকারিণঃ
অগুণস্য সতঃ পুংসঃ অর্থম্ অপার্থকং চরতি।

গুণবতী (অর্থাৎ প্রকৃতি) পুংসঃ অর্থম্ চরতি—ইহা হইল মূল বাক্য। প্রকৃতি পুরুষের অর্থ চরতি বা সাধন করে।

কিরূপে সাধন করে—(১) নানাবিধৈঃ উপায়ৈঃ, (২) অপার্থকং। অপার্থকং = বৃথা, বিফল ভাবে। অপার্থকং—চরতি ক্রিয়ার বিশেষণ।

নানাবিধৈঃ উপায়ৈ = নানাবিধ বিশেষণ, তৃতীয়া বিভক্তি। নানাবিধ উপায় দ্বারা।

প্রকৃতির অপর নাম গুণবতী, কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণ স্বরূপা।

গুণবতী, চরতি ক্রিয়ার কর্ত্তা। ইহার বিশেষণ উপকারিণী বা উপকারী।

পুংসঃ = পুমান শব্দের ৬ষ্ঠীর একবচন। "অর্থম্"এর সহিত সম্বন্ধ। অর্থ = প্রয়োজন। অনুপকারিণঃ, অগুণস্য, তস্য, সতঃ ইহারা সকলেই ৬ষ্ঠীর ১ বচন—এবং "পুংসঃ"র বিশেষণ।

তস্য = তাহার, গুণবতীর সর্ব্বনাম। উপকারী গুণবতী তাহার পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে। পুরুষটি কি রূপ? নির্গুণ, সৎ এবং অনুপকারী। সতঃ = সৎ শব্দের ষষ্ঠীর একবচন, বর্ত্তমান, নিকটস্থ।

অগুণস্য = নির্গুণ, (সেইজন্য) অনুপকারিণঃ = উপকার করিতে অসমর্থ।

অর্থ :—প্রকৃতি গুণবতী এবং পুরুষের উপকারী। পুরুষ গুণহীন এবং তজ্জন্য উপকার করিতে অক্ষম। প্রকৃতি নানাবিধ উপায়ে এবং স্বার্থশূন্য ভাবে তাহার নিকটস্থ পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজন সাধন করে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

—ওমর।

গোপালের মা

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে বেলা ৩-৩০ বা ৪টার সময় বর্ত্তমান লেখক বরাহনগর-মঠে পৌছিল। দ্রুতপদে সমস্ত পথটা হাঁটিয়া আসিয়াছে। মাথায় ছাতা ছিল না সেইজন্য মুখটা কিছু লাল এবং শরীর খুব ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল। একটি বৃদ্ধা উপরকার সিঁড়ি হইতে নামিয়া সবে নিচেকার পোড়ো দালানটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি দেখিতে স্থূলকায়, দাঁত অনেক পড়িয়া গিয়াছে এবং মাথার চুলও প্রায় সব সাদা। বয়স আন্দাজ ৫৫ হইতে ৬০এর ভিতর হইবে। যুবকটি উঠিবেন এমন সময় বৃদ্ধা তাহাকে ধরিয়া তাহার ডান কাঁধের উপর হাত রাখিয়া নিজের আঁচল দিয়া যুবকটির মুখ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন এবং

কাঁদিয়া ফেলিলেন। একবার আঁচল দিয়া মুখ মোছান, একবার দাড়িতে হাত দিয়া চুমো খান, যেন কত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন আর কেবলই বলিতে লাগিলেন, "ওরে তুই যে নরেনের ভাই, তোর মুখে রোদ্দুর লেগেছে, তোর মুখে ঘাম বেরিয়েছে, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে দেখে আমার বুকটার ভেতর কেমন কচ্ছে রে।" এমন একটি স্নেহপূর্ণ স্বরে ঐ কথাগুলি বলিতেছিলেন যে যুবকটি মোহিত ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, প্রণাম বা কথাবার্ত্তা কিছুই হইল না। যুবকটির চক্ষু তখন অশ্রুতে ভরিয়া আসিয়াছে,—এ যেন এক নূতন রাজ্যের ভালবাসা। যুবকটি খানিকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল, বৃদ্ধাও পরে ধীরে ধীরে বরাহনগর বাজারের দিকে চলিয়া গেলেন। ইনিই হইতেছেন পূজনীয়া বিখ্যাত গোপালের মা, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাঁহাকে গোপাল ভাবে দর্শন দিয়া মা বলিয়াছিলেন।

তিন চার মাস পরে একদিন বৈকালে বর্ত্তমান লেখক বলরামবাবুর বাড়ী গিয়া দেখেন, অল্পক্ষণ হইল গোপালের মা আসিয়াছেন এবং বড়ই ক্লান্ত। নবাগত যুবকটিকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া আঁচলের গাঁট খুলিয়া কি যেন বাহির করিতে লাগিলেন। তাহার পর কলাপাতে মোড়া দুটি আতা-সন্দেশ বাহির করিয়া নবাগত যুবকটির মুখে একটু একটু করিয়া খাওয়াইতে এবং বাম হাত দিয়া মাথা, কাঁধ ও পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ওরে তোর জন্য যে দুটি সন্দেশ নিয়ে সিমলেতে গেছিলুম, তা নরেন নেই তাই কেঁদে কেঁদে কাঁসারিপাড়ার রাস্তা দিয়ে ফিরে এলুম, তোদের বাড়ীতে ঢুকতে পাল্লুম না। নরেন ছাড়া তোদের বাড়ীতে কি করে উঠবো, আমার বুকটা যেন দপ্ করে উঠলো। তা তুই খা, তোর জন্য ভাবছিলুম, তুই খা।" পরে শুনা গেল তিনি কামারহাটির গোবিন্দ দত্তর ঠাকুর বাড়ী থেকে সকালে বলরাম বাবুর বাড়ী আসেন, বলরামবাবুর বাড়ীতে দুটি সন্দেশ তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। সেই সন্দেশ দুটি কলাপাতে মুড়িয়া কাপড়ের খুঁটে বাধিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর দুপুর বেলা ভাত

খাইয়া সেই দুটি সন্দেশ লইয়া বাগবাজার হইতে সিমলায় গিয়াছিলেন ও পুনরায় তথা হইতে বাগবাজারে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে একটা নূতনতর ভালবাসা দেখা গিয়াছিল যাহা চিরকাল জগতে উজ্জ্বল থাকিবে।

খানিকক্ষণ পর বাহির হইতে অনেক লোক আসিতে লাগিল, সম্ভবতঃ ১০, ১৫টি হইবে। যোগেন মহারাজ 'বলরাম-মন্দিরের' বারণ্ডায় পায়চারি করিতে করিতে যুবকটির সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আগন্তুক ব্যক্তিরা অনেকেই কলেজে পড়া, শাস্ত্রাদি অধ্যায়ন ও একটু একটু জপধ্যানও করিয়া থাকেন। সিঁড়িতে উঠিয়া ডান দিকের ছোট ঘরের দোরের নিকট গোপালের মা বসিয়া রহিলেন। তখন সকলে তাঁহাকে নানা বিষয়ের দুরূহ দুরূহ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। গোপালের মা বলিলেন, "ওগো আমি যে মেয়ে মানুষ, বুড়ো মানুষ আমি কি তোমাদের শাস্ত্রের কথা জানি? তোমরা শরৎ, যোগেন, তারককে জিজ্ঞাসা করগে যাও না।" তাহার পর তাঁহারা অনেক জিদ করিতে থাকিলে শেষে গোপালের মা বলিলেন, "তবে দাঁড়াও বাপু, গোপালকে জিজ্ঞাসা করি—ও গোপাল, গোপাল, ওরে এরা কি বলছে, আমি কি ছাই কিছু বুঝতে পারি? এরা কি শাস্তোরের কথা বলছে, তুই বাপু এদের একবার বলে দে না।" ইহা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, এ আবার কি ব্যাপার? কাহার সহিত এমন স্পষ্টভাবে কথা কহিতেছেন। তাহার পর, হাওয়ার ভিতর হইতে কে যেন কিছু বলিতেছেন সেইরূপ ভাবে দৃষ্টি ও মুখভঙ্গি করিয়া গোপালের মা বলিতে লাগিলেন, "ওগো, গোপাল এই বলছে" বলিয়া দুরূহ দুরূহ প্রশ্নগুলির অদ্ভুত মীমাংসা করিয়া দিতে লাগিলেন। সকলেই স্তম্ভিত, হর্ষিত ও মাঝে মাঝে 'বাঃ-বাঃ' করিয়া আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন, যেন একটা মহা আনন্দের রোল উঠিল। অধিকাংশ লোকেরই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে, কেবল দুই তিন জনের তখনও দেওয়া হয় নাই। এমন সময় গোপালের মা বলিলেন, "ও গোপাল, গোপাল, তুই

চলে যাচ্ছিস কেন, ওদের কথার জবাব দিবি নি? তুই ওদিকে যাচ্ছিস কেন, ফিরে আয় না। তোর বাপু কেবল খেলা আর ছুটোছুটি, আয় না আমার কোলে আয়, ওদের কথার উত্তর দে।” কিন্তু গোপাল তখন চলিয়া গেল, দুই তিনটি লোকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না। তাঁহারা বড়ই বিষণ্ণ হইয়া ম্লান মুখে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

আর একদিন গোপালের মা বলরামবাবুর বাড়ীতে বসিয়া আছেন। জনৈক ব্যক্তি বৈকালে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা শুনার পর বারাণ্ডায় পাইচারি করিতে লাগিলেন। অনেকগুলি লোক আসিয়াছিল, সকলেই পীড়াপীড়ি করিয়া বলিতে লাগিল—‘গোপালকে দেখবো।’ গোপালের মা গোপালকে ডাকিলেন, কিন্তু গোপাল সেদিন অত্যন্ত দুরন্ত হইয়াছে, কিছুতেই আসিবে না। উপস্থিত লোকগুলি গোপালকে দেখিবার জন্য যতই জিদ করিতেছিল গোপালও ততই সেদিন দুষ্টামি আরম্ভ করিল, হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল একটি বারও গোপালের মায়ের কাছে আসিল না, কোন প্রশ্নেরও উত্তর দিল না। অবশেষে গোপালের মা রাগিয়া বারাণ্ডা, বড় ঘর, এদোর, ওদোর দিয়া ছুটিয়া গোপালকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়ো মানুষ, থপ্‌ থপে, ছুটাছুটি করিয়া তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে গোপালকে ‘ক্যাঁক্’ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন, আর খুব বকিতে লাগিলেন। তারপর যেন তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, গোপাল যেন বড় অপ্রস্তুত হইয়াছে। গোপালের মা বসিয়া প্রথমে ডান পাটা মেলিয়া বলিলেন, —“আচ্ছা বাপু, তুই এই পাটা টেপ্‌ তাহলেই হবে; তুই ছেলে মানুষ আর বেশী কিছু কত্তে হবে না, তা ওঠ্‌ ওঠ্‌ খেলগে যা। আবার এ পাটাও টিপবি? একটা হলো বেশ হয়েছে, তা থাক্, নে বাপু এ পাটাও টেপ্‌, তুইতো ছাড়বিনি।” এই বলিয়া গোপালের মা বাঁ পাটাও ছড়াইয়া দিলেন। তারপর যেন চিবুক ধরিয়া কাহাকেও চুমো খাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেদিন আর কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না। গোপালের মায়ের এইরূপ ভাব বহুবার দেখা গিয়াছে। নিত্য ঐরূপ

হওয়ায় উহা কিছু নূতন বলিয়া বোধ হইত না। গোপালের মা ব্রাহ্মণ কন্যা, অল্প বয়সে বিধবা, ভয়ঙ্কর শুচিবাইগ্রস্তা ও নিষ্ঠাবতী ছিলেন। তিনি সারাদিন জপ করিতেন। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন পাইয়া তাঁহার সেই শুচিবাই চলিয়া গেল। গোপালের মা নিজ ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন ও তাঁহার সহিত কথা কহিতেন।

সিষ্টার নিবেদিতা প্রথম বিলাত হইতে আসিয়া বাগবাজারে একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সবে মাত্র মাস দুই আসিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষা কিছুই জানেন না। একদিন বৈকালে গুপ্ত মহারাজের (স্বামী সদানন্দ) সহিত সিষ্টার নিবেদিতা রাস্তায় বাহির হইয়াছেন, এমন সময় গোপালের মা অপর দিক দিয়া আসিলেন। গোপালের মা গুপ্ত মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও গুপ্ত, এটি কে রে? একি নরেনের মেয়ে, যে তার সঙ্গে এসেছে?" গুপ্ত মহারাজ বলিলেন, "হ্যাঁ, ইনিই স্বামিজীর সঙ্গে এসেছেন।" তখন গোপালের মা নিবেদিতাকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি আমার গোপালের, তুমি কি আমার গোপালের?" এই বলিয়া নিবেদিতার চিবুকে হাত দিয়া চুমো খাইলেন। তাহার ডান হাতটি ধরিয়া রাস্তা চলিতে চলিতে পরিচিত লোক যাঁহাকেই দেখিতেছিলেন, তাঁহাকেই বলিতে লাগিলেন, "ওগো! এটি আমার গোপালের, এটি আমার নরেনের মেয়ে।" নিবেদিতা পরে বলিতেন,—গোপালের মা যখন আমার চিবুক ধরিয়া চুমো খাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তুমি কি আমার গোপালের?" তখন আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল এবং ভিতরে কি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি যেন একটি নূতন ভালবাসার জগতে যাইতে লাগিলাম, তথায় কূল কিনারা কিছুই নাই। তখন হইতে আমার প্রাণের ভিতর একটা সাহস, একটা ভালবাসার শক্তি জাগিয়া উঠিল। গোপালের মায়ের উদার হৃদয়ের ইহাই একটি সামান্য উদাহরণ।

গোপালের মা কামারহাটির বাগানে থাকিতেন। স্বামিজীর দেহত্যাগ সংবাদ শুনিয়া তিনি আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া পড়িয়া যান তাহাতে

ডান হাতে একটু চোট লাগে। হাতে 'বাব' বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে এবং শুশ্রূষার জন্য একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে রহিয়াছেন। একদিন বাবুরাম মহারাজ জনৈককে সঙ্গে লইয়া গোপালের মাকে দেখিতে গেলেন। তখন বেলা ১২॥০টা কি ১টা হইবে। গোপালের মা ও সেই স্ত্রীলোকটি আহার করিতে বসিয়াছেন এবং কিছু আহারও করিয়াছেন। বাবুরাম মহারাজ এবং ঐ ব্যক্তি গোপালের মায়ের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকটি অপরিচিত দুইটি পুরুষকে দেখিয়া আহারের থালি হইতে হাত তুলিয়া লইলেন ও মুখে ঘোমটা দিলেন। গোপালের মা তখনই বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, ওদের দেখে লজ্জা কেন, ওরা যে আমার গোপালের।" স্ত্রীলোকটি যখন আহার ত্যাগ করিয়া মাথায় ঘোমটা দিলেন তখন বাবুরাম মহারাজ ও সেই ব্যক্তি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন, কিন্তু গোপালের মা, "ওদের দেখে লজ্জা কেন, ওরা যে আমার গোপালের" এই কথাগুলি এমন মধুর ও পবিত্রতাপূর্ণ স্বরে বলিলেন যে স্ত্রীলোকটির আর কোন লজ্জা রহিল না, তিনি মুখের ঘোমটা তুলিয়া আহার করিতে লাগিলেন এবং বাবুরাম মহারাজ ও জনৈকের হৃদয় হইতেও সঙ্কোচের ভাব চলিয়া গেল। তখন গোপালের মা বলিতে লাগিলেন, "ও মহিন, তুই কোথায় ছিলি? তুই কোন খবর দিস্‌না কেন? আয় এইখানে বোস্।" গোপালের মা সেইখানেই হাত ধুইয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, "আমায় একটা পান সেজে দে।" তাঁহার এমন একটা আশ্চর্য্য প্রভাব যে সেই স্ত্রীলোকটি বাবুরাম মহারাজের কাছে বসিয়া পান সাজিতে লাগিলেন কিন্তু কাহারও কোন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল না।

গোপালের মাকে একটা পান ছিঁচিয়া দিলে তিনি উহা চিবাইতে লাগিলেন। বাবুরাম মহারাজ ও জনৈক নিজে নিজে পান সাজিয়া খাইতে লাগিলেন। তখন স্বামিজীর বিষয়ে নানা কথোপকথন হইতে লাগিল। স্বামিজীর হঠাৎ দেহত্যাগ হওয়ায় গোপালের মায়ের অন্তরে খুব লাগিয়াছিল। তিনি 'নরেন—নরেন' করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং স্বামিজীর গুণের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল

পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "নরেনের দেহত্যাগের কথা শুনে আমার গাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো। মাথা ঘুরে গেল, চোখে কিছু দেখ্‌তে পেলুম না, হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম তাইতে হাতে চোট লেগেছে।" তিনি এই সব কথা কহিতে কহিতে মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় বলিলেন,—"ও বাবুরাম, মঠে যাচ্ছিস্ তা যা, আমায় গোটাকতক ডেঙোর ডাঁটা পাঠিয়ে দিস্, আর মুখটা ব্যাজ্ ব্যাজ্ করে কিছু হিংচে শাকও পাঠিয়ে দিস।"

চারি পাঁচ বৎসর পরে গোপালের মায়ের খুব অসুখ হইল। কামারহাটির বাগানে একা রাখা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা না করিয়া শরৎ মহারাজ তাঁহাকে সিষ্টার নিবেদিতার স্কুলে রাখিয়া দিলেন। একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে তাঁহার সেবা করিবার জন্য নিযুক্ত হইল। এই সময় সিষ্টার নিবেদিতা এবং গুপ্ত মহারাজও গোপালের মায়ের বিশেষ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের একদিন পূর্ব্বে যখন বর্ত্তমান লেখক তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে যান তখন গোপালের মায়ের কোন সংজ্ঞা ছিল না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, গোপালের মা ব্রাহ্মণ-কন্যা ও অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। তিনি অতি নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবার আচরণ করিতেন কিন্তু অবিরাম জপ করায় ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি থাকায় তাঁহার জীবনে এমন উদার ভাব আসিয়াছিল যে, তাঁহার কাছে 'জাতাজাতি' ভাব কিছুই ছিল না, গোপালের ভক্ত সকলেই সমান। এমন উদার ভাব ও ভালবাসা জগতে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

সাংখ্যাচার্য্যগণ সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করের মতামত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাংখ্যাচার্য্যগণ শ্রুতি-বিচারে পরাস্ত হইয়া স্বমত শোধনাভিলাষে স্মৃতি-(বেদ ব্যতিরিক্ত অপরাপর শাস্ত্র) বল অবলম্বন করিলে নিম্ন লিখিত বিচার হইয়া থাকে।

পূর্ব্বপক্ষ—কপিলাদি ঋষি সাংখ্য শাস্ত্রের প্রণেতা। তাঁহাদের জ্ঞান অপ্রতিহত ও অনাবৃত—স্মৃতি এরূপ বলিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত। এক্ষণে তাঁহাদের শাস্ত্র অপ্রামাণ্য বলিলে স্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ ঘটে। ইহার প্রত্যুত্তরে ব্যাস সূত্র রচনা করিয়াছেন—

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষ প্রসঙ্গাৎ॥

অ ২, পা ১, সূ ১॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্মৈব জগতঃ কারণমিতি পূর্ব্বত্র প্রতিপাদিতম্। তত্র স্মৃত্যনবকাশদোষঃ স্মৃতীনাং কপিলাদিকৃতানাং অনবকাশঃ নির্ব্বিষয়তয়া আনর্থক্যং তস্য প্রসঙ্গঃ প্রাপ্তির্ভবতীতি নাশঙ্কিতব্যম্। হেতুমাহ—অন্যেতি। অন্যস্মৃতীনাং মন্বাদিপ্রণীতানাং অনবকাশদোষঃ স্যাৎ। ইদমত্র তাৎপর্য্যম্—সাংখ্যস্মৃতিষু প্রধানং প্রতিপাদ্যতে ন ধর্ম্মঃ, মন্বাদিস্মৃতিষু তু ধর্ম্ম প্রতিপাদ্যতে ন প্রধানম্। তত্রান্যতর প্রাধান্যাঙ্গীকারেঽন্যতরা প্রাধান্যং স্যাদিতি। যথা সাংখ্যস্মৃতি বিরোধাৎ ব্রহ্মবাদস্ত্যাজ্য ইতিত্বয়োচ্যতে তথা স্মৃত্যন্তর বিরোধাৎ প্রধানবাদস্ত্যাজ্য ইতি ময়োচ্যতে। অতএব "যত্রোভয়োঃ সমোদোষঃ পরিহারশ্চ যঃ সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থবিচারণে॥" ইতি ন্যায়াৎ ন পূর্ব্বপক্ষাবসরঃ। বস্তুতস্তু শ্রুতিস্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সীত্যনুশাসনাৎ শ্রৌতে বিরোধে স্মৃত্যপ্রামাণ্যস্যেষ্টত্বাৎ প্রোক্তপূর্ব্বপক্ষো ন যুক্তঃ ইতি ভাবঃ।—"সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগৎ কারণ, এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইল বলিয়া মনে করিও না যে, সাংখ্য

পাতঞ্জলাদি স্মৃতি নির্ব্বিষয় অর্থাৎ অপ্রমাণ (মিথ্যা) হইল। সাংখ্য স্মৃতির ভয়ে ব্রহ্ম কারণবাদ ত্যাগ করা সঙ্গত নহে। কারণ সাংখ্য স্মৃতির প্রাধান্য স্থাপন করিতে গেলে মন্বাদি স্মৃতি অপ্রধান ও নির্ব্বিষয় সুতরাং অপ্রমাণ হইবে। অতএব, যখন এক স্মৃতির প্রাধান্যে অপর স্মৃতির অপ্রাধান্য, তখন অবশ্যই উক্ত পূর্ব্বপক্ষ অগ্রাহ্য। বিশেষতঃ স্মৃতির অনুরোধে শ্রুতির সঙ্কোচ সর্ব্বথা অগ্রাহ্য।"

ভাষ্য তাৎপর্য্য। [প্রথম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই একমাত্র জগৎ কারণ। মৃত্তিকাদি যেরূপ ঘটাদি উৎপত্তির কারণ ব্রহ্মও সেইরূপ জগদুৎপত্তির উপাদান কারণ, তাহা ছাড়া তিনি জীবনিয়ন্তারূপে স্থিতি কারণ এবং তাঁহাতেই সেই সকলের শেষ হয় বলিয়া লয়েরও কারণ। ব্রহ্মই আমাদের আত্মা। সাংখ্যের প্রধান অবৈদিক। এইগুলি শ্রুতি বিচার দ্বারা দেখান হইয়াছে। এক্ষণে স্মৃতি লইয়া বিচার আরম্ভ হইতেছে।]

পূর্ব্ব-পক্ষ—সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগৎ কারণ এ কথা বলা যায় না। বলিলে স্মৃতির অনবকাশ (অপ্রামাণ্য) দোষ ঘটে। কপিল ষষ্টিতন্ত্র নাম্নী স্মৃতি শিষ্টগণের গৃহীত সুতরাং উহা গ্রাহ্য। পঞ্চশিখ প্রভৃতি অপর কয়েকজন ঋষিও কপিল মতের অনুসরণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম-কারণবাদ স্বীকার করিলে ইঁহাদের কোনও স্থান থাকে না।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—কিন্তু মনু প্রভৃতি স্মৃতির সহিতও সাংখ্য ত মিলে না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—মনু প্রভৃতি স্মৃতির প্রতিপাদ্য বস্তু ভিন্ন, সুতরাং সে সকল স্মৃতির অনবকাশ (আনর্থক্য) নাই। সাংখ্য স্মৃতি স্বতন্ত্র অচেতন প্রধানকে জগৎকারণ বলেন। এই প্রধানই সাংখ্যের প্রতিপাদ্য বস্তু। কিন্তু মন্বাদি স্মৃতির প্রতিপাদ্য বস্তু ধর্ম্ম (যাহার দ্বারা স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাহাতে বিধি নিষেধ আছে)। উহারা প্রবর্ত্তক বাক্যানুমেয় (বিধিবাক্যবোধিত বা বেদবাক্যানুমেয়) ধর্ম্ম অর্থাৎ উহাতে অগ্নি হোত্রাদি যজ্ঞের এবং তাহার অঙ্গস্বরূপ অন্যান্য অনুষ্ঠেয়ের উপদেশ আছে। এই বর্ণ এই

সময়ে এই প্রকারে উপনীত হইবে, এই বর্ণের এই আচার, এই প্রকারে বেদাধ্যয়ন এবং এই প্রকারে সমাবর্ত্তন (অধ্যয়ন কালে ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপন স্নান পদ্ধতি) করিবে, এই বিধিতে পত্নীগ্রহণ করিবে—এইরূপ উপদেশ আছে। চতুর্ব্বিধ আশ্রমের বিবিধ ধর্ম্ম ও পুরুষার্থ সম্বন্ধীয় উপদেশ আছে। পরন্তু কপিলাদি স্মৃতি উহা হইতে পৃথক। কপিলাদি শিষ্টেরা (ঋষিরা) মোক্ষসাধন উপলক্ষে স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। তোমাদের মতে এই সকল মোক্ষ-স্মৃতি নিরর্থক ও বিষয়শূন্য হইয়া পড়ে। অভ্রান্ত কপিলের গ্রন্থকে ভ্রান্ত কে বলিবে? অতএব স্মৃতি রক্ষার হেতু স্মৃতির অনুযায়ী বেদান্ত বা শ্রুতি ব্যাখ্যা করা উচিত।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—কিন্তু শ্রুতিতে যে "তিনি ঈক্ষণ করিলেন—আলোচনা করিলেন" ইত্যাদি বাক্য সৃষ্টি কার্য্যের পূর্ব্বে রহিয়াছে, তখন উহাকে কেন বদর্থ করিব?

পূর্ব্ব-পক্ষ—আছে বটে কিন্তু তুমি কি প্রকারে জানিলে যে উহা জগৎ-কারণ সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—নচেৎ শ্রুতির অর্থ নির্ণয় হয় না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যাঁহারা স্বতন্ত্র-প্রজ্ঞ অর্থাৎ যাঁহাদের জ্ঞান অনাবৃত বা অব্যাহত—যাঁহারা স্বয়ং শ্রুত্যর্থ জানেন, তাঁহাদের নিকট কোনও পূর্ব্ব-পক্ষ স্থান পায় না। যাহারা পরতন্ত্র, যাঁহাদের জ্ঞান আবৃত যাঁহারা শ্রুতির অর্থ প্রত্যক্ষ করেন নাই তাঁহাদের ব্যাখ্যা গুরু এবং শাস্ত্র সাপেক্ষ। তাঁহারা নিজ মত সমর্থনের জন্য প্রধান ঋষিদের গ্রন্থ অবলম্বন করেন, কিন্তু সেই সকল ঋষিদের মধ্যে কপিলের সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তোমাদের কথায় বিশ্বাস কে করিবে? শ্রুতি নিজেই কপিলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ (শ্বে ৫, ২) "যে দেব প্রথম প্রসূত কপিলকে জন্মিবা মাত্র ঋষি ও জ্ঞানী করিয়াছেন সেই পরমদেব ঈশ্বরকে জ্ঞান গোচর করিবে।" এইরূপ ঋষির মত অযথার্থ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া তিনি তাঁহার

স্মৃতি কেবল মানিয়া লইতে বলিতেছেন না, তিনি উহা তর্ক-মার্জ্জিতও করিয়াছেন। এই হেতু স্মৃতির অনুযায়ী শ্রুতি ব্যাখ্যা করা উচিত।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—এক স্মৃতির অনবকাশ (স্থলাভাব) দেখিয়া ঈশ্বর-কারণ-বাদ অস্বীকার করিলে, অন্য স্মৃতির অনবকাশ ঘটে। যে সকল স্মৃতি ঈশ্বর-কারণ-বাদী তাহা এখানে দেখান হইতেছে। "যৎ তৎ সূক্ষ্মং অবিজ্ঞেয়ং", "স হি অন্তরাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যতে," "অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্নির্গুণে সম্প্রলীয়তে" "অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ। স সর্গকালে চ করোতি সর্ব্বং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ।" "সেই যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় সূক্ষ্ম বস্তু" স্মৃতি এইরূপ প্রস্তাব করিয়া পরে "তিনি প্রাণিনিচয়ের অন্তরাত্মা সুতরাং তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব", এইরূপ উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। তাঁহা হইতে ত্রিগুণ অব্যক্ত (প্রধান) উৎপন্ন হইয়াছে।" অপর স্থলেও বলিয়াছেন, "হে ব্রহ্মন। সেই অব্যক্ত গুণাতীত পুরুষে লয় প্রাপ্ত হয়", "ঋষিগণ। এই সংক্ষিপ্ত উপদেশটি শুন—পুরাতন নারায়ণই এ সমুদয় এবং তিনিই সৃষ্টিকালে সৃষ্টি করেন, সংহার কালে এ সকল আত্মসাৎ করেন।" পুরাণ এই প্রকারে ঈশ্বরকেই জগৎকারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতাও বলিয়াছেন, "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" (৭, ৬), "আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির ও প্রলয়ের কারণ।" আপস্তম্ব মুনি, তাঁহার ধর্ম্ম-সূত্রে বলিতেছেন, "তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ" (১, ৮, ২৩, ২), "তাঁহা হইতে চতুর্ব্বিধ জীবদেহ জন্মে, তিনি এ সমস্তের মূল তিনিই শাশ্বত ও নিত্য।" এইরূপ অসংখ্য স্মৃতি প্রমাণের দ্বারাও দেখান যাইতে পারে ঈশ্বরই জগৎ কারণ। যাহারা স্মৃতি-বল অবলম্বন করে তাহাদিগকে স্মৃতির দ্বারাই নিরস্ত করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কোনও স্মৃতি শ্রুতির অনুকূল, কোনও স্মৃতি শ্রুতির প্রতিকূল, এক্ষণে কোনটি গ্রাহ্য কোনটি ত্যাজ্য ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—যাহা শ্রুতির অনুগামিনী তাহাই গ্রাহ্য, অন্য সকল

অগ্রাহ্য। জৈমিনি মুনি তাঁহার পূর্ব্ব মীমাংসা সূত্রে বলিতেছেন, "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি-হ্যনুমানম্" (১, ৩, ৩). "যে স্থলে শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ—সে স্থলে স্মৃতির প্রমাণ্য অনপেক্ষ অর্থাৎ অগ্রাহ্য। হেতু এই যে বিরোধের অভাব স্থলেই অর্থাৎ শ্রুতির বিরুদ্ধ না হইলেই অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি পরিগৃহীত হইতে পারে।" শ্রুতিকে পরিত্যাগ করিয়া কেহ কোনও কালে অলৌকিক (ইন্দ্রিয়াতীত) বিষয়ের প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু কপিলাদি ঋষি সিদ্ধ এবং তাঁহাদের জ্ঞান অপ্রতিহত।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—সিদ্ধিও ধর্ম্মসাপেক্ষ। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে সিদ্ধি হয় না। পুনশ্চ ধর্ম্মের মূল বেদ। প্রথমে বেদজ্ঞান, পরে তাহার অনুষ্ঠান, তাহার পর সিদ্ধি। পরভবিক সিদ্ধপুরুষের কথায় পূর্ব্ব সিদ্ধ বেদার্থের অন্যথা কিরূপে করিতে পারি?

পূর্ব্ব-পক্ষ—কপিল বেদের পর জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি যথার্থ সত্য জানিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বেদের সংশোধন ত করিতে পারেন?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—কিন্তু পরভবিক কোন সিদ্ধপুরুষের মত ঠিক? পরবর্ত্তী সিদ্ধপুরুষ অনেক এবং তাঁহাদের স্মৃতিও বহু এবং পরস্পর বিরুদ্ধবাদিনী। শ্রুতির আশ্রয় না লইলে তাঁহাদের বিরোধ ভঞ্জন কিরূপে হইবে? যাহাদের জ্ঞান পরের অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরুর অধীন, তাহাদের হঠাৎ কি কোনও স্মৃতির পক্ষপাতী হওয়া উচিত? যে সক্তিহীন, পক্ষপাতী তাহার কখনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে না। পুরুষ-মতি বৈশ্বরূপ অর্থাৎ মানুষও বহু এবং তাহাদের বুদ্ধিও বিচিত্র, সকলে সমান অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না, সেই জন্য শ্রুতি বিচার করিয়া কোন্ স্মৃতি শ্রুতিবিরোধিনী এবং কোন স্মৃতি শ্রুত্যনুসারিণী তাহা আলোচনা করিয়া বুদ্ধিকে সৎপথে আনয়ন করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব-পক্ষ—তবে কি তোমরা কপিলের ঋষিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ কর?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—সাংখ্য-স্মৃতিকার কপিলের মত দেখিয়া আমরা তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে ইচ্ছুক নহি। কপিল শব্দটি সামান্য-

বাচী (অর্থাৎ কপিল অনেক, কোন্ কপিল সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা এবং কোন্ কপিল শ্রুতিতে প্রশংসিত হইয়াছেন তাহা আগে নির্ণয় করা উচিত)। শ্রুতি হিরণ্যগর্ভ-কপিলের জ্ঞান অপ্রতিহত বলিয়াছেন, স্মৃতি (শ্রীভগবানের অবতার) বাসুদেব-কপিলের স্মরণ (বর্ণনা) করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়ই ঈশ্বর-কারণবাদী এবং একাত্মবাদী পরন্তু সাংখ্যবক্তা কপিল ভেদমূলক দ্বৈতজ্ঞানের উপদেশক, তখন তাঁহার মতকে বেদানুগামী কি করিয়া বলিব অথবা তাঁহার মতের দ্বারা বেদকে মার্জ্জিতই বা কেন করিতে যাইব ?

পুনশ্চ শ্রুতি যেমন কপিলকে অপ্রতিহত জ্ঞানী বলিয়াছেন, মনুকেও একই গুণে গুণান্বিত করিয়াছেন। "যদ্বৈকিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ভেষজম্" (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ২, ২, ১০, ২), মনু যাহা বলিয়াছেন তাহাই ভেষজ অর্থাৎ সংসার ব্যাধির মহৌষধ।" এই মনু আবার একাত্ম বিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন। "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি সংপশ্যন্নাত্মযাজী বৈ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি" (মনুসং, ১২।৯১), "যে উপাসক সমানরূপে আপনাকে সমস্তভূতে ও সমস্ত ভূত আপনাতে সন্দর্শন করে সেই আত্মজ্ঞানী উপাসক স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হয়।" আবার মহাভারতও এই একাত্মবাদের কথাই বলিতেছেন, "বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্ উতাহো এক এব তু" "হে ব্রহ্মন পুরুষ এক কি বহু ?" এইরূপ প্রশ্ন করিয়া পরকীয় পক্ষ উল্লেখ করিতেছেন, "বহবঃ পুরুষা রাজন সাংখ্যযোগ বিচারিণাম্" "হে রাজন সাংখ্য ও যোগের মতে পুরুষ বহু" পরে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, "বহুনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে। তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্ ॥" "বহু পুরুষাকার শরীরের উৎপত্তি স্থান যদ্রূপ, তদ্রূপ আমি সেই বিরাট পুরুষের কথা তোমাকে বলিতেছি" এইরূপ প্রস্তাব করিয়া "মমান্তরাত্মা তব যে চান্যে দেহ সংস্থিতাঃ। সর্ব্বেষাং সাক্ষী ভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ ॥ বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষি নাসিকঃ একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্ ॥" "ইনিই আমার আত্মা, তোমার আত্মা ও অন্যের আত্মা। ইনি সমস্ত আত্মার

(সমস্ত দেহের অথবা সমস্ত জীবের) সাক্ষী অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। ইনি কুত্রাপি কাহারও আপাত জ্ঞানের গোচর হন না। ইনিই বিশ্বমস্তক, বিশ্ববাহু, বিশ্বপাদ, বিশ্বনেত্র ও বিশ্বনাসিক। ইনি এক স্বাধীন প্রকাশ স্বেচ্ছা বিহারী ও সকল ভূতে বিরাজমান।” শ্রুতিতে ত একথা স্পষ্টই আছে, “যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥” (ঈশ, ৭), “যে কালে সমস্ত ভূত জ্ঞানীর আত্মা হইয়া যায় সে কালে সেই একত্ব দর্শীব শোকই বা কি ? মোহই বা কি ?”

কেবল প্রধান বলিয়া নহে, পুরুষ বহু বলাতেও সাংখ্য অবৈদিক। বেদবাক্য স্বতঃ প্রমাণ কিন্তু পুরুষবাক্য পবতঃ প্রমাণ কাজেকাজেই উহা নিকৃষ্ট। স্মৃতিব লক্ষণ হইতেছে প্রথমে সে শ্রুতির অনুমান করায় পবে তাহার অর্থ ও প্রামাণ্য বুঝাইয়া দেয়। এই হেতু বেদ বিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃতিব অনবকাশ ঘটিলেও উহা দোষ নহে।

ইতবেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ অ ২। পা ১। সূ ২ ॥

সূত্রার্থ—ইতরেষাং মহদাদীনামপি অনুপলব্ধেঃ লোকে বেদে চা দর্শনাৎ সাংখ্যস্মৃতানবকাশপ্রসঙ্গেন দোষায়েতি পূরনীয়ম্। মহদাদিবৎ প্রধানেঽপি প্রামাণ্যং নাস্তীতি ভাবঃ।—“সাংখ্য যে পবিণামী মহত্ত্বের ও অহঙ্কার তত্ত্বেব স্মবণ কবিয়াছেন, তাহা অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। তাহা লোকে ও বেদে সর্ব্বত্রই অপ্রসিদ্ধ। প্রধান যখন অপ্রসিদ্ধ মহত্তত্ত্বের সহিত পরিপঠিত, তখন অবশ্যই তাহার অপ্রামাণ্য ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যতাৎপর্য্য। সিদ্ধান্ত-পক্ষ—সাংখ্যে যে প্রধানের পর মহৎ ও অহংকার দৃষ্ট হয় তাহাও বেদে ও লোকে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভূত ও ইন্দ্রিয় লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ সুতরাং সেগুলি গ্রহণের যোগ্য। যেমন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা ষষ্ঠ অর্থ অপ্রসিদ্ধ সেইরূপ সাংখ্য পরিভাষিত মহত্তত্ত্ব ও অহংতত্ত্বও অপ্রসিদ্ধ অতএব অপ্রমাণ। যখন কার্য্য (মহৎ ও অহংকার) অপ্রমাণ তখন কারণও (প্রধান) অপ্রমাণ।

পূর্ব্ব-পক্ষ—আমরা শ্রুতি-প্রমাণ যদি না মানি। শ্রুতি না থাকিলেও আমরা প্রধানকে তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কবিব।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তর্কাবষ্টম্ভং তু "ন বিলক্ষণত্বাৎ" (২, ১, ৪) ইত্যারভ্য উন্মথিষ্যতি। উল্লিখিত চতুর্থ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তোমাদের তর্ক জাল ছিন্ন ভিন্ন হইবে।

[আচার্য্য পরসূত্রে বলিয়াছেন, যে সাংখ্য এবং যোগের যে সকল অংশ শ্রুতির সহিত মিলে সে গুলি আমারা গ্রহণ করিব। যেমন সাংখ্যের নির্গুণ-আত্মা, ইন্দ্রিয়, ভূত-সূক্ষ্ম, তুষ্টি প্রভৃতি। কিন্তু উহার প্রধান, বহুপুরুষ, জগদীশ্বর, মহৎ, অহঙ্কার আমরা মানি না। পতঞ্জলির যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি আমরা মানি কিন্তু অপরাপর যাহা বেদ বিরুদ্ধ তাহা আমরা গ্রাহ্য করি না।]

শ্রুতি ও স্মৃতি লইয়া যে বিচার তাহা সমাপ্ত হইল। প্রবন্ধান্তরে কেবল যুক্তি দ্বারা সাংখ্যমত খণ্ডন এবং স্বীয় মত সমর্থিত হইবে।

—বাসুদেবানন্দ।

(সমাপ্ত)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্ত

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ অহঙ্কারোদ্দীপক এবং প্রেমভক্তির বিরোধী, এই অভিযোগের যাথার্থ্য অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, বৌদ্ধমত নিরসন কল্পে আচার্য্য শঙ্করকে অদ্বৈতবাদের সাহায্যে অনেক প্রথিতনামা বৌদ্ধ-শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষু ও শ্রমণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, কালক্রমে শঙ্করের উন্নত মত বিকৃত হইলে তদ্দৃষ্টান্তে পাণ্ডিত্য-প্রচার প্রয়াসী তথাকথিত অদ্বৈতবাদী কেবল শুষ্কবিচার বিতর্ক দ্বারা বিরোধী মত সমূহকে খণ্ডন করিতে যাইয়া ব্যাকরণ বিভীষিকা ও ন্যায়ের সূচ্যগ্র যুক্তি

প্রদর্শনার্থে নীরস পারিভাষিক শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করায় এবং তাহাদের অদ্বৈতবাদ পাণ্ডিত্য-প্রচারে ও অহঙ্কারে এবং মায়াবাদ নানাপ্রকার দুর্নীতিতে পর্য্যবসিত হওয়ায় প্রেমভক্তি-প্রধান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকট উহা এক অপরূপ ভীতির কারণ হইয়া আছে। অদ্বৈতবাদের নামে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ শুষ্কজ্ঞান-বিচার ও দুর্নীতি, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই তিনি এই বিকৃত অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি যে সকল তথাকথিত অদ্বৈতবাদীকে শ্রীচৈতন্য দেব বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই উপলব্ধিহীন শুষ্ক অদ্বৈতমতেরই প্রচারক ছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থ একবাক্যে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বন্যায় বিকৃত অদ্বৈতবাদ ভাসিয়া যাওয়ায় অনেক শাস্ত্রজ্ঞানহীন বৈষ্ণব প্রকৃত অদ্বৈতবাদের নামেও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। অদ্বৈত বেদান্ত ও জ্ঞানকর্ম্মের নামে কতিপয় বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তির বিদ্বেষের মাত্রা এতদূর প্রবল যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা বৈশেষিকী মুক্তির বিনিময়ে "বৃন্দাবনের শৃগালত্ব" পর্য্যন্ত কামনা করিয়াছেন * এবং কেহ বা জ্ঞান-কর্ম্মকে "বিষের ভাণ্ড" বলিয়া প্রচার করিয়া মহাপ্রভুর অত্যুদার প্রেমধর্ম্মের নামে হিংসা-বিদ্বেষাগ্নিতে সমাজকে দগ্ধ করিয়াছেন †। আশ্চর্য্যের বিষয় যে কতিপয় বৈষ্ণবগ্রন্থকার অনেক স্থলে এই সকল বিদ্বেষপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মুখ-পদ্ম-বিনিসৃত বলিয়া প্রচার করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদারতায় কলঙ্ক-

* "বরং বৃন্দাবনারণ্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং।
নতু বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন॥"
—বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিনী॥

† "কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফেরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার গতি অধঃপাতে যায়॥"
—নরোত্তম দাস।

কালিমা লেপন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সঙ্গে বেদান্তধর্ম্মের এবং তৎপ্রচারিত প্রেমভক্তির সঙ্গে জ্ঞান-কর্ম্মের কোনও পার্থক্য নাই। বৈষ্ণবের "কৃষ্ণপ্রেম" এবং বৈদান্তিকের "ব্রহ্মজ্ঞান" একার্থ বোধক। বৈষ্ণবের পরম পবিত্রগ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যারে কহে নাহি যাঁর সম॥
ভক্তিযোগে ভক্তপায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যৈছে স্ববিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞানযোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মারূপে তারে করে অনুভব॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা॥"

উদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতে বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে শুধু বেদান্ত ধর্ম্ম বলিয়া কেন, কোন ধর্ম্মের এবং ভক্তিযোগের সঙ্গে জ্ঞান বা কর্ম্মযোগের কোন বিরোধ বা পার্থক্য নাই। বেদান্তের "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" এবং চৈতন্য-চরিতামৃতের "একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ" সম্পূর্ণ একার্থবাচক। বৈষ্ণবের আদরের ধন ভাগবতেও বৈদান্তিকের "ব্রহ্ম" ও বৈষ্ণবের "কৃষ্ণ" এক ও অভেদ (নাম মাত্র ভেদ) বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে *। কথিত আছে যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে অবস্থান করিবার সময়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট তিনি ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা সুন্দররূপে প্রমানিত হয় যে তিনি বেদান্ত-সূত্রের প্রামাণ্যও অস্বীকার করেন নাই।

ধর্ম্মের অভিধানে জ্ঞান ও প্রেমভক্তির কোন পার্থক্য নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন "শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক।" জ্ঞান ও

* "ব্রহ্মকৃষ্ণয়োঃ কিরণার্কোপমাযুষোর্যথা
কিরণস্য সূর্য্যস্য ঐক্য কিরণরূপং ব্রহ্মসূর্য্যরূপঃ কৃষ্ণঃ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রেম উভয়েই পূর্ণতায় পৌঁছিয়া এক হইয়া যায়। জ্ঞান যাঁহাকে এক বলিয়া দেখাইয়া দেয়, প্রেম তাঁহাকেই এক করিয়া ফেলিতে চায়। প্রেমিক প্রেমাস্পদের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে সচেষ্ট। প্রেম ভেদ পার্থক্য রাখিতে চায় না, প্রেম প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে এক করিতে চায়। জনৈক পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন—"প্রেমের মানসাঙ্কে একে একে দুই না হইয়া এক হয়।" তুমি যাঁহার গুণে আকৃষ্ট তাঁহার সহিত তোমার মিলিত হইবার চেষ্টা,—তাঁহার মধ্যে তোমার আপনাকে বিলাইয়া দিবার যে আগ্রহ, তাহারই নাম প্রেম। শুদ্ধা জ্ঞানভূমিতে অধিরোহণ করিয়া জ্ঞানযোগী যেমন "তত্ত্বমসি" বলিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক আত্মার সঙ্গে আপনার অভিন্নত্ব প্রত্যক্ষানুভব করিয়া "ব্রহ্মানন্দে" নিমগ্ন হন, শুদ্ধ প্রেম লাভ করিয়াও ভক্ত তেমনি প্রেমাস্পদের "রসোবৈ সঃ" মূর্ত্তি চরাচর-ব্যাপী এক অখণ্ড বিশ্বাত্মার সঙ্গে অভেদরূপে দর্শন করিয়া অনির্ব্বচনীয় "প্রেমানন্দে" নিমজ্জিত হইয়া থাকেন। প্রেমিক ভক্ত এই দেবদুর্লভ অবস্থা লাভ করিলে—

"স্থাবরজঙ্গম দেখে না, দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
সর্ব্বজীবে হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

—চৈতন্য-চরিতামৃত।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য এই শুদ্ধ প্রেমের রাজ্যে গমন করিয়া বলিয়াছেন,—

"সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণবিদ্যমান।"

—চৈতন্য-চরিতামৃত।

এই অনির্ব্বচনীয়—প্রেমোন্মত্ততায় বিভোর হইয়া শ্রীরাধা আপনার প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে—

"কোথাকৃষ্ণ পরমাত্মা সর্ব্বজন প্রাণ।"

—দুর্লভসার।

বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

"তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।"

—জ্ঞানদাস।

এই প্রেমে আত্মহারা হইয়া সর্ব্বভূতে প্রেমাস্পদকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া প্রেমের জীবন্তপ্রতিমূর্ত্তি গোপবালাগণ বলিয়াছেন,—

"যে দিকে ফিরাই আঁখি সর্ব্বকৃষ্ণময় দেখি"

—চৈতন্য চরিতামৃত।

বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিলে দেখা যায়,—দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব-কবিগণ প্রেমমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যে ভাবঘন দেববাঞ্ছিত অবস্থাকে "বিবহোন্মাদ" প্রভৃতিনামে অভিহিত করিয়াছেন, উহাদের সঙ্গে বেদান্তের অদ্বৈতানুভূতির কোন পার্থক্য নাই। প্রেমিক বৈষ্ণব-কবি ভগবান শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রেমোন্মাদ বর্ণনা প্রসঙ্গে গাহিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে, মালসাট মারে বুকে,
ক্ষণে বোলে মুঞি সেই ঠাকুরে।"

—পদ কল্পতরু।

পুনশ্চ,—

"কৃষ্ণ বলে তোব মোর নাহি কিছু ভেদ।
তোর মোর সর্ব্বথা নাহিক বিচ্ছেদ॥"

—দুর্লভসার।

আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যজীবনেও দেখিতে পাই,—তিনি যখন সমাধির উচ্চতর অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিতেন, তখন আপনাকে "সর্ব্বব্রহ্মময়ং জগৎ" রূপে দর্শন কবিতেন এবং যখন নিম্নভূমিতে বিচরণ করিতেন তখন "প্রভু ও দাস" রূপে আরাধনা করিতেন। ভগবান শ্রীচৈতন্যের জীবনীতেও এই দৃষ্টান্ত বিশেষরূপে পরিস্ফুট, এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব-কবি স্পষ্টভাষায় লিখিয়াছেন,—

"অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
খেনে বোলে মুঞি পহুঁ, খেনে বোলে দাস॥"

—পদকল্পতরু।

আধুনিক তথাকথিত বৈষ্ণবগণ গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাবশে যাহাই বলুন না কেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পুণ্যজীবনে এবং বৈষ্ণবের প্রামাণ্য শত শত ভক্তিগ্রন্থে বেদান্তের অদ্বৈতভাব পূর্ণরূপে পরিস্ফুট।

বৈষ্ণবচূড়ামণি মহাত্মা মধ্ব, বল্লভ, রামানন্দ প্রভৃতি প্রতিভাশালী বৈষ্ণবগণ দ্বৈতভাবের প্রচারক হইয়াও পরোক্ষভাবে অদ্বৈত বেদান্তকে ধর্ম্মজ্ঞানের চরম অভিব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-কুলপাবন প্রেমভক্তির জীবন্ত-বিগ্রহ রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মতাবলম্বী হইয়াও অদ্বৈত বেদান্তকে এক অপূর্ব্ব আকারে নিজস্ব ভাবে ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ভক্তপ্রবর তুলসীদাস গাহিয়াছেন,—

"সো তৈঁ তোহি তোহি নহি ভেদা।
বারিবীচি ইব গাও বহি বেদা॥
সোঽহমস্মি ইতিবৃত্তি অখণ্ডা।
দীপশিখাছই পরম প্রচণ্ডা॥
আতম অনুভব সুখ সুপ্রকাশা।
অভবমূল ভেদভ্রম নাশা॥"

তুলসীদাস-রামায়ণ।

নব্য বৈষ্ণব শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণাদি প্রাচীন বৈষ্ণব-শাস্ত্র অনুশীলন করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে বেদান্তের অদ্বৈত-বাদ ঐ সকল ভক্তি গ্রন্থাবলীতেও বৈষ্ণবধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রমাণিত। বৈষ্ণব-বেদ ভাগবতের "আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধয়া দেহ সর্ব্বতঃ," "জীবঃ শিবঃ জীবঃ শিবঃ ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ" ও "অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাঽবস্থিতঃ সদা" প্রভৃতি শত শত শ্লোক এবং বৈষ্ণবের পরম-প্রিয়গ্রন্থ বিষ্ণুপুরাণের "সোঽহং সচ ত্বং সচ সর্ব্বমেতদাত্মরূপং ত্যজ ভেদ-মোহম্" প্রভৃতি বাক্য মুক্তকণ্ঠে বেদান্তের অদ্বৈত ভাবকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করিতেছে।

দ্বৈতভাবে উপাসনা,—প্রতীক উপাসনা প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বর্ণমালা মাত্র। এখন বালক যদি বর্ণমালা শিখিতে গিয়া জীবন অতি-বাহিত করে তবে কখনই তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না; এবং তাহার বর্ণমালা-জ্ঞানই যে জ্ঞানের এবং শিক্ষার চূড়ান্ত সীমা—এই বলিয়া যদি সে আস্ফালন করে তাহা হইলে তাহাকে উপহাসাস্পদ হইতে হয়, সেইরূপ কোন সাধক যদি দ্বৈতভাব সাধনই সাধন-রাজ্যের চরম বলিয়া

নির্দ্দেশ করেন তাহা হইলে কথনই তাঁহাকে উন্নত বা বিচারশীল বলা যাইতে পারে না ।

(ক্রমশঃ) —ধ্যানচৈতন্য ।

দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ

স্বদেশ মন্ত্রের আদি সাধক, বর্ত্তমান ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞদের প্রথম গুরু শ্রীযুক্ত দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ স্বীয় ত্যাগ, দেশভক্তি, অধ্যবসায়রূপ আদর্শ উত্তরাধিকার সূত্রে বাঙ্গালীর জন্য রক্ষা করিয়া বিগত ২২শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বেলা ১টার সময় এ নরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। বিকৃত মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা প্রসূত উন্মত্ত স্বদেশ সেবা তাঁহার ছিল না, তাঁহার সাধনে ছিল আন্তরিকতা, বিবেচনা এবং অদম্য অধ্যবসায়। যৌবনে প্রথম পদার্পণ হইতে এই বার্দ্ধক্যাবধি তিনি স্বদেশের কল্যাণ চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতা ও অত্যাচারের মধ্যে মানুষ কথনও এতকাল ধরিয়া একটা জিনিষকে ধরিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার কার্য্যে ও যুক্তিতে ভুল থাকিতে পারে কিন্তু সেই ভুল দিয়া জাতিকে ঠকাইবার বা ভুল পথে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। বিজ্ঞাপনের ভুঁইফোঁড় স্বদেশী আজ হইবে কাল যাইবে, ঠিক যেন একরাত্রে দালালী করিয়া বড়লোক। কিন্তু যাহারা বোনেদী তাহারা নিজেদের চাল চলন কথন ত্যাগ করে না, তাহাদের জীবনের একটা উদ্দেশ্য ও আদর্শ ঠিক আছে, সেটাকে কর্ম্মজীবনে সার্থক করিয়া তুলাই তাহাদের জীবনের ব্রত। আদর্শের ছোট বড় আছে তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু আদর্শ ছোট বলিয়া তো আমরা তাহাকেও গালাগালি করিতে পারি না। দেখিতে হইবে তাহার আন্তরিকতা এবং আন্তরিকতার লক্ষণ জীবনব্যাপী আদর্শে একনিষ্ঠতা। সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে, তাঁহার সকল দোষ সত্ত্বেও, ঐ গুণ গুলি দেখিতে পাই, তাই বলি তিনি মহৎ, তাঁহার অন্তর্দ্ধানে দেশের সমূহ ক্ষতি। শ্রীভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

রামকৃষ্ণ বন্দনা

নমো নমঃ জয় জয় নমস্তে করুণাময়
ব্রহ্ম অংশে রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম-অবতার।
জন্মিয়া কামারপুরে বসিলে দক্ষিণেশ্বরে
করিলে দ্বাদশবর্ষ তপঃ সুদুশ্চর॥
প্রেমময়ী শ্রীমা সনে আসিয়ে মর্ত্ত ভুবনে
শিখালে মানবগণে তরালে সংসার।
কামনারে দিয়ে সাজা করিলে ষোড়শীপূজা
রমণী জননীরূপা শ্যামা মা আমার॥
বাজালে সাধনা বাঁশী আনন্দ সলিলে ভাসি
আসিল ভক্তবৃন্দ উল্লাসে অপার।
স্বামিজী শিবশঙ্কর লঙ্ঘিয়া সিন্ধু অপার
জগতে করিলা সেবা-ধর্ম্মের প্রচার॥
যত জীব শিব হয় শিব ছাড়া জীব নয়
প্রাণপণে কর সাধু লোক-উপকার।
যত দেববৃন্দ সবে নররূপে আসে ভবে
দিতে শিক্ষা ধর্ম্মরক্ষা জগত উদ্ধার॥
সত্য ধর্ম্ম প্রচারিয়া স্বস্থানে গেলে চলিয়া
বিশ্ব জুড়ে রামকৃষ্ণ নামের হুঙ্কার।
ওহে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী লয়ে যোগৈশ্বর্য্য ঝুলি
দেখালে জগতে খুলি শান্তির আগার॥
জয় ব্রহ্মসনাতন জয় সাঙ্গোপাঙ্গগণ
পতিত পাবন প্রভু পাতকী উদ্ধার।
রত্নাকর মসীপাত্রে বীণা-পাণি ব্যোমগাত্রে
লিখিতে না পারে তব মহিমা অপার॥
ধন্য কলি ধন্য ধরা ধন্য গঙ্গা পাপহরা
ধন্য রাণী রাসমণী নায়িকা তোমার।
পতিত পাবন তুমি পতিত পাতকী আমি
হর দুঃখ হর পাপ দীন সারদার॥

শ্রীসারদা দাসী।

মাধুকরী

১। মহাত্মাজী ও মূর্ত্তিপূজা।

"নবজীবন" পত্রে মহাত্মা গান্ধী "কন্যা কুমারী দর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধে মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"যে সময়ে আমি কন্যাকুমারীর দেবমন্দির দেখিতেছিলাম, সেই সময়ে আমার মনে হইল, মূর্ত্তিপূজা হিন্দুদের অজ্ঞানতার পরিচায়ক নহে, উহা তাঁহাদের জ্ঞানেরই পরিচয়। মূর্ত্তিপূজার পথ দেখাইয়া হিন্দুগণ এক ঈশ্বরকে অনেক ঈশ্বর বলেন নাই, বরং তাঁহারা জগৎকে উহাই প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মনুষ্য এই ঈশ্বরকে অনেকরূপে পূজা করিতে পারে এবং মানুষ এই ভাবেই ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে। খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণ নিজদিগকে মূর্ত্তিপূজক বলিয়া স্বীকার করেন না কিন্তু উঁহারা নিজেদের কল্পনাকে পূজা করেন, সেই হিসাবে উঁহারাও মূর্ত্তিপূজক। মসজিদ, গির্জ্জাও এক প্রকার মূর্ত্তি-পূজা. উহাতে যাইয়া আমি অধিকতর পবিত্র হইব এই কল্পনাও মূর্ত্তিপূজা। আর উহাতে দোষও কিছু নাই। কোরাণ এবং বাইবেলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারের কথা আছে এই কল্পনাও মূর্ত্তিপূজা, উহাতেও কোন দোষ নাই। হিন্দুগণ উহাদের অপেক্ষাও অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন যাহার যেরূপ পছন্দ হয়, সেইরূপে ঈশ্বরকে পূজা কর। যে লোক পাথর, সোণা বা রূপার মূর্ত্তিতে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া নিজে চিত্তশুদ্ধি করে, তাহার মোক্ষ লাভের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

২। দেশবন্ধুর বাণী।

(ক)

অহঙ্কারের অবসান না হইলে প্রেমের জন্ম হয় না।

(খ)

সাধনার পথে সাধক বিশ্বের দর্পণে তাহার নিজের মুখের ছায়া যখন দেখে, তখন তাহার সত্যরূপ প্রকটিত হয়।

(গ)

মানুষের যে অন্তর্নিহিত শক্তি, তাহার যে আত্ম-সম্বিত, তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেওয়া, সিংহকে জাগাইয়া দেওয়া, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার ধর্ম্মকে ফুটাইয়া তোলাই শিক্ষা-দীক্ষার কার্য্য।

(ঘ)

সকলেই বলে যে দাসত্ব হইতে মুক্তি। আমি তাহার সঙ্গে আরও বলিতে চাই—পাপ হইতেও মুক্তি! কে এই পাপ করে? আমি বলি, যে দাসত্বের লৌহ-শৃঙ্খল ক্রীতদাসের গলায় বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া দেয়, সেই পাপ করে। আমি আরও বলি, যে ক্লীব ভীরু দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার সময় বাধা দেয় না সেও পাপ করে।

(ঙ)

আমাদের জাতির সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার যে আদর্শ, তাহাই স্বরাজ।

(চ)

কোন জাতির সংস্কার অন্য জাতির আদর্শে সম্ভব হয় না। আমাদের যে সব সংস্কারের আবশ্যক, তাহা আমাদের স্বভাব-ধর্ম্মের মধ্যে যে সব শক্তি নিহিত আছে, তাহার বলেই হইবে।

(ছ)

জীবন গড়িবার সময় ত্যাগের সময়—ভোগের নয়। আমাদের এখন বিলাতি আদর্শ জনিত যে বিলাসের ভোগ তাহা দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে।

(জ)

আমাদের সব চেয়ে বেশী বিপদ যে, আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহারে অনেকটা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি।

(ঝ)

বাঙ্গালী আবার বাঙ্গালী হইতে না পারিলে ভারতবর্ষে তাহার স্থান নাই। পৃথিবীর এই মহা প্লাবনে সে হয়ত বা এবার ভাসিয়া যাইবে, কূল পাইবে না। বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে এ প্লাবন শুধু ত্রয়োদশ শতাব্দীর সপ্তদশ অশ্বারোহীর অভিযান নয়। ইহা পলাসীর প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতক-

তাব জীর্ণদ্বাবে ক্লাইবের পদাঘাতও নয়। আমি মানস-চক্ষে দেখিতেছি. ইহা তাহা অপেক্ষাও নির্ম্মম,—তাহা অপেক্ষাও ভয়াবহ,—তাহা অপেক্ষাও শোনিত-পিচ্ছিল।

(ঐ)

বাঙ্গলাব আধুনিক উপন্যাস-সমুদ্র যদি কেহ মন্থন কবিতে চান, তবে দেখিবেন রিরংসাব বিষে,—এবং তাহাও আমি বলি. ফেবঙ্গ-বিবংসা,—বাঙ্গলার তরুণ-তরুণী আকণ্ঠ নিমজ্জমান। এত যে বিষ,—তাহা যদি সমাজে ও সাহিত্যে সত্য হয়, তবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি—"লাখে না মিলিল এক"—একটিও নীলকণ্ঠ আমি বাঙ্গালায় পাইলাম না, এই আমাব আক্ষেপ।

("বঙ্গবাণী", শ্রাবণ, ১৩৩২।)

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়

(১) রসাঙ্কুর—প্রণেতা শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ। চুঁচুড়া হইতে গ্রন্থকাব কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৸০ আনা।

কবিতার বই। ইহাব অনেকগুলি কবিতা "উদ্বোধনে" পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাগুলি সরস, স্বাভাবিক ও বৈচিত্র্যময়। "বিধবা" নামক কবিতাটিব মত উচ্চ ভাবেব কবিতা পূর্ব্বে আমরা পড়ি নাই। ঐ বিষয়ে আমবা যত কবিতা পড়িয়াছি, তাহা কেবল দুঃখ, বেদনা ও অশ্রুমাখান, কিন্তু 'রসাঙ্কুবেব' কবি উহাব ধাব দিয়াও যান নাই। তিনি ভাব ও কবিত্বেব তুলিকা সম্পাতে হিন্দু-বিধবাব নিঃস্বার্থ সেবা, সহিষ্ণুতা, পবিত্রতা ও বিশ্বজনীন প্রেমের একটি নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছেন।

পাঠকগণের অবগতির জন্য কবিতাটির কোন কোন অংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম,

"* * * নহ তুমি আর আগেকার,
আপনার ক্ষুদ্র সীমা চরাচরে করিয়া বিস্তার
মূর্ত্তিমতী দেবীসম দাঁড়ায়েছ অঙ্গনের তলে,
বাড়াইয়া দুটি কর স্নেহ কণ্ঠে ডাকিছ সকলে
হৃদয়ের অন্তঃপুরে।
* * * রুদ্ধ প্রেম আজি শত পথে
সসীমের বন্ধটুটি, অসীমের অচঞ্চল স্রোতে
পড়িছে ঝর্ঝর রবে, অপগত আকাঙ্ক্ষা নিচয়
প্রভাতের পদ্মসম প্রস্ফুটিত কৈশোর হৃদয়
করুণা-শিশির-সিক্ত, সকলেরে বলে লয় টানি,
নাহি তথা আত্মপর, নাহি স্বার্থ, নাহি কোন গ্লানি,
আপনার ভালমন্দ দুই পায়ে করিয়া দলন
পরহিত ব্রতে দেবী করিয়াছ আত্ম নিবেদন।"

শেষে কবি এই 'কর্ম্মময়ী সন্ন্যাসিনী'কে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন,—

"মূর্ত্তা সহিষ্ণুতা তুমি, ধৈর্য্যময়ী ধরিত্রীর প্রায়
আছ স্থির অচঞ্চলা জগতের স্তুতি বা নিন্দায়
কিছুই আসে না তব, কর্ম্মময়ী সন্ন্যাসিনী ভবে
তুমি দেবি আছ বসি আপনার স্বর্গীয় গৌরবে
অঙ্কে ধরি সর্ব্বজীবে, পূত করি অপগু অবনী
নমো নম অনিন্দিতা হে বরেণ্যা সংসার জননী।"

ইহা ছাড়া 'আর্য্যভূমি' 'বরষা' 'শরতের গান' 'দামোদর' 'নদী তীরে', 'শ্রীহীন ব্রজ' প্রভৃতি কবিতাগুলি কবিত্ব ও উচ্চভাবের সমাবেশে এক অপূর্ব্ব রস-বাহুল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। 'কবি ও যোগী' কবিতাটি বেশ উপভোগ্য। যোগী বলিতেছেন,—

বিলাসী ভাবুক।
ঢালিও না অর্ঘ্য আর সুন্দরীর পায়

ক্ষণিক অস্থায়ী এই ক্ষণস্থায়ী সুখ
সার্থকতা কোথা তার ? জলবিম্ব প্রায় ।”

কবি উত্তর দিলেন, “* * * * * নারীর ধেয়ানে আমি লভিব নির্ব্বাণ ।” আমরা কবির সেই ‘নির্ব্বাণের’ অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম ।।

আশা করি, ‘রসাঙ্কুর’ বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে আদৃত হইবে ।

(২) নারী-কল্যাণ—লেখিকা শ্রীমনোরমা দেবী । প্রকাশক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৫।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

পুস্তকখানি লেখিকার ধর্ম্ম-জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস । ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত না করাই উচিত ছিল । ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ, তাহাকে অন্তরের বাহির করিতে নাই ।

(৩) আদর্শ পুরুষ—প্রকাশক শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় । ইডেন হিন্দু হোষ্টেল, কলিকাতা । পুস্তিকাটি, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের একটি ইংরাজি বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ । মূল্য /১০ আনা ।

(৪) অঞ্জলি—বেলুড়মঠ হইতে স্বামী ধ্যানানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কয়েকটি স্তোত্র সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । মূল্য /০ আনা ।

(৫) মহামন্ত্র—প্রকাশক শ্রীনির্ম্মলকৃষ্ণ দেব । ৭৮।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’, ‘লীলা প্রসঙ্গ’ ও ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ’ হইতে লইয়া ধ্যান, ধারণা, জপ ও পাঠ করিবার জন্য এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হইয়াছে । মূল্য ৵০ আনা ।

(৬) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়—বেলুড়, ১৯২৪ সালের কার্য্য বিবরণী—উল্লিখিত বৎসরে ৯৯৭৯ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে । স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ ছাড়া সালখিয়া, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, রামবাজাতলা, বরানগর প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ নিকট ও দূরবর্ত্তী গ্রামবাসিগণও এখান হইতে সাহায্য পাইয়া

থাকে। ঔষধ ও চিকিৎসা ছাড়া প্রয়োজন হইলে রোগীদিগকে পথ্যও সাহায্য করা হয়। গত বৎসর হইতে, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ জনৈক সন্ন্যাসী কালাজ্বরের ইনজেক্‌সন্ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহাতে বেশ সুফলও দেখা গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৩৩ জন রোগীকে কালাজ্বরের চিকিৎসা করা হইয়াছে। সপ্তাহে নিয়মিতরূপে দুইবার ইনজেক্‌সন্ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিম্নলিখিত চিকিৎসক ও দাতাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন, তাঁহারা প্রয়োজনকালে "মিশনকে" নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

(১) ডাঃ বি, বি ঘোষ এম, বি, কলিকাতা। (২) ডাঃ ডি, পি, ঘোষ বি, এ, এম, বি। কলিকাতা। (৩) ডাঃ এস, পি, মুখার্জ্জি, এম, বি। কলিকাতা। (৪) ডাঃ কে, সি, বক্সী এম, বি, কাশীপুর। (৫) ডাঃ এইচ, ডি, ব্যানার্জ্জী (হোমিওপ্যাথ), বালী। (৬) মেসার্স, বি, কে, পাল, কলিকাতা। (৭) বালী মিউনিসীপালিটী। (৮) সার ওঙ্কার মল জেটিয়া, বড়বাজার, কলিকাতা। (৯) দি ইণ্ডিয়ান ক্যামিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড্, কলিকাতা। (১০) দি বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা।

এই সেবা প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করিয়া যাঁহারা নিজের এবং সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ সাধন করিতে চান, তাঁহারা অর্থ, ঔষধ ও পথ্যাদি —প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় (হাওড়া) এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

(৭) রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেণ্টস্ হোম—কলিকাতা, ১৯২৪ সালের কার্য্যবিবরণী।

আলোচ্য বর্ষে ১৪টি বিদ্যার্থীকে আশ্রমে রাখা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৮টি ফ্রী, ২টি হাফ্ ফ্রী, বাকী ৪টি বালক নিজেদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করিয়াছেন।

দুইটি বিদ্যার্থী বি, এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন একটি 'ডিস্‌টিংসনে'

(Distinction), অন্যটি 'অনার্সে' (Honours) পাস করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আর একটি বিদ্যার্থী আই, এস্-সি, পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

'হোমের' কর্তৃপক্ষগণ আনন্দের সহিত জানাইতেছেন যে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ জি, সি, বসু একটি বিদ্যার্থীর সমস্ত ব্যয়ভার এবং অন্য তিনটির আংশিক ব্যয়ভার বহন করিয়া সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। ডাঃ ডি, এন, ব্যানার্জ্জি, এম, ডি, ডাঃ ধর্ম্মদাস সামন্ত, এম, বি এবং ডাঃ এ, এন, রায় চৌধুরী এম, বি, মহোদয়গণও বিনা পারিশ্রমিকে বালকগণের চিকিৎসা করায় কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

১৯২৪ সালে 'হোমের' মোট জমা ৬২৭৬৶৴০ এবং মোট খরচ ৪৬০৬৵১০।

কলিকাতার অন্তঃপাতী কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে এক শত বিদ্যার্থীর বাসোপযোগী 'হোমের' নিজস্ব একটি প্রশস্ত বাড়ীর বিশেষ প্রয়োজন। উহার জন্য বর্ত্তমানে ৮০০০০ হাজার টাকা অত্যাবশ্যক। আশা করি সহৃদয় দেশবাসী, ভারতের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা স্কুল বালক ও যুবকগণের জীবন-গঠনোপযোগী এমন একটি মহৎ প্রতিষ্ঠানে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া নিজের ও জাতির কল্যাণ সাধন করিবেন।

(৮) অমর-কানন আশ্রম ও গঙ্গাজলঘাটী (বাঁকুড়া) জাতীয় বিদ্যালয়ের কার্য্য বিবরণী, ১৩২৯ সাল ফাল্গুন—১৩৩১ পৌষ।

"আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এই আদর্শে দৃঢ় থাকিয়া ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান যুগের অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্যে খাঁটি মানুষ গঠনে সাহায্য করাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

১৩৩০ সালের মাঘ মাসে এই বিদ্যালয়টি গঙ্গাজলঘাটি গ্রাম হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই নূতন অবস্থানটি তিন মাইলের মধ্যে ২৯টি গ্রামের মধ্যস্থলে হওয়ায় স্থানীয় ছেলেদের শিক্ষার সুযোগ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

নয় জন শিক্ষিত যুবক এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১৫০ জন।

উপযুক্ত ছাত্রগণকে এবং স্থানীয় উৎসাহী অনেক যুবককে এযাবৎ সুন্দর ভাবে খদ্দর প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত ছাত্র সূতা প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়াছে এবং অনেকেই বেশ সরু সূতা কাটিতে পারে। এখানে খদ্দরের নানা প্রকার কাপড়, চাদর, গামছা, জামার থান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

বিদ্যালয়ে কৃষির উপযোগী ২০ বিঘা জমি আছে। ঐ জমীতে ছাত্র ও শিক্ষকগণ আলু, কপি, বেগুন, লাউ, কুমড়া, কাপাস প্রভৃতি স্বহস্তে চাষ করেন।

গঙ্গাজলঘাটীর অন্তর্গত জামবেদে গ্রামের অগ্নিকাণ্ডে ঐ গ্রাম নষ্ট হইয়া গেলে আশ্রমের সেবকগণ ভস্মসাৎ গৃহের সংস্কার, বিপন্নদিগের সাময়িক আহারের ব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় সেবা কার্য্য করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মেলা, উৎসব প্রভৃতিতে শৃঙ্খলা রক্ষা, আর্ত্তসেবা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য সেবকগণের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে।

আলোচ্য কালের মধ্যে ছয় জন বিদ্যার্থী আশ্রমে বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে। আশ্রমবাসিগণ তাহাদের অধিকাংশ কার্য্য যথা—রান্না কার্য্যে সাহায্য করা, কাপড় কাচা প্রভৃতি নিজ হস্তে করিয়া থাকেন। এখানে বাসের জন্য প্রত্যেক বিদ্যার্থীর মাসিক দশ টাকা করিয়া ব্যয় হয়।

আলোচ্য বর্ষদ্বয় বিদ্যালয়ের মোট আয় ৬৪১৪৬১৫ এবং মোট ব্যয় ৬০৪৫৬৯/০।

জাতীয় বিদ্যালয়ের কার্য্য বিবরণী পাঠে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এইরূপ নিঃস্বার্থ, উদ্যমী, ত্যাগী ও শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা দেশে যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্গীয় যুবকগণের নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করিয়াছিলেন। সেই আশার ক্ষীণালোক যেন আমরা অদূরে দেখিতে পাইতেছি।

সংঘ-বার্ত্তা

১। মেদিনীপুর জেলার হরিনগর শ্রীরামকৃষ্ণ নৈশ বিদ্যালয় ও স্ত্রী বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বিগত ২৮শে জুন স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ ও স্বামী প্রশান্তানন্দ তথায় গমন করেন। এতদুপলক্ষে তাঁহারা বহুগ্রামে ধর্ম্ম ও পল্লিসংগঠন বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা রঘুনাথপুরে একটি সাপ্তাহিক ধর্ম্মালোচন সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বামিজিদ্বয় ৩০শে জুন চক্ জয়কৃষ্ণপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করেন। ৩রা জুলাই হরিনগরে উপস্থিত হইয়া স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ তথায় একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ৫ই জুলাই রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ নৈশ বিদ্যালয় ও স্ত্রী বিদ্যালয়ে বাৎসরিক উৎসব ও পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের বহু ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলারা তাহাতে সানন্দে যোগদান করেন। সভায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাতরা ও রামনারায়ণ দেব মহাশয় স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার পর স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ এবং শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাব্যাপী তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তৎপরে স্বামিজিদ্বয় নিমন্ত্রিত হইয়া নতুক্ গ্রামে গমন করতঃ তথায় ধর্ম্ম-চর্চ্চা এবং একটি পাক্ষিক ধর্ম্মসভা গঠন করিয়াছেন। পুনরায় ৭ই জুলাই তাঁহারা খড়ার গ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বেদান্ত মন্দিরে ধর্ম্মালোচনা এবং ভজন গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ ও ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করেন।

২। বিগত ২৯শে বৈশাখ মঙ্গলবার বিক্রমপুর (ঢাকা) মধ্যপাড়াস্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে পরমহংসদেবের জন্মোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হইতে ব্রহ্মচারী অমলচৈতন্য ও ব্রহ্মচারী পরেশচৈতন্য তথায় গমন করিয়া উৎসবে যোগদান করেন। উৎসব-সভায় শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র সেনগুপ্ত "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ" শীর্ষক একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করার পর ব্রহ্মচারী অমলচৈতন্য আশ্রম পরি-চালনা, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

৩। বিগত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ মধ্যপাড়া আবাদপুর (টাঙ্গাইল) শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ আশ্রমের সেবকবৃন্দ কর্ত্তৃক পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে 'দরিদ্র-নারায়ণ' সেবা ও আনন্দোৎসব হইয়া গিয়াছে। জামালপুর (মৈমনসিংহ) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে ব্রহ্মচারী সুখচৈতন্য তথায় গমনপূর্ব্বক "সেবাধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ছিলেন।

৪। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য, স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সহ-কর্ম্মী, মান্দ্রাজ ও ব্যাঙ্গলোর (মহীশূর) মঠের প্রতিষ্ঠাতা ভক্ত-বীর শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর (শশী মহারাজ) জন্মতিথি পূজা বিগত ২রা শ্রাবণ বেলুড়-মঠে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের সমক্ষে মঠের জনৈক সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ শশী মহারাজের আদর্শ জীবন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

পূজা

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীতে নব যুগের সূচনা আনিয়াছে। বিশ্বাসে, ধর্ম্মে, সাধনায় ও উপলব্ধিতে তাঁহার অসাধারণ জীবনের তীব্র আলোক সম্পাত আদর্শকে নবীনরূপে প্রতিফলিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের নয়ন-মনের গোচর করিয়াছে। তাঁহার শরীর ধারণ বহুলোকহিতায়। তাহা শুধু তথাকথিত জ্ঞান-ভক্তির উচ্চ মণিকোঠায় উঠিয়া অলস-মদিরায় ডুবিয়া থাকা নহে, পরন্তু পণ্ডিতম্মন্য মানবের প্রাণহীন চিরাচরিত শিক্ষায় বিপুল সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তি, সমাজ, এবং জাতির দেহ, আচরণ ও চিন্তায় উদ্দাম প্রাণস্পন্দের অনুভব করানও ছিল তাঁহার মানব-দেহ ধারণের উদ্দেশ্য।

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় অখণ্ড ভাগবত রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়াও তাঁহার বিচিত্র সাধনা ষোড়শী পূজায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। নবযৌবনসম্পন্না, সর্ব্বাভরণভূষিতা, ষোড়শী স্ত্রীর শরীরাবলম্বনে সচ্চিদানন্দময়ীর সাক্ষাৎ পূজা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সাধনার ইতি করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিকর্ম্মের মূল—লোকশিক্ষা। ইহা তো বিস্মৃত হইবার নহে যে তাঁহার এই নারীপূজা, সমস্ত মানব জাতিকে শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবার একটি বিশেষ ইঙ্গিত। মায়ের নারীরূপ আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার ভুবনমোহিনীরূপের ছটায় মুগ্ধ আমরা বহুযুগ ধরিয়া তাঁহাকে কেবল কামকৌতুক লালসার বিষয়রূপে উপাসনা করিয়াছি। এখন, এ যুগের যুগকর্ত্তা তাঁহাকে জননীরূপে

পূজা করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। নারীর সহিত এই বিশুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধ যিনি স্থাপন করিয়াছেন, নারীর চক্ষে যিনি মাতৃস্নেহবিগলিত করুণার কটাক্ষ নিরীক্ষণ এবং তাঁহার মুখে মাতৃত্বের বিকাশ অনুভব করিয়াছেন, তিনিই জানেন সে সৌন্দর্য্যে কত অভয়, কত তৃপ্তি, কত শান্তি! মাতৃহারা কিরূপে বুঝিবে জননীর অঙ্কে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম লাভে কত আনন্দ। আজ সেই বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগের জন্য মাতৃহীন মানব সন্তানের কণ্ঠ বড়ই তৃষিত। তাহার মা কোথায়?

কে আজ তাহার মা হইবে? ওগো মঙ্গলময়ি নারি! তুমি আমাদের মা হইতে পারিবে? এই বাসনা বিক্ষুব্ধ হৃদয় তোমার সন্তানকে স্পর্শ করিয়া তাহার চির বিবংসাকে শান্ত করিতে পারিবে? ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় বারি, রোগে সেবা, বিপদে সহায়তা, অন্যায়ে ক্ষমা, কুবুদ্ধিতে শুভ মতি ও অমঙ্গলে মঙ্গল শীল সহস্রধারা পবিত্র ধারায় ঢালিয়া দিতে পারিবে কি? উচ্ছৃঙ্খল জগৎকে তোমার স্নেহনিবিড় বন্ধনে বাঁধিয়া শান্ত করিয়া ঐ উন্মাদ, ঐ দুঃস্থদের শূন্য জীবন তোমার কান্তি, তোমার শান্তি তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া দিয়া পূর্ণরূপে তুমি ভরিয়া দিবে কি? হে বিশ্বমায়ে! তুমি তো জীবন্ত প্রাণবন্তরূপে বসিয়াছ মাতৃরূপে, জায়ারূপে, ভগ্নীরূপে, কন্যারূপে জগৎকে পালন করিতেছ। আমরা জানি এই অসংখ্য নারীরূপে, বহুরূপে তুমি আছ। তুমি হাসিতেছ, খেলিতেছ, কথা কহিতেছ আরও কতরূপে আনন্দ করিতেছ। তোমার সহিত আমরাও হাসিয়া খেলিয়া আনন্দ করিতে চাই। এই অনাবিল আনন্দ-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত কর। হে মহামায়ে! তুমি অন্নপূর্ণারূপে অফুরন্ত আনন্দ সম্ভার তোমার নিরানন্দ, অখিল আনন্দ-পিয়াসী সন্তানগণের মধ্যে বিতরণ কর, যেন সেই অমৃত আস্বাদ তাহাদিগকে অমর করে, পূতি পর্য্যুষিত বিষয় রস ভুলাইয়া দেয়।

ভয়গ্রস্ত, প্রমত্ত আমরা, ওগো শিবে! চরাচরে তোমার বরাভয় করা মূর্ত্তি দেখিতে চাই। তোমার লালসাময়ী আসুরী মূর্ত্তি সংবরণ কর। আমরা তোমায় দেখিতে চাই, যেখানে তুমি গণেশ-জননীরূপে

শিশুর ওষ্ঠে হৃদয় নিংড়াইয়া করুণার ধারা ঢালিয়া দিতেছ, যেখানে সরলা সাধ্বী পল্লিবধূ নদীকূল আলো করিয়া সতীরূপে বিরাজমানা, যেখানে অবুঝ ক্রীড়াচঞ্চলা কুমারী উমার কলকণ্ঠে গৃহ প্রাঙ্গণ মুখরিত। যেখানে কাল-বৈশাখী, অনাদর, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মহামারী, মৃত্যু-বিভীষিকা, সেখানে তোমার অভয় কর, এবং যেখানে ত্যাগ, তপস্যা, অহিংসা, পবিত্রতা, সাধনা ও সিদ্ধি সেখানে তোমার বর মূর্ত্তির প্রকাশ দেখিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিতে চাই। চিন্ময়ি! তুমি শুধু সসীম, মৃন্ময় প্রতিমায় মাত্র তিন দিনের জন্য আসিবে, নিরানন্দ বাঙ্গালীর বুকে ক্ষণিক সুখ হিল্লোল তুলিয়া নবমী অন্তে আবার চলিয়া যাইবে ইহা মনে করিতেও বুক ফাটিয়া যায়। তোমার অসীম রূপকে রূপে রূপে আমরা বাঁধিয়া রাখিব, যে রূপে তুমি আমাদের সহিত কথা কহিবে, আনন্দ করিবে, আমাদিগকে ভালবাসিবে। ঐ যে গাভী, তাহার বৎসকে অসীম প্রেমভরে লেহন করিতেছে, ঐ যে বানরী তাহার শিশুকে নিশিদিন বুকে করিয়া ফিরিতেছে, ঐ যে মার্জ্জারী তাহার অসহায় শাবককে মুখে করিয়া গোপন-স্থান অন্বেষণ করিতেছে, ঐ যে জননী তাঁহার সন্তানকে চুম্বন করিতেছেন, ঐ যে সতী তাঁহার পতির জীবনের জন্য মরণের দ্বারে অতিথি, ঐ যে সহোদরা সহোদর গভীর স্নেহে পরস্পর লীলাময়, সেই অপরোক্ষ ভালবাসায় আমরা তোমাকে জাগ্রতরূপে উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা পোষণ করি। সে ভালবাসা, কল্পনা ও বিশ্বাসের সোণালি পাত মোড়া নহে, উহা সহজ, স্বতন্ত্র, সত্য, সবল ও অনাবৃত। কাল্পনিক বস্তুর উপর আপেক্ষিক সিদ্ধান্তের ন্যায় সে ভালবাসা বিরুদ্ধ তর্ক-যুক্তির ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় না, উহা জীবনের মরু-প্রান্তর আর্দ্র করিয়া এ মরজগতে বাস্তব স্বর্গ রাজ্যের সৃষ্টি করে।

জগৎ ভালবাসার জন্য পাগল। কিন্তু সে ভালবাসা পঙ্কিল বাসনার নামান্তর মাত্র। অতি ক্ষুদ্র, অতি দূষিত, অতি স্বার্থপূর্ণ সে ভালবাসা। সেই নারকীয় ভালবাসাকে তুমি শুদ্ধ করিয়া দাও, আমাদিগকে নিঃস্বার্থরূপে ভালবাসিতে শিখাও। যে অব্যক্ত প্রেরণায় রবিচন্দ্র, গ্রহ-

তারা, পরস্পর পরস্পরকে অবিরাম আকর্ষণ করিয়া একীভূত হইতে চাহিতেছে, মা। সেই একাত্মবোধক ভালবাসা আমাদের অন্তরে জাগাও। যে নিগূঢ় সর্ব্বগ্রাসী ভালবাসায় সমস্ত নীচতা, সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব, সমস্ত ভেদ চলিয়া গিয়া প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক হইয়া যায়, জননী। সেই মহাপ্রেমরূপে তুমি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূতা হও। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় প্রেমাঞ্জলি দানে আমরা প্রেমরূপিণী তোমার পূজা করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

পঞ্চম ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মৌনাবলম্বী শ্রীরামকৃষ্ণ ও মায়াদর্শন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে সকাল ৮টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত মৌন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আজ মঙ্গলবার ১১ই আগষ্ট, ১৮৮৫ খৃঃ; গতকল্য সোমবার অমাবস্যা গিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সঞ্চার হইয়াছে, তিনি কি জানিতে পারিয়াছেন যে, শীঘ্র তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন? জগন্মাতার ক্রোড়ে আবার গিয়া বসিবেন? তাই কি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন? তিনি কথা কহিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা কাঁদিতেছেন, রাখাল ও লাটুও কাঁদিতেছেন; বাগবাজারের ব্রাহ্মণীও এই সময়

আসিয়াছিলেন, তিনিও কাঁদিতেছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কি বরাবর চুপ করিয়া থাকিবেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, 'না'।

নারাণ আসিয়াছেন, বেলা ৩টার সময় ; ঠাকুর নারাণকে বলিতেছেন, "মা তোর ভাল করবে।"

নারাণ আনন্দে ভক্তদের সংবাদ দিলেন, 'ঠাকুর এইবার কথা কহিয়াছেন।' রাখালাদি ভক্তদের বুক থেকে যেন একখানি পাথর নামিয়া গেল। তাঁহারা সকলে ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালাদি ভক্তদের প্রতি)। 'মা' দেখিয়ে দিচ্ছিলেন যে, সবই মায়া, তিনিই সত্য আর যা কিছু সব মায়ার ঐশ্বর্য্য।

আর একটি দেখলুম, ভক্তদের কার কতটা হয়েছে।

নারাণাদি ভক্ত। আচ্ছা, কার কতদূর হয়েছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এদের সব দেখলাম—নিত্যগোপাল, রাখাল, নারাণ, পূর্ণ, মহিমা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশ, শশধর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে।

ঠাকুরের অসুখ সংবাদ কলিকাতার ভক্তেরা জানিতে পারিলেন। আলজিভে অসুখ হইয়াছে সকলে বলিতেছেন।

রবিবার ১৬ই আগষ্ট অনেক ভক্ত তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন—গিরীশ, রাম, নিত্যগোপাল, মহিমা চক্রবর্ত্তী, সিমুলিয়ার কিশোরী, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি।

ঠাকুর পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দময়, ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। রোগের কথা মাকে বলতে পারি না। বলতে লজ্জা হয়।

গিরীশ। আমার নারায়ণ ভাল করবেন।

রাম। ভাল হয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাঁ, ঐ আশীর্ব্বাদ কর। (সকলের হাস্য)।

গিরীশ নূতন নূতন আসিতেছেন, ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন,

"তোমার অনেক গোলের ভিতর থাকতে হয়; অনেক কাজ; তুমি আর তিনবার এস।" এইবার শশধরের সহিত কথা কহিতেছেন।

শশধর পণ্ডিতকে উপদেশ—ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি অভেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শশধরের প্রতি)। তুমি আদ্যাশক্তির কথা কিছু বল।

শশধর। আমি কি জানি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। একজনকে একটি লোক খুব ভক্তি করে। সেই ভক্তকে তামাক সাজবার আগুন আনতে বল্লে, তা সে বল্লে, আমি কি আপনার আগুন আনবার যোগ্য? আর আগুন আনলেও না। (সকলের হাস্য)।

শশধর। আজ্ঞা, তিনিই নিমিত্ত কারণ, তিনিই উপাদান কারণ। তিনিই জীব জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আবার তিনিই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন, যেমন মাকড়সা, নিজে জাল তৈয়ার করলে (নিমিত্ত কারণ), আর সেই জাল নিজের ভিতর থেকে বার করলে (উপাদান কারণ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর আছে যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি, যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি, আর যখন ঐ সব কাজ করেন তখন তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। কিন্তু যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি হয়ে রয়েছেন। জল স্থির থাকলেও জল, আর হেল্‌লে দুল্‌লেও জল। সাপ এঁকে বেঁকে চল্‌লেও সাপ, আবার চুপ করে কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকলেও সাপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের কথায় সমাধিস্থ। ভোগ ও কর্ম্ম।

"ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না, মুখ বন্ধ হয়ে যায়। নিতাই আমার মাতা হাতী, নিতাই আমার মাতা হাতী, এই কথা বল্‌তে

বল্‌তে শেষে আর কিছুই বল্‌তে পারে না, কেবল বলে 'হাতী'। আবার হাতী বল্‌তে বল্‌তে শুধু 'হা'। শেষে তাও বল্‌তে পারে না, বাহ্য শূন্য।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ।

সমাধি ভঙ্গের পর কিয়ৎকাল পরে বলিতেছেন,—'ক্ষর' 'অক্ষরের' পারে কি আছে মুখে বলা যায় না।

সকলে চুপ করিয়া আছেন, ঠাকুর আবার বলিতেছেন ; "যতক্ষণ কিছু ভোগ বাকি থাকে, কি কর্ম্ম বাকি থাকে, ততক্ষণ সমাধি হয় না। *

(শশধরের প্রতি) "এখন ঈশ্বর তোমায় কর্ম্ম করাচ্ছেন, লেকচার দেওয়া ইত্যাদি, এখন তোমায় ঐ সব করতে হবে।

"কর্ম্মটুকু শেষ হয়ে গেলে আর না। গৃহিণী বাড়ীর কাজ কর্ম্ম সব সেরে নাইতে গেলে, ডাকাডাকি করলেও আর ফেরে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ডাক্তার রাখাল। ভক্ত সঙ্গে নৃত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্ত সঙ্গে নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। রবিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ খৃঃ, ৫ই আশ্বিন, শুক্লা একাদশী। নবগোপাল, হিন্দুস্কুলের শিক্ষক হরলাল, রাখাল, লাটু প্রভৃতি, কীর্ত্তনীয়া গোস্বামী ; অনেকেই উপস্থিত।

বহুবাজারের রাখাল ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত, ডাক্তারকে ঠাকুরের অসুখ দেখাইবেন।

ডাক্তারটি ঠাকুরের গলায় কি অসুখ হইয়াছে দেখিতেছেন। তিনি দোহারা লোক ; আঙ্গুলগুলি মোটামোটা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি)। যারা এমন এমন কারে

---

* ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ গীতা, ২, ৪৪।

(অর্থাৎ কুস্তি করে) তাদের মত তোমার আঙ্গুল। মহেন্দ্র সরকার দেখেছিল কিন্তু জিভ্ এমন জোরে চেপেছিল যে ভারি যন্ত্রণা হয়েছিল , যেমন গরুর জিভ্ চেপে ধ'রেছে।

ডাক্তার রাখাল। আচ্ছা, আমি দেখ্ছি আপনার কিছু লাগ্‌বে না।

ডাক্তার ব্যবস্থা করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের রোগ কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। আচ্ছা, লোকে বলে, ইনি যদি এত—(এত সাধু)—তবে রোগ হয় কেন ?

তারক। ভগবান দাস বাবাজী অনেক দিন রোগে শয্যাগত হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মধু ডাক্তার. ষাট বছর বয়সে রাঁ'ড়ের জন্য তার বাসায় ভাত নিয়ে যাবে , এদিকে নিজের কোন রোগ নাই।

গোস্বামী। আজ্ঞা, আপনার যে অসুখ সে পরের জন্য , যারা আপনার কাছে আসে তাদের অপরাধ আপনার নিতে হয়, সেই সকল অপরাধ, পাপ লওয়াতে আপনার অসুখ হয়।

একজন ভক্ত। আপনি যদি মাকে বলেন, মা এই রোগটা সারিয়ে দাও, তা হলে শীঘ্র সেরে যায়।

সেব্য সেবক ভাব কম। 'আমি' খুঁজে পাচ্ছি না !

শ্রীরামকৃষ্ণ। রোগ সারাবার কথা বল্‌তে পারি না , আবার ইদানী সেব্য-সেবক ভাব কম পড়ে যাচ্ছে। এক একবার বলি 'মা তরবারির খাপটা একটু মেরামত করে দাও ,' কিন্তু ওরূপ প্রার্থনা কম পড়ে যাচ্ছে , আজকাল 'আমি'টা খুঁজে পাচ্ছি না। দেখ্ছি তিনিই এই খোলটার ভিতরে রয়েছেন।

কীর্ত্তনের জন্য গোস্বামীকে আনা হইয়াছে। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কীর্ত্তন কি হবে ?' শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ, কীর্ত্তন হইলে মত্ততা আসিবে , এই ভয় সকলে করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন "হোক একটু। আমার নাকি ভাব হয়, তাই ভয় হয়। ভাব হলে গলার ঐ খানটা গিয়ে লাগে।"

কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাব সম্বরণ করিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার রাখাল সমস্ত দেখিলেন, তাঁহার ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, তিনি ও মাষ্টার গাত্রোত্থান করিলেন, কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে উভয়ে প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে মাষ্টারের প্রতি)। তুমি কিছু খেয়েছ ?

মাষ্টারের প্রতি আত্মজ্ঞানের উপদেশ—'দেহটা খোলমাত্র'।

বৃহস্পতিবার পূর্ণিমার দিন রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরে ছোট খাটটির উপর বসিয়া আছেন। গলার অসুখের জন্য কাতর হইয়াছেন। মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। এক একবার ভাবি, দেহটা খোলমাত্র; সেই অখণ্ড (সচ্চিদানন্দ) বই আর কিছু নাই।

"ভাবাবেশ হলে গলার অসুখটা একপাশে পড়ে থাকে। এখন ঐ ভাবটা একটু একটু হচ্ছে, আর হাসি পাচ্ছে।"

দ্বিজর ভগ্নী ও দ্বিজর ছোট দিদিমা ঠাকুরের অসুখ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রণাম করিয়া ঘরের একপাশে বসিলেন। দ্বিজর দিদিমাকে দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "ইনি কে ?—যিনি দ্বিজকে মানুষ করেছেন ? আচ্ছা, দ্বিজ এমন এমন (একতারা) কিনেছে কেন ?"

মাষ্টার। আজ্ঞা, তাতে দুইতার আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একে ওর বাবা বিরুদ্ধ, সব্বাই কি বলবে ? ওর পক্ষে গোপনে (ঈশ্বরকে) ডাকাই ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে দেয়ালে টাঙ্গান গৌর নিতাইয়ের ছবি একখান বেশী ছিল, গৌর নিতাই সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন করছেন এই ছবি।

রামলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। তা হলে, ছবিখানি এঁকেই (মাষ্টারকে) দিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, তা বেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও হরিশের সেবা।

ঠাকুর কয়েকদিন প্রতাপের ঔষধ খাইতেছেন। গভীর রাত্রে উঠিয়া পড়িয়াছেন, প্রাণ আই ঢাই করিতেছে। হরিশ সেবা করেন, ঐ ঘরেই ছিলেন, রাখালও আছেন, শ্রীযুক্ত রামলাল বাহিরের বারাণ্ডায় শুইয়া আছেন। ঠাকুর পরে বলিলেন "প্রাণ আই ঢাই করাতে হরিশকে জড়াতে ইচ্ছা হোল, মধ্যম নারাণ তেল দেওয়াতে ভাল হলাম, তখন আবার নাচতে লাগ্‌লাম।"

শ্রীম —

সাংখ্য-দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬১

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ॥

পদপাঠ :— প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিৎ অস্তি ইতি মে মতিঃ ভবতি।
যা দৃষ্টা অস্মি ইতি পুনঃ ন দর্শনম্ উপৈতি পুরুষস্য ॥

অন্বয় :—প্রথম ছত্রে পরিবর্ত্তন নাই
যা দৃষ্টা অস্মি ইতি পুনঃ পুরুষস্য দর্শনম্ ন উপৈতি।

এই দৃষ্টান্ত, যে সময়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ এই কারিকা লিখিয়াছিলেন, তখন প্রত্যক্ষবৎ ছিল।

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিৎ অস্তি। (অনেক সুন্দরী আছে, কিন্তু) প্রকৃতি অপেক্ষা কেহই সুকুমারতর (ন+অস্তি) নাস্তি বা নাই।

সুকুমার = কোমল, স্পর্শ-কাতর, লজ্জাবতী।

ইতি = ইহাই। মে মতিঃ ভবতি = আমার অভিমত হইতেছে।

ইতি মে মতিঃ = আমার মতে। আমার মতে প্রকৃতি অপেক্ষা অধিকতরা সুকুমারী কেহ নাই। কেন?

যা = যিনি, দৃষ্টা অস্মি ইতি = আমি দৃষ্ট হইয়াছি ভাবিয়া, ইতি = এইরূপ ভাবিয়া। তিনি কি করেন? পুনঃ পুরুষস্য দর্শনম ন উপৈতি = পুনরায় পুরুষের দর্শন পথে পতিত হন না।

"কি লজ্জা, আমায় দেখে ফেলেছে"—এই ভাবিয়া আর তিনি পুনরায় পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হন না।

অর্থ:—প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা সুকুমারী। পুরুষ তাঁহাকে দেখিয়াছে ইহা জানা মাত্রই তিনি পুরুষের দর্শন পথে উপস্থিত হন না। সুতরাং তাঁহা হইতে পুরুষের ভোগ আর ঘটে না।

৬২

তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥

পদপাঠ:—তস্মাৎ ন বধ্যতে অদ্ধা ন মুচ্যতে ন অপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানা-আশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥

অন্বয়:—তস্মাৎ অদ্ধা কশ্চিৎ (পুরুষঃ) ন বধ্যতে ন মুচ্যতে ন অপি সংসরতি
নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ (এব) সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ।

তস্মাৎ = সেই হেতু (পুরুষ নির্গুণ এবং প্রকৃতি অতি সুকুমারী বলিয়া) কশ্চিৎ (বহু পুরুষের মধ্যে এক জনও) কেহই, কোন পুরুষই।

অদ্ধা = সত্য, বাস্তবিক পক্ষে।

ন বধ্যতে = বদ্ধ হয় না (বধ্)

ন অপি মুচ্যতে = (মুচ্) মুক্তও হয় না।

ন অপি সংসরতি :—সংসর = গতি, বন্ধন এবং মুক্তি এই দুই অবস্থার মধ্যে যে গতি চাঞ্চল্য বা চেষ্টা। চঞ্চলও হয় না।

প্রকৃতি নানাশ্রয়া = প্রকৃতি নানা পুরুষের আশ্রয়ে থাকেন।

প্রকৃতিঃ বধ্যতে (ইত্যাদি) = প্রকৃতিই বাঁধা পড়েন।

অর্থ :—বাস্তবিক পক্ষে কোন পুরুষই বদ্ধ হয় না, মুক্তও হয় না, চঞ্চলও হয় না। নানা পুরুষাশ্রিত প্রকৃতিই বাঁধা পড়েন, বাঁধন ছিঁড়িবার জন্য চেষ্টা করেন, এবং শেষে ছাড়া পান। প্রকৃতির অবস্থা সুন্দর সুধী ব্যক্তিকে মজাইবার অভিলাষিণী কুলটার তুল্য

৬৩

রূপৈঃ সপ্তভিরেব তু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥

পদপাঠ :—রূপৈঃ সপ্তভিঃ এব তু বধ্নাতি আত্মানম্ আত্মনা প্রকৃতিঃ।
সা এব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়তি এক রূপেণ।

অন্বয় :—পুরুষার্থং প্রতি প্রকৃতিঃ সপ্তভিঃ এব রূপৈঃ তু আত্মনা আত্মানম্ বধ্নাতি, সা এব চ একরূপেণ (আত্মানম্) বিমোচয়তি।

পুরুষার্থং প্রতি। প্রতি যোগে দ্বিতীয়া। প্রতি—অভিমুখ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরুষার্থং = পুরুষ + অর্থ, পুরুষের প্রয়োজন অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গ। প্রতি, অভিমুখ, উদ্দেশ্য। পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্যে কি হয়? দুইটি কাজ। একটি কাজে প্রকৃতি বদ্ধ হন, আর একটি কাজে প্রকৃতি বিমুক্ত হন। (মুচ্ + ক্ত = মুক্ত)। তিনি প্রকৃতি জাত বুদ্ধির যে অষ্টরূপ বা ভাব আছে তদ্দারাই কাজ সম্পন্ন করেন। বুদ্ধির অষ্টভাব কি কি? জ্ঞান, বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য এবং অধর্ম্ম। প্রকৃতি এক জ্ঞানভাব দ্বারা "বিমোচয়তি", এবং বৈরাগ্যাদি সপ্তভাব দ্বারা "বধ্নাতি"। প্রকৃতি কাহাকে "বিমোচয়তি" বা মুক্ত করেন আবার কাহাকে "বধ্নাতি" বদ্ধ করেন? আত্মানম্ = আপনাকেই। আত্মন্ শব্দের তৃতীয়ার এক বচনে আত্মনা, আপনা দ্বারাই। একরূপেণ অর্থ জ্ঞানরূপ এক রূপের দ্বারা।

সপ্তভিঃ হইতেছে রূপৈঃএর বিশেষণ। সপ্তভিঃ এব রূপৈঃ = সপ্ত রূপেরই দ্বারা। অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, ধর্ম্ম এবং ঐশ্বর্য্য দ্বারা। সা = প্রকৃতি, এব = ই, চ = আবার।

সা এব চ = প্রকৃতিই আবার। প্রকৃতি আপনাদ্বারাই আপনাকে বদ্ধ করেন।

অর্থ :—বুদ্ধিরূপ প্রকৃতিই পুরুষার্থের জন্য জ্ঞান ব্যতীত যে সপ্তভাব আছে তদ্দ্বারা আপনাকে বদ্ধ করেন, এবং একমাত্র জ্ঞানভাব দ্বারা আপনাকে মুক্ত করেন। ভোগের জন্য সপ্তভাব, অপবর্গের জন্য এক ভাব। ভোগ এবং অপবর্গকে পুরুষার্থ বলে। ভোগের জন্য প্রকৃতি সপ্তাম্বরা, মুক্তির জন্য একাম্বরা। "নীলাম্বরা", পট্টবস্ত্র, ঢাকাইশাড়ী, বেণারসী প্রভৃতি বসন ভোগের জন্য—একমাত্র গেরুয়াবাস অন্য প্রয়োজনে।

৬৪

ধর্ম্মাধর্ম্ম রাগ বিরাগ, পাপ পুণ্য, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি দ্বারাই পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির বন্ধন হয়। আর পুরুষ ইহা তাহার নিজের বন্ধন বিবেচনা করে। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই কেবল মুক্তি হইতে পারে।

ইহার জন্য বিচার, শ্রবণ, অধ্যয়ন, সুহৃৎপ্রাপ্তি, দান প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার মধ্যে শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন, ইহাই জ্ঞানের প্রধান উপকরণ। সাংখ্যকার বলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে এই শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান উৎপন্ন হইবে যে,—'আমি কেহ নহি, আমার কেহ নহে'।

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্ ॥

পদপাঠ :—এবম্ তত্ত্ব অভ্যাসাৎ ন অস্মি ন মে ন অহম্ ইতি অপরিশেষম্
অবিপর্য্যয়াৎ বিশুদ্ধম্ কেবলম্ উৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥

অন্বয় :—তত্ত্বাভ্যাসাৎ ন অস্মি ন মে, ন অহম্ এবম্ ইতি
অপরিশেষম্ জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে। (তৎ জ্ঞানং) অবিপর্য্যয়াৎ
বিশুদ্ধং কেবলম্ (চ)

তত্ত্বাভ্যাসাৎ=সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব অভ্যাস হইতে। অভ্যাস=পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন ধ্যান। অভ্যাস হইতে কি হয়? জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে=জ্ঞান জন্মে। কিরূপ জ্ঞান? অপরিশেষম্। অপরিশেষং=অবশিষ্ট হীন। যে জ্ঞানে কোন অজ্ঞাত বিষয় অবশিষ্ট থাকে না। সম্পূর্ণ, ব্যাপক। সে জ্ঞানের স্বরূপ কি? ন অস্মি, ন মে, ন অহম্ এবম্ ইতি। আমি করি না, আমার বলিয়া কিছু নাই, আমি কর্ত্তা নহি এইরূপ জ্ঞান।

কৃ, ভূ, এবং অস্ ধাতু সাধারণ ক্রিয়ার বাচক। ন অস্মি শব্দদ্বয়ে পুরুষের নিষ্ক্রিয়তা বুঝাইতেছে। অহং=কর্ত্তা। ন মে=নহে আমার, (সম্বন্ধ বুঝাইতেছে।)

অবিপর্য্যয়াৎ:—সংশয় এবং ভ্রম হইতেছে জ্ঞানের মল স্বরূপ। উহাকে বিপর্য্যয় বলে। অবিপর্য্যয়াৎ=বিপর্য্যয়ের অভাব হইতে। যে জ্ঞান অভ্যাস হেতু উৎপন্ন হয় তাহা সমাধি দ্বারা ভ্রম সংশয় শূন্য হইলে কি হয়? সেই জ্ঞানকে "বিশুদ্ধং কেবলং" বলে। দীর্ঘকাল স্থায়ী পুনঃ পুনঃ ধ্যানের নাম সমাধি। একাগ্র মনে কোন বিষয় বহুক্ষণ ধরিয়া ধারণা অর্থাৎ চিন্তা ও মননের নাম ধ্যান।

কেবলং=একমাত্র জ্ঞান, যাহাকে পরাভব করিয়া অন্য জ্ঞান আসিতে পারে না।

অর্থ:—তত্ত্ব সমূহের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে, আমার কোন ক্রিয়া নাই, কোন বিষয়ে সম্বন্ধ নাই, আমি কর্ত্তা নহি ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। এ জ্ঞান সর্ব্ব-বিষয়-ব্যাপক। উক্ত জ্ঞান যখন ভ্রম সংশয় শূন্য হয় তখন উহা একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান হয়। ইহার তুলনায় অন্যান্য জ্ঞান সংকীর্ণ এবং সংশয়পূর্ণ।

৬৫

তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ॥

পদপাঠ:—তেন নিবৃত্ত প্রসবাম্ অর্থবশাৎ সপ্তরূপ বিনিবৃত্তাম্।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ স্বস্থঃ॥

অন্বয় :—তেন স্বস্থঃ প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ পুরুষঃ নিবৃত্তপ্রসবাম্
অর্থবশাৎ

সপ্তরূপ বিনিবৃত্তাম্ প্রকৃতিং পশ্যতি ।

পুরুষঃ প্রকৃতিং পশ্যতি = পুরুষ প্রকৃতিকে দর্শন করে। তখন অর্থাৎ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার পর—পুরুষের বা অবস্থা কেমন, এবং প্রকৃতির বা অবস্থা কেমন ?

প্রকৃতির অবস্থা ।

তেন নিবৃত্তপ্রসবাম, অর্থবশাৎ সপ্তরূপ বিনিবৃত্তাম্। বুদ্ধিরূপা প্রকৃতির অষ্টবিধ রূপ, যথা জ্ঞান, ধর্ম্মাদি। প্রকৃতির সৃষ্টি প্রক্রিয়া পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের জন্য। উক্ত অষ্টবিধ রূপের বা ভাবের মধ্যে জ্ঞান ভাব অপবর্গের অনুকূল, এবং ধর্ম্মাদি সপ্তভাব ভোগের অনুকূল। অপবর্গ = ভোগের নিবৃত্তি। ২১ কারিকায় ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়কে প্রসবধর্ম্মী বলা হইয়াছে। প্রকৃতির প্রসব বা পরিণামের দুই প্রয়োজন, প্রথম ভোগ, দ্বিতীয় প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান। প্রকৃতির প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়াতে তাহার ব্যাপার নিবৃত্ত হয়, বিবেক জ্ঞান হেতু ধর্ম্মাদি সপ্তভাবের নাশ ঘটে। তেন—তত্ত্বজ্ঞানেন।

নিবৃত্ত হইয়াছে প্রসব যাহার তাহা নিবৃত্তপ্রসবা।

অর্থবশাৎ = বিবেক জ্ঞানরূপ যে অর্থ তাহার বশ বা সামর্থ্য হইতে।

বিবেকের সামর্থ্য দ্বারা কি হয় ? প্রকৃতি সপ্তরূপ বিনিবৃত্তা হন। তত্ত্ব জ্ঞানের বিরোধী প্রকৃতির যে সপ্তবিধ রূপ, প্রকৃতি সেই সপ্তবিধ রূপ শূন্যা হন। উপরে প্রকৃতির অবস্থা বলা হইয়াছে পুরুষের অবস্থা কিরূপ হয় ?

স্বস্থঃ এবং প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ। স্বস্থঃ = সুস্থ, যেন স্বন্ধ হইতে পেত্নী নামিয়াছে। প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ—প্রেক্ষক = দর্শক, প্রেক্ষা = নৃত্য দর্শন। প্রেক্ষা গৃহ = নাট্যঘর। অবস্থিতঃ = স্থির, অবিচলিত।

অর্থ :—তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতির প্রসব নিরুদ্ধ হয়। বিবেক-বলে প্রকৃতির জ্ঞান বিরোধী ধর্ম্মাদি রূপের নাশ হয়। তখন ভদ্র দর্শক যেমন

নর্ত্তকীর নৃত্য দর্শন করেন সেইরূপ সুস্থ পুরুষ অবিচলিত ভাবে প্রকৃতিকে দর্শন করেন।

৬৬

দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একোদৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য ॥

পদপাঠ :—দৃষ্টা ময়া ইতি উপেক্ষকঃ একঃ দৃষ্টাঃ অহম্ ইতি
উপরমতি অন্যা।
সতি সংযোগে অপি তয়োঃ প্রয়োজনং ন অস্তি সর্গস্য ॥

অন্বয় :—ময়া দৃষ্টা ইতি একঃ উপেক্ষকঃ অহং দৃষ্টা ইতি অন্যা
উপরমতি।
তয়োঃ সংযোগে সতি অপি সর্গস্য প্রয়োজনং ন অস্তি।

মাথায় পরচুলা, মুখে রং মাখিয়া সাজিয়া গুজিয়া প্রকৃতি পুরুষকে মজাইতেছিলেন। দমকা বাতাসের সহিত বৃষ্টি পড়িল। প্রকৃতির পরচুলা উড়িয়া গেল, রং গলিল, বসন বিপর্য্যস্ত হইল পুরুষের তখন আর ঝোঁক নাই, প্রকৃতির মাথা হেঁট। তখনও উভয়ে একস্থানে, কিন্তু প্রকৃতি ধরা পড়িয়াছেন, তাঁহার গান, হাব ভাবে আর কোন ফল হইবে না। বিবেক আসিলে প্রকৃতি এবং পুরুষের অবস্থা যেরূপ হয় তাহাই ৬৬ কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে। উপেক্ষায় তাচ্ছিল্যের ভাব আছে, উপরমে গ্লানির ভাব আছে।

একঃ = পুরুষ, অন্যা = প্রকৃতি। ময়া (আমার দ্বারা) দৃষ্টা ইতি = (প্রকৃতি দৃষ্ট হইয়াছেন সেইজন্য) একঃ (অর্থাৎ পুরুষ) উপেক্ষকঃ = (উপেক্ষাকারী) ঈক্ষ ধাতু দেখা হইতে উপেক্ষক, দর্শন হইতে নিবৃত্ত। অহম্ (প্রকৃতি) দৃষ্টা ইতি (পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছি সেইজন্য) অন্যা, (অপর ব্যক্তি বা প্রকৃতি), উপরমতি (বিরত হয়) তয়োঃ (এক এবং অন্যা এই উভয়ের) সংযোগে সতি অপি = (সংযোগ থাকিলেও) ভাবে সপ্তমী। সর্গস্য (সৃষ্টির শব্দাদি বিষয়ের) প্রয়োজনং (ভোগের জন্য প্রয়োজন) ন অস্তি = (থাকেনা)

অর্থ :—আমি দেখিয়াছি ইহা ভাবিয়া একজন উপেক্ষক হন, আর

আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে ইহা ভাবিয়া অন্যজন বিরত হন। তখন সংযোগ থাকিলেও ভোগের আবশ্যকতার অভাবে আর সর্গ হয় না। উভয়ের অবস্থা তখন 'আর কেন ঢের হয়েছে'।

৬৭

সম্যগ্জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধৃতশরীরঃ ॥

পদপাঠ :—সম্যক্ জ্ঞান-অধিগমাৎ ধর্ম্মাদীনাম্ অকারণ প্রাপ্তৌ ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ ॥

অন্বয় :—সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাৎ ধর্ম্মাদীনাম্ অকারণ প্রাপ্তৌ
ধৃতশরীরঃ সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমিবৎ তিষ্ঠতি ।

শরীরের সুখ দুঃখ মোহ যখন আত্মায় আরোপিত হয় না তখন জীবন ধারণ চক্রভ্রমি তুল্য। শরীরে অনেক স্ফোটক হইয়াছে, কবিরাজের ঔষধ রোগী সেবন করিল। ঔষধ সেবনের ফলে নূতন স্ফোটক জন্মিল না, কিন্তু পূর্ব্বেকার স্ফোটক ধীরে ধীরে সারিয়া আসিলেও কিছুদিন থাকে। বিবেক জ্ঞানোদয়ে জ্ঞানীর অবস্থা এই কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

সম্যগ্জ্ঞান-অধিগমাৎ = তত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্তি হেতু।

ধর্ম্মাদীনাম্ = ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপ কার্য্য সমূহের।

অকারণ প্রাপ্তৌ = অকারণ প্রাপ্তি হেতু, ধর্ম্মাদির ব্যর্থতা প্রাপ্তি হেতু, কর্ম্মের যে ফল সুখ দুঃখ মোহ নিষ্প্রয়োজন হওয়াতে।

ধৃতশরীর := শরীরধারী, তিষ্ঠতি = থাকে মাত্র। কি প্রকার? সংস্কারবশাৎ চক্র ভ্রমিবৎ = ঘট গড়া হইয়া গিয়াছে তখনও যেরূপ কুমারের চাক পূর্ব্বের বেগ বা ঝোঁক বশতঃ ভ্রমণ করে, তদ্রূপ।

সংস্কার বশাৎ = গতির বেগকে সংস্কার বলে।

চক্রভ্রমিবৎ = চাক ঘোরার মত।

অর্থ :—তত্ত্ব জ্ঞান হইলে, ধর্ম্মাদির কোন সার্থকতা থাকে না। যে দুই প্রয়োজনে (ভোগ ও বিবেক) প্রকৃতি সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন

তাহা তখন সিদ্ধ হইয়াছে, তবে যে তখন চৈতন্য ও দেহের সম্পর্ক থাকে, দেহের কার্য্য দৃষ্ট হয় তাহাতে কোন ফল ফলে না।

কুম্ভকারের চক্র ঘটাদি নির্ম্মাণ ক্রিয়া শেষ হইলেও যেরূপ পূর্ব্ব বেগের বশে কিছুক্ষণ নিষ্ফল ভ্রমণ করে, শরীরের অবস্থাও তখন তদ্রূপ হয়।

৬৮

পুরুষের ভোগ ও বিবেক ঘটিলে প্রকৃতি চরিতার্থ হন। প্রকৃতি চরিতার্থ হইবার দরুণ প্রকৃতির আর কার্য্য থাকে না, প্রকৃতির কার্য্যের বা প্রসবের বা পরিণামের বা সর্গের নিবৃত্তি হয়। দেহ বা শরীর সম্বন্ধও অবসান হয়। বিবেক হওয়ার দরুণ শরীরের সহিত পুরুষের যে বিচ্ছেদ হয় তাহাতেই দুঃখত্রয়ের চরম নির্ব্বাণ।

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি ॥

পদপাঠ:—প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধান বিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকম্ আত্যন্তিকম্ উভয়ম্ কৈবল্যম্ আপ্নোতি ॥

অন্বয়:—চরিতার্থত্বাৎ প্রধান বিনিবৃত্তৌ, শরীরভেদে প্রাপ্তে (পুরুষঃ) ঐকান্তিকম্ আত্যন্তিকম্ উভয়ম্ কৈবল্যম্ আপ্নোতি।

(পুরুষঃ) কৈবল্যম্ আপ্নোতি। পুরুষ উহ্য। পুরুষ কৈবল্য পায়।

কৈবল্যম্ = মুক্তি, সঙ্গশূন্যতা। কিরূপ কৈবল্য?

(একান্ত + ষ্ণিক) ঐকান্তিকম্ = নিশ্চিত। আত্যন্তিকম্ = (অত্যন্ত + ষ্ণিক্) অতিশয়, উভয়ম্ = উভয়ই, একান্ত এবং অত্যন্ত এই উভয় বিধ, অর্থাৎ চরম।

কখন পুরুষ এবম্বিধ কৈবল্য পায়?

চরিতার্থত্বাৎ প্রধান বিনিবৃত্তৌ, (এবং) শরীর ভেদে প্রাপ্তে। বিনিবৃত্তৌ, ভেদে (ভাবে সপ্তমী)।

চরিতার্থ হইতে প্রধানের বিনিবৃত্তিতে ও শরীর ভেদ প্রাপ্তিতে; প্রধান বিনিবৃত্ত হইলে এবং শরীর ভেদ ঘটিলে উক্ত কৈবল্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঐ ভেদ এবং বিনিবৃত্তির কারণ কি? চরিতার্থত্বাৎ = ভোগ ও বিবেকরূপ যে পুরুষার্থ তাহার চরিতার্থতা নিবন্ধন। চরিত + অর্থ = চরিতার্থ। চরিতার্থতা = প্রয়োজন সিদ্ধি। শরীর ভেদে = শরীর আত্মা হইতে ভিন্ন এই দৃঢ় জ্ঞান হইলে। শরীর = চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমন্বিতদেহ।

অর্থ:—প্রকৃতির দুই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হন এবং ভোগায়তন দেহেরও আবশ্যকতা থাকে না। পুরুষ তখন সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকে। ব্যক্ত হইতে জ্ঞ ভিন্ন হইয়া যায়, আর ত্রিতাপ জ্ঞকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই অবস্থার নাম কৈবল্য; ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞএর বিজ্ঞান হইতে কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটে।

৬৯

পুরুষার্থজ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতম্।
স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্॥

পদপাঠ:—পুরুষার্থ জ্ঞানম্ ইদম্ গুহ্যম্ পরমঋষিণা সমাখ্যাতম্।
স্থিতি উৎপত্তি প্রলয়াঃ চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্॥

অন্বয়:—ইদম্ গুহ্যং পুরুষার্থজ্ঞানম্ পরম ঋষিণা সমাখ্যাতম্;
যত্র ভূতানাম্ স্থিতি উৎপত্তি প্রলয়াঃ চিন্ত্যন্তে।

ইদম্ = এই পূর্ব্বোক্ত।

পুরুষার্থ জ্ঞানম্—দুঃখ নিবৃত্তির জ্ঞান, জ্ঞ ব্যক্ত এবং অব্যক্তের বিজ্ঞান।

গুহ্যম্ = দুর্ব্বোধ, রহস্য পরিপূর্ণ।

পরমঋষিণা = মহর্ষি কপিলের দ্বারা।

সমাখ্যাতম্ = কীর্ত্তিত হইয়াছে, বর্ণিত হইয়াছে।

যত্র = যে জ্ঞানে, যে জ্ঞানের নিমিত্ত।

ভূতানাম্ = ভূত সমূহের।

স্থিত্যুৎপত্তিলয়াঃ = (চিন্ত্যন্তে ক্রিয়ার কর্ত্তা) স্থিতি উৎপত্তি লয়।

চিন্ত্যন্তে = চিন্তা করা হইয়াছে।

যে জ্ঞানের নিমিত্ত ভূত সকল কি ভাবে আদি কারণে স্থিত ছিল, কি ভাবে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, আবার কি ভাবে তাহারা আদি কারণে মিশিয়া যাইবে এই সমুদয় চিন্তা করিতে হয়।

অর্থ :—যে জ্ঞানের নিমিত্ত ভূতগণের স্থিতি উৎপত্তি লয় চিন্তা করিতে হয়, যে জ্ঞানের দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখের চরম নিবৃত্তি হয়, এবং যে জ্ঞান অত্যন্ত দুর্ব্বোধ, সেই জ্ঞান ঋষিশ্রেষ্ঠ কপিল দ্বারা (প্রাচীন কালে) কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

৭০

এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্ ॥

পদপাঠ :—এতৎ পবিত্রম্ অগ্র্যম্ মুনিঃ আসুরয়ে অনুকম্পয়া প্রদদৌ ।
আসুরিঃ অপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্ ॥

অন্বয় :—(কপিলঃ) মুনিঃ এতৎ পবিত্রম্ অগ্র্যম্ (জ্ঞানং) আসুরয়ে অনুকম্পয়া প্রদদৌ । আসুরিঃ অপি (উক্তং জ্ঞানং) পঞ্চশিখায় (প্রদদৌ) । তেন চ তন্ত্রম্ বহুধা কৃতং ।

আসুরয়ে = আসুরি শব্দের সম্প্রদানে চতুর্থী । আসুরিঃ = কপিলের শিষ্য, পঞ্চশিখায় = আসুরির শিষ্যকে । তন্ত্রম্ = শাস্ত্রং, সাংখ্য শাস্ত্র । তেন = পঞ্চশিখেন ।

অর্থ :—কপিল মুনি এই পবিত্র, অগ্র্য বা শ্রেষ্ঠজ্ঞান আসুরিকে অনুকম্পাবশতঃ প্রদান করিয়াছিলেন। আসুরিও উক্ত জ্ঞান পঞ্চশিখ নামক শিষ্যকে প্রদান করিয়াছিলেন। পঞ্চশিখ কর্তৃক সাংখ্য শাস্ত্র বহুধা কৃত অর্থাৎ বহুভাবে বিভক্ত হইয়াছিল। পঞ্চশিখ যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহা লুপ্ত। এইরূপ কিম্বদন্তী—তাঁহার গ্রন্থ ৬০ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। ঐ গ্রন্থের নাম ছিল ষষ্টিতন্ত্র।

অধ্যায় সমূহ—যথা,

১। প্রকৃতি পুরুষের নিত্যত্ব।

২। প্রকৃতি পুরুষের একত্ব।

৩। ভোগ এবং অপবর্গের সম্বন্ধ।

৪। প্রকৃতির পরার্থ সাধকতা।

৫। পুরুষ ও প্রকৃতি ভেদ।

৬। পুরুষের অকর্তৃত্ব।

৭। পুরুষের বহুত্ব।

৮। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ ও সৃষ্টি।

৯। প্রকৃতি পুরুষেব মুক্তিকালে বিয়োগ।

১০। মহদাদির কারণে অবস্থিতি।

১১-১৫। পঞ্চ বিপর্য্যয়।

১৬-২৪। নব তুষ্টি।

২৫-৫২। অষ্টাবিংশতি অশক্তি।

৫৩-৬০। অষ্টসিদ্ধি।

৭১

শিষ্যপরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেণ চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যগ্‌বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্‌॥

পদপাঠ ঃ—শিষ্যপবম্পবয়া আগতম্‌ ঈশ্বরকৃষ্ণেণ চ এতৎ আর্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তম্‌ আর্য্যমতিনা সম্যক্‌ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্‌॥

অন্বয় ঃ—শিষ্যপবম্পবয়া আগতম্‌ এতৎ আর্য্যমতিনা ঈশ্বরকৃষ্ণেণ চ।
সিদ্ধান্তং সম্যগ্‌ বিজ্ঞায় আর্য্যাভিঃ সংক্ষিপ্তম্‌॥

এতৎ ঈশ্বরকৃষ্ণেণ সংক্ষিপ্তম্‌ এতৎ সাংখ্য শাস্ত্রম্‌ ঈশ্ববকৃষ্ণেণ সংক্ষেপেণ প্রোক্তম্‌। কাবিকায় সাংখ্যশাস্ত্র ঈশ্বরকৃষ্ণকর্তৃক সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

এতৎ বা সাংখ্য শাস্ত্র কিরূপ? শিষ্যপরম্পরয়া (তৃতীয়া বিভক্তি) আগতম্‌। কপিল হইতে শিষ্য প্রশিষ্যাদি ক্রমে আগত। ঈশ্বর-কৃষ্ণ কিরূপ? আর্য্যমতিনা এবং সিদ্ধান্তং সম্যগ্‌ বিজ্ঞায়। বিজ্ঞায় অসমাপিকা ক্রিয়া—জানিয়া; ইহার কর্ত্তা ঈশ্বরকৃষ্ণ। আর্য্যমতিনা=আর্য্য হইয়াছে মতি যাঁহার, তাঁহার দ্বারা। উচ্চমতি। সিদ্ধান্তং সম্যগ্‌ বিজ্ঞায়= সাংখ্যের সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে জানিয়া, অর্থাৎ যিনি সাংখ্যশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তম্ = সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। কিসে, গদ্যে না পদ্যে না সূত্রে ?

আর্য্যাভিঃ = আর্য্যাচ্ছন্দে পদ্যে। আর্য্যাচ্ছন্দে ৪ পাদ। ১ম পাদে ১২, ২য় পাদে ১৮, ৩য় পাদে ১২ এবং ৪র্থ পাদে ১৫ মাত্রা।

হ্রস্বস্বর এবং হ্রস্বস্বর যুক্ত বর্ণের একমাত্রা। দীর্ঘস্বরের দুই মাত্রা। যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের দুই মাত্রা। এতদ্ব্যতীত ং এবং ঃ যুক্ত শব্দের এবং অবয়বের শেষবর্ণের মাত্রা দুই বা এক হইতে পারে।

শি = ২	মী = ২	সং = ২	স = ২
ষ্য = ১	শ্ব = ১	ক্ষি = ২	ম্য = ২
	র = ১		
প = ১	কৃ = ২	প্তু = ১	প্তি = ২
	ষ্ণে = ২		
র = ২	ণ = ১	মা = ২	ভ্রা = ২
ম্প = ১	চৈ = ২	র্য্যা ১	য় = ১
	ত = ১		
ব = ১	দা = ২	ম = ১	সি = ১
য়া = ২	র্য্যা = ২	তি = ১	দ্ধা = ২
গ = ১	ভিঃ = ২	না = ২	স্তম্ = ২
ত = ১			
——	——	——	——
১২	১৮	১২	১৫

অর্থ :—উচ্চমতি ঈশ্বরকৃষ্ণ কপিল হইতে শিষ্য পরম্পরা প্রাপ্ত সাংখ্য সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে জানিয়া আর্য্যাচ্ছন্দে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

৭২

সপ্তত্যা কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি ॥

পদপাঠ :—সপ্তত্যা কিল যে অর্থাঃ তে অর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকা বিরহিতাঃ পরবাদ বিবর্জ্জিতাঃ চ অপি ॥

অন্বয় :—সপ্তত্যা যে অর্থাঃ তে অর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য কিল,

আখ্যায়িকা বিরহিতাঃ, পরবাদ বিবর্জ্জিতাঃ চ অপি।

সপ্তত্যা (তৃতীয়া)। ৭০ শ্লোকের দ্বারা, যে অর্থাঃ = যে সমুদায় পদার্থ। ৭০ শ্লোকের দ্বারা যে অর্থ উক্ত হইয়াছে। তে অর্থাঃ = সেই সমুদায় পদার্থ। সেই সমুদায় পদার্থ গোড়াতে কাহার ছিল? কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য কিল = সমগ্র ষষ্টিতন্ত্রেরই। কারিকা এবং ষষ্টিতন্ত্রে তবে তফাৎ কোথায়? ষষ্টিতন্ত্রে আখ্যায়িকা ছিল, (যথা পিঙ্গলার আখ্যান) পর মত খণ্ডন ছিল (যথা যজ্ঞে মুক্তিরূপ পরমত)। কিন্তু কারিকায় তাহা নাই। কারিকার পদার্থ সমূহ কিরূপ? আখ্যায়িকা বিরহিত এবং পরবাদ বিবর্জ্জিত।

বিরহিতাঃ = রহিত, শূন্য।

বিবর্জ্জিতাঃ = শূন্য।

পরবাদ = অপর মত খণ্ডন।

অর্থ:—ষষ্টিতন্ত্রে যে সমুদায় বিষয় আলোচিত হইয়াছে, কারিকার প্রথম হইতে ৭০ শ্লোক পর্য্যন্ত সেই সমুদায় বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। ষষ্টিতন্ত্রে অনেক মত খণ্ডন এবং আখ্যায়িকা আছে, কিন্তু কারিকায় তাহা নাই।

ওমার খৈয়াম্।

সমাপ্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৈষ্ণব সাধক ভাব-সাধনার চরমে যে অদ্বৈতানুভূতি লাভ করিয়া থাকেন তাহা বৈষ্ণব শাস্ত্র হইতে বহুলরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। ভক্তিপ্রাণ ভাগবতে প্রত্যেক আত্মাই হরি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন,—

"কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ।" ৭।৮।৩৮

নারদোক্তি—"হে দৈত্য বালকগণ। রাজ্য ও ধনাদি সংগ্রহের কোন প্রয়োজন নাই, হরির উপাসনা অনায়াসসাধ্য, কেননা তিনি আমাদের হৃদয়েই আকাশবৎ সর্ব্বদা অবস্থিত রহিয়াছেন, তিনিই জীবে স্বকীয় আত্মা, তিনিই সাধারণভাবে নিখিল দেহধারীর সখা।" ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ ভগবানের সেই লোকোত্তর সর্ব্বাত্মভাব কেমন উপলব্ধি করিয়াছেন, দেখুন। তৎপরে মধুর ভাবাশ্রিতা গোপীগণের উপলব্ধি শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে,—

"গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহমিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥" ১০।৩০।৩

"গোপীগণ—গমন, হাস্য, দৃষ্টি, বাক্য প্রভৃতি দ্বারা কৃষ্ণের অনুকরণ করিয়া কৃষ্ণময় হইয়া 'আমি কৃষ্ণ'—'আমি কৃষ্ণ' এইরূপ বলিতে লাগিলেন।" ইহাকে অদ্বৈতবাদের "সোঽহং" ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে সুধী পাঠক তাহা বিবেচনা করুন।

যে গোপানুগতিলাভ বৈষ্ণবের এত আকাঙ্ক্ষিত সেই কৃষ্ণগত প্রাণা গোপীদের এই অদ্বৈতানুভূতি অনুধ্যান করিলেই বৈষ্ণবমাত্রের সর্ব্বসংশয়ের নিরাস হইবে। অমৃতের অনন্ত প্রস্রবণ ভাগবতে আর একস্থানে ভগবান্ বলিতেছেন, "কেহ আমার ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তনে অনুরক্ত, কেহ বা আমার রুচিররূপ নিরীক্ষণে আসক্ত এবং তৎসহ সংলাপে প্রসক্ত হইয়া রসভঙ্গ আশঙ্কায় আমার সহিত একাত্মতা অভিলাষ করে না তাহারা আমার রূপ ও বাক্যে হতজ্ঞান, হতপ্রাণ, তাহারা মুক্তি ইচ্ছা না করিলেও তাহাদের ভক্তিই তাহাদিগকে নির্ব্বাণ প্রদান করিয়া থাকে।" তারপর ভাগবতের আখ্যায়িকা ভাগ হইতেও অদ্বৈত স্বীকারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ তাঁহার কাঁধে চড়িয়া ক্রীড়া করিতেন। এখন বিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ বলুন, উপাস্য উপাসকের দ্বৈতভাবে এরূপ ঘটনা সম্ভবপর কিনা? এখানে ত অর্চ্চনা, কীর্ত্তন, পাদ-বন্দন কিছুই নাই, আছে শুধু নিবিড়ানন্দের একাত্মজ্ঞান,—দ্বৈতভাব সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত,—সখ্যভাবের পরিপূর্ণ আবেগ ও উচ্ছ্বাসে একান্ত তাদাত্ম্যলাভ। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রেমিক রামানন্দ সম্মিলনে যে তত্ত্বামৃত প্রস্রবণ উৎসারিত হইয়াছিল তাহাই এই সংশয় ও দ্বন্দ্বের চরম মীমাংসা বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। শ্রীরায় রামানন্দ-মুখে যে গীত শুনিয়া মহাপ্রভু তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া কহিলেন,—

"সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়,
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়।"

সেই গীতের মুখ্য বক্তব্য—"না সো রমণ না হাম রমণী"—এই বাক্য মহাভাবাবস্থার উপলব্ধির পরিচায়ক এবং সম্পূর্ণ অদ্বৈত ভাবদ্যোতক। তারপরই মহাপ্রভু কহিলেন,—

"কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥"

অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবগণ নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করেন

বলিয়াই এ সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করিতে হইল। আমাদের সৌভাগ্য যে নিখিল সাধনার স্ফুরদ্‌বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমাদের মধ্যে পাইয়াছি। তাঁহার সমন্বয় বাণীর আলোকে সমস্ত সংশয়-তিমির অপসারিত হইয়াছে। হিন্দুর যুগযুগান্তরের সাধন রহস্য এই মহাসমন্বয়াচার্য্যের সম্মুখে প্রকট হইয়া সাধন রাজ্য উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার সাধনোপলব্ধি, তাঁহার ভাস্বর অনুভূতির আলোচনা করিলে আর শ্লোকোদ্ধারের প্রয়োজন হয় না। তিনি বলিতেন, "দ্বৈতাদ্বৈতাদি একই সাধকজীবনের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র, প্রবর্ত্তক দ্বৈতভাব হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্বৈতে উপনীত হয়।"

মহাত্যাগী ভগবান্ বুদ্ধ বহির্মুখী সর্ব্ববিষয়গ্রাহী ও ইন্দ্রিয়গণের প্রাণস্বরূপ মনকে নিবৃত্তি-পথে অন্তর্মুখী করিয়া মনের বৃত্তিগুলি এবং পূর্ব্ব সংস্কার সমূহকে বিবেক, বৈরাগ্য, প্রজ্ঞা ও সাধন বলে নাশ করিয়া মন যাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত, মন যাঁহার প্রতিবিম্ব, সেই অখণ্ড চৈতন্যরূপী আত্মার মধ্যে, মনের স্বকারণে মনকে লয় করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মনের সম্পূর্ণতায় বা বিলোপের ফলে যে অজর,অমর, সর্ব্বব্যাপী, শাশ্বত, অখণ্ড, চৈতন্যসত্তা 'অহং' জ্ঞানের অতীত প্রদেশে তুরীয় ভূমিতে অবস্থিত থাকিয়া 'বোধে'মাত্র 'বোধ' হয়, তাঁহাকে বুদ্ধদেব অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের ন্যায় ঈশ-জ্ঞাপক কোন নাম প্রদান না করিয়া এবং এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকিয়া এই বাক্যমনাতীত অতীন্দ্রিয় তুরীয়ভাবকে 'মহানির্ব্বাণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বেদান্তের অনির্ব্বচনীয় চৈতন্য ব্রহ্মসত্তাকে কোন নাম প্রদান করেন নাই বলিয়াই বৌদ্ধমত নিরীশ্বরবাদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বেদান্তমতে ধর্ম্মের যাহা সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি, যাহা মুখ্য আদর্শ, তাহা কোন মানব প্রদত্ত ঈশ্বরীয় 'নাম' বা 'অনাম' অথবা কোন 'বাদ' বা 'অবাদের' উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পরন্তু আপনার মধ্যে এই আদর্শ বা অভিব্যক্তির চরম বিকাশই ধর্ম্মের লক্ষ্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, জিহোবা, যীশু, গড্, আল্লা ও ঈশ্বর প্রভৃতি নাম মানব কল্পিত এক একটি শব্দ মাত্র। বিশেষ বিশেষ কারণে বিশেষ বিশেষ

আকারে এই শব্দগুলির সহিত ঈশ-জ্ঞাপক কতকগুলি কাল্পনিক ভাব ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকিয়া উহাদিগকে মাহাত্ম্যময় করিয়া রাখিয়াছে। কোন নাম উচ্চারণ বা শ্রবণমাত্রই উহার সঙ্গে নামী স্বয়ং বা তদীয়গুণ মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে, এই জন্য শাস্ত্রমতে নাম-নামী অভেদ বলিয়া বর্ণিত। নাম শব্দ মাত্র, নামের কোন পৃথক্ শক্তি নাই, নামীর শক্তিতেই নামের শক্তি, নামীর গুণেই নামের গুণ। বেদান্তের 'ব্রহ্ম' শব্দটি মানবভাষায় অপ্রকাশ্য বাক্যমনাতীত শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সচ্চিদানন্দময় এক চৈতন্যশক্তি জ্ঞাপক। বেদান্তমতে স্থাবর জঙ্গমের এক অদ্বৈত চৈতন্য বা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ঈশ্বরকে কোন নাম প্রদান করা, না করার জন্য কিছু যায় আসে না, বেদান্তধর্ম্ম, 'মনোবচনৈকাধার' এই বাক্য-মনাতীত সত্তাকে উপলব্ধি করিতে চায়। সুতরাং ব্রহ্ম-চৈতন্য শক্তিকে কোন নাম প্রদান না করার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে উহার কোন বিরোধ নাই। পরন্তু, ভগবান্ বুদ্ধের "নির্ব্বাণমোক্ষের" সঙ্গে দ্বৈতবাদিগণের "প্রেমানন্দ", যোগীর "সমাধি-মুক্তি" এবং বেদান্তের ব্রহ্মানন্দপূর্ণ "অদ্বৈত জ্ঞানের" কোনও ভেদ দৃষ্ট হয় না।

ভগবান্ বুদ্ধ "নির্ব্বাণমোক্ষ" লাভ করিয়া চরাচরব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মার সঙ্গে আপনাকে অভেদরূপে দর্শন করিয়া বলিয়াছেন,— "নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।" তাঁহার বিশ্বপ্রেমমূলক "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" প্রভৃতি উপদেশ নির্ব্বাণমোক্ষ দ্বারা সর্ব্বভূতের সঙ্গে আপনার একত্ব অনুভব করারই অমৃতপ্রসূ ফল।

বৌদ্ধধর্ম্ম মতে ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি কোন বিশেষ মানসিক ক্রিয়ামূলক। ধর্ম্ম আপনার মনের মধ্যেই নিহিত, সুতরাং ধর্ম্ম মনের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। "মনই মনুষ্যের বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ *।" জগতের সকল ধর্ম্ম এই মহাসত্য সমন্বয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, জগতের সকল ধর্ম্মই এইখানে আসিয়া সমন্বিত।

---

* "মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।"
—ব্রহ্মবিন্দুপনিষদ্।

ধর্ম্মের সকল অভিব্যক্তিই মানবের মনোরাজ্যে পৌঁছিয়া একত্ব লাভ করিয়াছে। বেদান্ত বলেন, মানুষের ধর্ম্ম লাভের জন্য বাহ্যিক সকল ক্রিয়াই এই মনকে উচ্চতম শক্তিলাভে সমর্থ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট, এবং জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মের বিভিন্ন প্রকারের বহিরনুষ্ঠান ও ক্রিয়াগুলি মানব মনকে সর্ব্বধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক সত্যলাভে যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য দেশকাল পাত্রভেদে বিভিন্নাকারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মনের উপরই এই পরিদৃশ্যমান বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব। মনেই সৃষ্টি, মনেই স্থিতি, মনেই লয়, মনেই স্বর্গ, মনেই নরক, মনেই জ্ঞান, মনেই কর্ম্ম, মনেই ভক্তি, মনেই ইষ্টদর্শন, মনেই ব্রহ্ম-জ্ঞান, মনেই সমাধি, মনেই মুক্তি, মনেই নির্ব্বাণ-মোক্ষ, মনেই শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর ভাবাদি ও পরকীয়া প্রেম এবং মনেই উহাদের আদর্শ প্রাপ্তি, "মনের প্রসাদেই পরমাত্মা দর্শন *।" জগতের সকল ধর্ম্মেই এই বিশ্ব-সত্য স্বীকৃত, জগতের সকল মানবই এই সার্ব্বভৌমিক সনাতন সত্য সম্বন্ধে একমত। হিন্দুর পূজা-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, মূর্ত্তিপূজক মনেই প্রতিমা গড়িয়া মনেই ভূতশুদ্ধি ও আবাহন করিয়া মনেই বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। বুদ্ধদেব আপনার ভিতরে মনের মধ্যেই নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহম্মদ 'হর পর্ব্বতের' (Mount Hara) গুহায় মুদিতনেত্রে উপবেশন করিয়া 'সপ্তম স্বর্গে' (In the Seventh Heaven) ভগবদ্দর্শন করিয়াছিলেন। এই উক্তি দ্বারা বেশ প্রমাণিত হয়, তিনি আপনার মনেই ভগবদ্দর্শন করিয়াছিলেন। "স্বর্গরাজ্য তোমারই অন্তা-স্তরে †" "চাও—পাইবে, অনুসন্ধান কর—মিলিবে, আঘাত কর—খুলিবে‡"

* "মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্।"

—বিবেকচূড়ামণি।

† "The kingdom of God is within you"

—Luke, XVII, XXI

‡ "Ask, and it shall be given to you , seek, and ye shall find , knock and it shall be opened unto you"

—St. Mathew, VII—VII

প্রভৃতি উপদেশে যীশুও আপনার মনের মধ্যেই ভগবান্‌কে লাভ করিতে বলিয়াছেন। ঐ যে যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসী প্রভৃতি পর্ব্বতকন্দরে, নদীতীরে, শ্মশানপ্রান্তে ও তীর্থস্থানে মুদ্রিতনয়নে বসিয়া আছেন, তাঁহারাও আপনার মনেই ভগবান্‌কে লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সাকারবাদী বাহ্য-মূর্ত্তি এবং নিরাকারবাদী বাক্যমনাতীত ঈশ-জ্ঞাপক ব্রহ্মভাবাশ্রয়ে আপনার মনের মধ্যেই ভগবান্‌কে লাভ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় বেদান্তধর্ম্মও সকল বাসনা ক্ষয় দ্বারা বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া মনকে উচ্চতম সত্যলাভের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন *। এমন কি মন এই সত্যলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন না করিলে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ মানুষের চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেও সে তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না, অথবা ঐরূপ অবস্থায় ভগবান্ তাহাকে স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইতে চাহিলেও সে স্বীকৃত হইবে না। ভগবান্ রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, যীশু ও মহম্মদ প্রভৃতিরূপে এই মর্ত্ত্যধামে সশরীরে বিচরণ করিয়া সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন বটে কিন্তু যাঁহাদের মন বিশুদ্ধ হইয়া আধ্যাত্মিক সত্যলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাঁহারা—কেবল তাঁহারাই মাত্র এই অবতার মহাপুরুষগণকে চিনিয়া তাঁহাদের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই জীবিতাবস্থায় ইঁহাদের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। এমন কি শত সহস্র ব্যক্তি ইঁহাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন স্পর্শন করিয়াও ইঁহাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। ইহাদ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, মন যে পর্য্যন্ত সত্যলাভের উপযুক্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম একটা কথার-কথা মাত্র।

—ধ্যানচৈতন্য।

(সমাপ্ত)

---

* "সর্ব্ব-বাসনা-ক্ষয়াত্তল্লাভঃ।"

—মুক্তিকোপনিষদ্।

অদ্বৈতবাদ *

১। মীমাংসকদের আপত্তি।

ব্রহ্মকে জানবার জন্যই বেদান্ত দর্শনের আরম্ভ। কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন হতে পারে, ব্রহ্মকে জানবার দরকার কি? বেদান্তীরা বলেন ব্রহ্মকে জানলে মৃত্যুকে জয় করা যায়। কিন্তু যাঁরা অদ্বৈতবাদ (জীব ও ব্রহ্ম এক এবং জগৎ মিথ্যা) মানেন না তাঁরা উক্ত বেদান্তীদের কথায় আপত্তি তোলেন এই বলে যে, তোমাদের কথানুযায়ী জীব আর ব্রহ্ম যদি একই জিনিষ হয় তা হলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কোনও দরকারই নেই। কারণ, যে বিষয় আমরা জানি বা যাতে আমাদের দরকার নেই, সে বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা উঠ্‌তেই পারে না। যে বিষয় আমরা জানি না এবং যা জানলে আমাদের উপকার হয়, মানুষ সেই সকল বিষয়ই জিজ্ঞাসা করে থাকে। তোমরা যখন জীবকে (নিজের আত্মাকেই) ব্রহ্ম বলছ তখন সেই ব্রহ্মকে ত আমরা বেশ জানি। আমি আমাকে বেশ জানি, সে সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন তুলে মাথা ঘামাতে যাব কেন? জীব বা আত্মা বা অহং সব সময়েই সকলের নিকট বেশ সুবিদিত, সুতরাং তার সম্বন্ধে আবার জিজ্ঞাসা কি? তোমরা বল, নিজেকে (আত্মাকে) জানলে মুক্তি হয় কিন্তু আমরা নিজেকে ত বেশ জানি, কই আমাদের ত মুক্তি হয় নি? তোমরা আরও বল, জ্ঞান দ্বারা যার নাশ হয় তা মিথ্যা। যেমন অন্ধকারে দড়ি দেখে আমার তাতে সাপ বলে বোধ হল, আমি ভয় পেলাম। আর একজন একটা আলো নিয়ে এসে বল্লে, 'আরে, ওটা সাপ নয় দড়ি।' তখন আমি জানলুম ওটা সাপ নয় দড়ি। দড়ির জ্ঞান যেই হল, সেই

---

* শঙ্কর-ভাষ্যের অনুমান অংশের তাৎপর্য্য বুঝিবার সুবিধার জন্য চল্‌তি ভাষায় মায়াবাদ সম্বন্ধীয় এই উপন্যাস (Introduction) লিখিলাম। পরে পুনরায় ভাষ্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা রহিল।

সাপের জ্ঞান নাশ হল। সেইজন্য সাপের জ্ঞানটা মিথ্যা। ঐ রকমের সব জ্ঞান মিথ্যা এ কথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু জগৎটা ত আর ওরকম জ্ঞান নয় যে তোমরা দু কথায় উড়িয়ে দেবে।

তোমরা যে বল 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়'—এ কথাটা আমরা আরও ভাল করে পরীক্ষা করব। তোমরা ব্রহ্মকে আত্মা বল। যারই চেতন আছে, সেই এই আত্মাকে 'আমি' বলে প্রকাশ করে থাকে—তা পাষণ্ডও যেমন আত্মাকে (নিজেকে) 'আমি' বলে নির্দ্দেশ করে, তেমনি আবার অতি বড় দার্শনিকও নিজেকে 'আমি' বলে প্রকাশ করে থাকেন। কেউ কখনও 'আমি আছি, কি নেই' বলে সন্দেহ করে না। (Descartesএর cogito ergo sum অনেকটা এই ধরণের), সকলেই নিঃসন্দেহে নিজেকে 'আমি' বলে প্রকাশ করে। তবে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—কেউ বলে এই দেহটা 'আমি', কেউ বলে মনটা 'আমি', আবার কেউ বলে দেহ ও মন হতে একটা পৃথক্ চেতন 'আমি' আছে। কাজে কাজেই 'আমি' সম্বন্ধে বেশ সন্দেহ আছে এবং সেজন্য এই আমি বা আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও করতে হবে।

কিন্তু তোমাদের এ প্রশ্ন ঠিক নয়। একটু বিচার করলেই আমরা দেখতে পাই যে এ দেহটা কখনও আমি হতে পারে না। কারণ, বাল্যকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত দেহের কত পরিবর্ত্তন হচ্চে কিন্তু ওর মধ্যে যে 'আমি'টা সেটা যেমন তেমনই রয়েছে। ছেলেবেলায় যে 'আমি' ছিলাম সেটাকে কি কেউ বৃদ্ধ বয়সের 'আমি' থেকে পৃথক ভাবে? বৃদ্ধ যদু কি কখনও বলে যে 'ছেলেবেলার যদু আমি নই, সে আর একটা আলাদা লোক ছিল। কারণ আমি কত বড়, শিশু-যদু কত ছোট, আমি কত লেখা পড়া জানি, শিশু-যদু মূর্খ। এখনক... যদু যাকে তোমরা দেখছ, সে ঐ শিশু-যদু যার ছবি তোমরা দে...চ্ছ তা থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ।' কেউ এ কথা বলে না। কেউ নিজেকে তার অতীত জীবন থেকে তফাৎ করে চিন্তা করতে পারে না।

আবার দেখ, খাদ্য থেকে আমাদের শরীর গড়ছে। রোজ রোজ

আমরা নূতন নূতন খাদ্য খেয়ে থাকি। অবশ্য রোজ রোজ হয়ত আমরা ভাত খাই কিন্তু একই চালের ভাত রোজ খাওয়া যায় না। আজকের ভাত যে চালে হয়েছিল কালকের ভাত সে চালে হয় নি। সেজন্য বলছি রোজ আমরা বিভিন্ন খাদ্য খাচ্চি এবং এর দ্বারা আমাদের দেহ গঠিত হচ্চে। দেহও আবার দেখছি অসুখে, জল বায়ুর সংঘর্ষে, পরিশ্রমে ক্ষয় হচ্চে কিন্তু রোজ বিভিন্ন খাদ্য গিয়ে নূতন নূতন দেহ গড়ে তুলে সেই ক্ষতি পূরণ করছে। দশ বৎসর আগে আমার যে দেহ ছিল এখন সে দেহটা নেই। এখন দেহটাই যদি রামের আত্মা হয় তা হলে দশ বৎসব আগের রামের আত্মা এখনকার রামের আত্মা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। সেই হেতু দশ বৎসর আগে রাম যা দেখেছিল, শুনেছিল এখন তার একটুও রামের মনে থাকা উচিত নয়, কাবণ এখনকার রাম তখন ত ছিল না। আবাব দেখ, রোজই যখন দেহেব ক্ষয় হচ্চে এবং নূতন নূতন দেহের গঠন হচ্চে তখন দশ বৎসর আগেকাব দেহের বা আত্মার নাশ হয়ে গ্যাছে এবং নূতন দেহ বা আত্মার জন্ম হয়েছে। কাজে কাজেই বলতে হয় তিনমাস পূর্ব্বে যে পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য প্রাণপণে খেটে ছিল সে এখন আর নেই, পাশ করলে আর একজন।

কিন্তু এমন ত কখনও হতে পারে না, কাজেকাজেই বলতে হয় দেহেব নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা আছেন যিনি আত্মা। যেমন লাল, নীল ফুলের মধ্যে একই সূতা, যেমন লাল, নীল লণ্ঠনের মধ্যে একই আলো।

আবার দেখ, ইন্দ্রিয়কেও আমরা আত্মা বলতে পাবি না। ইন্দ্রিয় বলতে ওপরের চোখ, কানকে বলছি না, ওগুলোও দেহের মধ্যে পড়ে যায়। ইন্দ্রিয় বলতে আমরা বুঝি অতি সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের মধ্যবর্ত্তী, বাহ্যবস্তু হতে তন্মাত্র (রূপ, রসাদি) সকলের ভেতরে প্রবেশ করবার রাস্তা। কেউ কেউ বলেন, আমাদের ভেতরের দিক্‌টা এই পর্য্যন্তই। স্থূল দেহের পরিবর্ত্তন হচ্চে, সেজন্য তাকে আত্মা বলতে পারি না। কিন্তু ইন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম পদার্থ এবং এর পরিবর্ত্তনও হয় না। এই ইন্দ্রিয়-

সমষ্টিকেই আমরা আত্মা বলি। দেহ ইন্দ্রিয়কে অপেক্ষা করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ছাড়া দেহ কোন কাজেই আসে না। স্থূল দেহের কান আছে, চক্ষু আছে তবুও লোকে শুনতে পায় না, দেখতে পায় না, কারণ স্থূল দেহের যন্ত্রগুলো থাকা সত্ত্বেও অন্তর্ব্বর্ত্তী ইন্দ্রিয়ের দোষ থাকায় দেখতে পাওয়া যায় না, শুনতে পাওয়া যায় না। অতএব স্থূল দেহ হতে সূক্ষ্ম বস্তু ইন্দ্রিয়ই আত্মা।

কিন্তু ইন্দ্রিয়কেও আত্মা বলা যায় না। কারণ ইন্দ্রিয়গুলো যদি 'আমি' হতো, তা হলে যে কোনও ইন্দ্রিয় দিয়ে জগতের সব জ্ঞানই সম্ভব হতো। কেননা সব ইন্দ্রিয়ই 'আমি'। কানও 'আমি', চোখও 'আমি', জিহ্বাও 'আমি'। আমি যখন সজাগ থাকি তখন যে কোনও বস্তু আমার সমক্ষে উপস্থিত হয় তাকে আমরা জানতে পারি। এ যদি সত্য হয়, তা হলে কানরূপ 'আমি'তে বেশ করে ছিপি এঁটে জিহ্বা-রূপ আমিটাকে সজাগ রেখে গানের আস্বাদ করা যেতে পারে। যদি বল, চক্ষুরূপ 'আমি' আর ত্বক্-রূপ 'আমি' পৃথক। শোঁকাটা নাসিকারূপ আমির কার্য্য, দেখাটা চক্ষুরূপ আমির কার্য্য তাহলে আমি খণ্ডিত হয়ে পড়ল। আমি গোলাপফুলটাকে দেখলুম, আমি গোলাপফুলটাকে স্পর্শ করলুম, আমি গোলাপফুলটাকে শুঁকলুম— এই তিনটে আমিই পৃথক। কিন্তু একটা গোটা-গোলাপ জানতে গেলে তাকে রূপে, রসে, গন্ধে, শব্দে, স্পর্শে একই আমিকে জানতে হবে। আর আমরা দেখতেও পাচ্ছি অনন্ত অনুভূতি আমরা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে করচি, কিন্তু প্রত্যেক অনুভূতির সঙ্গে অহং জড়িত। অহংকে বাদ দিয়ে কোনও অনুভূতিই হয় না। কিন্তু কত রূপ, রসের অনুভূতি এলো আবার গেল কিন্তু 'আমি' অতীতেও ছিল, বর্ত্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। ইন্দ্রিয় আত্মা হতে পারে না। কারণ তাহলে একই ব্যক্তি বহু হয়ে পড়ে। এক কি করে বহু হবে? তার বহু দিক থাকতে পারে, কিন্তু দশটা পৃথক জিনিষ মিলে কখনও একটা জিনিষ হতে পারে না বা একত্বের ধারণাও হতে পারে না। দশটা জিনিষ দেখে একটা জ্ঞান লাভ করতে গেলে একজন নিরন্তর, অখণ্ড সাক্ষী বা দ্রষ্টার দরকার।

মনে কর, পাঁচ জন লোকের কোনও কারণে চক্ষুরাদি ক্রমে, একটি করে জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে আর বাকি চারটি নষ্ট হয়ে গ্যাছে। তাদের প্রত্যেকের কমলালেবু সম্বন্ধে জ্ঞান পৃথক পৃথক হবে। গোটা-কমলালেবুর জ্ঞান হবে তার, যার পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়টা ত ঐ ইন্দ্রিয়টার কথা বুঝে না। তবে একই কমলালেবুর যে এই পাঁচটা দিক বা অনুভূতি এটা কে বুঝিয়ে দেয়। কমলালেবু সম্বন্ধে পাঁচটা অনুভূতির প্রত্যেকটির সময় কে উপস্থিত ছিল, কে সাক্ষী বা দ্রষ্টা?—আমি।

আবার দেখ, বয়সের সঙ্গে, অনুশীলনের সঙ্গে এবং ব্যাধিতে ইন্দ্রিয়ের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেইজন্য বলতে হয় আত্মারও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া মানে সেই বস্তুর সত্তা ক্ষয় হওয়া বা অপর বস্তুর দ্বারা তার পুষ্টি করা। এ কথা বল্লে, দেহকে আত্মা বল্লে যে দোষ হয় এখানেও সেই দোষ হয়। যদি হ্রাস বৃদ্ধি মানে সুপ্ত এবং জাগ্রত বা অস্ফুট এবং স্ফুট বল তাহলেও দোষ হয়। কারণ, অহং যদি সুপ্ত, অস্ফুট বা অপ্রকাশিত থাকে তাহলে কোনও জ্ঞানই হয় না। সুষুপ্তিতে অহং লয় পায় বলে বোধ হয় কিন্তু স্বপ্ন বা জাগ্রত অবস্থায় 'অহং' এর হ্রাস বৃদ্ধি কেউ কি কখনও অনুভব করেছে? সঙ্কোচের অবস্থা এবং বিকাশের অবস্থা তুলনা করতে গেলেও আর একজন অটুট 'অহং' বা সাক্ষীর দরকার হয়।

আবার দেখ, আকাশে দেখলুম একখানা ঘুড়ি উড়ছে। এখানে মাত্র চক্ষুঃ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হল। কিন্তু জ্ঞান হল শুধু রূপের নয়, স্পর্শ ইন্দ্রিয় দিয়ে যে আমাদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্বের জ্ঞান হয় সেগুলোও হল। স্পর্শ ইন্দ্রিয় আমরা ব্যবহার করিনি তবুও ঐ গুলোর জ্ঞান আমাদের হল কি করে? যদি বল অনুমান করে, কিন্তু অনুমান করলে কে? কাজেকাজেই বলতে হয় ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অহং আছে।

অন্তঃকরণকেও আত্মা বলতে পার না। অন্তঃকরণের নানা বৃত্তির মধ্যে এই অহংই নিত্য। অন্তঃকরণের তিনটি বিভাগ আছে। মন,

বুদ্ধি ও চিত্ত। মনের দ্বারা আমরা সংকল্প বিকল্প করে থাকি। বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করে থাকি এবং চিত্তের দ্বারা স্মরণ করে থাকি। কিন্তু সকল বৃত্তিই 'অহং'কে নিয়ে। 'অহং'কে বাদ দিয়ে কোনও বৃত্তিই সম্ভব নহে। রাত্রে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছি। হঠাৎ একটা আলো চকমকিয়ে চোখের উপর দিয়ে চলে গেল। রূপ তন্মাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়তে লাগতেই একটা দুঃখ (হেয়) বা সুখের (প্রেয়) অনুভব হল। এই অনুভবের সঙ্গে দুটো জিনিষ জড়িত। আমাতে দুঃখ এল 'যা-আমি-নই' তা থেকে। যেই 'আমি'র জ্ঞান, সেই প্রতিযোগী 'আমি-যা-নই' এরও (আলোর) জ্ঞান আছে। এই 'আমি' এবং 'আমি-যা-নই' এই দুটো জড়িয়ে হল 'অহং'। একটা তীব্র আলো এসে আমার চোখে দুঃখ দিয়ে গেল (ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বেদনা)। তার পর মনে হল, এটা কিসের আলো ?—বিদ্যুৎ ? (চিত্তের কার্য্য স্মৃতি) না, আকাশে ত মেঘ নেই (মনের কার্য্য সঙ্কল্প-বিকল্প)। ওহো, জাহাজের সার্চ্চ-লাইটে (চিত্তের কার্য্য স্মৃতি) এমনি হয় (মনের কার্য্য সংকল্প-বিকল্প)। ঠিক হয়েছে এটা সার্চ্চ-লাইটেরই আলো (বুদ্ধির কার্য্য নিশ্চয়)। সার্চ্চ-লাইটকে জানতে গিয়ে মোটা মুটি পাঁচটা অন্তঃকরণের বৃত্তি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখালুম। কিন্তু এর মধ্যে আরও অনন্ত বৃত্তি হয়ে গ্যাছে, সে গুলোর শেষ ফল হল সার্চ্চ-লাইটের জ্ঞান। একটা শতদল পদ্মের 'কুট্মল' (কুঁড়ি) একটা ছুঁচ দিয়ে আমরা এক সেকেণ্ডে এধার ওধার বিঁধে ফেলতে পারি। কিন্তু যত তাড়াতাড়িই বিঁধি না কেন, ছুঁচটা একটার পর একটা করে প্রত্যেক দলটা বিঁধে তবে ওধারে বেরুবে। অসংখ্য বৃত্তির পর অন্তঃকরণে একটা জ্ঞান হয় কিন্তু আমাদের মনে হয়, যেমনি বাহ্য বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ হল আর অমনি জ্ঞান হল। চিত্ত জিনিষটাকে আরও ভাল করে বুঝতে আমরা চেষ্টা করব। অন্তঃকরণের দুটো দিক আছে। যে দিকটা 'অহং' সমক্ষে উপস্থিত থাকে সেটাকে জ্ঞান-ভূমি বলে (Conscious Plain) আর বাকি অংশটাকে অজ্ঞান-ভূমি (Sub-conscious Region) বলে। এই অজ্ঞান-ভূমিতে আমার পূর্ব্বেকার সকল অভিজ্ঞতা

সঞ্চিত থাকে। ঐ সকল অভিজ্ঞতার নাম, সংস্কার। মনে কর, দুজন লোক বসে আছে আমি বল্লুম 'নীলা'। একজন বুঝতে পারলে, একজন বুঝতে পারলে না। যে বুঝতে পারলে সে নীলা পূর্ব্বে দেখেছে, এবং উহা সংস্কার রূপে তার অন্তঃকরণের অজ্ঞান-ভূমিতে ছিল, এক্ষণে চিত্তের বৃত্তি যে স্মৃতি, সেই অজ্ঞান-সাগর থেকে অনুসন্ধান করে ডুবুরীর মত জ্ঞান-ভূমিতে নীলাকে তুলে নিয়ে এল। আর যার নীলার সংস্কার নেই সে তার অর্থ বুঝতে পারলে না।

অন্তঃকরণের এই যে বৃত্তি ত্রয়, এরা কেউ কাকেও ছেড়ে থাকতে পারে না। কেউ আগে, কেউ পরে একথাও বলতে পারি না। এরা যেন একটা ত্রিভুজের তিনটি বাহু। দুই বাহুসম্পন্ন কোনও ত্রিভুজ হয় না। তিনটি বাহু পরস্পর সংলগ্ন থাকা চাই। এই বৃত্তি ত্রয় একত্র যোগে যাহা 'ইচ্ছা' করে তাহাই কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়ে প্রকাশ পায়। কিন্তু অন্তঃ-করণের এতগুলি বৃত্তির বিশ্লেষণ যে আমরা করলুম, এগুলির একত্র সমাবেশ কে করেছে? সকল বৃত্তির মধ্যে কে সাক্ষিস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে এবং নানা বৃত্তিরূপ পুষ্প দিয়ে কে জ্ঞানরূপ মালা গাঁথছে? ব্যাবৃত্তের মধ্যে অনুবৃত্ত কে? বহুর মধ্যে এক কে? মণি মালার মধ্যে সূত্র কে?

স্বপ্নে দেখলুম আমি দেব-শিশু, নন্দনে কত মন্দার, কত পারিজাত, কত অমৃত, কিন্তু যাই ঘুম ভাঙ্গল তখন আমি যে রাস্তার ভিখারী সেই রাস্তার ভিখারী। বাদসার কৃপায় আবুহোসেন একরাত্রে বাদসা হল, তার পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখে, যে জীর্ণ শয্যা সেই জীর্ণ শয্যায় সে শুয়ে আছে। মানব-মনের এই দুই অবস্থার প্রত্যভিজ্ঞা বা ঐক্য (Identity) সম্পাদন কি করে হয়। আমিই স্বপ্নে দেব-শিশু এবং জাগ্রত অবস্থায় ভিখারী—আমাদের এই অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে যে ঐক্য-জ্ঞান, মন বুদ্ধির অতিরিক্ত 'অহং' জ্ঞান ব্যতীত হতে পারে না। সেইজন্য চার্ব্বাকদের দেহাত্মবাদ ঠিক নয়।

এইরূপ যুক্তিতে আমরা বেশ বুঝতে পারি চেতন-আমি আর অচেতন-জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। 'আমি' আমাকে বেশ জানি সেইজন্য ব্রহ্ম বা

আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার কোনও প্রয়োজন নেই এবং চেতন ও অচেতনে, দড়িতে সাপের মত ভ্রান্তি হবারও কোনও কারণ নেই। তারপর তোমরা বলছ, আত্মজ্ঞান হলে মুক্তি হয়। কেন না আত্মজ্ঞান হলে বোঝা যায় সংসারটা একটা মস্ত ভ্রান্তি। উজ্জ্বল আলোক এলে যেমন বাইস্কোপের ছবিগুলো মিশে যায় কেবল একটা সাদা পরদাই থাকে, তেমনি আত্মজ্ঞানের আলোক এলেই এ সংসাররূপ ছায়াবাজি বিলীন হবে, থাকবে শুধু এক চেতন আত্মা। কিন্তু চেতন আত্মা বা 'অহং' যদি অনাদি অনন্ত হয় তা হলে সংসারও অনাদি অনন্ত স্বীকার করতে হবে। 'আমি' স্বীকার করলেই সঙ্গে সঙ্গে 'যা-আমি-নই' (সংসার) এটাকেও স্বীকার করতে হবে। 'আমি'র জ্ঞান না থাকলে 'আমি-যা-নই' এর জ্ঞান হয় না, আবার 'আমি-যা-নই' এর জ্ঞান না থাকলে 'আমি'র জ্ঞান হয় না। 'আমি' এবং 'আমি-যা-নই' দুটিই সমান্তরাল রেখার ন্যায় অনাদি অনন্তকাল ধরে চলেছে। দুটি রেখার কেউ কাকেও ছেড়ে থাকতে পারে না। শাস্ত্রে এই সম্বন্ধটির নাম অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি বলা হয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে আমরা আত্মাকে দেখালুম, তবুও দেখ জগৎ রইল। বেদে যদি তোমরা যা বলছ ঐরূপ কোনও কথা থাকে, তা হলে বুঝতে হবে তোমরা তার অর্থ বুঝতে পারনি। কর্ম্ম এবং উপাসনার দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। হীন অবস্থা থেকে উচ্চ অবস্থা লাভের নামই মুক্তি। কর্ম্ম এবং উপাসনার দ্বারা আমরা বর্ত্তমানের অসম্পূর্ণ দুঃখাত্মক জগৎ ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ সুখাত্মক জগতে যেতে পারি। মীমাংসকেরা অদ্বৈত বেদান্তীদের বিরুদ্ধে এইরূপ যুক্তি করে থাকেন।

২। দ্বৈত বেদান্তীদের আপত্তি।

বেদান্তের তাৎপর্য্য অদ্বৈতবাদে হতে পারে না। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" আর সত্যজ্ঞান হীন সান্ত জীব এক হতে পারে না। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এর অর্থ জীব জগতের এক-ঈশ্বর ছাড়া বহু-ঈশ্বর নেই। অথবা এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু 'বেল' বলতে যেমন

শাঁস, খোলা, বীচি তিনটিকেই বোঝায়, সেরূপ ব্রহ্ম বলতে জীব, জগৎ, ঈশ্বর তিনই বোঝায়। এই তিনটি পদার্থের মধ্যে পাঁচটি ভেদ নিত্য। জীবে জীবে, যেমন রামের আত্মায় শ্যামের আত্মায় ভেদ; জীবে জগতে, যেমন রামের আত্মা ও রামের দেহে ভেদ, জগতে জগতে ভেদ, যেমন গন্ধ পদার্থে ও শব্দ পদার্থে; ঈশ্বর ও জীবে ভেদ যেমন জোনাকি কখন সূর্য্য হতে পারে না; ঈশ্বর ও জগতে ভেদ, যেমন কুম্ভকারে ও ঘটে ভেদ। এই পঞ্চ ভেদ না মানলে জগৎ রহস্য কোন কালে বোঝা যাবে না। ব্রহ্ম বলতে জীব, জগৎ, ঈশ্বর। এই তিনের মধ্যে পঞ্চ-ভেদ নিত্য আছে। একই পদার্থের মধ্যে যদি বিভিন্ন ভেদ থাকে, যেমন বৃক্ষে—ডাল, পাতা, গুঁড়ি, ফুল, ফল, সেই ভেদের নাম স্বগত ভেদ। ব্রহ্মে এই স্বগত ভেদ স্বীকার না করলে কি কি দোষ হয় বলছি।

(ক) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" আর কর্ত্তা ভোক্তা সত্য-জ্ঞানহীন সান্ত জীব কখনও এক হতে পারে না। একই বস্তু দুরকম কি করে হতে পারে?

(খ) 'আমি' বলতে জীবাত্মাকে বুঝায়। এই আমিরূপ যে জীব, প্রতিদেহে ভিন্নভিন্ন বলে আমাদের অনুভব হয়। জীবে জীবে ভেদ কল্পনা নহে,—বাস্তব। কারণ উহা প্রত্যক্ষ অনুভব সিদ্ধ। রাম কখনও শ্যামের সঙ্গে নিজেকে এক ভাবে না।

(গ) ব্রহ্মে জগৎ ভ্রান্তি হতেই পারে না। ব্রহ্ম ও জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। তোমাদের মতে ভ্রান্তি দু রকমের,—(১) একটা জিনিষে আর একটা জিনিষের ভ্রম, যেমন দড়িতে সাপের ভ্রম (২) একটা জিনিষে আর একটা জিনিষের গুণের ভ্রম, যেমন স্ফটিকের পাশে জবা ফুল রাখলে, জবাফুলের লাল গুণটা স্ফটিকের স্বচ্ছতাকে ঢেকে তাকে লাল করে ফেলে। এখানে স্ফটিক বস্তু, এই বস্তুতে জবাফুলের যে ধর্ম্ম লালত্ব সেইটি এসে ভ্রান্তি উৎপাদন করলে লাল-স্ফটিক বলে।

এক্ষণে প্রথমটিকে (পক্ষ) ধরা যাক। যখন দড়িতে সাপের অজ্ঞান বা ভ্রম বা অধ্যাস হয় তখন রজ্জু হল অধিষ্ঠান, কারণ সাপের জ্ঞান

রজ্জুতেই অধিষ্ঠিত, রজ্জুকে অবলম্বন করেই সাপের ভুল জ্ঞান হয়েছে। আর সর্পজ্ঞান হল আরোপ্য, কারণ ঐ জ্ঞানটি রজ্জুতে আরোপিত হয়েছে। বাস্তবিক সাপ না থাকাতে, সাপের জ্ঞানটা যেন রজ্জুর ওপর গুণের মত ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এখানে একটি বস্তুতে আর একটি বস্তুর ভ্রম হয়েছে। কিন্তু এই দুটি বস্তুরই জ্ঞান আমাদের থাকা কর্ত্তব্য। কারণ, সর্পের পূর্ব্বজ্ঞান (সমানাকার প্রমা-জ্ঞান) যদি না থাকে, সাপ যদি আমি আগে না দেখে থাকি, তা হলে রজ্জুতে আমার সাপের ভ্রম হতেই পারে না। আবার দেখ, সর্প ভ্রান্তি কেটে গেলে যখন আমি বুঝতে পারছি এটা দড়ি, তখন রজ্জু জ্ঞানও আমার পূর্ব্বে ছিল। নইলে জানলুম কি করে এটা দড়ি। অন্তঃকরণের যে চিত্ত-শক্তি বা স্মৃতি-শক্তি সে অন্তঃকরণের অজ্ঞান-সাগরে ডুব দিয়ে যে দড়ির সংস্কার সেখানে লুকান ছিল, তা জ্ঞান-ভূমিতে তুলে নিয়ে এল, আমি জানলুম এটা সাপ নয় দড়ি। আরও দেখ, রজ্জুতে যে সর্প ভ্রান্তি হয় সে ভ্রান্তি রজ্জুর নিজের হয় না, হয়—রজ্জু হতে পৃথক আর একজন পুরুষের। এক বস্তুতে অপর বস্তুর ভ্রম স্বীকার করতে গেলেই উক্ত বিষয় গুলিও নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে। তাহলে এই প্রশ্নগুলির উত্তর তোমাদের দিতে হবে—

(১) সর্পের প্রত্যক্ষমূলক পূর্ব্বজ্ঞান না থাকলে সর্প ভ্রান্তি হতে পারে না। সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি (সৃষ্টি) হবার পূর্ব্বে জগতের পূর্ব্বজ্ঞান কার ছিল? যদি বল—ব্রহ্মের। তা বলতে পার না। রজ্জুর স্থলে তোমরা ব্রহ্মকে বসিয়েছ। রজ্জুতে কোনও কালে সর্পজ্ঞান ছিল না, সর্পজ্ঞান ছিল তৃতীয় ব্যক্তিতে। কাজেকাজেই ব্রহ্মতে জগতের পূর্ব্ব-জ্ঞান থাকতে পারে না, তৃতীয় পুরুষের কল্পনা করতে হয়।

(২) সর্পজ্ঞান দূর হওয়ার পর যে রজ্জুজ্ঞান হয় তাও ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হতে হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলে রজ্জুজ্ঞান হয় না। কিন্তু এই উপমা অনুযায়ী জগৎ ভ্রান্তি কেটে গেলে ব্রহ্মের জ্ঞান হতে পারে না, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নন। আবার আমাদের সমস্ত সঞ্চিত সংস্কার ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই আমরা পেয়ে থাকি।

কিন্তু রজ্জু জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে যেমন আমাদের রজ্জুর সংস্কার ছিল, সেরূপ ব্রহ্মের সংস্কার থাকতে পারে না। কারণ তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তার সংস্কারও থাকতে পারে না।

(গ) দেখ, রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয় তার একটি কারণ, রজ্জু ও সর্পেতে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে কিন্তু ব্রহ্ম ও জগতে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। এবং অন্ধকারে এই সাদৃশ্য-জ্ঞান হেতু ভ্রম হয়ে থাকে। অন্ধকার হচ্চে অজ্ঞান, ব্রহ্ম হচ্চেন জ্ঞানস্বরূপ এই দুইটির কখনও একত্র সমাবেশ হতে পারে না অর্থাৎ ব্রহ্মের ওপর অজ্ঞান কখনও জগৎ রচনা করতে পারে না।

দ্বিতীয় পক্ষ হচ্চে—একটা জিনিষের ধর্ম্ম আর একটা জিনেষে অধ্যাস সৃষ্টি করতে পারে। যেমন জবার লালত্ব স্ফটিকের স্বচ্ছতাকে ঢেকে লাল করে ফেলে। কিন্তু এ উপমাও ব্রহ্ম সম্বন্ধে খাটে না। কারণ, এরূপ ভ্রম মানলে, স্ফটিক ছাড়া যেমন জবাফুল সেইরূপ ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ মানতে হয়। এর নাম হল দ্বৈতাপত্তি। তারপর দেখ, স্ফটিকে জবার লালত্বের অধ্যাস হতে গেলে দুটি জিনিষের কাছাকাছি (নৈকট্য) থাকা দরকার। কিন্তু মায়া (অজ্ঞান) ও ব্রহ্ম (জ্ঞান) অন্ধকার আলোকের মত বলে পরস্পরের নৈকট্যও কখনও সম্ভব নয়।

(ঘ) তোমরা বলছ, জগৎ ভ্রান্তি নিবারণের হেতু হচ্চে ব্রহ্ম জ্ঞান কিন্তু তা হতে পারে না। জীব যখন স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম যখন জ্ঞান-স্বরূপ তা সত্ত্বেও যখন জগৎ ভ্রান্তি রয়েছে, তখন বুঝতে হবে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হলেও তাতে জগৎ-ভ্রান্তি সম্ভব। সেইজন্য ব্রহ্ম জ্ঞান মুক্তির হেতু হতে পারে না। কিংবা অজ্ঞান নাশের পরও আবার মায়া তাকে আক্রমণ করে জগৎ-ভ্রান্তি দেখাতে পারে।

এই সকল কারণে তোমাদের বিবর্ত্ত বা মায়াবাদ ঠিক নয়, আমাদের পরিণামবাদই ঠিক। এ জগৎ সত্য কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল এবং ব্রহ্মের এক অংশ বিকৃত হয়ে এই জগৎ প্রবাহ চলছে।

আচার্য্য শঙ্কর যে সকল কথায় তাঁর ভাষ্যের মধ্যে পূর্ব্ব-পক্ষের উত্থাপন করেছেন, তারই মধ্যে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মত সবই পাওয়া যায়। তাঁরা সকলেই প্রায় বিবর্ত্তবাদের বিরুদ্ধে উক্ত আপত্তি সকল তুলেছেন।

(ক্রমশঃ) —বাসুদেবানন্দ

আগমনী

জলস্রোতে কাঁদে গান, ত্রিভুবনে দুঃখের সম্ভার,
পদতলে কাঁপে পৃথ্বী, স্বর্গে মর্ত্ত্যে এ'ক অন্ধকার।
হিমাচল পাদমূলে ও কারা বসিয়া আছে?
সকলে স্তিমিতনেত্র, কি চায়, কাহার কাছে?
কোথা সে, কিরূপ মূর্ত্তি, কোথা সে কিরূপ শক্তি তার?
কিরূপ তাহার লীলা, কোন মন্ত্রে প্রকাশ তাহার?
কেহ কি দেখেছে তারে, কোনো দিন রূপের আধারে,
এই যুগে, পূর্ব্বযুগে কিংবা সর্ব্বযুগ সীমা পারে?
এ প্রশ্ন উঠেছে বনে, এ প্রশ্ন উঠেছে মনে,
সংঘাত করেছে প্রশ্ন স্থলে, জলে, সমীরণে—
তবু তারা বসে আছে যেমন অতিথি কারো দ্বারে,
পূর্ণ চাই সর্ব্বকাম, দেখা চাই দেখা চাই তারে।
কোটি কণ্ঠ শব্দ শূন্য, কোথা আছে নিবদ্ধ কামনা?
বহে কি না বহে শ্বাস প্রাণ করে প্রাণের ধারণা।
তথাপি শুনিল বিশ্ব সে অপূর্ব্ব ইতিহাস,
দেবতার সত্যাগ্রহ হিমনদী-তীরে বাস।
দেবতার সত্যাগ্রহ—কি সুতীব্র নারব সাধনা।
ভুলে গেছে কোথা দেহ কোথা স্বস্তি কোথায় যাতনা।
কত রূপ দিল তারে ধ্যান-নেত্র দেবতা বাহিনী।
বহিয়া আনিল বিশ্বে যুগান্তের কত যে কাহিনী।
দানবের উপদ্রবে যখনি কেঁদেছে ধরা,
অধর্ম্মের অভ্যুদয়ে হয়েছে সে শান্তিহারা,
কালস্রোতে বিপর্য্যয়—রাত্রি দিন, দিবস যামিনী,
তখনি বসেছে ওই অর্চ্চনায় দেবতা বাহিনী।
অর্চ্চনায় বসিয়াছে, কিন্তু কেহ বলিতে না পারে
সাগ্রহে এ রূপ-পুষ্প উপহার দেয় তারা কারে।
অব্যক্ত, সতত ব্যক্ত, স্থিতিহীন স্থিতি যার
অরূপ, অনন্ত রূপ, গুণহীন, গুণাধার,

সেই তিনি সেই যিনি আবরিয়া সমস্ত সংসারে,
সর্ব্বভাবে সর্ব্বভূতে নমস্কার নমস্কাব তারে।
মুক্ত চক্ষু দেবসংঘ বুঝি তার পেয়েছে সন্ধান,
সমবেত কণ্ঠে তারা তুলিল তাহার জয়গান।
সহসা উঠিল বাণী কি অপূর্ব্ব, কি মধুর।
কত যেন সন্নিকটে দূব যেন কতদূর।
ফুটিল পার্ব্বতীফুল আঁধাবেব ব্যাকুল প্রয়াণ,
উছলে জাহ্নবী জল সুদীর্ঘ নিশাব অবসান।
দেবসংঘ মুগ্ধনেত্রে অকস্মাৎ কবে দবশন
কোথা হ'তে কি সুন্দব কি অপূর্ব্ব কার আগমন।
উপবে হিমানীমালা নিম্নে জাহ্নবীব লীলা
মধ্যে গৌরী পূর্ণরূপা কুমাবী ষোড়শী বালা।
দেখিতে কোমলা, কিন্তু দেখিল বিস্মিত দেবগণ,
নয়ন-ইঙ্গিতে তাব দুলিয়া উঠেছে ত্রিভুবন।
"কাব স্তব কবিতেছ, হে দেবতা। সমবেত সুরে?"
নিস্তব্ধ তাহারা, কাবো বাক্য নাহি ফুটিল অধরে।
সেই কোমলাঙ্গ হ'তে, কি অপূর্ব্ব ইতিহাস,
বাহিব হইল বামা অঙ্গে দশদিক বাস
অট্টহাসে কয় কথা পার্ব্বতীব প্রশ্নেব উত্তবে,
"বিষম দৈত্যেব ভয়ে ওরা যে আমাব স্তুতি কবে।"
সে অপূর্ব্ব ইতিহাস, সেই যুগ যুগান্তেব বাণী—
গৌরীর সে রূপ হ'তে শ্যামা-রূপ উদ্ভব কাহিনী
আনুক মঙ্গল বিশ্বে, হ'ক দৈত্যকুল নাশ,
ভাঙুক মোহের কাবা, ঘুচুক সকল ত্রাস।
ওইত তোমার তুমি, ওগো শক্তি দানব-নাশিনী,
ওইত তোমার পূজা ওইত তোমাব আগমনী।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ।

জাতি-সংগঠক শ্রীবিবেকানন্দ

"ভারতের বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহকে সন্নিবেশিত করিয়াই আমাদের জাতীয় একত্ব সংসাধিত করিতে হইবে। এমন একদল লোকের সম্মিলনে ভাবতে জাতি প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একই আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা।" *

"প্রত্যেক জাতিরই একটি বিশিষ্ট কর্ম্ম-প্রণালী থাকে। * * * * আমাদেব নিকট ধর্ম্মই একমাত্র ভিত্তি-ভূমি যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা অগ্রসব হইতে পারি। * * * ধর্ম্মেব ভিতর দিয়া আমবা বাজনীতিকেও বুঝিতে পাবি। এই ধর্ম্মেব ভিতর দিয়াই আমাদেব সমাজ-বিজ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ লাভ করিতে হইবে। প্রত্যেকটি জিনিষকেই ধর্ম্মের ভিতব দিয়া আসিতে হইবে। কারণ আমাদেব জাতীয় জীবন-সঙ্গীতেব ধর্ম্মই প্রধান সুর, অবশিষ্ট আর সমস্তই ঐ প্রধান সুবেবই তবঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে।" †

স্বামী বিবেকানন্দ।

সমগ্র দেশের বহুধা বিভক্ত বিশৃঙ্খল চিন্তা ও কর্ম্মপ্রণালীকে সুনিয়মিত ও সুসংযত করিয়া ভারতময় একটি সুমনোহর জাতীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তোলাই ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা। বিসদৃশ মতামত ও তর্কবিতর্কেব যুগ পশ্চাতে রাখিয়া আমরা বর্ত্তমানে এমন এক মুহূর্ত্তে পদার্পণ করিয়াছি, যখন সংগঠনমূলক স্থির বুদ্ধির সাহায্যে আমাদিগকে সংঘবদ্ধ হইয়া দেশেব সমগ্র কর্ম্ম-জীবনকে সুন্দব ও সুঠাম করিয়া গড়িতে হইবে। এই জাতীয় জীবন সংগঠন-রূপ বিরাট সমস্যা চিন্তাশীল ভারতবাসী মাত্রেরই মস্তিষ্ক অধিকার করিয়াছে সন্দেহ নাই; এবং নানাভাবে নানাদিকে জাতি-গঠনের

---

* The Common bases of Hinduism হইতে অনুবাদিত।

† স্বামিজীর কলিকাতাব বক্তৃতা হইতে অনুবাদিত।

বিবিধ ভাব ও কর্ম্মপ্রণালীর সূচনা হইতেছে। দুইটি কঠিন প্রস্তর-খণ্ডে আঘাত লাগিলে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উদ্গীরণ হয় তেমনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রূপ দুইটি অভিনব সভ্যতার সংঘাতে বর্ত্তমান ভারতে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে এবং সমস্যা মীমাংসারও বিবিধ প্রকার চিন্তা ও কর্ম্মপ্রণালী জনসাধারণকে বিভিন্ন পথে পরিচালিত করিতেছে। ভারতের জাতীয়তা ও জাতি-গঠন সমস্যায় ভারতবাসীর প্রতি আচার্য্য বিবেকানন্দের একটি বাণী (message) আছে। সত্যদ্রষ্টা ঋষি যে ভাবে ভারতীয় সমস্যাসমূহের আলোচনা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে যে মীমাংসায় উপনীত হইয়া দেশবাসীর প্রতি তাঁহার জাতি-সংগঠন বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ভারত-ভক্ত স্বদেশ-কল্যাণকামী প্রত্যেকেরই প্রণিধান যোগ্য—সন্দেহ নাই। সমগ্র ভারতকে একটি সুবিশাল জাতিরূপে পরিণত করিবার নিমিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ যে বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্য ভাব সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিকট জাতি বা নেশন কথাটি খুব প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। জাতি বা নেশন বলিতে মুখ্যতঃ এমন একটি জন-সমষ্টিকে লক্ষ্য করা হয় যাঁহারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের উপর আপনাদের চিন্তা-প্রণালী সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্যই নিয়ামকরূপে তাঁহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সমস্তই তাহারই বিশিষ্ট পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর এই রূপে জাতি বা নেশনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আপাতচাকচিক্যে সম্মোহিত হইয়া নব্যভারতও জাতি বা নেশন বলিতে রাজনৈতিক জাতি বা নেশনই বুঝিয়া থাকেন। এখন প্রশ্ন এই—রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ভিন্ন জাতি বা নেশন সংস্থাপিত হইতে পারে কিনা? এবং তদ্রূপ কোন জাতি বা নেশন প্রাচীন ভারতে ছিল কিনা? প্রাচীন ভারত কোন জাতীয় উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইয়া জাতীয় সমগ্র চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রণালী তাহারই উপর সংস্থাপিত করিয়াছিল

কিনা? তাহার সমগ্র শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমূহ কোন বিশিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত হইয়াছিল কিনা? উত্তরে আমরা বলি—হে নব্যভারত। সত্য সত্যই এইরূপ একটি জাতি বা নেশন প্রাচীন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু ঐতিহাসিক নানা বিপ্লব-সমাকুল হইয়া তাহা সমগ্রভাবে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে নাই। তাহারও সমাজ নীতি ছিল, অর্থনীতি ছিল, রাজনীতি ছিল, রাজশক্তি ছিল এবং এই সমস্তকে সে একটি বিশিষ্ট পথে পরিচালিত করিয়াছিল কিন্তু ঐতিহাসিক নানা জটিল সমস্যায় জড়িত হইয়া উহা পূর্ণাঙ্গভাবে প্রাণধারণ করিয়া থাকিতে পারে নাই। সত্যানুসন্ধিৎসু যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব, মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি ভারতীয় শাস্ত্র সমুদ্র আলোড়ন করিতে সক্ষম হইবেন, ভারতীয় দৃষ্টিতে যাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা ভারতীয় সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট ও বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না, আর সত্যসত্যই তাঁহাদের নিকট ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষত্ব প্রতিভাসিত হইবেই হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ জাতিসংগঠনে আমাদের জাতীয়তার সেই সনাতন পন্থার অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান যুগোপযোগী ব্যাখ্যান প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার কর্ম্মনীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হে প্রবুদ্ধ ভারত। তাঁহার বাণী দায়স্বরূপ তোমার সম্মুখে,—তুমি গ্রহণ করিবে কি?

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে বেদান্তের বিজয়-কেতন উড্ডীন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাহা ভারতের জাতীয় জীবনেতিহাসের এক চিরস্মরণীয় দিন। সনাতন ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি এবং হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্ট ধর্ম্মের মহাসমন্বয় প্রতীকস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণতলে এই নব্য-শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের মস্তক অবনত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণতলে স্বামী বিবেকানন্দের আত্মসমর্পণ সত্যসত্যই যেন প্রাচীন ভারতের সহিত নব্য-ভারতের সম্মিলন। শ্রীরামকৃষ্ণ-

জীবনের সমন্বয় দৃষ্টি, স্বকীয় অসাধারণ আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ ও তন্ন তন্ন অনুসন্ধানে ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে ভূয়োদর্শন, অসামান্য মেধা ও প্রতিভা বলে ভারতেতিহাস ও শাস্ত্র সমূহের সুবোধ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার গভীর সমালোচনা এবং পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত প্রচাররূপ দায় গ্রহণে তত্তদ্দেশ হইতে পারদর্শিতা লাভ প্রভৃতির সহায়তায় সমগ্র ভারতকে তিনি এক অমানব দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে পারিয়াছিলেন। উহাদেরই সাহায্যে স্থূলদৃষ্টিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন বহুধা বিভক্ত হইলেও আধ্যাত্মিক চিরগৌরবে মহিমাময়ী সম্মিলিত ভারতের (United India) সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি সর্ব্বপ্রথম তাঁহা-রই মানসপটে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। সমগ্র দেশের বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহকে সংবদ্ধ ও এককেন্দ্রানুগ করিয়া জাতীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ কল্লে দেশকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "গড়িবার বিষয় প্রস্তাব করিবার জন্য আমি আজ এখানে দণ্ডায়মান, ভাঙ্গিবার বিষয় নহে। * * * বর্ত্তমান যুগের ঘোষণা বাণী আসিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন —যথেষ্ট হইয়াছে, প্রতিবাদ যথেষ্ট হইয়াছে, দোষোদ্ঘাটন যথেষ্ট হইয়াছে, পুনঃ প্রতিষ্ঠা, পুনর্গঠনের সময় আসিয়াছে। সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহ একত্রিত করিতে হইবে, একটিমাত্র কেন্দ্রে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে এবং তারপর কেন্দ্রীভূত শক্তিতে নেশনকে সম্মুখের পথে পরিচালিত করিতে হইবে,—কেন না বহুশতাব্দী হইল উহার গতি একেবারে থামিয়া গিয়াছে। গৃহ মার্জ্জন ও পরিষ্কার করা হইয়াছে, এস আবার আমরা গৃহে বাস করি। পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, আর্য্য-সন্তানগণ! এস অগ্রসর হও।"

প্রত্যেক জাতি বা নেশনই একটি ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে রাজনীতিই নেশনমাত্রের ভিত্তি বলিয়া আমরা শুনিয়া থাকি। রাজনীতি ভিন্ন একটি নেশনের যে অন্য কোনও ভিত্তি হইতে পারে তাহা আমরা সহসা গ্রহণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। রাজনীতিকে ভিত্তি না করিয়াও আধ্যাত্মিক ভাব ও

চিন্তাসমূহকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াও যে একটি নেশন গড়িয়া উঠিতে পারে তাহা পাশ্চাত্য ষ্টেট্-কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক (State-Centred-Politics) চিন্তার ফলে আমাদের বোধগম্য হয় না। ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাসমূহকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ভিন্ন অন্য কোন মনীষী জাতীয় জীবন সংগঠন কল্পে ভিত্তি বলিয়া প্রচার করেন নাই। নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মস্তিষ্কেও ভারতীয় আধ্যাত্মিক সত্য-সমূহের সুবিশাল শক্তি প্রকাশিত হইবার অবকাশ পায় নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই আমরা ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ভারতীয় প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি-সমূহ যে আমাদের সমগ্র কর্ম্ম-জীবনকে শক্তি-সঞ্চারিত করিয়া সুমনোহর জাতীয় জীবন গঠন করিতে পারে তাহা আমাদের বোধগম্য হয় নাই। জড়বাদ-আলেয়ার পশ্চাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাশ্চাত্য রাজনীতিকেই আমরা সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় জীবনের ভিত্তির কথা বলিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথমেই বলিলেন, "সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাসমূহ দ্বারা ভাসাইয়া দিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে ভারতকে আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ দ্বারা প্লাবিত করিয়া দাও ইহাই জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, ভিত্তি ও প্রতিষ্ঠাভূমি। এই পুণ্যভূমিতে ধর্ম্ম—একমাত্র ধর্ম্মই ভিত্তিভূমি, মেরুদণ্ড, জীবন-কেন্দ্র।" *

(ক্রমশঃ) —অব্যক্তানন্দ।

---

* 'My plan of Campaign' হইতে অনুবাদিত।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ ও তাহার অবস্থা

আমাদের দেশের কথা আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমতঃ ভারতের জীর্ণ হিন্দুসমাজের প্রতি স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যে সমাজ শিক্ষায়, ধর্ম্মচর্চ্চায়, উদারতায় ও আধ্যাত্মিকতায়, শুধু ভারতের কেন পৃথিবীর সভ্যসমাজের আদর্শস্থল ছিল, যে সমাজের কৃতিসন্তানগণ ভারতের বেদবেদান্তমন্থিত আধ্যাত্মিক জীবনের চিরভাস্বর, শাশ্বত আদর্শ জগতের সম্মুখে ধরিয়া জগতে বরেণ্য হইয়াছে সেই সমাজ,—বিশ্ববিশ্রুত হিন্দুসমাজ, আজ পঙ্গু, জীর্ণ ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। সেই চিরতুষার-মণ্ডিত হিমাদ্রির পাদমূল হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে শতধা বিভক্ত হিন্দুসমাজ আজ শুধু কতকগুলি কুসংস্কার, হিংসা, দ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতা বক্ষে সজোরে ধারণ করিয়া অমাবস্যার বিরাট অন্ধকারের ন্যায় ভারত ব্যাপিয়া পড়িয়া আছে। আজ কোথায় সেই কোটীকণ্ঠোচ্চারিত সামগান, কোথায় সেই বুদ্ধচৈতন্যের লীলাভূমি ভারত-তপোবনের বিশ্ববিমোহন উদার সঙ্গীত, আর কোথায় দীন, হীন, মৃতকল্প, হতশ্রী বর্ত্তমান ভারতের পঙ্গু হিন্দুসমাজ। দেশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজ আজ যে কোন্ নিম্নস্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা এই যুগসন্ধিক্ষণে সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক সুধীব্যক্তিরই প্রণিধান করা একান্ত প্রয়োজন।

হিংসা, দ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতার তীব্র হলাহল সমাজ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে যে আজ হীনবীর্য্য ও পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে মনীষিবর্গ ভারতে আজ বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে এতদিন যাহাদিগকে হীনতার দুর্ম্মোচ্য শৃঙ্খলে অযাজ্য ও অস্পৃশ্য করিয়া অবজ্ঞায় মূক ও জড়প্রায় করিয়া রাখা হইয়াছিল, যে পর্য্যন্ত সহানুভূতি ও প্রীতির পীযূষসিঞ্চনে তাহাদিগকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিতে

না পারিব, অজ্ঞতার আঁধার যবনিকার অন্তরালে যে বিরাট শক্তি সুপ্তসিংহের ন্যায় নিদ্রিত তাহা যে পর্য্যন্ত শিক্ষার অঙ্কুশাঘাতে পুনঃ উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত এই অধঃপতিত হিন্দুসমাজের পুনরুত্থানের কোন সম্ভাবনা নাই।

এতদিন হিন্দুসমাজ বলিতে সমাজশীর্ষাধিষ্ঠিত শাস্ত্রজ্ঞান গরীয়ান আধ্যাত্মিকবলে বলীয়ান্ ব্রাহ্মণকেই বুঝিয়া আসিয়াছি। কিন্তু কোথায় আজ সেই সমাজের গৌরবস্থল ব্রাহ্মণ? ভারতের পথ প্রদর্শক তুমি, সমাজেব নেতৃত্বগ্রহণ কবিয়া এতদিন সর্ব্বজাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছ, আজ এই জীবন-মরণ-সন্ধিক্ষণে সেই ত্যাগ, মহাপ্রাণতা, জ্ঞান ও তপস্যা লইয়া সমাজের, দেশেব মৃতকল্প সন্তানের সম্মুখে দাঁড়াও, এই অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ন পথভ্রান্ত ভাবতবাসীকে ত্যাগালোকবর্ত্তিকা হস্তে প্রকৃত পথ দেখাও। যে দেশের ব্রাহ্মণের ক্ষমা, তিতিক্ষা, দান প্রেমেব নিকট বিশ্ববিজয়ী-বীরের সমুন্নত দৃপ্তশির ভূতলে লুটাইয়া পড়িত, যে দেশের ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রশক্তিকে সংযত বাখিয়া বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালন করিয়া অসীম প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য শক্তি আজ কোথায়? যদি আবার সেই ব্রহ্মণ্য শক্তি জাগ্রত করিয়া নিজ জীবনকে মহীয়ান কবিতে পার, তবে তোমারই বিজয়-বৈজয়ন্তীতলে ভারত সন্তান যুগযুগান্তের হিংসা, দ্বেষ ভুলিয়া তোমারই পার্শ্বে দাঁড়াইবে, আবার তাহাবা মানুষ হইবে।

এ দেশের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, জাতিনির্ব্বিশেষে যেখানেই মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইখানেই রাজরাজেশ্বর হইতে দীনাদপি-দীন পর্য্যস্ত সকলেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে। মনুষ্যত্বটা যে শুধু তথাকথিত উচ্চজাতির একচেটিয়া নয়, সে ধারণা যে পর্য্যন্ত প্রতি মানব হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত না হইবে, ততদিন এ দেশের হিংসা, দ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতার পঙ্কিল আবর্জ্জনা দূরীভূত হইবে না। ভারতীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র যে হিন্দুশাস্ত্র কালের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করিয়া আজও চিন্তাশীল ব্যক্তির একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়া রহিয়াছে, সেই উদার

হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে এই ভারতভূমিতে "দাসীর গর্ভে নারদ, উর্ব্বশীর গর্ভে বশিষ্ঠ, শূদ্রার গর্ভে বিদুর, বেশ্যার গর্ভে সত্যকাম এবং ধীবরগর্ভে বেদব্যাস" জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের তথা জগতের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যকে একসময় অনার্য্যসেবিত বলিয়া উপেক্ষা করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, সে দেশও একদিন নামদেব, একনাথ, জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম ও সাধকচূড়ামণি রামদাসের মধুর উদাত্ত সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। চর্ম্মকার কুলসম্ভূত মহাপ্রাণ যোগী চোকামেলা একদিন দেবতার মন্দির প্রবেশে নিষিদ্ধ হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে যে উদার বাণী বলিয়াছিলেন তাহা আজও দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

কালের স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে একটু ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সময়োপযোগী করিয়া লইতেই হইবে। বৈদিকযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমাজের বুকের উপর দিয়া অনেক পরিবর্ত্তনের ঢেউ চলিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে এ বিরাট হিন্দুসমাজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া নিজকে প্রতি যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়া আসিয়াছে। কিন্তু কালের কুটিলপ্রবাহে সমাজের সে সুদৃঢ় ভিত্তিও আজ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; একটা জীবন্ত অত্যাচার সমাজের বুকের উপর বসিয়া রক্তশোষণ করিতেছে। আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না, তাই আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। ক্ষুব্ধহৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগে সন্ন্যাসিকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ অন্ধভারতবাসীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—

"One fifth of your Madras people will become Christians if you do not take care. Was there ever a sillier thing before in the world than what I saw in Malabar Country? The poor Pariah is not allowed to pass through the same street as the high caste man, but if he changes his name to a hodge-podge English name, it is all right or to a Mahommedan name, it is all right."

এই ত হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা! হিন্দুসমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতি লক্ষ্য করিলে লজ্জায় মস্তক আপনিই অবনত হইয়া আসে। যে মুচি, মেথর, ও চণ্ডালদিগকে পারিয়ার (Pariah) ন্যায় ঘৃণিত অস্পৃশ্য বলিয়া অবজ্ঞায় আপন দুয়ার হইতে বহিষ্কৃত করিতে দ্বিধা বোধ করি না, তাহারাই আজ অন্য ধর্ম্মের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া স্বধর্ম্মীদিগের অমানুষিক অত্যাচারের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে! নিম্নের উদ্ধৃতাংশ হইতে উহা সম্যক উপলব্ধি হইবে :—

"The Converts to Christianity are recruits almost entirely from the classes of Hindus, which are lowest in the social scale As long as they remain Hindus they are daily and hourly made to feel that they are no better than beasts! They are snubbed and repressed on all public occasions, are refused admission to the temples of their Gods. But once a youth from among these people becomes a Christian, his whole horizon changes."

দিন দিন ভারতের হিন্দুসংখ্যা যেরূপ দ্রুতগতিতে কমিয়া আসিতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুজাতির বিলোপ অনিবার্য্য। জগতে আজ আত্মকলহনিরত হিন্দুর স্থান কোথায়? ভারতের রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করিয়া উর্ম্মিবিক্ষুব্ধ নীল সিন্ধুর পরপারে সুদূর কেনীয়ার লাঞ্ছিত হিন্দুভ্রাতৃগণের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছ কি? জাতিসঙ্ঘে তোমার স্থান অতি নীচে; অতি হেয় কদর্য্য স্থান তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অথচ এমন অপমানের কলঙ্ক মাথায় রাখিয়া তোমার আপন ঘরের আপন ভায়ের হৃদয় শোণিত শোষণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছ না।

আজ নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের মহারথিবৃন্দ এ জড়প্রায় সমাজবক্ষে একটা জাগরণের সাড়া আনিয়া দিয়াছেন। তাই ভরসা হয় বহু বর্ষ পরে এ ভগ্ন মন্দিরে পুনঃ যে আশার ক্ষীণ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, উদ্বুদ্ধ কর্ম্মীর উৎসাহ-তৈল সিঞ্চনে সে আলো উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে; আর উহা নির্ব্বাপিত হইবে না।

ঐ শুন, মিলনের মূর্ত্তবিগ্রহ মহাত্মা গান্ধী আজ তাঁহার দেশবাসীকে প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধিবার জন্য এই মহামানবসাগরতীরে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। পঞ্চনদ সেবিত পঞ্জাবের বীর কেশরী লালা লাজপতের তূর্য্যনিনাদ, শস্যশ্যামলা বাঙ্গলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মিলন মধুর সঙ্গীতের মোহন মূর্চ্ছনা সমগ্র ভারত-সমাজ-বক্ষে নূতন প্রাণস্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে, সুপ্তসিংহ আজ জাগ্রত হইয়াছে। হে হিন্দুসমাজ, এখনও এ মহামিলন-তীর্থনীরে আপনার যুগযুগান্তের হীনতা, দুর্ব্বলতা, হিংসা, দ্বেষ ডুবাইয়া সকলকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে শিক্ষা কর, তবেই পুনঃ আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াইয়া জগতের মধ্যে গৌরবমণ্ডিত আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ শিকদার এম্-এ।

মাধুকরী

১। মরণ কালে।

একটা চলিত কথা আছে মানুষের মরণ কালে বিপরীত বুদ্ধি হয়। আমাদের জাতীয় জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডের নির্য্যাতিতা রাণী বোডেশীয়া রোম সাম্রাজ্যের কিরূপে ধ্বংস হইবে সেই কথার ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিল :—

"Sounds not arms shall win the prize, Harmony,—the path to fame."

যখন অস্ত্র বিদ্যার পরিবর্ত্তে সঙ্গীত বিদ্যার আদর হইবে তখনই রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের আরম্ভ।

সকল জাতির ধ্বংসের মূলে এই বিলাস ব্যসন ও দুর্নীতি পরায়ণতা।

ভারতের হিন্দু, মোগল পাঠান, এমন কি পরবর্ত্তী যুগের পর্ত্তুগীজ ও ফরাসী বণিকদেরও এই জন্যই ধ্বংস হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইতিহাসের এই শিক্ষা আমাদেব জাতীয় জীবনের পবিচালকগণ গ্রহণ করিতেছেন না। ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইয়াছে অনুধাবন করিয়া দেখুন।

(১) গত পাঁচ ছয় বৎসর হইতে পতিতা নারীগণ সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছে। "পাপকে ঘৃণা কর,—পাপীকে ঘৃণা করিও না" প্রভৃতি ছলনাময় যুক্তির জঞ্জালে যুবকগণ অন্ধ হইয়াছে। ইহার জন্য দায়ী প্রথমতঃ কয়েকজন সাহিত্যসেবী; দ্বিতীয়তঃ থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ, তৃতীয়তঃ বাজনীতিক ক্ষেত্রের কয়েকজন নেতা। ইহার কু-ফল কতদূর গড়াইয়াছে তাহা মহাত্মা গান্ধী বরিশালে যাইয়া ভালরূপে দেখিয়া সকলকে এই অপবিত্র সংঘ ভাঙ্গিয়া দিতে বলিয়াছেন এবং সকলকে এই পাপ স্পর্শ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

(২) আমাদের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য নাট্যকলার উন্নতি-সাধন প্রয়োজন, এরূপ বিপরীত বুদ্ধি অনেকের মাথায় আসিয়াছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়েব শিক্ষিত যুবক থিয়েটারের দিকে দলে দলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে,—দেশেব লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যের জন্য ব্যয়িত না হইয়া থিয়েটারের দল গঠনে নিয়োজিত হইতেছে। বারবনিতা ও নর্ত্তকীগণের প্রশংসা ও প্রতিকৃতি সংবাদ পত্রেব পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইতেছে.—দেশের অপবিণত বুদ্ধি যুবকেরা এই পাপানলে পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিতেছে।

(৩) দেশেব চিন্তা ধারাব যিনি পরিচালক, যুবকগণের যিনি আদর্শ-স্থানীয় সেই কবিশ্রেষ্ঠ ববীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া তাহার অভিনয়-কলাব সহিত আপনাকে বিশেষভাবে বিজড়িত করিয়াছেন। কোন নর্ত্তকীর গান শুনিয়া তিনি এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে তাহার জন্য পুনরায় নূতন গান রচনা করিয়া দিয়াছেন। ইংরাজীতে একটা কথা আছে "Fashions descend" গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

অনুকরণ প্রিয়তা নিম্নগামী। শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করে ইতর ব্যক্তিরাও সেইরূপ করে। লোক শিক্ষার গুরু রবীন্দ্রনাথ এই সহজ সত্য বিস্মৃত হইলেন।

(৪) শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র নিরঞ্জন পাল বিলাত যাইয়া অভিনয় বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছেন। তিনি দেশে আসিয়া ভারতের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণকে লইয়া থিয়েটার ও সিনেমার দল গঠন করিতেছেন। এই হইল শিক্ষার পরিণাম। ভারতীয় যুবকের কৃতিত্ব এখন এই বিলাস ব্যসনের দিকেই পরিস্ফুট হইতেছে।

(৫) গত রবিবারের ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এইরূপ—সম্ভ্রান্ত বংশের ভারতীয় মহিলা কর্ত্তৃক পরিচালিত কলিকাতার কোন থিয়েটারের জন্য বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ ভারতীয় মহিলা অভিনেত্রীর প্রয়োজন; বেতন ২৫০ হইতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত। থিয়েটারের আমোদ প্রমোদের পরিণাম কতদূর পর্য্যন্ত গড়াইতেছে। অন্তঃপুরচারিণী ভারতীয় মহিলা থিয়েটার পরিচালনা করিতেছেন। পাশ্চাত্য দেশে অভিনয় করিয়া নরনারীগণ কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করে; কিন্তু সেই আদর্শের দিকে যদি ভারতীয় নারী পুরুষ লক্ষ্য করিয়া চলেন তবে অচিরেই এদেশের জাতীয় জীবন ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

(৬) বেঙ্গলী, ফরওয়ার্ড, সার্ভেণ্ট প্রভৃতি সংবাদ পত্রে থিয়েটারের সচিত্র ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ সমূহ প্রকাশিত হয়। তাহার ফলে কি হইতেছে?—যুবকের মনে হইতেছে কেবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি, দূষিত চিন্তার আবির্ভাব ও প্রলোভনের আকর্ষণ। যে দেশের যুবকগণের সম্মুখে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে,—বিনিদ্র হইয়া কর্ম্ম করিলেও যে দেশে কর্ম্মের অন্ত নাই সেই দেশের যুবকগণ এত তরল মস্তিষ্ক হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা কোন গুরুতর কাজের কথা ভাবিতে পারে না,—এত দুর্ব্বল দেহ হইয়া পড়িয়াছে যে কোন বৃহৎ কাজে তাহারা হাত দিতে সাহস করে না। তাহারা চায় এখন—আমোদ প্রমোদ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে,—হাসিয়া খেলিয়া দেশোদ্ধার করিতে। কিন্তু দিনে

দিনে, পলে পলে যে তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতেছে না।

(৭) কোন সৎকার্য্যে চাঁদা সংগ্রহের নিমিত্ত আজকাল "ভ্যারাইটী এণ্টারটেইন মেণ্ট" অর্থাৎ নানাপ্রকারে আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অনেক সময় এই সকল ব্যাপারে ভদ্র মহিলাগণ যোগ দিয়া থাকেন। ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে প্রায়ই শুনিতে পাই মেয়েরা গান গাহিতেছে,- নাটকের মহলা দিতেছে। আমরা বুঝি না, সৎকার্য্যে এই দুর্নীতির ভেজাল কেন?—পুরুষের কি লজ্জা নাই? নিজেরা চাঁদা দিতে পার না,—ঘরের মেয়ে বউদের দ্বারা গান করাইয়া নিজেদের অক্ষমতার পরিপূরণ কর—ছিঃ—ছিঃ।

আমরা জানি গত যুদ্ধের সময় বিলাতের অনেক থিয়েটার সার্কাস, সিনেমা এই সব বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সকলেই তখন লড়াই করিতে ছুটিয়াছে। কিন্তু আমরা একটা জীবন মরণের সংগ্রামে নিত্য লিপ্ত রহিয়াছি অথচ আমাদের আমোদ প্রমোদের বিরাম নাই। দেশের ভূমি-লক্ষ্মী আজ যুবকদের পানে কাতর নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা চলিয়াছে অভিনেত্রীর চটুল হাস্য ও নৃত্যভঙ্গিমার মোহে অন্ধ হইয়া। দেশের শিল্প বাণিজ্য যুবকগণকে কর্ম্মের ভেরী নিনাদে আহ্বান করিতেছে কিন্তু তাহারা চলিয়াছে আমোদ প্রমোদের পঙ্কিলপ্রবাহে ভাসিয়া। নিরাভরণা পল্লীজননী যুবকদিগের ভরসা করিয়া এখনও বাঁচিয়া আছে,—কিন্তু তাহারা চলিয়াছে বিলাস ব্যসনের তরঙ্গে ডুবিয়া।

আমরা অক্লান্তভাবে কতবার বলিয়াছি। আবার বলিতেছি— এ সর্ব্বনাশের পথ,—মরণের পথ, ধ্বংসের পথ। যদি জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিতে হয় তবে এ পথ ছাড়িতে হইবে।

("সঞ্জীবনী" ২১শে শ্রাবণ, ১৩৩২।)

২। কলিকাতার পেশাদার থিয়েটার।

সম্প্রতি গান্ধী মহাশয়ের ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে কোন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন, কলিকাতার পেশাদার দেশী থিয়েটারগুলি প্রধানতঃ

পেশাদার অভিনেত্রীদের জোরে চলে এবং তাহারা সকলেই বারবনিতা। ইহার কু-ফলের দিকেও লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। গান্ধীজি লিখিয়াছেন, তিনি চান না যে, বারবনিতারা বারবনিতা থাকিবে এবং অভিনেত্রীরও কাজ করিবে।

বারবনিতা অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে আমরা অনেকবার আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। তাহার বিস্তারিত পুনরাবৃত্তি করিতে চাই না। এই বিষয়টির আলোচনা দুই দিক দিয়া হইতে পারে।

(১) বারবনিতারা বারবনিতা থাকিয়াই পেশাদার অভিনেত্রীর কাজ করায় সমাজের ক্ষতি হয় কিনা, এবং ক্ষতি হইলে তাহার নিবারণের উপায় কি?

(২) এইরূপ বন্দোবস্ত দ্বারা বারবনিতা-বৃত্তিকে স্থায়ী করার সাহায্য করা হয় কি না, তাহা স্থায়ী করার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সম্মতি দিলে কার্য্যতঃ কতকগুলি স্ত্রীলোককে বারবনিতার জীবন যাপন করিতে হয় বলিয়া সমাজের এক অংশের লোকের প্রতি নির্ম্মমতা প্রদর্শন ও অবিচার করা হয় কি না? আমরা আগে আগে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে, বারবনিতারা দুশ্চরিত্রা থাকিয়াই সামাজিক কোন কাজ করিলে তাহাদের সংস্পর্শে ও সংস্রবে সমাজের অনিষ্ট হয়। তাহার অন্যপ্রকার দুইটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। অনেক কলকারখানায় শ্রমজীবী স্ত্রীলোক কাজ করে। তাহাতে তাহাদের উপার্জ্জন যথেষ্ট হয় না বলিয়া তাহারা কেহ কেহ উপার্জ্জনের জন্য পাপেও লিপ্ত হয়। কলিকাতায় যাহারা ঠিকা ঝির কাজ করে, তাহারা অনেকে যথেষ্ট বেতন পায় না, পাপে লিপ্ত হইয়া বেতন ব্যতীত আরও কিছু উপার্জ্জন করে। অবশ্য এই উভয় প্রকার স্ত্রীলোকদের উপার্জ্জনের অল্পতাই তাহাদের পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার একমাত্র কারণ নহে; অন্য কারণও আছে। কিন্তু কারণ যাহাই হউক এই উভয় প্রকার স্ত্রীলোকদের চরিত্রহানি বশতঃ তাহাদের নিজেদের অকল্যাণ হয় এবং সমাজেরও অকল্যাণ হয়। অতএব তাহারা যে-যে কারণে বেশ্যাবৃত্তি করে, সেই সেই কারণের উচ্ছেদের দিকে সমাজহিতৈষী-দিগের মনোযোগ করা উচিত।

অনেকে মনে করেন বেশ্যাবৃত্তি স্মরণাতীত কাল হইতে আছে এবং ভবিষ্যতেও চিরকাল থাকিবে, অতএব ইহার প্রতিকার চিন্তা করিয়া মাথা খারাপ করিবার দরকার নাই। আমরা তাহা মনে করি না। ক্রীত বা যুদ্ধে বন্দীকৃত দাসের দ্বারা কষ্টসাধ্য বা ঘৃণিত কাজ করাইবার প্রথা বেশ্যাবৃত্তি অপেক্ষা কম প্রাচীন নহে। কিন্তু এখন তাহা আর কোন সভ্যদেশে নাই বলিলেও চলে। অবশ্য দাসেদের স্থানে অন্যবিধ শ্রমিকের শ্রম বলপূর্ব্বক চালাইবার চেষ্টা নানা স্থানে চলিতেছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামও চলিতেছে। বেশ্যাবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, যে সামাজিক সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা এরূপ হইতে পারে ও হইবে যাহাতে ক্রমশঃ উহা হ্রাস পাইবে ও উঠিয়া যাইবে। অভিনয় মাত্রকেই আমরা খারাপ মনে করিনা। যাত্রা একপ্রকার অভিনয়। বহুবিধ যাত্রায় আমাদের দেশের লোকে অনাবিল আমোদ ও শিক্ষা পাইয়াছে। থিয়েটারের অভিনয় মাত্রই খারাপ নয়। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে আমরা উহার একান্ত বিরোধী হইতাম কিন্তু যদি ইহা সত্য হয়, যে, কলিকাতার দেশী থিয়েটারগুলি, পেশাদার অভিনেত্রী ভিন্ন চলে না, এবং পেশাদার অভিনেত্রীদের পক্ষে সচ্চরিত্রা হওয়া ও থাকা অসম্ভব, তাহা হইলে সেরূপ অবস্থার উচ্ছেদের কোন না কোন উপায় আবিষ্কার করিতে সমাজ বাধ্য। কেন না, এমন কোন সামাজিক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান রাখিবার অধিকার সমাজের নাই, যাহার দ্বারা সমাজের অন্তর্ভূত কোন অংশকে চির অমঙ্গলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত রাখিতে হয়।

উপরে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কথা লিখিয়াছি, যাহারা যথেষ্ট পারিশ্রমিক না পাওয়ায় বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা অভাব পূরণ করে। পাদ্রি হারাট্ এণ্ডার্সন্‌কে কোন কোন পতিতা নারী বলিয়াছে, যে সদুপায়ে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলিলে তাহারা তাহাদের বর্ত্তমান ঘৃণিত জীবন ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু পেশাদার অভিনেত্রীদের বেলায় একথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ অভিনয় করিয়া ত তাহারা যথেষ্ট টাকা পায়, অথচ তাহারা ভাল হয় না। ইহার কারণ কি? থিয়েটার সংসৃষ্ট লোকেরা কি তাহাদিগকে ভাল হইবার ও থাকিবার পরামর্শ,

উৎসাহ এবং সুযোগ দেয় না ? তাহারা কি, ববং ইহার বিপরীত অবস্থা-সমবায়েরই সৃষ্টি করে ? অথবা যাহারা অভিনয় দেখিয়া অভিনেত্রীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ পেশাদাব অভিনেত্রীদেব কলুষিত জীবনেই আবদ্ধ থাকিবার অন্যতম কারণ হয় ? থিয়েটারগুলির অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদেব কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকায় এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। কিন্তু শুনিয়াছি, কোন কোন পেশাদার অভিনেত্রী অভিনয় কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিলে কোন-না-কোন ধনী দুশ্চরিত্র বা দুর্ব্বলচিত্ত লোক তাহাদিগকে আর অভিনেত্রী থাকিতে দেয় নাই। ইহা হইতে মনে হয়, অন্ততঃ এই সকল স্থলে অভিনয় কার্য্য অভিনেত্রীদের কেবল রোজগারের সদুপায় না হইয়া তাহাদেব ও তাহাদেব দ্বারা আকৃষ্ট পুরুষদিগের কলুষিত জীবন যাপনের সহায় হইয়াছে।

যাহারা পেশাদার অভিনেত্রীর কাজ করে, শুনিয়াছি তাহাদের মধ্যে অনেকে ভাল অভিনয় করে। তাহা নানাবিধ মানসিক শক্তির পরিচায়ক। তাহারা প্রাতঃস্মরণীয়া অনেক মহিমাময়ী মহিলার ভূমিকা গ্রহণ করে। তাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের চরিত্র ধ্যান করিয়া, অভিনেত্রীদের যদি হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইত, যদি তাহাদের এরূপ মনের বল জন্মিত তাহারা আর দেহবিক্রয়ে রাজী হইত না, তাহা হইলে ত তাহারা কোন-না-কোন আইনের সাহায্যে বিবাহিত হইয়া একচর্য্যা একনিষ্ঠ জীবন যাপন করিতে পারিত। কোন পুরুষের পক্ষে কোন নারীর ঘনিষ্ঠতম আমরণ সঙ্গলাভের একমাত্র বৈধ মূল্য একনিষ্ঠ প্রেম। কোনও নারীর পক্ষেও কোনও পুরুষের এরূপ সঙ্গলাভের একমাত্র বৈধ মূল্য একনিষ্ঠ প্রেম। ইহা বুদ্ধির দ্বারা বুঝিবার এবং কার্য্যতঃ ইহার অনুসরণ করিবার মত হৃদয় মনের শক্তি কোনও পেশাদার অভিনেত্রীর থাকা কি একেবারেই অসম্ভব ?

কোন-না-কোন প্রকারে যাহারা সমাজের কোন প্রকার কাজ করিয়া দেয়, সমাজ তাহার বিনিময়ে তাহাদের কল্যাণ চিন্তা ও কল্যাণের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। নতুবা সমাজের স্বার্থপরতা ত হয়ই, অধিকন্তু

সমাজ ক্ষতিগ্রস্তও হয়। আমাদের মনে হয়, পেশাদার অভিনেত্রীদের নিকট হইতে সমাজ কেবল আমোদ দান-রূপ কাজই লইতেছে কিন্তু তাহাদের কল্যাণ চিন্তা করিতেছে না। ফলে উক্ত অভিনেত্রীরাই যে কেবল খারাপ থাকিয়া যাইতেছে তাহা নহে, সামাজিক অপবিত্রতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। থিয়েটারের সংখ্যা ও আদর বাড়িয়া চলিতেছে। যে কেবল বেশ্যা, ভদ্রসমাজে তাহার নাম উল্লেখ কিংবা তাহার সম্বন্ধে আলোচনা চলে না; কিন্তু যে বেশ্যা এবং অভিনেত্রী দুই-ই, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা এবং তাহার ছবি মুদ্রণ সম্ভ্রান্ত, ভদ্র, সচ্চরিত্র লোকদের দ্বারাও হইতেছে। ইহাদ্বারা সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা ও বৃদ্ধি ক্রমশঃ কঠিনতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে।

"বিবিধপ্রসঙ্গ"—প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩২ সাল।

সহযোগী "সঞ্জীবনী" ও "প্রবাসী" বাংলা দেশের থিয়েটার প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহা খুবই সমীচীন। বহুযুগ সঞ্চিত তিমির রাশি ঠেলিয়া দেশ যখন আলোকের মুখ দেখিবার জন্য উন্মুখ, আর্টের দোহাই দিয়া নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ তখন উহার গতি-পথে নিবিড় কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছেন—ইহাই মরণোন্মুখ জাতির জীবন সমস্যার রহস্য-কৌতুক। 'ভূখা' দেশের শোনিত পরিপুষ্ট নাট্যকলা যদি সাধারণের দুর্ব্বলতা ও বোকামির সুবিধা ও সুযোগ খুঁজিয়া বাহির করিয়া অন্নদাতার শোনিতকে বিষাক্ত করে তবে তাহা অপেক্ষা বিশ্বাসঘাতক আর কে আছে? শুধু থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণকে ন্যায়ের বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিলে চলিবে না, নব্য-বঙ্গের যাঁহারা আদর্শ স্থানীয়, তাঁহারাও যদি নাট্যশালায় গমন করিয়া এই দূষিত ঘৃণ্য ব্যবসায়কে পরোক্ষভাবে অনুমোদন এবং দেশের আদর্শ নষ্ট করিয়া তাহার প্রাণ-পাখীর বিনাশে সহায়তা করেন, তবে ন্যায়ের বিধান হইতে তাঁহারাও অব্যাহতি পাইবেন কি? বাংলার হৃদয় ও মস্তিষ্ককে একাধারে সম্মিলিত করিয়া নাট্যশালার বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দেশের বালক বালিকা, তরুণ তরুণীকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবে কে? আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া সংযমহীন স্বাধীন চিন্তার আগুন যাঁহারা সমাজ গৃহের প্রতি চালে ধরাইয়া বেড়াইতেছেন ইহা

তাঁহাদেরই কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। এই রিরংসার অগ্নিদাহ এক্ষণে দেশব্যাপী। এ আগুনে ঘরও পুড়িতেছে, দমকলও পুড়িতেছে, "প্রবীণ" গুরুদেব পুড়িতেছেন, "সবুজ" শিষ্যও পুড়িতেছে। এই উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার যুগে "প্রবাসী" "সঞ্জীবনীর" ক্ষীণ কণ্ঠোচ্চারিত ভয়ব্যাকুল 'গেল সব গেল', এই সতর্ক নিষেধবাক্য কেহ কি শুনিবে? বাংলায় গিরীশচন্দ্রের মত দ্বিতীয় নীলকণ্ঠ আর কে আছেন, যিনি রঙ্গালয়ের সমস্ত হলাহল নিঃশেষে পান করিয়া সমাজকে অমৃত দান করিবেন।

সমালোচনা ও পুস্তকপরিচয়

(১) 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা'—(আষাঢ় সংখ্যা) একখণ্ড পাইয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিলাম। বঙ্গ ভাষায় সঙ্গীত বিষয়ক ইহাই একমাত্র মাসিক পত্রিকা। ইহাতে দেশের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞগণ নিয়মিতভাবে লিখিয়া থাকেন। পত্রিকাখানি সঙ্গীত শিক্ষার্থী ও সঙ্গীতামোদী সকলের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই সংখ্যায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গীতানুরাগ, তাঁহার ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে এমন অনেক কথা আছে যাহা অনেকেই জানেন না। গান, স্বরলিপি, সঙ্গীত বিজ্ঞান, কবিতা, প্রবন্ধ এবং মনোরম চিত্রাদিতে ভূষিত হইয়া পত্রিকাখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। আশা করি, এই পত্রিকা সঙ্গীত প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিবে। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য সডাক মাত্র ২৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা ৶৹ তিন আনা। ৮।সি, লাল বাজার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত আর, বি, দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(২) শিশুগীতা—শ্রীযোগী কথিত ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত লিখিত। মূল্য ৷৹ আনা। বাংলা ভাষায় ছেলে মেয়েদের উপযোগী ধর্ম্ম গ্রন্থ অতি বিরল। শিশুগীতা সেই অভাব অনেকটা পূর্ণ করিবে। লেখক মহাশয় এইরূপ সুখপাঠ্য ও সহজ ভাষায় নব নব ধর্ম্মপুস্তক প্রণয়ন করিয়া তরুণ বাংলার কল্যাণ সাধন করুন, ইহাই অনুরোধ।

(৩) শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা—স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ সম্পাদিত, মূল্য ।/০ আনা। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জনৈক প্রাচীন ত্যাগী শিষ্য রচিত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য ও বিশেষ পূজা পদ্ধতি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

(৪) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—কাশী, ১৯২৪ সালের কার্য্য-বিবরণী। এই আশ্রমে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভাগ আছে :—

(ক) সাধারণ হাঁসপাতাল (আন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ)।

(খ) অসমর্থ পুরুষদিগের আশ্রম।

(গ) বিধবা ও অসমর্থা স্ত্রীলোকদিগের আশ্রম।

(ঘ) বালক-নিবাস।

(ঙ) বালিকা-নিবাস।

পুরুষ-বিভাগ, আশ্রমের সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক এবং স্ত্রী-বিভাগ জনৈক বিদুষী অভিজ্ঞা মহিলা ও তাঁহার সহকারিণীগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া থাকে।

(চ) আশ্রমের বাহিরে সেবা কার্য্য—যে সমস্ত ভদ্রমহিলা আশ্রমে আসিয়া সাহায্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাঁহাদের বাড়ী বাড়ী গিয়া অর্থ ও খাদ্য সাহায্য করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া যে সমস্ত দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি আশ্রমে আসিয়া যে কোন প্রকার সাহায্য চায় বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিবার ব্যবস্থা আছে।

(ছ) চরকা ও বস্ত্র-বয়ন বিদ্যালয়—এখানে আশ্রমের বালকগণকে ও বাহিরের শিক্ষার্থীদিগকে বিনা বেতনে সযত্নে বস্ত্র-বয়ন-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়।

(জ) আশ্রমে একটি পাঠাগার আছে।

আলোচ্য বৎসরে ১৩৩৩ জন রোগীকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা এবং ১৫৯৬৪ জন ব্যক্তিকে আশ্রমের বাহিরে ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা নানারূপে সাহায্য করা হইয়াছে।

গত বৎসর আশ্রমের মোট আয় ৮৪৯৪৮ টাকা ৴ পাঃ এবং মোট ব্যয় ৫৮৮৫৭।/১০ পাঃ।

সেবাশ্রমের কার্য্যবিবরণী পাঠে আমরা আনন্দিত হইয়াছি; কিন্তু মাসিক ও সাময়িক সাহায্যকারিগণ অধিকাংশই বাঙ্গালী দেখিয়া মনে হয়, এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলার বাহিরে বিশ বৎসরের উপর সেবাকার্য্য করিয়াও ঐ দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে স্বামিজীর নিষ্কাম সেবাধর্ম্মে বিশেষ আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করিতে পারেন নাই।

(৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—সরিষা (ডায়মণ্ড হারবার); ১৯২৩ এবং ১৯২৪ সালের কার্য্য বিবরণী আমরা পাইয়াছি। উল্লিখিত আশ্রমে গত দুই বৎসরে নিম্ন-লিখিত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে :—

(ক) অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়—৩৮টি বালক এই শিক্ষায়তনে নিয়মিতরূপে বিদ্যা চর্চ্চা করিয়াছে এবং এখনও করে।

(খ) আশ্রমে বর্ত্তমানে ৭টি তাঁত আছে, ১৭টি ছাত্র বস্ত্র-বয়ন-শিল্পে শিক্ষালাভ করিয়াছে।

(গ) আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ২৫৭৯ জন রোগীকে চিকিৎসা ও ঔষধাদি দ্বারা সেবা করা হইয়াছে।

(ঘ) অগ্ন্যুৎপাতে গৃহ নষ্ট হওয়ায় কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান গ্রামবাসীকে আশ্রমের সেবকবৃন্দ ২৬ খানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) ২৭ জন দরিদ্র গৃহস্থকে নিয়মিতরূপে আহার ও বস্ত্রাদি দানে সাহায্য করা হইয়াছে।

(চ) আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ, তিনটি বালকের স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়ভার বহন এবং চারিটি দরিদ্র বালককে আশ্রমে স্থায়ীভাবে রাখিয়া তাহাদের ভরণ পোষণ এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(ছ) ৩৬০ খানি কম্বল, ২৩ খানি বস্ত্র, ৫ খানি চাদর, ৪টি জামা

প্রভৃতি দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত গ্রামবাসিগণ আশ্রম হইতে সাহায্য পাইয়াছে।

(ঝ) আশ্রমে একটি সাধারণ পাঠাগার আছে।

১৯২৩ সালে আশ্রমের মোট আয় ৩৯৯৮/১১ পাঃ, মোট ব্যয় ৩৫৭৭/৬ পাঃ এবং ১৯২৪ সালে মোট আয় ৬৬১১।৴৬ পাঃ, মোট ব্যয় ৬৪৬১॥৴৮ পাঃ।

আশ্রমটি খুব বেশী দিনের নহে, তথাপি ইহার বহুল কর্ম্ম প্রসারণ সকলেরই মনযোগ আকর্ষণ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিবে সন্দেহ নাই। আশ্রমের প্রধান সাহায্যকারিগণ অধিকাংশই বম্বাই নিবাসী। কতিপয় নিঃস্বার্থ পল্লীসেবকের নীরব কর্ম্মে সুদূর বম্বাইবাসীদের এইরূপ অপরোক্ষ সহানুভূতি বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয়। এই উদারহৃদয় বম্বাইবাসিগণ সমস্ত বাঙ্গালীর অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

সংঘবার্ত্তা

১। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী, বিগত ১৩ই জুলাই ৭নং হালদার লেনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেণ্টস্ হোমে এবং গত ৪ঠা আগষ্ট মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটস্থ অদ্বৈত আশ্রমে শুভ পদার্পণ করিয়া উপস্থিত ধর্ম্ম-পিপাসু ভক্তগণকে উপদেশামৃত দানে আনন্দিত করিয়াছেন।

২। স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ বিগত ১৩ই জুলাই জামসেদপুর গমন করেন। তিনি স্থানীয় "বিবেকানন্দ-হলে" গত ১৯শে তারিখে "কর্ম্ম জীবনে ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎপরে ২১শে তারিখে স্বামী রামানন্দের সহিত তিনি মেদিনীপুর আগমন করেন। তথায় স্বামিজী "বেলি পাব্‌লিক লাইব্রেরী হলে" রায় বাহাদুর মন্মথনাথ বসুর সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভায় "আমাদের জাতীয় আদর্শ ও শিক্ষা" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে স্বামিজী গড়বেতা (মেদিনীপুর) আগমন করিয়া তথায় "জাতীয় উন্নতি ও কর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

৩। গত ২৬শে শ্রাবণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে এক সভার অধিবেশন হয়। জয়দেবকৃত দশাবতারের স্তব গান পূর্ব্বক সভা আরম্ভ হইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্-এ, মহোদয় "গোপাল কৃষ্ণের বাল্য-লীলা" সম্বন্ধে এক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রমণী মোহন দত্ত গুপ্ত বি-এ, মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের বৈচিত্র্য প্রতিপাদন করিয়া যোদ্ধা, রাজনীতিজ্ঞ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপকরূপে তাঁহার স্থান কোথায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাশঙ্কর সেন এম-এ, মহাশয় "শ্রীকৃষ্ণ-লীলা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করার পর স্বামী অচ্যুতানন্দ একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনাশক্তি ও ভয় শূন্যতাই যে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের মূলমন্ত্র ছিল তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেন। সর্ব্বশেষে সুগায়ক শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দাস মহাশয় সুললিত-কণ্ঠে "মাথুর কীর্ত্তন" গাহিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

বঁধু

ওগো, চিরসুখ সুধা নির্ঝর বঁধু

দুঃখ হে প্রিয়তম।

চিব প্রিয় সখা অন্তর মধু

মঞ্জুল মনোরম।

পরিবন্তণে নিয়ে এসো প্রাণে

শীত চন্দন তৃপ্তি,

প্রেম-অঞ্জনে ফুটাও নয়নে

শান্ত উজল দীপ্তি।

অন্তর মম ধুয়ে দাও সখা

নির্ম্মল আঁখি লোরে,

মর্ম্মের পথে দাও আজ দেখা

বাঁধ প্রিয় প্রেম ডোরে।

মর্ম্ম বীণায় তোল আজ ধীরে

করুণ সে মধু তান,

এসগো উছসি' হৃদয়ের তীরে

দেবতার স্নেহ দান।

ভরে' দাও হিয়া সমবেদনায়

বেদনার মধু ঢালি',

ছেয়ে দাও প্রাণ পুণ্য প্রভায়

প্রেমের আলোক জ্বালি'

বিলায়ে দাও গো বিশ্বের মাঝে
আমার পরাণখানি,
নিয়ে চল মোরে সকলের কাজে
ত্যাগের মন্ত্র দানি' ।
কাঙাল করিয়া কর মোরে রাজা
পরাণ বন্ধু মোর,
যত পার দাও দৈন্যের সাজা
ওগো প্রিয় মন চোর ।
তোমার দেওয়া সে বেদনা হিয়ার
আছে তা'র প্রয়োজন,
মন পথে সে যে মর্ম্ম বিহার
উৎসব আয়োজন ।
ক্রন্দনে মম ফুটায়ে তোল গো
কাঞ্চন রাঙ্গা হাসি,
বন্ধনে তব লইয়া এস গো
মুক্তি সে অবিনাশী ।
এসো সখা মোর ঢাল এ হিয়ায়
বেদনার যত মধু,
প্রীতি-মূর্চ্ছনে মর্ম্ম-বীণায়
ঝঙ্কৃত হও বঁধু ।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

(৯)

শ্রীশ্রীমার শেষ অসুখের বারে একদিন সকাল বেলা মাকে দর্শন করিতে যাই। তখন ঘরে আর কেউ ছিল না। মা সর্ব্ব দক্ষিণের ঘরে ছিলেন। এই সময় কয়েক দিন একটু ভাল ছিলেন। দিনের বেলায় ঐ ঘরেই মার বিছানা করে দেওয়া হত। চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতেই মা বাড়ীর সব কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মার শরীর খুব রুগ্ন দেখিয়া আমি বলিলাম, "মা, আপনার শরীর এবার বিশেষ খারাপ হয়ে গেছে। এত দুর্ব্বল শরীর কখনও দেখি নাই।"

মা—হাঁ বাবা, দুর্ব্বল খুব হয়েছে। মনে হয় এ শরীর দিয়ে ঠাকুরের যা করাবার ছিল, শেষ হয়েছে। এখন মনটা সর্ব্বদা তাঁকে চায়, অন্য কিছু আর ভাল লাগে না। এই দেখনা রাধুকে এত ভালবাসতুম, ওর সুখ সচ্ছন্দের জন্য কত করেছি, এখন ভাব ঠিক উলটে গেছে। ও সামনে এলে বাজার বোধ হয়, মনে হয় ও কেন সামনে এসে আমার মনটাকে নীচে নামাবার চেষ্টা কচ্ছে। ঠাকুর তাঁর কাজের জন্য এত কাল এই সব দিয়ে মনটাকে নামিয়ে রেখেছিলেন। নইলে তিনি যখন চলে গেলেন, তার পর কি আমার থাকা সম্ভব হত?

আমি—মা, আপনি এরূপ কথা বল্লে আমাদের বড় কষ্ট হয়। আপনি যদি চলে যান, আমাদের উপায় কি হবে? আমাদের ত্যাগ তপস্যার বিশেষ অভাব। বৈরাগ্য ত একেবারে নাই বল্লেই চলে। আপনার শরীর না থাকলে আমরা কিসের জোরে মহামায়ার রাজত্বে বেঁচে থাক্‌বো? মনে যখন কোন দুর্ব্বলতা এসেছে, আপনার কাছে বলে তা হতে বাঁচবার রাস্তার খবর পেয়েছি। এখন আমরা কোথায় যাব? আমাদের যে একেবারেই নিরাশ্রয় হয়ে পড়তে হবে।

মা—(দৃঢ়তার সহিত) কি, তোমরা নিরাশ্রয় হবে কেন ? ঠাকুর কি তোমাদের ভাল মন্দ দেখছেন না ? অত ভাবো কেন ? তোমাদের যে তাঁর পায়ে সঁপে দিয়েছি। একটা গণ্ডির মধ্যে তোমাদের ঘুরতে হবেই, অন্য কোথাও যাবার যো নাই। তিনি সর্ব্বদা তোমাদের রক্ষা কচ্ছেন।

আমি—ঠাকুরের দয়ার কথা অনেক সময় মনে হলেও সব সময় ঠিক বুঝতে পারি না। অনেক সময় বিশ্বাস হয়, অনেক সময় সন্দেহও আসে। আপনাকে সাক্ষাৎ দেখছি, ভাল মন্দ অনেক কথা বলেছি, আপনিও তার ভাল মন্দ বিচার করে কখন্ কি ভাবে চললে আমার ভাল হবে, বলে দিয়েছেন। এতে আপনার কাছে আশ্রয় পেয়েছি, এটা বিশ্বাস হয়।

মা—ঠাকুর একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—এটি সর্ব্বদা মনে রাখবে। এটি ভুললে সব ভুল। আজ যে তোমার বাড়ীর কথা, মার কথা এত জিজ্ঞাসা করলুম, কেন জান ? প্রথম গণেনের মুখে তোমার বাপ মবার খবর শুনলুম। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম তোমার মার আর কে আছে, খাবার সংস্থান আছে কিনা, তুমি না থাকলে তাঁর চলবে কিনা ; যখন শুনলুম তুমি না থাকলেও তাঁর চলবে তখন মনে হল 'যাক্, ছেলেটার যদি একটু সৎবুদ্ধি হয়েছে, ঠাকুরের ইচ্ছায় তার সৎপথে থাকবার বিশেষ বাধা পড়বে না'।

মার সেবা করা সকলের উচিত, বিশেষ যখন তোমরা সকলের সেবা করবার জন্য এখানে এসেছ। তোমার বাপ যদি টাকা না রেখে যেতেন, তা হলে তোমাকে টাকা রোজগার করে মার সেবা করতে বলতুম। ঠাকুরের ইচ্ছায় তিনি তোমার কোন উৎপাত রাখেন নি। কেবল মেয়েমানুষের হাতে থেকে টাকাগুলো নষ্ট না হয়ে যায় এর একটা বন্দোবস্ত করা ও দেখা শুনা করলেই হয়ে যাবে। এটা কি কম সুবিধা ? টাকা রোজগার মানুষ সৎভাবে করতে পারে না—মন বড় মলিন করে দেয়। এজন্য তোমায় বলছি, টাকা কড়ির ব্যাপার যত শীঘ্র সম্ভব সেরে ফেলো। বেশী দিন ওসব নিয়ে থাকলেই ওতে

একটা টান পড়বে, টাকা এমনি জিনিষ। মনে কচ্ছ ওতে আমার টান নাই, যখন একবার ছাড়তে পেরেছি, তখন আর টান হবে না, যখন ইচ্ছা চলে আসব। না, এ কথা কখনো মনে ভেবো না। কোন্ ফাঁক দিয়ে তোমার গলা টিপে ধরবে, তোমায় বুঝতে দেবে না। বিশেষ, তোমরা কল্কাতার ছেলে, টাকা নিয়ে খেলা করতে তোমরা জান। যত শীঘ্র পার মার বন্দোবস্ত করে কল্কাতা থেকে পালিয়ে যাও। আর মাকে যদি কোন তীর্থস্থানে নিয়ে যেতে পার, দুজনে বেশ ভগবানকে ডাকবে, মা ব্যাটা সম্পর্ক ভুলে। এই শোকের সময় মার মনে খুব কষ্ট, এটি হলে বেশ হয়। তোমার মারও ত বয়স হয়েছে। তাঁকে খুব বোঝাবে। এই সব কথা মার সঙ্গে কইবে।

মার পথের সঞ্চয় করবার সাহায্য করতে পার তবেই ত ঠিক ঠিক ছেলের কাজ করলে। তাঁর বুকের রক্ত খেয়ে যে এত বড় হয়েছ, কত কষ্ট করে তোমায় মানুষ করেছেন, তাঁর সেবা করা তোমার সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম জানবে; তবে তিনি যদি ভগবানের পথে যেতে বাধা দেন তখন অন্য কথা। তোমার মাকে একবার এখানে নিয়ে এস না, দেখব কেমন। যদি ভাল বুঝি, দু একটা কথা বলে দেবো। কিন্তু সাবধান, মার সেবা কচ্ছি ভেবে বিষয় নিয়ে মেতোনা, একটা বিধবার খাওয়া পরা বইত না, কত টাকাই বা চাই? কিছু লোকসান দিয়েও যদি তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত হয়, তার চেষ্টা করবে। ঠাকুর ত টাকা ছুঁতেই পারতেন না। তোমরা তাঁর নামে বেরিয়েছ, সব সময় তাঁর কথা মনে ভাববে। জগতে যত অনর্থের মূল টাকা। তোমাদের কাঁচা বয়স, হাতে টাকা থাকলেই মন লোভ দেখাবে, সাবধান!

আমি—আমার মনে হয়েছিল আমার মাকে একদিন আপনার কাছে আনব। কিন্তু আপনার শরীর দেখে আর আনবার ইচ্ছা হচ্ছে না।

মা—না, না, একদিন নিয়ে এসো। কত লোক ত আসছে।

আর, শরীর ত দিন দিন খারাপ হবেই। শীঘ্র শীঘ্র নিয়ে এস। সকাল বেলাটায় শরীর মন্দ থাকে না। সকাল বেলা আনতে পারবে না? বেশী বেলা কোরো না, দেরী হলে এরা হয়ত আসতে দেবে না।

আমি—মা, আপনার কথা শুনে বড় কষ্ট হচ্ছে। বারবার নিজের শরীর সম্বন্ধে যে সব কথা বলছেন, তাতে মনে হয়, শরীর রাখবার আর আপনার ইচ্ছা নাই।

মা—এ শরীর থাকা, না থাকা আমার হাত নয়—তাঁর ইচ্ছা। তোমরা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এই আমার কাছে তোমরা কত সময়ই বা থাক? কখন মঠে, কখন বা বাইরে থাক। আমার সঙ্গে কথাবার্তা কইবার বা কাছে থাকবার কয়জনের সুবিধা হয়? তোমরা ত কখন্ কোথায় থাক খবর পর্য্যন্ত দাও না।

আমি—আমাদের থাকবার সুবিধা হয় না বটে, কিন্তু আমাদের মনের বিশ্বাস আছে আপনি আছেন, মনে যখন কোন দুর্ব্বলতা আসবে আপনার কাছে আসলেই তা দূর হয়ে যাবে।

মা—তোমরা কি মনে কর, যদি ঠাকুর এ শরীরটা না রাখেন, তা হলেও যাদের ভার নিয়েছি, তাদের একজনও বাকি থাকতে আমার ছুটি আছে? তাদের সঙ্গে থাকতে হবে। তাদের ভাল মন্দের ভার যে নিতে হয়েছে। মন্ত্র দেওয়া কি চারটিখানি কথা। কত বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতে হয়। তাদের জন্য কত চিন্তা করতে হয়। এই দেখনা, তোমার বাপ মারা গেলেন, আমারও মনটা খারাপ হল। মনে হল ছেলেটাকে ঠাকুর কি আবার এক পরীক্ষায় ফেললেন। কিসে ঠেলে ঠুলে বেঁচে উঠবে এই চিন্তা। সেইজন্যই ত এত কথা বল্লুম। তোমরা কি সব বুঝতে পার? যদি তোমরা সব বুঝতে পারতে, আমার চিন্তার ভার অনেক কমে যেত। ঠাকুর নানান ভাবে নানা জনকে খেলাচ্ছেন—টাল সামলাতে হয় আমাকে। যাদের নিজের বলে নিয়েছি, তাদের ত আর ফেলতে পারি না।

আমি—মা, আপনার অবর্ত্তমানে কার কাছে যাব, কি হবে, ভাবতে গেলে বড় ভয় হয়।

মা—কেন, এই রাখাল টাখাল এই সব ছেলেরা রয়েছে, এরা কি কম? তুমি ত রাখালকেও খুব ভালবাস। তার কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবে। কি আর জিজ্ঞাসাই বা করবে? বেশী জিজ্ঞাসা করা ভাল নয়। একটা জিনিষ হজম করতে পারে না, আবার দশটা জিনিষ মনের মধ্যে পুরে এটা না ওটা কেবল এই চিন্তা। যে জিনিষ পেয়েছ, তাইতে ডুবে যাও। জপ ধ্যান করবে, সৎসঙ্গে থাকবে। অহঙ্কারকে কিছুতেই মাথা তুলতে দেবেনা। দেখছ না রাখালের কেমন বালক ভাব, এখনও যেন ছোট ছেলেটি। শরৎকে দেখ না, কত কাজ করে, কত হাঙ্গাম পোহায়—মুখটি বুজে থাকে। ও সাধু মানুষ, ওর এত সব কেন? ওরা ইচ্ছা করলে দিন রাত ভগবানে মন লাগিয়ে বসে থাকতে পারে। কেবল তোমাদের মঙ্গলের জন্য এদের নেমে থাকা। এদের চরিত্র চোখের সামনে ধরে রাখবে। এদের সেবা করবে। আর সর্ব্বদা মনে ভাববে আমি কার সন্তান? কার আশ্রিত? যখনি মনে কোন কুভাব আসবে, মনকে বলবে, তাঁর ছেলে হয়ে আমি কি এ কাজ করতে পারি? দেখবে, মনে বল পাবে, শান্তি পাবে।

শ্রী—

(১০)

শ্রীশ্রীমা আমাকে দীক্ষা দানের পর বলেছিলেন, "দেখ মা, আমি যাকে তাকে মন্ত্র দিই না, তবে তুমি ভাল, তাই দিলুম। দেখো, যেন আমায় ডুবিয়ো না। শিষ্যের পাপে গুরুকে ভুগতে হয়। সব সময় ঘড়ীর কাঁটার মত ইষ্ট-মন্ত্র জপ করবে।"

আর একবার শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় বলেছিলেন, "কারু সঙ্গে মিশবে না, কারু জামাই, বেয়াই, কুটুম আসুক, তার কোন কিছুতেই থাকবে না। 'আপনাতে আপনি থেকো যেয়ো না মন কারো ঘরে।' ঠাকুর নারকেলের নাড়ু ভালবাসতেন, দেশে গিয়ে তাই করে তাঁকে ভোগ দেবে, আর তাঁর সেবা, জপ ধ্যান বাড়াবে, ঠাকুরের বই সব পড়বে।"

একদিন মা ও আমি ছিলাম, আর কেউ ছিল না, বল্লেন, "দেখ মা,

পুরুষ জাতকে কখনও বিশ্বাস কোরো না—অন্য, পরের কথা কি, নিজের বাপকেও নয়, ভাইকেও নয়, এমন কি স্বয়ং ভগবান যদি পুরুষরূপ ধারণ করে তোমার সামনে আসেন, তাঁকেও বিশ্বাস কোরো না।"

মঠে বা যে সব স্থানে সাধু সন্ন্যাসীরা থাকেন সে সব জায়গায় বেশী যেতে বারণ কর্ত্তেন। বলতেন, "দেখ মা, তোমরা ত ভাল মনে, ভক্তি করেই যাবে কিন্তু তাতে তাদের মনে ক্ষতি হলে সেই সঙ্গে তোমারও পাপ হবে।"

যখন তখন যার তার সঙ্গে তীর্থে যেতে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, "তোমার হাতে দুপয়সা হয়, দশ বিশজন বামুন খাইয়ে দিও।" জনৈকা সামনে বসেছিলেন তাঁকে দেখিয়ে বল্লেন, "এই দেখ একজন, তীর্থ করতে গিয়ে কেমন ঠোক্কর খেয়ে এসেছে। 'তীর্থ গমন, দুঃখ ভ্রমণ, মন উচাটন হয়ো নাবে'। 'ভ্রমিয়ে বারো, ঘরে বসে তের, যদি করতে পার'।"

একদিন স্ত্রীভক্তেরা অপর একজনের নামে পাঁচ জনে পাঁচ রকম সমালোচনা কচ্ছিলেন সেই সময় মা আমায় বল্লেন, "তুমি তাকে ভক্তি করবে। সেই-ই তোমায় প্রথম এখানে এনেছিল।"

পরের একটি ছেলে নিয়ে মানুষ কর্ত্তে চেয়েছিলাম। তার উত্তরে রাধুর জন্য নিজের অবস্থা দেখিয়ে বলেছিলেন, "অমন কাজও কোরো না। যার উপর যেমন কর্ত্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসোনা। ভালবাসলে অনেক দুঃখ পেতে হয়।"

শ্রীশ্রীমার নিকট আমার মন্ত্র গ্রহণের কথা শুনে আমাদের বাড়ীর গুরু আমায় শাপ দিয়েছিলেন, মাকে সে কথা লিখেছিলাম। মা চিঠিতে উত্তর জানাইলেন, "যে ঠাকুরের শরণাগত হয়, তার ব্রহ্মশাপেও কিছু হয় না। তোমার কোন ভয় নাই।"

জনৈকা প্রাচীনা স্ত্রীভক্ত একদিন আমায় বলেছিলেন, "মঠে ফটে আর এখন কিছু নেই"—তাই আমি মাকে যেয়ে বলেছিলাম। মা শুনে চমকে উঠে বল্লেন, "যদি এখনও ধর্ম্ম কিছু থাকে, ত সে এখানে, আর মঠে।"

একদিন জনৈকা স্ত্রী ভক্তের কথা আলোচনা করতে করতে আমি ও নলিনী দিদি মাকে বল্লুম, "কিন্তু তার উপর ত আমাদের কোন অভক্তি আসছে না।" মা বল্লেন, "সে যে ঠাকুরকে ডাকে। যে ঠাকুরকে ডাকে, সে যেমনই হোক, তার উপর অভক্তি হয় না।"

শ্রীমতী—

অদ্বৈতবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আত্মা, অহং ও জগৎ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখান হয়েচে অধ্যাস মিথ্যা। কিন্তু এই মিথ্যা জিনিষ দুভাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি, অসম্ভব বা অপহ্নব (absurd) এবং অনির্ব্বচনীয় (inconceivable)। কতকগুলো জিনিষ হতেই পারে না, যেমন আকাশ-কুসুম (absurd) অসম্ভব। আবার কতকগুলো জিনিষ মস্তিষ্ক ধারণা করতে পারে না বলে মিথ্যা বলে মনে হয়। টালিসম্যানের কাছ থেকে সারাসিন যখন কঠিন জলের (বরফ) কথা শুনেছিল সে বিশ্বাস করতে না পেরে উড়িয়ে দিলে (inconceivable)। আমরা পরে প্রমাণ করব মায়াটা অসম্ভব নয় তবে অচিন্তনীয় বটে।

এখন, তোমরা যে অহংকে আত্মা বলেছিলে তাতে আমাদের আপত্তি আছে। তোমরা অহং বলতে যা বুঝ আমরা আত্মা বলতে তা বুঝি না। আমাদের আত্মা কোন দেশে কালে বদ্ধ নয়, উহা অবিনাশী ও আনন্দস্বরূপ। উহার একমাত্র স্বভাব জ্ঞান বা চৈতন্য। এই আত্মতত্ত্বের অতিরিক্ত জগৎ বলে কোনও কিছু নেই। এই জন্যে আত্মাকে আমরা সৎ এবং চিৎ (Existence &Knowledge) বলে থাকি। এই আত্মাই হচ্ছেন যথার্থ জ্ঞান-স্বরূপ, আর সব আপেক্ষিক জ্ঞান। অহংও প্রত্যয়-গোচর বা জ্ঞান-গোচর হওয়া চাই। অহংএর জ্ঞান এবং নাহংএর ধারণা করতে গেলে জ্ঞানকে উভয় স্থলেই মানতে হয়। (The ego and the non-ego, thought and being, are both derived from higher principle which is neither one nor the other -- Schelling) সাদা যদি কুন্দ ফুল ছাড়া অন্যত্র না দেখা যেত তাহলে বলতে পারতে কুন্দ আর শ্বেত একই জিনিষ। কিন্তু

দর্শনও যখন সাদা দেখা যাচ্চে তখন বলতে হবে কুন্দ আর দশন থেকে সাদা বলে আর একটা বিশেষ জিনিষ আছে সেটা পদার্থের গুণরূপে দেখা দেয়। 'আমি আমাকে জানি' এবং 'আমি তাকে জানি', এখানে একবার জ্ঞানের বিষয় হল 'আমি' আর একবার জ্ঞানের বিষয় হল সে। জ্ঞানটা যেন জল যখন যে আধারে যাচ্চে, তখনই সেই আধারের আকার নিচ্চে। জ্ঞান যখন যে বিষয় নিচ্চে তখনই তদাকার প্রাপ্ত হচ্চে। যে বিষয়ের জ্ঞান নেই সে বিষয়ও নেই। জগতের জ্ঞান আছে বলে জগৎ আছে। জ্ঞান দেশ এবং কালের মধ্য দিয়ে বিচিত্র জগৎ রচনা করেছে। (Reason which prescribes its laws to the sensible universe it is reason which makes the cosmos —Kant)। আকাশের যেমন রূপ নেই তবুও যেমন আমরা বলি ঘটাকাশ, মঠাকাশ, সেইরূপ দেশ, কাল, নিমিত্ত রূপ উপাধি দিয়ে জ্ঞান নিজেই নিজেতে আমি-তুমি, দেব অসুর, স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য, শত্রু মিত্র, স্বামী স্ত্রীর রচনা করছে।

এই আত্মার প্রথম উপাধি হচ্চে 'আমি'। এই 'অহং' রূপ উপাধিকে অবলম্বন করে এ জগৎ রয়েছে। আমি না থাকলে জগৎ নেই। (The objects do not exist apart from the subjects perceiving them —Berkeley) কেউ কেউ বলে থাকেন 'আমি' না থাকলে জগৎ থাকবে না তার মানে কি? আমি মরে গেলে কি জগৎ থাকবে না?—থাকবে, কোনও না কোনও অহংএর কাছে। সমুদ্রের তলদেশ সেখানে কোনও অহং নেই—তাই বলে কি সমুদ্রের তলদেশ নেই?—আছে, কারণ আমি ও তুমি, অনুমান করছি বলে আমাদের কাছে আছে। সেখানে যদি কোনও অহং থাকে তা হলে তার কাছে আছে। আর যদি জানবার কেউ না থাকে যদি কর্ত্তার অভাব হয় তাহলে কর্ম্মেরও অভাব হবে, বুঝতে হবে সমুদ্রের তলদেশ নেই। বৈজ্ঞানিক কত নূতন জিনিষ আবিষ্কার করছে এর পূর্ব্বে কেহ সে সব জানত না, তাই বলে কি সে সব ছিল না?

—ছিল, কিন্তু মানুষ সেগুলোকে আর এক ভাবে দেখত বলে ছিল, তুমি যেগুলো নতুন discovery বলছ সেগুলো ছিল মানুষের মনের এক রঙে রঙিয়ে, এখন সে জিনিষটাকে মানুষ আর এক রঙে রঙিয়ে নিলে মাত্র। ভবিষ্যতে মানুষের বর্ত্তমানের রঙের নেশা কেটে যাবে তখন দেখবে আর এক রকমে, আধার-শক্তি মাধ্যাকর্ষণ মহাকর্ষণে (Law of Gravitation) নাম বদলাবে আবার মাধ্যাকর্ষণ মহাকর্ষণও নাম বদলিয়ে বিদ্যুতিনের (Election) শক্তিতে পরিণত হতে চলেছে। কিন্তু যথার্থ জগৎ তা চিরকালই অজ্ঞাত রয়েছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি পাঁচটা গুণ দিয়ে আমরা জগৎটাকে জানছি। সেই গুণগুলো বাদ দিয়ে গুণীকে জানতে চাও বুঝতে পারবে না। অতএব জগৎ হল গুণাত্মক এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, গুণাত্মক এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎকে জানতে হলে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং অহং এ সবেরই দরকার। অন্তঃকরণের মধ্যে যে জগৎ সেই জগৎই আমরা জানি, বাহ্য যথার্থ জগৎ যে কি তা আমরা কিছুই জানি না, অথচ বলছি অহং-আত্মক জগৎকে বাদ দিয়ে এই তথাকথিত প্রত্যক্ষ আনুমানিক জগৎ থাকতে পারে। অহং ও জগতের মধ্যে যেমন একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রয়েছে তেমনি একটা অচল ব্যবধানও রয়েছে। অহংএর প্রতিযোগী (Nagative) জ্ঞান হচ্ছে নাহং না জগৎ। জগৎটাও যেমন জ্ঞানের বিষয়, অহংটাও তেমনি জ্ঞানের বিষয়। যখনই বলছি এই আমি, তখনই ওটা জ্ঞানের বিষয় হয়ে পড়ছে। আর বিম্বে ও প্রতিবিম্বে যে তফাৎ আত্মা ও অহংএ সেই তফাৎ। অহংরূপ যে লৌকিক অনুভব তার দ্বারা আত্মতত্ত্ব কিঞ্চিৎ প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু তা প্রাদেশিক বা পরিচ্ছিন্ন (The ego points itself, a non-ego is opposed to the ego, the ego and the non-ego reciprocally limit each other — Fichte*)। তাই কখন সে কাঁদে হাসে। কখনও বলছে তুমি আমার সর্ব্বস্ব, কখন বলছে দূর দূর। এই অবিশুদ্ধ অহং কখনও নির্ম্মল আকাশের মত নিরঞ্জন সত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ হতে পারে না। আর এই আত্মাকে কেউ যুক্তি তর্কের দ্বারা জানতে পারে না। এর একমাত্র প্রমাণ বোধে

বোধ যে করে ; এই উপলব্ধি যাঁরা করেছেন তাঁদের উপদেশ শ্রুতিতে আছে ; ঐ স্বতঃসিদ্ধ উপদেশ অবলম্বন করে যুক্তি করলে আত্মা সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। আমি দুঃখী, আমি সুখী, বলে যে অনন্ত অহং-এর ধারা বয়ে যে একটা নিত্য-আমির ঝরণা তৈরী করছে, তিনি আত্মা নন, যে জ্ঞানকে অবলম্বন করে প্রতি-অহং ও তাহার বিষয় জানা যাচ্ছে, সুষুপ্তিতে অহং না থাকিলেও যিনি থাকেন তিনিই আত্মা।

যখন বলছি আমার অহং আর সকলের অহং থেকে পৃথক, তখনই অহংকে আমরা পরিচ্ছিন্ন করে ফেলছি। পরিচ্ছিন্ন মানে যার সীমা আছে। একটা থেকে আর একটাকে পৃথক করতে গেলেই তাদের সীমা নির্দেশ করতে হবে। প্রতি জীবের অহং যখন বিভিন্ন তখন তাদের সীমা আছে। এক্ষণে এই অহং সর্ব্বব্যাপী (বিভু), না দেহ পরিমাণ, না অণুপরিমাণ—দেহের কোনও অংশে বর্ত্তমান ?—অহং যখন বহু তখন বিভু তাকে বলতে পার না। আর যদি বল দেহ পরিমাণ, তা হলে দেহের সঙ্গে তার নাশের কল্পনা করতে হয়। দেহ নাশশীল।—কেন ?—সাবয়ব বা সান্ত বলে। যা সাবয়ব তার নাশ বা পরিবর্ত্তন আছে। কিন্তু তোমাদের অহং অপরিবর্ত্তনীয়। এ তোমরা প্রতিজ্ঞা (স্বীকার) করে নিয়েছ।

আত্মা দেহ ব্যাপী হতে পারেন না তার আর একটা কারণ, আমাদের যখন বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয় তখন একটা বিষয়েরই জ্ঞান হয়। দেহ-ব্যাপী চৈতন্য থাকলে দেহের সঙ্গে যত রকম বিষয়ের সংস্পর্শ হত এক সঙ্গে সবগুলিরই জ্ঞান হত। আত্মাকে দেহ পরিমাণ বলা আর ওটাকে দেহের ধর্ম্ম বলা একই কথা। যদি আত্মা বা চৈতন্যকে দেহের ধর্ম্ম বলা যায়, তা হলে দুটি প্রশ্ন ওঠে। (১) সমষ্টি দেহ যোগে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়, (২) না প্রত্যেক অবয়বেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়। সমষ্টি-দেহ-যোগে চৈতন্য উৎপত্তি হলে দেহের এক অংশের হানি হলে আর অহংএর উৎপত্তি হতে পারে না, যেমন অন্ধের। আর যদি প্রতি অবয়বে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তা হলে প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ বিষয়ের জ্ঞানোৎপত্তি হত। কিন্তু দুটোর একটাও সম্ভব নয়।

যদি বল অহং অণুপরিমাণ [Monads are metaphysical points or points of substance. They cannot be identified with anything. It eternally remains what it is (Principium distinctions)—Leibniz.] তাহলে, 'আমি কৃশ', 'আমি দীর্ঘ' প্রভৃতি যে লোক-সিদ্ধ অহং প্রত্যয় অসঙ্গত বলতে হয়। এই লোক-সিদ্ধ প্রত্যয়কে তোমরা উড়িয়ে দিতে পার না কারণ আত্মার বহুত্ব সম্বন্ধে তোমাদের যুক্তি প্রত্যক্ষ অনুভব সিদ্ধের ওপর। তার পর দেখ অণু বললে দেহের ধর্ম্ম আর তাতে আরোপ করতে পাববে না। সেইজন্য বলতে হবে আত্মা বা অহং নির্গুণ, সেই জন্য পুণ্যাদি গুণের দ্বাবা তার স্বর্গাদি প্রাপ্তি অসম্ভব। কিন্তু এ তোমরা বলতে পার না কারণ তোমাদের প্রতিজ্ঞা 'অহং সুখীত্ব দুঃখীত্বাদি গুণেব দ্বারা অবিশুদ্ধ'। আবার দেখ, অহং বা আত্মা অণু হলেও যখন বহু তখন সাবয়ব, কাজেকাজেই পবিবর্ত্তনশীল।

অতএব আত্মার বিভুত্ব স্বীকাব করতে হবে। আর সেই নিরবচ্ছিন্ন আত্মার বহু উপাধি হচ্চে অহং, নাহং, অস্মৎ, যুস্মৎ। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ তাঁকে অবলম্বন করেই অহং নাহং জ্ঞান। সূর্য্যের নিত্যত্বে যেমন প্রতিবিম্বের নিত্যত্ব, সেইরূপ পরমাত্মার নিত্যত্বে অহমাত্মার নিত্যত্ব।

২। প্রমাণ

(ক) চার্ব্বাকেরা বলে থাকেন প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু প্রত্যক্ষ একমাত্র প্রমাণ হতে পারে না, শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলতে পারা যায়। দিনমানে আকাশে তারা দেখা যায় না বলে কি দিনে আকাশে তারা থাকে না? অনুমান নইলে আমরা এক পাও চলতে পারি না। তবে অনুমান প্রত্যক্ষমূলক। দশটা জিনিষ দেখে তবে আমরা অনুমান করে থাকি। সাধু মরেছে, অসাধু মরেছে, রাজা মরেছে, প্রজা মরেছে সেইজন্য আমরা অনুমান করে থাকি সকলকেই মরতে হবে। যে জিনিষ আমরা কখনও দেখিনি সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও অনুমানও চলে না। কিন্তু প্রত্যক্ষ করতে হলে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে করতে হয়।

এবং ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করবার কতকগুলি বাধা আছে। নিম্নে সেগুলো দেওয়া গেল—

[অতি দূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোনবস্থানাৎ। সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥ সাংখ্যকারিকা ৭॥]

(১) অতি দূর—বিষয় যদি অতি দূরে থাকে তা হলে প্রত্যক্ষ হয় না। উড়ো-জাহাজ আকাশে ভেসে যাচ্চে, প্রথমে তাকে শব্দ দিয়ে ও চক্ষু দিয়ে জানছি। তারপর যত দূরে যেতে লাগল শব্দ ক্ষীণ হয়ে মিশিয়ে গেল, কেবল চখে একটা চিলের মত দেখা যেতে লাগল, তার পর চোখও আর দেখতে পেলে না, অতি দূর বলে।

(২) অতি নিকট—বিষয় যদি অতি নিকটে থাকে। একখানা চিঠি পড়তে হবে খুব চোখের কাছে নিয়ে এলে অক্ষর আর পড়তে পারা যাবে না। অক্ষরের জ্ঞান আর কোনও রকমে হবার যো নেই।

(৩) ইন্দ্রিয়বৈগুণ্য—ইন্দ্রিয়ের গঠনে যদি দোষ থাকে তা হলেও বিষয় অনুভব হয় না। অন্ধ, কালা ইত্যাদি।

(৪) মনের অস্থিরতা—মন চঞ্চল হয়ে রয়েচে আর একজনকে দেখবার জন্য—ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মোপদেশ হচ্চে তার একটি কথাও কানে ঢুকলো না।

(৫) সূক্ষ্মতা—গায়ে কত বালি লেগে রয়েছে কিন্তু স্পর্শ তা ধরতে পারছে না। বিছানার চাদরে কত ধূলিকণা ছড়ান রয়েছে, ঝুবার ঝেড়ে দেখলুম বেশ ধবধবে পরিষ্কার।

(৬) ব্যবধান—মেঘের অবগুণ্ঠন (ব্যবধান) না সরে গেলে চাঁদ দেখা যায় না।

(৭) অভিভব—সূর্য্যের তেজে নক্ষত্র দেখা যাচ্চে না।

(৮) সমানাভিহার—দুটো জিনিষ এমন মিশিয়ে থাকে যে একটাকে আর একটা থেকে পৃথক করে ধরা যায় না। যেমন কতটা খাদ আর কতটা সোনা চোখে ধরা যায় না।

(খ) প্রত্যক্ষের এই সকল দোষ থাকা সত্ত্বেও, প্রত্যক্ষ ছাড়া অনুমান [illegible] পারে না। যখন আমরা অনুমান করি তখন যে বিষয় সম্বন্ধে আমরা

অনুমান করি, সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান থাকা দরকার (সামান্যরূপে জ্ঞান এবং বিশেষরূপে অজ্ঞান) আর সেই সন্দেহপূর্ণ অল্প জ্ঞানকে সম্পূর্ণ করবার জন্যই অনুমান। প্রথমে যে অল্প জ্ঞান থাকে সেটা প্রত্যক্ষ-মূলক। ন্যায়ের (Syllogism) পঞ্চ অবয়ব (Premise)

১। পাহাড়ে আগুণ আছে—প্রতিজ্ঞা

২। ধূম আছে বলিয়া—হেতু (Cause)

৩। উনন প্রভৃতি যায়গায়, যেখানেই ধূম দেখা যায়, সেখানেই বহ্নি দেখা যায়। — উদাহরণ (প্রত্যক্ষ মূলক) (Observation) (Major Premise)

৪। পাহাড়ে ধূম দেখা যাইতেছে — উপনয় (Minor Premise)

৫। পাহাড়ে ধূম আছে—নিগমন (Conclusion)

[ন্যায়—প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনাত্মক পঞ্চাবয়ব বাক্যম্। ইতি চিন্তামণিঃ।]

[পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ, যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্, যথা মহানসং, বহ্নিব্যাপ্য ধূমবাংশ্চায়ং, তস্মাদ্বহ্নিমান্। ইতি জগদীশঃ]—প্রাচীন ন্যায়।

এখানে হেতু (Middle Term) হল ধূম, সাধ্য (Major Term) হল বহ্নি, আর পক্ষ (Minor Term) হল পর্ব্বত। এখন যেখানেই ধূম আছে সেইখানেই বহ্নি আছে এই ব্যাপ্তি জ্ঞান বা সাহচর্য্য নিয়ম বা অবিনা ভাব পেতে হলে প্রত্যক্ষ ছাড়া হয় না। দশটা জায়গায় দেখতে হবে যে যেখানেই ধূম আছে সেখানেই বহ্নি আছে। তখন আমাদের ধূম আর বহ্নির সাহচর্য্য জ্ঞান (Co-existence) হয়। আর এই সাহচর্য্য বা ব্যপ্তি-জ্ঞান ছাড়া অনুমান হতে পারে না।

[অনুমিতি—ব্যাপ্তি-বিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান-জন্যজ্ঞানম্। যথা ধূম দর্শনাদ্বহ্নিমান্ পর্ব্বত ইত্যাকার জ্ঞানম্। অস্যা ব্যাপার কারণং পরামর্শঃ। অস্যা করণং ব্যাপ্তিজ্ঞানম্। ইতি ভাষাপরিচ্ছেদ]—নব্যন্যায়।

প্রমাণ জিনিষটা গৌতম ন্যায়েতে যেমন বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে এমন আর জগতের কোনও দর্শন শাস্ত্রে হয় নি। এ্যারিষ্টটলের লজিক (Aristotle Logic)টা একেবারে গৌতম ন্যায়ের নকল (copy)। এ্যারিষ্টটল যেমন তাঁর লজিকে আদি গৌতম ন্যয়ের অনুমানের পাঁচটা অবয়ব (Premise) থেকে মাত্র তিনটে অবয়ব নিয়েছেন, আমাদের দেশের নব্য নৈয়ায়িকেরাও অনুমানের মাত্র তিনটি অবয়ব রেখেছেন। তার কারণ বৈশেষিক (Physicist) কণাদ প্রথম অনুমানের পঞ্চ অবয়ব আবিষ্কার করেন, এবং যা গৌতম তাঁর ন্যায়ে গ্রহণ করেছেন এবং যা আধুনিক লজিকে Scientific method (Induction + Deduction) বলে পরিচিত। তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে জগৎ রহস্যের নির্ণয় করতে গিয়ে ঐ পাঁচ অবয়বের উপকারিতা বুঝতে পেরেছিলেন। বৈজ্ঞানিক নৈলে যুক্তির মধ্যে উদাহরণ (Observation) এবং উপনয়ের (Demonstration) উপকারিতা বুঝতে পারবে না।

[গৌতম ন্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ১ম ও ৭ম সূত্র এইরূপ—প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্ত-অবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। এষাং লক্ষণানি যথা—প্রত্যক্ষ-অনুমান-উপমান শব্দাঃ প্রমাণানি। ১। প্রতিজ্ঞা-হেতু-উদাহরণ-উপনয়-নিগমনানি-অবয়বাঃ ৭।

এতে দেখতে পাওয়া যাচ্চে গৌতম চারটি প্রমাণ মেনেছেন, (১) প্রত্যক্ষ (Perception) (২) অনুমান (Reasoning) (৩) উপমান বা সাদৃশ্যজন্যজ্ঞান (Analogy) এবং শব্দ (Authority)। আর ন্যায়ের (Syllogism) অবয়বও (Premise) পাঁচটি ধরেছেন—(১) প্রতিজ্ঞা (Hypothesis) (২) হেতু (Cause), (৩) উদাহরণ (Observation) (৪) উপনয় (Demonstration) (৫) নিগমন (Conclusion)।

কিন্তু সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ উপমান বাদ দিয়ে কেবল তিনটে প্রমাণ মেনেছেন—দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয় সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি ॥৪॥ দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্ত বাক্য এই তিন প্রমাণ হচ্চে সাংখ্যের অভিমত। যিনি অজ্ঞ যত রকমেরই

প্রমাণের আবিষ্কার করুন না কেন সবই এই তিন প্রমাণের মধ্যে পড়ে যাবে। যা কিছু প্রমেয় এই তিন প্রমাণে সিদ্ধ হতে পারে।

এঁরা বলেন অনুমান তিন রকমের—

১। পূর্ব্ববৎ—কারণ দেখে কার্য্যের নির্ণয়।

বীজ দেখে বৃক্ষের অনুমান। (বীত বা অন্বয়)

২। শেষবৎ—কার্য্য দেখে কারণের নির্ণয়।

ঘট দেখে কুম্ভকারের অনুমান। (অবীত বা ব্যতিরেক)

৩। সামান্যতোদৃষ্ট—একটা বিশেষ জিনিষ দেখে সেই জাতির সমস্ত জিনিষের জ্ঞান সম্বন্ধে অনুমান। (বীত বা অন্বয়)

একটা ঘট দেখে, সব ঘটের (ঘট জাতির) জ্ঞান সম্বন্ধে অনুমান।

দু চারটে মানুষকে মরতে দেখে সব মানুষজাতির মৃত্যু অনুমান করা।

কিন্তু স্বর্গাদি অলৌকিক বিষয় আপ্ত প্রমাণ ছাড়া আর উপায় নেই, এ এঁরা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু যুক্তি বিরোধী হলে শাস্ত্র বাক্যও শোধন করে নিতে হবে এ কথাও আবার বলে থাকেন।

৩। বেদ

কিন্তু যত রকমেরই প্রমাণ প্রযোগ হোক না কেন, অলৌকিক বিষয়ে বেদই স্বতঃপ্রমাণ। বাক্য মনের অতীত সত্তাকে ও স্বর্গাদি লোককে জানতে গেলে শ্রুতিকে মানা ছাড়া এবং তার অনুকূল যুক্তি ছাড়া উপায় নেই। তারপর শ্রুতি যে সাধনের (Experiment) উপদেশ করেছেন ঠিক সেই সেই রাস্তা দিয়ে গেলে সত্যের উপলব্ধি হবে। প্রত্যক্ষমূলক তর্ক করতে গেলে ভুল হবে। প্রত্যক্ষ জিনিষটা আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবদ্ধ। আবার সেই প্রত্যক্ষের আবার কত রকমের দোষ হতে পারে তাও আমরা দেখিয়েছি। প্রত্যক্ষমূলক অনুমান করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্চি, এক এক জন দার্শনিক এক এক নূতন সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌছেন; এখন কার অনুমিতি ঠিক?

পরন্তু বেদের সিদ্ধান্ত এক ব্রহ্ম বস্তুতেই পরিসমাপ্ত। সকল সমাধিবান ব্যক্তি সেখান থেকে ফিরে এসে সেই অদ্বয় সত্যেরই সন্ধান দিয়েছেন। পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতে যুক্তি তর্ক দিয়ে কতকটা সত্য নির্ণয় করতে পার কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে শ্রুতির উপদেশ ও সাধন ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পাবে? তবে বৈদান্তিকবা যে যুক্তি কবে থাকেন, সে হল নিজের মত দৃঢ় করবার জন্য শ্রুতির অনুকূল যুক্তি। সে যুক্তির অভিপ্রায়, বেদের সত্যকে মানলে জগতেব সকল সমস্যার সমাধান হয, কিন্তু এ ছাড়া আর যা কিছু মেনে জগতের তত্ত্ব সমাধান কবতে যাবে তাইতেই গোল বেধে যাবে আর পদে পদে স্ববিরোধ এসে উপস্থিত হবে—এইটে বোঝাবার জন্য। ব্যবহারিক বাজ্যে ন্যাযেব অবয়ব যত রকম ইচ্ছে বাড়িয়ে যাও ক্ষতি নেই, কিন্তু পারমার্থিক সত্তাকে বুঝতে গেলে অধ্যারোপ অপবাদ-ন্যায় দিয়ে বুঝতে হবে। অধ্যারোপ মানে এই জগৎটা ব্রহ্মের উপর দেশ-কাল-নিমিত্ত (time space causality) বা নাম-রূপ দিয়ে কল্পিত (illusion)। এই অধ্যারোপ ন্যায় দিয়ে জগৎ রহস্য বুঝা আর এর বিরোধী কথা যা কিছু তাতে অপবাদ দিয়ে তার ভুল দেখিয়ে দেওযা (Reductio ad absurdum)। এর উদাহরণ হচ্চে রজ্জুতে সর্প ভ্রম।

এখন তোমরা যে এই উদাহরণের ভুল ধরেছিলে, সেটা যে তোমাদেরই ভুল সেইটে এখন আমরা দেখিয়ে দেব। তোমাদের প্রথম ও মূল যুক্তি হচ্চে পূর্ব্বে সর্পজ্ঞান না থাকলে রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি হতে পারে না। আবার এই সর্পজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। ব্রহ্মেতে জগৎ ভ্রান্তি হবার পূর্ব্বে জগতের জ্ঞান থাকা চাই আর সে জ্ঞানও প্রত্যক্ষ মূলক হওয়া চাই তা হলেই জগতেব পূর্ব্ব অস্তিত্ব মানতে হয়। কিন্তু আমরা বলি, কোন বিষয়ের প্রমাণ বা নিশ্চয়জ্ঞান (ideation) হতে গেলেই যে (১) একটা বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ কবা চাই বা (২) একটা বাহ্য বস্তুকে প্রত্যক্ষ করলেই যে ঠিক সেই বাহ্য বস্তুরই প্রমা জ্ঞান হবে, বা (৩) অনুমান দ্বারা প্রত্যক্ষ শোধন করে নিয়ে প্রমা জ্ঞান হবে—তার কোনও মানে নেই। এ যুক্তির ভুল আমরা দেখাচ্চি।

১। তোমরা বলেছিলে কোন বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ ছাড়া কোনও সংস্কার হতে পারে না এবং সে সংস্কার স্মৃতিতেও উঠতে পারে না। সাপ দেখেছিলুম, তার সংস্কার ছিল, রজ্জুতে এখন সেই সংস্কারের স্মৃতি এসে আরোপিত হয়েছে। আমরা বলি এ সংস্কার অনাদি, রজ্জুকে উপলক্ষ করে বর্ত্তমানে স্মৃতি পথে এসে উপস্থিত হয়েছে। জ্ঞান জিনিষটা বাইরে থেকে এসে আমাদের ভেতরে ঢোকে না, ও ভেতরেই আছে, অজ্ঞাত বাহ্য বস্তুর সংঘাতে সে তার নাম-রূপ বদলাচ্চে মাত্র, বা বাহ্য বস্তুকে উপেক্ষা করেও নিজের মনে ইন্দ্রপুরী গড়চে। (The phenomenon is the product of reason, it does not exist outside of us, but in us, it does not exist beyond the limits of intuitive reason—Kant.) দেখ, তোমরা বলছিলে দেহের অতিরিক্ত আত্মা তোমরা বেশ বোঝ, দেহে ও আত্মাতে ভ্রম হবার কোনও হেতু নাই। যুক্তিতে বেশ বোঝা গেল বটে কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে রাম শ্যাম কি ঠিক চেতন আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক করে ভাবতে পারে? তুমিই যখন বল, 'আমি ঘরে এখন শুয়ে আছি, এখন আমি বাইরে যেতে পারব না'—তখন কি দেহের অতিরিক্ত চেতন আত্মার কথা তোমার মনে ছিল। বলতে পার ওটা আমরা গৌণ-প্রয়োগ করেছিলাম—'বীরসিংহ' মানে লোকটা যথার্থ সিংহ নয়, সিংহের মত বলবান—কিন্তু গৌণ প্রয়োগের কথা তোমার মনে থাকে কিন্তু আমার মনে থাকে না, আমি তখন দেহকেই আত্মা বলে বুঝি। মানুষে সিংহের গৌণ প্রয়োগ হতে পারে—সিংহের ন্যায় বলবান মানুষ, কিন্তু আত্মাতে দেহের গৌণ প্রয়োগ হতে পারে না। দেহের কোন্‌টার মত আত্মা হবে?—তখন বুঝতে হবে, 'আমি ঘরে শুয়ে রয়েছি' এ যখন বলছি, তখন আমার কাছে, দেহটাই আত্মা, এইরূপ প্রমা বা নিশ্চয়-জ্ঞান হয়েছে। এখন বল দেখি, দেহেতেই যখন আত্মার অধ্যারোপ করছি, তখন আত্মাকে কবে প্রত্যক্ষ করেছিলুম, এবং সেই প্রত্যক্ষ-জন্য চেতনের সংস্কার আজ দেহকে অবলম্বন করে স্মৃতি রূপে উদিত হয়েছে?

আমরা এটাকে নিয়ে ন্যায় শৃঙ্খলে সাজাচ্চি—

দেহ ও আত্মা পৃথক

কারণ, দেহ জড় এবং আত্মা চেতন

কিন্তু দেহেতে আমাদের আত্ম ভ্রম হচ্চে

যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম

কিন্তু রজ্জুতে সর্প ভ্রম হতে গেলে বাহ্য প্রত্যক্ষমূলক পূর্ব্ব সর্পজ্ঞান বা সংস্কার থাকা চাই

এখন দেহতে আত্মভ্রম হয়েছে

তখন আত্মাব পূর্ব্বজ্ঞান থাকা চাই

পূর্ব্বজ্ঞান বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ থেকে হয়

যেমন পূর্ব্বে সাপ দেখেছিলুম তাই এখন সাপের সংস্কার আছে

তা হলে আত্মাকে কবে প্রত্যক্ষ করেছিলুম যার সংস্কার আজ স্মৃতি পথে আরূঢ় হয়ে দেহের ওপর আত্মার অধ্যারোপ করেছে

আত্মা বাহ্য বস্তু নয়, আত্মা আছেন বলে বাহ্য বস্তু আছে

যা বাহ্য বস্তু নয় তা প্রত্যক্ষ হয় না

অতএব আত্মার পূর্ব্বজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নয়

অনুমানমূলকও নয় [চক্রক (circulus sive orbisin demonstrendo) দোষ হইবে]

কারণ, অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক

অতএব আত্মাব প্রমাজ্ঞান অনাদি সংস্কাব

তেমনি আবার দেশ (space), কাল (time), নিমিত্ত (causality) এ সকলের জ্ঞান কোথা থেকে এলো। প্রত্যক্ষ করতে গেলেও ঐ গুলোকে আগে ধরে নিয়ে (Pre-suppose) তবে বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হয়। (Space and time are original intuitions of reason prior to all experience—Kant) বেদান্তীরা দেশকেই আকাশ বলেছেন, আকাশের চেয়ে বড় জিনিসেব জ্ঞান মানুষের হতে পারে না। অনন্ত বলতে সাধারণ মানুষে আকাশকেই বোঝে। এই আকাশেব বা দেশের প্রতিযোগী (negative) জ্ঞানের তুলনা থেকে মানুষের সাবয়ব

(limited) সীমাবদ্ধ জিনিষের জ্ঞান হয়। এই দোয়াতটার জ্ঞান হতে গেলে দোয়াতের পারিপার্শ্বিক সমস্ত জ্ঞানকে 'না' করে দেওয়া চাই। দোয়াত কি? যা বিছানা নয়, মেজে নয়, বই নয়, কলম নয়, বাতাস নয়, এই রকম করে সমস্ত দোয়াত-ভিন্ন সমস্ত প্রতিযোগী দেশ (space) জ্ঞানকে নিরস্ত করে একটা বিশেষ গুণ (রূপ রসাদি) বিশিষ্ট এবং দৈর্ঘ্য (length), প্রস্থ (breadth), বেধ (Hight) রূপ সীমাবদ্ধ (limited space) = (L × B × H), যা পূর্ব্বে ক্ষার ও বালিরূপে অবস্থান কালে একপ্রকার দেশে অবস্থান করছিল, এখন এই রূপে বা দেশে অবস্থান করছে, ভেঙ্গে যাওয়ার পর আর এক রূপ নেবে বা বিভিন্ন দেশে ও কালে অবস্থান করবে (Time—past present, future)। একটা জিনিষের জ্ঞান হতে পারে না। বহু বস্তু থাকলে তাদের মধ্যে তুলনা করে তবে আমাদের জ্ঞান হয়। একটা বিশেষ বস্তুর জ্ঞান হতে গেলেই তার একটা বিশেষ দেশের, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধের জ্ঞান চাই, এই ভাবে সীমাবদ্ধ করতে গেলেই অপর জিনিষ মানতে হয় যা তাকে সীমাবদ্ধ করবে। যদি এক জিনিষ থাকে তাকে দেশে আছে বলা যায় না, কারণ তাকে দেশে আছে বলতে গেলেই সীমাবদ্ধ করবার জন্য দ্বিতীয় বস্তুর দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন বলছ এক জিনিষই আছে আর কিছু নেই তখন তাকে সীমাবদ্ধ করবার জন্য দ্বিতীয় জিনিষ কোথায় পাওয়া যাবে। আর যে জিনিষ সীমাবদ্ধ হল না তা অনন্ত সর্ব্বব্যাপী হয়ে পড়ল। ইনিই হলেন বেদান্তের অদ্বয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম (Neomenon) যখন অদ্বয় তখন তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁরই ওপর অনাদি সংস্কার দেশ, কাল নিমিত্ত জগৎ-প্রবাহ আঁকছে। এ জগৎটা কেবল কতকগুলো কাল্পনিক রেখা। প্রবাহ বা পরিবর্ত্তন মানে এই অনাদি দেশ-জ্ঞানের বিভিন্ন আকার পূর্ব্ব-পর-রূপ অনাদি কালের সংস্কার দিয়ে নিমিত্তের কাল্পনিক সম্বন্ধ জুড়ে দেখা। পরিবর্ত্তন (Change or Phenomenon) জ্ঞানই হতে পারে না যদি পূর্ব্বপর জ্ঞান না থাকে। আগে এই রকম ছিল, পরে এই রকম হয়েছে এই জ্ঞানের নামই পরিবর্ত্তন। (The modification of extention are motion and rest—Spinoza) কাজে

কাজেই পরিবর্ত্তন জ্ঞানের আগে কালের জ্ঞান থাকা চাই। দেশের জ্ঞানও কালকে অপেক্ষা করে। কোন দেশের জ্ঞান হতে গেলে যখন তার প্রতিযোগী জ্ঞানের সহিত তুলনা করতে হয়, তখন আগে পূর্ব্বাপর জ্ঞানের প্রয়োজন।

নিমিত্তও আমাদের একটা সংস্কার। এও প্রত্যক্ষমূলক নয়। ঘটনার পারম্পর্য্য দেখে আমাদের সুবিধা মত কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করি সূক্ষ্মের পর স্থূল ঘটে দেখে আমরা বলছি সূক্ষ্ম—কারণ, স্থূল—কার্য্য। (One event follows another, but that we can never observe any tie between them. They seem conjoined but never connected —Hume) স্থূল থেকেও ত সূক্ষ্ম হচ্ছে, তখন স্থূল—কারণ, সূক্ষ্ম—কার্য্য এওত বলা যেতে পারে। বীজের কারণ অঙ্কুর না অঙ্কুরের কারণ বীজ তা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নি। কারণ সৎ, কার্য্য অসৎ—যে হেতু ভাব নাশ হয় এবং পুনরায় স্বরূপ কারণকেই প্রাপ্ত হয়—এরূপ কথাও বলা যায় না। তোমরা যাকে কারণ বলছ তা ও যখন পরিণাম প্রাপ্ত হয়ে কার্য্য হচ্ছে তখন তাকে সৎ কি করে বলতে পার? তা হলে কারণও ত কার্য্যের ন্যায় পরিণামী এবং অসৎ হয়ে পড়ে। আর যদি বল কারণ হচ্ছে অপরিণামী নিত্য, আর কার্য্য হচ্ছে তার ওপর বিবর্ত্ত বা অধ্যাস। তা হলেও দেখ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ একটা সংস্কার মাত্র। শুক্তিতে রজতের ভ্রম হচ্ছে। শুক্তি না থাকলে রজতের ভ্রম হত না। সেইজন্য শুক্তি রজতের কারণ। কিন্তু বাস্তবিক শুক্তির সংস্কার আর রজতের সংস্কার সম্পূর্ণ পৃথক কারও সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নেই কেবল দ্রষ্টা একটা সংস্কারকে আর একটা সংস্কার দিয়ে ঢেকে ফেলছে, আর নিমিত্তরূপ সংস্কার দিয়ে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করছে। নিমিত্তকে কেউ প্রত্যক্ষ করে সংস্কার পাই নি।

অনাদি সংস্কার রয়েছে, দ্রষ্টা সেই সংস্কার দিয়ে ব্রহ্মতে রজ্জু ভ্রম করছে, আবার রজ্জুতে সর্পভ্রম করছে। দ্রষ্টার অধিষ্ঠানও যিনি, রজ্জুর অধিষ্ঠানও তিনি, সর্পের অধিষ্ঠানও তিনি। আত্মাতেই অহংএর ভ্রম হয়েছে, আত্মাতেই রজ্জু ভ্রম হয়েছে, পরে আবার সর্প ভ্রম হচ্ছে। কাজে-

কাজেই 'রজ্জুব সর্প ভ্রম হয় না, পৃথক তৃতীয় ব্যক্তির কল্পনা করতে হয় এসব প্রশ্নই উঠে না'। আর সংস্কার যখন অনাদি, তখন আর প্রত্যক্ষ মূলক বাহ্য জগতের অস্তিত্বই থাকতে পাবে না। জগৎটা ব্রহ্মের উপর দেশ-কাল-নিমিত্ত সংস্কাবাত্মক মায়াব অনাদি অনন্ত প্রবাহ।

সমষ্টি অজ্ঞানে বা মায়ায় জগতেব সংস্কার অনাদি কাল ধরে রয়েছে। এই অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যই ঈশ্বব। তিনি সমগ্র মায়াকে জানেন তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞ Absolute mind canno unconditionally subject itself to anything but mind —Hegel। জীব ব্যষ্টি মায়াকে জানে বলে অল্পজ্ঞ। বেদই হচ্ছে ঈশ্বরের জ্ঞান। বেদ মানে থান কতক বই নয়। —ঈশ্বরেব অনন্ত জ্ঞান। জীবাত্মা পরমাত্মাব অংশ বলিয়া, সে জ্ঞান সেও সাধন বলে লাভ কবে ঋষি হয়। ঋষি আবিষ্কৃত মন্ত্র বা সত্যই বেদান্ত। অলৌকিক বিষয়ে জ্ঞানলাভ সাধন সাপেক্ষ। সাধনা—উপদেশ গুরু বেদান্ত সাপেক্ষ। ব্যবহারিক জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমান সাহায্যে হতে পাবে কিন্তু সেটাকে নিত্য সত্য (Absolute Truth) বলতে পাবি না। আজ পর্য্যন্ত যুক্তি তর্ক কবে কেউ কোনও নিত্য সত্য বের করতে পারেন নি। তার্কিকদেব জগৎ-কারণ অনন্ত প্রকাবেব। অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic)দের অবস্থা সাধারণ লোকদেব চেয়ে বিশেষ উন্নত বলে বোধ হয় না, কাবণ তাবাও বলেন, জগৎ-কারণ আমরা জানি না এবং জানবাব উপায়ও নেই।

(ক্রমশঃ) —বাসুদেবানন্দ

জাতি-সংগঠক স্বামী বিবেকানন্দ

রাজনীতির কৌশলময়ী নীতিজাল বিস্তার অপেক্ষা ধর্ম্মের আদর্শ কত উচ্চ ও মহান—সে বিষয়ে কে সংশয় প্রকাশ করিতে পারে? প্রেম, সত্যানুরাগ ও শান্তির মঙ্গলময়ী বার্ত্তা, সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর যথার্থ বাণী একমাত্র ধর্ম্মই জগৎকে দান করিতে সমর্থ হইয়াছে,

—তাহার প্রমাণ জগৎ-ইতিহাসে জাজ্বল্যমান। দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক জাতীয়তার পতনের যুগে চিন্তাশীল এমন কে থাকিতে পারেন যিনি নিঃসংশয়ে রাজনীতিকে জাতীয় ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত? যখন ইউরোপীয় সভ্যতা হতবল ও হতমান হইয়া দৃঢ়ভিত্তির অন্বেষণে তৎপর, যখন পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের নব্য চিন্তা-নায়কগণ কায়-মনোবাক্যে রাজনৈতিক সভ্যতার বিরুদ্ধে আপনাদের সর্ব্বশক্তির নিয়োগ করিতেছেন, তখন বিচারশীল কেহই রাজনৈতিক ভিত্তির প্রত্যাশা করিবেন না ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তৃতীয়তঃ ধর্ম্মরূপ ভিত্তির উপর প্রাচীন ভারতে একটি বিশাল 'নেশান' গড়িয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং বর্ত্তমান যুগেও তাহা সম্ভবপর। চতুর্থতঃ রাজনৈতিক ভিত্তিকে ভাল বলিয়া মানিয়া লইলেও তাহা ভারতবর্ষে চলিতে পারে না, কারণ স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মকেই অবলম্বন করিয়া আপনার জাতীয় জীবন কখনও ক্ষীণ ভাবে কখনও তীব্র গতিতে প্রকট করিয়া আসিতেছেন। ভারতীয় নেশনের সঙ্কটসংগ সমূহে ভারতের ধর্ম্মই ভারতকে নবালোক দান করিয়াছেন, এমন কি মধ্যযুগে রাজপুত, মহারাষ্ট্র ও শিখজাতির অভ্যুত্থানের পশ্চাতেও একমাত্র ধর্ম্মেরই অনু-প্রেরণা দেখিতে পাওয়া যায়। তাই স্বামিজী বলিতেছেন, "তোমরা ধর্ম্মকে বিশ্বাস কর বা না কর, জাতীয় জীবনের অনুরোধে তোমাদিগকে একমাত্র ধর্ম্মকেই অবলম্বন করিতে হইবে ও ধরিয়া থাকিতে হইবে। তারপর অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়া অপরাপর জাতি সমূহ হইতে সামর্থ্যানুসারে সমস্তই টানিয়া আন। কিন্তু সেই একই জীবনাদর্শের নিকট অপর সমস্ত বিষয়কে অনুগত করিয়া রাখিতে হইবে এবং তাহা হইতেই অভিনব গৌরবময় ভবিষ্যৎ ভারত প্রকটিত হইয়া উঠিবে। আমার দৃঢ় ধারণা সে ভারতবর্ষ আসিতেছে, অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত ভারতবর্ষ আবির্ভূত হইতেছে।" *

হে পাঠক। ক্ষণমাত্র অপেক্ষা কর, এই ধর্ম্ম কি এবং কি প্রকারেই

---

*'Reply to the address—Ramnad' হইতে অনুবাদিত।

বা উহা হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহকে সমন্বিত করিতে পারে, অল্পক্ষণ পরেই আমরা সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে যাইতেছি।

স্বামিজীর জাতীয়তা ও তৎপ্রচারিত জাতি-সংগঠন-বাণীর একটি বিশেষত্ব আধ্যাত্মিক ভিত্তি। সে সম্বন্ধে আমরা আংশিক আলোচনা করিয়াছি। ভারতবর্ষ যে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া সুদূর অতীত হইতে আপনার জাতীয় জীবন প্রকট করিয়া চলিয়া আসিতেছে আজ আমরা তাহাকে অস্বীকার করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। স্বামিজী প্রচারিত জাতীয়তার দ্বিতীয় বিশেষত্ব—ভারতীয় জন সাধারণের (Mass) সম্বন্ধে তাঁহার ঘোষণা ও ভবিষ্যদ্বাণী। স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত জাতীয়তা ও জাতি সংগঠনে এই জনসাধারণ বা শূদ্র জাতি কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা সম্যক্ না বুঝিলে আমরা স্বামিজীর জাতি-সংগঠন বাণীর সম্ভবতঃ কিছুই বুঝিব না। জনসাধারণরূপ বিরাট সুপ্ত জানোয়ারের জাগরণ ও শক্তি-উন্মেষের ইঙ্গিত করিতে গিয়া স্বামিজী একটি বিশিষ্ট প্রণালীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রণালীতেই স্বামিজীর সহিত ইউরোপের নব্য (Prolitariat) বিপ্লববাদীদের পার্থক্য। ইউরোপের সর্ব্বত্র যে বিরাট সামাজিক বিপ্লব ধীরে ধীরে মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছে তাহার পশ্চাতে সেই গভীর আধ্যাত্মিক ভাব ও দৃষ্টির একান্ত অভাব, যাহা তাপদগ্ধ বিশ্ব-মানবকে শান্ত ও সরস করিয়া সংঘবদ্ধ করিতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে রোমদেশেই সর্ব্ব প্রথম Patricians ও Plebians দের সংগ্রামে জনসাধারণ মাথা তুলিবার চেষ্টা করে। তারপর Karl Marx ইউরোপে জনসাধারণের জাগরণের তিনটি যুগ দেখাইয়াছেন। (১) Feudalism যে প্রণালীতে জনসাধারণ দাসত্বের লৌহনিগড়ে বদ্ধ ছিল, স্বীয় গ্রাম বা দেশের বাহিরে গিয়া সংঘবদ্ধ হইবার বা আপনাদের শক্তির বিকাশ করিবার কোন অবকাশ পায় নাই। (২) দ্বিতীয় যুগ আসিল পাশ্চাত্য Capitalism এর সঙ্গে সঙ্গে, যখন জন-সাধারণ নিজেদের অনিচ্ছা সত্বেও Capitalistsদের অধীনে থাকিতে

বাধ্য হইয়া সমান সুখ ও সমান দুঃখের অনুভব করিতে লাগিল ও ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘবুদ্ধি জাগরিত হইতে লাগিল। (৩) বর্ত্তমান Socialism এর যুগ। অন্যের দ্বারা আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া জনসাধারণ ধীরে ধীরে তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাইতে আরম্ভ করিল। যখন তাহারা দেখিতে পাইল—আপাদ মস্তক ঘর্ম্মাক্ত হইয়া নামমাত্র পুরস্কারের বিনিময়ে তাহারা সমগ্র সভ্যতার রসদ প্রস্তুত করিতে বাধ্য, তখন তাহাদের নিষ্পেষিত মন বিদ্রোহী না হইয়া থাকিতে পারিল না, স্বাধীন ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহার আপনাদের ভোগাধিকার বন্ধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিল। বস্তুতঃ Capitalism ও Labour এর সমন্বয়ই জগতের একটি বড় সমস্যা। পাশ্চাত্যের অন্যান্য ভাবের সহিত এই সমাজ বিপ্লবের ভাবও ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে। এই প্রকার সামাজিক বিপ্লব দ্বারা প্রাচীন ও নবীন যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমূহ উল্টাইয়া দিয়া জন সাধারণের সমানাধিকারবাদরূপ ভিত্তির উপর অনেকে নূতন ভারত গঠন করিতে উদ্যত হইতেছেন। ভারতের প্রাচীন জাতীয়তাকে যদি জাগিতে হয়, তাহা হইলে আজ তাহাকে এই সামাজিক বিপ্লবের ভাবকে স্বভাবানুযায়ী সমন্বিত করিয়া আপনার গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ জনসাধারণের উদ্বোধন চাহিয়াছেন এবং জাতি সংগঠনে শূদ্র জাতিকে তিনি জাতীয় জীবনের অন্যতর ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ ও কর্ম্ম-প্রণালী কত পৃথক তাহা ক্রমশঃ আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। জনসাধারণকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবাবলম্বনে জাতি গঠনের চেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্বে আর কখনও ভারত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে নাই। ভারতের আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার প্রয়াস প্রাচীন ভারতে অনেকবার সফল হইলেও জন-সাধারণকে অবলম্বন করিয়া সেই সত্যসমূহের ভিত্তির উপর মহা-ভারত গঠনের প্রয়াস—মহাভারতীয় যুগের পর এই প্রথম, আর এই নব-সংগঠনের

পতাকা বাহক স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন—"নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপ্‌ড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধর্‌বে না। এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিন রাত খাটা এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম।। অতীতের কঙ্কালচয়। এই সাম্‌নে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা,—তোমার মাণিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো, তোমার যাই বিলীন হওয়া অমনি শুন্‌বে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনী 'ওয়াহ গুরু কি ফতে'।" *

ভারতীয় জাতীয়তা ও জাতি গঠনের কথা আলোচনা করিতে গেলে কয়েকটি গুরুতর বিষয় স্বতঃই আসিয়া পড়ে। ধর্ম্ম, সমাজনীতি, রাজনীতি, জাতি, ভাষা, বৈদেশিক নীতি এই কয়েকটি সন্নিবেশিত হইয়াই একটি নেশন বা জাতি গড়িয়া উঠে। ইহাদের প্রত্যেকটিকে একটি বিশেষ ধারায় সন্নিবেশিত করিয়া ভারতে একটি সমুন্নত নেশন গঠন করিবার নিমিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ যে প্রণালী দেখাইয়াছেন ও যে সমস্ত গুরুতর সমস্যা ইহাদের সহিত জড়িত আছে এবং তাহাদের সম্বন্ধে

---

* পরিব্রাজক।

তিনি যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন এখন আমরা তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ভারতীয় নেশনের ভিত্তি ধর্ম্ম এবং জাতীয় জীবনরূপ বিপুল প্রবাহে এই ধর্ম্ম সমন্বয়ের যুগগুলিই এক একটি বিরাম স্থান। এই বিরাম-কেন্দ্রগুলির ভিতর দিয়া দৃষ্টিপাত না করিলে আমরা ভারতীয় নেশনের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতেই সক্ষম হইব না। সুতরাং ভারতীয় নেশন গঠনে ধর্ম্ম-সমন্বয় সমস্যাই একটি বিরাট ব্যাপার যাহাতে আমাদের বিক্ষিপ্ত শক্তি সমূহ সর্ব্বপ্রথম নিয়োজিত করিতে হইবে। স্বামিজী বলেন—

"ভারতের ভাবী সংগঠনের প্রথম ভিত্তিরূপে ধর্ম্মের ঐক্য-সাধন একান্ত প্রয়োজন। এই পুণ্য ভূমির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একই ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এক ধর্ম্ম বলিতে আমি কি বুঝি? ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত সমূহে যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, তাহাদের দাবী দাওয়া যতই পৃথক হউক না কেন, আমরা জানি, আমাদের ধর্ম্মে এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত আছে, যাহারা সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অতএব এই ধর্ম্ম তাহার সাধারণ সিদ্ধান্ত সমূহের সীমার মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্যের অনুমোদন করে এবং জীবন যাপন ও চিন্তা প্রণালীতে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা প্রদান করে। * * * দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র নরনারী ও বালক বালিকাকে এই সত্য সমূহ বুঝিতে, জানিতে ও জীবনে পরিণত করিতে দাও। আমাদের অভিযানে ইহাই প্রথম পদক্ষেপ, সুতরাং আমাদের উহা করিতেই হইবে।" *

প্রশ্ন হইতে পারে—তবে কি ভারত-ভারতী মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বকীয় জীবন যাত্রার পথ পরিত্যাগ করিবে এবং ভব-সমুদ্রের পারে বসিয়া দুর্ব্বহ জীবন নিঃশেষ করিতে কাণ্ডারীর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে থাকিবে? প্রশ্ন হইতে পারে—মুসলমান ধর্ম্ম বা খৃষ্ট ধর্ম্মই বা কি অপরাধ করিল,

* Future of India

সকলে মুসলমান বা খৃষ্টান হইয়া গেলেইত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যায়? হে সন্দিগ্ধ চিত্ত! যে ধর্ম্ম ভারত-ব্যাপী নেশন গঠনে উদ্যত হইয়াছে, তাহার সমন্বয় শক্তি অসীম, তাহা প্রত্যেক ব্যষ্টিকে স্বস্থানে শক্তি ও সামর্থ্য দান করিয়া অভিনব কর্ম্ম-প্রণালীর পত্তন করিতে চায়। রাজ-প্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রের লাঞ্ছিত কুটীর পর্য্যন্ত তাহা শক্তি-সঞ্চার করিয়া দিতে উন্মুখ। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিলে এমন কতকগুলি সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহাদের আদর সর্ব্বত্র সমান। পরিষ্কার ভাবে বলিতে গেলে—কতকগুলি চরম আধ্যাত্মিক সত্য আছে, তাহারাই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পারিপার্শ্বিক বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। একমাত্র এই সাধারণ ভিত্তি-মূলক সত্য-সমূহকেই আমরা ভবিষ্যৎ মানবের ধর্ম্ম বলি, উহা হিন্দু, মুসল-মান বা খ্রীষ্টানের একচেটিয়া ধর্ম্ম নহে, উহাতে সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার, কারণ সকল ধর্ম্মই এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে। কোরাণ, বাইবেল ও বেদের ভিতর যে অসাম্প্রদায়িক ভাব আছে—তাহারই ভিতর দিয়া সমগ্র কোরাণ, বাইবেল ও বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দুকে সত্য হিন্দু, মুসলমানকে সত্য মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে প্রকৃত খ্রীষ্টান হইয়া এই অসাম্প্রদায়িক ভাবের নিকট নত-মস্তকে কায়মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে এবং এই অসাম্প্রদায়িক ভাবকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে ভারতীয় নেশন গঠনে সহায়তা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সাম্য-বাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ধর্ম্মের ভাবসমূহ সমীকরণ করিয়া একটি নূতন ধর্ম্মমত স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় অসামান্য প্রতিভা বলে এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া দেশে এক উদার ভাবের পত্তন করিয়াছিলেন—তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বর্ত্তমান যুগে আমরা অধিকতর অগ্রসর হইতে চাই—জগতের সকল ধর্ম্মমত সমূহকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাখিয়া, এক মহা-সমন্বয় সূত্রে তাহাদিগকে গ্রথিত করিতে চাই।

ভারতীয় নেশন ধর্ম্মের বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম জগৎ সম্বন্ধে এই অসাম্প্রদায়িক উদার মত-সমূহ অভিব্যক্ত করিয়াছিল, উহারাই বেদান্ত প্রচারিত চরম সত্য। এই বেদান্তের সার্ব্বভৌমিক ভাব—যাহা উপনিষদ সমূহে বিশদ বর্ণিত—তাহা মানব মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি। তাহাতে কোন জাতির বিশেষ অধিকার নাই। বিশ্ব-মানবের সাধারণ সম্পত্তি স্বরূপ এই সত্য-সমূহকে স্বামী বিবেকানন্দ জগতে প্রচার করিয়াছেন। এই সত্য সমূহ বাইবেলেও বর্ণিত রহিয়াছে এবং কর্ম্ম পরিণত ইস্‌লামধর্ম্ম এই বৈদান্তিক সাম্যবাদকে অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন—সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ নাইনিতালস্থ জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহাই এথানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"* * * * উহাকে আমরা বেদান্তই বলি, আর যাই বলি আসল কথা এই যে অদ্বৈতবাদ ধর্ম্মের এবং চিন্তার শেষের কথা এবং কেবল অদ্বৈত ভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস যে উহাই ভাবী সুশিক্ষিত মানবসাধারণের ধর্ম্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌছানর বাহাদুরিটুকু পাইতে পারে, (কারণ তাহারা কি হিব্রু, কি আরবী জাতি অপেক্ষা প্রাচীনতর জাতি) কিন্তু কর্ম্ম-পরিণত বেদান্ত (Practical Vedantism) যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সার্ব্বজনীন ভাবে পুষ্ট হইতে এখনও বাকী আছে।

"পক্ষান্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যদি কোন যুগে কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্যরূপে এই সাম্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকেন তবে একমাত্র ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী। * * * *

"এই হেতু আমার দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম্ম-পরিণত ইস্‌লাম ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত

তাহা মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানব জাতিকে সেইস্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, ধর্ম্ম সকল কেবল একত্বরূপ সেই একমাত্র ধর্ম্মেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র। সুতরাং প্রত্যেকেই যাঁহার যেটি সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তিনি সেইটিই বাছিয়া লইতে পারেন।

'আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইস্‌লাম ধর্ম্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইস্‌লামীয় দেহ—একমাত্র আশা। * * * আমার মাতৃভূমি যেন ইস্‌লামীয় দেহ ও বৈদান্তিক হৃদয়-রূপ এই দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন। * * *"

বেদান্ত বা উপনিষদের অসাম্প্রদায়িক ভাব সমূহের অপরোক্ষানুভূতি যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহারাই ঋষি। এই ঋষিগণই আবহমান কাল হইতে ভারতীয় নেশনের কর্ণধার। সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত থাকিয়াও অল্পসংখ্যক অসামান্য পুরুষই ঋষিত্ব লাভ করিতে সক্ষম হন। ভারতীয় নেশনের আদর্শ ঋষিত্ব লাভ। এই জাতীয় আদর্শ অব্যাহত রাখিবার জন্য স্বামিজী এমন একটি সংঘ চাহিয়াছেন, যাহা জীবনের অন্যান্য সমুদয় ক্ষুদ্র ব্যাপারকে ত্যাগ ও অস্বীকার করিয়া একমাত্র ধর্ম্মের অপরোক্ষানুভূতিরই জন্য প্রাণপাত করিবেন ও আপনাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া জাতীয় ভিত্তিকে অটল রাখিবেন। স্বামিজীর বিশেষত্ব এই যে, তিনি এই সত্য সমূহকে কেবল অল্পসংখ্যকের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চান না, জাতীয় জীবনের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এই সত্য সমূহ পৌঁছাইয়া দিয়া উহাদিগকে সকলের গোচরীভূত করিতে চান। বুদ্ধি সাহায্যে বেদান্তের সিদ্ধান্ত সমূহ মানিয়া লইয়া জনসাধারণ যাহাতে শ্রদ্ধা সমন্বিত চিত্তে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে এই সত্যগুলিকে পরিণত করিতে পারেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাহারই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই সত্য সমূহের Intellectual Conviction হইতেই যে মহা-শক্তির সঞ্চার হইবে, তাহাতেই সমগ্র নেশনকে

উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহন করাইয়া দিবে। অতএব অল্পসংখ্যক ত্যাগী নরনারী একদিকে যেমন এই সত্য সমূহের বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া জাতীয় আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন তেমনি অপরদিকে সমগ্র ভারতের নরনারী শ্রদ্ধাবান হইয়া এই সত্যগুলিকে জাতীয় আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং স্ব স্ব কর্ম্মকেন্দ্রে অবস্থিত থাকিয়াও এই সত্য সমূহকে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়া ভারতব্যাপী আধ্যাত্মিক জাতি সংগঠনে সাহায্য করিবেন। বস্তুতঃ বেদান্তের সত্য সমূহ সর্ব্ব-সাধারণে শ্রদ্ধা, আত্মপ্রত্যয়, সৎসাহস প্রভৃতি জন্মাইয়া দিয়া উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করিবার সামর্থ্য রাখে—"উপনিষৎ সমূহ শক্তির বৃহৎ আকর স্বরূপ। উপনিষদ্ যে শক্তি-সঞ্চারে সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরু-জ্জীবিত এবং শক্তি ও বীর্য্যশালী করিতে পারা যায়। সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্ব্বল, দুঃখী, পদদলিতগণকে উহা উচ্চ-রবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র শাস্ত্র, যাহাতে উদ্ধারের কথা বলে না, মুক্তির কথা বলে। প্রকৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হও, দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হও।"*

(ক্রমশঃ) —অব্যক্তানন্দ।

---

* ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্য্যকারিতা——ভারতে বিবেকানন্দ।

পল্লীর কথা

"আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখান"—পূজা সেবাই যে আত্মোন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট পথ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ আন্তরিক ভক্তি সহকারে পূজা সেবারূপ সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া আমাদিগকে সেই পথই অবলম্বনে আত্মোন্নতি সাধন করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জগজ্জননীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে চিন্ময়ীজ্ঞানে সেবা দ্বারা সর্ব্বার্থ সিদ্ধি লাভ করিয়া এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া জীবের মুক্তির জন্য উপযুক্ত পাত্রে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহারই প্রেরণায় শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীস্থ মোহান্ধগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ আমাদিগকেও অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বলিতেছেন,—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন, প্রাণ, শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়॥
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

অতএব আমাদিগকেও জীবসেবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এস, বীরহৃদয় পবিত্রচেতা জননী জন্মভূমির একনিষ্ঠ সেবক এস—শৃগাল, কুক্কুর, ও ম্যালেরিয়া-পিশাচের তাণ্ডব নিকেতন পল্লীরূপ মহাশ্মশানে বিরাট-রূপিনী মাতৃদেবীর পীঠস্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সেবা পূজায় ব্রতী হইয়া শব সাধনে শক্তিলাভ করতঃ কৃতার্থ হই।

সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামই আমাদের পক্ষে সেবা কার্য্যের উপযুক্ত স্থান, কেন না পল্লীগ্রামই সহরের জন্মদাতা ও পুষ্টিসাধক। পল্লীগ্রামের কৃষক ও শ্রমজীবিগণ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সহরের অন্ন যোগাইতেছে, বাণিজ্য ব্যাপারে যাবতীয় মালপত্র প্রস্তুত করিয়া চালান দিতেছে। পল্লীগ্রামবাসীরাই সহরে যাইয়া লোকসংখ্যা পুষ্ট করিতেছে। যাহারা

এখনও পল্লীগ্রামে বাস করিয়া গ্রামের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে সেই নিবক্ষর নিরীহ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবিগণের শিক্ষার ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিহিত ব্যবস্থা না থাকায় মনোহর তপোবন সদৃশ পল্লীভূমিব প্রাকৃতিক অবস্থা এবং পল্লীবাসীর শাবীরিক ও মানসিক অবস্থা ক্রমশঃ অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পল্লীগ্রামের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা কোন কোন পল্লীগ্রামের দুই একটা প্রাচীন সংসাব দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; তাহারা কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া নানাবিধ ভাবতবঙ্গের মধ্যে পড়িয়াও প্রাচীন নীতি এখনও বজায় বাখিয়াছে। এখনও ইহারা সত্যপথে থাকিয়া স্বহস্তে ভাত কাপড়ের যোগাড় করিয়া লইতেছে। দেখিলে মনে হয় ইহারা প্রকৃত সুখী এবং ইহাদের বাটী প্রকৃত শান্তি নিকেতন। কৃষক-কুলেব এই শান্তিময় সংসারের কর্ত্তা কৃষিকার্য্য দ্বারা ধান, গম, গুড়, সবিষা, কলাই, কাপাস প্রভৃতি শস্য ও নানাবিধ তরকারী উৎপন্ন কবেন —কর্ত্রী জিনিষগুলি সযত্নে রাখিয়া আবশ্যক মত চাউল, ময়দা, এবং নিজহস্তে সূতা কাটিয়া গৃহস্থেব আবশ্যক মত কাপড় প্রস্তুত করাইয়া থাকেন এবং বন্ধনাদি কবিয়া দুই বেলা সমভাবে সকলকে খাইতে দেন। কর্ত্তাব আদেশে ও কর্ত্রীর ব্যবস্থায় ভাই, ভাইপো, ছেলে, মেয়ে সকলে একান্নবর্ত্তী থাকিয়া সকলেই আপনাপন কার্য্যে ব্যস্ত। কার্য্যাবসানে সন্ধ্যাব পব রামায়ণাদি পাঠ ও শ্রবণ—বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা, মনসাপূজা, বারব্রতাদি বারমাসে তেব পূজা পার্ব্বণ, তার উপব গ্রাম্য দেবতাগণের মাসিক পূজা, মানত পূজা, পুরোহিত বাটীর দুর্গাপূজা ও কালীপূজাদিতে অকপট শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত যথাসাধ্য পূজোপহার দান করেন। ব্রাহ্মণ সজ্জনাদি আগন্তুক বা কুটুম্ব আসিলে আনন্দের সহিত নিজেব পুকুরের মাছ, দুধ, জমির তরিতবকাবী আনিয়া যথাসাধ্য সেবা করেন এবং অন্ধ, খঞ্জ, আতুর ও বৈষ্ণব ভিখারীকে ভিক্ষা দেন। এই কৃষকগণের বাটী সর্ব্বদা নানাবিধ শস্য ও খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ; দেখিলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বলিয়া মনে হয়। কেহ জল খাইতে চাহিলে মুড়ি, গুড় ত আছেই তাহার উপর ফুটি, কাঁকুড়, শসা, শাঁখআলু, দুগ্ধ ইত্যাদি খাওয়াইয়া গৃহস্থ কৃতার্থ

হইয়া থাকেন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রামস্থ শিল্পজীবিগণ কৃষককুলের আবশ্যক মত লোহার জিনিষ—কোদাল কাস্তে, তুলর জিনিষ—কাপড় গামছা, মাটিব জিনিষ—হাঁড়ি মালসা ইত্যাদিব বিনিময়ে ধান্য, গম, সরিষা প্রভৃতি যে শস্য পাইত তাহাতেই শিল্পিকুলের সংসার স্বচ্ছল ভাবে নির্ব্বাহ হইত। শ্রমজীবিগণও তাহাদেব পারিশ্রমিক দরুণ শস্যাদি ও সংসারেব আবশ্যক দ্রব্যাদি পাইত। পল্লীগ্রামের এই শ্রীমান্ গৃহস্থগণের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া উচ্চ বর্ণীয় পল্লীবাসিগণ দেবদেবীর আরাধনায় নিরত থাকিয়া গ্রামস্থ বালক বালিকাগণকে সৎশিক্ষা দান, এবং পঞ্চায়েত মিলিয়া বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করিয়া সমাজ ও দেশবক্ষা করিতেন। গৃহস্থগণ প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাদের সেবার জন্য শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত সুপ্রচুর শস্যসম্ভাব এবং বস্ত্র প্রভৃতি সংসারের আবশ্যক দ্রব্যাদি বাশি রাশি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতেন। কল্যাণকামিগণ তাহাদের প্রদত্ত সেই মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া শান্তিসুখ অনুভব করিয়া মনের আনন্দে কাল যাপন কবিতেন।

কাল প্রভাবে সেই উচ্চ বংশীয় সন্তানগণ, পশ্চিমী সভ্যতার মোহে পড়িয়া বিলাস-সাগরে গা ঢালিয়া অনর্থমূলক অর্থোপার্জ্জনের জন্য 'সহুরে' হইতেছেন এবং পল্লীগ্রামস্থ শ্রীমান্গণের শোণিত শোষণ করিতেছেন। কৃষক এবং শিল্পিগণের সন্তানগণও গোলামি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজনসহ দলে দলে দেশত্যাগী হইতেছে ইহাব জন্য দায়ী ত আমরাই। আমবা নামে মাত্র উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হই না কেন, তদ্বারা নিরীহ পল্লীবাসীদের অর্থাৎ যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভাত কাপড়ের মূল উপাদান শস্য ও তুলাদি উৎপন্ন করিতেছে—তাহাদের কিঞ্চিৎ মাত্রও সাহায্য বা উপকার করিতে পাবিতেছি কি? বেশ প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব যে ছলে, বলে ও কৌশলে তাহাদের পায়ের ধূলা তাহাদেরই মাথায় দিয়া শুধু ভাত কাপড়ের যোগাড় করা নয়, বিড়ালের পিঠা ভাগের মত অর্থাদিও শোষণ করিয়া আহারে বিহারে বিলাসিতার চরম সীমায় গিয়া পড়িয়াছি। আমরা অবশ্য বলিতে পারি স্বোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারাই এই সব করিতেছি।'

তাহারা যখন উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য পাইতেছে তখন সেই অর্থের দ্বারাই তাহারা যে কোন অভাব ত পূরণ করিতে পারে? বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় তাহারা উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য পায় না। এক দিনে একজনে যন্ত্র সাহায্যে হাজার টাকা তৈয়ারী কবিতে পারে কিন্তু হাজার লোকে এক দিনে যন্ত্র সাহায্যে একজনের উপযুক্ত ধান্য প্রস্তুত করিতে পাবে না। হাজার টাকা থাকিলেও এক মুঠা ভাতের জন্য প্রাণ গিয়াছে, কিন্তু ঘরে ভাত থাকিলে টাকার অভাবে প্রাণ যাইবে না। অতএব টাকা কখনও শস্যের মূল্য হইতে পারে না। আমরা যদি সকলেই স্বার্থপর অকর্ম্মণ্য সভ্য হইতে লাগিলাম আর ভাত কাপড়েব জন্মদাতা অসভ্য বুনো জঙ্গলী জোলা, চাষাভুষোবা খাটিয়া খাটিয়া অতিশ্রমে এবং অজ্ঞানতা প্রযুক্ত পুকুবের পচা জল খাইয়া, বদ্ধ ঘরে বাস করিয়া, উপযুক্ত খাদ্যাভাবে ম্যালেবিয়া, কলেরা, নিমুনিয়া প্রভৃতি রোগে যদি গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া গেল, তবে আমাদের মত উপাধিধাবী সভ্য বাবুদের আহার যোগাইবে কে? এই অসভ্যদের হাল বন্ধ, কোদাল বন্ধ হইলে যে যুদ্ধ বন্ধ, রেল বন্ধ, টেলিগ্রাম বন্ধ, আদালত ও পোষ্টাফিস হইতে মুদিখানার দোকান পর্য্যন্ত ক্রমে বন্ধ হইয়া আমাদিগকে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হইবে তাহা কি ভাবিয়া দেখিতেছি?

একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব, সুজলা, সুফলা, শস্যসম্ভার পূর্ণা ভারতে যে এত ভেজাল জিনিষেব ব্যবহার ও দ্রব্য সমূহের মহার্ঘতা তাহার প্রকৃত কাবণ, সুব্যবস্থার অভাবে পল্লীগ্রামস্থ শস্যাদি উৎপন্নকারী কৃষক ও শ্রমিকগণের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও তাহাদেব সংখ্যার হ্রাস। পল্লীগ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি না হইলে আইনের দ্বারা ভেজাল জিনিষের আমদানী ও ব্যবহাব বন্ধ হইবে না এবং অর্থনীতি-বিশারদগণ 'কমিটি' করিয়া যতই চেষ্টা করুন, দ্রব্যের মূল্য কমাইতে পাবিবেন না। বিচার করিয়া দেখ, ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিনিময়ের সুবিধার জন্য অর্থের কিঞ্চিন্মাত্র আবশ্যক হয় বটে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবলমাত্র অর্থ উপার্জ্জন করাকেই মানবজীবনের উদ্দেশ্য কবিয়া ফেলিয়াছি। তাহাব ফলেই মনুষ্যত্ব হারাইয়া এত অনর্থ ও

বিপদের সম্মুখে পড়িয়াছি। আবার অর্থের মোহে পড়িয়াই পল্লীগ্রামস্থ শ্রমজীবিগণ পেটে না খাইয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও শস্যাদি যাহা উৎপন্ন করিতেছে সেই সমস্ত বিক্রয় লব্ধ টাকা মোকদ্দমাদিতে ব্যয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। টাকা থাকিলেই মোকদ্দমার সুবিধা হয়, কেন না ধান, গম ত আর মোকদ্দমায় 'ঘুষ' চলে না। এইরূপে তাহারা একদিকে অর্থ নষ্ট, অন্যদিকে পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। আবার ব্যবসায়িগণ উক্ত খাঁটি জিনিষ কিনিয়া তাহাতে নানারূপ অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য 'মিশাল' দিয়া বাবুদিগকে 'দুনা' লাভে বিক্রয় করিতেছে। সহরবাসিগণের অধিকাংশ সেই ভেজাল জিনিষ উদরস্থ করিয়া নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অকালে সমন-সদনে গমন করিতেছেন। এইরূপে পল্লীগ্রামগুলি ধীরে ধীরে জনশূন্য হইতে বসিয়াছে। আমরা সকলে একই বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছি। অতএব যাহারা পিতামাতার ন্যায় ভরণ পোষণকারী, সেই পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত, রুগ্ন, দরিদ্র, প্রপীড়িত পল্লীবাসিগণের প্রতি যদি আমাদের মমতা ও ভালবাসা আসিয়া থাকে তাহা হইলে নারায়ণ জ্ঞানে তাহাদের সেবা করিয়া আমাদিগকে মানুষ নামের যোগ্য হইতে হইবে এবং পল্লীবাসিগণকেও মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে।

দরিদ্রনারায়ণ সেবা

পল্লীবাসিগণের অভাবের বিষয় বলিতে গিয়া অনেকেই দুই চারিটি অভাবের উল্লেখ করিয়া অভাবকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। নিরীহ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবিগণের অভাবের সীমা নাই অথচ তাহারা অভাব জানে না, তাহারা এতদূর কষ্টসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে যে রোগ, শোক, দুঃখকে কষ্ট বলিয়া অনুভবই করিতে পারে না। বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব, জলের অভাব, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, বিদ্যার অভাব, জ্ঞানের অভাব, পরস্পর সহানুভূতির অভাব, ধর্ম্মাভাব প্রভৃতি যাবতীয় অভাবই পল্লীগ্রামে আড্ডা গাড়িয়াছে। তাহা হইতে উদ্ভূত দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি সমূহ এবং অত্যাচার, অনাচার, ব্যাভিচার প্রভৃতির জ্বালায় পল্লীস্থ নিরীহ মহা-

প্রাণিগণ দগ্ধীভূত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে। আর মোহবিকার-গ্রস্ত, তৃষ্ণাতুর আমরা তাহাদের কালানল সদৃশ উত্তপ্ত নিশ্বাসোদ্ভূত মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবিত হওয়ায় ভীষণ পিপাসায় আমাদেরও প্রাণ যায় যায় হইয়াছে।

যদি আমরা ইহা স্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি তাহা হইলে জননী-জন্মভূমি পল্লীগ্রামের কোলে ফিরিয়া গিয়া মন, প্রাণ অর্পণ করিয়া মায়ের সেবা, পূজা—মায়ের দরিদ্র সন্তানগণকে প্রাণের প্রাণ মনে করিয়া তাহাদের জীবনপ্রদ শিক্ষা দিতে হইবে, নচেৎ আমাদের অন্য উপায়ে শান্তি নাই।

দুইজন হইলেই ভাল হয়, অসমর্থ হইলে একজনই পল্লীগ্রামে আসিয়া নিজবাটী না থাকিলে কোন সদাশয় ব্যক্তির বৈঠকখানায় কিংবা কোন বারোয়ারী গৃহে অথবা গ্রাম্য দেবতার আটচালায় আড্ডা পাতিয়া গ্রামস্থ দরিদ্র বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য একটি পাঠশালা খুলিতে হইবে এবং আগন্তুক যুবকগণকে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভ-গবদ্গীতা, উপনিষৎ, শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ এবং স্বামিজীর গ্রন্থাবলী পড়িয়া শুনাইতে হইবে। যাহাতে যুবকগণ উক্ত ধর্ম্মপুস্তক সমূহের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সকলে আসিয়া একত্র হয় তাহার চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক। কার্য্যাবসরে সন্ধ্যার পর ধর্ম্মালোচনা, আপনাপন ইষ্ট দেবদেবীর ধ্যান ধারণা এবং শ্রীশ্রীভগবানের স্তবপাঠাদি যথা নিয়মে প্রতিদিন সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আহারাদির সংস্থান না থাকিলে অবসর মত গ্রাম বা গ্রামান্তর হইতে ভিক্ষা বা চাঁদার দ্বারা আহারের খরচ কিছুদিন যোগাড় করিয়া লইতে হইবে। গ্রামের লোক মুষ্টিভিক্ষা দিতে কাতর হইবে না। প্রথমতঃ পল্লীবাসিগণ বেশী সাহায্য করিবে না, কেন না তাহারা অনেকবার ভদ্রবেশধারী জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া প্রতারিত হইয়াছে। ভিক্ষালব্ধ অর্থ হইতে কিছু কিছু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আনিয়া দরিদ্রগণের চিকিৎসা এবং সুবিধা হইলে অন্ধ, খঞ্জ, আতুরগণকে কিছু কিছু চাউল সাহায্য করিতে হইবে। এই সকল কার্য্য দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তিগণ

বেশী বেশী সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। অতএব সুবিধা বুঝিয়া গ্রামস্থ প্রত্যেক গৃহস্থ হইতে সম্ভবমত খড়, বাঁশ, গাছ ও অর্থাদির সাহায্য লইয়া দরিদ্র বালকগণকে শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত স্থানে একটি শিক্ষালয় নির্ম্মাণ করিতে হইবে। শিক্ষালয়ের নিকটে চাষের জন্য একটু উর্ব্বরা জমি এবং খেলিবার জন্য একটু ফাঁকা মাঠ থাকা আবশ্যক। বিদ্যালয়ে চরকা ও তাঁত থাকিবে। বালকগণ লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চরকায় সুতা কাটা শিখিবে। যে সমস্ত যুবক ধর্ম্মালোচনা করিতে আসিবে তাহাদিগকেও চরকায় সুতা কাটা, তাঁত বোনা অথবা অন্যান্য শিল্পকার্য্য এবং লেখাপড়া না জানিলে লেখাপড়াও শিখাইতে হইবে। পাঠশালার বালকদিগকে শিক্ষালয় সংলগ্ন উর্ব্বর জমিতে কাপাস গাছ, শাকসবজী ও নানাবিধ ফুলের গাছ লাগাইয়া সকালে বৈকালে কিছু কিছু কৃষিকার্য্য করান আবশ্যক। শিক্ষালয় বা আশ্রম নির্ম্মাণ কালে যে মাটি তোলা হইবে তাহাতেই এমন একটি ক্ষুদ্র জলাশয় প্রস্তুত হইবে, যাহার জলে সেচন কাজ সম্বৎসর চলিতে পারে। শিক্ষার্থীদের চিত্ত-বিনোদনার্থ নিকটস্থ মাঠে প্রতিদিন সামান্যরূপ ব্যায়াম ক্রীড়া আবশ্যক।

—কেশবানন্দ।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া

মা ও ছেলে এই মধুর সম্পর্কের পর পুরুষের সহিত নারীর আর একটি শুদ্ধ সম্বন্ধ আছে, ভাই-বোন। নারীর সম্মান লাঘব না করিয়া স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে সহজ ভাবে তাহার হৃদয় ভরিয়া দিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইতে এমন বন্ধনী আর নাই। যাহার হৃদয় আকাশের মত উদার, সাগরের মত বিরাট্, বাতাসের

মত মুক্ত, বিশ্বজননীর করুণা-কটাক্ষ লাভ করিয়া বিশ্বের অণু পরমাণুকে পর্য্যন্ত যে অতি আপনার বলিয়া ভাবিতে পারে, সৃষ্টি-তন্ত্রীর কোন গোপন-স্থানে ঈষৎ আঘাত লাগিলেও যাহার হৃদয়-তন্ত্রী আপনি বাজিয়া উঠে, তাহারই—একমাত্র তাহারই ব্যাপক হৃদয়ে এই বিশ্বজনীন্ ভ্রাতৃপ্রেমের উদয় হয়। এই মহান ভাবকে কতকটা আত্মস্থ করিয়া ভারতবর্ষ তাহাকে আপামর সাধারণে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। বিজয়া দশমীতে শোকের লহরি তুলিয়া মা শুভযাত্রা করিলেন, সেই মাতৃস্নেহে সমস্ত হৃদয় অভিসিঞ্চিত করিয়া সহোদরকে শান্তি ও অভয় দান কবিবার জন্য সহোদরা আসিয়া তাহার কপালে বিজয় তিলক পরাই বলিল,—

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা।
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা ॥"

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার ফোঁটা কপালে পবিলে কি যমেব দুয়াবে কাঁটা পড়ে? সহোদরার স্নেহাশীষ কি রক্ষাকবচ হইয়া যমেব বিপুল প্রয়াস অনায়াসে ব্যর্থ করিয়া দেয়?—দেয়। দেয়, যদি তুমি ইহাকে হাসি খেলা মনে না করিয়া দিনান্তের আবর্জ্জনাস্তূপে অবহেলাভরে ফেলিয়া না দিয়া একটু আত্মস্থ হইয়া ইহার অর্থ চিন্তা কর। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন তুমি যে শুদ্ধ পূত স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তোমার সহোদবাকে দেখিয়া থাক, তোমাব সংসারের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর পবপারে সীমাহীন বিপুল সংসারে সেই শুভদৃষ্টি ছড়াইয়া দাও, দেখিবে পুবাতন পূতিগন্ধময় জগৎ নবীন রূপে তোমার হৃদয় স্পর্শ করিতেছে। বিশ্বজননীর সন্তান সন্ততি আমরা, কিন্তু কুকুর শৃগালের মত কি জঘন্য আচরণই না আমরা পরস্পর করিয়া থাকি। একই জননীর প্রেম-পিযূষ পানে আমবা সঞ্জীবিত, একই জননীব শ্যাম-অঙ্কে পরিবর্দ্ধিত, একই মহামায়ীর বিরাট্ খেলাঘরে ক্রীড়ারত, এ নীচতা, এ ক্ষুদ্রতা, তবে কেন—কিরূপে আসিল? আমাদের এই নিগূঢ় স্নেহসম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া কেন পরস্পরের মধ্যে বিরাট্ ব্যবধান রচিয়া কল্পনার মায়াজালে এক কাল্পনিক সম্বন্ধ সৃষ্টি করি? সুহৃজ, সবল, অনাবিল ভাব সম্পদকে নষ্ট করিয়া আপাত-

মধুর যৌন সম্বন্ধ মানব জীবনকে কত উদ্বেল, কত আবর্ত্তময়, কত আশঙ্কাপূর্ণ করিয়া তুলে, ইহার সম্প্রসারণী গতিকে কত শীর্ণ, কত পঙ্গু করিয়া ফেলে, তাহা কি তুমি জান না? জান না কি মানব। কি জ্বালাময়ী লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে কল্যাণীর দিকে আঁখিপাত করিয়া সর্ব্ব অকল্যাণে তোমার জীবন ভরিয়া দাও?

এস, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার শুভমুহূর্ত্তে সহোদরার পূতস্পর্শে, সাধনার পাবনী শক্তিতে তোমার কামদগ্ধ হৃদয় পরিশুদ্ধ কর। তারপর অনাবিল মনে নির্ম্মল আঁখি তুলিয়া জগতের নারীজাতির প্রতি দৃষ্টি-পাত কর। তখন কুমারী বালিকা হইতে ষোড়শী যুবতী, কে তোমার মনে কিরূপ ভাবতরঙ্গ তুলে সমনস্ক হইয়া একবার দেখিও।

ঐ যে সহোদর সহোদরা রস-কৌতুকের রাজ্য রচিয়া পরস্পর ক্রীড়ারত, উহাদের অন্তরেও তরুণ জাগিয়াছে, কোকিল ডাকিয়াছে, ভ্রমর গুঞ্জন করিয়াছে, কিন্তু হীন বাসনা কখনও উহাদের মনের কোণে উঁকি মারিবে না। তুমি সহোদরাপ্রতিম নারীকে ঐ দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবে? ঐ অনাবিল নিকটতম সম্বন্ধ তাহার সহিত স্থাপন করিতে পারিবে কি? যদি পার, তোমার হৃদয়ে চির-নবীন জাগিয়া রহিবে। কেশ পক্ক, চর্ম্ম লোল, আঁখি দৃষ্টিহীন হইতে পারে, কিন্তু তোমার মনের বনে ফুল চিরকাল ফুটিবে, শ্যামা চিরকাল ডাকিবে, জ্যোৎস্না চির নিশি গলিয়া পড়িবে।

এস শুচিস্নাতা সহোদরা! তোমার রক্ত রাখী আমাদের হাতে বাঁধিয়া দাও, তোমার অঞ্চলে আমাদের আঁখিলোর মুছাইয়া দাও, তোমার স্নেহবিন্দু তিলকরূপে আমাদের ভালে আঁকিয়া দাও। আমাদিগকে কোলে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বল,—

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা।
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা॥"

অবহেলা

তুমি, কোন সাজে যে এস দ্বারে
কেউ না জানে,
কোন ছলে যে ফের সবার
প্রাণে প্রাণে,
তা, কেউ না জানে।
সকল রাজার রাজা তুমি
ধন্য ধরা চরণ চুমি,
আসার কালে ভরবে নিখিল
গানে গানে,
এই ছিল মনে।

তোমার তরে আছি বসে
গেঁথে মালা,
আল্পনাতে আসন ঘেরা
অর্ঘ্য থালা,
এরি মাঝে কখন গো হায়।
পার হয়ে যে গেছ আমায়,
কাঙাল বলে চাইনি তোমার
মুখের পানে,
কোন সাজে যে এস দ্বারে
কেউ না জানে।

শ্রীরাধা

মাধুকরী

বাংলার মেয়েদের সম্বন্ধে

আজ কাল যে কোন বাংলা মাসিক খুল্‌লেই দেখ্‌তে পাই, মেয়েদের সম্বন্ধে একটা না একটা প্রবন্ধ আছে—তাও আবার বেশীর ভাগ মেয়েরাই লেখেন। আমার ত "নারী" বিষয়ক প্রবন্ধ পড়্‌তে ইচ্ছা হয় না—কি হয় লিখে? এত যে লেখা লেখি, আলোচনা, তার কোন ফল দাঁড়াচ্ছে কি? মেয়েরা এ রকম লেখালেখি করাতে, আমি এক দলকে বলতে শুনেছি "এ সব এচোঁড়ে পাকামি—দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না। লেখা পড়া শিখে মেয়ে—মর্দ্দানি কর্‌ছেন,—প্রবন্ধ লিখ্‌ছেন,—পুরুষদের টেক্কা দিতে যাচ্ছেন। আরে বাপু, তোবা যতই লাফাই—ঝাঁপাই কর্—পুরুষেব জুতোর তলায়ই তোদের আদত্ জায়গা॥"

আর একদল প্রকাশ্যে দেখান—যেন মেয়েদের পুরুষেরা মাথায় করে রেখেছেন। হাতের রুমাল পড়ে গেলে শশব্যস্তে তুলে দেন,—মেয়েদের দেখ্‌লেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান,—আরও কত রকমে মেয়েদের সম্মান দেখান। আর বাড়ী ঢুক্‌লেই, তাঁরই বিকট মুখ ভঙ্গীতে, অপরূপ ব্যবহারে, অত্যাচারে মা, বোন, স্ত্রী সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকেন। সবই সমান। কয়েকখানা "ভারতবর্ষ" পেলাম, সখ হল, মেয়েদের সম্বন্ধে লেখাগুলো পড়্‌লাম। পড়ে কয়েকটা কথা লিখ্‌বার বড় ইচ্ছে হচ্ছে—লেখক লেখিকাগণ আমার বক্তব্য বুঝে যেন আমার উপব দোষারোপ করেন। আমি অন্যায় কিছুই বলিনি।

গত বছরের শ্রাবণ মাসের ভারতবর্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী "নারীর কথা"য় নারীর উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। সমাজে নারীকে নিয়ে আজ এত রকমের সমস্যা উঠেছে যে, তাতে "নারীর উত্তরাধিকার" সমস্যার প্রথমেই মীমাংসা কর্‌বার দরকার হয় না। ন্যায়বান (!) সমাজপতিবা নারীকে বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি দিতেও যে স্থানে

বিমুখ, সেখানে নারীরা কোন্ সাহসে মহামান্য শাস্ত্রকারদের বিধান উল্টাতে চায়? শ্রদ্ধেয়া লেখিকা যা বলেছেন, সে সব কথার একটিও আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু একটা কথা আমি বলি (জানি না তাঁর সঙ্গে মতের মিল হবে কি না) যেখানে অনুরোধ-মিনতি করে, অক্ষেপ জানিয়ে, ব্যথা প্রকাশ করে কোন ফল হয়নি, সেখানে দশের কাছে সে সব শুনিয়ে কি কিছু লাভ হয়? পুরুষদের কাছ থেকে "আহা" "উহু" ছাড়া নারীরা আর কিছুই পাবে না। নারীর সমস্যা যদি নারীরা সমাধান না করে তবে আর কারুর সাধ্য নাই, করতে পাবে। নারী আগে প্রকৃত শিক্ষিত হোক। শিক্ষা মানে শুধু বি-এ, এম-এ পাশ নয়। জীবনে যখন যে কাজ করবার দরকার বা সুযোগ হবে, তাই হাসি মুখে নিপুণতার সঙ্গে করতে পাবাই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা। সন্তান-পালন (তার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধান), গৃহকর্ম্ম থেকে আরম্ভ করে বাইরের দশের কাজ সুসম্পন্ন কবতে পারাই প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া। "আমাদের অধিকার দাও" বলে পুরুষদের কাছে ভিক্ষা চাইবার কোন দরকার দেখি না। সুসন্তানের উপযুক্ত মা হও, সংসারের সুগৃহিণী হও, দেশের ও দশের কাছে আদর্শ ভগিনী হয়ে সগর্ব্বে একবার দাঁড়াও,—"অধিকার" "সম্মান" আপনি আসবে।

বাঙ্গালী-সমাজ চিবকালই পুরুষ অপেক্ষা নারীকে হেয় জ্ঞান করবে—তা নারী যতই কেন পুরুষের মত সমস্ত বিষয়ে অধিকার লাভ করুক না। নারী পিতার সম্পত্তির সমান অধিকার পেলেও করবে। মেয়েকে পিতামাতা কিছু চিবকাল নিজের কাছে রাখবেন না। তার বিয়ে দিয়ে তাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাবেন। সে দুদিনের জন্যে এসেছে, পিতৃসম্পদের উত্তরাধিকারিণী হলেও দুদিন পরেই চলে যাবে। কন্যাব উপর এই একটা "আহা" ভাবই অধিকাংশ পিতা মাতার থাকবে। পুত্র সে যে টাকা উপায় কববে, ভবিষ্যতেব আশ্রয় স্থল, তার উপর স্নেহের আকর্ষণ বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। তা সে যত কুপুত্রই হোক না কেন, স্নেহমমতার রাজ্য সে যেন একচেটিয়া করে নিয়েছে। মেয়েদের টাকা উপায় করা—সে যেন এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। লেখা পড়া শেখা,

গান বাজনা শেখা মেয়েদের এক মস্ত অপরাধের কাজ হয়ে পড়েছে। আজ "মাসিকে" "মাসিকে" "নারীর অধিকার" "স্ত্রী স্বাধীনতা" ইত্যাদি দেখে দেখে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়, প্রাণেও হাঁফ ধরে গেল। কি রে বাপু! "অধিকার দাও" বলে যে মেয়েরা চেঁচাচ্ছ—কার কাছে চেঁচাচ্ছ শুনি? যারা জেগে ঘুমোয়, তাদের ঘুম যে হাজার চেঁচালেও ভাঙ্গে না, তা কি নারীরা জানে না? যতক্ষণ তারা ঘুমোয়, ততক্ষণ নিজেদের তৈরী করে নেও না কেন? শুধু গা ছেড়ে দিয়ে চেঁচালে কোন ফল হবে না। আর চাইব কার কাছে—পুরুষের হাতের মধ্যে সব তোলা রয়েছে না কি?

"স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা" প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী স্বাধীনতা বিষয়ে মোটামুটি যা লিখেছেন, তা সংক্ষেপে এই যে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সমান শিক্ষালাভ করে চাক্‌রী করলে, ঘর সংসারের দুরবস্থা হয়, সন্তান পালন হয় না, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ঘটে ইত্যাদি এই সব কারণে তিনি মেয়েদের চাকরী করার একেবারেই বিপক্ষে। আর লেখা পড়া কি সকলেই চাক্‌রী করার উদ্দেশ্যে শেখে? স্ত্রী স্বাধীনতা বল্লে কি চাকরী করা বোঝায়? বেশ, সব বুঝ্‌লাম। তবে একটা কথা—বাংলায় বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা, পিতৃগৃহ-বিতাড়িতা ও দরিদ্রা নারীর সংখ্যা খুব বেশী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সংসারের আবর্জ্জনা হয়ে, আত্মীয়-স্বজনের বোঝা হয়ে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে, আধপেটা খেয়ে কিংবা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তারা যদি অর্থের জন্য চাক্‌রী করতে যায় (অনেকে হয়ত শিক্ষিতাও,) তাতে কি দোষ হবে আমাকে বলতে পারেন? কুটীর-শিল্প দ্বারা অর্থাগমও বেশী হয় না, কারণ, ইহার আদর আর বড় নেই। যে কয়টি শিল্পাশ্রম আছে, তাও অর্থাভাবে ও লোকের সহানুভূতির অভাবে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছে। পুরুষেরা ত আমাকে তেড়ে মেড়ে উঠ্‌বেন—কারণ, বিনা পয়সার দাসীটি যে হাত ছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েরা—তোমরা বুঝিয়ে দাও দেখি—তোমরা কি চিরকাল ঐ রকম মুখ গুঁজে অসহ্য গঞ্জনা শুনে দিন কাটাবে, না কি করবে? এ আমি বলি না যে, সকল দুর্ভাগিনীর

অবস্থা ঘটে। চোখের সাম্‌নে এ রকম যত দেখেছি, ২।১টি ছাড়া সকলেরই কপালে অসহ্য লাঞ্ছনা। যাঁরা লেখা পড়া জানেন, তাঁদের অনেককে আমি বল্‌তে শুনেছি—"বাইরে চাক্‌রী বাক্‌রী কিছু যে একটা করব, তারও উপায় নাই, বাড়ীর ও পাড়ার পুরুষেরা অমনি তেড়ে এসে বল্‌বে, আমাদের এতে মান যাবে, খবর্দ্দার আর যেন এমন কথা কখনও না শুনি।" জোর করে যায়—পাঁচ রকম কলঙ্ক অমনি তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। ব্যস্, তবে আর কি? মেয়েরা সভয়ে অমনি চুপ হয়ে গেল। যাঁরা অশিক্ষিতা (ভদ্র ঘরের মধ্যে অনেক পাওয়া যায়) তাঁরা বলেন "লেখা পড়া যদি জানতুম, তবে এ বাঁদী-গিরির হাত থেকে রক্ষে পেতুম,—চাক্‌রী ক'রে খেতুম,—ছেলে মানুষ কর্ত্তুম, ইত্যাদি।" শিক্ষাবিদ্বেষিগণ এ কথা শুনে খুবই আনন্দ পাচ্ছেন বোধ হয়।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে চাক্‌রী কর্‌তে আমিও দেখেছি। স্বামী বিদেশে চাক্‌রী কর্‌তে গেছেন। অল্প আয়ে স্বামীর বিদেশের খরচ, স্ত্রী ও তিনটি সন্তানের খরচ একেবারেই কুলোয় না। স্ত্রীকে বাধ্য হয়ে চাকরের জিম্মায় সন্তানদের রেখে চাক্‌রী কর্‌তে যেতে হয়। এতে সন্তানদের কষ্ট হলেও, চাক্‌রী না করে মায়ের উপায় নেই। মা সন্তানের কষ্ট বরং সইতে পারেন, কিন্তু তাদের অর্দ্ধাহারে শুকিয়ে মরাটা ত আর দেখ্‌তে পারেন না। ইনি উচ্চ-শিক্ষিতা বলেই চাক্‌রী কর্‌তে পারছেন; কিন্তু অশিক্ষিতা হলে ত আর পারতেন না। তবেই দেখুন, অশিক্ষিতা মায়ের ছেলেরা সে যায়গায় না খেয়ে শুকোত। "স্ত্রী শিক্ষার" নানান্ দোষ লেখিকা দেখিয়েছেন—হ্যাঁ বুঝ্‌লাম আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী বাঙ্গালী মেয়েদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। বেশ ত, যোগ্য প্রণালী কি তাই বলুন—শুধু বক্তৃতা দিলেই হয় না,—সে কাজ অনেকেই বেশ কর্‌তে পারেন। শ্রদ্ধেয়া লেখিকা যদি নিজ হাতে কয়েক জনকে শিখিয়ে দিয়ে যেতে পারেন, তবে নারীসমাজ তাঁর কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাক্‌বে।

অধ্যাপক শ্রীসত্যশরণ সিংহ মহাশয় মেয়েদের কি রকম শিক্ষা হওয়া

উচিত, তাবই একটা তালিকা দিয়েছেন (ভারতবর্ষ, পৌষ—১৩৩০)। উপায় বের হল—এখন কাজে হলেই ত বেশ হয়। উপায় ঢের হল যদি বা—এখন বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবাব লোকের অভাব হচ্ছে। নারীর অন্দরের অবস্থা সকলেই জানেন—কিন্তু স্বীকার করেন কয়জনে? বেশ, স্বীকার না হয় নাই কবলে, কিন্তু তাব প্রতিকাবের চেষ্টাও যে কেউ করে না, এইটেই যে অত্যন্ত দুঃখের কথা। কিন্তু কেউ যদি একবাব বলেন, "আহা, অধিকাংশ বাঙ্গালী মেয়েদেব মত দুরবস্থা জগতে আর কোথাও নাই" ইত্যাদি—অমনি চারদিক দিয়ে ভিড় করে শাস্ত্র আওড়ে সকলে বলে উঠবেন, "এঁ্যা সে কি, নারীদের আমরা সেই সনাতন কাল থেকে দেবী বলে আস্‌ছি,—তাঁদের আমবা লাঞ্ছনা অবজ্ঞা কবি, অসম্ভব। আমাদের দেশেব মত এমন উচ্চ আদর্শ আর কোথাও নাই। শাস্ত্রে বলেছে, নাবীর যেথানে অসম্মান, সেখানে লক্ষ্মী থাকে না। তাঁবা যে সংসারে কষ্টে অপমানে চোখেব জল ফেলেন, সে সংসার উচ্ছন্ন যায়। এ সব জেনে কি আর আমরা তাঁদেব অপমান করি?"

একবাব স্মরণ করে দেখুন ষ্টেসনের অবস্থা! প্লাটফরমে একটি মেয়ের (সুন্দরী হলেত কথাই নেই) আবির্ভাবে সমস্ত পুরুষের লালসা দীপ্ত ও কৌতূহলী চক্ষু কোন দিকে থাকে। "দেবী" কি না, তাই তার পূজা বা সম্মান স্বরূপ মেয়েদের ইহা অবশ্য প্রাপ্য। একাকিনী বা অসহায়া মেয়েকে পেলে তার কপালে যে কি থাকে, তাহা আর বলিবার কথা নয়। "দেবী" বলেই বুঝি এই সব সম্মান। এটা জান না,—বেশীর ভাগ বাঙ্গালী মেয়ের চোখের জল না ফেলে দিন যায় না। বাঙ্গালী মেয়েদের মত মনের বল, সহিষ্ণুতা খুব কম আছে। আর তাদের মত উৎপীড়িতাও বুঝি জগতে খুব কম। এই মনের বল ও সহিষ্ণুতা আছে বলেই বাংলার আজ মুখ রক্ষা; তা না হলে "জহর ব্রত" আরম্ভ কর্‌তে হত।

মহারাজা যশোবন্ত সিংহ যখন যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নিজ রাজ্যে ফিরে এসেছিলেন, তখন তার পত্নী মহামায়া বলেছিলেন "যিনি যুদ্ধে

পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এসেছেন, তিনি আমার স্বামী নন। যশোবন্ত নামধারী কোন ছদ্মবেশী এসেছে-রাজ্যে ইহার স্থান নেই। রক্ষী, প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ কর।" চমৎকার। স্ত্রীব কি সুন্দর তেজস্বিতা, আত্মমর্য্যাদা! ইহার সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়ের তুলনা করে দেখা যাক্। শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী বলেছেন, "নারীর মধ্যে যদি শক্তি থাকে, যথার্থই তিনি যদি ধার্ম্মিকা হন, যদি অন্তরের বিতৃষ্ণায় হীন সঙ্গ করিতে না পারেন, তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজ গৃহে আগত মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মহিষীর ন্যায় স্বধর্ম্মত্যাগী (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পৃষ্ঠপ্রদর্শন মহাপাতক) স্বামীর সহিত অপরিচিতবৎ ব্যবহাব করিতে পারেন ·· ·· · ······।" ইত্যাদি। "হীন সঙ্গ" করিতে অনিচ্ছুক মেয়ে বাংলায় অজস্র পাওয়া যাবে; কিন্তু তাদের সাধ্য কি স্বামীর সহিত ওরূপ "অপরিচিতবৎ" ব্যবহার করে! মনে করুন, মাতাল, চরিত্রহীন স্বামী (এত আজ ঘরে ঘরে) সমস্ত রাত প্রায় বাইরে কাটিয়ে শেষবাতে বাড়ী ফিরুছেন। তেজস্বিনী স্ত্রী দড়াম কবে বাড়ীর দবজা বন্ধ করে বল্লেন, "এ মাতাল, ব্যভিচারী লোক আমার স্বামী নয়; এ বাড়ীতে তাব স্থান নেই।" পরদিন স্বামী মহাশয় বাড়ী ঢুকে তার তেজস্বিনী স্ত্রীটিকে যখন বাড়ী থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেবেন তখন স্ত্রী দাঁড়ায় কোথা? স্বামী তাড়িয়েছে, পিতৃগৃহ, আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতেও তাব স্থান হবে না। শেষ পর্য্যন্ত তাব মান ইজ্জত রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়বে। রাগান্ধ, কামান্ধ, ও অত্যাচারী স্বামীর সম্বন্ধেও এই একই কথা। তখনকার দিনে ধর্ম্ম বলে একটা জিনিষ ছিল—আজকাল নামটা শুন্‌তে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কার্য্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। সেজন্য "তখন" ও "এখন" এর সঙ্গে কোন তুলনা হতে পারে না। সমাজ কি কেবল নারীকে নিয়ে? পুরুষ ও নারী উভয়েই যখন সমাজের অধীন, তখন পুরুষের পাপের দণ্ড কেন তারা পায় না? যত শাস্তি মেয়েদের জন্য শাস্ত্রকারগণ তৈরী করেছেন! শাস্ত্রে পুরুষের শাস্তির কথাও উল্লেখ আছে শুনেছি। অথচ তাদের বেলায় "সমাজ নেই আজকাল" (অনুরূপা দেবী) এ কি রকম কথা? মেয়েদের সমাজ আছে পুরুষদের উঠে গেল কেন? তাই বলে এ

আমি বলি না, পুরুষেরা ব্যভিচারী হলে মেয়েরাও কেন তার দাবী না করবে। মেয়েরা তা চায়ও না, তারা এ বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেনা। "পুরুষের বাইজী নিয়ে" মাতা মাতি করবার সখ হলেই যে মেয়েরাও "বাবুজি নিয়ে রাস্তায় বেরুবে" এমন কোন কথা নেই। ভয় নেই, একজন যদি ঘরে আগুন দেয়, অমনি আমাকেও যে তাই করতে হবে, এমন ধারণা করাই ভুল। নারীগণ, আজ তোমরা সকলে একমন প্রাণ হয়ে জাগ দেখি, নিজেদের সকল অপবাদ দূর করে নিজেরা শক্তিময়ী হও। হতাশ হয়ো না—অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে প্রথমে অনেক আঘাত পেতে হবে, অনেক অপবাদ সইতে হবে। সাহস কর—পিছিয়ে "জহর ব্রত" অবলম্বন করে নিজেরা আরও অন্ধকারে ডুবো না।

অবশ্য শ্রাবণের (১৩৩১) ভারতবর্ষে মনোরমা দেবী পরামর্শ দিয়েছেন "সাহস হয় ত ঘোর প্রতিবাদ কর, নয়ত জহর ব্রতের পুনরভিনয় করা যাক, তা হলে যদি পুরুষদের চৈতন্য হয়।" মর, মর, পুড়ে মর, গলায় দড়ি দিয়ে মর, জলে ডুবে মর, বিষ খেয়ে মর, তেতালা থেকে পড়ে মর কিছুতে কিছু হবে না। পুরুষদের চৈতন্য নারীরা মরলে হবে না। মেয়েরা তোমরা প্রতিবাদ কর, আত্মরক্ষা করতে শেখ, শুদ্ধ থেকে পুরুষদের মিথ্যা অপবাদ দুর্নামকে অগ্রাহ্য করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াও—তা হলে যদি পুরুষদের চৈতন্য হয়!

"সত্য যেটা ধরবে জোরে, প্রাপ্য যেটা কাড়বে তা,
অপমানের বইলে বোঝা, ক্রমাগতই বাড়বে তা।
আত্ম-অবিশ্বাস ভোল গো, কুণ্ঠা, ভীতি, লজ্জাভার,
সব সঙ্কোচ সরিয়ে দূরে, বেরিয়ে দাঁড়াও একটিবার।"

ভারতবর্ষ, শ্রাবণ।
১৩৩২। শ্রী"দরদী"

২। যক্ষ্মা

অধিকাংশ লোকের ধারণা যে যক্ষ্মা একবার ধরিলে রোগীর জীবনের আশা ত্যাগ করা উচিত। আমরা জানি যক্ষ্মা ব্যাধি খুব শীঘ্র সারে এবং অধিকাংশ সময় আপনি সারিয়া থাকে। অনেক শব ব্যবচ্ছেদে (Post mortem) দেখা যায় যে প্রায় অর্দ্ধেকের উপর লোকের Tuberculosis হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে তিন অংশের দুই অংশ ফুসফুসেরই। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যক্ষ্মা হইয়াছিল ও সারিয়া গিয়াছে কিন্তু রোগী মোটেই হয়ত জানে না যে তাহার যক্ষ্মা বা সেই-রূপ রোগ কখনও হইয়াছিল। আপনাদের আমি কতকগুলি জ্ঞানী লোকের মত দিতেছি—

Bonchard বলেন, "বেশীর ভাগ যক্ষ্মা রোগীই এ রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করে।"

Dr Neol Guenea-de-Mussy বলেন, "আমি এমন অনেক রোগী জানি যাহাদের আমি নিজে বা আমার অপেক্ষা বিজ্ঞ চিকিৎ-সকেরাও Cavity পাইয়াছি ১০, ১৫ বা ২০ বৎসর আগে অথচ তাহারা এখনও বেশ সুস্থ শরীরে আছে।"

Cohnheim বলেন, "Tuberculosisএর চিকিৎসা মানুষের শরীরে ভালই হইতে পারে।"

আমার মতে যক্ষ্মার ঔষধাদির অপেক্ষা Sanitarium চিকিৎসাই উত্তম ও অব্যর্থ ফলপ্রদ। এইরূপ স্বাস্থ্যনিবাসে (Sanitarium) রোগী সদাসর্ব্বদা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া নিয়মিতরূপ খাদ্য ব্যবহার, ব্যায়াম ইত্যাদি করিতে পারে—অন্যান্য রোগীদের ক্রমশঃ আরোগ্য হইতে দেখিয়া তাঁহাদের মনে উৎসাহ হয় ও তাঁহাদের ব্যবস্থা-গুলিতে যেরূপ উপকার পায় তাহা নিজ চক্ষে দেখিয়া ও শুনিয়া ঐরূপ চিকিৎসার উপর ক্রমে তাহার আস্থা হইয়া যায় ও মনে প্রফুল্লতা ও উৎসাহ আসে।

অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীরও খোলা বা জলো বা ঠাণ্ডা হাওয়াতে সর্দ্দি

হয় না যদি সর্ব্বদা তাহাকে খোলা হাওয়ায় রাখা যায়। যদি রোগীকে উপযুক্ত খাদ্য ও কাপড় দেওয়া যায় ও দম্‌কা বাতাস না লাগান হয়, কখনই ক্ষতি হইতে পারে না।

অনেক স্থলেই ক্ষুধা মন্দতাই যক্ষ্মার প্রথম লক্ষণ বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। সকল বিশেষজ্ঞদেরই মত এই যে, যক্ষ্মা রোগীকে যে শুধু উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা তাহার শরীরের আগেকার বল ও ওজনই ফেরৎ পাইলে চলিবে তাহা নহে বরং তাহাকে আরো মোটা হইতে হইবে। শরীরের ওজন বৃদ্ধি হওয়া চাই; শরীরে fat হওয়া চাই ইহাতে শুধু যে রোগই সারিবে তাহাই নহে—আবার পুনরাক্রমণ হইবার আশঙ্কাও কমিবে। খাদ্য অনেক প্রকারের রুচিকর ও সুপাচ্য হওয়া প্রয়োজনীয়।

রোগীকে বহুপরিমাণ খাওয়ান Sanitarium treatment প্রথার অংশ। তাহার ক্ষুধা না থাকিলেও খাওয়াইতে হইবে, যাহাতে সে মোটা হইতে পারে।

যক্ষ্মা রোগীদের ঘৃত জাতীয় খাদ্যতেই বেশী উপকার দেখিতে পাওয়া যায়—জ্বরের অবস্থাতেও তাহারা ঘৃত ও Nitrogen হজমের ক্ষমতা খুব অধিক রাখে—তাহাদের ক্ষুধা না থাকিলেও যে ঐ সব পদার্থ হজম করিবার অসাধারণ ক্ষমতা রাখে তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।

জ্বরের সময় বিশ্রাম অতি প্রয়োজনীয়, যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে জ্বর একটু দেখা দিলে বা অনুভব করিলে তাহাদের সর্ব্বপ্রকারে বিশ্রাম অবশ্য কর্ত্তব্য। মানসিক উত্তেজনাতেও তাপ বাড়িয়া যাইতে দেখা গিয়াছে —যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে বিশ্রাম যে একটি প্রধান কর্ত্তব্য তাহা মনে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক।

সকলেরই জানা আছে যে শরীরকে ঠিক রাখিতে হইলে ইহাকে কাজ করান চাই, ব্যায়ামের দ্বারা শরীরের সকল যন্ত্রগুলিকেই ভাল রাখা যায়। ব্যায়ামে শরীরের বিষ অবসাদগুলিকে দূর করে ও স্নায়ু পুষ্ট করে। নিয়মিত ব্যায়াম করা সকলেরই উচিত; যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে ইহা অন্যতম কর্ত্তব্য। যক্ষ্মা রোগীর ব্যায়াম অতি সাবধানতার সহিত

করা উচিত। অনেকে ব্যায়াম অধিক পরিমাণ করিয়া অতিশয় ক্ষতি-গ্রস্থ হয়। জ্বরের অবস্থায় সাধারণতঃ কোনওরূপ ব্যায়াম করা উচিত নয়। প্রথম প্রথম সামান্য ২।৪ মিনিট বেড়ান, পরে যদি উহা সহ্য হয় আস্তে আস্তে ব্যায়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি করা বিধেয়, কখনও ব্যায়াম করিতে করিতে হাফাঁইয়া যাওয়া উচিত নয়; অধিক ব্যায়ামের পরিণাম এ রোগে অতি ভীষণ। অনেকের মতে পাহাড়ে উঠাতে Heart ও Lungs উভয়েরই উপকার হয়। যক্ষ্মা রোগীর সর্ব্বদাই তাহার চিকিৎসকের উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করা উচিত। সেইজন্য যক্ষ্মার স্বাস্থ্য নিবাসে চিকিৎসা করান সর্ব্ব রকমে উত্তম ও ফলপ্রদ।

(স্বাস্থ্য) ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, এম, বি।

গুরু

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা অজ্ঞান তিমিরান্ধের চক্ষু উন্মীলিত করেন সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

যিনি জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান দূর করিতে সমর্থ এমন ব্যক্তিই যে গুরু এ শ্লোকে তাহাই বুঝাইতেছে।

গুরু শব্দে বড়কে বুঝায়। কেমন বড়? না যিনি অজ্ঞান দূরীকরণে সমর্থ। গুরু গুরুই—লঘু অর্থাৎ ছোট নহেন। মানব জীবনের লক্ষ্য ব্রহ্মলাভ। ব্রহ্মকে আমরা বাহির হইতে লাভ করি না, আমাদের মধ্যে যে ব্রহ্ম অজ্ঞান আবরণ হেতু ছোট হইয়া আছেন অজ্ঞানাবরণ অপসরণ

দ্বারা সেই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করা আমাদের চরম গতি ও পরম সাধনা। যতদিন মানব ব্রহ্মকে—বৃহত্তমকে লাভ না করিতেছে ততদিন তাহার ক্ষুদ্রত্ব সংকীর্ণতা দূর হইতেছে না; তদ্ধেতু তাহার দুঃখও যাইতেছে না। মুক্তি অর্থে এই ক্ষুদ্রত্ব নাশ। একখণ্ড লৌহকে চুম্বকে পরিণত করিতে হইলে তাহাকে অপর চুম্বকের দ্বারা ঘর্ষণ করিতে হয় বা কোন চৌম্বক শক্তির প্রভাব তাহার উপর আনিতে হয়। চৌম্বক শক্তি লৌহের মধ্যে সুপ্তভাবে নিহিত থাকে, অপর চুম্বকের শক্তি সাহচর্য্যে তাহার সুপ্ত অপ্রকাশিত শক্তি প্রকটিত হয়। মানুষও লৌহবৎ। ব্রহ্মজ্ঞের শক্তি প্রভাবে ও তদাদর্শে জীবনগঠন দ্বারা সে ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান, জৈন প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্র একমত। ব্রহ্মকে—বৃহত্তমকে যিনি লাভ করিতে সমর্থ হন তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ও গুরু। তিনি তখন শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ বেদবিৎ অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা।

মানুষ কতকগুলি ভাবের সমষ্টিমাত্র। স্থূল শরীর তাহার সূক্ষ্ম মনের বহিঃপ্রকাশ। একই শক্তির সূক্ষ্ম দিকটা মন এবং স্থূলটা শরীর। মানুষে মানুষে পার্থক্য, তাহাও তাহার চিন্তারাশি ও মানসিক ভাবরাশির দ্বারা সূচিত ও সংঘটিত হয়। মানুষের চিন্তারাশির, ভাবপুঞ্জের পরিবর্ত্তন জন্য পরিবর্ত্তনোপযোগী চিন্তা এবং ভাবযুক্ত ব্যক্তির শিক্ষা ও প্রভাব একান্ত প্রয়োজনীয়।

জাগতিক প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তৎ তৎ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের নিকট উপদেশ লইতে হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণা করিবে তাহার পক্ষে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। রসায়ন জ্ঞান সম্বন্ধে রসায়নবিদের উপদেশ অবশ্য প্রতিপাল্য—তৎ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে উহার আলোচনা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। রসায়ন শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞের প্রতি যতই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করি না কেন, রসায়ন সম্বন্ধে তিনি কোন উপদেশই দিতে পারগ নহেন। আবার দেখা যায়, আমাদের কোন বিষয়ের ধারণা সেই সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের লব্ধ জ্ঞানের ছায়া মাত্র। অধ্যাত্ম বিষয় সম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যগণ যাহা

বলিয়াছেন তাহারই ছায়া মাত্র আমরা আবৃত্তি করিয়া থাকি। যদি জগতে ব্রহ্মজ্ঞ না থাকিতেন তবে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি বিষয়ে কেহ কিছু বলিতে পারিতেন না বা জানিতেন না। অধ্যাত্ম বিদ্যার জন্য যে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন নাই এরূপ ধারণা অন্ধ সংস্কার বা আত্মম্ভরিতা মূলক।

কেহ কেহ বলেন, ইউক্লিডের জ্যামিতি শিখিতে হইলে ইউক্লিডের কোন প্রয়োজন নাই, তিনি জ্যামিতিতে যাহা বলিয়াছেন তাহা জানিলেই যথেষ্ট। অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। জ্যামিতি, অঙ্কশাস্ত্র, শিল্পাদি বিদ্যা লাভ করিতে হইলে সে সব বিদ্যার সহিত দ্রষ্টার জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। যাহা বুদ্ধিবৃত্তি প্রসূত বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে সে সব বিষয়ের নীতিগুলি বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট। শুধু এখানে বুদ্ধিবৃত্তির অনুসরণ প্রয়োজনীয়। কিন্তু অধ্যাত্ম বিদ্যার অর্জ্জন বিষয়ে সত্যদ্রষ্টার স্বভাব, চরিত্র, সাধনা ও স্থূল আদর্শ অতীব প্রয়োজনীয়। জীবন গঠন বিষয়ে জীবন প্রয়োজন। এখানে সত্যদ্রষ্টার জীবনই প্রকৃত আদর্শ যাহা আমাদিগকে প্রতি পদে পদে সাহায্যকল্পে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। আদর্শের অনুসরণ দ্বারা যেমন জীবন গঠন সহজ abstract truth নিরবলম্ব সত্যকে অনুসরণ দ্বারা জীবন গঠন তেমন সহজ নহে। মানুষের মন এমন ভাবেই গঠিত যে abstract truthকে গ্রহণ করা তাহার পক্ষে বড় কঠিন। চিরকাল স্থূল চিন্তায় স্থূল সংসর্গে গঠিত বর্দ্ধিত হঠাৎ তাহার নিকট সূক্ষ্ম নিরবলম্ব সত্য আদর্শরূপে ধরিলে সে বড় উপায়হীন হইয়া পড়ে। তাহার মন চায় এমন একটি আদর্শকে যাহাকে সম্মুখে রাখিয়া যাহার অনুকরণ, অনুসরণ করিয়া সে জীবন গঠন করিতে পাবে। তদ্ব্যতীত সে নিরবলম্ব ভাবে চলিয়া পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া সত্য লাভ করিতে অসমর্থ। সে চাহে এমন একজন ব্যক্তিকে যিনি ভালবাসিবেন, পদে পদে সাহস দিবেন, যাঁহাকে সে ভালবাসিবে পদে পদে তাঁহার নিকট সাহস, সাহায্য পাইবে, যিনি অন্ধকারে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। তাই দেখিতেছি ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞ নেতার প্রয়োজন। ব্রহ্মজ্ঞের পূজা ব্যতীত যদি

আমরা আমাদের স্ব স্ব ইচ্ছা দ্বারা চালিত হই তবে আমরা আমাদের কামাদি কলুষিত আদর্শকেই অনুসরণ ও পূজা করিব। আবার শাস্ত্রে বলে, যাহার যেমন ভাবনা তাহার তেমন সিদ্ধি। মানব মন যেমন সংসর্গ লাভ করে অজ্ঞাতসারে সেই সংসর্গজ স্বভাব তাহার মনে সঞ্চারিত হয়। দোষ বা গুণ সংসর্গজ। গুরু বা গুরুর মনই শিষ্যের মনকে তদনুযায়ী করিয়া গড়িয়া তুলে তাই কথিত হয় শিষ্য গুরুর মানসপুত্র। সাধক কবি বলিয়াছেন, "সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ। কয়লাকো ময়লা ছোড়ে যব আগ করে পরবেশ।" স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন. "গুরু কি জানিস যে অজ্ঞানটা দূর করে দেয়। জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেয়, তা যে না পারে সে আবার গুরু কিরে? এক অন্ধ কি আর এক অন্ধকে রাস্তা দেখাতে পারে?" এ বাণীর মধ্যে গুরু সম্বন্ধে অনেক গূঢ় কথা নিহিত।

অতএব সত্য লাভেচ্ছুকের সত্যদ্রষ্টার শরণ লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা দেখিতে পাই সত্যদ্রষ্টার সংসর্গে যেমন জীবন গড়িয়া উঠে এমন অন্যরূপে ঘটে না। আধ্যাত্মিক সত্য বা বেদ চিরকালই বর্ত্তমান, শুধু আদর্শ অভাবে সত্যলাভ সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই-রূপে ক্রমশঃ অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে। তখন সামাজিক জীবনের এই অধঃপতনের প্রতিক্রিয়ারূপে বিশেষ বিশেষ লোককে অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকট হয়। সেই সেই ব্যক্তি নিজ জীবনকে সত্যের প্রকট মূর্ত্তিরূপে আদর্শ হেতু সমাজ সম্মুখে স্থাপন করেন। এরূপ আদর্শকে ত্যাগ করাও যাহা, আর জগতের আবিষ্কৃত জ্ঞানরাশিকে অস্বীকার করাও তাহা। জীবন্ত আদর্শকে অবলম্বন করিয়া সত্যলাভ করা যেমন সহজ, এমন আর কিছু নহে। সত্যদ্রষ্টার শরণ লইলে অতি সহজেই লক্ষ্য লাভ সম্ভব হয়। আমরা ভাবকে উপাসনা করি, চিন্তা করি, অবি-রত চিন্তার ফলে মন সেই আকারে আকারিত হইয়া ক্রমে তদবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকে শুধু গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইবে না, তাঁহার দ্বারা চালিত হওয়া চাই। ব্রহ্মে আত্ম-সমর্পণের পূর্ব্বে গুরুর দৃষ্ট সত্য অবলম্বন করিতে হইবে। সেই সত্যের

নিকট আত্মসমর্পণই ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ। অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞান লাভার্থীর তদ্‌বিষয়ে অভিজ্ঞের সাহায্য ও নির্দ্দেশ অবশ্য আবশ্যক। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, গুরুর অনুসরণ দ্বারা কি ব্যক্তিত্ব নষ্ট করিতে হইবে বা নষ্ট হইয়া যায়? ব্যক্তিত্ব অর্থে যদি আমাদের higher self বড়-আমি গ্রহণ করি তবে সত্যদ্রষ্টার অনুসরণে তাহা নষ্ট হয় না বরং তাহার লাভ বা উন্মেষ ঘটে। সকলের মধ্যে আত্মা আছেন। যাঁহার মধ্যে আত্মা স্ব-মহিমায় প্রকটিত হয়েন তিনি সত্যদ্রষ্টা ও গুরু, তিনিই ব্রহ্মবিৎ। তাঁহার মধ্যে আমারই higher self বড়-আমি প্রকাশিত। এমন গুরুর সাহায্য ব্যতীত আমার lower self ছোট-আমির নাশ দ্বারা বড়-আমির প্রকাশ অসম্ভব। এরূপ গুরুকে বরণ করা মানে, বড়-আমি-কে বরণ করা। মানুষের মধ্যে অনন্তে পৌঁছিবার যে আকুলিত আকাঙ্ক্ষা আছে অনন্ত আত্মসাক্ষাৎকারী অনন্তে বিচরণশীল গুরুর দ্বারা সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সম্ভব। অতএব এরূপ গুরুর নেতৃত্বে চালিত হওয়ায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়, প্রকৃত ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে। গুরু শরীর হিসাবে স্থূল ও সসীম কিন্তু মন হিসাবে তিনি অনন্তচারী। দেহ হিসাবে আমাদের মত হওয়াতে তাঁহাকে ধরা, তাঁহার সাহায্য লওয়া, তাঁহার জীবনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে বড় সুবিধাজনক। স্থূল গুরুকে ধরিয়া সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে ধরিতে পারি। অর্থাৎ সসীম হইতে অসীমে যাইতে সমর্থ হই। ইহা নিন্দনীয় নহে। যদি চরম সত্য লাভের দিকে অগ্রগমনের সুবিধা হয় তবে তাহা মঙ্গলজনক ও অবলম্বনীয়। কিন্তু স্থূলে আবদ্ধ থাকা, স্থূলকে চরম লক্ষ্য করা বা স্থূলের ভোগের জন্য, স্থূলের সেবার জন্য যে স্থূলভাব গ্রহণ বা স্থূলের পূজা তাহা পৌত্তলিকতা। দেহের সুখ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর যে কোন ভাব, চিন্তা বা কার্য্যকে যত বড় বিশেষণে বিশেষিত করি না কেন তাহা নিরয়মুখী। অতএব গুরুবাদ আমাদের জীবনের অভিব্যক্তির পথে অপরিত্যজ্য। প্রকৃত গুরু হারাইয়া আজ সমাজ, জাতি বিপর্য্যস্ত। লঘুকে গুরুত্বে বরণ করিয়া মানুষ ভগবানের সিংহাসনে সয়তানকে পূজা করিতেছে। সদ্‌গুরুকে লাভ দ্বারা অমৃতত্ব লাভই ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের চরম

পরিণতি। এ পথ ত্যাগ করিয়া শান্তির জন্য, কল্যাণের জন্য যতই চেষ্টা কর না কেন তাহা তোমার সদিচ্ছা প্রণোদিত হইতে পারে কিন্তু তাহা কল্যাণপ্রসূ হইবে না। সদ্‌গুরুর একমাত্র লক্ষ্য জগতের কল্যাণ। নিঃস্বার্থভাবে পরার্থসাধনে তিনি উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তাঁহার প্রতি কার্য্য, প্রতি চিন্তা প্রতি পদক্ষেপ পবিত্রতাময়। যাঁহাকে চাই তিনি মঙ্গলময়, তিনি পবিত্রতাময় সত্যস্বরূপ। অতএব তাঁহার পন্থা পবিত্রতার, মঙ্গলের মধ্য দিয়াই হইবে। যেখানে স্বার্থ মাথা খাড়া করিয়া উঠিবে, জানিবে সেখানে সয়তান প্রবেশ করিয়াছে। ভারতে বহুদিন হইতে প্রকৃত সদ্‌গুরুর অভাব। তাই দেখিতে পাই ব্যষ্টি জীবন স্থান বিশেষে উন্নত হইলেও সমষ্টি জীবনকে মঙ্গলের দিকে লইয়া যাইবার সামর্থ্য ও বিভিন্ন প্রকৃতির মানব মনকে সত্যের পথে চালিত করিবার শক্তি তাহার উদ্গত হয় নাই। তাই কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি ধর্ম্মের বিভিন্ন অঙ্গের বিরোধ জন্মিয়াছে, তাই দেখিতে পাই জাতির শরীর ও মনে রোগ, দারিদ্র্য ও প্রীতিশূন্যতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। মানুষ মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন উন্মেষের পরিপন্থী হইয়া ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম সমর্থনের কত উৎকট চেষ্টা ও তাহাতে আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছে। সদ্‌গুরু মঙ্গলের দিকে, সত্যের দিকে লইয়া যান তাহাতে গড়িয়া উঠে এমন সভ্যতা যাহাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিদূরিত হয়। তিনি জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প-কলা, বাণিজ্য ইত্যাদি সকল প্রকার বিদ্যা দান করিবেন। তিনি দেহ, মন ও আত্মাকে সকল রকম উন্নতির পথে চালিত করিবেন, জীবনের সম্পূর্ণতা দান করিবেন। তিনি শূদ্রশক্তি, বৈশ্যসম্পদ, ক্ষাত্রতেজ ও ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের নব উন্মেষ সাধন করিবেন। সদ্‌গুরু নির্দ্দেশিত পথে যাইয়া মানুষ অনন্ত শক্তির উৎস তাহার নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে। সে শক্তি যে দিকে প্রযুক্ত হইবে সেই দিকেই মঙ্গল ও শান্তি আনিবে। হে জগতবাসী, এ হেন সদ্‌গুরুর কৃপায় নিজ ভাণ্ডারস্থ অনন্ত কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানবল, প্রেমসম্পদ লাভ করিয়া নিজ জীবন,

সমাজ ও জগতের কল্যাণ সাধন কর; তাঁহার আশ্রয়ে সকল প্রশ্নের সমাধান সাধিত হইবে। মনে রাখিও যতদিন সে অনন্ত জীবনী শক্তির উৎস লাভ না করিতেছ ততদিন নিস্তার নাই, ততদিন দুঃখ যাতনা অঙ্গের ভূষণ। অতএব হে মানব, যদি নিজের, দেশের, সমাজের ও জগতের কল্যাণ চাও তবে সত্যদ্রষ্টাকে অনুসন্ধান কর, তাঁহার শরণ লও।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত॥

উঠ জাগো, সদ্গুরুর বর লাভ করিয়া নিবোধিত হও।

শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ*

১৯১৫ ডিসেম্বর মাস, রাত্রি ৮।৯টা হইবে। গঙ্গার সম্মুখস্থ নীচে বাহিরের বারাণ্ডায় বড় বেঞ্চের উপর পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বসিয়া আছেন। সম্মুখে ও পাশে ছোট বেঞ্চের উপর মঠের কতকগুলি সাধু ও কয়েকটি গৃহস্থভক্ত উপবিষ্ট। আজ রাত্রে মহারাজ উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া বসিয়াছেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—সাধারণ মানুষের মন তো সদাই নীচের দিকে, কাম-কাঞ্চনের দিকে, নাম-যশের দিকে ছুটছে, সেটাকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। মনের প্রবাহ সদা ভগবদভিমুখী কর্ত্তে হবে। ঠাকুরের মন সদাই তুরীয় ভূমিতে থাকতো, জোর করে জগতের দিকে মন নিয়ে আসতে হতো। পঞ্চবটীতে যখন সাধন করতেন সদাই তাঁর মন সেই ভূমিতে থাকতো। যখনই একটু নীচে নামতো, অমনি যে তাঁর কাছে

* জনৈক ব্রহ্মচারীর ডাইরী হইতে।

থাকতো এক গরোস্ ভাত তাঁর মুখে গুঁজে দিতো, এইরূপে সমস্ত দিনে হয় তো ৭।৮ গরোস্ ভাত কেউ জোর করে খাইয়ে দিতো।

সদাই তাঁর স্মরণ মনন করবে। স্মরণ মনন সদা সর্ব্বক্ষণ অভ্যাস হলে, তখন ধ্যান করতে বসলেই জমে যায়। ধ্যান যতই জমবে ততই ভিতরে আনন্দ, তখন কাম-কাঞ্চন ঠিক ঠিক আলুণি বোধ হবে। সেই জন্যই বাজে চিন্তা, বাজে কথা একেবারে ত্যাগ করতে হবে। বাজে চিন্তায় শক্তিক্ষয় হয়। উপনিষদে আছে, "অন্যা বাচা বিমুঞ্চথ।" কেবল আত্মধ্যান কর এই হচ্ছে মোক্ষের উপায়। রামপ্রসাদ বলেছিলেন, "শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।" গীতাও বলছেন, "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।" এই হচ্ছে ভগবান লাভের উপায়। ঠাকুর বলতেন, "মনের বাজে খরচ করতে নাই।" অর্থাৎ সদাই তাঁর স্মরণ মনন কর। সংসারী লোক টাকা পয়সার বাজে খরচ যাতে না হয় তার জন্য কত হিসাব করে, কিন্তু মনের যে কত বাজে খরচ কচ্চে তার দিকে হুঁস নেই। সকলেই তাঁর উপদেশামৃত পানে বিভোর। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—

সমাধি দুই রকম—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। সবিকল্পে রূপ দর্শন হয়, নির্ব্বিকল্পে রূপ টুপ নেই। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, দেহ টেহ সব ভুল হয়। সত্ত্ব রজ ও তমোগুণী লোক যে যে ভাব আশ্রয় করে সে সেই ভাবের রূপ দর্শন করে। কাশীপুরের বাগানে স্বামিজীর নির্ব্বিকল্প ধ্যান হয়, তিনি ও-সব খুব চেপে রাখতে পারতেন। আর একরকম সমাধি আছে—আনন্দ-সমাধি, তাতে এত প্রেমানন্দ ভোগ করে, যে এই শরীরে আর সেটা রাখতে না পেরে তার ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যায়। এ সব ব্যবসা না করে, লোকে কি সব তুচ্ছ ব্যবসায় রত থাকে। ভগবানই আমাদের "আপনার" লোক এইটিই বেশ করে realise করতে হবে।

আমি একদিন দুপুরে পঞ্চবটীতে ধ্যান কচ্ছি, এমন সময় পরমহংসদেব "শব্দব্রহ্ম" এই সব কি বিচার করছিলেন। এই সব বিচার শুনতে শুনতে দেখি, সেই সব গাছের পাখিগুলো পর্য্যন্ত বেদে যে সব গান রয়েছে, সেই সব গান করছে, যেন শুনলুম।

ঠাকুর একদিন বল্লেন, "কালীঘরে ধ্যান করছি যেন একটা একটা করে চিক উঠে যেতে লাগলো — মায়ার, অজ্ঞানের পর্দা। একদিন মা আমায় দেখালেন যে কোটী সূর্য্যের জ্যোতিঃ সামনে — সেই জ্যোতিঃ থেকে আবার একটা চিন্ময় রূপ দেখলুম। আবার খানিক পরে সেটা জ্যোতিতে মিশিয়ে গেল। এইরূপে মা আমায় সাকার নিরাকার বুঝিয়ে দিলেন। নিরাকার কেমন সাকার হলো, আবার সাকার নিরাকার।"

দেহই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। সেইজন্য ধ্যান ট্যান সব শরীরের ভিতর করতে বলে। সহস্রারে মন গেলে আর নাবতে চায় না। যা আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে। "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" এর মানে হচ্ছে, হৃদয়ের ভিতর সেই পুরুষকে দেখলে আর জন্ম হয় না। নিম্ন অধিকারীর জন্য রথ, মন্দির প্রভৃতির সৃষ্টি। রামপ্রসাদ যখন হৃদয়ে তাঁকে দর্শন করলেন তখনই গান বানিয়ে ফেল্লেন, "তুমি মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে যায় চুরি।" উঃ। কি ভয়ানক কথা বল দিকিনি? বাস্তবিক, সেই আস্বাদ পেলে আর অন্য কিছু কি ভাল লাগে?

ঠাকুর বলতেন, "দুই ভ্রূর মাঝখানে জ্ঞাননেত্র আছে। সেটা ফুটলে চারদিকে আনন্দময় দেখায়।"

একদিন কালিপদ ঘোষ কালীমন্দিরে ঢুকে মাকে খুব গালাগাল আরম্ভ করলে, খানিক পরে তার বুকটা লাল হয়ে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। ঠাকুর গালাগাল শুনে কালীঘর থেকে নেমে এসে বল্লেন, "আমাদের মাতৃভাব ও ভাব বড় শক্ত। আপনার লোকের উপরই অভিমান চলে।"

রাজার ৭ দেউড়ি বাড়ী। নায়েবের কাছে কোনও গরিব প্রজা এসে রাজার দর্শন প্রার্থনা করলে। নায়েব কৃপা করে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে লাগলেন। এক এক দেউড়িতে যায়, আর জিজ্ঞাসা করে, এই কি রাজা? উত্তর হয়—না। এই রকম করে ৭ম দেউড়িতে যখন প্রবেশ করে রাজার সেই অপরূপ রূপ দেখে আর জিজ্ঞাসা করে না, চুপ হয়ে যায়। শ্রীগুরুও সেইরূপ শিষ্যকে এক এক দেউড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে ভগবানে মিলিয়ে দেন।

নিজের মনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গুরু। দেখবে, যখন ধ্যান করে মন স্থির হয়,সেই মন তোমাকে পর পর যা করতে হবে বলে দেবে। এমন কি দৈনিক কার্য্যও এব পর এটা, তাব পর সেটা, বলে দিয়ে ঠিক তোমার হাত ধরে নিয়ে যাবে। ভগবানে অনুরাগ চাই, ভালবাসা চাই, তবে মন স্থির হবে।

শীতকাল, ডিসেম্বর মাস, ইং ১৯১৫ সাল, বড় দিনেব কয়েক দিন পূর্ব্বে। মঠে এখন শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ, খোকা মহারাজ ও অন্যান্য সাধু ব্রহ্মচাবী অনেকেহ থাকেন। আজকাল মহারাজ নিয়ম করিয়াছেন রাত্রি ৪টার সময় সকলে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ৪৷৷৹ টার মধ্যে সকল সাধু ব্রহ্মচারীকে ধ্যান জপে বসিতে হইবে। কেহ ঠাকুর ঘরে, কেহ বা উপরে শ্রীশ্রীমহারাজের ঘরে বা তাঁহার ঘরের সম্মুখস্থ গঙ্গার দিকের বারাণ্ডায় ধ্যান জপ কবেন। মহারাজের একজন সেবকের উপর ৪টা বাজিবার ১০ মিনিট পূর্ব্বে সকলকে জাগাইবার জন্য ঘণ্টা বাজাইবাব ভার আছে। শ্রীশ্রীমহাবাজ কোনও দিন তিনটায় কোনও দিন পোনে তিনটায় উঠেন। তাঁহার নিদ্রা খুব অল্প। ২ ঘণ্টা ২৷৷৹ ঘণ্টা ধ্যান জপান্তে, প্রাতে প্রায় ৭টা হইতে শ্রীশ্রীমহারাজের ঘরে প্রত্যহ সকলে একত্রিত হইয়া ১ ঘণ্টা ১৷৷৹ ঘণ্টা ভজন গান করেন।

আজ মহারাজের উপবের ঘরে ভজনান্তে এক ঘর লোক। মঠের অনেক সাধু ব্রহ্মচারী ও কয়েকটি গৃহস্থ ভক্তও উপস্থিত। ভজনান্তে মহারাজ সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সে উপদেশ নহে, আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার। প্রত্যেকের মনকে ৫।৬ ধাপ উর্দ্ধে তুলিয়া দিলেন। উপদেশ শ্রবণান্তে প্রত্যেকেই দ্বিতল হইতে নীচে নামিয়া শ্রীশ্রীমহারাজের অদ্যকার অলৌকিক শক্তি অনুভব করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে তাহাদের মধ্যে অনেকেই মহারাজের এরূপ শক্তির বিকাশ তাহার পূর্ব্বে কখনও অনুভব করে নাই। এমন কি অন্য কোনও মহারাজগণের ভিতরও এরূপ শক্তির বিকাশ তাহারা কখনও দেখে নাই। জনৈক ব্রহ্মচারী কিছুদিন হইতে মঠের diary (কড়চা) লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনিও অদ্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারও মন এত

ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছিল যে চেষ্টা করিয়াও ভাষার দিকে আর মন রাখিতে পারেন নাই। যাহা সামান্য কিছু তিনি লিখিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মহারাজ—ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তা মনকে দমন করতে হবে। আবার মন বুদ্ধি উভয়কেই আত্মাতে লয় করতে হবে। মনকে একদম না মেরে ফেল্লে চলবে না। সাধু-সঙ্গে এখন ইন্দ্রিয়গুলো চুপ মেরে আছে, মনে করো না ওগুলো আর নেই। সমাধি না হলে ওসব যায় না। একটু ছেড়ে দাও দেখবে, দ্বিগুণ জোরে ইন্দ্রিয়গুলো ছোবল মারবে। সেইজন্য খুব সাবধা[illegible] থাকা প্রয়োজন, যতক্ষণ না মন বুদ্ধির পারে যাচ্ছ।

ভগবান আছেন, ধর্ম্ম আছে, এ সব কথার কথা বা morality (চরিত্র) রক্ষার জন্য নয়। সত্যই তিনি আছেন, তিনি প্রত্যক্ষের বিষয়, উপলব্ধির বিষয়। তাঁর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। fanaticism (পাগলামী) ভাল নয়। ধীর স্থির সংযমী হতে হবে—যখন এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন, সকলের ভিতর যেন একটা তড়িৎ শক্তি বহিয়া গেল।

চারবার ধ্যান করবি,—সকালে, স্নানের পর, সন্ধ্যায় ও মধ্যরাত্রে। ভগবান লাভের জন্য ঘর দোর ছেড়ে এসেছিস, তাঁকে পাবার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে প্রাণপণ চেষ্টা চাই। পাগলা কুকুরের মতন ভগবান লাভের জন্য 'হন্যে' হতে হবে। চারটি ডাল ভাত খেয়ে মঠে শুধু পড়ে থাকা most miserable life (অত্যন্ত হীন জীবন) না হলো ওদিক না হবে এদিক, একুল ওকুল দুকুল যাবে। ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ হবে। মন যদি তাতে বসতে না চায়, অভ্যাস রাখতে হবে। রোজ এক অধ্যায় করে গীতা পাঠ দরকার। আমি নিজে দেখেছি মন যখন নীচে নামে, একটু গীতা পাঠ করলে সেগুলো একেবারে ঝেঁটিয়ে সাফ্ করে দেয়। চাট্টি ডাল ভাত খেয়ে পড়ে থাকা—"ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ।"

প্রত্যহ মনকে খোঁচাতে হবে। কি করতে এসেছি, কি করে দিনটা গেল? বাস্তবিক কি ভগবানকে আমরা চাই? চাই যদি তো কচ্ছি কি? বুকে হাত দিয়ে সত্য করে বল দিকিনি চাওয়ার মত কাজ করছি কি না? মন ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে, তার গলা টিপে ধরতে হবে,

ফাঁকি না দিতে পারে। সত্যকে ধরতে হবে—পবিত্র হতে হবে। যতই পবিত্র হবে ততই মনের একাগ্রতা বাড়বে, ও মনের সূক্ষ্ম ফাঁকি-গুলো ধরা পড়বে, আর তাদের নাশ করবে। "কে শত্রবঃ?—নিজেন্দ্রিয়ানি। তানি এব মিত্রানি, জিতানি যানি।" এই মনই নিজের শত্রু আবার এই মনই নিজের মিত্র। যে যত cross examine (আত্ম-পরীক্ষা) করে মনের এই গলদ্ বার করে তার সম্যক নাশ করবে—সে তত দ্রুত এই সাধন রাজ্যে এগুবে।

খুব ধ্যান জপ্ করবি। প্রথম প্রথম মন স্থূল বিষয়ে থাকে। ধ্যান জপ করলে তখন সূক্ষ্ম বিষয় ধরতে শিখে। শীতকালই তো ধ্যান জপের সময়—আর এই বয়স। "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং" বলে বসে যা। সত্যই ভগবান আছেন কিনা—একবার দেখে নে না? একটু একটু তিতিক্ষা—যেমন অমাবস্যা, একাদশীতে একাহার করা ভাল। বাজে গল্প টল্প না করে, সারাদিন তাঁর স্মরণ মনন করবি। খেতে, শুতে, বসতে, নাইতে—সর্ব্বক্ষণ। এরূপ করলে দেখবি কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগবে। স্মরণ মননের চেয়ে কি আর জিনিষ আছে? মায়ার পর্দা একটার পর একটা খুলে যাবে। নিজের ভিতর যে কি অদ্ভুত জিনিষ আছে দেখতে পাবি ও স্বপ্রকাশ হবি।

এক একটা দিন বয়ে যাচ্ছে, কি কচ্ছো? এদিন আর ফিরে আসবে না। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর তিনি এখনও বর্ত্তমান আছেন। আন্তরিক ভাবে ডাকলে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। তাঁকে ছেড়ো না, তা হলেই মরবে। "তুমি আমার, আমি তোমার" এই ভাব। এ পথে এসে যদি জপ ধ্যান না কর ও তাঁতে মন ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা না কর তা হলে ভারি কষ্ট পাবে। মন কেবল কাম-কাঞ্চনের জন্য লালায়িত হয়ে বেড়াবে। সত্ত্বের তম—যেমন এখনও আমার ভগবান লাভ হলো না—ছার জীবনে আর কাজ কি? এখনি আত্মহত্যা করবো—এরূপ ভাব ভাল

হৃষিকেশের সাধুদের চাল চলন মুক্ত পুরুষের মতন কিন্তু বাস্তবিক তারা সে stage এ পৌঁছায় নি। তারা হচ্ছে বিচারানন্দী।

সমালোচনা ও পুস্তক-পরিচয়

(১) পঞ্চ-প্রদীপ—শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-বিশারদ প্রণীত; মূল্য ।৵০ আনা। 'নবযুগ', 'ত্যাগভোগ', 'ত্যাগের পথে', 'ত্যাগাতঙ্ক', 'আদর্শ' নামক পাঁচটি প্রবন্ধ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হই-

য়াছে। প্রবন্ধ নিচয়ে গ্রন্থকার সরল, প্রাঞ্জল ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় বর্ত্ত-মান জাতীয় সমস্যার আংশিক আলোচনা করিয়াছেন।

(২) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন তৃতীয় সাধারণ কার্য্য-বিবরণী। ১৯১৭ হইতে ১৯২২ সালের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃক যে সমস্ত জীব-সেবারূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহার আয় ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব এবং মিশনের অধীনস্থ আশ্রম সমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা 'কার্য্য-বিবরণী' পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উহার জন্য বেলুড় মঠের ঠিকানায় /০ আনার ডাক-টিকিটসহ পত্র লিখিবেন।

সংঘ-বার্ত্তা

১। বিগত ২৯শে আগষ্ট রামমোহন লাইব্রেরী হলে পার্শিবাগান রামকৃষ্ণ সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণ গীত হইলে, শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী উক্ত সমিতির কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিবার পর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী প্রভৃতি ভক্ত ও বক্তাগণ তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী, যাহাতে নারী-সমাজের মধ্যেও ভক্তির বীজ উপ্ত হয় সে সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

২। বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য সাধু নাগ মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে এলবার্ট হলে এক সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ মরেনো, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ, শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বাসুদেবানন্দ, শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ নাগ মহাশয়ের আদর্শ চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

৩। বিগত ৩রা অক্টোবর প্রাতে ১০-৪৫ মিনিটের সময় বাগবাজার 'উদ্বোধন-মঠে' স্বামী কপিলেশ্বরানন্দ শ্রীভগবানের অভয় পাদপদ্মে চিরতরে মিলিত হইয়াছেন।

বন্দনা

প্রেমানন্দ মহারাজ।

তুমি আজ,

লোকান্তরে।

দীনতম ভক্ত আমি বন্দনা করিছি ভক্তিভরে,

আপন অন্তরে।

মর্ত্ত্যলোকে বসি,

মৃত্যুর এপার থেকে ওপারের আত্মীয় আত্মারে—

বসি একা

বন্দি তারে ছন্দোবন্দে—রচি লেখা,

শ্রদ্ধারূপ ভূর্জ্জপত্রে দিয়া ভক্তিমসী।

মহারাজ। কখনও তোমারে

দেখি নাই এ দুটি আঁখিতে,

সে অনন্ত আক্ষেপেতে জ্বলি আমি জ্বলি সদা চিতে।

যবে মহাপ্রয়াণ শয্যায়,

তুমি হায়।

বহুদূর পল্লীপ্রান্তে শৈশবের কোলে ছিনু আমি,

তখন কি জানিতাম স্বামী ?

তোমারেই জীবনের ধ্যেয় শ্রেয় করি,

কাটাইব দিবস শর্ব্বরী ?

তখন পাঠায়েছিনু ক্ষুদ্র শিশু ক্ষুদ্র একলিপি,

চেয়েছিনু প্রাণের সংবাদ,
মাগি আশীর্ব্বাদ।—
দিয়ে গেছ আশীর্ব্বাদ, চলে গেছ তুমি।
তারপর একে একে কত রবি অস্ত গেল গোধূলিরে চুমি,
কত নিশা ভোর হল লাজে রাঙ্গা হয়ে,
আমি হেথা ভুলে আছি ধূলি মাটি ছাইভস্ম হাসিকান্না লয়ে,
বুকে লয়ে ক্ষীণতম আশা।
তোমার আশীষ প্রভু, সে তো কভু বিফল হবে না,
আজি হোক, কালি হোক আনিবেই নূতন চেতনা,
আজিও রাখি সে ভরসা।
তুমি নাই তব প্রেম আজো বেঁচে আছে,
নিখিলের ভক্তহিয়া মাঝে।
প্রেমানন্দ, ছাত্রবন্ধু। বিলাইতে সদা প্রেম তুমি,
বঙ্গভূমি—
ধন্য হল তব প্রেম লভি,
ধন্য হল ভক্ত তব অন্তরেতে আঁকি তব ছবি।
মহারাজ,
তুমি আজ,
যেথা থাকো করো আশীর্ব্বাদ—
বেঁচে যেন থাকি শুধু পেতে নব নন্দনের আনন্দ সংবাদ।
আজি পুনঃ লিপি মোর দিতেছি পাঠায়ে
হে অন্তরযামী স্বামী! সান্ত্বনা দিও এ—
অশান্ত আত্মায়।
প্রেমানন্দ। তব প্রেমে অন্ধ হতে যেন মোর
চিত্ত সদা চায়।

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস।

স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ *

আজ বুধবার, ইংরাজী ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯১৫ সাল। গঙ্গার সম্মুখস্থ মঠের পূর্ব্ব দিকের নীচের বারাণ্ডায় পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বড় বেঞ্চির উপর উপবিষ্ট আছেন, এবং মঠের কয়েকটি সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ তাঁহার সম্মুখে এবং পার্শ্বে ছোট বেঞ্চির উপর বসিয়া আছেন।

বাবুরাম মহারাজ :—ঠাকুর বলতেন, "একমাত্র স্বামিজীই জ্ঞানের অধিকারী, আর সব ভক্তির।" ঠাকুর নিজ জীবনে অদ্বৈতভাব চেপে বেশীর ভাগ ভক্তিই প্রচার করেছেন। আর স্বামিজী ভক্তিভাবকে চেপে অদ্বৈতভাব প্রচার করেছেন। স্বামিজীর মতন ভক্তিমান লোক আর কয়টা আছে?

ঠাকুরের অদর্শনের পর, অনেকেই শ্রীবৃন্দাবনে তপস্যা করতে চলে গেছলেন। তখন বরাহনগরে মঠ ছিল। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলে সব বৈষ্ণবভাব হয়েছিল। তাই দেখে স্বামিজী একদিন বল্লেন, "বৃন্দাবন থেকে তোরা তেলক মাটি এনেছিস, দে আমাকে বষ্টুম সাজিয়ে দে।" এই বলে সর্ব্বাঙ্গে ছাপ, নাকে তেলক প্রভৃতি মাখলেন। তার পর বল্লেন "দে ঝুলি মালা দে।" এই বলে ঝুলি মালা নিয়ে বিদ্রূপ করে চক্ষু বুজে জপ করতে লাগলেন, 'নিতাই ঠক্ ঠক্, নিতাই ঠক্ ঠক্।' সব হাসির রোল উঠলো। খানিক পরে ঝুলি মালা রেখে বল্লেন, "খোল নিয়ে আয়, এইবার কীর্ত্তন হবে।" এই সব কথা তিনি বষ্টুমি দীনতার সঙ্গে বল্লেন। খোল টোল এল, বল্লেন, "আমি মওড়া গাইচি তোরা সব গাইবি।" এই বলে গান ধর্‌লেন—নিতাই নাম এনেছে, নাম এনেছে, নাম

---

* জনৈক ব্রহ্মচারীর ডায়েরী হইতে।

এনেছে রে।” আমরাও সব গাইলুম। ঐ লাইনটা দু তিনবার বলবার পরই দেখি স্বামিজীর দুই চক্ষু দিয়ে দর দর ধারায় জল পড়ছে। রাস্তার লোক পাছে আসে বলে দরজায় খিল দিয়ে খুব কীর্ত্তন হতে লাগলো। বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৪।৫টা অবধি এই ভাবে চল্‌ল। এরূপ কীর্ত্তন কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর থাকতে জমতে দেখতুম। আর সে দিন জমেছিল। আমি ঠাকুরের পূজা করতুম, ঠাকুরঘরের দরজা খুলে দেখি বাহিরে বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে সব কীর্ত্তন শুনছে। আমি তাদের ভিতরে যেতে বল্লুম। তারা হাত নেড়ে বল্লে—এখান থেকে বেশ শুনছি, বেশ শুনছি। তা না হলে গোলমাল হবে।

আজ বৃহস্পতিবার, ইংরাজী ২৫শে ডিসেম্বর, বড়দিন, ১৯১ সাল। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দুর্গাপদ বাবু (Healing Balm) আরও অনেক ভক্ত এসেছেন। গঙ্গার সম্মুখস্থ মঠের পূর্ব্ব দিকের নীচের বারাণ্ডায় ক্ষীরোদ বাবু বড় বেঞ্চির উপরে বসিয়া আছেন। সম্মুখের বেঞ্চে দুর্গাপদ বাবু। আরও কয়েকটি গৃহস্থ ও সাধু ভক্ত পাশের বেঞ্চে রহিয়াছেন।

ইংরাজী, ১৯১৫ সাল, ইউরোপে মহা-সমরানল জ্বলিতেছে। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দুর্গাপদ বাবু ঐ সব যুদ্ধের কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। বলিতেছেন—Germanরা কত Scienceএর culture করেছে—ওরা কত সভ্য ও উন্নত জাতি। বেলা ৩।৪টা হবে। ইতিমধ্যে বাবুরাম মহারাজ আসিয়া বড় বেঞ্চির উপর বসিলেন এবং তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজেই বলিতে লাগিলেন, “ওরা (Europeanরা) আবার civilized ! ওদের আবার অনুকরণ কচ্ছেন !! Scienceএর culture করে ওরা কি করেছে? লক্ষ লক্ষ মানুষ মারছে, নদীর মত রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কত সতী পতিহারা, কত মাতা সন্তানহারা হচ্ছে। নিজেদের আত্মম্ভরিতা, অহংকার, জিদ বজায় রাখবার জন্য লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী মানুষের প্রাণ নাশ কচ্ছে। ওরা কি ধর্ম্মের

জন্য যুদ্ধ কচ্ছে—না ভগবানের জন্য—না জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য? এ তো বর্ব্বরতা পৈশাচিকতা!! এই কি Science দিয়ে শান্তি স্থাপন করা? তা কি কখনও হয় মশাই? এই যে যুদ্ধ লাগলে, থেমে গেলেও কি এর জের মিটবে মনে কচ্ছেন? জাতগুলোর মজ্জাতে মজ্জাতে ঈর্ষা ঢুকে রইলো। একি যাবার? ৪।৫ generation পরেও পরস্পর চেষ্টা থাকবে ঈর্ষা করতে। যুদ্ধের দ্বারা কি জগতে শান্তি স্থাপন হয়? একমাত্র ঠাকুরই শান্তি কিসে হয় দেখিয়ে গেলেন। আমাকে গোঁড়াই বলুন, আর যাই বলুন।

"রাম অবতারে যুদ্ধ করেছিলেন, কৃষ্ণ অবতারে বাঁশি আর গরু চরাবার লাঠি, গৌর অবতারে দণ্ড কমণ্ডলু, কিন্তু এবার কিছুই নেই—কেবল এমনি (বলিয়া ঠাকুরের দাঁড়ান সমাধি এক হাত উর্দ্ধে, অপর হাত নীচে, সেই posture দেখাইয়া দিলেন)। তিনি কি মনে করলে, মার্ মার্, কাট্ কাট্ করে যুদ্ধের দ্বারা নিজের অবতারত্ব প্রতিপন্ন করতে পারতেন না? তা করবেন কেন? তার দ্বারা কি শান্তি স্থাপন হয়? দেখুন না, মুসলমানদের হিন্দুদের উপর এমনি ঈর্ষা—৭০০ বছর হয়ে গেল তবুও ফাঁক পেলে কি তোমাদের কাফের বলতে ও ঘৃণা করতে ছাড়ে? ঠাকুর এসেছিলেন, এই হিন্দু-মুসলমান বিরোধ মিটাবার জন্য। তিনি গোঁড়া হিন্দু হয়েও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে নমাজ পড়তেন ও সাধন করতেন। কেন জানেন?—এই বিরোধ মেটাবার জন্য। তাই বলি, যতই ঠাকুরের এই উদার ভাব দেশে প্রচার হবে, ততই এই দেশের কল্যাণ। আমাদের জাতীয়তা হিসাবেও মহাকল্যাণ। আমরা কি গোঁড়ামি প্রচার কচ্ছি মনে করেন? আগে সূক্ষ্ম, তার পর স্থূল জগৎ। তিনি আধ্যাত্মিক জগতে—সূক্ষ্ম রাজ্যে এই দুই বড় জাতির মিলন করে গেছেন এইবার স্থূল জগতে প্রকাশ একদিন না একদিন হবেই, বিশ্বাস করুন। তাঁর সকল প্রকার সাধনার ভিতরই একটা গূঢ় উদ্দেশ্য

ছিল। তাঁর এই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের ভিতর যে মহান উদ্দেশ্য রয়েছে একদিন না একদিন এই অধম পতিত জাতি তা বুঝতে পারবে। তাই বলি, ঠাকুরের ভাব প্রচার করা—কি গোঁড়ামি প্রচার করা? জয় প্রভু! জয় প্রভু!! জয় প্রভু!!! নাহং, নাহং, নাহং,—তুঁহু তুঁহু, তুঁহু। ঠাকুরের ভাব কয়টা লোক পেয়েছে, তাঁকে কয়টা লোক বুঝেছে? আমরাই কি প্রথম প্রথম তাঁকে বুঝতে পেরেছিলুম? আহা। তিনি দয়া করে না বোঝালে কি আমরা তাঁকে এবতে বুঝতে পারতুম? যিনি সকল ধর্ম্মের, সকল ভাবের জমাট মূর্ত্তি ছিলেন, তাঁর ভাব প্রচার করলে কি মশাই গোঁড়ামি প্রচার করা হয়?"

ক্ষীরোদবাবু, ও দুর্গাপদবাবু চুপ্। সকলেই তখন নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বাবুরাম মহারাজ বলিতে লাগিলেন—

"একদিন এখানে কুমিল্লা থেকে একজন মুসলমান ভক্ত এসে বল্লে, ঠাকুরের আদেশ পেয়েছি, তিনি স্বপ্ন দিয়েছেন বেলুড় মঠে গিয়ে তাঁর দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করবার জন্য। সে একজন হিন্দুকে নিজের দেশ থেকে এখানে সঙ্গে করে এনেছিল, পাছে আমরা তাকে ঠাকুর ঘরে ঢুকতে না দিই। জগন্নাথ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের দর্শন দিবার জন্য সিং-দরজার কাছে পতিতপাবন হয়েছিলেন কিন্তু আমাদের ঠাকুর সবাইকে একেবারে কোলের কাছে নিচ্ছেন—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান। সেদিন একজন খৃষ্টানও এসেছিল, বলে—আমাদের (খৃষ্টান) ধর্ম্ম সব সামাজিকতা; স্বামিজীর ধর্ম্মে যদি আমাকে দয়া করে নেন। কয়েকদিন একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলে। ঠাকুর বলতেন, "ভক্তদের জাত নেই।" মুসলমান ভক্তটি ঠাকুর ঘরে ঢুকে ভক্তি গদগদ চিত্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কল্লে। তার পর প্রসাদ নিয়ে গঙ্গার ধারে বসে খেলে—আর খুব আনন্দ।

যারা Westernদের (পাশ্চত্য জাতির) নকল করে, তাদের আমি দেখতে পারি না। আর যে বেটারা ওদের নকল করে তাদের চৌদ্দ পুরুষে

কিছু হবে না। Europeএর দেখাদেখি আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ছেলেরা সব anarchist হচ্ছে—বলে, ঐ করে স্বদেশ উদ্ধার করবো। ও বেটাদের যেমন বুদ্ধি। misguided হয়ে নিজেদের মাথা খাচ্ছে। ঠাকুর, স্বামিজী ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন—ভূত, ভবিষ্যৎ নখদর্পণে দেখতে পেতেন। তাই বলতেন, fanaticism করে কিছুই হয় না। ধীর স্থির ভাবে দেশ-সেবাব্রত লয়ে ধর্ম্মকে জাগা। ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ। এই প্রাণ সতেজ থাকলে আর সব অনায়াসে হবে।

"আর্য্য সমাজীরা একদিন স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করে খুব খাতির টাতির করেছিলেন। স্বামিজী তাঁদের বল্লেন, 'fanaticsএর দ্বারা কিছু হয় না। আমার গুরুভাই ঠাকুরকে প্রচার করবার জন্য কত বলতো, আমি তাদের কথা না শুনে ধীর স্থির ভাবে চলছি।'

"স্বামিজী বিলেত থেকে ফিরে বরানগর মঠে এলে, শশী মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'স্বামিজী, কিসে ভাল preacher হওয়া যায়?' স্বামিজী মাথা হতে উপস্থ পর্য্যন্ত একটা একটা করে দেখালেন অর্থাৎ ১ম মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন, মেধা, ২য় মুখে হাত দিয়া বল্লেন, ভাল চেহারা, ৩য় সুকণ্ঠ; ৪র্থ উচ্চ হৃদয়; ৫ম অল্প আহার, ৬ষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্য। এ কটা একত্র হলে তবে ভাল preacher হওয়া যায়।

"আজকালকার লোকগুলো দেখছি খালি ওদের (ইউরোপিয়নদের) অনুকরণ কচ্ছে। নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ—এই যে ৫টা যজ্ঞ রয়েছে গৃহস্থরা এগুলো করে কি? ও সব তো ভুলেই গেছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে না হতে পাচ্ছে ভাল ভোগী, না হচ্ছে এদিক। ছিঃ ছিঃ এমনি করেই জীবনটা নষ্ট কচ্ছে।

'মন তুমি কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ কল্লে ফলতো সোণা।'

এই scienceএর দিনে, এবার ঠাকুর নিরক্ষর হয়ে এসে দেখালেন

পণ্ডিতাই করে ধর্ম্ম হয় না—practical life, ধর্ম্ম জীবনে পরিণত করা চাই। ঠাকুর ছিলেন পবিত্রতার জমাট মূর্ত্তি।

"ঠাকুর একদিন বলরাম বাবুর বাটীতে গিয়াছেন। নীচের যে ঘরে এখন ভগবান পড়া শুনা করে সেই ঘরে সেই সময় এক মেয়ে স্কুল ছিল। ঠাকুর উপরের দ্বিতলের পাইখানা থেকে এলে, আমি হাতে জল ঢেলে দিচ্ছি। নীচে একটি ছোট মেয়ে আঁচলে বাঁধা একটি চাবির থোলো আঁচলের খুঁট ধরে বন্ বন করে ঘোরাচ্ছিল। ঠাকুর উহা দেখাইয়া আমাকে বল্লেন, "দ্যাখ, মাগীগুলো, পুরুষদের এই রকম করে বেঁধে বন বন্ করে ঘোরায়। তুইও কি মাগীদের হাতে ঐ রকম ঘুরতে চাস?" আগে ধূলো পড়া শিখে তার পর সাপ ধরতে হয়। Character form না করে, ভগবানে ভক্তিলাভ না করে, যে থা করলে মহা বিপদে পড়তে হয়। শেষে নাকানি চোপানি খেয়ে মরে। (একজন M. Sc. studentকে লক্ষ্য করিয়া) আগে চরিত্র ঠিক কর, তার পর যে থা করবি।"

আজ ২৮শে ডিসেম্বর, রবিবার, ইং ১৯১৫ সাল। ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যা আরতি ও ধ্যান জপের পর মঠের প্রায় সকল ব্রহ্মচারী ও সাধুবৃন্দ রাত্রি প্রায় ৮টার সময় visitor's roomএ একত্রিত হন। আজকাল বাবুরাম মহারাজ প্রায় প্রত্যহই রাত্রিকালে ধ্যান জপান্তে visitor's roomএ বসেন ও সকলকে উপদেশ দেন।

বাবুরাম মহারাজ—ভগবানই আমাদের একমাত্র আপনার লোক। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর—যে কোনও একটা ভাব ধরে মন মুখ এক করে চল্লেই হল। ঠাকুর বলতেন, 'মন মুখ এক করাই সাধন।' গিরিশ ঘোষ এক বিশ্বাসের জোরে উৎরে গেল। তাকে কত অসৎ সঙ্গ ও সমাজের খারাপ লোকের সঙ্গে চলতে হয়েছে। তবুও এক বিশ্বাসের জোরে তরে গেল। ঠাকুরের উপর তার আঠার আনা বিশ্বাস।

"আর গোপালের মার কি নিষ্ঠা। কড়ে রাঁড়ি (বালবিধবা) 'গোপাল'

'গোপাল' করেই চোখ দিয়ে জল বেরুতো। তাঁর বাৎসল্য ভাব; তিনি গোপালের উপাসক ছিলেন। কামারহাটীতে থাকতেন। প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে এসে তাঁর কথা ভাল লাগতে, আর একদিন এলেন। ঠাকুর মাকালীর প্রসাদ দিতে চাইলেন—খেলেন না—কৈবর্ত্তের অন্ন কিনা। পঞ্চবটীতে স্বপাক রান্না করছেন, এমন সময় ঠাকুর গিয়ে সেগুলি ছুঁয়ে দিলেন। তিনি আর সে অন্ন খেলেন না। কারুর ছোঁয়া তো খেতেনই না এমন কি ঠাকুর ছুলেন তাও খেলেন না—এমনি নিষ্ঠাবতী ছিলেন। কিন্তু সেই গোপালের মাকে পরে দেখেছি, ঠাকুরের আমিষ পাতে খেতে কোনও দ্বিধা করেন নি। ঠাকুর বলতেন, 'এগিয়ে যাও।' উদ্দেশ্য হারিয়ে চিরকালই নিষ্ঠাবান ও আচারী হলে কি হলো? দেখতে পাই, পণ্ডিতেরা খোসা ভূসি নিয়েই লড়াই করছে—aim হারিয়ে ফেলেছে। নিষ্ঠা চাই, আচার চাই কিন্তু সেগুলো নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না।"

স্বামী প্রেমানন্দের কথা

প্রথম জীবনে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা পাঠ করিয়া প্রাণে এক বিষম আঘাত পাইয়াছিলাম যে শ্রীভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া আমাদের এই বাঙ্গলায় নাচিয়া গাহিয়া গেলেন, তিনি জীবকে অভয় দিতে এবং জীবনাদর্শ দেখাইতে আসিয়াছিলেন, সেই লীলা তো দেখিলাম না। যদি গদাধর, শ্রীনিবাসাদি কাহাকেও দেখিতাম, তাঁহাদের পদধূলি পাইতাম, তবে জীবন সার্থক হইত। ভাবিতে ভাবিতে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার সংবাদ পাইলাম। এবারের গদাধর, শ্রীনিবাস এখনও আছেন

জানিয়া ব্যাকুল হইয়া বেলুড় মঠে ছুটিয়া গিয়াছিলাম, সে আজ ১৩।১৪ বৎসরের কথা। প্রেমের পাথার প্রেমানন্দকে তদবধি বহুবার দেখিয়াছি। কত ভাল করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু হায়। তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমার কোথায় ?

অপরিচিত ভাবে জনৈক বন্ধুর সহিত 'মঠে' তাঁহাকে প্রথম দর্শন করিতে যাই। মঠে প্রবেশ করিতেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমাদের উভয়েরই তখন নবীন বৈরাগ্য—কাহারও মাথায় ছাতা নাই। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন "তোমাদের ছাতা নেই ?"

"না"

তিনি আদেশ করিলেন, "এক একখানা ছাতা রেখো"। স্থির ছিল মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইয়া আমরা দক্ষিণেশ্বর যাইব। তিনি তখন উপরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমি সাহস করিয়া তথায় গেলাম এবং শায়িত অবস্থায় প্রণাম অবৈধ জানিয়াও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিলাম বলিলাম, "আশীর্ব্বাদ করুন—ঠাকুর যেন কৃপা করেন।" বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করেছি, এখনও করছি, আরও করবো। মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসো।" ইত্যাদি। কথাগুলি এত স্নেহ মাখা, এত আপনার জনের মত, এত পূর্ব্বপরিচিতের মত, শুনিয়া অবাক হইলাম। ভাবিলাম, তিনি আমায় কখনও চিনিতেন না, তবে আশীর্ব্বাদ করিলেন কবে ? বুঝিলাম, মহাপুরুষেরা আশীর্ব্বাদ করিয়া অনেক জীবাত্মাকে উদ্বুদ্ধ, মুমুক্ষু করেন। তিনি বুঝি এ অধমকে টানিয়া আনিয়াছেন।

দ্বিতীয়বার বাবুরাম মহারাজকে দেখিয়াছিলাম ঢাকা বিদগাঁও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে—শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে। আমি দুইটি ভক্ত-বন্ধু সঙ্গে তথায় গিয়াছিলাম। আমাদের বিদগাঁও পঁহুছিতে বোধ হয় বেলা ৯।১০টা হইয়াছিল। তখন তাঁহারা নগর সঙ্কীর্ত্তন শেষ করিয়া নদীর ধারে আসিয়াছেন। আমার সঙ্গী জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ নদীতে স্নান করিয়া কূলে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। স্বামিজী তাঁহার বাম পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বন্ধু সেই-ই তাঁহাকে প্রথম দর্শন করিলেন।

তিনি বলেন, "একটা দিব্য জ্যোতির মধ্যে তাঁহার দেহখানি দেখেছিলাম।" অপরাহ্নে তাঁহার সঙ্গে আমাদের দুই চারিটি কথা হয়। পূর্ব্বোক্ত বন্ধু প্রথমেই করজোড়ে জিজ্ঞাসা করেন, "মহারাজ, আমার কি কোন উপায় হবে?" প্রশ্ন মাত্রই, তিনি অস্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "হবে, হবে, কালে হবে।" আমি একটু দূরে থাকাতে অন্য কথাবার্ত্তা শুনি নাই। তিনি মহাপুরুষ, অন্তর্দ্দর্শী ও সত্যভাষী। আমার সেই বন্ধু কত ঘাটের জল খাইলেন কিন্তু কোথাও গাঁজা এখনও ভিজিল না। কাল বুঝি এখনও হইল না। শুনিলাম, তিনি হরিদ্বারের স্বামী ভোলানন্দ গিরির নিকট মন্ত্র লইয়া এখন আবার নবদ্বীপের এক বৈষ্ণবের আশ্রয় লইয়াছেন।

একবার আমি কাশীধামে যাইতেছি। মঠে কখনও রাত্রি বাস করি নাই, আরাত্রিক "খণ্ডন ভববন্ধন" গান কখনও শুনি নাই। এ যাত্রায় উভয় সাধ মিটাইয়া যাইব ভাবিয়া বৈকালে মঠ যাত্রা করিলাম। কিন্তু নৌকার অসুবিধায় মঠে পৌঁছিতে একটু রাত্রি হইল। মঠের পূর্ব্ব বারান্দায় উঠিতেই জনৈক সাধু আমায় ভীষণ আক্রমণ করিলেন। আমি মঠে রাত্রি বাস করিতে পারিব না। আমি বলিলাম, "আরতি দেখতে এসেছি। আরতি দেখে আমি শ্রীরামপুর চলে যাব। রাত্রিরে মঠে না থাকলেও চলবে।" তথাপি তিনি আমায় ছাড়েন না। 'গোঁয়ার', 'বাঙ্গাল' প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, বাবুরাম মহারাজ ঠাকুর-ঘরে ধ্যান করছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেও।" এক ঘণ্টার অধিক হইয়া গেল তবু তিনি আসেন না। আমি শুধু সাধুর শাসনেই আছি। নতুবা, আমি এমন জীব নহি যে সামান্য কথায় বা এক রাত্রির আশ্রয়ের জন্য কাহারও কাছে আত্মসমর্পণ করিব। শীতের রাত্রি গভীর হইতেছে, শ্রীরামপুর যাইতে হইবে ভাবিয়া চঞ্চল হইয়া আমি রওনা হইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ নামিয়া আসিলেন। পূর্ব্বোক্ত সাধু বলিলেন, "নওয়াখালী থেকে এই ছেলেটি এসেছে। আমি তাকে এই এই বলেছি।" বাবুরাম মহারাজ একটা আলো আনাইয়া আমার মুখ

দেখিলেন। আমি তখন আমার হৃদয় দেবতার সোহাগের ছেলে ছিলাম। সেই জন্য সাধুর গালাগালিতে প্রাণে বিষম অভিমান হইয়াছিল। প্রেমানন্দ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "এযে চেনা মুখ বলে বোধ হ'চ্ছে।" তৎপরে 'বাছা', 'সোনার চাঁদ' ইত্যাদি অশ্রুতপূর্ব্ব মিষ্ট কথায় আমার প্রাণের অভিমান যেন বাড়াইয়া মাতৃস্নেহে হৃদয় বেদনা মুছিয়া দিলেন। স্বামী নিগুর্ণানন্দ তখন সবে সংসার ছাড়িয়া মঠে যোগদান করিয়াছেন। আমি তাঁহার পরিচিত ও এক স্কুলের শিক্ষক জানিয়া তিনি কত আনন্দ করিলেন। বলিলেন, "দু জনে বুঝি যোগাযোগ করে এসেছ?" আমরা বলিলাম, "না মহারাজ, তেমন কিছু নয়।" তিনি বলিলেন, "ও আগে এল, তুমি পরে এলে, এ যোগ নয় তো কি বিয়োগ হল?" তিনি এইরূপ যোগাযোগ বড় ভালবাসিতেন। আহারান্তে লেপ বালিশাদির বন্দোবস্ত করিয়া আমাকে শোয়াইয়া তবে তিনি উপরে গেলেন। পরদিন আমি কাশী যাইব। মহাপুরুষের নিকট কি কি সংবাদ বলিব সব বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন, "তুমি তাঁকে বলো হয় তিনি এখানে আসুন, না হয় আমায় টেনে কাশী নিয়ে যান। পুরাণো মানুষ না হলে ভাল লাগে না।"

আর একবার, আমার গুরুদেব তখন আলমোড়ায়। আমার ইচ্ছা—মঠে কয়েকদিন থাকি। গুরুদেব, শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজকে আমার বিষয়ে চিঠি লিখিয়াছিলেন। আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আমি প্রেমানন্দ মহারাজকে কি আপনার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিব?" তিনি লিখিলেন, "তোমায় কিছু পরিচয় দিতে হবে না। তিনি সহজেই তোমায় চিনিবেন।" দুঃখের বিষয় আমি মঠে গিয়া তাঁহাকে পেলাম না। কেহ আমায় মঠে থাকিতে দিলেন না। আমি শূন্য মনে ফিরিয়া আসিলাম।

আর একবার দেখা নারায়ণগঞ্জে—চৌধুরীদের বাড়ীতে। তিনি শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও অন্যান্য অনেক সন্ন্যাসিসহ কামাখ্যা হইতে ফিরিতেছেন। আমি তখন চট্টগ্রামে থাকিতাম। তথাকার ভক্তগণ তাঁহাদিগকে চট্টগ্রামে লইয়া যাইবার জন্য আমায় প্রতিনিধি স্বরূপ

পাঠাইযাছেন। আমি বোধ হয় বেলা ৯টার সময় তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলাম। অত দূর দেশের ভক্তদের প্রতিনিধি, সুতরাং আজ আমি কম নহি। একেবারে মহারাজদের দরবারে নীত হইলাম। উভয় মহারাজের সঙ্গে কত আলাপ হইল। বেলা অধিক হইলে সেবকগণ সকলকে সরাইয়া তাঁহাদের স্নানে পাঠাইতে আসিলেন। সকলে উঠিয়া গেল। আমার ইচ্ছা, বাবুরাম মহারাজের নিকট দুই একটা প্রাণের কথা বলি। আমি উঠিতেছি না দেখিয়া তিনি আমায় যাইতে দিলেন না। সেবকেরা চলিয়া গেলেন। এখন নির্জ্জনে তাঁহাকে পাইয়া প্রাণ উছলিয়া উঠিল। যেন কত জিজ্ঞাসা করি, কত ভিক্ষা করি, আমার ভিক্ষার থলি ভরিয়া লই। বলিলাম, 'মহারাজ, আশীর্ব্বাদ করুন যেন ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিলাভ হয়।" বলিতে বলিতে আমার চোখে জল আসিল, সমস্ত প্রশ্ন গোলমাল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ভক্তি কি আর গাছের ফল যে পেড়ে খাবে?" আরও কত কি বলিলেন, মনে নাই। আমার ইচ্ছা হইল, তাঁহার পায়ের উপর পড়ি, তাঁহার পদসেবা করি। কি আশ্চর্য্য। আমি এইরূপ ভাবিতেছি, কোথায় তিনি স্নান করিতে যাইবেন, না একটা মোটা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। লোকে শুইবার সময় একটা পূর্ব্ব পশ্চিমদিক ঠিক করিয়া শোয়। তিনি কোণাকুণি আমার দিকে পা করিয়া শুইলেন। আমি নাকের জলে, চোখের জলে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সাহস করিয়া স্পর্শ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, যদি অযোগ্য ভাবিয়া তিনি আমায় প্রত্যাখ্যান করেন। ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। আমার বরদাতা দেবতা—মূক, মূর্খ, আমাকে বর, না অভিসম্পাত, কি দিয়া উঠিয়া গেলেন—বুঝিলাম না। কয়েক বৎসর পরে 'কথামৃত'কার শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয়ের নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পরে কখন তাঁর পদসেবা করেছিলে?" পূর্ব্বোক্ত রাত্রি অনুশোচনায় কাটাইয়া পরদিন এক সুযোগে তাঁহার পদসেবার অধিকার লাভ করিয়াছিলাম, ইহা শুনিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

সেদিন দুপুরের পরে, ঢাকাব ছেলেদের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ বৎসহীনা গাভীর ন্যায় চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে "জয় গুরু মহারাজ" ধ্বনিতে সহর প্রকম্পিত করিয়া তাহারা দেখা দিলে তাঁহার কি আনন্দ। আমাদের সকলকে একত্রিত করিয়া বসিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্, মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তোদের একটা কথা বলতে বড় সঙ্কোচ বোধ করেন—সে ঠাকুরের কথা। ঠাকুরকে ভাবতে বল্লে কোন সাম্প্রদায়িকতা হয় না। তিনি তেত্রিশ কোটী দেবতার জমাটবাঁধা মূর্ত্তি। জগতে যত প্রকার ভাব, যত প্রকার অবতার বিগ্রহ হয়েছে, তিনি সকলের সমষ্টিভূত," ইত্যাদি কত কথা তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। আমরা অবাক হইয়া শুনিতেছি। আর প্রাণে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ ধারা বহিয়া যাইতেছে। এমন সময় জনৈক Retired ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইতেই আমাদের সব আনন্দ শেষ হইয়া গেল। আর সে সব কথা নাই। কারণ, এ যে বাজে লোক। ভদ্রলোকটিকে ধর্ম্ম কথা শুনাইতে স্বামিজী উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তিনি পুরাণের সৃষ্টি প্রকরণ—কারণ জলে ব্রহ্মার অণ্ড নিক্ষেপের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাহবা পাইবার জন্য তাঁহার প্রসঙ্গ কিরূপ জমিতেছে, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমাদের বড় বিরক্তিকর বোধ হইল। কারণ, ভদ্রলোক সরস্বতীকে বর্ণমালা শিখাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছেন! বাবুরাম মহারাজ আমাদের কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্, কোথায় উঠে গিয়েছিলুম আর কোথায় পড়ে গেছি।" কিছুক্ষণ পরে উক্ত 'শ্রীবাসের শাশুড়ী' উঠিয়া গেলেন। স্বামিজীরা সকলে, মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও বাবুরাম মহারাজ, শ্রীযুক্ত নাগ মহাশয়ের জন্মভূমি দর্শন মানসে দেওভোগ যাত্রা করিলেন।

বাবুরাম মহারাজ নাগ মহাশয়ের সমাধিগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তৎপরে পুকুরে হাত মুখ ধুইয়া মহারাজের নিকট বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, নাগ-ভূমির বৃক্ষ পত্রাদি কেমন দেখছেন?"

মহারাজ বলিলেন, "সব ঠিক।" তিনি কি সব চৈতন্যময় দেখিতেছেন ?

তার পর নাগাঙ্গনে নাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। উঠান ভরা সন্ন্যাসী, ভক্ত সকলে "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় নমঃ কৃষ্ণ মাধবায় নমঃ॥" কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বাবুরাম মহারাজ পরমানন্দে হাত তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং মহারাজকেও নাচিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহারাজ দুই চারিবার লাফাইয়া স্থির হইয়া গেলেন। তাঁহার ভাব-সমাধি দেখিয়া ভক্তগণ বিচলিত হইয়া পড়িল। তাঁহাদের বিশ্বাস বুঝি মহারাজকে হারাইল। আমি ভাবিলাম, এইটুকু ভাব-সমাধিতেই যদি শরীরপাত হয়, তবে তিনি কিসের মহারাজ ?

চট্টগ্রাম যাইবার কথা তুলিলে বাবুরাম মহারাজ আমায় একবার বল্লেন, "তুই তার করে দে, আমি যাব।" আবার যখন ভক্তেরা বল্লেন, "মহারাজ, আপনার শরীর খারাপ হয়েছে এবার গিয়ে কাজ নেই," তখন তিনিও নিরস্ত হন। আবার কিছুক্ষণ পরেই শরীরের কথা ভুলিয়া চট্টগ্রাম যাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। তাঁহার শরীরের রং তখন কাল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন অসুখ তাঁহার দেখি নাই। আমার ধারণা জগাই মাধাই উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌর নিত্যানন্দ যেমন কাল হইয়া ছিলেন এও সেই অবস্থা। জানি না আমার ধারণা সত্য কিনা।

পরদিন তাঁহারা দুপুরের ষ্টীমারে কলিকাতার দিকে চলিলেন। বিদায় কালে দর্শন ও প্রণামের জন্য সহর ভাঙ্গিয়া "জয় গুরু মহারাজ" ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিয়া এত লোক আসিয়াছিল যে ধাক্কা ধাক্কি ছেঁড়া ছিঁড়ির অবস্থা হইয়াছিল।

আমি পূর্ব্বেই জাহাজে তাঁহার আসনের নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। তিনি স্নেহ ভরে আমাকে কত কথা বলিলেন, "তোর গুরুকে চিঠি লিখবি এই এই লিখবি" ইত্যাদি।

তার পরের শরৎকালে আমি কর্ম্ম উপলক্ষে দেওঘর যাত্রা করিলাম। মঠে যাইয়া দেখি তিনি ৮ দিন যাবৎ জ্বরে কাতর। সাগু খাইয়া

থাকেন। দ্বিতলে উত্তরের প্রকোষ্ঠে একখানি Easy chairএ (আরাম কেদারা) বসিয়া অবিশ্রান্ত জপ করিতেছেন। আমি মিছরি প্রসাদী করিয়া লইবার জন্য গুরুদেবের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি বাবুরাম মহারাজকেও উহা প্রসাদ করিয়া দিতে বলিলেন। গুরুদেবের কথামতে হরি মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ উভয়ে আমার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আর একবার মঠে রাত্রে গীতা পাঠ হইতেছে। ব্যাখ্যা লইয়া সাধুদের মধ্যে মহা তর্ক বাধিয়া গেল। বাবুরাম মহারাজ তখন ঠাকুরঘরে ধ্যান করিতেছিলেন। অকস্মাৎ আসিয়া জুটিলে তাঁহাকে মীমাংসা জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুরের একটা কথা দিয়া তাহা মিটাইয়া দিলেন। তৎপরে "সই লো সই মনের কথা কইতে মানা, দরদি নইলে প্রাণ বাচে না" ইত্যাদি তাঁহার প্রিয় গান গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার গাহিবার সুর ছিল না। একদিকে টান দিলে অন্যদিকে চলিয়া যাইত। কিন্তু এ গানে আমরা কত আনন্দ পাইলাম, প্রাণ একেবারে শান্ত শীতল হইয়া গেল। তাঁহার প্রেমের অভিনয়ে তিনি যে ঠাকুরের দরদি ছিলেন তাহা তখন জানিতাম না।

শেষ দেখা 'বলরাম মন্দিরে' তাঁহার দেহত্যাগের ঘণ্টা দেড়েক আগে কুমিল্লার শ্রীযুক্ত মহেশ বাবুর সঙ্গে গিয়াছিলাম। দেখিলাম বাবুরাম মহারাজ চোখ বুজিয়া আছেন। শরীরে শুধু হাড় কয়খানি আছে। একবার প্রবল কাশি আসায় চক্ষু মেলিলে আমাদের দিকে চাহিলেন। মহেশবাবু করযোড়ে প্রণাম করিলেন কিন্তু প্রতি নমস্কার হইল না।

শ্রী—

নারী-নির্যাতন

বাংলায় কিরে মানুষ নাই ?
নির্যাতিতার আর্ত্তনিনাদ
কেন তবে রোজ শুনিতে পাই ?

লোক-ভয় ভীতু পল্লীবালার
অবমানিতার মর্ম্মজ্বালার
ঘর্ম্ম মুছায়ে লাঞ্ছনা ভার
লাঘব করিতে চায়,—
বাংলায় কিরে এমন মানুষ
নাই, নাই কেউ হায় !

তবে কি জানিব বাংলাদেশের
ভগ্নী ও জননীর,
নির্যাতনের ক্রন্দন রোল
সুর হবে ধরণীর ?

এমন পুরুষ বাংলার ঘরে
জন্মায় নাকি দিনেকের তরে
বক্ষ পাতিয়া রক্ষা যে করে
জননীর সম্মান ?
চোখের সামনে হেরি জননীর
লাঞ্ছনা ক্ষত-রক্ত-রুধির
নিতে কি কেহই হয় না অধীর
অত্যাচারীর "জান" ?
বাংলাদেশের সন্তান কিরে
চেতনা বিহীন প্রাণ ?

এরাই না কিরে চায় স্বরাজ ?
এরাই না কিরে স্বাধীনতা হেতু
দ্বন্দ্ব করিছে আজ।

জননী ভগিনী কাঁদে যার ঘরে
অত্যাচারীর লাঞ্ছনা-শরে,
স্বাধীনতা তরে চীৎকার করে
সে না কিরে আজ জগৎ মাঝ।
যে অভাগা জাতি এখনো তোমার
করে না ঘেন্না, করে না লাজ।

"বাংলার বধূ"—বলিলেই বুক
ফুলিয়া উঠিত গর্ব্বে যেই,
চূর্ণিত করি তারে বুঝি আজ
নাচিবে পিশাচ থেই, থেই, থেই।

হায় বাঙ্গালী-লক্ষ্মীরা সব
হলো বুঝি আজ লুটের বিভব,
সাবিত্রী সীতার মূর্ত্তিরা সব
ধর্ষণ-দৃঢ় ঘায়,
ধূলি-পঙ্কিল পথের অঙ্কে
চূর্ণিত হয়ে যায়।

সপ্ত সিন্ধু উঠিবে হাসিয়া
"এই কি তোদের হিন্দু-নারী ?"
রক্ত বিন্দু থাকিতে মোদের
এই টিটকারি সহিতে পারি ?
থাকিতে জীবন, থাকিতে পরাণ
কেমনে সহিবে এই অপমান,
লয়ে অক্ষত ওই দেহখান

ক্ষত জননীর পাশে,
যাইবে কেমনে হারে সন্তান
স্নেহ-দুগ্ধের আশে ?

"উঠ, জাগো" বলি কর নিশিদিন
গলাবাজির ওই হুড়াহুড়ি,
এদিকে তোমার জাগা-ঘর মাঝে
হয়ে যায় যে গো বিষম চুরি !

যুঝিবারে চাও সিংহের সাথে
এদিকে শেয়াল ঘরে ঢুকি রাতে
অপমান করে লেজের আঘাতে
সেটা বুঝি কিছু নয় ?
জননীরে রাখি পথের উপরে,
ভগিনীরে সঁপি পিশাচের করে,
চাও কি স্বরাজ সাজাইতে ঘরে
গাহি একতার জয় ?
তোদের সমান এমন মূর্খ
আর কে জগতে রয়।

"সভ্যতা-পাপ-দুষ্ট" বলিয়া
ঘেন্না যাদের কর,
নারী-মর্য্যাদা রাখিতে তারাই
জগতে সবার বড়।

তাদের নারীরে যদি কেহ আজ
হানিত এমন লাঞ্ছনা-বাজ,
অস্থি তাহার বালুকার মাঝ

যাইত মিশিয়া তবে।

এটা যে রে ভাই বৈষ্ণবের দেশ
বঙ্গ-রসের তাই একশেষ
লোক লজ্জার নাই কণালেশ
সুস্থির আছি সবে।
গোলাম জাতির মর্য্যাদা জ্ঞান
এর চেয়ে কত হবে ?

নারী লাঞ্ছনার যে পাপ-বহ্নি
ধূমায়িত আজ বাংলা-ঘরে,
নিবারিতে যদি নাহি পার তায়
বুকের রক্ত সেচন করে—
নর হয়ে তোরা নারীর চিতায়
পুড়িয়া কেন রে মরিস্ না হায়
কবরী বাঁধার ও লাল ফিতায়
বাঁধিয়া কলসী গলে—
ডুবিয়া মর্ না কাপুরুষ জাতি
বঙ্গ-সাগর জলে।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

প্রেমানন্দ-স্মৃতি

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসহচর, প্রেমবিগলিত প্রাণ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের পূণ্যস্মৃতি আজও হৃদয়ে জাগরূক থাকিয়া সময়ে সময়ে মনকে এক অপূর্ব্ব আনন্দে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে। সেই দৃশ্যটি এখনও চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে, প্রাণের পরতে পরতে সেই মৃদু, গম্ভীর, করুণা মণ্ডিত বাক্যগুলি আজও ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কমনীয় মুখ এখনও প্রাণে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। কি দৃশ্যই না দেখিয়াছিলাম, কি অপূর্ব্ব বাণীই না শুনিয়াছিলাম।

বেলুড়মঠে দুর্গোৎসব। মহাষ্টমী, শত শত ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ মঠ প্রাঙ্গণে প্রসাদ গ্রহণে কাতারে কাতারে উপবিষ্ট। পরিবেষণে অপটু আমাকে জনৈক ভক্ত-বন্ধু দরিদ্র নারায়ণ সেবায় আহ্বান করিয়াছেন। পরিবেষণে সাহস না থাকিলেও এ আহ্বান উপেক্ষা করিবার সাহস হইল না। তাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ কাজ অন্ন পরিবেষণে রত হইলাম। কয়েকটি ছেলে প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে। আমি অন্ন পরিবেষণ করিয়া নাকাল হইয়া পড়িতেছি। অযথা নষ্ট করিতে ভয় হইতেছে, আবার বার বার কম পড়িতেছে দেখিয়া ক্রমশঃ বিব্রত হইয়া পড়িতেছি। বাবুরাম মহারাজের সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি হইতে এদিকটাও বঞ্চিত হয় নাই। তাঁহার দিকে চক্ষু পড়িবামাত্র কাছে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি নিকটস্থ হইলে বলিলেন, "তুমি কি আর কখনও পরিবেষণ কর নাই?" বিনীত ভাবে উত্তর করিলাম, "না মহারাজ।" তিনি তখন বলিলেন, "আর পরিবেষণ করলেই বা কি হবে? আমাদের পেটের ওজনে কি এদের পেটের ওজন করা যায়? জানি না জীবনে কদিন এরা পেটভরে খেতে পায়। এদের পেটে যে দিনরাত আগুন জ্বলছে। যাও, যাও বালতিটা এদের এক এক পাতে ঢেলে দাও। ঠাকুরের প্রসাদ পেট্‌টাভরে খেয়ে নিক।" কণ্ঠস্বর ভার, ভার। ওর দিকে চাহিয়া দেখিলাম আবেগ

মণ্ডিত সুন্দর মুখ-ছবি নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিশিখার ন্যায় দেখা যাইতেছে। চক্ষু দুটি সজল, মেঘ গলিয়া যেন বৃষ্টি ঝরিবে।

আর এক সময়—জনৈক ব্রহ্মচারী শ্রীহট্টের ভক্তগণকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বারান্দার বেঞ্চখানিতে আনিয়া বসাইতেছিলেন। শ্রীহট্টের ভক্তগণ দশ বার জনের কম উপস্থিত ছিলেন না। কেহই ব্রহ্মচারিজীর অপূর্ব্ব খেয়ালে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু ব্যাপারটা যে কি তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। কয়েকজন সমবেত হওয়ার পর মহারাজের কাছে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এদিকে একবার আসুন, আপনাকে একটা অপূর্ব্ব জিনিষ দেখাব।" মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, "রেখে দে তোর দেখাদেখি, কাজের বেলা আবার গোলমাল।" কিন্তু ব্রহ্মচারিজী নাছোড়বান্দা। অবশেষে বাবুরাম মহারাজ হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইলেন। আমরাও বসিয়া বসিয়া হাসিতেছিলাম। মহারাজ সম্মুখীন হইলে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখুন, দেখুন সিলেটচূণ—সিলেটচূণ।" মহারাজ উচ্চহাস্যে কহিলেন, "দূর বোকা, এরা চূণ হতে যাবে কেন? সিলেট 'অরেঞ্জ' (কমলালেবু), ঠাকুরের—"

পাঠক, উহ্য অংশটা আজও প্রকাশ করা সমীচীন বোধ করিলাম না। তবে মহারাজ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইতে চলিয়াছে। এইমাত্র বলিতে পারি নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না।

মহাষ্টমীর রাত্রে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ উৎসব কার্য্য সমাধা করিয়া কালী কীর্ত্তনে আনন্দ সম্ভোগ করিতে ছিলেন। তখন শত কর্ম্মের তত্ত্বাবধানে রত বাবুরাম মহারাজ মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া আনন্দ তরঙ্গ বর্দ্ধিত করিতেছিলেন। কীর্ত্তন তখন খুব জমিয়া আসিয়াছে। রাত্রি প্রায় নয়টা কি দশটা। পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজের গান শুনিবার জন্য কাহারও কাহারও ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু অনুরোধ করিতে কাহারও সাহস হইতেছে না। বাবুরাম মহারাজকে বলিলে তিনি শরৎ মহারাজের কাছে গেলেন, আর চাপিয়া ধরিলেন, "দাদা, তোমাকে গাইতেই হবে। দেখছ না কত আনন্দ। তোমার গান

ছাড়া আনন্দ যেন পূর্ণ হচ্ছে না।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "সে কি? বহুদিন গান গাওয়া ছেড়েছি, আজ হঠাৎ কি করে গাইব।" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, আসরে নামিতে হইল ও গান গাহিতে হইল। সেদিন কি আনন্দই না হইয়াছিল, জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। আমরা ভ্রাতৃপ্রেম দেখিয়াছি, কিন্তু গুরুভাইদের মধ্যে এত ভালবাসা, এত দাবীদাওয়া, এত অকপট ব্যবহার সেই প্রথম লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। পরদিন ভোবে কোন বিশিষ্ট ভক্ত মহাপুরুষ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "কি করব, বাবুরাম এ বুড়ো বয়সে নাচিয়ে তবে ছাড়লে।" মনে হয়, ঐ দিনই দ্বিপ্রহরের পর শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে সুপরিচিতা পূজনীয়া গোলাপ মা আসিয়া সংবাদ দিলেন, "শরৎ, মা ঠাকরুণ তোমাদের সেবায় খুব খুসী, তোমাদের তাঁর আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছেন।" শরৎ মহারাজ আনন্দ গম্ভীরকণ্ঠে "বটে" বলিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট বাবুরাম মহারাজের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাবুরাম, শুনলে?" সেবা সার্থকতা জনিত আনন্দ তখন বাবুরাম মহারাজের চোখে মুখে সুস্পষ্ট। উভয়ে তখন আনন্দে কোলাকুলি।

সেবানন্দ জিনিষটা যে কি তাহা যেন ইঁহাদের দেহ প্রাণ আশ্রয় করিয়া একটা জীবন্ত উপভোগ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। মহাপুরুষদের দেহ মন আশ্রয় করিয়া শাস্ত্রোক্ত উচ্চ উচ্চ ভাব নিচয় এমনি ভাবে ভক্তদের কাছে ধরা দেয়, অন্যথা শাস্ত্র—মহাপুরুষেতর লোকের কাছে উপলব্ধিজাত শ্রদ্ধার সামগ্রী না হইয়া শুধু অসার পাণ্ডিত্যের উপকরণ হইয়া পড়িত।

আর একদিন ঐ পূজারই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুযোগ্য দৌহিত্র পণ্ডিত ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি মঠ-প্রাঙ্গণে প্রসাদ পাইতেছেন। এদিনও শত শত ব্যক্তি মঠের সেই বিশাল উঠানখানিতে সমাসীন। বাবুরাম মহারাজ একা একশ। এদিক সেদিক পলকে ঘুরিয়া ফিরিয়া তত্ত্বাবধান ও অভ্যর্থনা করি[illegible] সমাজপতি ও কতিপয় ভক্ত বার বার [illegible]। আর সহাস্যবদনে

সমাজপতি বলিতেছেন, "আজ শ্রীচৈতন্যদেবের উৎসবের সেই একদিনের কথা মনে পড়িতেছে যে দিনের একটি তরকারী অতি উপাদেয় হইয়াছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আজও সেন মুগের ডালটি তেমনি উপাদেয় হইয়াছে।" এদিকে বাবুরাম মহারাজ সমাজপতিকে বলিতেছেন, "আপনার অভ্যর্থনা করতে পারি তেমন সম্বল, বাক্য, ভাব বা ভাষা কোথায় পাব? রস টস নেই, আপনার ত কলমের ডগায় রস টস্ টস্ করে।" সমাজপতি বিনীত ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "আপনার কথায় আপনিই ঠকলেন। স্বীকার করলুম আমার কলমের ডগায় রস আছে কিন্তু আপনার রস কথায়, কাজে, দেহে, প্রাণে —।" কথা পূর্ণ হইতে না দিয়া প্রশংসা এড়াইতে বাবুরাম মহারাজ অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। আমি সমাজপতি মহাশয়ের ঠিক পার্শ্বেই প্রসাদ পাইতেছিলাম। সেদিনও এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' প্রণেতা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্শ্বচর 'শ্রীম' বেলুড়মঠে আসিয়াছেন। বাবুরাম মহারাজ প্রমুখ কতিপয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, শ্রীম ও ভক্তগণ বসিয়া গল্প করিতেছেন। প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে সহসা মাষ্টার মহাশয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এইত। এঁরই কৃপায় জীবনটা ধন্য হয়ে গেল। ইনি যদি ঠাকুরের কাছে না নিয়ে যেতেন তা হলে কি ঠাকুরের কৃপা পেতেম?" কথাগুলি কৃতজ্ঞতায় ভরা। মাষ্টার মহাশয়ও ততোধিক বিনম্রভাবে বলিতেছেন, "ওসব কি বলা হচ্ছে? শুদ্ধসত্ত্ব আধার, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ, তিনিই টেনে নিয়েছিলেন।" বলা বাহুল্য বাবুরাম মহারাজ 'ছেলেধরা' মাষ্টার মহাশয়ের স্কুলের ছাত্র ছিলেন। মাষ্টার মহাশয় ছাত্রকে লইয়া ঠাকুরের কাছে প্রথম প্রথম যাতায়াত করিতেন।

দুর্গোৎসব। ষষ্ঠীর দিন মঠের ফটকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী ভক্তজননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া প্রেমানন্দ স্বামী প্রমুখ রামকৃষ্ণ লীলাসহচরগণ গাড়ী টানিয়া মঠ প্রাঙ্গণে লইয়া আসিতেছেন। সমবেত কণ্ঠে "শ্রীগুরুমহারাজ

কী জয়" "জয় মহামায়ী কী জয়" ধ্বনিতে শ্রোতৃমণ্ডলীর শরীর হর্ষাবেগে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। প্রেমানুরাগরঞ্জিত মুখ প্রেমানন্দ স্বামী আনন্দে টলিতেছেন। চোখ মুখ দিয়া যেন আনন্দ ঠিকরিয়া পড়িতেছে। এই স্বর্গীয় দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। গুরুপত্নীতে এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিবৃন্দের শ্রদ্ধার গভীরতা প্রত্যক্ষ করিয়া গুরুভক্তি জিনিষটি যে কি তাহা একটু উপলব্ধি করিয়াছি।

অতি ক্ষুদ্র কার্য্যেও বাবুরাম মহারাজের অপার স্নেহে ভক্তের প্রাণ শীতল হইতে দেখিয়াছি। ঐ পূজার সময়েই দেখিয়াছি ভক্তদের কাছে তিনি উপস্থিত হইতেছেন এবং আহার নিদ্রা প্রত্যেক বিষয়েই ভক্তেরা যে কি কষ্ট পাইতেছেন স্নেহার্দ্র কণ্ঠে তাহার আলোচনা করিতেছেন। উপসংহারে বলিতেছেন, "কষ্ট হলেই বা কি করবো? তোদেরই ত মঠ, তোদেরই ত সব, আমরা ত তোদেরই কাজ করছি।" আমার বেশ মনে আছে, পূর্ব্বরাত্রে মশার কামড় খাইয়া পরদিন কলিকাতায় চলিয়া যাইব স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রভাত হইবামাত্র বাবুরাম মহারাজ উপস্থিত হইলেন আর অযাচিত ভাবে আমারই সহিত সহাস্য বদনে মশার কামড় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য অসুবিধাদির কথা এমন ভাবে ও ভাষায় আলোচনা জুড়িয়া দিলেন যে মনে হইল সহস্র সহস্র মশার কামড় খাইয়াও যদি প্রভাতে এমনটি পাই তবে সে সব কষ্ট কুসুম কোমল হইয়া দাঁড়াইবে। বাবুরাম মহারাজ সাময়িক কষ্টানুভূতি এমনই ভাবে আনন্দে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেন।

কত কথা! আর একটি মাত্র বলিয়া শেষ করিতেছি। একাদশীর দিন প্রাতে শ্রীহট্টের কতিপয় ভক্ত-বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বর ও কলিকাতা হইয়া শ্রীহট্ট যাত্রা করিয়াছি। বাবুরাম মহারাজের কাছে বিদায় লইবার জন্য উপস্থিত হইবামাত্র তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে কিরে? এত শীগ্গীরই যাবি?" তার পর যখন যাওয়া স্থির জানিলেন তখন বলিলেন, "কিছু খেয়েছিস?" উত্তরে আমাদের মৃদুহাস্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের লইয়া হন্ হন্ করিয়া ছুটিলেন। মঠের ভাণ্ডারঘরে

প্রবেশ করিয়া ভারপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "ঠাকুরের প্রসাদ কি আছে নিয়ে আয় দেখি।" ব্রহ্মচারী প্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইলে ডাগর ডাগর পদ্ম পাতায় উহা প্রচুর পরিমাণে স্বহস্তে দিয়া বলিলেন, "নে এগুলি নৌকাতে বসে বেশ দিব্যি খাবি, আর আনন্দ করতে করতে দক্ষিণেশ্বর চলে যাবি।" আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, প্রসাদের মধ্যে প্রধানতঃ লুচি, জিলিপি, কচুরী প্রভৃতি ছিল। আমরা প্রসাদ ও হর্ষবিষাদের ভাব লইয়া মঠের ঘাটে নৌকায় চাপিলাম। বাবুরাম মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া গঙ্গাগর্ভ পর্য্যন্ত প্রসারিত ঘাটের পার্শ্ববর্ত্তী পাকা পোস্তার উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল, ক্রমবর্দ্ধিত জোয়ারে নৌকা দোল খাইতে খাইতে ছুটিল। আমরাও দুলিতে দুলিতে বাবুরাম মহারাজের নির্দ্দেশ মত প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলাম। নৌকা দূর হইতে দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল। তিনি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিয়া রহিলেন। আমাদের অনেকেরই ভিতরটা তখন আকুপাঁকু করিতেছিল। আমার মনে হইতেছিল যেন বিদেশ যাত্রা করিয়াছি, আর স্নেহময়ী জননী তাঁহার সন্তানকে যতক্ষণ দৃষ্টি বহির্ভূত না হয় ততক্ষণ নিরীক্ষণ করিতেছেন।

শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী।

জাতি-সংগঠক স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রাচীন ভারতে বেদান্তের সার্ব্বভৌমিক ভাবের উপর যে সমাজ-তন্ত্র গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। বর্ত্তমান যুগে সেই বিশেষত্বগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারতের সামাজিক সমস্যা-গুলিকে বুঝিতে হইবে। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে প্রথমতঃ আর্য্য-সভ্যতার পত্তন হইয়াছিল। মনুসংহিতায় উল্লিখিত

আছে এই ব্রহ্মাবর্ত্তের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া অন্যান্য দেশ মহান হইত। আর্য্য বলিয়া কোন বিশিষ্ট জাতি সুদূর প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগে অন্য কোন দেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদিক সাহিত্য হইতে এই পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় বৈদিক যুগে উত্তর ভারত বিভিন্ন জাতির লীলা-নিকেতন ছিল। এই বিভিন্ন দল সমূহের কোন এক জনসমষ্টি কোন অজ্ঞাত কারণে অধিকতর অন্তর্দৃষ্টি পরায়ণ হইয়া উঠেন এবং প্রবল মন-সমুদ্র তুমুল ভাবে আলোড়ন করিয়া কতকগুলি সার্ব্বভৌমিক আধ্যাত্মিক সত্যের বিজ্ঞান লাভ করেন। এই সত্য-সমূহের উপর ভিত্তি করিয়া সেই দেব-মানবগণ বর্ণাশ্রমাচার বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নামক একটি বিজ্ঞান-সম্মত আধ্যাত্মিক সমাজ-তন্ত্র গঠন করেন। যে জনসংঘ এই অভিনব সমাজ-তন্ত্র গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আপনাদিগকে আর্য্য বলিতেন এবং এই আর্য্য সভ্যতার বিস্তারকল্পে বহির্গত হইয়া তাঁহারা সমগ্র উত্তর-ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন এবং অবশেষে ধীরে ধীরে তাঁহাদের সমাজ-তন্ত্রকে সুদূর দ্রাবিড় ভূমি পর্য্যন্ত বিস্তারিত করিয়া দেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সমাজের দুইটি বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন। প্রথম—অন্যান্য সমাজে ক্ষত্রিয় বা সৈনিকজাতিকে শ্রেষ্ঠাসন প্রদত্ত হইয়াছে কিন্তু ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ বা জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়—অন্যান্য সমাজে ব্যক্তিই সামাজিক উন্নতির মাপ কাঠি বা unit অর্থাৎ স্বাধীন ভাবে ব্যক্তি মাত্রেরই উন্নতির জন্য অন্যান্য সমাজ ব্যস্ত কিন্তু আর্য্য সমাজের উন্নতির মাপ কাঠি এক একটি ক্ষুদ্র জনসংঘ বা Caste Community। এখানে ব্যষ্টির উন্নতির বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব নাই কিন্তু তাহাকে স্বার্থপরের মত একা অগ্রসর হইবার অনুমতি দিতে সমাজ প্রস্তুত নহে, সমস্ত সংঘটিকে তাহার সহিত উন্নত করিয়া লইয়া যাওয়া চাই। "এখানেও প্রত্যেক ব্যক্তির নিম্নবর্ণ হইতে উচ্চতর বা উচ্চতম বর্ণে উন্নত হইয়া উঠিবার সুযোগ বর্ত্তমান। কেবলমাত্র এই মৈত্রীর জন্মভূমিতে প্রত্যেকে তাহার

সমগ্র বর্ণটিকে সঙ্গে লইয়া অগ্রগামী হইতে বাধ্য।"* এই প্রণালীটি বৈদিকযুগ হইতে প্রবল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিতেছে। কখনও ক্ষীণ গতিতে কখনও তীব্র গতিতে উহা ভারতীয় জনসমষ্টিকে সঞ্জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং এই প্রণালীর দ্বারাই আর্য্য ধর্ম্মের বহির্ভূত অথবা নিম্নস্তরে অবস্থিত জাতি সমূহকে ভারতীয় সভ্যতা আপনার অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিভিন্ন জাতি, সমাজ ও ভাষার আবর্ত্তে পড়িয়াও ভারত এমন একটি সমাজ-তন্ত্র উদ্ভাবিত করিল যাহা সেই অতি প্রাচীন যুগে জাতি-সমস্যা, সমাজ-সমস্যা ও ভাষা-সমস্যার কতকগুলি বেশ মীমাংসায় উপনীত হইল। আর্য্য বলিয়া পৃথক কোন জাতি ছিল না, আর্য্য ছিল ভারতীয় জাতি-সমস্যার মীমাংসা মূলক। মধ্যযুগেও শক, হুন প্রভৃতি মধ্য-এশিয়ার কত দুর্দ্দান্ত জাতি আর্য্যত্ব অবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয় রাজপুত জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতীয় জাতীয়তায় আর্য্য ছিল এমন একটি Standard বা আদর্শ, যাহার প্রতি ধাবমান হইয়া বিভিন্ন জাতি বৈদিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতেন। প্রাচীন ভারতীয় নেশন বিবিধ ভাষার মধ্যেও একটা সমন্বয় আনয়নের চেষ্টা করিয়াছিল। তাঁহারা বিভিন্ন ভাষাকে মিশ্রিত করিয়া এক করিবার প্রয়াস করিলেন না, ভাষায়ও তাঁহারা একটা Standard বা আদর্শ দাঁড় করাইলেন—তাহাই সংস্কৃত বা দেবভাষা। আদর্শ ধর্ম্ম ও সমাজের কথা এই ভাষার ভিতর দিয়াই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া এই ভাষাকে তাঁহারা Standard বা আদর্শ করিয়াছিলেন। সমাজ ও রাজনীতিতে তাঁহাদের একটি বিশিষ্ট আদর্শ বা Standard ছিল। সমাজ ও রাজনীতি যাহাতে মুষ্টিমেয় লোকের ভোগাধিকারের সাজসরঞ্জামে পরিণত না হয়, তদুদ্দেশ্যে তাঁহারা সমাজ ও রাজনীতিকেও একটি বিশিষ্ট আদর্শাভিমুখে চালিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণত্ব বা Brahmanhoodই ছিল সেই আদর্শ যাহা চিরকাল ভারতীয় সমাজ ও রাজশক্তিকে কঠোর সংযমের পথে পরিচালিত করিয়াছে। আচার্য্য

---

* Aryans and Tamilians হইতে অনুবাদিত।

শঙ্করও তাঁহার গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণত্বস্যহি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকোধর্ম্মস্তদধীনত্বাৎ বর্ণাশ্রমভেদানাম্।" স্বামিজী তাঁহার কোন অসম্পূর্ণ প্রবন্ধে বলেন—"Just as Sanskrit has been the linguistic solution, so the Arya, the racial solution So the Brahmanhood is the solution of the varying degrees of progress and culture as well as that of all social and political problems."*

প্রাচীন ভারতীয় সমাজের এই কয়েকটি বিশেষত্বের কথা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। আজ নব জাতি-সংগঠনের দিনে এই বিশেষত্বগুলি প্রণিধান যোগ্য সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন দেশে বর্ত্তমান আছে তাহা ভারতীয় ভাব বা প্রণালী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। সেই জন্য আমরাই দায়ী। আমরাই ত অবহেলা করিয়া আমাদের সমাজ-তন্ত্রকে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। পাশ্চাত্য সাম্যবাদ ও অধিকার বাদে (rights) সম্মোহিত হইয়া আমরাই ত আমাদের পরম্পরাগত Plan বা প্রণালীকে অবহেলা করিয়াছি। বৌদ্ধ উপপ্লাবনে বিশাল বৈদিক সমাজ একেবারে শিথিল ও পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল। বেদান্তের উচ্চ সার্ব্বজনীন ভাব লোকলোচনের অন্তরালে চলিয়া যাওয়ায় মহাভারতের ক্ষত্রিয়কুলের উন্মূলনের সহিত নানা অবাস্তব জাতীয় সমস্যা উদ্ভূত হওয়ায় ও সমাজের ভিতর প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ড মাত্রের প্রসারে বৈদিক সভ্যতার মৌলিক ভিত্তিভূমি টলটলায়মান হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাহার অসামান্য উদারতা ও সাম্যবাদে উপনিষদের লুক্কায়িত সত্য সমূহকে সমাজের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া বিভিন্ন দেশাগত বর্ব্বর অনার্য্যকুলকে সভ্যতার সোপানে আরোহন এবং পুরোহিতকুলের বিরুদ্ধে মস্তক উন্নত করিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম-জীবনে স্বাধীনতা ও উদার ভাব সমাগম করাইয়া ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভুল হইয়াছিল—উহা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার স্বীকার করে নাই। সেই হেতু স্বধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম প্রভৃতি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের

* India's message to the world

পরিপক্ক ফল সমূহ নির্দ্দয় ভাবে পেষিত হইল; অন্যদিকে নির্ব্বাণের স্বাধীন, উন্মুক্ত বাণী অনধিকারীর কর্ণে পৌছিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তাহার নৈতিক জীবন অবনত করিল। এই বৈদিক সমাজ-তন্ত্র বৌদ্ধযুগে বা তৎপরে আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারে নাই, এমন কি নালন্দা, বিক্রমশীলা বা ওদন্তপুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে উন্নত হইলেও ভারতীয় ভগ্ন জাতীয় প্রাসাদকে পুনঃ সংস্কার করিবার পথে বিশেষ কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। নিজের প্রকৃতি গত নিজস্ব যে বৃত্তি সমূহের স্বাভাবিক উন্মেষ দ্বারা নেশনের সেবার পথ সহজসাধ্য হয়, তাহার প্রতিষ্ঠার নাম স্বধর্ম্ম। পারিবারিক যে সকল কর্ত্তব্য ব্যক্তিগত জীবনে পরিচালন করিতে হইত তাহাই ছিল কুলধর্ম্ম। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সমগ্র বৈদিক সভ্যতার প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহাই ছিল জাতিধর্ম্ম। বৌদ্ধ যুগের পর আর তাহা ভারতীয় জীবনে উন্মেষিত হইবার সুযোগ পায় নাই। এই জাতিধর্ম্ম প্রত্যেক নেশনের প্রাণ। "বৌদ্ধধর্ম্ম আর বৈদিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধ মতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হত ত আমাদের এ সর্ব্বনাশ কেন হল? কালেতে হয় বল্লে কি চলে? কাল কি কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ছেড়ে কাজ কত্তে পারে?

"অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও উপায় হীনতায় বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষকে পাতিত করেছে। * * * উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়—'জাতিধর্ম্ম' 'স্বধর্ম্ম' যেটি বৈদিক ধর্ম্মের, বৈদিক সমাজের ভিত্তি। এই 'জাতিধর্ম্ম' 'স্বধর্ম্ম'ই সকল দেশে সামাজিক কল্যাণের উপায়, মুক্তির সোপান। ঐ 'জাতিধর্ম্ম' 'স্বধর্ম্ম' নাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেশটার অধঃপতন হয়েছে। * * * আপাততঃ এইটি বোঝ যে জাতিধর্ম্ম যদি ঠিক ঠিক থাকে ত সে দেশের অধঃপতন হবেই না। এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে আমাদের অধঃপতন কেন হল? অবশ্যই জাতিধর্ম্ম উৎসন্নে গেছে। * * * অতএব যাকে তোমরা জাতিধর্ম্ম বোলছো, সেটা ঠিক উল্টো। প্রথম, পুরাণ পুঁথি পাটা বেশ করে পড়গে, এখুনিই দেখ তে

পাবে যে, শাস্ত্রে যাকে জাতিধর্ম্ম বলেছে, তা সর্ব্বত্রই প্রায় লোপ হয়েছে। তার পর কিসে সেইটি ফের আসে তারি চেষ্টা কব, তা হলেই পরম কল্যাণ নিশ্চিত।"*

পাশ্চাত্য বৈপ্লবিক মতবাদ সমূহ যাহাতে আমাদের সামাজিক সত্যগতিব পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া নেশন সংগঠনে বাধা না দেয়, তাহার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যাহারা প্রাচীন ভারতীয় জাতীয়তার পুনরুদ্ধারে কায়মনোবাক্যে যত্নশীল তাহাদের সকলেরই ভারতীয় সামাজিক বিধান ও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। সমাজ বর্ত্তমান থাকিলেই তাহার সংস্কার সম্ভবপর। কিন্তু প্রকৃত ভারতীয় সমাজ বহুকাল ভারতবর্ষ হইতে অপসৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রথমতঃ আমাদেব নেশন গঠনোদ্দেশ্যে ভারতীয় আদর্শে সমাজ বদ্ধ হইতে হইবে। প্রাচীন পন্থাবলম্বন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ গঠনের একটা বিশিষ্ট আদর্শ প্রদান করিয়াছেন। সামাজিক মীমাংসা করিতে গিয়া তিনি বলেন—"নিম্ন বর্ণ সমূহকে ক্রমশঃ উচ্চবর্ণে পরিণত করিয়াই সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে, উচ্চবর্ণ সমূহকে অবনত করিয়া নহে। * * * সেই প্রণালীটি কি? একপক্ষে আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং অন্যপক্ষে আদর্শ চণ্ডাল, আর চণ্ডালকে উন্নীত করিয়া ব্রাহ্মণে পরিণত করাই সেই কর্ম্ম প্রণালী"†

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণেতর জাতির জীবনে একটি নূতন স্পন্দন আসিয়াছে। তাঁহারা আপনাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া স্বকীয় ভোগসত্বাধিকার আয়ত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ভাব সমূহ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভারতের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতেছে এবং প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বপ্রকার অধীনতার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহ—ভাব বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। ভোগাধিকার বা rightsরূপ পাশ্চাত্য ভাব যদি আজ জনসাধারণকে প্রমত্ত করিয়া তুলে, তাহা হইলে আমাদের নব জাতীয়তার পথে বিরাট বাধা পড়িবে সন্দেহ নাই। যে নব জাগরণের

---

* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

† Future of India হইতে অনুবাদিত।

উন্মেষ ভারতের ব্রাহ্মণেতর জাতি সমূহের মধ্যে দেখা যাইতেছে, তাহাকে সুপথে পরিচালিত করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় গতি রুদ্ধ হইবে। সহৃদয়ভাবে ভারতীয় সভ্যতার যাবতীয় চিন্তারাশি জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত না হইলে, তাহারা সমবেত হইয়া বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত আর একটি ধর্ম্মমত সংস্থাপিত করিতে পারে ও তাহাতে ভারতীয় সভ্যতার গতি অবরুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রকার সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

"Not a step forward can be made by these inter-caste quarrels, not one difficulty removed ; only the beneficent onward march of events would be thrown back, possibly for centuries, if the fire bursts out into flames It would be a repetition of the Buddhistic political blunders " *

তথাকথিত উচ্চবর্ণের বা নিম্নবর্ণের কাহারও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান এখনও জন্মে নাই। শত শত বৎসরের অধিকার তথাকথিত উচ্চবর্ণেরা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন আর অনভিজ্ঞ নিম্নবর্ণেরাও আর্য্যোচিত পথে স্বকীয় সমস্যা পূরণের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই।

যাঁহারা সমাজের ভিতর আজ পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকার অটুট রাখিয়া অপরকে পরিচালনা করিতেছেন তাঁহারা আর্য্যভাবের দোহাই দিয়াও স্বেচ্ছানুসারে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া আধিপত্য করিতেছেন। পাশ্চাত্য অধিকার বাদে মত্ত না হইয়া যদি ব্রাহ্মণেতর জাতি সমূহ আর্য্য সাধনাকে আপনাদের জীবনে সুপরিণত করিতে পারেন তাহা হইলে সমাজ তাঁহাদিগকে না মানিয়া থাকিতে পারিবে না। যদি নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতি সমূহ আর্য্য সাধনা সম্বন্ধে ভূয়োদর্শন লাভ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহাদের নৈতিক বল ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ সমূহের মধ্যে নূতন উদ্যম আনিয়া দিয়া তাঁহাদের কায়-মনোপ্রাণ আর্য্য সাধনায় নিয়োজিত করিতে বাধ্য করিবে। বিশাল আর্য্য-

* Aryans and Tamilians

সাধনার পুনর্বিকাশের দায় বর্ত্তমান যুগে কেবল ব্রাহ্মণেরই নহে—যথার্থ অধিকারীর। যে কোনও জাতিই হউক না কেন, যিনি এই মহান দায় গ্রহণ করিয়া নেশান গঠনের পথ পরিষ্কার করিবেন, তিনি সম্মানিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের জাতিভেদ কখনও স্থিতিশীল নহে, প্রত্যেক জাতিই ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া যাহাতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন—ইহাই ভারতীয় সমাজের আদর্শ। নানা বর্ণের ক্রম-পরিণতি ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ ভারতীয় সমাজের একটি অতি অভিনব ব্যাপার। ভারতের সামাজিক আদর্শ কোন বর্ণকে ছোট করিয়া রাখিতে চাহে না। "Caste is a natural order" বর্ত্তমান সময়ে সমাজে স্বাভাবিকত্ব বিনষ্ট হইয়া গেলেও আযোচিতভাবে ক্রমপরিণতি লাভই ভারতীয় সামাজিক সমস্যার একমাত্র মীমাংসা বলিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "সহস্র সহস্র বর্ণ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহাদের মধ্যে কত বর্ণ আজকালও ব্রাহ্মণ-বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। কারণ—যে কোনও বর্ণ যদি আজ আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করেন তাহা হইলে কে তাহাকে বাধা দিতে পারে? সুতরাং একটি বর্ণ—তাহার ভিতরে বাহিরে যতই কঠিন নিয়ম থাকুক্ না কেন, এই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" *

ভারতীয় সমস্যা মীমাংসার তিনটি সূত্র স্বামী বিবেকানন্দ দেখাইয়াছেন।

প্রথমতঃ, আমাদের জাতীয় ভিত্তিভূমির উপর শ্রদ্ধা আবশ্যক। যে আধ্যাত্মিক ভাব সমূহকে ভিত্তি করিয়া বিরাট ভারতীয় জন-সাধারণ একটি নেশনে পরিণত হইবে, সেই ভাব সমূহকে ভারতের প্রতি ঘরে পৌছাইয়া দিবার প্রয়োজন স্বামিজী প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। জনসাধারণের ভিতর সহজ ও সরল ভাষায় দার্শনিক মতসমূহ প্রচার করিতে স্বামিজীর কত অনুরাগ ছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় ধর্ম্মের

* Future of India হইতে অনুবাদিত।

অসাম্প্রদায়িক কথাগুলির প্রচারই জাতি-সংগঠনের সর্ব্ব প্রথম কাজ। "My idea is first of all to bring out the gems of spirituality that are stored up in our books and in the possession of the few only, * * * in one word, I want to make them popular" *

দ্বিতীয়তঃ, সহজ ও সরল ভাষায় ধর্ম্মের সার সত্য প্রচারিত হইলেও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যে সুসংযত সাধনা (culture) বর্ত্তমান, তাহা জনসাধারণের ভাষায় নাই। এই সংস্কৃত ভাষার প্রতি ভারতের একটি বিশেষ অনুরাগ আছে। প্রাচীন ভারতীয় মহাপুরুষগণ আপনাদের আবিষ্কৃত সত্য সমূহকে সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিয়া এই ভাষায় শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় সত্য সমূহের প্রতি ভারত-ভারতীর অনুরাগ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত যে medium এর ভিতর দিয়া এই সত্য সমূহ প্রকাশিত তাহার প্রতিও একটা জাতীয় শ্রদ্ধার ভাব থাকিবেই থাকিবে। মধ্যযুগে কবীর, রামানুজ, চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণ উদার ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জনসাধারণকে খুব মাতাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রচারিত আন্দোলন সমূহ প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতি একটা সপ্রেম ভাবাবতারণা করিলেও জাতীয় চিন্তা ও কর্ম্মজীবনে কোন প্রকার অভিনবত্ব আনয়ন করিতে পারেন নাই এবং ভাব প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার প্রচারে মনোযোগ না দেওয়ায় মৌলিক ভাবে তাঁহারা জনসাধারণের ভিতর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। "সেই আচার্য্যগণের শিক্ষাসমূহ তাঁহাদের তিরোধানের এক শতাব্দী মধ্যেই বিফল হইল কেন? তাহার রহস্য এখানে, তাঁহারা নিম্নজাতিকে উন্নীত করিয়াছিলেন। নিম্ন জাতির উন্নয়নে তাঁহাদের কতই আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণের ভিতর সংস্কৃত ভাষা প্রচার করিতে শক্তি নিয়োগ করেন নাই।" †

---

* Future of India.

† Future of India হইতে অনুবাদিত।

"The friars of the Orders founded by Ramananda, Kabir, Dadu, Chaitanya or Nanak were all agreed in preaching the equality of man however, differing from one another in philosophy. Their energy was for the most part spent in checking the rapid conquest of Islam among the masses and they had very little left to give birth to new thoughts and aspirations. Though evidently successful in their purpose of keeping the masses within the fold of old religion and tampering the fanaticism of the Mahammadans, they were mere apologists, struggling to obtain permission to live "*

স্বামিজী মধ্যযুগের এই আচার্য্যগণের প্রশংসা করিতে গিয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। পাঠক এখানে ভুল বুঝিবেন না। স্বামিজী একটি বিশেষ দিক হইতে এখানে তাঁহাদের জীবনী সমালোচনা করিয়াছেন। মধ্যযুগের এই ঐতিহাসিক শিক্ষা হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যাহাতে আমরা অধিকতর অগ্রসর হইতে পারি, তদুদ্দেশে স্বামিজী বলিতেছেন—"উহার (অর্থাৎ সরল ভাষায় ধর্ম্ম-ভাব প্রচারের) সহিত সংস্কৃত শিক্ষারও প্রচার আবশ্যক। কারণ সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণমাত্র আমাদের জাতির ভিতর আত্মমর্য্যাদা, বীর্য্য ও তেজস্বিতা আনয়ন করে।" †

তৃতীয়তঃ, জাতীয় শিক্ষা। জাতীয় শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত কোন সুপরিণত ধারণা নাই। বৈদেশিক সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-প্রণালীর যন্ত্রে পরিপুষ্ট হইয়া আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও প্রণালীতে একটা আপোষের ভাব না আনিয়া পারেন না। শিক্ষা সমস্যায় হাত দিতে গেলেই বৈদেশিক ভাবানুপ্রাণিত বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি আমাদের মনে প্রাণে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা যাহাতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে এই দেশবাসীর দ্বারাই গড়িয়া উঠে তদুদ্দেশ্যে

* National Evolution of India

† Future of India হইতে অনুবাদিত।

স্বামিজী অনেক স্থানে বলিয়াছেন। দেশের যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা একমাত্র যথার্থ জাতীয় শিক্ষার প্রচলন দ্বারাই হইবে—ইহা স্বামিজীর ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। "সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষা আমাদের হাতে আনিতে হইবেই হইবে। কথাটি বুঝিতেছ কি? এই স্বপ্নে তোমাদের আত্মহারা হইতে হইবে, এই বিষয় তোমাদের আলোচনা করিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে এবং অবশেষে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। * * সুতরাং আমাদের আদর্শ এই—দেশের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সমগ্র শিক্ষাকে আমাদের নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং তাহা যতদূর সম্ভব জাতীয়ভাবে জাতীয় পদ্ধতিতে পরিচালনা করিতে হইবে।" * এই জাতীয় শিক্ষা ব্যাপারটি এত বৃহৎ যে সমগ্রভাবে ইহাব আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পল্লীগঠন প্রভৃতি অনেক কিছুই ইহার ভিতর আসিয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে অন্য সময়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবাব ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ) —অবাক্তানন্দ।

মাধুকরী

ভারতবর্ষীয় বিবাহ।

* * * * ভারতবর্ষেব বিবাহের তত্ত্ব জান্‌তে হলে ভারতবর্ষের গৃহমূলক সমাজের তত্ত্ব ঠিকমত জানা চাই। তা হলে সহজেই বোঝা যায় যে, এমন সমাজে বিবাহে নিজের ইচ্ছার পথে চল্‌তে চাইলে বিপদ ঘটে; এখানে বিবাহেব বাঁধ বাঁধা থাক্‌লে সমাজের

---

* Future of India হইতে অনুবাদিত।

বাঁধ টেঁকে। হিন্দু বিবাহ ব্যক্তিবিশেষের রুচি ও প্রবৃত্তির স্বাতন্ত্র্যকে খাতির করে না, ভয় করে। কোন য়ুরোপীয় এই মনোভাবকে যদি বুঝ্‌তে চায় তবে গত যুদ্ধকালের অবস্থা চিন্তা ক'রে দেখুন। সাধারণত য়ুরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহের বাধা নেই। কিন্তু যুদ্ধের সময় যখন একটিমাত্র উদ্দেশ্যের কাছে মানুষের আর সমস্ত অভিপ্রায় ছোটো হ'য়ে গেল, তখন শত্রুজাতির মধ্যে বিবাহ অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিল। এমন কি পূর্ব্ব হতেই যারা বিবাহে বদ্ধ ছিল তাদের মধ্যে কঠোর ভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে সমাজের সঙ্কোচ রইল না। এর কারণ, য়ুরোপে যুদ্ধরত জাতিদের মধ্যে তৎকালে সমবায়ের ভাব নিবিড় হওয়াতে, কেবল বিবাহ নয়, আহার বিহার সম্বন্ধেও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা সকলকে সমভাবে সঙ্কুচিত হয়ে চল্‌তে হয়েছিল। তখন পরস্পরের ব্যবহারের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রায় লোপ পেয়ে গেল। য়ুরোপীয় দেশের সেই অবস্থা অনেকটা পরিমাণে আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। অর্থাৎ এখানে সমস্ত সমাজের একটা সম্মিলিত অভিপ্রায় অত্যন্ত নিবিড়, তাই পালন করাকেই যদি ধর্ম্ম ব'লে স্বীকার করতে হয়, তবে ব্যক্তিগত মানুষের স্বভাবদত্ত প্রবৃত্তি-গুলিকে পদে পদেই সম্বরণ করা চাই। ভারতবর্ষে মানব সভ্যতাকে বিশুদ্ধ রাখবার সমস্যার এই ভাবেই সমাধান হওয়াতে সকলের কাছেই এখানকার সমাজ নানাদিক থেকেই, বিশেষত বিবাহ সম্বন্ধে, ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যের খর্ব্বতা কঠোর ভাবে দাবী করেছে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে হিন্দু সমাজের মধ্যে একটা স্থায়ী যুদ্ধের অবস্থা রয়ে গেছে। কারণ এই সমাজ ভারতবর্ষে একমাত্র সমাজ নয়—নানা প্রকারের ভিন্ন আচার ব্যবহারের দ্বারা এই সমাজ চারিদিকে বেষ্টিত। তাদের আক্রমণ থেকে নিজের সত্তাকে রক্ষা করবার জন্যে একে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়েছে। এইজন্যে এ সমাজ সর্ব্বদাই গড়ের মধ্যে বাস করে। এইজন্যে আত্মপরের ভেদ ও বিরোধ সম্বন্ধে এ সমাজ এত অতিমাত্রায় সসঙ্কোচ ভাবে সচেতন। অন্য কোনো সভ্যদেশে হিন্দুসমাজের মত অবস্থা কোনো সমাজের নেই। এইজন্যে

সে সকল সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এমন থর্ব্বতা ঘটে নি। আমাদের সমাজে এই থর্ব্বতা থাওয়া-ছোঁওয়া প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে—সকলের চেয়ে বেশী বিবাহে,—কারণ বিবাহ গৃহবন্ধনের মূলে, এবং গৃহই আমাদের সমাজের মূলভূত। যাই হোক আমাদের সমাজকে ঠিকমত বিচার কর্‌তে হ'লে বোঝা চাই যে, এ সমাজে যুদ্ধের অবস্থার বিরাম নেই, এবং এই অবস্থা বহুযুগ হ'তে চ'লে আস্‌ছে। এই যুদ্ধের দুর্গ হচ্ছে গৃহ, এই যুদ্ধের যোদ্ধা হচ্ছে গৃহী।

ভারতবর্ষে সমাজের এই অভিব্যক্তি একদিনেই হয় নি। তাকে অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পরিণামের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। পূর্ব্ব ইতিহাসের সেই সকল পরিশিষ্ট অনেক দিন পর্য্যন্ত নূতন কালেও সজীব ছিল। এইজন্যে গান্ধর্ব্ব রাক্ষস আসুর পৈশাচ বিবাহকেও মনু তাঁর সমাজ বিধির মধ্যে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সকল বিবাহে সামাজিক ইচ্ছা নয়, ব্যক্তিগত মানুষের ইচ্ছাই প্রবল। কন্যাকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়া আসুর বিবাহ, তাকে বলপূর্ব্বক হরণ করা রাক্ষস বিবাহ। সুপ্তা বা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়া পৈশাচ বিবাহ। ধর্ম্মশাস্ত্রে এইগুলোকে অগত্যা স্বীকার ক'রেও নিন্দা করা হয়েছে। কেন না অর্থবল, বা বাহুবল, বা রিপুর বল স্বভাবতই উদ্ধত, তা' পরের বিধি মান্‌তে চায় না।

গান্ধর্ব্ব বিবাহও নিন্দিত, কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত এর স্থান ভারতবর্ষীয় সমাজে প্রশস্ত ছিল, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে সাহিত্যে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থিতিশীল সমাজের স্থিতিধর্ম্ম সেই সমাজের সকল শ্রেণীর পক্ষেই সমান প্রবল হ'তে পারে না। স্বভাবতই ক্ষাত্রধর্ম্মে নিবৃত্তির চর্চ্চাকে একান্ত ক'রে তোলা সহজ নয়। যে ক্ষত্রিয় নব নব ক্ষেত্রে আপন চঞ্চল শক্তির সাধনা কর্‌তে ছোটে, তাকে স্থাবর গার্হস্থ্য নীতির জটিল জালে একান্ত বেঁধে রাখা অসম্ভব। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সমুদ্রপারে যেতে নিষেধ, তার কারণই এই। সমাজকে অচল বিধিতে বাঁধ্‌বার জন্যেই সমাজের মানুষকেও সে অচল ক'রে রাখ্‌তে চেয়েছে। কারণ, যে-চলাতে মনকে চঞ্চল কর্‌তে পারে, যাতে

আমাদের চিন্তার, বিশ্বাসের ও ব্যবহারের অভ্যাস কিছুমাত্র ন'ড়ে যায় তাতে আমাদের সমাজের একেবারে ভিতে গিয়ে ঘা মারে। শুধু সমুদ্র যাত্রা নয়, ম্লেচ্ছ দেশে বাসও নিষিদ্ধ ও সমাজে দণ্ডনীয় ছিল। আজকাল পাশ্চাত্যদেশে দেখ্‌তে পাই, বল্‌শেভিক মতকে স্বদেশের মন থেকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে নানা প্রকার বল প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ জিনিষটা সমুদ্র যাত্রা নিষেধের সঙ্গে তুলনীয়। অর্থাৎ এখনকার কালে যে নীতিকে রাষ্ট্র স্থিতির প্রতিকূল বলে গণ্য করা হয় তার সম্পর্ক তিরস্কৃত রাখ্‌বার অভিপ্রায়ে কঠিন শাসন চল্‌ছে। এ সম্বন্ধে জনসাধারণের মতের বা আচরণের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হচ্ছে না। আমাদের দেশে রাজনিষিদ্ধ সাহিত্য এই শ্রেণীর। আজকের দিনে ফ্যাসিজ্‌ম্‌ নামে যে-একটি পীড়নশক্তি পাশ্চাত্য মহাদেশে প্রবল হয়ে উঠেছে, সে হচ্ছে আমাদের সমাজপ্রচলিত নিষেধনীতির অবিকল প্রতিরূপ। ব্রাহ্মণের পন্থা নেবার স্পর্দ্ধা শূদ্র যদি কর্‌ত তবে একদা ভারতে নিষ্ঠুর ভাবে তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। পাশ্চাত্য দেশে ফ্যাসিজ্‌ম্‌, কু-ক্লুক্স্‌-ক্যানিজ্‌ম্‌, লিঞ্চিং প্রভৃতি নানা প্রকার নিষ্ঠুর চেষ্টায় সেই মনোবৃত্তিরই আদর্শ দেখ্‌তে পাই। সমাজে সকল লোকেরই মনোভাব ও আচরণ কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে অবিকল একই রকম হ'লে তাতে ব্যক্তিগত মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্র বিকাশের বাধা দিতে পারে কিন্তু সমাজের স্থিরত্বপক্ষে সেটা যে অনুকূল তাতে সন্দেহ নেই। যে-সমাজ চলিষ্ণুতাকে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করে না সে-সমাজে ব্যক্তিগত ইচ্ছা, রুচি ও বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্যকে কঠোর ভাবে দমন করা হয় না। যে-সমাজ গাছের মতো নয় মন্দিরের মতো, অবৃদ্ধিশীল স্থাবরতাই যার সম্পদ, তার একখানি ইঁটও নড়তে দিলে সেটা ক্ষতি।

কিন্তু এই নিশ্চলতার কঠোর বন্ধনে সমাজের সব মানুষকে সমভাবে বেঁধে রাখা যায় না, সেটা মানবধর্ম্মের বিরোধী, প্রাণধর্ম্মের প্রতিকূল। এইজন্যে কোনো দেশে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণশক্তি সবল থাকে ততক্ষণ প্রাণের চঞ্চলতা নিশ্চল নিষেধগুলিকে নিয়ত আঘাত না করে থাক্‌তে পারে না। এদেশে ক্ষত্রিয়েরা যখন যথার্থ ভাবেই ক্ষত্রিয় ছিলেন

তখন নিত্যনৈমিত্তিক রীতি পালনের অভ্যাসে তাঁদের শক্ত করে বেঁধে রাখা সম্ভব ছিল না। তাই তখনকার কালে ভারত ইতিহাসে ধর্ম্ম-বিপ্লব সমাজ-বিপ্লব যা-কিছু ঘটেছে তা ক্ষত্রিয়দের দ্বারা। এ কথা মনে রাখ্‌তে হবে, বুদ্ধ ছিলেন ক্ষত্রিয়, মহাবীর ছিলেন ক্ষত্রিয়, কৃষ্ণ যে-যদুবংশের লোক ছিলেন সে বংশের রীতি নীতি একবারেই সাধুশাস্ত্র সম্মত ছিল না। সমস্ত মহাভারত পড়্‌লে বারে বারেই এ কথা মনে আসে যে, সেই প্রাচীনকালে সমাজের পাকা বাঁধ বাঁধ্‌বার চেষ্টা যতই থাক্ তাকে নানা প্রকারে লঙ্ঘন না ক'রেছে এমন বিখ্যাত বংশ একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। একদিন অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালে যখন ভারতে ক্ষত্রিয়ের অভিভব হয়ে ব্রাহ্মণই সমাজে প্রায় একেশ্বরতা লাভ করেছে, তখনই সমাজবন্ধন এমন কঠিন দৃঢ় হ'য়ে উঠ্‌তে পেরেছে। প্রাচীনকালে ভারতে স্থিতিশীল সমাজের ক্ষেত্রের মাঝখান দিয়েই গতিশীল প্রাণের ধারা প্রবাহিত হবার একান্ত বাধা ঘটে নি। এইজন্যে তখন নানা উপলক্ষেই ধর্ম্মশাস্ত্রকে বল্‌তে হয়েছে, "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

মনু বলেছেন, বর কন্যার পরস্পর ইচ্ছা সংযোগে বিবাহকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। কিন্তু তাকে কামসম্ভব বলে তিনি একটু খোঁটা দিয়েছেন। কামনার দীপ্ত মশাল যে-বিবাহে পথ দেখায় সে বিবাহের মুখ্য লক্ষ্য সমাজবিধিরক্ষা নয়, প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। এমন কি, অপেক্ষাকৃত শিথিলবন্ধন য়ুরোপীয় সমাজেও নরনারীর দ্বন্দ্ব-সংঘটনে কামনার বেগে মানুষকে পদে পদে যে অসামাজিক সঙ্কটে নিয়ে যায় তা সকলের জানা আছে। কিন্তু সেখানকার সমাজ অনেকটা চলিষ্ণু বলেই এরকম সঙ্কট সমাজের পক্ষে আমাদের দেশের মতো একেবারে সাংঘাতিক হয় না। আমাদের শাস্ত্রে ব্রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য। এই বিবাহের রীতি অনুসারে কন্যাকে বর প্রার্থনা করবে না, অযাচক বরকে কন্যাদান করতে হবে। বর যে-কন্যাকে নিজে প্রার্থনা করে তার সামাজিক উপযোগিতাকে সে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করতে পারে না। অতএব বিবাহ অনুষ্ঠানকে সামাজিক হিসাবে যদি বিশুদ্ধ রাখ্‌তে

হয়, তবে বর কন্যার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সতর্ক ভাবে বাঁচিয়ে চলতেই হবে। য়ুরোপে রাজকুলে বিবাহে যে রকম কঠিন ও সঙ্কীর্ণ নিয়ম আমাদের সমাজে সর্ব্বত্রই তাই।

ভারতবর্ষে বিবাহ রীতির মূলে যে মনোভাবটি আছে কোনো য়ুরোপীয় যদি তা স্পষ্ট ক'রে বুঝ্‌তে চান তাহলে পাশ্চাত্যে আজকাল সৌজাত্য নিয়ে (Eugenics) যে আলোচনা চল্‌ছে সেইটে বিচার ক'রে দেখ্‌লে সুবিধা হ'তে পারে। বিজ্ঞান ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে যথেষ্ট আমল দিতে চায় না। বিবাহে সুসন্তান হ'বে এই যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে কামনা প্রবর্ত্তিত পথকে নিষ্ঠুর ভাবে বাধা না দিলে চলে না। বিজ্ঞান বলে, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যেখানে কোনো বংশসঞ্চারী দৈহিক রোগ বা মানসিক বিকার আছে সেখানে রাজদণ্ডের বা সমাজ শাসনের সাহায্যে বিবাহকে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। একথা স্বীকার কর্‌লেই বিবাহকে ভাবাবেগের টান থেকে সরিয়ে এনে বুদ্ধির এলেকায় দাঁড় করাতে হয়। কেন না ভাবাবেগকে এঁর মধ্যে স্থান দিতে গেলেই সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠে। ফলাফল বিচার কর্‌তে সে চায় না, বিচারকের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ সর্ব্বদাই অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবেই। ভারতবর্ষ নির্ম্মম ভাবেই তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

য়ুরোপীয় সমাজের মূল প্রকৃতি রাষ্ট্রিক, আর্থিক, তার আকার, আয়তন ও প্রভাব যতই বৃহৎ ও প্রবল হ'য়ে উঠবে ততই তার প্রয়োজনের কাছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বলি দিয়ে চল্‌তে হবে। তার নানা লক্ষণ সেখানে দেখা যাচ্ছে। আমাদের দেশে সমাজের মূলপ্রকৃতি সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ শ্রেণী বিশেষের আচার ধারাকে রক্ষা করার দ্বারা তার ধর্ম্মকে (Culture) বিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থাতন্ত্র। এই ব্যবস্থার প্রয়োজন একদা অত্যন্ত বলবান হওয়াতে তার কাছে ব্যক্তিগত বিচার ও ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্যকে এদেশে অত্যন্ত খর্ব্ব করা হয়েছে। আমাদের দেশের সমাজনীতি ও বিবাহরীতি আলোচনা কর্‌বার সময় আমাদের দেশের এই সামাজিক সমস্যার কথা বাহিরের লোকের চিন্তা ক'রে দেখা দরকার।

পূর্ব্বেই বলেছি, ক্ষত্রিয়েরা বিবাহে কড়া নিয়মের শাসন তেমন ক'রে মানেন নি। কিন্তু সেই না-মানাটা সমস্ত সমাজের আদর্শকে যে পীড়া দিত, তা কালিদাসের কাব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। সমাজনীতি রক্ষার উদ্দেশে ভারতবর্ষের বিবাহ যে-সৌভ্রাত্যের প্রতি লক্ষ্য করত, তার সম্বন্ধে কবির বিশেষ বেদনা ছিল সন্দেহ নেই। অথচ বিশ্বের লীলাময়ী প্রাণ-প্রকৃতির মাঝখানে নরনারীর স্বাভাবিক প্রেমচাঞ্চল্যের সৌন্দর্য্য বিকাশও কবির চিত্তকে মুগ্ধ করেছে। কালিদাসের প্রায় সকল বড় কাব্যেরই মধ্যে এই দ্বন্দ্ব দেখা যায়। ভরতবংশের জন্ম ভারত ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা, অথচ এই বংশের আদিতে প্রবৃত্তির আকর্ষণে স্ত্রীপুরুষের যে আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল কবি তাঁর নাটকে তার বৃত্তান্তকে সৌন্দর্য্যদৃষ্টিতে স্বীকার ক'রেও অবশেষে কল্যাণদৃষ্টিতে শোধন ক'রে নিয়েছিলেন। তপোবনে অরণ্যের সহজশোভার মধ্যে শকুন্তলা সেখানকার তরুলতার সঙ্গে সঙ্গেই নব যৌবনে দেহে মনে হিল্লোলিত হ'য়ে উঠেছে। সেখানে প্রকৃতির ইঙ্গিত সব জায়গাতেই, সমাজ শাসন এখনো তার তর্জ্জনী তোলবার অবকাশ পায় নি। এই অবস্থায় দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার যে-মিলন ঘটেছিল, সমস্ত সমাজের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ঘট্‌তে পায় নি। কবি বল্‌লেন সেই কারণে এর মধ্যে একটা অভিশাপ র'য়ে গেল। সে হচ্ছে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃতির প্রতি অভিশাপ। শকুন্তলা আতিথ্যধর্ম্ম পালন করতে ভুলে গেলেন, তার কারণ, প্রকৃতি যখন আপন উদ্দেশ্য সাধনে লাগে তখন অন্য সব উদ্দেশ্যকে খাটো ক'রে দেয়। এইখানে জৈব ধর্ম্মের সঙ্গে মানব ধর্ম্মের বিরোধ বাধল। রাজসভায় শকুন্তলার প্রেমের উপর অপমানের বজ্র এসে পড়্‌ল, তার যে বাঁচবার পথ ছিল না।

সপ্তমাঙ্কে যে-তপোবনে রাজার সঙ্গে তপস্বী কন্যার স্থায়ী মিলন ঘটল সেখানে প্রকৃতির প্রাণলীলাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে কবি তপস্যার কঠোর মূর্ত্তিকেই সর্ব্বত্র প্রকাশ করলেন। সেখানে মহর্ষি তখন পতিব্রতধর্ম্ম ব্যাখ্যায় নিযুক্ত ছিলেন। শকুন্তলা সেখানে ব্রতধারিণী জননী মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নরনারীর মিলনের

দুই বিরুদ্ধ মূর্ত্তিকে কবি এই নাটকে উজ্জ্বল করে দেখিয়েছেন। ভরতজন্মের ভূমিকাটিকে তিনি তপস্যার অগ্নিদাহনে শুচি করে দিয়ে বলেছেন প্রেমের এইত চরিতার্থতা। কেন না জৈব প্রকৃতি যখন প্রেমের সারথ্য নেয় তখন সে যে প্রবৃত্তির জোয়ালে তাকে বাঁধে। কিন্তু ধর্ম্ম যখন তার চালক হয়, তখন সে-প্রেম মুক্তিরূপে প্রকাশ পায়। নিবৃত্তিশান্ত আত্মত্যাগরত প্রেমের সেই অচঞ্চল মুক্ত স্বরূপই পরমসুন্দর। কবি এই কথাটিকে শাস্ত্র উপদেশের আকারে ব্যাখ্যা করেন নি, তিনি সুন্দরের সংযত গম্ভীর কঠোর নির্ম্মল মূর্ত্তিটিকে মোহ আবরণ থেকে মুক্ত ক'রে তার নাটকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর কুমারসম্ভবেও এই একই কথা। সে কাব্যে কবি নরনারীর চিরকালীন প্রেমের পবিত্র দৈবস্বরূপ দেখিয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই যে, যখন দৈত্য জয়ী হয়, দেবতাব পরাভব ঘটে, তখন নরনারীর প্রেম তপস্যা হ'য়ে স্বর্গকে উদ্ধার করে। সংসারে পাপবিজয়ী কুমারের জন্মই দেবতাদের চিব-আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার। সেই কুমারকে আনতে গেলে কামনার উদ্দাম বেগকে নিরস্ত ক'বে দিয়ে নিবৃত্তিপূত সাধনাকে আশ্রয় করতে হবে। সিদ্ধিব সেই কঠোররূপই যথার্থ সুন্দর; শিব রূপবান নন্ ব'লে যখন উমার কাছে তাঁর নিন্দা কবা হয়েছিল তখন উমা এই ভাবেই তার উত্তর দিয়েছিলেন। মোহের সৌন্দর্য্যকে বসন্তপুষ্পাভরণে আসতে হয় কিন্তু মুক্তির সৌন্দর্য্য নিরাভরণ।

যাই হোক্, কালিদাসের রঘুবংশই হোক্, কুমারসম্ভবই হোক্ আর ভরতজন্মের আখ্যানমূলক অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকই হোক্, তিনের মধ্যেই বিবাহ সম্বন্ধে ভারতীয় কবির মনের কথাটি ব্যক্ত হয়েছে। বিবাহকে তিনি তপস্যা বলেছেন;—এই তপস্যার পন্থা কিম্বা এর লক্ষ্য আত্মসুখভোগ নয়। এর পন্থা হচ্ছে কামনাদমন এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে কুমারসম্ভব, যে-কুমার সমস্ত কু, সমস্ত মন্দকে মারবে, স্বর্গরাজ্যকে ব্যাঘাতশূন্য ক'রে দেবে।

কালিদাসের এই তিন কাব্যেরই ভিতরকার বেদনা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁর সময়ে ক্ষত্রিয় রাজারা বিবাহে সংযত আর্য্য আদর্শ লঙ্ঘন

ক'রে কামনার অনুসরণে সমাজে অপজনন (Degeneracy) ঘটা-চ্ছিলেন। এই সর্ব্বনেশে ব্যাঘাতকে দূর করবার জন্যে শিবের জ্ঞান নেত্রের ক্রোধাগ্নির প্রয়োজন হয়েছিল। নইলে সমাজকে দৈত্যরাজকতা থেকে বাঁচাবার উপায় ছিল না। তাই কবি বিবাহকে কন্দর্পের শাসন থেকে উদ্ধার করে শিবের তপোবনে আহ্বান ক'রে আন্‌তে চেয়ে ছিলেন।

যাই হোক্, কবির এই কাব্যগুলি থেকে ভারতীয় বিবাহের যথার্থ আদর্শ যেমন বোঝা যায় এমন কোনো ধর্ম্মশাস্ত্র থেকে নয়। এতে তিনি প্রবৃত্তির আকর্ষণের সঙ্গে ধর্ম্মের দাবীর সংগ্রাম দেখিয়েছেন। প্রকৃতির প্রাণলীলার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে, তাকে তিনি একটুও খাটো করেন নি, কিন্তু মানুষের তপস্যার মহিমাকে তার উপরেও জয়ী ক'রে দেখিয়েছেন। কেন না মানুষকে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে হবে, সেই মুক্তির শরীরীরূপ হচ্ছে কুমার—কুমারই মুক্তি সংগ্রামের বিজয়ী বীর; সমাজকে পাপ থেকে, পরাভব থেকে সে রক্ষা করে।

এইখানে প্রশ্ন ওঠে, বিবাহ থেকে ইচ্ছাকে যদি সম্পূর্ণ নির্ব্বা-সিত করা হয়, তা হলে দাম্পত্যের মধ্যে প্রেমের স্থান হয় কি ক'রে? এ দেশের সঙ্গে যাদের যথার্থ পরিচয় নেই এবং যাদের বিবাহপ্রথা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরূপ তারা গোড়াতেই ধরে নেয় যে আমা-দের বিবাহ প্রেমহীন। কিন্তু সেই ধারণা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা আমরা প্রত্যক্ষ জানি। খাঁটি প্রেম নরনারীর স্বেচ্ছাসম্মত বিবাহেও যে সুলভ নয়, তার অনেক প্রমাণ প্রত্যহ পাওয়া যায়। বিবাহকে যদি মান্‌তে হয়, তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, মানুষ এমন কোনো ব্যবস্থাই করতে পারে না, যাতে বিবাহের পূর্ব্বে যা স্থির করা যায়, স্ত্রীপুরুষের সুদীর্ঘ বিবাহিত কালে তা' অক্ষুণ্ন সত্য হ'য়ে টিঁক্‌তে পারে। এইজন্যেই বাইরের দিক থেকে এত লোক লজ্জা, এত আইনের শাসন। অথচ যে-সম্বন্ধ পরস্পর প্রেমের উপরেই সত্য, যখনই তাকে বাহিরের বাঁধনে জোর ক'রে বাঁধা যায়, তা অত্যন্ত অশুচি হয়, তার মত দুঃখ অপমান মানুষের পক্ষে আর কিছুই নেই। সন্তানের দায়িত্ব চিন্তা ক'রে মানুষ এ সমস্তই স্বীকার করেছে কিন্তু আজো কোনো সমাজই

বলতে পারে নি যে বিবাহ-সমস্যার নির্দ্দোষ সমাধান সে করেছে। সর্ব্বত্রই অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, তারপরে আকস্মিক সুযোগ দুর্য্যোগের ভিতর দিয়ে হয় তলায় তলানো, নয় ঘাটে পৌছনো হ'য়ে থাকে।

এই সমস্যার সমাধান চিন্তা করতে গিয়ে ভারতবর্ষ বলেছে বিবাহের গোড়াতেই ইচ্ছার বেগকে স্বীকার না করাই নিরাপদ। কেননা ইচ্ছা কল্যাণ বিচার করতে অসমর্থ। তা হ'তে পারে, কিন্তু যে-ইচ্ছার সঙ্গে লড়াই সেটা যে প্রকৃতির সব চেয়ে বড় সৈনিক। যখন সে অস্ত্র উদ্যত করে তখন তাকে ঠেকাবে কে? ভারত বলেছে, যে-ইচ্ছা স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব ঘটায় তার একটা বিশেষ বয়স আছে। অতএব যদি বিবাহকে সমাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছানুমত করাই শ্রেয় হয়, তবে সেই বয়সের পূর্ব্বেই বিবাহ চুকিয়ে দেওয়া ভালো। ভারতে অল্প বয়সে বিবাহের মূল কারণই হচ্ছে এই।

মনে আছে কোনো একজন কৃষিতত্ত্বজ্ঞের কাছে যখন আক্ষেপ করে বলেছিলুম, যে আমাদের দেশে সাধারণ গোচারণ ভূমি প্রত্যহ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসাতেই গোজাতির অবনতি হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন, মাঠে স্বেচ্ছাচারণের দ্বারাই গোরুরা উপযুক্ত খাদ্য পায়, এটা কল্পনা করা ভুল। প্রয়োজনমত বিশেষ খাদ্য চাষ করে সেইটে গোরুকে খাওয়ানোই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসঙ্গত। দাম্পত্য প্রেম সম্বন্ধে সেইভাবেই আমাদের দেশে তর্ক উঠেছিল। আমাদের দেশ বলেছিল স্বেচ্ছা-উদ্গত প্রেমের উপর ভরসা নেই, প্রেমের চাষ করতে হবে। তার আয়োজন হয়ে থাকে বিবাহের পূর্ব্ব থেকেই। স্বামী বলে একটি ভাবকে শিশুকাল হতেই বালিকারা ভক্তি করতে শেখে। নানা কথা কাহিনী ব্রত পূজার ভিতর দিয়ে এই ভক্তিকে মেয়েদের রক্তের সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে স্বামীকে যখন পায় তখন তাকে তারা ব্যক্তি বলে নয় স্বামী বলে দেখে। সেই স্বামী অনেকখানিই তাদের নিজেরই মনের জিনিষ, বাইরের জিনিষ নয়। বিচার বুদ্ধি পরিণত হবার পূর্ব্ব

হতেই বিশেষ ব্যক্তির উপরে এই স্বামীভাব আরোপ করে দিনে দিনে এই পতিগত সংস্কার তাদের দেহমনকে অধিকার করে তোলে। নানা প্রকার সেবা ও ব্যবহারের দ্বারা এই সংস্কার কেবলি প্রবল হতে থাকে।

আমাদের সমাজে সতী স্ত্রীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও একটা সংস্কারের প্রচলন আছে। স্ত্রীর প্রতি সাধ্বী গৃহিণী ভাবে একটি ভক্তি-ভাবের চর্চ্চা আমাদের দেশে দেখা যায়। অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের প্রেম বলে যে একটি স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি আমাদের আছে তাকে অতিক্রম করে দাম্পত্যপ্রেম নামক একটি সামাজিক হৃদয় বৃত্তিকে সাধনার দ্বারা গড়ে তোলবার বিশেষ চেষ্টা আমাদের দেশে আছে। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, মেয়েদের স্বভাব হৃদয়-প্রবণ (Emotional) বলে এই দাম্পত্যপ্রেম মেয়েদের পক্ষে যত সহজ হয়েছে, পুরুষের পক্ষে তত সহজ হয় নি। পুরুষের পক্ষে দাম্পত্য একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে সমাজের কিঞ্চিৎ অনুমোদন আছে, কিন্তু কিছুমাত্র অনুশাসন নেই। এমন কি, স্ত্রীর বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে এই একনিষ্ঠতা লঙ্ঘনের পক্ষে বিশেষ বিধিরও অভাব নেই। তা ছাড়া অবৈধ লঙ্ঘনকে শাসন কর্‌বার সামান্য চেষ্টা মাত্রও দেখা যায় না। বস্তুত একপক্ষে দাবীকে অত্যন্ত বেশি কড়া করার দ্বারাই অন্যপক্ষে শিথিলতাকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে।

অতএব ভারতীয় বিবাহের বিচার কর্‌তে হলে একথা জানা চাই যে এ-বিবাহে স্ত্রী পুরুষের অধিকারের সাম্য নেই। এখানে অধিকার বল্‌তে আমি বাহ্য অধিকারের কথা বল্‌ছি নে। এই অসাম্যের দ্বারা স্ত্রীলোকের চরিত্রহীনতা ঘট্‌তে পারত। তা যে ঘটেনি তার কারণ স্বামী তার পক্ষে আইডিয়া। ব্যক্তির কাছে পাশববলে সে নত হয় না, আইডিয়ার কাছে ধর্ম্মবলে সে আত্মসমর্পণ করে। স্বামী যদি মানুষের মতো হয়, তা হলে স্ত্রীর এই আইডিয়াল প্রেমের শিখা তার চিত্তেও সহজে সঞ্চারিত হয়। আমরা এমন দৃশ্য দেখেছি। এই আইডিয়াল প্রেম হচ্ছে যথার্থ মুক্ত প্রেম। এ প্রেম প্রকৃতির মোহবন্ধনকে উপেক্ষা করে।

একথা মনে রাখা চাই, ভারতসমাজ গৃহকেও চরম বলে স্বীকার করে নি। মুক্তির অন্বেষণে একদিন গৃহকে পরিত্যাগ করতে হবে এই ছিল তার উপদেশ। ভারতের উদ্দেশ্য ছিল গৃহকে মুক্তির পথের সোপান করে গড়া। সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে আজও আমাদের দেশে অনেক গৃহী গৃহ ছেড়ে তীর্থে বাস করে। ভারত সভ্যতার মূলে এই একটি স্বতোবিরোধ আছে। একদিকে এ সভ্যতা গৃহপ্রধান, এবং এই গৃহ মানুষের সঙ্গে আপন সম্বন্ধ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে স্বীকার করে। ভারত আবার আর একদিকে আত্মার মুক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে সকল সম্বন্ধই একে একে ছিন্ন করতে বলে। সম্বন্ধকে স্বীকার করতে বলবার কারণ এই যে, তার মধ্য দিয়ে না গেলে তাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। মানুষের মনে যে সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে তাদের ক্ষয় করতে গেলেও তাদের ব্যবহার করতে হয়। এই ব্যবহারকে নিবৃত্তির দ্বারা নিয়মিত করে তবে প্রকৃতির বন্ধনগুলিকে একদিন কাটানো সম্ভবপর হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের এই তফাৎ। প্রকৃতির শাসন সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্ম গোড়া থেকেই একেবারে নৈরাজ্যপন্থী anarchist।

* * * এককালে ভারতের তপস্বী ছিল গৃহী, কারণ গৃহ তখন মুক্তিপথের চরম বাধা ছিল না, আজকালকার দিনে ভারতে কোনো বড় তপস্যা গ্রহণ করতে গেলে গৃহত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই, কারণ গৃহ একটা গর্ত্ত হয়ে উঠেছে। আজ ভারতের দুর্গতির প্রধান কারণ তার গৃহধর্ম্মের গভীরতা। অর্থাৎ গৃহের সেই প্রবল ও বিচিত্র দাবী যাতে মানুষের সকল শক্তিকে আশাকে তলার দিকেই নিয়ে যায়, ঘাটের দিকে না। এই গার্হস্থ্যের আবর্ত্তে প্রতিদিন ভারতের বড় বড় নৌকাডুবি চল্‌ছে, এই আমাদের সকলের চেয়ে দুঃসহ ট্রাজেডি। উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য করে তোলার মানেই হচ্ছে ছোটোকে বড় করে তোলা। পথকে আলয় করে যে, তার মত দরিদ্র আর নেই। বিশ্বকেই স্বীকার করবার অনুশীলনক্ষেত্র ছিল যখন গৃহ, তখন গৃহের দাবী মানুষকে ছোটো করে নি। আজ হিন্দু-সমাজে সেই দাবী নিজের

দিকেই অত্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে বলে মানুষকে অত্যন্ত ছোটো করছে। আমাদের যে-ত্যাগ বিশ্ববিধাতার প্রাপ্য প্রতিমুহূর্ত্তে সেই ত্যাগ গৃহের উপদেবতা চুরি করছে; এই চুরি স্বীকার করেও যারা স্বচ্ছন্দে থাকতে অভ্যস্ত হয়েছে বিশ্বসমাজে তাদের স্থান দাসশালায়। আজ ভারতবাসী বিশ্বসমাজের পরিত্যক্ত, গৃহগুহার অচল অন্ধকারে সেই অকিঞ্চনের নির্ব্বাসন। এইখানে আপন প্রদীপ জ্বেলে, আপন দেবতার বেদী প্রতিষ্ঠা ক'রে বরঞ্চ নারী আপন মহিমা রক্ষা করতেও পারে, কিন্তু পুরুষ এখানে বন্দী এখানে তার নিরন্তর আত্মবিস্মৃতি। পুরুষের আত্মবিস্মৃতির সেই অপরিসীম অবসাদে সমস্ত ভারতবর্ষ আজ ভারগ্রস্ত। * * *

আজও মানুষের মধ্যে সভ্যতায় আধ্যাত্মিক প্রয়োজনকে ঠিকমতে স্বীকার করা যায় নি। এইজন্যে, বিবাহে আজও স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ সত্য হয় নি। আজও সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছু না কিছু বিরোধ ও কোনো না কোনো পক্ষের অবমাননা আছে। তাই আজও বিবাহে গায়ের জোর আপন জায়গা ছাড়তে চাচ্ছে না, স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা ও সন্দেহ নিত্য আন্দোলিত। এইজন্যেই মানুষের সব চেয়ে বড় দুঃখদুর্গতি বড় অপমান ও গ্লানি নর নারীর এই বিবাহ সম্বন্ধেই। কিন্তু যাঁরা মানব-সমাজে আধ্যাত্মিকতা বিশ্বাস করেন তাঁরা বিবাহ সম্বন্ধকে সামাজিক পাশব-বলের অত্যাচার থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে সমাজে প্রেমের শক্তিকে সত্যভাবে বিকীর্ণ করবার উপায় অন্বেষণ করবেন তাতে সন্দেহ নাই। বিবাহ অনুষ্ঠানে এখনো সমস্ত প্রথায় অভ্যাসে ও আইনে আমরা বর্ব্বর যুগে আছি ব'লেই বিবাহ আজও নর নারীর মিলনকে পূর্ণ কল্যাণ-রূপে প্রকাশ না করে তাকে আবৃত ক'রে রেখেছে। সেই-জন্যেই আমাদের দেশে কামিনী-কাঞ্চনকে দ্বন্দ্ব সমাসের সূত্রে গেঁথে নারীকে ইতর ভাষায় অপমান করতে পুরুষ কুণ্ঠিত হয় না। কেন না পুরুষ এখানে এখনো মনে করে যে সেই হ'ল মানুষ, তারই মুক্তি মানুষের একমাত্র লক্ষ্য, নারীকে সে কাঞ্চনের মতই নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে স্বীকার করতেও পারে ত্যাগ করতেও পারে। ত্যাগ

করার দ্বারা সে যে আত্মহত্যা করে তা সে জানেই না। তা ছাড়া নারীর মাধুর্য্য বিলাসসামগ্রী নয়, তা যে মানুষের সকল সাধনাতেই পরম সম্পদ একথা বোঝবার মতো সময় তার আজও হ'ল না,—আমাদের সর্ব্বব্যাপী শক্তিহীনতার সে একটা প্রধান কারণ।

(প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩২)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। পুরাতন এবং আধুনিক বিবাহ প্রথার সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই বলিয়াছেন। হিন্দুর ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রথার গুণানুকীর্ত্তন তিনি পরোক্ষভাবে করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মুখে, নিজে নিরপেক্ষভাবে থাকিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তথাপি আমরা ইহার মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাই। যে সকল নব্য ভারত ভারতী বিবাহাদি সম্বন্ধে হিন্দুর প্রাচীন রীতি নীতি বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অল্প নহে। স্বামী বিবেকানন্দ 'বর্ত্তমান ভারতে' বিবাহ সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন, "একদিকে নব্য ভারত ভারতী বলিতেছেন, পতি-পত্নী নির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত। কারণ যে বিবাহে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব; অপর দিকে প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এ দেশের ধারণা। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখ-ভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।"

'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধের সহিত আমরা সর্ব্বতোভাবে একমত না হইলেও আজ জীবনসায়াহ্নে শ্রদ্ধেয় কবিবর ভারতীয় বিবাহের প্রাচীন

রীতি নীতির যে প্রশংসা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা সুখী হইলেও কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই ; কারণ, ইহা তো নূতন নহে ! ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র এবং প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণও একদিন এইরূপই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন !! যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ-ব্যাস-সংবাদের একটি শ্লোকের কথা আমাদেব মনে হইতেছে,—

"জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ ।
যদ্বাক্যতোধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ ॥"

১স্ক । ৫অ । ১৫ শ্লো ।

অতএব হে ব্যাস ! তুমি হরিযশঃ প্রাচুর্য্য বর্ণনাভাবে ভারতাদিতে যে ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছ তাহা তোমার অকিঞ্চিৎকর, প্রত্যুত বিরুদ্ধই হইবে। কারণ স্বভাবতঃ কাম্যকর্ম্মাদিতে অনুরাগী পুরুষের পক্ষে তুমি নিন্দনীয় কাম্যকর্ম্মাদি ধর্ম্মার্থে অনুশাসন কবিয়াছ, ইহাতে তোমাব মহা অন্যায় হইযাছে, যেহেতু তোমার বাক্যে বিশ্বাস কবিয়া ইতর ব্যক্তিবা কাম্যকর্ম্মাদিকেই মুখ্য ধর্ম্মরূপে স্থির করিবে, তদ্রূপের নিবারণ বা তুমি স্বয়ং নিবারণ করিলেও আব মানিবে না।

সত্যের পূজা।

পরম কারুণিক ঈশ্ববেব কৃপায় আমাদের জীবন সফল হউক। আমরা যেন দৃঢ় ও বীর্য্যবান হই ; আমাদের সত্যনিষ্ঠা অচল ও অটল হউক। অসত্য হইতে আমাদের মন মুক্তিলাভ করুক। আমাদের চিন্তাস্রোত সত্যের দিকে ধাবিত হউক। সত্যের উপলব্ধিতে আমাদের সমস্ত জীবন ব্যয়িত হউক। আমাদের অন্তঃকরণ হইতে সকল প্রকাব মোহ স্খলিত হউক। সর্ব্বোপরি আমাদের ভগবৎপ্রেম প্রবল হউক। আমাদের বুদ্ধির বিচারশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ হউক যেন কোন কিছুতে আমরা প্রলুব্ধ বা প্রতারিত না হই। আমরা যেন সর্ব্বদা শ্রীভগবানের প্রতি পরম বিশ্বাসী হই। আমরা যেন তাঁহাকে অদ্বিতীয় প্রভুরূপে উপলব্ধি

করিতে পারি। অন্ধকারের দিকে ধাবিত না হইয়া যেন কেবল তাঁহারই পূজা করি। তিনিই আমাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন তিনি ব্যতীত আমাদের অন্য কেহই রক্ষকর্ত্তা নাই। তিনি আমাদের সুখ ও শান্তি দান করুন।

সত্যই অমর, সত্যই অজেয়। যাঁহারা সত্যের উপাসনা করেন কেবল তাঁহারাই পরমানন্দের অধিকারী, অন্য কেহ নহে। সত্য যেন আমাদের জীবনসৌধের ভিত্তিভূমি হয়। এস আমরা সত্যের জন্য প্রাণপাত করি। সত্য হইতে আমাদের সমস্ত অনুপ্রেরণা আসুক এবং অসত্যকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা যেন কেবল সত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারি। সত্য-লাভ করিবার জন্য প্রত্যেক জিনিষ আমাদের সহায় হউক। আমরা যেন কিছুতেই নিরাশ না হই। সত্য নিষ্ঠায় আমাদের সমস্ত জীবন পবিত্র হউক। সত্যই কেবল আমাদের আত্মাকে চিরতৃপ্তি প্রদান করে। শারীরিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য পায়ে ঠেলিয়া যাঁহারা সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহারাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারাই সত্যলাভ করেন। সত্যের এক কণিকা মাত্রও বিনষ্ট এবং সত্যলাভ করিবার জন্য অতি অল্প চেষ্টাও বিফল হয় না। চাই কেবল আমাদের ধৈর্য্য, অধ্যবসায় এবং ঈশ্বর পদে অটল বিশ্বাস। আর কি চাই? কেবল সত্যের জন্য জীবন ধারণ কর। অর্থাৎ ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ কাহারও মতামতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সত্যের বিকাশ ও আলোক দর্শনের জন্য বাঁচিয়া থাক। সত্যই আমাদিগকে সাহসী করে, কারণ যখন আমরা কোন বিষয় জানি না তখন সন্দেহ করি, ইতস্ততঃ করি, আমাদের বাক্যে ও কর্ম্মে বিশ্বাসের অভাব হয়, কিন্তু যিনি সে বিষয়টি জানেন তাঁহার এরূপ হয় না। তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র চিন্তা সত্যের প্রচার করা, এবং জীবনকে সত্যময় করিয়া তোলা। সেইজন্য ঋষিগণ এমন নির্ভীক ভাবে সত্যের মহিমা গান করিয়াছেন। সত্যের পূজা, বিশ্বাসের শক্তি, সর্ব্বাঙ্গীন নির্ভীকতা প্রদান করে।

মানুষ যখন সত্যের উপাসনা করে, তখন তাহার মোহান্ধকার অন্তর্হিত হয়, বন্ধন ঘুচিয়া যায়। কিন্তু আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে

হইবে, কারণ যতক্ষণ না আমরা নিজেদের বিলাইয়া দিব, ততক্ষণ আমরা সত্যের মহিমা ও সত্যের আলোক দেখিতে পাইব না। চাই কেবল আমাদের দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য ও আত্মানুরক্তি। নিজেদেব প্রতি অকপট থাকিলে আমবা আমাদের আদর্শের প্রতি ও জীবনেব প্রতি প্রকৃতভাবে অকপট থাকিব। অকপটতা ও নিঃস্বার্থপরতার সহিত যাঁহারা সত্যের সেবা ও পূজা করেন তাঁহাবাই সুখী। জগজ্জননী তাঁহাদের রক্ষা করেন। কেন বা না করিবেন ? শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥"

৯ম অধ্যায়, ২২শ শ্লোক।

এমন কি তিনি তাঁহাদেব সাংসারিক অভাবও দূব করেন। এই সমস্ত কথা প্রকৃত ও সত্য এবং তুমি যতই এই আদর্শানুযায়ী জীবন যাপন করিবে ততই তুমি এই সমস্ত প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিবে। শিশুর ন্যায় বিশ্বাসী হও, তবেই সত্য পাইবে। বিশ্বাসবলেই সত্যলাভ হয়, বিচারশক্তি দ্বারা নহে। মাতা পিতা যাহা বলেন শিশুগণ তাহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে এবং যে পর্য্যন্ত আমবা শিশুভাবাপন্ন না হইতেছি ততক্ষণ আমাদেব স্বর্গবাজ্যে বা সত্যরাজ্যে প্রবেশাধিকাব থাকিবে না। তাহারা বিপদাপন্ন হইলে পবিত্রাণের জন্য আত্মচেষ্টা ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ মাতার নিকট ছুটিয়া যায়। ভগবদ্ভক্তগণেরও ঠিক তদ্রূপ হইতে হইবে। সরলতাই সর্ব্বধর্ম্মেব ভিত্তিভূমি। মানুষ যতই বয়সে বাড়িতে থাকে ততই তাহার অন্যায়ের ধারণা জন্মে। কিন্তু অসৎ-সম্বন্ধে শিশুব কোন ধারণাই নাই। আমবা বড হইয়া সংসারকে নিজ প্রণালীতে গ্রহণ করি। তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বালকসুলভ সরলতা শিক্ষা করিতে হইবে তবেই প্রেমরাজ্যের প্রবেশ পত্র পাইব। আমবা অসৎ হই কখন ? যখন আমরা শ্রীভগবানকে ভুলিয়া নিজেকে দেহমাত্র মনে করি। কিন্তু যখন আমবা শারীরিক বন্ধন অতিক্রম করিয়া সত্যাশ্রয়ী হইয়া শ্রীভগবানের আরাধনা করি তখন শীঘ্রই আমরা ধর্ম্মভাবাপন্ন হইয়া পড়ি। মুক্তিলাভের এইমাত্র উপায। সমস্ত বাধাবিঘ্ন

অতিক্রম করিয়া কেবল তাঁহারই চিন্তায় ডুবিয়া যাও। ক্রমাগত তাঁহারই চিন্তায় নিমগ্ন হইলে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক কর্ম্মে তাঁহার পূজা হইতে থাকে। মন যেন আকাশ, বাসনাগুলি মেঘরাশি,—এই মেঘমণ্ডল আকাশে উদিত হইয়া জ্ঞানসূর্য্যকে আবৃত করে। এই মেঘরাশির উদয় নিবারণের জন্য আমাদের মনকে ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে; তখনই উহা সমস্ত বাসনামুক্ত হইবে। যতই আমরা অন্তঃকরণে আদর্শকে ধরিয়া রাখিতে পারিব আমরা ততই শক্তি সম্পন্ন হইব।

এইরূপে হৃদয়মন্দিরে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে আমরা শান্তি-রাজ্যে বাস করিব। সেইজন্য আমাদের লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে অকপটতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত আদর্শের চিন্তায় ক্রমাগত নিমজ্জিত হইতে হইবে। ফলাফলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া দৃঢ়ভাবে সাধনে অগ্রসর হওয়াই ধর্ম্ম। আমাদের বালকবৎ সরল বিশ্বাস ও পবিত্র অন্তঃকরণ চাই আর কিছুই নহে। আমরা আদর্শকে মনোমন্দিরে স্থাপন করিয়া চলিব কিছুতেই নিরাশ হইব না। চেষ্টা না করিয়া আমরা কিরূপে বলিতে পারি যে সিদ্ধি সুদূর পরাহত। কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য নানাস্থানে যাতায়াতেই আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য ও দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। আমাদিগকে তুলাদণ্ডবৎ স্থির ধীর ও শান্ত হইতে হইবে। কখনও কখনও আমরা এত হতোদ্যম হইয়া পড়ি যে আমরা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করি। কিন্তু কখনও আমরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রকৃতরূপে চেষ্টা করিয়াছি কি? তাঁহার দর্শনলাভের জন্য আমরা কখনও ব্যাকুল হইয়াছি কি? যদি আমরা ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করিয়াও একবার মাত্র তাঁহার জ্যোতিঃদর্শন করিতে না পাই তখন আমরা তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি। নিজেদের এ সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন আবশ্যক। আমাদের আত্ম-চেষ্টাই ভবিষ্যৎ পথ গড়িয়া তোলে এবং দেশকালপাত্রকে তদুপযোগী করিয়া গড়িলে পথ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া পড়ে। ধ্যানেই তাহা সম্ভবপর হয়। অধিকাংশ লোকে প্রকৃতভাবে সত্য চায় না, সেইজন্য তাহারা আপত্তি করে যে আধ্যাত্মিক সাধনের সময় তাহাদের নাই। আমোদ প্রমোদ, খোস গল্প ও সাংসারিক বিষয়ের

জন্য তাহাদের প্রচুর সময় থাকে কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের জন্য পাঁচ মিনিট সময়ক্ষেপ করিতে পারে না। এইরূপে তাহারা আত্মবঞ্চনা ও ঈশ্বরকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সত্যলাভের জন্য যাহাদের আন্তরিক বাসনা আছে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক ক্ষুধা আছে, তাহারা অবসর খুঁজিয়া লয়। আধ্যাত্মিক চিন্তায় যে ভূমানন্দ লাভ হয় কেহ তাহার একবার আস্বাদ পাইলে তাহা আর কখনও বিস্মৃত হইতে পারে না। ক্ষুদ্র চেষ্টাতে আত্মার ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয় না। সত্যের উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদের বাসনায় একাগ্রতা ও সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্ঠা থাকা আবশ্যক। যে মন খুব স্থির ও দৃঢ় তাহাতে প্রত্যক্ষানুভূতি হয়, যতক্ষণ মন চঞ্চল থাকে ততক্ষণ উহা উপস্থিত হয় না। মাঝে মাঝে সত্যের আভাষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে কিন্তু সেই দর্শন স্থায়ী হইবে না। এইজন্যই এইরূপ কথিত আছে যে নীচ বৃত্তিগুলির দমন না হইলে সত্য লাভ হয় না। আত্মসংযম ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। দৃঢ়তাই সর্ব্বপ্রকার জয় ও সিদ্ধির ভিত্তি। শক্তির অর্থ সুখ, শক্তির অর্থ শান্তি। যখন আমরা নিজেদের শক্তিমান অনুভব করি তখনই অন্তরে প্রকৃত সুখোদয় হয়। আমরা জানি বা না জানি অ-সুখের অর্থই দুর্ব্বলতা। সত্য অন্তঃকরণে সদা বর্ত্তমান। কিন্তু অতি অল্প লোকের সেইরূপ অনুভূতিসাপেক্ষ পবিত্রতা ও অধ্যবসায় আছে। এইজন্য লোকে বলে, "অনেকেই নিবেদন করেন কিন্তু অতি অল্পই মনোনীত হয়।"

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।"

৭ম অধ্যায়, ৩য় শ্লোক।

ইহার কারণ কি? কারণ, যদিও অনেকেই চেষ্টা করে কিন্তু সকলের অধ্যবসায় নাই। তাহাদের প্রকৃতি ও মনের গতি তাহাদিগকে বিপথগামী করায়, কিন্তু অতি অল্প,—সহস্রের মধ্যে দুই একজনমাত্র দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকে। মৃত্যুতেও তাহাদের অধ্যবসায় চলিতে থাকে এবং তাহারাই প্রকৃত সিদ্ধিলাভ করে। সত্যপথ ভ্রষ্ট হওয়া অপেক্ষা তাহারা মৃত্যু শ্রেয়ঃ

মনে করে। সত্যলাভ করিতে হইলে এইরূপ অচল বিশ্বাস আবশ্যক। উপাসনা বা পূজা করিবার সময় কোন প্রকার বিশেষ রীতির আবশ্যকতা নাই। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে অন্তঃকরণে শুদ্ধাভক্তি আবশ্যক। যখন তাহা থাকে তখন কোনমন্ত্র উচ্চারিত হউক বা না হউক কিছুই আসিয়া যায় না এবং ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করেন। আমরা তাঁহাকে কি দিতে পারি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার। কিন্তু যদি আমরা তাঁহার চরণে ভক্তি ও ভালবাসা দিতে পারি তাহাতেই তাঁহার প্রকৃত পূজা হয়। যখন আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অভাব তখন যতই নৈবেদ্যের মাত্রা বৃদ্ধি করি না কেন তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। হৃদয় হইতে সহজ সরল প্রার্থনা উচ্চারণ কর এবং ইষ্টপদে প্রেম ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন কর। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি উহা সর্ব্ব প্রকার বাহ্যানুষ্ঠান অপেক্ষা বেশী উপকারে আসিবে। প্রাণের সহিত তাঁহার সেবা ও পূজা করিবার জন্য প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহার চরণে পবিত্রতা ও শক্তি প্রার্থনা কর। পবিত্রতা, ভক্তি, অধ্যবসায়, অভীঃ এই কয়েকটি আবশ্যকীয় গুণ আমাদের ব্রহ্মোপাসনায় সহায়তা করে। ঈশ্বর অনন্ত। কোন মতবাদ, নাম, প্রতীক বা অনুষ্ঠান সেই অসীমকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। আমাদের চিন্তায় আমরা যতক্ষণ অকপট ও সবল থাকিব, ততক্ষণ কিরূপ পূজা করি বা না করি তাহাতে যায় আসে না। ধর্ম্ম কেবল সূত্রে পর্য্যবসিত নয়। ঈশ্বর এত বৃহৎ যে কোন ধারণায় বা সূত্রে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। কেবলমাত্র পবিত্র হৃদয়েই তিনি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হন। যখন আমরা তাঁহাকে অনুভব করি কোন এক শাস্ত্র বা ধর্ম্মনীতিতে না দেখিয়া সমস্ততে প্রকাশিত দেখি, তখনই প্রকৃত ঈশ্বরদর্শন হয়। যখন আমরা ঈশ্বরকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা দ্রব্যে অনুভব করি সে দর্শন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু প্রকৃত দ্রষ্টা তাঁহাকে সর্ব্বত্র বিরাজমান দেখিতে পান, সেইজন্য তাঁহার জাগরণেও অলসতা নাই। যিনি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করেন তিনিই বস্তুতঃ সুখী এবং একমাত্র তিনিই ধার্ম্মিক পদবাচ্য। যতক্ষণ আমাদের দ্বৈতদর্শন হয় ততক্ষণ আমরা জানি না কি মহান ব্রহ্মশক্তি সর্ব্বত্র নিহিত আছে। সকল জিনিষে আত্মদর্শনই

পূর্ণতা। আধ্যাত্মিক কুসুম যেথায় ইচ্ছা প্রস্ফুটিত হউক, প্রাচ্যেই হউক বা পাশ্চাত্যেই হউক উহা হইতে একই সৌন্দর্য্য ও সৌরভ স্ফুরিত হইবে এবং যে উহার নিকটে আসিবে তাহাকে একই প্রকার আনন্দ দান করিবে। সুতরাং প্রাচ্যেই হউক বা পাশ্চাত্যেই হউক মহাপুরুষগণ সর্ব্বত্রই সমান। তিনি যেখানেই অবস্থান করুন না কেন সর্ব্বত্রই একই প্রকার সত্য সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা বিকীরণ করিবেন। যখনই আমরা এক জাতির বা ব্যক্তির হৃদয় অনুসন্ধান করি তখনই তথায় এমন একটি বস্তু দেখিতে পাই যাহা ব্যক্তিগত বা জাতিগত নহে, তাহা বিশ্বজনীন। যদিও অন্তঃকরণ একই প্রকার তবুও উহা বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন প্রকারে স্পন্দিত হয়। সেইরূপ সত্য চিরকাল এক হইলেও ইহার বাহ্য বিকাশ বিভিন্ন আকারে হইয়া থাকে। আমাদের কর্ত্তব্য সমন্বয় সাধন, সহানুভূতি সাধন, শত্রুতা সাধন নহে। কখনও কখনও মানুষ একটি মহান আদর্শকে হৃদয়ঙ্গম করিতে অনেক সময় লইয়া থাকে। কিন্তু শেষে ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও প্রেমেরই জয় হয়। মানুষকে আনন্দ ও সুখ প্রদান করা অতি উত্তম কার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্ঞানালোক লাভের সহায়তা করা অনেকগুণে শ্রেয়ঃ। কারণ সত্যের আলোক তাহাদিগকে জন্মমৃত্যুর ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে রক্ষা ও অনন্ত সুখের অধিকারী করে।

আমাদের চিন্তারাশি সকল প্রকার শারীরিক বন্ধন অতিক্রম করুক। আমরা যেন সত্যেই সুখ ও আনন্দ পাই। প্রত্যেক জিনিষ আমাদিগকে সত্য অর্জ্জন করিতে সহায় হউক। সত্যের একাগ্রতা সাধনে আমাদের অনুপ্রেরণা আসুক এবং কোন কিছু যেন আমাদের পশ্চাৎপদ করিতে না পারে। আমাদের সমস্ত জীবন সত্য নিষ্ঠাতে পবিত্র হউক। সত্যকেই যেন আমরা আমাদের লক্ষ্য, আমাদের শক্তি ও আশ্রয় বলিয়া মনে করি। সত্য ব্যতীত অন্য কিছুর উপরে যেন আমাদের জীবনসৌধ নির্ম্মিত না হয়। অসতো মা সদ্গময়।

"সত্য—অজেয়, অমর ও মঙ্গলময়ী জীবন্ত শক্তি। যাহারা সত্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ না হয় তাহারা জীবনের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই। অন্ধকারে আলোক শিখার ন্যায় সত্যকে ধরিয়া থাক। একমাত্র

সত্যেই মুক্তি অন্বেষণ কর। যেখানে আত্মাভিমান রহিয়াছে সেখানে সত্য থাকিতে পারে না। সত্যের আবির্ভাবে আত্মাভিমান অন্তর্হিত হয়। অতএব কেবল সত্যের উপর চিত্ত স্থির কর। দিকে দিকে সত্যের ঘোষণা কর। তোমার সকল ইচ্ছাশক্তি সত্যকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্য করুক। অবিচ্ছেদে সত্যের প্রচার হউক। সত্যেই তুমি অনন্ত জীবন লাভ করিবে। অহংই মৃত্যু—সত্যই জীবন। সত্যে বিশ্বাসী হও, সত্যময় জীবন যাপন কর।"—বুদ্ধদেব।

"ব্রহ্ম অখণ্ডসত্য আনন্দস্বরূপ। এই বস্তু লাভ করিলে আত্মা অসীম সুখের অধিকারী হয়।"—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

শ্রী—

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়

(১) মনের কথা—শ্রীসরসীলাল সরকার। ডাঃ সরসীবাবু আধুনিক পদ্ধতিতে মনোবিশ্লেষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। তিনি যেরূপ ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন তৎপূর্ব্বে আর কেহ ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বিশ্লেষণ প্রণালী অতি সুন্দর, সহজ ও সুশৃঙ্খল। প্রত্যক্ষ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার বিষয়টিকে উপন্যাসের মত চিত্তগ্রাহী করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠক চেষ্টা করিলে স্বপ্নদৃষ্ট অলীক বিষয়েরও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাইবেন। ভূমিকায় ডাঃ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "মনোবিদেরা বলেন, অতি গভীর স্তরের ইচ্ছাগুলি প্রায়ই কামজ। এই ইচ্ছার স্বরূপ নির্ণয় মনোব্যাকরণের একটি দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এরূপ চেষ্টা সাধারণ পাঠকের রুচিকর হইবে না বলিয়াই সরসীবাবু

তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই।" ইহার সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন অনেক বিষয় জানিবার আছে যাহার আলোচনা নীতিবাদীদের নিকট objectionable বা আপত্তিজনক। তাঁহাদের মুখ চাহিয়া যদি ঐসব জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা না করা হইত তবে মানবের জ্ঞানলাভের একটা দিক চিরকাল রুদ্ধ হইয়া থাকিত। সুতরাং "সাধারণ পাঠকের রুচিকর হইবে না বলিয়া" ডাঃ সরসীবাবু মনস্তত্ত্বের একটি প্রয়োজনীয় অংশের আলোচনা না করায় এক শ্রেণীর বাঙ্গালী সমাজ জ্ঞানলাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

পুস্তকের প্রচ্ছদ-পট, কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর।

(২) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—কনখল (হরিদ্বার) ১৯২৪ সালের কার্য্য-বিবরণী।

৭৩১ জন রোগীকে আশ্রমে রাখিয়া এবং ৪৬৭২৬ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে আশ্রমের বাহিরে ঔষধ, চিকিৎসা ও পথ্যাদির দ্বারা সেবা করা হইয়াছে।

গত বৎসর ৩৫টি নিম্নবর্ণীয় বালক অবৈতনিক নৈশবিদ্যালয়ে নিয়মিতরূপে শিক্ষালাভ করিয়াছে।

বহু সাধু-ব্রহ্মচারী ও শিক্ষিত ভদ্রলোক আসিয়া আশ্রমের পাঠাগারে পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করেন।

গত বৎসর হরিদ্বার অঞ্চলের বন্যাপীড়িত দরিদ্রগণের সাহায্যের জন্য আশ্রমের সেবকগণ দুইটি অস্থায়ী সেবা-কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন, উভয় কেন্দ্র হইতে ২৭৬ জন ব্যক্তিকে নানারূপে সাহায্য করা হইয়াছিল।

উল্লিখিত বৎসরে সেবাশ্রমের মোট আয় ২২২৮৪৸১৫ এবং মোট ব্যয় ৬৮৮৮৶/১০।

(৩) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ—দেওঘর ১৯২৪ সালের কার্য্য বিবরণী।

বর্ত্তমানে ১০ জন শিক্ষক বালকগণের শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তন্মধ্যে ৮টি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী। উল্লিখিত

বৎসরে ৪৬ জন শিক্ষার্থীকে আশ্রমে রাখিয়া নানারূপ শিক্ষাদান করা হইয়াছে।

বৎসরের প্রথমে আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট গত বৎসরের উদ্বৃত্ত মাত্র ১৬৫২৸৴৯ পাই ছিল, ক্রমে আরও ৮৭৫৮॥৪ পাই তহবিলে জমা হয়, তন্মধ্যে ৮৪৫২।৵৯ পাই খরচ হইয়াছে। তাহা ছাড়া গৃহ নির্ম্মাণকল্পে ৬৭৯৬ টাকার মধ্যে ৬৮৮৸৬ পাই ভিত্তি নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে।

অন্যান্য বিদ্যালয় হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব এই যে এখানে প্রাচ্য শিক্ষাদর্শে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীতে বালকগণকে চরিত্র গঠনোপযোগী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে; যাহাতে ছাত্রগণ যথাসময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারে বিদ্যাপীঠে তাহারও ব্যবস্থা আছে।

ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে এইরূপ মানুষ-তৈয়ারী করা শিক্ষা প্রবর্ত্তনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কতিপয় নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী যে ঐ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। দেশ এখন জাগ্রত। আশা করি, জাগ্রত দেশের জনসাধারণ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মঙ্গলের জন্য এই সময়োপযোগী প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে নিশ্চেষ্ট হইবেন না।

নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ ও সভ্যগণের নিকট নিবেদন—আগামী বসন্তে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মহাসম্মেলন হইবে। চিন্তাশীল কর্ম্মিগণ ইহার প্রয়োজন বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছিলেন। দেশে নবজাগরণের যে ভাবে সাড়া পাওয়া যাইতেছে, অচিরে কর্ম্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত না হইলে পাশ্চাত্যভাব মিশনের নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শকে সহজেই কলুষিত করিয়া দিতে পারে। তদ্ব্যতীত আরও অনেক কারণে এইরূপ মহাসম্মেলনের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

যাহাতে সম্মেলন পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য মিশনের ইংরাজী বাঙ্গলা পত্রিকাগুলিতে কর্ম্মিগণের মতামত প্রস্তাবাদি এখন হইতেই আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

রুগ্ন, দৈবদুর্য্যোগ-পীড়িতগণের সেবার আদর্শ দেশবাসী গ্রহণ করিয়াছেন। সকল সম্প্রদায়ই এখন সেবাকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এখন মিশন এইদিকে কার্য্য আর সম্প্রসারিত না করিয়া শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ দিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

শিক্ষা সম্বন্ধে Student s Home, বিত্থাপীঠ, কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু মিশনের শক্তির তুলনায় তাহা অতি সামান্য মাত্র। সেইজন্য আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবকগণের নিকট বিনীত চিত্তে উপস্থিত করিতে চাই। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী ভারতের উন্নতির একটা প্রধান অন্তরায়, এই সম্বন্ধে বোধ হয় মতান্তর নাই।

মিশনে (graduate) বি-এ পাশ সন্ন্যাসীর অভাব নাই। তাঁহারা ৭।৮ জন মিলিত হইয়া একটি (Model High school) আদর্শ-উচ্চ-বিত্থালয় অনায়াসেই স্থাপন করিতে পারেন। ভারতীয় যে কোন বিশ্ববিত্থালয়েব সঙ্গে তাহা যুক্ত থাকিলেই চলিবে। কলিকাতায় এইরূপ একটি স্কুল স্থাপিত হইলে অল্পদিনে তাহা সর্ব্বজনবিদিত হইয়া পড়িবে। তাহাতে অর্থসংগ্রহ ও লোকমতের আনুকূল্য সহজে সম্ভব হইবে। বিত্থালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে তাহা লইয়া গেলেও কোন বিঘ্ন হইবে না এবং সেই আদর্শে আরও স্কুল, এমন কি কলেজ স্থাপন সহজ হইবে।

শিক্ষা-বিজ্ঞান এখন এত উন্নতিলাভ করিয়াছে যে বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে অভ্যাস না করিলে কালোপযোগী প্রণালীতে শিক্ষাদান সম্ভব নহে। সেইজন্য চারিজন বি-এ পাশ সাধুকে কোনও Training collegeএ পাঠান দরকার।

বিত্থালয়ের নিয়ম প্রণয়নের জন্য প্রাচীন তপস্বী ও নবীন শিক্ষিত উৎসাহী সাধুগণের একটি শাখা-সংঘ গঠন করা প্রয়োজন। তাঁহারা

সকল দেশের শিক্ষাপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া বৈদান্তিক আদর্শে নিয়ম প্রণয়ন করিবেন। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একদল উদ্‌যোগী ভারপ্রাপ্ত যুবককর্ম্মীর প্রয়োজন।

তাহা হইলে প্রস্তাবটি এইরূপ দাঁড়ায়:—

(১) মিশনের একটি 'শিক্ষা-শাখা-সংঘ' (Educational sub-committee) গঠন। ইঁহারা বিদ্যালয়ের নিয়ম-প্রণালী ও আদর্শ-নির্ণয় করিবেন।

(২) অভিজ্ঞ-শিক্ষক-সংঘ (Trained teachers' committee) গঠন। ইঁহারা অধিতব্য বিষয় নির্ণয় ও পাঠ প্রণালী নির্দ্দেশ করিবেন।

(৩) উদ্‌যোগী-সংঘ (Organisers' committee) গঠন। ইঁহারা স্কুল স্থাপন বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার যোগাড় যন্ত্র করিবেন।

শ্রী—

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ ও দাতব্য ঔষধালয়

জয়রামবাটী।

আমরা শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসারদা-বিদ্যাপীঠ ও শ্রীশ্রীসারদা-দাতব্য ঔষধালয়ের সংবাদ এক বৎসর পূর্ব্বে জনসাধারণকে অবগত করাইয়াছি। উক্ত অনুষ্ঠানদ্বয়ের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় সকলকে পুনঃ জ্ঞাত করা একান্ত দরকার হইয়াছে।

শ্রীশ্রীসারদা-বিদ্যাপীঠ।

এই বিদ্যালয়ের কোন স্থায়ী গৃহ না থাকায় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের জন্য আবশ্যক একটি ক্ষুদ্র মাটির ঘরে মাত্র ছয়টি ছেলেকে লইয়া প্রথমে স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রায় এক বৎসরকাল ধরিয়া এই ক্ষুদ্র ঘরখানিতেই শিক্ষাদান কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু

পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামে কোনও শিক্ষানুষ্ঠান না থাকায় এই বিদ্যাপীঠের ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমান ছাত্র সংখ্যা ৩২। উল্লিখিত ঘরখানিতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় শ্রীমন্দিরের বারান্দায়ই স্কুল বসাইতে হইয়াছে, ইহাতে ছেলেদের পাঠের ও মন্দিরের ক্রিয়ানুষ্ঠানাদির নানা অসুবিধা হইতেছে। স্থানাভাব হেতু আর ছাত্র গ্রহণ করা যাইতেছে না। ছাত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়টিকে মধ্য-ইংরাজীতে পরিণত করিবার ইচ্ছা রাখি। এতাবৎ-কাল ছেলেদিগকে উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ইংরাজীও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত এই দরিদ্র দেশের বালকগণ যাহাতে নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চরিত্র গঠনপূর্ব্বক যথার্থ শিক্ষা লাভ এবং স্বাধীনভাবে নিজ নিজ উপায়ের পথ আবিষ্কার করিতে পারে সেইভাবে শিক্ষা প্রদানই এই বিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্য, অধিকন্তু এ অঞ্চলের কর্ম্মহীন যুবকদের এবং উক্ত বিদ্যালয়ের বালকগণের জন্য একটি বয়ন বিভাগও খুলিবার একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে।

নৈশ বিদ্যালয়।

যাহারা সাংসারিক কার্য্য নিবন্ধন দিবাভাগে স্কুলে আসিতে পারে না এমন কয়েকজন ছেলে ও বয়স্ককে লইয়া গত ১লা মাঘ তারিখে একটি নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। আক্ষরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য নীতি, ধর্ম্ম নীতি ও শিল্পের উন্নতির বিষয় নানাভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা ১৫।

শ্রীশ্রীসারদা-দাতব্য ঔষধালয়।

এই ঔষধালয়েরও পরিবর্দ্ধন নিতান্ত দরকার। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে উপযুক্ত চিকিৎসক না থাকায় রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারাই বিশেষভাবে চিকিৎসা করা হয়। এ পর্য্যন্ত যে ভাবে ঔষধ সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে তাহাতে উপস্থিত কার্য্য পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এলোপ্যাথিক বিভাগটির উন্নয়ন করিয়া যাহাতে উপযুক্ত চিকিৎসক

নিযুক্ত করিতে পারা যায় তাহাও অত্যাবশ্যক হইয়াছে। আগামী ম্যালেরিয়া আরম্ভের পূর্ব্বেই আমাদিগকে ঔষধাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। এই উভয় বিধ অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বের আবেদনের ফলে এ পর্য্যন্ত যে সাহায্য আসিয়াছে তাহা অতি সামান্য মাত্র, ইহাতে আংশিক ব্যয়ও নির্ব্বাহ হইবে না। প্রথমতঃ ভূমি সংগ্রহ, তদুপরি প্রয়োজনানুযায়ী গৃহাদি নির্ম্মাণ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন।

আমরা রুগ্ন, দরিদ্র ও অশিক্ষিত নারায়ণগণের সেবার জন্য জনসাধারণের নিকট ভিক্ষাপাত্র হস্তে উপস্থিত হইলাম—আশা করি, তাঁহারা এতদুদ্দেশে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া শ্রীভগবানের অশেষ কৃপাভাজন হইবেন।

যিনি যাহা দান করিবেন, সামান্য হইলেও তাহা ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত এবং কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইবেন।

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ, মাতৃ-মন্দির, জয়রামবাটী।
পোঃ আঃ দেশড়া, জেলা বাঁকুড়া।

সংঘ-বার্ত্তা

স্বামী মুক্তানন্দ

১। গত ১লা কার্ত্তিক স্বামী মুক্তানন্দ কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের অভয় পদে চিরতরে মিলিত হইয়াছেন। তিনি বহুদিন কনখল সেবাশ্রমে জীব-সেবারূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর স্বর্গাশ্রমে (লছমন ঝোলা) ভিক্ষান্নে শরীর ধারণ ও সাধন ভজনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মৌনাবলম্বনে দিবা রজনীর অধিকাংশ সময় তাঁহাকে তপস্যায় নিমগ্ন

থাকিতে আমরা দেখিয়াছি। আরও দেখিয়াছি—একনিষ্ঠ তপস্তার মানবপ্রেম তাঁহার হৃদয়কে দিন দিন স্পর্শ করিতেছিল। ভিক্ষামাত্রজীবী, নিঃস্ব, কোন সাধু-ব্রহ্মচারীর অসুখ হইলে তিনি তপস্তার ক্ষতি করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন, পীড়া গুরুতর হইলে সকলের নিকট কিছু কিছু ভিক্ষা করিয়া ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী কনখল সেবাশ্রমে তাঁহাকে লইয়া আসিতেন অথবা তাঁহাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা কবিতেন। স্বামী মুক্তানন্দের সাধুতা, সরলতা, অমায়িক ব্যবহার, নিঃস্বার্থ সেবা এবং ঐকান্তিক তপো-নিষ্ঠা হৃষিকেষ ও স্বর্গাশ্রমের (লছমন ঝোলা) অধিকাংশ সাধু-ব্রহ্মচারীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিল।

স্বামী মুক্তানন্দের ন্যায় সাধুকে হারাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ক্ষতিগ্রস্ত।

২। স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ রাঁচি গমন করিয়া তথায় গীতার কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছেন। বিগত জন্মাষ্টমীর দিন স্থানীয় জগন্নাথ মন্দিরের সুবৃহৎ নাট-মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা হয় এবং বক্তৃতান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত-সমাজ কর্ত্তৃক "নাম মাহাত্ম্য" নামক পালাকীর্ত্তন গীত হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া স্বামিজী উহার সাপ্তাহিক ধর্ম্ম সভায় "ছাত্র জীবনের আদর্শ ও শিক্ষা" বিষয়ে সরল ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎপরে হিন্দু ড্রামাটিক্ ক্লাবের থিয়েটার হলে "আমরা ও আমাদের আদর্শ" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। সভায় বহু নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

৩। পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে The Morning Star নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র নিয়মিতরূপে বাহির হইতেছে। নগদ মূল্য এক পয়সা। বার্ষিক মূল্য ১॥০। সম্পাদক স্বামী অব্যক্তানন্দ।

৪। আগামী ২১শে অগ্রহায়ণ, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ত্রিসপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে এবং ৫নং নিবেদিতা লেনস্থ (বাগবাজার) নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে বিশেষ পূজাদি হইবে। পুরুষ ভক্তগণ ঐ দিবস বেলুড় মঠে এবং স্ত্রী ভক্তেরা বালিকাবিদ্যালয়ে আগমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর পুণ্য দর্শন ও প্রসাদ লাভে ধন্য হইবেন।

অর্ঘ্য

আমি সারা নিশি দাঁড়ায়ে হে নাথ!
অর্ঘ্য রচিয়া—আঁখি নীরে,
তুমি আনমনে রহিবে—নিঠুর।
তব কাঞ্চন-মন্দিরে,
হে আমার চির-প্রিয়!
দয়িত! হে বরণীয়!
এস স্বপনের মাধুরিমা মাঝে ঝঙ্কারি' তব মধুবীণা;
পদধূলি দানে সুন্দর কর
মম ভাঙ্গা গৃহ আঙ্গিনা।

জন্ম, মৃত্যু, প্রকৃতি, পুরুষ—
কেন গো এসব জটিলতা?
গোলক-ধাঁধার প্রয়োজনে কিবা—
কেন এত শত কুটিলতা?
তব বিচিত্র বেশে—
তুমি—শুধু পাশে বস' হে'সে
নিমিষের তরে নিরখিও শুধু মম আখিজল বন্দনা—
বেদনার মাঝে পরশন দিও
দিও—এতটুকু সান্ত্বনা।

তুমি যার দেশে—চলে' যাবে হেসে'
নিদ্ ঢালি মোর চক্ষে গো—
পূজার অর্ঘ্য নিতি যাবে বৃথা
কেমনে সবে তা' বক্ষে গো?

তব— চরণ মুছাব বলে'
আমি—অলক রেখে'ছি খুলে'
আঁখি ভরে জল জমায়ে রেখেছি ঢালি' দিতে পদ-পঙ্কজে
এস প্রিয়তম! হৃদয়েতে এস
আজি মম গৃহ শূন্য যে।

নাচুক তোমার অঞ্চলবায়—
চিত্ত-লতার কম্পনে,
তোমার প্রেমের রাগিণীটি শুধু
বাজুক হিয়ার স্পন্দনে;—
হে আমার চির-প্রভু!
তুমি—দূরে সর যদি কভু,—
তব বিরহের বিদারুণ-রেখা এঁকে যেও মম অন্তরে
যাত্রার সাঁঝে দীক্ষিত করো
মিলনের মধু মন্তরে।

সকল বিশ্বে হয় যেন তব
রূপ-বিদ্যুৎ চমকিত,
কুঞ্জে, কাননে, ফুটে তব হাসি
ইন্দু-জোছনা-নিন্দিত;
যেন প্রতি শুভপ্রাতে
তব—হেম-রথ-চূড়া ভাতে,
পৃথিবীর পথ ধূলি-কণা যত মধুময় করো স্পর্শনে,
তপ্ত বিশ্ব সুশীতল করো
তব মধু-ধারা বর্ষণে।

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

(১১)

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি। ১৯০৮ এর মধ্যভাগে বর্ষাকালে দ্বিতীয় বার দর্শন হয়। এইবার বেলা প্রায় ১১॥টার সময় জয়রামবাটী উপস্থিত হই। প্রণাম করিলে পর শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কি মাষ্টার মহাশয়ের ছাত্র ?"

আ—না মা, আমি তাঁর কাছে যাই।

মা—তিনি কেমন আছেন ? তুমি কি শীগ্‌গীর গিয়েছিলে ?

আ—ভাল আছেন। আমি আট দিন আগে গিয়েছিলাম।

মধ্যাহ্নে আহার কবিবার সময় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন আপনার কল্‌কাতা যাওয়া হবে কি ?"

মা—ইচ্ছা ত আছে পূজার সময় যাই। তারপর মা যা করেন। * * * * তোমাদের জমিতে ধান হয় ?

আ আজ্ঞে হাঁ মা, হয়।

মা—বেশ। আমাদের দেশে ভাল ধান হয় না। আচ্ছা, তোমাদের কলাই হয় ?

আ—হাঁ মা।

মা—বেশ ভাল।

রাত্রে আহারের সময় শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বাড়ীতেই থাক এখন ?"

আ—হাঁ মা, আমার বড় বিপদ—খুব অসুখ হয়েছিল, তারপর বিবাহ।

মা—বিবাহ কি হয়ে গেছে ?

আ—হাঁ মা।

মা—মেয়েটির বয়স কত ?

আ—প্রায় তের বছর।

মা—যা হয়েছে, ভালর জন্যই হয়েছে, আর কি করবে ?

আ—মাষ্টার মহাশয় বিবাহ করতে বারণ করেছিলেন।

মা—আহা! নিজে অনেক কষ্ট পেয়েছেন কিনা, তাই বলেন, আর তোরা কেউ বিয়ে করিস নি রে!

আ—সংসারে বড় ব্যাঘাত। সংসারে থাকলে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে।

মা—নিশ্চয়! কেবল টাকা, টাকা, টাকা!

আ—বিষম যন্ত্রণা।

মা—ঠাকুরের সংসারী ভক্ত ত আছে। ভাবনা কি ?

আমি নিস্তব্ধ হইয়া আছি।

মা—আমার ভায়েরা বিবাহ করেছে।

আ—আপনার অনুমতি অনুসারে ?

মা—কি করব। ঠাকুর বলতেন, 'বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই ভাল থাকে। ভাতের হাঁড়ীতে রাখলে মরে যাবে।' আর আমরা খুড়ো জ্যাঠার যেমন সেবা শুশ্রূষা করেছি, এখনকারের ভাইঝিরা তেমন করে না।

আ—ক্রমশঃ সব পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে।

মা—দেখ না, আগে আমি পিঁপড়ে মারতে পারতুম না, কিন্তু এখন বেড়ালকে এক ঘা বসিয়ে দিই।

"ঠাকুর বল্‌তেন, 'এও কর, ওও কর'। বলতেন, 'তুঁহু, তুঁহু' জীব অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করে তবে বলে, তুঁহু, তুঁহু।

"স্বার্থ, যতক্ষণ মুটো করে, ততক্ষণ আপনার, তারপর আর নয়।

"ভয় কি, বিবাহ করেছ—ঠাকুরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হয়ে যাবে। হয় ত তার কোন সুকৃতি আছে। বলতেন, 'বিদ্যার চেয়ে অবিদ্যার জোর বেশী'—অর্থাৎ অবিদ্যামায়া সংসারকে মুগ্ধ করে রেখেছে।"

জগদম্বা আশ্রম—কোয়ালপাড়া, বাঁকুড়া।

এপ্রিল ২০, রবিবার, ১৯১৯। মণীন্দ্র, না—, সা—প্রভৃতি সকাল বেলা প্রায় দশটার সময় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। মা এক মাসের উপর হইল আসিয়াছেন। পুরুষ ভক্তেরা কোয়ালপাড়া মঠে থাকেন এবং তথায় খাওয়া দাওয়া করেন।

শ্রীশ্রীমার ভ্রাতুষ্পুত্রী মাকুর ছেলের খুব অসুখ—ডিপ্থিরিয়া হইয়াছে, জয়রামবাটীতে আছে। বৈ—মহারাজ তাঁহাকে দেখিতেছেন। মা সেজন্য খুব চিন্তিত—কি হয়।

ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বসিতেই প্রথমে ঐ কথাই উঠিল।

না—মা, আপনার আশীর্ব্বাদে ছেলে ভাল হয়ে যাবে।

মা—(হাত জোড় করিয়া ঘরের ভিতরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিকে দেখিয়া) উনি আছেন।

সা—মাকুর ছেলের জন্য না—অনেক কচ্ছেন।
ডিপ্থিরিয়ার ইন্জেক্সন্ আনিবার জন্য কলিকাতা লোক পাঠানো—ইত্যাদি।

মা—হাঁ, ভাল লোক। কা—কে (কলিকাতা) পাঠানো, টাকা খরচ করা,—উনি না থাকলে কে এত করত?

না—আমি যন্ত্র, ঠাকুর যন্ত্রী। আমাকে যন্ত্রের মত কাজ করাচ্ছেন।

মা—ঠাকুর বলেছিলেন, "যার ধন-ধান্য আছে সে মাপো, (মেপে দেওয়া)। যার তা নেই সে জপো।"

না—জপ করবার সময় কি আচমন করা প্রয়োজন?

মা—হাঁ; ঘরে হলে আসন, আচমন প্রয়োজন। রাস্তায় বা অন্যত্র পথে ঘাটে নাম করলেই হবে।

না—শুধু নাম? মন্ত্র জপ নয়?

মা—হাঁ, মন্ত্র জপও করবে বৈকি। তবে, মন স্থির করে একবার ডাকলে লক্ষ জপের কাজ হয়। নতুবা সারাদিন জপ করছে কিন্তু মন নেই, তাতে ফল কি? মন চাই, তবে তাঁর কৃপা।

না—আমি যা কচ্ছি তাইতেই হবে, না আরও প্রয়োজন ?

মা—যা কচ্ছ, তাই কর। তুমি ত তাঁর কৃপা পাত্র আছই।

না—দু তিন দিন সরল ভাবে ডাকলে দর্শন পাওয়া যায়, এতদিন ডাকছি দর্শন হয় না কেন ?

মা—হাঁ, হবে বৈকি। শিব বাক্য, আর তাঁর মুখের কথা—সে কথা মিথ্যা হবার যো নেই।

সুরেন্দ্রকে (মিত্র) তিনি বলেছিলেন, "যার ধন আছে সে মা্পো, যার নেই সে জপো।"

(সকলকে লক্ষ্য করিয়া) তাও না পার (ঠাকুরকে দেখাইয়া) 'শরণাগত'। এটুকু মনে রাখলেই হল, আমার একজন দেখবার আছেন, একজন মা, কি বাবা আছেন।

না—আপনি বলছেন তাই আমার বিশ্বাস।

রাধুর একটি সন্তান হইয়াছে। সন্তান হইবার পর হইতেই রাধু শয্যাগত। তাহাকে খাওয়াইবার সময় হইয়াছে, তাই মা এবার উঠিবেন।

মা—এখন রাধুকে খাওয়াতে যাব।

ভক্তেরা প্রণাম করিয়া উঠিতেছেন। পাদপদ্মে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন, মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মণীন্দ্র প্রণাম করিবার সময় মা বলিলেন, "তোমার মার কি বিশ্বাস। কাশীতে যেতে বলায় বলেছিল, 'এই আমার কাশী, আমি কোথাও যাব না'।"

মণীন্দ্রের মা শ্রীশ্রীমার কাছে থাকিতেন। এক বৎসরের উপর হইল তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। তিনি শ্রীশ্রীমার খুব সেবা করিয়াছিলেন। মা তাঁকে বলিয়াছিলেন, "আমার এখানে কেউ বেশী দিন থাকতে পারেনি, কেদারের মা ছিল আর তুমি আছ।"

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় সংবাদ আসিল মাকুর ছেলের অবস্থা খুবই খারাপ। শুনিয়া মা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। বরদা নামক ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "পাল্কী ঠিক করে রাখ, কাল সকালেই আমি যাব যদি ছেলে ততক্ষণ বেঁচে থাকে। সকালেই আমাকে সংবাদ এনে দেবার কি হবে ?"

মণীন্দ্র—আমি ও সা—খুব ভোর ভোর সংবাদ এনে দিব। একটু পরেই বৈ—মহারাজ জয়রামবাটী হইতে ফিরিলেন। মাকে এই সংবাদ দিতেই চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি ছেলে নাই ?"

সকলকে নিরুত্তর দেখিয়া মা বলিলেন, "কতক্ষণ মারা গেল ?"

বৈ—মহারাজ—সাড়ে পাঁচটার সময়।

মা—এখন গেলে দেখতে পাব ?

বৈ—মহাবাজ—না মা, নিয়ে গেছে।

মা খুব কাঁদিতে লাগিলেন। একটু থামিয়া আবার কাঁদিতেছেন। স্বামী কেশবানন্দ মাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করাতে মা কাঁদিয়া বলিলেন, "কেদার গো, আমি ভুলতে পাচ্ছি না।"

ছেলেটি মাকুর সঙ্গে জয়রামবাটী যাইবার সময় কোথা হইতে কতকগুলি গুলঞ্চ ফুল কুড়াইয়া আনিয়া মায়ের পায়ে দিয়া বলিয়াছিল, "দেখ পিসিমা কেমন হয়েছে।" তারপর সে প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীমার পায়ের ধূলা লইল। পবে ফুলগুলি জামার পকেটে পুরিয়া লইয়া গিয়াছিল। শরৎ মহাবাজ তাহাকে খুব ভালবাসিতেন। অসুখের সময় ছেলেটি "লালমামা লালমামা" বলিয়া শরৎ মহারাজকে খুব ডাকিয়াছিল। মা বলিলেন, "হয়ত কোন ভক্ত এসে জন্মেছিল। শেষ জন্ম হবে। নইলে তিন বছরের ছেলের অত বুদ্ধি, অমন করে পুজো করে গা ! লালন পালন করে আমাব কষ্ট।"

এই সব ব্যাপারে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। রাত্রিতে শ্রীশ্রীমা মেয়েদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাদের খাওয়া হইয়াছে কিনা ? যখন শুনিলেন তাহাবা কিছুই খায় নাই (মা খান নাই বলিয়া) তখন তিনি একটু দুধ ও দুখানি লুচি খাইলেন।

এপ্রিল ২১, সোমবার। পরদিন সন্ধ্যার সময় মনীন্দ্র ও প্র-মার কাছে গিয়াছেন। মাকুর ছেলের মৃত্যুতে মাব মন বিষণ্ণ। তাহারই কথা হইতেছে।

মা—সে বলতো, "ফুল লাল করেছে কে ?" আমি বলতুম, "ঠাকুর করেছেন।"

"কেন ?"

"তিনি পরবেন বলে। * * * * শরতের খুব লাগবে। সর্ব্বদা কোলে করতো, যদিও তার পায়ে ব্যথা। কোলে বসে বলতো—'তোমার মা কোথায় ?' শরৎ মাকুকে দেখিয়ে বলতো—'এই যে আমার মা'। ছেলে বলতো—'তোমার মা স্কুল বাড়ীতে গেছে'।"

ঐ সময় রাধুর অসুখের জন্য মা তাহাকে লইয়া কিছুদিন নিবেদিতা স্কুল বোর্ডিংএ ছিলেন। উদ্বোধনের বাড়ীতে গোলমাল—রাধুর সহ্য হইত না।

মণীন্দ্র—অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুরের খুব কষ্ট হয়েছিল।

মা—তিনি বলেছিলেন, "গামছা যেমন মোচড় দেয়, তেমনি হয়েছিল।"

"আমার এক ভাসুরপো (জ্ঞাতির ছেলে), দীনু বলে, বিষ্ণু ঘরে পূজো করতো। হৃদয় কালীঘরে পূজো করতো। দীনু 'যশোদা নাচাত তোমায় বলে নীলমণি' এই সব গান ঠাকুরকে শুনাতো। তার কলেরা হলে ঠাকুর যদু মল্লিকের বাগানে চলে গিয়েছিলেন।"

মণীন্দ্র—আপনি তখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন ?

মা—হাঁ, আমি নহবতে ছিলুম। ঠাকুরের পায়ের ধূলো, আমার পায়ের ধূলো, মা কালীর স্নানজল দিয়েছিলুম। তা বাঁচলো না—মারা গেল। ঠাকুরের খুব কষ্ট হয়েছিল।

"আমার ছোট ভাই এণ্ট্রান্স পাশ করেছিল—বেশ লেখাপড়া শিখেছিল, ডাক্তারী পড়ছিল। নরেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে নরেন বলেছিল 'মার এমন ভাই আছে ? সব ত চাল কলা বাঁধা বামুন'। নরেন রহস্য করে বলেছিল, 'পেটের ভিতর ফোঁড়া হবে, তোমাকে তা কাটতে হবে। যোগেনকে বলেছিল, যোগেন, তুমি এর পড়ার খরচ যোগাবে।' যোগেন মারা গেল। রাখাল ৪০৲ টাকার বই কিনে দিয়েছিল। রাখাল, শরৎ তার সাথে একসঙ্গে তাস খেলতো। সে ভাই মারা গেল।

"সংসার মায়ার বন্ধন। * * * * (করুণ স্বরে) আহা ! যাকে পাশ ফিরে শুইয়ে মনে প্রত্যয় হয় না, এমন ছেলে মাকুর, দেখ না কত যন্ত্রণা !

"এই রাধুকে লালন পালন করে কত কষ্ট—পালার বড় জ্বালা। রাধু যখন হয় মা বলেছিলেন, 'ছোট বউকে ওর মা বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে চায়, তা যাক না।' আমি পূজার সময় দেখলুম (কলিকাতায় ঠাকুরকে পূজা করিবার সময়) থিয়েটারে যেমন পর্দা (Drop Scene) এইরূপে দু হাত মেলিয়া দেখাইয়া) সরে যায়, সেইরূপ দেখেছিলুম—রাধুর মা খুব কষ্ট পাচ্ছে, রাধুকে শুধু চারটি মুড়ি দিয়েছে, বাইরে উঠানে পড়ে খড় ধূলোর উপরে সে মুড়ি খাচ্ছে। রাধুর মা রাধুর হাতে কোথাও একটা লাল সুতো, কোথাও একটা নীল সুতো বেঁধেছে—পাগলের যেমন খেয়াল! অন্য সব ছেলেরা মুড়িটুড়ি মিষ্টি দিয়ে খাচ্ছে—এই দেখে জলে চুবিয়ে ধরলে যেমন হাঁফিয়ে উঠে তেমনি হাঁফিয়ে উঠলুম, বুঝলুম আমি ছেড়ে দিলে রাধুর ঐ অবস্থা।"

শ্রীশ্রীমা তাঁর ছোট ভাই অভয়কে খুব ভালবাসিতেন। ভাইদের তিনিই মানুষ করিয়াছেন। অভয় মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিল—"দিদি, সব রইল—দেখো।" রাধু তখন মাতৃগর্ভে। প্রসবের পর রাধুর মা শ্রীশ্রীমায়ের সহিত কলিকাতায় আসেন। পরে পাগল হইলে তাঁহাকে জয়রামবাটী পাঠান হয়। রাধু সেখানে খুব দুঃখ কষ্ট পাইতে থাকে।

একদিন বাগবাজার মঠে পূজা করিবার সময় মা মনের মধ্যে জয়রামবাটীর ছবি (Vision) দেখেন এবং অভয়ের অন্তিমকথা স্মরণ করিয়া দু চার দিনের মধ্যেই দেশে গিয়া রাধুর লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। মা বলিতেন, "সেই হতেই আমাকে মায়ায় ধরলো।" আর একবার কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীমায়ের খুব অসুখ। তখন হঠাৎ রাধু শ্বশুরবাড়ী যাইবে বলিয়া জয়রামবাটী চলিয়া আসে। মাকে বলিয়াছিল, "তোমাকে দেখবার কত ভক্ত আছে, আমার স্বামী ছাড়া আর কে আছে?" মা এই ঘটনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "কাল রাধু ত অমন করে আমার মায়া কাটিয়ে চলে গেল। মনে ভয় হল, ভাবলুম—ঠাকুর কি তা হলে আমাকে এবার রাখবেন না? মা আরও বলিয়াছিলেন "এই যে রাধি রাধি করি, এ একটা মায়া নিয়ে আছি বইতো নয়?"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। মণীন্দ্র ও প্র—বিদায়

লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রাত্রেই তাঁহারা আরামবাগ যাইবেন।

মা বলিলেন, "তোমরা একটু কিছু খাও।"

প্র—আমরা খেয়ে এসেছি।

মা—একটু খাও না কেন ? ওগো, একটু মিষ্টি এনে দাও ত।"

মা—তোমরা খাওয়া দাওয়া করে যেও।

মণীন্দ্র—আচ্ছা মা।

মা—গাড়ী হয়েছে ?

"হয়েছে।"

প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণের সময় মা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ভগবানে মতি হোক।" মণীন্দ্র—"মা আমাদের মায়া যেন কাটে" মা এ কথায় প্রসন্ন দৃষ্টি করিলেন।

এপ্রিল ২৩শে। ভক্তেরা মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। না— মাকে বলিলেন, "মা আপনার মনে এখন অশান্তি (মাকুর ছেলের মৃত্যুতে), আমি সেজন্য শীঘ্র রওনা হব মনে করছি।" মা বলিলেন, "সুখ দুঃখ আর কোথায় যাবে ? এরা ত আছেই। তোমার তাতে কি ? তুমি এখন থাক। আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের ৪ঠা ৫ই তারিখে যাবে।"

সোমবার—১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬। স্বামী শা—ও হ—কাশী হইতে আসিয়াছেন। মণীন্দ্রও পুনরায় আসিয়াছেন। সকালে শা—মণীন্দ্র প্রভৃতি শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। ভক্তেরা কোয়ালপাড়া মঠে থাকেন, মা জগদম্বা আশ্রমে।

শা—মা, আপনার শরীর কেমন আছে ?

মা—আমি ভালই আছি।

Internment (রাজদ্রোহিতার সন্দেহে আটক) হইতে মুক্তি প্রাপ্ত একটি ছেলে পূর্ব্বদিনে আসিয়াছে। পুলিশ হাঙ্গামার ভয়ে ভক্তেরা তাহাকে তখনি বিদায় দেবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "ওকে রেখে দাও ; আজ থাক কাল যাবে।" কে—তাহাকে মঠে না রাখিয়া অন্যস্থানে রাখিয়াছিলেন। কারণ, তখনও রোজ রাত্রে চৌকীদার আসিয়া নবাগত ভক্তদের নাম ধাম লিখিয়া

লইত। পরদিন মা তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সেই ছেলেটি কোথায়? চলে গেল নাকি?"

মণীন্দ্র—সে আছে। আজ খাওয়া দাওয়া করে যাবে।

মা—(শা—কে) রাত্তিরে কোথায় ছিল?

শা—জানি না মা, আমাদের জানায় নাই।

মা—এখানে যখন জল হয়, কাশীতেও কি সেই সময় জল হয়?

শা—না মা, শ্রাবণ মাসে সেখানে বর্ষাবস্ত। তবে কখনো কখনো বৈশাখ মাসে ঝড় হয়ে আম টাম নষ্ট করে দেয়।

শা—কাশীতে যারা মরবে বলে যায়, বুড়ীরা, তাদের মা বড় কষ্ট। হয় ত বাড়ী থেকে টাকা পাঠাত, বন্ধ করে দিয়েছে। নীচের স্যাঁৎ সেতে অন্ধকার ঘরে থাকতে হয়।

মা—হাঁ, বুড়ীদের খুব কষ্ট দেখেছি, যখন কাশীতে বংশীদত্তের বাড়ীতে ছিলাম। সামান্য চাল ভিক্ষে করে এনে হয়তো ভিজিয়েই তা খেয়ে ফেলতো, রাঁধতো না।

শা—বুড়ীরা মরতে গিয়ে আবার দীর্ঘজীবী হয়।

মা—বিশ্বনাথ দর্শন স্পর্শনে পাপ ক্ষয় হয়। তাতেই দীর্ঘজীবী হয়। বৃন্দাবনে শাঁখের জল গায় দেয়, প্রসাদ খাওযায় বলে দীর্ঘজীবী হয়।

মা এবার রাধুর কথা বলিতেছেন—

রাধু একটু দাঁড়াতে পারলে হয়। ঘরেই শৌচাদি করছে। এ ভাবে আমাকে আর কদিন রাখবেন। ঠাকুর যে কি করবেন, জানি না।

শা—কে মাকুর ছেলের কথা বলিতেছেন—

"শোকে মানুষকে যা জব্দ করে এমন আর কিছুতেই পারে না। শরতেরও তার জন্য খুব কষ্ট হয়েছে। কা—ঔষুধ আনতে কলকাতা গেল। এরা আবার তাকে বলে দিচ্ছিল শরতের সঙ্গে যেন দেখা না করে। আমি বলি, কলকাতা যাবে—শরতের সঙ্গে দেখা করবে না—এ কি রকম কথা?"

শ—হাঁ শরৎ মহারাজ লিখেছিলেন, কা—যেন সটান আমার কাছে আসে।

মা তরকারী কুটিতেছিলেন। চেলো (ফল) দেখে শা—বলিলেন, এ কল্‌কাতায় পাওয়া যায় না।

মা—এতে ছেঁচ্‌কি হয়, অম্বলে দেওয়া চলে, ঠাণ্ডা গুণ ভাল জিনিষ। (মণীন্দ্রকে) জাহানাবাদে পাওয়া যায় ?

মণীন্দ্র—হাঁ মা।

শা—মায়ের নিকট দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা তুলিলেন—

শা—ইনফ্লুয়েঞ্জাতে শুনছি ষাট লক্ষ লোক মরেছে। ধান চাল সব দুর্ম্মূল্য—লোকেব বড় কষ্ট।

মা—হাঁ বাবা, লোকে খেতে পাচ্ছে না। আবার যার ঘরে ছেলে পিলে আছে তার আরও কষ্ট। এই ত কষ্ট আরম্ভ হয়েছে। বর্ষা হয়ে ধান চাল হলে তবে ত কষ্ট যাবে। কে সাহেব নাকি এসেছিল—কল্‌কাতায়—যেখানকার ধান চাল সেখানে থাকবে, আইন করবে বলে; সে নাকি চলে গেছে।

মণীন্দ্র—সেরূপ ত চেষ্টা হচ্ছে।

শা—লোকের কষ্টতো দিন দিন বাড়ছে। এত কষ্ট দেশে—এ কি মা কর্ম্মফল ?

মা—এত লোকের কি কর্ম্মফল ? কি একটা হাওয়া এসেছে।

শা—যুদ্ধ থেমে গেছে, তবু জিনিষপত্র সস্তা হচ্ছে না কেন ?

মা—তবে যে বলে, আবার যুদ্ধ হচ্ছে ?

শা—সে এখানে—কাবুলে।

শা—এত দুঃখ কষ্ট যুদ্ধ বিগ্রহ, এ কি মা যুগ পবিবর্ত্তন হবে আবার ?

মা—(হাসিয়া) কি করে বলবো ? তাঁর ইচ্ছায় কি হবে কেমন করে জানবো ? রাজাব পাপে বাজ্য নষ্ট হয়। হিংসা, খলতা, ব্রহ্মহত্যা এই সব পাপ। রাজার পাপে প্রজার কষ্ট ও দৈব উৎপাত—যেমন যুদ্ধ, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, সবাই একটু নরম হলে তো যুদ্ধ থেমে যায়।

"আহা, ভারতেশ্বরী (ভিক্টোরিয়া) কেমন ছিলেন! লোকে কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল। এখন একটি পাঁচ বছরের ছেলে—সেও দুঃখের কথা

বোঝে। আচ্ছা শরৎ এখানে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, কতগুলি চাল দেওয়া হল ?"

মণীন্দ্র—কত তা ঠিক বলতে পাচ্ছি না। তবে প্রতি সপ্তাহে চৌত্রিশ টাকার চাল দেওয়া হয়।

মা—কত করে পাচ্ছে ?

মণীন্দ্র—জন প্রতি এক পোয়া হিসাবে।

মা—প্রত্যেকে কত পেলে ?

মণীন্দ্র—ছয় সের, সাত সের, আট সের, যাদের যেমন লোক খেতে।

মা—কতগুলি লোক পেলে ?

মণীন্দ্র—ঠিক জানি না ; মুসলমানের মেয়েরাই বেশী ভিখারী।

মা—হাঁ, এখানে মুসলমানেরা গরিব বেশী। আচ্ছা, শরৎ আর কোথায় চাল দিচ্ছে ?

মণীন্দ্র—বাঁকুড়া, ইন্দপুর, মানভুম। যেখানে দুর্ভিক্ষ সেইখানেই দিচ্ছেন।

মা—ছেলেরা যাচ্ছে সেখানে ?

শা—মঠ থেকে যাচ্ছে।

মণীন্দ্র—ইন্দপুর যেখানে সা—র যাবার কথা হয়েছিল।

মা—সা—র ভগ্নীটির শিওড়ে বিবাহ হয়েছে।

মণীন্দ্র—হাঁ মা, সা—বিবাহে না যাওয়ায় তার বাপ মা—

মা—হাঁ, বড় দুঃখিত হয়েছে তা হবেই তো, কিন্তু সাধুসন্ন্যাসী মানুষ, বিয়েতে যাবে কেমন করে ? অন্য সময় যাবে বই কি ?

"প্র—র ছেলেটি ভাল হলে হয়। ছেলে হওয়া এক পাপ। তিনি বলতেন,—সংসারে সব ভেল্কিবাজি। ভেল্কিবাজি বটে, তবে মনে থাকে না এই-ই দুঃখ।"

১৬ই আষাঢ় বৈকালে মণীন্দ্র, প্র—শ্যামবাজারের প্রবোধ বাবু—প্রভৃতি মাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। প্রণাম করিতেই মা, প্র—কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলে ভাল আছে তো ? অসুখ করেছিল।"

প্র—ভাল আছে।

মা—তোমরা কতক্ষণ এলে ? ভাত খাওয়া হয়েছে ?

"হয়েছে ।"

মণীন্দ্র ও প্র—বাবু নিবেদিতা স্কুলে মেয়েদের ভর্ত্তি করিয়া দিতে ইচ্ছুক ।

সে কথা উত্থাপন করিয়া মার অনুমোদন প্রার্থনা করায় তিনি বলিলেন, "বেশ তো শরৎকে লেখ ।"

"তাঁকে লেখা হয়েছে ।"

স্ত্রী-ভক্তদের কে একজন বলিলেন, "থাকতে পারবে কি, ছেলে মানুষ ?"

মা—খুব পারবে। বাঙ্গাল দেশের মেয়েরা ছয় সাত বছর বয়স, থাকে তো ? তাদের মা বাপ নিতে এলেও যেতে চায় না ।

প্র—আজ গ্রাম দেখতে গিয়েছিলুম। খুব কষ্ট লোকদের। পরণের কাপড় নেই—আমাদের সামনে বেরুতে পারলে না। চালে খড় নেই।

মা—তাদের চাল দেওয়া হল কি ?

প্র—কাল রবিবারে দেওয়া হয়েছে ।

মা—কাপড় দেওয়া হয় কি ?

প্র—বেছে বেছে দেওয়া হয়। * * *

"মা আপনি কি এক স্বপ্ন দেখেছিলেন, শুনেছি—একটি স্ত্রীলোক কলসী ও ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে—"

মা—হাঁ, একটি মেয়ে একটা কলসী ও ঝাঁটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কে গো ? সে বল্লে—আমি সব ঝেঁটিয়ে যাব। বল্লুম, তারপর কি হবে ? সে বল্লে, অমৃতের কলসী ছড়িয়ে যাব ।

"তাই বুঝি হচ্ছে। মার মুখে শুনতুম্ যে যখন হয় উপর উপর তিন বছর দুর্ভিক্ষ হয়। দু বছর হয়েছে কি ?"

মণীন্দ্র—যুদ্ধ তো অনেক দিন হচ্ছে ।

মা—যুদ্ধ তো চার পাঁচ বছর হচ্ছে। তা নয়, দুর্ভিক্ষ কি দু বছর হয়েছে ? তা হলে আর এক বছর হবে। 'এখন ধানের দাম কত ?', মা

জিজ্ঞাসা করিলেন। ও দেশের হিসাবে মূল্য বলা হইল। মা বলিলেন, "এত দাম ? আর, সব জিনিষই—কাপড়, তেল এ সব ত খুব চড়েছে। যাদের আছে—তাদেরও চিন্তা ভাবনা। এবার 'তোমার চামড়া আমি খাব, আমার চামড়া তুমি খাবে' !

"তিনি যত দুঃখ কষ্ট দিচ্ছেন, তা তো বুক পেতে নিতে হবে। ভগবান যা করবেন তাই হবে।"

প্র—মা, আপনাকেই যখন এত কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে তখন অন্য আর কারুরও কি পরিত্রাণ আছে ?

মা—আমাকে ঠিক যেন খাঁচায় পুরে রেখেছে। নড়বার চড়বার যো নেই—কোনো দিকে পালাবার উপায় নেই।

প্র—কামারপুকুরে আবার গোলমাল হচ্ছে, ঠাকুরের জায়গা নিয়ে। (ঠাকুরের জন্মস্থানে মন্দির করিবার জন্য যে নূতন জমি কেনা হইয়াছে)

মা—কে গোলমাল কচ্ছে ? মহিম বাবু ?

প্র—না, ফকির বাবু আর হেম বাবু।

মা—আচ্ছা, গোলমালে কাজ কি ? বেড়া সরিয়ে নিলে কি হয় না ?

প্র—আমি ত খুঁটো চারদিকে পুঁতে দিয়ে এসেছি। মহিম বাবু রাস্তার উপরে মাটি পড়াতে বরং সন্তুষ্ট। আমাদের আরও খানিকটা এগিয়ে খুঁটো পুঁতলে ভাল হত। তারপর যত আপত্তি করতো ক্রমশঃ সরিয়ে আনা হত। যেমন ব্যবসাদার, তেমনি ব্যবসাদারী বুদ্ধি দরকার।

মা এই আশ্চর্য্য ব্যবস্থা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

প্র—শরৎ মহারাজকে লিখেছি। তিনি যেমন বলবেন তেমনি করবো।

মা—পূর্ব্বে মুনিষের (মজুরের) দাম চার পয়সা ছিল। আমার মনে আছে, এতখানা একটা কাগজে লিখে কল্‌কাতায় লোক পাঠাতো। সে হেঁটে যেত। তখন ডাক ছিল না।

প্র—এখন ডাক হয়ে কিন্তু সুবিধা হয়েছে মা।

মা—তা হয়েছে। পূর্ব্বে যা ছিল তাই বলছি। এক টাকায় অনেক তেল পাওয়া যেত। এখন ধান এক আঁজলাতেই টাকা বলে সকলে

ধান বেচে দিচ্ছে, টাকা বেশী পাওয়া যায় কিনা। বাকী সামান্য যা থাকছে তাও ত রাখতে পারবে না, কেন না পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, খেতে ত হবে ?

"প্রসন্ন (বড় মামা) চার পাঁচ শ টাকার ধান বেচে দিলে। তার কিছু ধান চুরি গিয়েছিল। বাজ ঘোষও ধান বেচে ফেলছে। তার অনেক ধান। তাকে না কি চিঠি দিয়েছিল "তুমি এত টাকা দাও, না হলে তোমার বাড়ীতে চুরি হবে।" সে পুলিশে চিঠি দেখিয়েছিল। বোধ হয় গ্রামের দুষ্ট লোকে ঐরূপ করছে।"

মণীন্দ্র ও প্র—পুনরায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। প্র—জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, জোর করে সংসার ত্যাগ করা চলে ?"

মা এ কথায় সস্মিত মুখে অমনি উত্তর দিলেন, "লোকে ত কচ্ছে গো।"

প্রবোধ—মহামায়ীর প্রসন্নতা লাভ না করে যদি নিজের খেয়ালে কেউ সংসার ত্যাগ করে, তা হলে বোধ হয় গোল বাধে।

মা—ঘরে ফিরে আসে।

মণীন্দ্র—মহারাজদিগকে কি ঠাকুর সন্ন্যাস দিয়েছিলেন ?

মা—কি জানি। না, ঠাকুর দেন নাই, স্বামিজী দিয়েছিলেন বোধ হয়।

মণীন্দ্র—স্বামিজীও খুব কষ্ট করেছিলেন। তিনি কিন্তু উতরে গেলেন—শরীরে সয়ে গেল।

মা—না, তাঁকেও খুব ভুগতে হয়েছে, পেচ্ছাবের অসুখ। সর্ব্বদাই গা জ্বালা করতো। তবু খেটে খেটে মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়ে ফেলেছিলেন।

মণীন্দ্র—মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছিল ?

মা—না, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে নি। এত পরিশ্রম করেছিলেন যে রক্ত উঠা পরিশ্রম।

প্র—শুনেছি স্বামিজী হরি মহারাজের গলা ধরে কেঁদেছিলেন দার্জ্জিলিংএ, "ভাই, তোমরা শুধু তপস্যা নিয়ে থাকবে—আমি একা প্রাণ বার কচ্ছি !"

মা—হাঁ বাবা, তিনি (স্বামিজী) নিজের দেহের রক্ত দিয়েছিলেন পরের জন্য।

"নরেন ত বিলাত হতে ফিরে এসে এই সব করলেন। তাই ছেলেদের দাঁড়াবার একটু জায়গা হয়েছে।

"এখন বিলাতে (বিলাত বলিতে শ্রীশ্রীমা আমেরিকা বুঝিয়াছিলেন চার জন ছেলে আছে।"

প্র—হাঁ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী পরমানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ।

মা—কালীর নামটি কি ?

মণীন্দ্র—স্বামী অভেদানন্দ।

মা—নরেন সেখান থেকে ফিরে এসে মঠ করলেন। কালী এখানকার কিছুই করলেন না।

মা—বসন্ত (স্বামী পরমানন্দ) এখানে চিঠি পত্র লেখে, টাকা কড়ি পাঠায়। সেখানে বক্তৃতা দেয়।

মা—যোগেন (স্বামী যোগানন্দ) খুব কঠোর করেছিল, তীর্থে গিয়ে আঁজলা (অঞ্জলি) করে জল খেত। রুটী শুকিয়ে গুঁড়িয়ে রেখে দিত। তাই কিছু কিছু খেত। তাতে খুব পেটের অসুখ করে। তাইতেই ভুগে ভুগে দেহ গেল! * * *

"সংসারে কি সুখ আছে ? এই আছে, এই নাই। সংসার বিষের গাছ। বিষে জেরে ফেলে। তবে যারা সংসার করে ফেলেছে, তারা আর কি করবে ? বুঝতে পেরেও কিছু করতে পারে না।"

ভক্তরা প্রণাম করিয়া মঠে (কোয়ালপাড়া মঠ) ফিরিলেন। বৈকালে আবার ম, প্র, মার কাছে গেছেন।

প্র—শরৎ মহারাজ পত্রের উত্তর দিয়াছেন, পড়ব মা ?

মা—পড়।

প্রবোধ বাবু চিঠি পড়িয়া মাকে শুনাইলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে এই লেখাছিল "আমার মত হইলে কি হইবে, বীণাকে (প্রবোধ বাবুর মেয়ে) এখানে রাখা সম্বন্ধে ঠাকুরের ইচ্ছা অন্যরূপ।"

মা—তাই তো, এমন কথাটা কেন লিখলে বল দেখি, একেবারে কাটিয়ে লিখে দিয়েছে ? তা বোধ হচ্ছে—সুধীরার মত নাই।

"সুধীরা বলেছিল 'মা আর পারি না। আমার বড কষ্ট হচ্ছে'।

"সুধীরা মেয়েদের জন্য কত কষ্ট করে। যখন খরচ আর চলে না, বড়লোকের মেয়েদের গান, বাজনা শিখিয়ে মাসে ৪০৲ ৫০৲ টাকা আনে।

"স্কুলের মেয়েদের সব শিখিয়েছে—সেলাই করা, জামা তৈরী করা। সে বছর তিনশ টাকা লাভ হয়েছিল। ঐ টাকায় ওরা হেথা সেথা যায়—পূজোর সময়।

"সুধীরা দেবব্রতের (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) ভগ্নী। ভাই নিজে ষ্টেসনে আড়ালে থেকে ভগ্নীকে টিকিট্ কাটতে, একলা গাড়ীতে উঠতে—এ সব শিখাতো।

"মাদ্রাজের দুটি মেয়ে বিশ বাইশ বছর বয়স বিবাহ হয় নাই, নিবেদিতা স্কুলে আছে। আহা, তারা সব কেমন কাজকর্ম্ম শিখেছে।

"আর আমাদের এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছর হতে না হতেই বলে 'পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও।'

"আহা। রাধুর যদি বিয়ে না হত, তা হলে কি এত দুঃখ দুর্দ্দশা হোত।"

পরলোকগত—মণীন্দ্রভূষণ বসু।

অদ্বৈতবাদ

মায়া

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[বাচস্পতি মিশ্র কৃত শঙ্কর ভাষ্যের টীকা 'ভামতী' ও গোবিন্দানন্দ কৃত 'রত্ন-প্রভা' টীকা অবলম্বনে এই অদ্বৈতবাদের উপন্যাস (Introduction) লিখছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে বাচস্পতি মিশ্র সপ্তম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইউরোপীয় দার্শনিকদের সম-মত সকল যে উদ্ধৃত করেছিলাম তার হেতু, ইউরোপ যখন অর্দ্ধ-সভ্য তখন ভারতে আধুনিক সভ্য-ইউরোপের মতবাদ সকল পরিস্ফুট ছিল, এই বিষয়টি পাশ্চাত্য মোহমুগ্ধ অনুকরণ প্রিয় 'আধুনিক' সভ্য ভারতবাসী যেন একটু চিন্তা করবার অবসর প্রাপ্ত হন।]

পূর্ব্বে পূর্ব্ব-পক্ষ ও সিদ্ধান্ত-পক্ষের যে বাদানুবাদ হল সে গুলি আমরা ন্যায়ের অবয়বে দেখাবার চেষ্টা করবো। এতে আমাদের বোঝবার আরও সুবিধা হবে।

পূর্ব্ব-পক্ষ বলছেন,

ব্রহ্ম অজিজ্ঞাস্য

যেহেতু, তাহা নিষ্প্রয়োজন ও অসন্দিগ্ধ.

যেমন—স্ফীতালোক মধ্যবর্ত্তী সমনস্ক ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট ঘট অথবা বায়স দন্ত

সিদ্ধান্ত-পক্ষ উত্তর দিচ্ছেন,—

ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য

যেহেতু, তাহা সপ্রয়োজন ও সন্দিগ্ধ

যেমন—স্বর্গাদি সাধক ধর্ম্ম

পুনশ্চ, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা শাস্ত্র সপ্রয়োজন

যেহেতু, ইহা বন্ধন-নিবর্ত্তক জ্ঞানের হেতু

যেমন—রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি যুক্ত ব্যক্তির উদ্দেশে বলা ইহা 'রজ্জু, সর্প' নহে।

পুনশ্চ, বেদান্ত শাস্ত্র আরম্ভনীয়

যেহেতু, ইহা আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ সপ্রয়োজন

যেমন—ক্ষুন্নিবৃত্তিরূপ ভোজনাদি ক্রিয়া

পুনশ্চ, ব্রহ্ম সন্দিগ্ধ

যেহেতু, ব্রহ্ম বিষয়ে বহুবাদীর বহু প্রকারের বিপ্রপতিপত্তি বা সিদ্ধান্ত দেখতে পাওয়া যায়

যেমন—দেহই আত্মা, মনই আত্মা

এই ন্যায় গুলির দ্বারা সিদ্ধ হল ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য।

পূর্ব্ব-পক্ষ বলেছেন,

প্রপঞ্চ মিথ্যা নহে অর্থাৎ অধ্যস্ত নহে

যেহেতু, তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সিদ্ধ

যেমন, আত্মা

সিদ্ধান্ত পক্ষ উত্তর দিচ্চেন,

প্রপঞ্চ মিথ্যা অর্থাৎ অধ্যস্ত

যেহেতু, ইহা জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য

যেমন—শুক্তিতে রজত বা রজ্জুতে সর্প ভ্রম।

এর দ্বারা সিদ্ধ হল অধ্যাসও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, একে অপলাপ করবার যো নেই।

পূর্ব্বে দেখান হয়েছে সংস্কার প্রত্যক্ষ মূলক নয়, অনাদি। অহং, দেশ, কাল, নিমিত্ত, ঈশ্বর, ভূত, দেব প্রভৃতি কত জিনিষের আমাদের সংস্কার রয়েছে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তা হলে কেউ বলতে পারেন না কবে তাঁরা এ সব জিনিষ দেখেছেন। তারপর দেখ দেশ, কাল, নিমিত্ত, অহং যখন প্রত্যক্ষ মূলক বাস্তব সংস্কার নয় তখন আর জগৎকে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ মূলক বলব কি করে। দেশ, কাল, নিমিত্ত, অহং ছাড়া কেউ কখন জগৎকে ত ধারণাই করতে পারে না। দেশ-কাল-নিমিত্ত-অহং যখন কাল্পনিক তখন জগৎটা আর বাস্তব হবে কি করে।

কাল্পনিক স্বপ্ন যেমন সত্য বলে বোধ হয় ব্রহ্মের উপর জগৎটাও ঠিক তেমনি কল্পনা। দেশ-কাল-নিমিত্ত-অহং হল আপেক্ষিক সত্য। কিন্তু আপেক্ষিক সত্য মানতে গেলেই নিত্য-সত্য অর্থাৎ ত্রিকালে যা অবিকারী তাকেও মানতে হবে। এই নিত্য-সত্যই ব্রহ্ম। এটা একটা অবস্থা। যেখান থেকে "ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর।" আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়ে। বোধ হয় যেন তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্ব আছে কিন্তু স্পর্শের দ্বারা তা কিছুই বোধ হয় না। ছবিতে দেখলুম গাছের অনেক দূরে যমুনা কিন্তু সেটা চখের ভ্রম (Optical Illusion) ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই অবস্থায় জগৎটা ঠিক ঐ রকম বোধ হয়। সে অবস্থা থেকে নামলেই আবার এই দেশ-কাল-নিমিত্ত-অহং এর গণ্ডি—এই প্রত্যক্ষ মূলক ব্যবহারিক সত্তা। ঐ অবস্থার ওপরে উঠলে জগৎ মিশে যায়, জগৎ না থাকলে অহংও থাকে না। তখনকার অবস্থা মুখে বলা যায় না। মুখে বলতে গেলেই আপেক্ষিকের রাজ্য এসে পড়বে।

যা হক এখন আত্মা সম্বন্ধে কত রকমের মত দেখ—

১।	সাধারণে	আত্মাকে	দেহ	বলে থাকেন
২।	চার্ব্বাক ...	" ...	ঐ ...	"
৩।	ভিন্ন-চার্ব্বাকেরা	" ...	ইন্দ্রিয় ...	"
৪।	নৈয়ায়িক-বিশেষগণ [প্রাভাকর]		মন ...	"
৫।	যোগাচারী বৌদ্ধগণ	" ...	ক্ষণিক বিজ্ঞান	"
৬।	মাধ্যমিক ...	" ...	শূন্য ...	"
৭।	নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ	" ...	দেহাতিরিক্ত কর্ত্তা ভোক্তা	"
৮।	সাংখ্যগণ ..	" ...	অকর্ত্তা কিন্তু ভোক্তা	"

আত্মা সম্বন্ধে যখন এত মতামত তখন আত্মা অবশ্য বিচার্য্য। এই বিচার আরম্ভ করবার পূর্ব্বে আচার্য্যশঙ্কর তাঁহার শারীরক ভাষ্যের উপোদ্ঘাতে (Introduction) নিম্ন লিখিত পূর্ব্ব-পক্ষ ও তাহার সিদ্ধান্ত করেছেন—

পূর্ব্ব-পক্ষ—'আমি' এবং 'আমি যাহা নহি' অর্থাৎ 'তুমি' ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। 'আমি' হইল বিষয়ী (Subject) এবং 'তুমি' হইল বিষয় (Object)। ইহারা আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধ স্বভাব। চেতন-আমি ও জড়-জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব অস্মৎ প্রত্যয়-গোচর-চিদাত্মক বিষয়ীতে যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয়ের এবং তাহার ধর্ম্মের অধ্যাস হইতে পারে না। এবং তদ্‌বিপরীতক্রমে বিষয়ী ও তাহার ধর্ম্মের, বিষয়ে অধ্যাস হইতে পারে না।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা সত্ত্বেও, এক বস্তুতে অপর বস্তুর ও ধর্ম্মের অধ্যাস করিয়া ইতরেতরের (বিষয় ও বিষয়ীর) অবিবেক বশতঃ তাহারা অত্যন্ত বিবিক্ত (বিরুদ্ধ) স্বভাব হইলেও মিথ্যা জ্ঞান নিমিত্ত সত্য এবং অনৃতকে একত্রে গ্রহণ করিয়া 'আমি এই,' 'আমার ইহা' এইরূপ নৈসর্গিক (স্বাভাবিক বা সহজাত) লোক ব্যবহার দেখা যায়।

পূর্ব্ব-পক্ষ—এই অধ্যাস কি ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্ব দৃষ্টাবভাস :—ইহা অপর বস্তুতে পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় (স্মৃতিরূপ) আর একটি বস্তুর জ্ঞান।

[আমরা পূর্ব্বে বলেছি যে স্মৃতি-রূপ যে সংস্কার তা অনাদি এবং ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট বাহ্য বস্তুকে অপেক্ষা করে না। অনাদি সংস্কার দিয়ে আমরা সাজিয়ে গুজিয়ে ব্রহ্মের উপর নানা রঙ বেরঙের ছবি আঁকছি। আর বাহ্য বস্তু দেখলেই যে ঠিক তদাকার জ্ঞান হবে তারও কোনও মানে নেই। হরফ গুলো প্রত্যক্ষ করছি তাদের কোনও অর্থ নেই, অর্থ মনের মধ্যে উঠছে অন্য বস্তুর। হরফের সঙ্গে ও অর্থের সঙ্গে কোনরূপ সাদৃশ্যও নেই। বালিতে যখন জলের তরঙ্গ ভঙ্গ দেখা যায় সেখানে আরোপ্য অধিষ্ঠানে কোন সমানাকারতা বা সাদৃশ্য থাকে না। অধ্যাসের আর একটা ব্যাপার আমরা দেখছি পরবর্ত্তী জ্ঞানের দ্বারা বর্ত্তমান আরোপ্য জ্ঞানের বাধ বা নাশ হয়। যেই অধিষ্ঠানের (রজ্জুর) স্বরূপ জ্ঞান হল অমনি আরোপ্যের (সর্পের) জ্ঞান নাশ হল। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, আরোপ্য (সর্প) তখনকার মত প্রকাশমান (সত্য) বলে বোধ হলেও বাস্তবিক অসৎ। মরীচিকার জল যদি সত্য হোত তা হলে হরিণের পিপাসা

মিটত। মরীচিকার জলে যেমন হরিণীর পিপাসা মেটে না তেমনি দেশ কাল দিয়ে গড়া কাম-কাঞ্চনের রসে জীবের পিপাসাও কখনও মিটবে না। 'নাভ কমল মে হ্যায় কস্তুরি কৈয়সে ভরম টুটে পশুকারে। বিন্ সদ্ গুরু নর এই সা হি ভোলে যেই সে মৃগ ফিরে বন কারে॥" "প্রেম সিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,"—সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে অবগাহন করে, রে মূঢ় মন, শান্ত হও তৃপ্ত হও।]

পূর্ব্ব-পক্ষ--কিন্তু কেহ কেহ অধ্যাসকে বলিয়া থাকেন (১) অন্যধর্ম্মীতে অন্যের ধর্ম্মের আরোপ, কেহ কেহ বলেন (২) যেখানে যাহার অধ্যাস হয় সেখানে তাহাদের বিবেকের অগ্রহ-নিবন্ধন ভ্রম হয়। আবার কেহ বা বলেন, (৩) যেখানে যাহার ভ্রম হয় তথায় তাহার বিপরীত ধর্ম্মত্ব কল্পনা করা হয়।

[আত্মখ্যাতিবাদী—(১) বৈভাষিক (২) সৌত্রান্তিক ও (৩) যোগাচারী এবং অসংখ্যাতিবাদী—(৪) মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা প্রথমটিকে "অধ্যাস" বলে থাকেন। দ্বিতীয়টি অখ্যাতিবাদী প্রাভাকরদের মত। তৃতীয়টি অন্যথা খ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকদিগের মত। চতুর্থ মত আচার্য্য শঙ্করের উহা অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি বলিয়া প্রচলিত।

(ক) বৈভাষিকদের মতে আন্তর জ্ঞান ও বাহ্যবস্তু উভয়ই সৎ। বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। যাহা দেখছি তা ঠিক দেখছি।

(খ) সৌত্রান্তিকেরা বলে বাহ্য পদার্থ সৎ কিন্তু প্রত্যক্ষ হয় না। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে আসে বলে অনুমান করে নিতে হয়।

(গ) যোগাচারীরা বলে থাকেন, আন্তর জ্ঞানই সৎ বাহ্য বস্তু বলে কিছু নেই। বাহ্য বস্তু জ্ঞানের বিভিন্ন আকার (form) মাত্র।

(ঘ) মাধ্যমিকের মতে, আন্তর জ্ঞানও অসৎ। বিভিন্ন জ্ঞানের আকার ও তাহার পরিবর্ত্তন ছাড়া অখণ্ড জ্ঞান বলে কিছু নেই। শূন্যের উপর এই বিভিন্ন জ্ঞানের আকার প্রবাহাকারে চলেছে, কিন্তু অলাত-চক্রের মত তাতে একটা অখণ্ডের মিথ্যা জ্ঞান হচ্চে।]

সিদ্ধান্ত-পক্ষ— কিন্তু 'অন্যস্য অন্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি'—সকল প্রকারেই অন্যেতে অন্যধর্ম্মের আরোপ এই লক্ষণটির ব্যভিচার (বিরোধ)

হয় না। যেমন শুক্তিকায় রজত ভ্রম, একচন্দ্রে দ্বিচন্দ্র জ্ঞান, রজ্জুতে সর্প ভ্রম, মরুভূমিতে জলের ভ্রম ইত্যাদি।

পূর্ব্ব-পক্ষ—অবিষয় প্রত্যগাত্মাতে বিষয় ও তাহার ধর্ম্ম সমূহের অধ্যাস কি করিয়া সম্ভব? তোমরা বল যুষ্মৎ প্রত্যয়ের অতীত যে প্রত্যগাত্মা তাহা অবিষয়। যাহা বিষয় তাহা পুরভাগে অবস্থান করে। এই পুরভাগে অবস্থিত এক বিষয়ে আর এক বিষয়ের ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু অবিষয়ে বিষয়ের ভ্রম হইবে কি করিয়া?

[নৈয়ায়িকদের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানের প্রধান উপায়। প্রত্যক্ষ করতে গেলে একজন দ্রষ্টা চাই, বাহ্য বস্তু চাই এবং এই উভয়ের সংযোজক করণ (instrumet) চাই। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যখন করণ বা ইন্দ্রিয় সাহায্যে সংযোগ ঘটে তাকে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ বলে। সন্নিকর্ষ মানে ইন্দ্রিয়রূপ করণের ব্যাপার। ইন্দ্রিয় ব্যাপার-যুক্ত হলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। সেইজন্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ। এই ব্যাপার বা সন্নিকর্ষ-কালে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ে একটা বিশেষ সম্বন্ধ ঘটে। এই সম্বন্ধটি দুরকমের লৌকিক ও অলৌকিক। যখন একটি ঘটের (ব্যক্তির) প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞান হয় তখন লৌকিক-সম্বন্ধ হয় কিন্তু যখন একটা বিশেষ ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হইলেও ঘটত্বরূপ সমস্ত ঘটের (ঘট-সামান্যের) যখন জ্ঞান হয় তখন অলৌকিক সম্বন্ধ হয়। লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয় প্রকারের—(১) সংযোগ (২) সংযুক্ত-সমবায় (৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় (৪) সমবায় (৫) সমবেত-সমবায় (৬) বিশেষণতা।

(১) প্রত্যক্ষ স্থলে সংযোগ সম্বন্ধ।

(২) গুণ, জাতি বা ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কালে সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ।

(৩) গুণত্ব ও ক্রিয়াত্ব প্রভৃতি জাতির প্রত্যক্ষ স্থলে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সম্বন্ধ।

(৪) শব্দ প্রত্যক্ষ স্থলে সমবায় সম্বন্ধ।

(৫) শব্দত্ব প্রত্যক্ষ স্থলে সমবেত-সমবায় সম্বন্ধ।

(৬) অভাবের প্রত্যক্ষ স্থলে বিশেষণতা সম্বন্ধ।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন রকমের—(১) সামান্য-লক্ষণ, (২) জ্ঞান-লক্ষণ, (৩) যোগজ।

(১) কোন ঘট প্রত্যক্ষকালে ঘটত্বরূপে যে সকল ঘটের প্রত্যক্ষ হয় তাহা সামান্য-লক্ষণ।

(২) চন্দন প্রত্যক্ষকালে তাহার সৌরভ অথবা ভ্রান্তিকালে শুক্তিতে যে রজতের প্রত্যক্ষ তাহা জ্ঞান-লক্ষণ।

(৩) যোগিগণের যে অতীত, অনাগত এবং সাধারণের অদৃশ্য যে প্রত্যক্ষ হয় তাহা যোগজ।]

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—আত্মা একেবারে অবিষয় নহে। ইহা অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় এবং অপরোক্ষ। ইহা সকলের নিকট প্রত্যগাত্মরূপে প্রসিদ্ধ। আর এরূপ কোনও নিয়মও নাই যে পুরোভাগে বা সম্মুখে অবস্থিত এক বিষয়ে অন্য বিষয়ের অধ্যাস হয়। দেখ আকাশ অপ্রত্যক্ষ কিন্তু উহা অজ্ঞলোকের নিকট নীল এবং কটাহের মত বলিয়া বোধ হয়। এই হেতু প্রত্যগাত্মাতে অনাত্মার অধ্যাস অযৌক্তিক নহে।

[ভাষ্যটি এক্ষণে আমরা নিম্নলিখিত পূর্ব্ব ও সিদ্ধান্ত-পক্ষরূপে সাজাতে পারি।

পূর্ব্ব-পক্ষ :—কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি অবিষয়ে অধ্যাসঃ বিষয়-তদ্ধর্ম্মাণাম্ যুষ্মৎ প্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যাগাত্মনঃ অবিষয়ত্বং ব্রবীষি ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ :—ন তাবৎ অয়ম্ একান্তেন অবিষয়। অস্মৎ প্রত্যয়-বিষয়ত্বাৎ। অপরোক্ষত্বাৎ চ প্রত্যগাত্ম প্রসিদ্ধেঃ।

পূর্ব্ব-পক্ষ :—সর্ব্বঃ হি পুরঃ অবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরম্ অধ্যস্যতি।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ :—ন চায়ম অস্তি নিয়মঃ পুরোঽবস্থিতে এব বিষয়ে বিষয়ান্তরম্ অধ্যসিতব্যম্। অপ্রত্যক্ষে অপি হি আকাশে বালাঃ তলমলিনতাদি অধ্যস্যন্তি।

ন্যায়াবয়বে এই রকম হবে—

- আত্মাতে অনাত্মার অধ্যাস অসিদ্ধ

যে হেতু তাহা অবিষয় ও অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ পুরোঽবস্থিতও নহে এবং বিষয়ও নহে

যেমন, শুক্তি, রজ্জু, প্রভৃতি

এখানে পূর্ব্বপক্ষীরা পুরোঽবস্থিতির সহিত অধ্যাসের ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ দেখাচ্ছেন। কিন্তু আচার্য্য আকাশের উদাহরণের দ্বারা ঐ অনুমানের ব্যভিচার বা নিয়মভঙ্গ দোষ দেখালেন। ন্যায়ের ভাষায় একে সব্যভিচার-হেত্বাভাস-দোষ বলে।

এখন অন্যথা-খ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকেরা, বিষয় হলেই যে সেটাকে বাইরে থাকতে হবে, এর উপর তাঁরা কেন এত জোর দিচ্ছেন সেটা তাঁদের দিক দিয়ে একটু বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

ন্যায় মতে আত্মা দ্বিবিধ—ঈশ্বর ও জীব। ঈশ্বর নিত্যজ্ঞান, নিত্য-ইচ্ছা এবং নিত্য-প্রযত্নবান। ঈশ্বরের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, উহা সদা বিদ্যমান। জীবাত্মার জ্ঞান মনের সহিত যুক্ত হলে তবে উৎপন্ন হয়। এই জীবাত্মার যখন মুক্তি হয় তখন এর মনের সহিত বিয়োগ ঘটে। তখন জীবাত্মার আর জ্ঞান উৎপন্ন হয় না—জড়বৎ হয়ে যায়। তবে জড়ে ও জীবে প্রভেদ এই—জড়ে কখনও জ্ঞান উৎপন্ন হয় না কিন্তু জীবে সংসার দশায় মনঃসংযোগে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরে কিন্তু নিত্য-জ্ঞান থাকায় তিনি কখনও জড়বৎ হন না। জীব বহু ও বিভু, ঈশ্বর এক ও বিভু। বিভু অর্থ—সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ সকল মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগ সম্ভব। জীবাত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ হলে যখন জ্ঞানের প্রকাশ হয় তখন সেই প্রকাশমান আত্মাতে দেহাদি অনাত্মার অধ্যাস হয়ে থাকে। জীবাত্মার সহিত এই মনঃসংযোগের হেতু অনাদি বাসনা বা অদৃষ্ট। সৃষ্টির পূর্ব্বে, প্রলয়ে এবং মুক্তির পর জীবাত্মার জ্ঞান উৎপন্ন হয় না বলে তার কোনও প্রকাশ থাকে না, কাজে কাজেই তাতে ভ্রমও হতে পারে না। বদ্ধাবস্থায় বা সৃষ্টিকালে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন ভ্রম সম্ভব। সৃষ্টিকালে কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়ই থাকে এবং উভয়ই জ্ঞানের বিষয় এবং তখন এক বিষয়ে আর এক বিষয়ের ভ্রম সিদ্ধ হয়। জ্ঞানস্বরূপ অবিষয় এক-আত্মা সৃষ্টির প্রাক্‌কালে থাকলে অধ্যাস কখনই সিদ্ধ হয় না।

প্রাভাকর-মত ও ন্যায় মত একই তবে প্রভেদ এই—ন্যায়-মতে জ্ঞান ও জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তা যে আত্মা, আর একটা অনুব্যবসায় নামক জ্ঞান দ্বারা প্রকাশ হয়। কিন্তু এতে অনবস্থ দোষ (Petitio principii) হয় বলে প্রাভাকরেরা জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলে থাকেন।]

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—পণ্ডিতগণ উক্ত লক্ষণযুক্ত অধ্যাসকে অবিদ্যা বলিয়া থাকেন এবং যাহার দ্বারা বস্তুর স্বরূপ-অবধারণ করা যায় তাহাকে বিদ্যা বলিয়া থাকেন। এবং সতি যত্র যদধ্যাসঃ তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অনুমাত্রেণ অপি স ন সম্বধ্যতে। রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হইলেও সর্পের দোষ-গুণে রজ্জু যেমন দুষ্ট হয় না, সেইরূপ অবিদ্যাকৃত জগতের দোষ গুণে ব্রহ্ম কিঞ্চিন্মাত্রও দুষ্ট হন না। এই অবিদ্যাখ্য আত্মানাত্মার পরস্পর অধ্যাসকে অবলম্বন করিয়াই সমুদয় লৌকিক, বৈদিক প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার ও বিধি-নিষেধ পর সমস্ত শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং শাস্ত্র অবিদ্যার বিষয় হইল কি করিয়া ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—দেহ এবং ইন্দ্রিয়েতে যদি 'অহং' এবং 'মম' অভিমান না থাকে তাহা হইলে প্রমাতৃত্ব উৎপন্ন হয় না। 'আমি প্রমাণ কর্ত্তা' এইরূপ অহং জ্ঞান যদি না উঠে তাহা হইলে প্রমাণ-প্রবৃত্তিও সম্ভব নহে। আবার দেখ ইন্দ্রিয় সকলকে অবলম্বন না করিয়া প্রত্যক্ষাদি সম্ভব নহে। আবার অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহার সম্ভব নহে। এবং যে দেহে আত্মভাব অধ্যস্ত হয় না সে দেহের দ্বারা কেহ কার্য্যও করিতে পারে না। এ সকল যদি ব্যাপার না ঘটে তাহা হইলে আত্মার প্রমাতৃত্বও সম্ভব হয় না। আর প্রমাতা যদি না থাকে প্রমাণ-প্রবৃত্তিও সম্ভব নহে। সেইজন্য অবিদ্যা পরিকল্পিত বিষয়ই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও শাস্ত্রের বিষয় হইয়া থাকে।

[মীমাংসক প্রভৃতিরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আপ্ত ছাড়াও আরও কয়েকটি প্রমাণ মানেন। যথা—অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব এবং ঐতিহ্য।

অর্থাপত্তি—ফল দেখে অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পনা। পীনো দেবদত্তো

দিবা ন ভুঙ্ক্তে—স্থূলকায় দেবদত্ত দিবাতে ভোজন করেন না। কিন্তু তিনি যখন স্থূল তখন তিনি নিশ্চয়ই রাত্রে ভোজন করেন।

অভাব বা অনুপলব্ধি—যেখানে ঘট নেই, সেখানে আগে ঘটের অনুপলব্ধি বা অভাব জ্ঞান হয় তারপর 'এখানে ঘট নেই' এইরূপ জ্ঞান হয়।

সম্ভব (যোগ্যতা)—অমুক দেশে পর্ব্বত আছে, কাজেকাজেই সেই দেশের অমুক গ্রামে পর্ব্বত সম্ভব (Probablıty)।

ঐতিহ্য—প্রবাদ (Tradıtıon)। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে।

উপরে যে যুক্তিটি সিদ্ধান্তপক্ষীরা দিলেন, সেটি ন্যায়াবয়বে সাজালে এইরূপ হয়—

১। যদুর লোক ব্যবহার তাহার দেহেতে অহং অধ্যাসমূলক (প্রতিজ্ঞা)

২। কারণ তাহাতে অধ্যাসের অন্বয় ব্যতিরেকানুসারিত্ব দেখা যায় (হেতু)

৩। যাহাতে যাহার অন্বয় ব্যতিরেকানুবিধায়িত্ব আছে, তাহা তন্মূলকই হয়ে থাকে—যেমন মৃন্মূল ঘট (উদাহরণ)

৪। ইহা সেইরূপ (উপনয়)

৫। সুতরাং দেবদত্ত কর্ত্তৃক ব্যবহার তদীয় দেহাদিতে অহং অধ্যাস মূলক (নিমগন)

এর পর আচার্য্য বলছেন, যে পশুপক্ষী ও অতি বড় পণ্ডিতের ব্যবহার একই রকমেব। কারণ পণ্ডিত যখন যুক্তি করছেন তখনও যে দেহাভিমান আর পশু যখন আহারের চেষ্টা করছে বা ভয়ে পালাচ্ছে সেই দেহাভিমান যুক্ত হয়েই করছে। নিগুণ আত্মাতে বর্ণ, আশ্রম, বয়সের আরোপ না করালে ধর্ম্ম কর্ম্মও হয় না।

কত রকমে দেহাভিমান হচ্চে দেখ—

১। পুত্রাদির ধর্ম্ম আত্মাতে অধ্যাসের ফলে আত্মা সুখী ও দুঃখী হয়

২। দেহের " " " " " স্থূল ও কৃশ "

৩। ইন্দ্রিয়ের " " " " " মূক, কাণ "

৪।	মনের	„	„	„	„	„	সন্দেহ যুক্ত	„
৫।	বুদ্ধির	„	„	„	„	„	নিশ্চয় যুক্ত	„
৬।	অজ্ঞানের	„	„	„	„	„	অহমাকার বৃত্তি	„
৭।	আত্মার ধর্ম্ম জড় মন বুদ্ধিতে আরোপিত হয়ে চৈতন্য যুক্ত							„
৮।	„	„	পুত্র ধন যশেতে		„	„	'এসব আমার' জ্ঞান	„

এরই নাম ব্যবহারিক জগৎ।

(সমাপ্ত) —বাসুদেবানন্দ।

সাহিত্যে রসতত্ত্ব

মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সত্য, দ্বিতীয় সম্পদ সৌন্দর্য্য, তৃতীয় সম্পদ সাহিত্য।

সত্যে যাহার প্রতিষ্ঠা, সৌন্দর্য্যে যাহার বিকাশ, সাহিত্যে তাহার পরিচয়। সৎচিৎ ও আনন্দ।

মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দ প্রকৃতি ভেদে কেহ কেহ এই আনন্দের অন্য আখ্যা দিয়া থাকেন। কেহ আনন্দকে সুখ নামে অভিহিত করেন—কেহ ইহার নাম দেন শান্তি।

মানব মাত্রেই আকাঙ্ক্ষা করেন সুখ, অথবা শান্তি, অর্থাৎ আনন্দ। আনন্দই আমাদের জীবনের একমাত্র ঈপ্সিত ধন। আনন্দেই সুখ, আনন্দেই শান্তি—আনন্দই ভগবান।

সাধুর আনন্দ ত্যাগে, গৃহীর আনন্দ ভোগ। উভয়ের সুখ আনন্দে। আনন্দই উভয়ের উদ্দিষ্ট।

ভোগের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিবার উপায় দুইটি—রূপ ও রস।

রূপের বিকাশ যেমন প্রকৃতিতে, রসের বিকাশ তেমনি সাহিত্যে। রূপ উপভোগ করিতে হইলে যেমন প্রকৃতির সহিত নিবিড় ভাবে পরিচিত

হইতে হয়, রস আস্বাদন করিতে হইলে তেমনি সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্টতা সংস্থাপন করিতে হয়।

সাহিত্যের রস নয় প্রকার। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত।

বাক্য-শাস্ত্রের সারভূত সহৃদয় জনগণের চিত্ততোষকব আস্বাদনের নাম রস। হৃদয়বান ব্যক্তির চিত্তে রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আনন্দজনক হইলে তাহাকে রস বলে। কোন কোন ব্যক্তির মতে বাৎসল্যও রস। বাৎসল্য করুণের অন্তর্ভুক্ত।

রসজ্যেষ্ঠ—শৃঙ্গার রস। রসনাথ, রসরাজ, রসলেহ—পারদ। বস-শোধন—সোহাগা। বসকেশর—কর্পূর। রসাধার—সূর্য্য। রসনায়ক—মহাদেব। আর রসিকেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

বসতত্ত্ব অতি গভীর রহস্যের বিষয়। রসতত্ত্বে সৃষ্টিতত্ত্ব বিজড়িত। রসবেত্তা না হইলে এই রসতত্ত্ব বুঝে কাহার সাধ্য।

সাহিত্যের বিকাশ ও বিস্তৃতি গদ্যে ও পদ্যে। গদ্যাপেক্ষা পদ্য অধিক মনোরম, কিন্তু গদ্যও পদ্য; যে গদ্য পদ্য নহে—অর্থাৎ যে গদ্যে ছন্দ নাই—সে গদ্য তত সুখ পাঠ্য নহে।

অনেকের ধারণা গদ্যের কোন ছন্দ নাই। ইহা বিষম ভুল। ছন্দ পদ্যের প্রাণ, ছন্দই গদ্যের প্রাণ। ছন্দহীন পদ্য যেমন পদ্য নহে, ছন্দহীন গদ্যও তেমনি গদ্য নহে। দুঃখের বিষয় ছন্দ সকলের বোধগম্য নহে। যাঁহার ছন্দজ্ঞান আছে তিনি যথার্থই জ্ঞানী।

গদ্য এবং পদ্য উভয়েরই পুষ্টি রসে,—রস লইয়াই ইহাদের ললিত লীলা।

আমাদের শরীরে যেমন ছয়টি রিপু আছে তেমনি ছয়টি রস আছে। মস্তকে শৃঙ্গার রসের স্থান, ভ্রূদলে রৌদ্র রস, কণ্ঠস্থানে করুণ রস, হৃদয়ে ভয়ানক রস, নাভিমণ্ডলে অদ্ভুত রস ও মণিপুরে হাস্য রস। প্রমাণ—

শৃঙ্গারং শিরসি জ্ঞেয়ং
ক্রোধ আজ্ঞাপুরে তথা।

বিশুদ্ধাখ্যেতু করুণাং
হৃদি ভীষণ মেবচ।
মণিপুরেঽদ্ভুতং হাস্যং
স্বাধিষ্ঠানে প্রকীর্ত্তিতম্।

আত্মশরীর পরমাত্মাতে সমর্পণ করিবার নাম শৃঙ্গার। এই শৃঙ্গার ভাবই মধুর ভাব। মধুরের অর্থ আত্ম নিবেদন। এই আত্ম নিবেদনই রাসলীলার মূল তত্ত্ব। কিন্তু সে তত্ত্ব বুঝাইবার স্থান এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে।

আমার বক্তব্য এই যে, আমরা সাহিত্যের রস সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারি, তাহার কারণ, আমাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ রসের সহিত সাহিত্যের রসের বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই। সাহিত্য মনুষ্যের সৃষ্টি সুতরাং মানুষ নিজের অন্তরের মধ্যে যে রস অনুভব করে—তাহার সৃষ্ট সাহিত্যেও সে সেই রসের অবতারণা ও সঞ্চার করে। যাহার অন্তরে বিষাদ তাহার রচিত কাব্যে করুণ রসের অবতারণা স্বাভাবিক। যাহার অন্তরে বিষাদ নাই—দুঃখ নাই, যে সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত—অভাব অথবা অনটনের সহিত যাহার কখন পরিচয় হয় নাই—তাহার রচনায় হাস্য রসের বিকাশ সমীচীন। কিন্তু সকল রসের ফল্গুনদী আমাদের অন্তরে প্রবাহিত—সেইজন্য লেখক এবং কবি কল্পনা বলে সকল রসেরই আস্বাদ লইতে এবং স্বরচিত সাহিত্যে সকল রসেরই সঞ্চার করিতে সক্ষম। তবে কল্পনা সাহায্যে যে রসের সৃষ্টি—তাহার সহিত ভুক্তভোগীর সৃষ্ট রসের প্রভেদ অনেক। কোন কোন মনীষী লেখক কাল্পনিক অনুভূতিতে এমন প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন যে, বাস্তব তাহার নিকট খর্ব্ব হইয়া যায়।

একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, রস উপভোগ করিবার নিমিত্তই আমাদের জীবন। রসে আমাদের শরীরের পুষ্টি—রসে আমাদের চিত্তের তৃপ্তি—রসেই আমাদের জীবন। রসের অভাবে প্রাণ থাকে না—থাকিতে পারে না। যাহার প্রাণ আছে তাহার অভ্যন্তরে রস আছে। রস জীবন—রস আনন্দের আকর,—কারণ স্বয়ং শ্রীভগবান রসময়—"রসো বৈ সঃ"। শ্রুতি বলেন,—"এষাং

ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপো রসঃ, অপাম্ ওষধয়ো রসঃ, ওষধীনাং পুরুষো রসঃ, পুরুষস্য বাগ রসঃ, বাচ ঋগরসঃ, ঋচ সামরসঃ, সাম্ন উদ্গীথো রসঃ।”

পরমাত্মা সাক্ষাৎ রস-স্বরূপ। বিবেক চূড়ামণি বলিয়াছেন, তিনি “নিরন্তরানন্দরসস্বরূপং”।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বলিতেছেন—

চিদাত্মান্তর্গতং শান্তং পরংব্রহ্মরসাত্মকং।

সুতরাং এই যে মহার্ঘ রস—ইহাই পরম পদার্থ। ভক্তগণ যে ঐশ্বরিক রসাস্বাদনের নিমিত্ত ব্যগ্র, জ্ঞানী ব্যক্তিরাও সেই রসাস্বাদেই নিমগ্ন হইয়া থাকেন ; কারণ নিখিল রসের অভাব যে পরমাত্মার রস তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত উভয়েই ব্যাকুল। প্রমাণ :—

যদীশ্বর রসো ভুক্তস্তদীশ্বর রসো বুধঃ
অভাবৈকরসস্যোতৌ রসকাতরতাং গতৌ।

আবার শুদ্ধ জ্ঞানরূপ রস ভিন্ন অন্যান্য সমুদায় রসই নীরস। অতএব যদি ভজনা দ্বারা সেই রসেরই অধিকার লাভ হয় তাহা হইলে ভক্তি কখনই জ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। যথা :—

শুদ্ধ বোধরসাদন্যে রসা নীরসতাং গতাঃ।
তয়া রসাধিকতয়া নতু ভক্তি কদাচনঃ॥

জ্ঞান ব্যতিরেকে শত সহস্র যুক্তি দ্বারা মুক্তি লাভ ঘটিতে পাবে না ; আবার ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। এখন জ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র উপায় সাহিত্য চর্চ্চা। সুতরাং মানব জীবনে সাহিত্যের স্থান কত উচ্চে তাহা বোধ হয় আব বিশদ কবিয়া বুঝাইতে হইবে না। জীবনে রসাস্বাদন করিতে হইলে,—জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইলে—মুক্তি লাভ করিতে হইলে—সাহিত্যই একমাত্র আশ্রয় স্থল। সাহিত্য রসাত্মক বাক্য-বৈভব মাত্র।

রসের পার্থক্য হিসাবে সাহিত্যেরও পার্থক্য আছে। রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রসাশ্রিত সাহিত্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপাদেয়। রসনাগ্রাহ্য রস যেমন রুচি ভেদে—প্রকৃতি ভেদে—ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট তৃপ্তিদায়ক

হয়, সাহিত্যাশ্রিত রসও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট প্রীতিপ্রদ। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।

দেহীদিগের স্বভাব জাত, অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ শ্রদ্ধা তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক লোকেরা সত্ত্ব প্রকৃতি দেবতাদিগের পূজা করেন; রাজসিক লোকেরা রজঃ প্রকৃতি যক্ষ রাক্ষসাদির পূজা করেন এবং তামসিক লোকেরা তামস প্রকৃতি ভূত প্রেতাদির পূজা করেন। সত্ত্বাদি গুণভেদে মানবের আহার তিন প্রকার; যজ্ঞ তিন প্রকার, তপস্যা তিন প্রকার, এবং দানও তিন প্রকার। সত্ত্বাদি গুণভেদে সাহিত্য চর্চ্চারও রুচি ভেদ দৃষ্ট হয়,—সাত্ত্বিক সত্ত্বগুণাশ্রিত রস উপভোগ করেন, রাজসিক রজোগুণাশ্রিত রস উপভোগ করেন এবং তামসিক তমোগুণাশ্রিত রস উপভোগ করেন। সাহিত্য চর্চ্চা তপস্যা। শারীর, বাঙ্ময় ও মানসিক তপস্যার মধ্যে সাহিত্যচর্চ্চা প্রধানতঃ বাঙ্ময় তপস্যার অন্তর্ভুক্ত। প্রমাণ :—

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥

সাহিত্য চর্চ্চা মানসিক তপস্যার অন্তর্বর্ত্তী, কারণ মনের স্বচ্ছতা অক্রুরতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাব সংশুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক তপস্যার সকল লক্ষণ সাহিত্য সেবার দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়। অতএব সাহিত্যসেবা মানব জীবনের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়।

প্রথম ভক্তি—পরে জ্ঞান—তৎপরে মুক্তি। যে ভাবেই বিচার করা যাউক, সাহিত্যের সাহায্য ব্যতীত ইহাদের একটিও সহজ সাধ্য নহে। আশা করি, মানবজীবনে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা কত অধিক তাহা পাঠক পাঠিকা এখন সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মানবজীবনের প্রতি স্পন্দন যেমন সত্যের অর্থাৎ ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত; মানবজীবনের প্রতি উন্মেষ এবং বিকাশও তেমনি সৌন্দর্য্যের এবং সাহিত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাহিত্য যেমন জাতির বৈভব, তেমনি ব্যক্তিগত ভাবেও মানবজীবনের একটি ঐশ্বর্য্য। * * *

রসাত্মক রচনার নাম সাহিত্য। সেই সাহিত্যের প্রাণ রস। সাহিত্যের ভিত্তি ভাষা। ভাষা ভাবের বাহন। ভাব সম্পদে সমৃদ্ধ ভাষা সাহিত্য।

ভাষার অধিকারী বলিয়া মানুষ প্রাণী জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। ভাষার সাহায্যে মানুষ পরস্পরের নিকট পরস্পরের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, আদান প্রদান করিতে পারে। ভাষার সাহায্যে মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম। ভাষার সাহায্যে মনীষী মানব তাঁহার চিন্তাস্রোত লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষার্থীর জ্ঞানচর্চ্চার পথ সুগম করিয়া দেন। সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন।

ভাষা জাতীয় সম্পত্তি। ভাষা হইতে সাহিত্য। সাহিত্যও জাতীয় বৈভব। যাহার যে ভাষা—সে সেই ভাষাতেই আপনার মনের ভাব সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, সবল ও সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিতে পারে। সুতরাং যাহার যে ভাষা, সেই ভাষার সাহিত্যই তাহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। আপনার চিন্তাস্রোত আপনার মাতৃভাষাতে লিপিবদ্ধ করা যুক্তি সঙ্গত।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের জাতীয় জীবনে এমন একযুগ আসিয়াছিল যখন আমাদের দেশের যুবক সম্প্রদায় মাতৃভাষায় মনোভাব লিপিবদ্ধ করা দূরে থাকুক, মাতৃভাষায় কথোপকথন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। সে অধঃপতনের যুগ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার আত্মঘাতী প্রভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও এই বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। মাইকেলের যুগ, সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার যুগ। যুগের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া এবং ইংরাজী ভাষার ওজস্বিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া—মাইকেল স্থির করিযাছিলেন যে ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী যশ অর্জ্জন করিবেন। তিনি প্রথমতঃ ইংরাজীতে কবিতা রচনা করেন। তাঁহার রচিত প্রথম কবিতাগ্রন্থ তাঁহার আবাল্য সুহৃদ গৌরদাস বসাকের মারফতে তদানীন্তন শিক্ষা

পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন মহোদয়কে উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

বেথুন মহোদয় জানিতেন যে জাতীয় শিক্ষার বাহন জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত। শিক্ষা সম্পর্কীয় কার্য্যে সুযোগ উপস্থিত হইলে মহাত্মা বেথুন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেন।

মাইকেলের গ্রন্থ প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে বেথুন মহোদয় গৌরদাস বাবুকে লিখিযাছিলেন "আপনাব বন্ধুর ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিবার ক্ষমতা হইতে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে যদি তিনি মাতৃ-ভাষার অনুশীলন করেন তাহা হইলে তিনি চিবস্থায়ী কীর্ত্তিলাভ করিতে এবং মাতৃভাষাকে প্রচুর পবিমাণে সমৃদ্ধ কবিতে পারিবেন। মধ্যে মধ্যে ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা তাঁহার পক্ষে সুখকর হইবে, কিন্তু মাতৃভাষার অনুশীলন তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।"

বাঙ্গালা ভাষা তখন অতি দীনা। বাঙ্গলা সাহিত্যে তখন সুরুচি সঙ্গত পুস্তকেব একান্ত অভাব। তাই বেথুন মহোদয় গৌরদাস বাবুকে লিখিয়া-ছিলেন যে মাইকেল মৌলিক রচনা না করিয়াও যদি অন্যান্য ভাষা হইতে সৎগ্রন্থাদি মাতৃভাষায় ভাষান্তরিত করেন তাহা হইলেও বাঙ্গলা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে।

মহাত্মা বেথুনের বাঙ্গলা ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। ছাত্র-দিগের হৃদয়ে বাঙ্গলা ভাষার প্রতি যথার্থ অনুরাগ সম্ভাবিত হইতেছে কি না তৎপ্রতি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন।

মহাত্মা বেথুনের ন্যায় মধুসূদনের বন্ধুগণও তাঁহাকে মাতৃভাষার অনুশীলন করিতে অনুরোধ করিতেন এবং উপদেশ দিতেন। মধুসূদনের যে সকল বন্ধু বাঙ্গলা ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন না তাঁহারাও জানিতেন—বুঝিতেন যে মাতৃভাষায় রচনা ব্যতীত কোন গ্রন্থকারের পক্ষে অন্য ভাষায় রচনা দ্বারা স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ কখনই সম্ভব নহে। তাঁহারা সকলেই মধুসূদনকে বাঙ্গলা ভাষায় কাব্য রচনা করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান করিতেন।

ক্রমে মধুসূদন তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তিনি বিদেশীয় ভাষায় যতই কৃতিত্ব দেখান না কেন, তাহাতে কবিতা রচনা করিয়া স্থায়ী গৌরব লাভ করা কখন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। ফলে, মাতৃভাষার অনুশীলন দ্বারা যাহাতে স্থায়ী গৌরব লাভ করিতে পারেন তদ্বিষয়ে তিনি মনোযোগী হইলেন। শুভ-ক্ষণেই মাইকেল তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নতুবা ইংরাজী সাহিত্যের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া তিনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তেমন "মধুচক্র" রচনা করিতে পারিতেন না, "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"।

তাঁহার প্রথম চতুর্দ্দশপদী কবিতায় মাইকেল মাতৃভাষাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন :—

"নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।

* * * *

রক্ষকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?"

মাইকেলের জীবন চরিতকার যথার্থই লিখিয়াছেন :—মধুমক্ষিকার ন্যায় নানা দেশীয় কাব্য-কুসুম হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি যে অপূর্ব্ব মধু চক্র নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বাঙ্গলা ভাষা থাকিবে ততদিন গৌড়ীয় জনগণ, তাহাতে সত্যই—"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। মাতৃভাষার সেবা করিয়া তিনি যে অমূল্য গ্রন্থাবলী আমা-দিগকে উপহার দিয়া গিয়াছেন "তাহা চিরদিন তাঁহার গৌরব ঘোষণা

করিবে। যতদিন বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন বঙ্গ সাহিত্য হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন নাম বিলুপ্ত হইবে না। যতদিন বাঙ্গলা ভাষা থাকিবে ততদিন তাঁহার স্বদেশীয়গণ সত্যই তাঁহার কাব্য সমূহ হইতে—'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'।"

বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সাধক আর এক মনীষী কবি লিখিয়াছেন—

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আশা ?"

অতি সত্য কথা। মাতৃ-ভাষার পুষ্টি করা, মাতৃ ভাষায় সেবা—যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা। যেমন মাতৃস্তন্য—তেমনি মাতৃভাষা।

যেমন ভগবানের আরাধনার শেষ নাই,—যত কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে ডাক, ততই তাঁহাকে আরও অধিক ডাকিতে ইচ্ছা হয়; তেমনি মাতৃ-ভাষাব সেবা করিয়াও সহজে তৃপ্তি হয় না। কখনও হয় কিনা সন্দেহ। মহাকবি মাইকেলের মত আর কোন্ বঙ্গ মাতার সুসন্তান মাতৃভাষাকে নূতন সম্পদে সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন ? তথাপি তৃপ্তি কোথায় ? বঙ্গভাষার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"অল্পদিন। নাবিনু, মা চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি। ডাকিলা যৌবনে
যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে !
এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে !
এই বর হে বরদে। মাগি শেষবারে,
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত রতনে।"

আজ বঙ্গ ভাষায় সাধকের অভাব নাই কিন্তু সিদ্ধি কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে ? আজ বঙ্গভাষা দীনা, ক্ষীণা, সলিলতোয়া সরস্বতীর ন্যায় লোক-চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত নহেন, বাণীর বর পুত্র অসীম শক্তিশালী লেখক কবীন্দ্র রবীন্দ্রের ভাগ্যগুণে বিশ্বসাহিত্যের দেদীপ্যমান স্বর্ণ সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিতা। তথাপি মা, তোমার বড় দুর্ভাগ্য ! তোমার কৃতী সন্তানের—ভক্তের অভাব নাই, কিন্তু মা তোমার একনিষ্ঠ ভক্তসংখ্যা ত অধিক নহে। মুদ্রা যন্ত্রের সৌকর্য্যে স্বয়ং-সিদ্ধ লেখকের অভাব নাই,

কিন্তু মা ভক্ত কোথায়? পাঠক কোথায়? শ্রুতিধরের অভাব নাই, কিন্তু মা, শ্রোতা কোথায়? ভাষা-জননীর ক্ষুদ্র সন্তান আমরা—একথা কয়জন মনে করে মা? লেখনী ধারণা করিয়া আমরা সকলেই কর্ণধার হইতে প্রস্তুত, কিন্তু দাঁড় টানিবার—গুণ টানিবার লোক কোথায় মা? আবার প্রাচীন কর্ণধারদের শিখাইবার প্রবৃত্তিই বা কোথায়? এযে প্রবল একাকারের যুগ। সাধনা না করিয়া সাধকের আসনে বসিয়া সকলেই সেবকের ও বাহকের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, শাসক কেহ নাই—শিক্ষকের অভাব—সমালোচকের আসনে চাটুকার প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায়।

যুগধর্ম্মে শ্রীশ্রীমা

ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষত্ব ধর্ম্মকে লইয়া। বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারত ধর্ম্ম-জগতে কি অপূর্ব্ব তত্ত্ব সমূহ আবিষ্কার করিয়াছে তাহা বিচার করাই ভারতীয় ঐতিহাসিকের আসল কাজ। প্রত্যেক জাতিরই জীবনের এক একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ঐ আদর্শকে ভিত্তি করিয়া সেই জাতি বাঁচিয়া থাকে। কাহারও মধ্যে রাজনীতিই এই চরম আদর্শ, কাহারও মধ্যে বা সামাজিক উন্নতি, আবার কাহারও মধ্যে কলাবিদ্যার উৎকর্ষ। এইরূপ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন আদর্শকে অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু ভারত আশ্রয় করিয়াছে পরমার্থকে। ভারতে কপিলাদি দার্শনিকগণ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারনামা যত মহাপুরুষ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মসমন্বয়রূপ মহাযজ্ঞে জীবনাহুতি দিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের নেতৃত্বে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ উন্নতির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছে।

আমাদের সনাতন ধর্ম্ম এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নেতৃত্বে বারংবার আপনাকে প্রকাশ করিয়া আপনার ঘর রক্ষা করিয়াছে। ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। চিন্তাশীল ঐতিহাসিক ধীরভাবে ভারতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যুগে যুগে এই আত্মরক্ষারূপ কার্য্য কিরূপ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ভারত গগনে যখনই অধর্ম্মরূপ মেঘের সূচনা হইয়াছে তখনই ভারতের ভগবান আবির্ভূত হইয়া উহা দূর করিয়াছেন এবং দৃঢ়তার সহিত ভক্তগণকে আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন :—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

বর্ত্তমান যুগের এই তমসাচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজে তাঁহার আবির্ভাব উক্ত বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। তিনি আসিয়া বলিলেন, "আমি আসিয়াছি, আমিই সেই রাম, আমিই সেই কৃষ্ণ, আমিই আবার আসিয়াছি।" আচার্য্য বিবেকানন্দ বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন— "সতত বিবদমান, আপাত প্রতীয়মান বহুধা বিভক্ত সর্ব্বথা, প্রতিযোগী আচার সঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম্ম নামক যুগযুগান্তর-ব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বলৌকিক, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোক সমক্ষে সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোক হিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। * * * এই নবযুগধর্ম্ম সমগ্র জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এবং এই নবযুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান পূর্ব্বগ শ্রীযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণা কর।"

পরমার্থ বা বেদ যাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল শাস্ত্রে

তাঁহারা ঋষি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। মন্ত্রদ্রষ্টৃত্বই এই ঋষিত্বের অঙ্গ। যিনি এই মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব লাভ করিয়াছেন তিনিই ঋষি। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে এই ঋষিত্ব কোন ব্যক্তি বিশেষে বা সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ নয়। আরও, বৈদিক ঋষি পুরুষশরীরের ন্যায় নারীশরীরেও আত্মার সমভাবে বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মজগতে পুরুষের ন্যায় নারীকেও সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, পরমাত্মার প্রকাশে এবং পবিত্রস্পর্শে নারীও যে পুরুষের ন্যায় অতীন্দ্রিয় দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া ঋষিত্ব পদবীতে উন্নীতা হইতে পারেন তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ঋগাদি সংহিতায় এবং উপনিষদের স্থানে স্থানে নারী ঋষিকুলের উল্লেখ এবং রাজর্ষি জনকের সভায় ধর্ম্মবিচারে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাই ঐ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ।

মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় সাধনরূপ মহাযজ্ঞে শ্রীশ্রীমায়ের স্থান কম নয়। যে মহা সত্য শ্রীরামকৃষ্ণে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ যাহা সমগ্র জগতের প্রচার করিয়াছিলেন, সাধারণ লোক-চক্ষুর অন্তরালে শ্রীশ্রীমা সেই অপূর্ব্ব তত্ত্ব কি ভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহাই আমাদিগের চিন্তার বিষয়। তাঁহার পূত সঙ্গ ও অপার করুণা-লাভে বহু নরনারী কৃতার্থ হইয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি কৃপাবারি বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, যে কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে কেহই তাঁহার করুণা লাভে বঞ্চিত হয় নাই। মহাপাপী, যার কোথায়ও স্থান হয় নাই তিনি তাহাকেও আশ্রয় দিয়াছেন। তিনি একাধারে অপার করুণা, প্রেম, সহিষ্ণুতা ও স্নেহের মূর্ত্ত বিগ্রহস্বরূপা ছিলেন।

মহাপুরুষগণের জীবদ্দশায় খুব কম লোকেই তাঁহাদিগকে জানিতে পারে। কিন্তু যতই দিন যায় ততই তাঁহাদের ভাবরাশি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ভাবে লোকের হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে থাকে। বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রায় সাত শত বৎসর পরে জগৎ তাঁহাকে জানিতে পারিয়া-ছিল। খৃষ্টকে প্রায় সহস্র বৎসর পরে ইউরোপ জানিতে পারিযাছিল। যিনি যত শক্তিমান তাঁহার ভাবরাশি তত অধিক স্থায়ী হয়। এইরূপ

মহাপুরুষগণকে না জানার কারণ তাঁহারা সর্ব্বদাই আত্মপ্রচারে বিরত থাকেন, তাঁহারা নামযশ একেবারেই চান না, সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের ফলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহারা বিশ্বকল্যাণে রত থাকেন ; ব্রাহ্মণ, শূদ্র, উচ্চ, নীচ, পণ্ডিত, মূর্খ, সাধু, অসাধু, এই ভেদ তাঁহাদের থাকে না। ঈদৃশ মায়ামুক্ত জীবকল্যাণসাধনে তৎপর মহাপুরুষ যে স্থানে অবস্থান করেন তথাকার আকাশ বাতাস সমস্তই পবিত্র। যাঁহারা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হন এমন কি মহাদুষ্কৃতকারী ব্যক্তিও সেই পবিত্রতার সান্নিধ্য-মাত্রেই শান্তভাব ধারণ করেন। ইঁহাদের স্পর্শমাত্রে, দৃষ্টিমাত্রে এমন কি ইচ্ছা মাত্রেই মানবের জীবনস্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

ধর্ম্মজগতে শ্রীশ্রীমায়ের স্থান কোথায় সাধারণ মানব আমরা তাহার ধারণা করিতে অক্ষম। জহুরিই জহর চিনিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। তিনি বলিয়াছেন :—

"শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়াজী, শ্রীমতী রাধারাণী এঁদের কথা শুনেছ। মা যে এঁদের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন। ঐশ্বর্য্যের লেশ নাই। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য্য ছিল, তাঁর ভাবাবেশ সমাধি এ সব আমরা জন্মে দেখেছি—কত দেখেছে। কিন্তু মার—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত লুপ্ত। এ কি মহাশক্তি! জয় মা! জয় মা!! জয় শক্তিময়ী মা!!! দেখ্‌ছ না কত লোক সব ছুটে আস্‌ছে। যে বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে সব মার নিকট চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি, অপার করুণা! জয় মা! আমাদের কথা কি বল্‌ছিস? স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি। তিনিও কত বাজিয়ে বাছাই করে লোক নিতেন। কেশব সেনকে বলে দিলেন—কেশব তুমি যেমন তেমন গরু গোয়ালে ঢুকাও তাইতে এত গণ্ডগোল বাধে। ঠাকুর কত পরখ করে নিতেন। স্বামিজীকেই কত করে দেখেছিলেন, চোখ, মুখ, হাত, পা, প্রস্রাবের ধার কোন দিকে পড়ে তা পর্য্যন্ত। কত রকম পরীক্ষাই জান্‌তেন। এত করে দেখে তবে তিনি কাউকে স্থান দিতেন। দেখেছি

কেউ হয়ত কিছু খাবার নিয়ে ঠাকুরের ঘরেব পানে আস্‌ছে। দূর থেকেই ঠাকুর বল্‌ছেন—'দেখলুম, খাবার ত নয় যেন খানিকটা ময়লা নিয়ে আস্‌ছে।' বিষয়ীর গন্ধ সইতে পারতেন না—আর মার এখানে কি দেখ্‌ছি? অদ্ভুত, অদ্ভুত, সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে, মা, মা, জয় মা।

"তোমরা দেখে ত এলে রাজরাজেশ্বরী সাধ করে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন। বাসন ধুচ্ছেন, চাল ঝাড়ছেন—এমন কি ভক্তদের এঁটো পর্য্যন্ত পরিষ্কার করছেন। ঠাকুরের গলায় ঘা হয়েছিল, রামকৃষ্ণসংঘ তৈরীর জন্য। আর মা জয়রামবাটী থেকে অত কষ্ট কচ্ছেন গৃহী ভক্তদের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শেখাবার জন্য। অসীম ধৈর্য্য, অপরিসীম করুণা, সর্ব্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমান রাহিত্য। দেখ, চিন্তা কর, বোঝ, মার ছেলে তোমরা, ঠিক ঠিক মায়ের ছেলে হতে হবে, তবে তো, নইলে কেবল মাকে দর্শন করে এলুম, কি একটু প্রসাদ পেলুম, এতে আর কি হবে। "তদ্ভাবভাবিত," এ যদি না হলে কি আর তবে হলো? ভোগতৃষ্ণার পরিণাম দেখ্‌চো ত? ঐ যে রেগে উঠে দাউ দাউ হাউ হাউ রোলে জলে উঠ্‌ছে, ছারখার করে দিচ্ছে, মায়ের ছেলে তোমরা দেখে শেখো। ও সব আশায় ছাই ফেলে দাও। কি কঠোর দায়িত্ব তোমাদের। ভোগের পরিণাম দেখে সমস্ত জগৎ এইবার যোগের দিকে ফিরে দাঁড়াচ্ছে। কে তাদের পথ দেখাবে?—এইবার তোমাদের সম্মুখে। স্পর্শমণি স্পর্শ করে তোমরা ত সব সোণা হয়ে গেছ, এবার অন্য সকলকে সোণা করতে হবে। তার যোগ্যতা লাভের চেষ্টা কর। মায়ের যথার্থ ছেলে হয়ে উঠ। মনে রেখো সুখে, দৈন্যে, সম্পদে, বিপদে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, যুদ্ধে, বিগ্রহে, সর্ব্ববিষয়ে মায়ের সেই করুণা।—অপার করুণা। সেই অপার করুণা।।"

ভারতীয় সমাজের অদ্ভুত আতিথেয়তা এবং জননীর সকলের প্রতি সমান ভালবাসা এই উভয় দৃষ্টান্তই আমরা তাঁহার জীবনে দেখিতে পাই। শ্রীশ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে থাকিতেন তখন এমন দিন বাদ যাইত না যে পাঁচ সাত জন ভক্ত উপস্থিত না হইত। পরিচিত অপরিচিত সকলেই সমভাবে তাঁহার মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাইত। প্রাতঃকালে উঠিয়া তিনি

ভক্তদের চা খাওয়ার জন্য দুধের সন্ধানে বাহির হইতেন। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া "তোমাদের ঘরে দুধ আছে গো। আমার ছেলেদের চা খাওয়ার জন্য একটু দুধের দরকার" এইরূপে তিনি দুগ্ধ যোগাড় করিয়া তাহাদের চা খাওয়াইতেন। কোন দিন হয়ত রাত্রি দ্বিপ্রহের সময় দূর দেশ হইতে ভক্তেরা আসিয়া উপস্থিত হইত। বাড়ীর অন্যান্য সকলে তখন নিদ্রিত। তিনি টের পাইয়া চুপি চুপি উঠিতেন, ভক্তদের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া তাহাদের খাওয়াইতেন এবং উচ্ছিষ্ট বাসন প্রভৃতি ধুইয়া শয়ন করিতেন। করুণাময়ী, দয়াময়ী ইত্যাদি বিশেষণ পুস্তকে ও লোক মুখে শুনা যায়, কিন্তু আদর্শের অভাবে উহা আমাদের নিকট শুধু কথার কথা মাত্র। মাকে একবারও যাহারা দর্শন করিয়াছে তাহারাই উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বহুকাল যাবৎ ভারত তাহার আশ্রম ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছিল। কি গার্হস্থ্য জীবনে, কি সন্ন্যাস জীবনে উভয়ত্রই অবনতি দেখা গিয়াছিল। সুতরাং প্রাচীন আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার আগমন। গার্হস্থ্য জীবনেও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া সংযত ভাবে প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া নিবৃত্তির পথেই অগ্রসর হওয়াই শাস্ত্র বিবাহের উদ্দেশ্য বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। গুণবান পুত্র উৎপাদন দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধন করাই হিন্দুর বিবাহরূপ কর্ম্মের উদ্দেশ্য, কিন্তু সংযত চরিত্র না হইলে উহা একেবারে অসম্ভব। শাস্ত্র বিবাহের ঐরূপ উচ্চ উদ্দেশ্য উপদেশ করিলেও কয়জন লোক ঐ উপদেশ পালন করে? বিবাহিত জীবনে কয়জন যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া নিজের উন্নতি সাধন ও সমাজের উপকারে আসে? ঈশ্বরলাভ ত দূরের কথা, জনহিতকর কার্য্যেই বা কয়জন স্ত্রী স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করেন? কয়জন পুরুষই-বা ত্যাগই মানবজীবনের উদ্দেশ্য জানিয়া স্ত্রীকে তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন? বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যপালন করার প্রথা লোপ পাওয়াতেই যে হিন্দুর জাতীয় জীবনের এইরূপ অবনতি হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরের একজন সর্ব্বপ্রধানা শিষ্যা ছিলেন।

তাঁহার শিক্ষায় শ্রীশ্রীমা গৃহকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চাঙ্গের সাধনভজন পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যখন তিনি বাস করিতেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমস্ত রাত্রি ভাবাবেশে থাকিতেন, কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন,—কখনও একেবারে গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়া যাইতেছেন—তাঁহাব ঐ অবস্থা দেখিয়া শ্রীশ্রীমাব সারারাত্রি নিদ্রা হইত না, ভয়ে সারাবাত্রি তিনি জাগিয়া থাকেন জানিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে সমাধিভঙ্গেব নানারূপ উপায় শিখাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও শিখাইয়াছিলেন—পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রয়োজনমত অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা কবিয়া চলিতে। "যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন" এইভাবে দেশকালপাত্রভেদে সকল বিষয়ে বিবেচনা কবিয়া নিজেকে না চালাইতে পারিলে শান্তিলাভ বা অভীষ্টলাভ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। সঙ্কোচ ও লজ্জারূপ আবরণ দ্বারা নিজেকে সর্ব্বদা আচ্ছাদিত রাখিতে অভ্যস্তা হইলেও ঠাকুবের পূর্ব্বোক্ত উপদেশের ফলে প্রয়োজনমত পূর্ব্বসংস্কার ও অভ্যাস ত্যাগ করিয়া তিনি নির্ভয়ে যথাযথ আচরণে সমর্থা ছিলেন।

ঠাকুব যখন গলবোগেব চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন ডাক্তারের নির্দ্দেশমত পথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাবে তাঁহার সেবার বিঘ্ন হইতেছে জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীমা নিজের থাকিবাব সুবিধা ও অসুবিধার কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া শ্যামপুকুবে আসিয়া ঐ ভার আনন্দের সহিত গ্রহণ কবিয়াছিলেন। ছোট একখানা বাড়ীতে অপরিচিত পুরুষ সকলের মধ্যে তিনি সকল প্রকার শাবীরিক কষ্ট সহ্য কবিযা তিন মাস যাবৎ তথায় অবস্থান কবিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিযাছিলেন। ঐ বাড়ীতে একটি মাত্র স্নানের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং অন্য কেহ না উঠিতে রাত্রি তিনটার পূর্ব্বে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচ স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া জপধ্যানে নিযুক্তা

থাকিতেন এবং নিয়মিত সময়ে পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া নীচে সংবাদ দিতেন। সুবিধা হইলে লোক সরাইয়া তিনি আসিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কখনও বালক ভক্তেরা খাওয়াইত। মধ্যাহ্নে তিনি ঐ স্থানে আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামাদি করিতেন। সমস্ত দিন এই ভাবে অবস্থান করিয়া রাত্রি এগারটার সময় সকলে নিদ্রিত হইলে ঐ স্থান হইতে আসিয়া দ্বিতলে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেন। ঠাকুরকে রোগ মুক্ত করিতে বুক বাঁধিয়া দিনের পর দিন তিনি ঐরূপে অতিবাহিত করিতেন। যাহারা প্রত্যহ যাতায়াত করিত তাহাদের অনেকেই তিনি যে ঐস্থানে থাকিয়া ঠাকুরের সর্ব্বপ্রধান সেবাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া আছেন তাহা জানিতে পারিত না। দক্ষিণেশ্বরের নহবৎখানায় তাঁহার জীবনযাপন প্রণালীও অনেকটা এইরূপ।

শ্রীশ্রীমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল—প্রাচীন কালের মহীয়সী নারী সকলের ন্যায় বর্ত্তমান সময়েও সেইরূপ নারীগণের অভ্যুদয় হয়। ধর্ম্মজগতে পুরুষের ন্যায় নারীও সমভাবে উন্নতি লাভ করে। জনৈক স্ত্রীভক্ত একদিন মাকে বলিয়াছিলেন, "আমার পাঁচটি মেয়ে মা, বিবাহ দিতে পারি নাই, বড় ভাবনায় আছি।" মা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "বিবাহ দিতে না পার এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও। লেখাপড়া শিখ্‌বে বেশ থাক্‌বে।" অপর একজন বলিলেন, "এখন ছেলে পাওয়া কঠিন, অনেক ছেলে আবার বে করতেই চায় না।" মা বল্লেন, "ছেলেদের এখন জ্ঞান হচ্ছে, সংসার যে অনিত্য তা তারা বুঝতে পাচ্ছে, সংসারে যত লিপ্ত না হওয়া যায় ততই ভাল।" নিবেদিতা মাতৃমন্দিরের কার্য্য দৃষ্টে মনে হয় তাঁহার ইচ্ছা কতক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মা উক্ত মন্দিরে মধ্যে মধ্যে যাইয়া ছাত্রীদের চরিত্র গঠনে সহায়তা করিতেন। তিনি তাহাদের খুব স্নেহ করিতেন। ভগিনী নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বারাই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য করাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকালী পূজা দিবসে এই প্রতিষ্ঠা কার্য্য

হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন পূজান্তে মা প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—যেন এই বিদ্যালয়ের উপর জগন্মাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাগণ যেন আদর্শ বালিকা হইয়া উঠে। পূজ্যপাদ স্বামিজীরও ঐরূপ ইচ্ছা ছিল যে পুরুষদিগের ন্যায় নারীগণের জন্যও মাকে কেন্দ্র করিয়া মঠ স্থাপন করা।

শ্রীশ্রীমা অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। ঠাকুর এক সময়ে ভক্ত সঙ্গে পাণিহাটির মহোৎসব দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। যাইবার সময় জনৈকা স্ত্রীভক্তদ্বারা মা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি যাইবেন কিনা। তাহাতে ঠাকুর বলিলেন "তোমরা ত যাচ্ছ, যদি ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক।" শ্রীশ্রীমা ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "অনেক লোক সঙ্গে যাচ্ছে সেখানে অত্যন্ত ভিড় হবে। অত ভিড়ে নৌকা থেকে নেমে উৎসব দেখা আমার পক্ষে দুষ্কর হবে। আমি যাব না।" তিনি যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন এবং স্ত্রীভক্তদের আহার করাইয়া ঠাকুরের সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। উৎসব হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্ত্রীভক্তেরা ঐ রাত্রে মার নিকট ছিলেন। রাত্রে আহার করিতে বসিয়া ঠাকুর পানিহাটীর উৎসব সম্বন্ধে জনৈকা স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, "অত ভিড় তার উপর ভাব সমাধির জন্য আমাকে সকলে লক্ষ্য করছিল। ও সঙ্গে না গিয়া ভালই করেছে। ওকে সঙ্গে দেখলে লোকে বলতো হংস হংসী এসেছে। ও খুব বুদ্ধিমতী, মাড়ওয়ারী ভক্ত যখন দশ হাজার টাকা দিতে চাইল তখন আমার মাথায় যেন করাত বসিয়ে দিল। মাকে বল্লুম—'মা এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাতে এলি'। সেই সময়ে ওর মন বুঝবার জন্য ডাকিয়ে বল্লুম—ওগো এই টাকা দিতে চাচ্ছে। আমি ত নিতে পারবো না তুমি নাও না কেন? শুনিয়াই ও বলিল—তা কেমন করে হবে? টাকা নেওয়া হবে না। আমি নিলেও টাকা তোমারই নেওয়া হবে। কারণ আমি উহা রাখলে তোমার সেবায় ব্যয় না করে থাকতে পারবো না। ফলে ঐ টাকা তোমারই নেওয়া হল। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্য সুতরাং টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না। ওর ঐ

কথা শুনে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।" মার সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন, নহবতে যাইয়া স্ত্রীভক্তটি মার নিকট সকল কথাই বলিলেন। শুনিয়া মা বলিলেন, "সকালে উনি আমাকে যে ভাবে যেতে বলে পাঠালেন তাইতেই বুঝলুম, উনি মন খুলে যেতে অনুমতি দিচ্ছেন না। তা হলে বল্‌তেন--হাঁ, যাবে বই কি। ঐরূপ না বলে উনি বিষয়ের মীমাংসার ভার যখন আমার উপর দিয়ে বল্লেন, ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক,—তখন স্থির করলাম যাবার সংকল্প ত্যাগ করাই ভাল।"

শ্রীশ্রীমা বেশ আমোদ প্রিয় ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে জনৈকা স্ত্রীলোক শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটি ঔষধের জন্য ধরিয়া বসেন। ঠাকুর পরিহাস করিয়া তাহাকে মার ঘর দেখাইয়া বলিলেন "ঐ ঘরে একটি সন্ন্যাসিনী থাকেন। তিনি নানা রকম ঔষধ পত্র জানেন। তুমি গিয়ে তাঁকে ধর।" স্ত্রীলোকটি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া মার নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ঠাকুর যে ঔষধের জন্য তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন তাহা বলিলেন। মা এই পরিহাস বুঝিতে পারিয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, "আমি ত মা কিছুই জানি না। তিনি ভাল ঔষধ জানেন; তিনি তোমাকে ফাঁকি দিয়েছেন, তুমি ওঁর কথায় ভুলো না। ঔষধ আদায় করে তবে ছেড়ো।" স্ত্রীলোকটি মার কথায় বিশ্বাস করিয়া আবার ঠাকুরের নিকট গেলেন। ঠাকুর কিন্তু কৌশলে তাঁহাকে পুনরায় পূর্ব্ববৎ মার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই ভাবে তিন চারবার দুইজনের নিকট যাতায়াতের পর স্ত্রীলোকটি ঔষধ প্রাপ্তিতে হতাশ হইলেন। তখন মা আর কি করেন, পূজার একটি বিল্বপত্র তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এতেই তোমার কাজ হবে।"

উপসংহারে আমরা তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, যিনি আমাদেরই মঙ্গলের জন্য জীবনব্যাপী ত্যাগ, তপস্যা, সাধনভজন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সেই ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতা, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল আমাদের জীবনে মূর্ত্ত হউক। তিনি যেমন বিনা বিচারে সকলকেই আপনার কোলে স্থান দিয়াছেন, আমরাও যেন তাঁহার

আশীর্ব্বাদে হিংসা দ্বেষ জাত্যাভিমান ভুলিয়া সকলকে সমভাবে ভালবাসিতে পারি, আমাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া তৎস্থলে যেন উদারতার আবির্ভাব হয়। বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সময় তাঁহার জীবনই আমাদের এক মহান আদর্শ। আমরা যেন এই আদর্শের প্রতি উদাসীন না হই।

—অচ্যুতানন্দ।

জাতি-সংগঠক স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জাতীয় সাধনার সংরক্ষণ ও পরিপোষণের জন্য এমন একটি শক্তি-কেন্দ্রের আবশ্যক হয়, যাহা নেশনের অন্তর ও বাহিরের যাবতীয় আবেষ্টনীকে জাতীয় সাধনার অনুকূল করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। রাজনীতিতে আমরা সেই বিশিষ্ট শক্তি-কেন্দ্রেরই আলোচনা করিয়া থাকি। ভারতে যে আদর্শে সমাজ ও বর্ণাশ্রমাচারের পত্তন হইয়াছিল, সেই আদর্শ ও তদানুসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর করালগ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া নেশনের গতির পথ প্রশস্ত রাখিতে ভারতীয় রাজনীতির উদ্ভব হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশসমূহে যে প্রকার রাজনীতি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া নেশনের সর্ব্ববিভাগে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, ভারতের আধ্যাত্মিক জাতীয়-জীবনে রাজনীতি সেইভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু কখনও কখনও স্বাধিকার প্রমত্ত ক্ষত্রিয়-শক্তির হাতে ভারতের রাজনৈতিক আদর্শ পঙ্গু হইয়াছিল এবং সেই মদমত্ত ক্ষত্রিয় শক্তির হাত হইতে নেশনকে বাঁচাইয়া রাখিতে প্রাচীন ভারতকে অনেক শক্তিক্ষয় করিতে হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক জীবন-প্রণালী (Spritual scheme of life) গঠন করিয়া ভারতীয় নেশন পরমার্থ বা মোক্ষের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচাররূপ দায় গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতা অতি নিম্ন অধিকারীকেও বঞ্চিত করে নাই এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিকে সুনিয়মিত করিয়া মোক্ষাভিমুখে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বর্ণাশ্রমাচারের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই Spritual scheme of life এর একাঙ্গরূপেই ভারতীয় রাজনীতিকে বুঝিতে হইবে। স্বাধীন ভাবে রাজনীতি যখনই ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবের বিরুদ্ধে উদ্দাম স্রোতে চলিয়াছে তখনই উহা নিজে বিপথগামী হইয়া নেশনকেও বিপথগামী করিয়াছে।

ভারতীয় রাজনীতির দুইটি বিশেষত্ব। প্রথম—গ্রাম বা পল্লীসমূহকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া উত্তরোত্তর নেশনটিকে গঠিত করিয়া তোলা। দ্বিতীয়—রাজ ধর্ম্ম ও প্রজা-ধর্ম্মকে একই আধ্যাত্মিক প্রণালীর ভিতর ফেলিয়া দিয়া তাহাদের প্রত্যেককে নিজের ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে বাধ্য করা। ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমাচার আইন প্রণয়ন প্রভৃতি করিতেন—সত্যদ্রষ্টা ঋষি, যাঁহার সমাজের সঙ্গে কোন আদানপ্রদানের সম্বন্ধ ছিল না, সুতরাং তাঁহার কার্য্যে পক্ষপাতিত্ব দোষ থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত না। জাতীয়-জীবনের কর্ণধাররূপে তাঁহারা বিধি নিষেধ প্রভৃতির প্রণয়ন করিতেন আর রাজশক্তি সেই সমাজ-আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মন্ত্রীসভার সাহায্যে সেই বিধানসমূহ সমগ্র দেশে চালাইয়া দিতেন। রাজধর্ম্ম বা রাজশক্তির কর্ত্তব্য এবং প্রজাধর্ম্ম বা প্রজাশক্তির কর্ত্তব্য,—দুইটিই বর্ণাশ্রমাচারের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং উভয়-শক্তিকেই ঋষি-প্রচারিত বিধানসমূহকে মানিয়া চলিতে হইত। প্রজাশক্তি শাস্ত্রোক্ত পন্থাবলম্বন করিয়া বর্ণাশ্রমাচারের সাহায্যে জীবন-নিয়মন ও পরমার্থ রসাস্বাদের প্রচেষ্টা করিতেন, আর রাজশক্তি প্রজাশক্তির যাবতীয় বিঘ্ন অপসারিত করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতেন। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সংগ্রামের ফলে ইউরোপের ইতিহাসে এই দুইটি শক্তি একীভূত হইয়া যাইবার একটা প্রবণতা বর্ত্তমান।

কিন্তু কেবলমাত্র অধিকার বা rightsই তাহাদের ভিত্তিভূমি বলিয়া এবং রাজ-শক্তিকে নিয়মিত করিবার কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির অস্তিত্ব না থাকায় কিছুকাল পরেই রাজ-শক্তি Organised violenceএ পরিণত হইয়া যায় এবং পুনর্ব্বার প্রজাশক্তি রাজ-শক্তিকে আপন অঙ্গে মিশাইয়া দিতে অগ্রসর হয়। সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমরা এই Processটিই দেখিতে পাই। প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিতে ঐ প্রকার একীভূত হইবার ভাব ছিল না। একই আধ্যাত্মিক জীবন প্রণালীতে দুইটি শক্তিই স্বাধীন ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিয়া চলিতেন। এই যে একই Spritual schemeএর ভিতর রাজশক্তি ও প্রজা-শক্তির Dichotomy বা দ্বৈত-ভাব তাহাই ভারতীয় রাজনীতির বিশেষত্ব। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র নগর, নগরের ধন ঐশ্বর্য্যের আগমন গ্রাম হইতে। স্বদেশস্থ দরিদ্রের ধনহরণ করিয়া ও বাণিজ্য-নীতি সহায়ে পরস্বাপহরণ করিয়া ইউরোপের নাগরিক সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র-গ্রাম, গ্রাম হইতেই বড় বড় ভাবসমূহ উত্থিত হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—ইতিহাস তাহার প্রমাণ। গ্রামবাসিগণ স্বীয় শস্যাদির ষষ্ঠাংশ মাত্র প্রদান করিয়াই সুখী থাকিতেন, নির্ব্বিবাদে আপনাদের স্বধর্ম্ম পালন করিতেন, আর রাজ-শক্তি করস্বরূপ প্রাপ্ত সেই ষষ্ঠাংশের সাহায্যে আপদাদি দমন করিয়া প্রজাধর্ম্ম পালন সুগম করিয়া তুলিতেন। সমগ্র নেশনের স্বধর্ম্ম রক্ষার সুবিধা জন্মাইয়া দিবার নিমিত্তই দণ্ড বা Sovereignty রাজ-শক্তির হস্তে প্রদত্ত হইত।

তবে কি প্রাচীন ভারতীয় নেশনের স্খলনযোগ্য কোনই দোষ ছিল না? যদি না থাকিত, তবে এত বড় নেশনটি অধঃপতিত হইল কি প্রকারে? আমাদের প্রাচীন সমাজবন্ধনের ভিতর দুই একটি ত্রুটী ছিল, সেইজন্য কতকগুলি গুরুতর সমস্যার মীমাংসা সেই যুগে হইতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের নিরাশ হইবার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ আমরা বুঝিতে পারিব—আমাদের

জাতি-সংগঠক সেই গুরুতর সমস্যাগুলিরও মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন আর তাঁহার প্রদর্শিত কর্ম্ম-প্রণালী অবলম্বন করিলে বর্ত্তমান যুগে আমরা বাঁচিয়া যাইতে পারিব—ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে বাধ্য হইলেও মধ্যে মধ্যে ক্ষত্রিয়কুল উদ্ধত হইয়া প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে ক্ষত্রিয়কুল রাজ-ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন এবং বৈদিক-সভ্যতার বিরোধী হইয়া আর্য্য-সমাজকে বিভীষিকা সঙ্কুল করিয়া তুলিতেন। অন্যদিকে পুরোহিতকুল কখনও বা প্রজাবর্গের পক্ষ সমর্থন করিয়া রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেন আবার কখনও ছলে বলে কৌশলে ক্ষত্রিয় রাজশক্তিকে ক্রীড়াপুত্তলিকায় পরিণত করিয়া বৈশ্য ও শূদ্রকে শোষণ করিতেন। এই দুই শক্তির বিবাদ ভারত-ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায় এবং ব্রাহ্মণ ও পুরাণাদির ভিতর দিয়া এই বিবাদ-সূত্র ধরিতে পারা যায়।

'The degeneration of India came not because the laws and customs of the ancients were bad, but because they were not allowed to be carried to their legitimate conclusions * * Ancient India had for centuries been the battle field for the ambitious projects of two of her foremost classes —the Brahmanas and the Kshatriyas. On the one hand the priest-hood stood between the lawless social tyranny of the Princes over the masses, whom the Kshatriyas declared to be their legal food. On the other hand the Kshatriya power was the one potent force which struggled with any success against the spiritual tyranny of the priest-hood and the ever-increasing changes of ceremonials, which they were forging to bind down the people with "*

প্রাচীন ভারতে এই ক্ষত্রিয়-সমস্যার সমাধান হইতে পারিত

* Reply to Maharaja of Khetri

যদি প্রজাবর্গ সুশিক্ষিত হইয়া রাজ-শক্তির আইন-প্রণয়ন ভাগটি (Legislative power) স্বহস্তে আনয়ন এবং কার্য্য নিয়মন বা Executive powerটি আপনাদের অনুমোদিত ক্ষত্রিয় শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিতেন। কিন্তু প্রাচীন ভারত জনসাধারণের ভিতর স্বায়ত্ত-শাসন সম্প্রসারিত করিয়া বিকট ক্ষত্রিয়-সমস্যার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। "হউন যুধিষ্টির বা রামচন্দ্র বা ধর্ম্মাশোক বা আকবর পরে যাহার মুখে সর্ব্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ হয়। সর্ব্ব-বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্ম-রক্ষা শক্তির স্ফূর্ত্তি কখনও হয় না। সর্ব্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। দেবতুল্য রাজাদ্বারা সর্ব্বভাবে পালিত প্রজাও কখন স্বায়ত্ত-শাসন শিখে না; রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্ব্বীর্য্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়। ঐ "পালিত" "রক্ষিতই" দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্ব্বনাশের মূল।

"মহাপুরুষদিগের অলৌকিক প্রাতিভ-জ্ঞানোৎপন্ন শাস্ত্র-শাসিত সমাজের শাসন রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, মূর্খ, বিদ্বান্ সকলের উপর অব্যাহত হওয়া অন্ততঃ বিচার সিদ্ধ, কিন্তু কার্য্যে কতদূর হইয়াছে বা হয়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শাসিতগণের শাসন কার্য্যে অনুমতি—যাহা আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং যাহার শেষবাণী আমেরিকার শাসন-পদ্ধতি-পত্রে অতি উচ্চরবে ঘোষিত হইয়াছে এদেশে প্রজাদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে—যে একেবারেই ভারতবর্ষে ছিল না, তাহাও নহে। যবন পরিব্রাজকেরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন তন্ত্র এদেশে দেখিয়াছিলেন, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও স্থলে স্থলে নিদর্শন পাওয়া যায় এবং প্রকৃতি দ্বারা অনুমোদিত শাসন পদ্ধতির বীজ যে নিশ্চিত গ্রাম্য পঞ্চায়েতে বর্ত্তমান ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বীজ যে স্থানে উপ্ত হইয়াছিল, অঙ্কুর সেথায় উদ্গত হইল না, এ ভাব ঐ গ্রাম্য পঞ্চায়েত ভিন্ন সমাজ মধ্যে কখনও সম্প্রসারিত হয় নাই।" *

* বর্ত্তমান ভারত।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে প্রজা-ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় সাধনার প্রচার এবং লৌকিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দ্বারা প্রজাধর্ম্মের আদর্শ পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। সনাতন ধর্ম্মের যাবতীয় দায় জনসাধারণ গ্রহণ করিয়া তদনুসারে জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেই প্রজা-ধর্ম্মের পত্তন হইবে। সুতরাং আমাদের প্রথমতঃ দেখিতে হইবে রাজনীতি যেন কখন আধ্যাত্মিক ভিত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া ইউরোপাদি দেশের ন্যায় স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ না করে। অর্থাৎ রাজনীতি যেন আমাদের আধ্যাত্মিক ভিত্তি ও সমাজাদর্শের অনুকূল হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য রাজনীতির অনুকরণ করিলে আমাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ যথার্থ জাতীয়-শিক্ষার প্রচার দ্বারা পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণরূপ দায় জনসাধারণের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে।

Where are the people? The tyranny of a minority is the worst tyranny that the world ever sees. A few men who think that certain things are evil, will not make a nation move. Why does not the nation move? First educate the nation, create your legislative body and then the law will be forthcoming. First create the power, the sanction, from which the bane will spring The kings are gone, where is the new sanction, the new power of the people? Bring it up * *you must go down to the basis of the thing, to the very root of the matter That is what I call radical reform Put the fire there and let it burn upwards and make an 'Indian Nation' *

ভাব ও চিন্তার সম্প্রসারণই জীবনের লক্ষণ। কোন নেশন জীবিত কি মৃত তাহার একমাত্র চিহ্ন এই—জগৎ সভ্যতায় সেই নেশনের দান করিবার কিছু আছে কি না। ভারতীয় নেশনে যখনই সম্প্রসারণের ভাব আসিয়াছে, তখনই ভারতবর্ষ আপনার আধ্যাত্মিক চিন্তাসমূহ ও সভ্যতার আদর্শ মিশর, বাবিলন, এশিয়া-মাইনর, চীন প্রভৃতি দেশে প্রচার করিয়াছেন। প্রত্যেক নেশনের যেমন একটি বৈদেশিক নীতি থাকে,

* My plan of Campaign

যাহার সাহায্যে সেই নেশন কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত বিবাদ উত্থাপন করিয়া আপনার বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে,—তেমনি ভারতেরও একটি বৈদেশিক নীতি আছে—তাহা বেদান্তের নব-সভ্যতা সংগঠনী বাণী। স্বামী বিবেকানন্দ এই বাণীকেই ভারতের বৈদেশিক নীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সমগ্র জগতে এই বাণীর প্রচার দ্বারা ভারতীয় জাতি-সংগঠনের কতদূর সাহায্য হইবে, তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। বিশ্ব-সভ্যতায় বেদান্ত প্রচার দ্বারা ভারতীয় নেশনের কি উপকার সাধিত হইবে, আমরা তাহার আলোচনা করিতেছি।

(১) কতকগুলি ভাবদ্বারাই পাশ্চাত্য-সভ্যতা আমাদের নিকট তাহার শ্রেষ্টত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ইউরোপীয় সভ্যতার উপর কটাক্ষপাত করিতেছেন। এই সময় যদি ভারতের সনাতন-সাধনা নবীনালোক প্রদান করিয়া ভারতীয় চিন্তার প্রতি সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বজাতির সম্মান আকর্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলে বিশ্ব-জাতি সংঘে ভারত-মাতা উচ্চাসন গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য-সভ্যতার এই পতনের যুগে একমাত্র ভারতীয় বেদান্তই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ।

(২) সম্প্রসারণই জীবনের লক্ষণ; সুতরাং নবীন নেশন প্রতিষ্ঠার যুগে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবের সম্প্রসারণ বাঞ্ছনীয়।

(৩) আদান-প্রদান জগতের নিয়ম। পাশ্চাত্য-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ভারতকে গ্রহীতা সাজিতে হইয়াছে। ভারত তাহার অমূল্য ভাবরাশি প্রচার করিয়া দাতার আসন গ্রহণ করুন এবং আদান-প্রদান রূপ জাগতিক নিয়ম রক্ষা করুন।

(৪ প্রত্যেক জাতির নিকট প্রত্যেক জাতিরই অনেক শিখিবার আছে। ভিক্ষুকের মত কাহারও কাছে গেলে অবজ্ঞা ও তাচ্ছল্যই পাওয়া যায়। সুতরাং ভারত তাহার আধ্যাত্মিক ভাব প্রদান করুন এবং তৎপরিবর্ত্তে সসম্মানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও গণতান্ত্রিক ভাবসমূহ গ্রহণ করিয়া আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত সমন্বিত করিয়া লউন।

(৫) একের সহিত অন্যের তুলনা করিলেই দোষ-সংশোধন ও

গুণবর্দ্ধন সম্ভাবিত হয়। ভারত-ভারতী জগতের সর্ব্বত্র গমনাগমন করিয়া নিজের সভ্যতার সহিত অন্যান্য দেশের সভ্যতার তুলনা করুন এবং উদার হউন।

(৬) ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে যে সকল বিবাদ বিসংবাদ বর্ত্তমান রহিয়াছে—তাহা বেদান্তের বাণীপ্রচাররূপ নীতির সাহায্যে পর্য্যুদস্ত হউক এবং জাতীয় জীবনের বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহ সংহত হইয়া নেশনের পথের কণ্টক অপসারিত করুক।

(৭) মানব সভ্যতার শৈশব হইতে ভারত ভিন্ন অন্যান্য সকল দেশ পররাজ্য লুণ্ঠন ও পরস্বাপহরণে আপনাদের শক্তিক্ষয় করিয়াছে। আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সিজার, চেঙ্গিস্ খাঁ প্রভৃতি বিরোচন সন্তানগণ নবরক্তে পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতে যখনই সম্প্রসারণের যুগ আসিয়াছে তখনই ভারত সমগ্র জগতে একমাত্র প্রেম, সত্যানুরাগ ও শান্তির বার্ত্তাই প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধ-যুগের বহু পূর্ব্ব হইতেই নিবৃত্তি বাণীর একমাত্র বাহক ভারতবর্ষ। ভারতের চিরন্তন আদর্শ "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" ভারত চিরকাল তাহার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখুন। এই সম্বন্ধে স্বামিজী বলিতেছেন—

"For a complete civilisation the world is waiting, waiting for the treasures to come out of India, waiting for the marvellous spiritual inheritance of the race which through decades of degradation and misery, the nation has still clutched to her breast * * Therefore we must go out, exchange our spirituality for anything they have to give us, for the marvels of the region of spirit we will exchange the marvels of the region of matter."

উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে—আমাদের অন্তর্দৃষ্টি ও মেধা আমাদিগকে অযথা শক্তিক্ষয়কারী কর্ম্ম-প্রণালী হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ভারতীয় সমস্যার যথার্থ অববোধ ও মীমাংসায় যত্নপর করিয়া তুলুক এবং সঙ্কীর্ণভাব ও একদেশী কর্ম্ম-প্রণালীর ভিতর হইতে বহির্গত হইয়া আমরা যেন যথার্থ বিজ্ঞানালোকে প্রবুদ্ধ হই—ইহাই শ্রীভগবৎ চরণে প্রার্থনা।

(সমাপ্ত) —অব্যক্তানন্দ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ

আজ বুধবার ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬ সাল। আজ মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদের একটি সাধারণ সভা হইবে। এতদুপলক্ষে বাগবাজার হইতে পূজনীয় শরৎ মহারাজ আসিয়াছেন। উপরে মহারাজের ঘরের সম্মুখস্থ গঙ্গার দিকের বারাণ্ডায় শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজ, শরৎ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রত্যেকেই স্ব স্ব নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট আছেন। শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ পাশাপাশি উত্তরাস্য হইয়া এবং খোকা মহারাজ একখানি সাদা চাদর ঢাকা পুরাতন কোচের উপর পূর্ব্বাস্যে বসিয়াছেন। মেজেতে সতরঞ্চি পাতা—তাহার উপর সুধীর মহারাজ, অমূল্য মহারাজ, নীরোদ মহারাজ, শচীন, ব্রহ্মচৈতন্য প্রভৃতি মঠের সকল সাধু ও ব্রহ্মচারিগণ বসিয়া আছেন।

পূজনীয় শরৎ মহারাজ মঠে কাহার কি অসুবিধা, বাধা বিঘ্ন হইতেছে তাহা জানাইতে বলিলেন। কেহই বিশেষ কিছু উচ্চবাচ্য করিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ শচীনকে (স্বামী চিন্ময়ানন্দকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহার কি অসুবিধা হইতেছে। শচীন বলিল—পূর্ব্বে আমি পড়াশুনার অসুবিধা বোধ করিতাম। এখন ভজনে মন লেগেছে। অতএব এখন আর বিশেষ অসুবিধা নাই।

ব্রহ্মচৈতন্য :—মঠে পড়াশুনার বড়ই অভাব, একজন পণ্ডিত থাকলে ভাল হয়।

মহারাজ :—কেন ? তুমি তো শুকুলের কাছে পড়ছো। শুকুল তো পণ্ডিত, আবার ভাল সাধু।

ব্রহ্মচৈতন্য তখন পূজনীয় শুকুল মহারাজকে স্বামিজীর পুস্তক পড়িয়া শুনাইতেন। যেখানে কিছু সন্দেহ হইত তিনি বুঝাইয়া

দিতেন। তিনি মঠে গঙ্গার ধারে কোনও গাছতলায় বসিয়া পাঠ শুনিতে ভালবাসিতেন।

মহারাজ নিজ আসন হইতে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন :—স্বামিজী আমেরিকা যাবার আগে আমাকে ও হরি মহারাজকে Mt. Abuতে (আবু পাহাড়ে) যে চিঠি লেখেন, তাতে আমার এই কথাগুলো জ্বলন্ত মনে রয়েছে—হরি ভায়াও সে কথাগুলো প্রায়ই উত্থাপন করেন। সে কথাগুলা হচ্ছে, "জগদ্ধিতায় বহুজন সুখায় হচ্ছে ধর্ম্ম, আর নিজের জন্য যা করা যায় সবই অধর্ম্ম।" উঃ কত বড় কথা বল দিকিনি? এ কথার কি value (মূল্য) আছে!!

"তোমাদের ভিতর শুনতে পাই, কেহ কেহ বলে, মিশনের সব কাজগুলো সাধনের অন্তরায়। Famine work (দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য্য) ইত্যাদি করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। বাবুরাম মহারাজ ও আমি নাকি ওগুলো বড় prefer (পছন্দ) করি না—এ সব ধারণা তোমাদের সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের ভাব তোমরা বুঝতে পার না, তোমাদের উচিত—ভাবটা নেওয়া। অবশ্য আমি একথা পুনঃ পুনঃ বলি এবং এখনও জোর করে বলছি—যে Famine work প্রভৃতি যে কাজই করতে যাও, সকালে উঠে ও সন্ধ্যায় বা কর্ম্মের শেষে এক একবার ভগবানকে ডেকে নেবে, জপ ধ্যান করবে। তবে in case (যদি) কাজের pressureএ (চাপে) এক আধ দিন হলো না—সে আলাদা কথা। স্বামিজীর মুখে প্রায়ই একথা শুনতুম—work and worship কাজও কর, ধ্যান জপও কর। দিন রাত কি আর কেউ ধ্যান ভজন করতে পারে? কাজেকাজেই তাকে নিষ্কাম কর্ম্ম করতেই হবে। তা না কর, নানা প্রকার কুচিন্তা, বাজে চিন্তা মনে আসবে। তার চেয়ে ভাল কাজ করা কি ভাল নয়? গীতা এবং অন্যান্য সকল শাস্ত্রও তো ঐ কথাই জোর করে বলেছেন, দেখতে পাবে। আমিও নিজের experience (অভিজ্ঞতা) থেকে বলছি। আমি কি মঠের জন্য কম খেটেছি—জিজ্ঞাসা কর না শরৎ মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজকে। স্বামিজীর আদেশে, এমন যে হেয় স্থান Attorney office সেখানেই কত

হত্তে দিয়েছি। এমনকি স্বামিজীর গর্ভধারিণী মায়ের জন্তেও। এখন তো তোমরা ট্রেণ ভাড়া, এবং যেখানে যাচ্ছ খাওয়া দাওয়া সব পাচ্ছ, তখন কোথায় খাওয়া দাওয়া তার ঠিক নেই, অথচ 'বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায় কাজ কোরে গেছি।'

"তোমাদের চোখের উপর কি ভয়ানক লড়াই হচ্চে দেখতে পাচ্ছ না? ওরা তুচ্ছ স্বদেশের জন্য ধনী, নির্ধন, যুবা, বৃদ্ধ, সুন্দরী স্ত্রী, ভোগ বিলাস সব ত্যাগ করে নিজের নিজের কাঁচা মাথা দিচ্ছে, আর তোমরা তাদের চেয়েও এক মহত্তম উদ্দেশ্যে—ভগবান লাভের জন্য—জগতের হিতের জন্য—বাড়ী ঘর সব ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের কাছে জীবন মন প্রাণ সব সমর্পণ করেছ, তবুও কর্ম্মে বিরক্তি প্রকাশ কর। স্বামিজী আমাদের বলতেন—ওরে, 'বহুজনহিতায়' যদি একটা জন্ম বৃথাই গেল এরূপ মনে করিস্—তা গেলই বা—কত জন্ম তো এমন অলসে বৃথা গেছে, একটা জন্ম না হয় জগতের কল্যাণের জন্য গেল, ভয় কি? আর ভয়েরও কারণ নেই, শাস্ত্র বলছে, নিষ্কাম কর্ম্ম কোরলে ভগবান লাভ হয়। গীতায় বলছে—"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" "অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।" একখানা গেরুয়া পরে হৃষিকেশে গিয়ে, দুখানা রুটি ভিক্ষে করে খেয়ে, দু-চারটে শ্লোক মুখস্থ কোরলেই কি সাধু হলো নাকি? দেখছি তো তোমাদের ভেতর যারা যারা হৃষিকেশে গিয়েছিলে, কি spiritual (আধ্যাত্মিক) উন্নতি কোরে এসেছ? একটাকেও তো আমি দেখছি না। সেখানকার সব মন্দ ভাব কেবল নিয়ে এসেছ। কেউ বা রোগে পড়ে আবার সেই মিশনের কোনও আশ্রয়ে ঢুকলে। কেন, এমন বৈরাগ্য নেই যে গাছ তলায় পড়ে থাকবো? মিশনের কাজ কোরবো না বলে সরে পড়লুম, আর সেই মিশনের সেবা নিতে আসবো? দুমাস হৃষিকেশ, দুমাস লছমন ঝোলা, দুমাস কনখল, দুমাস উত্তরকাশী, দুমাস রামেশ্বর এই রকম এখানে ভাল লাগছে না সেখানে, আবার সেখান থেকে অন্যত্র!! Young ageএ (যৌবনে) এই রকম কোরে যদি ঘুরে বেড়াও শেষে যে ভবঘুরে হয়ে পড়বে? Lifeটা most miserable হবে।

"স্বামিজী একদিন বল্লেন,—দেখ, আজ কালকার নূতন ছেলেরা যারা সব আসবে, তারা তো দিন রাত ধ্যান ভজন নিয়ে থাকতে পারবে না, তাই এই সব relief work (সেবাকার্য্য) প্রভৃতি খোলা। দিন রাত যদি কেউ ধ্যান, ভজন, পাঠ নিয়ে থাকতে পারে সে তো উত্তম কথা, কিন্তু practically (কার্য্যতঃ) তা হয় না, শেষে কুড়েমির আশ্রয় করে থাকে। আর দেখ না, ভাল কাজের একটা ফল আছেই আছে—সেটা যাবে কোথা? সেই ফলই তোমার মুক্তির পথ পরিষ্কার কোরে দেবে। দেখছি, হৃষিকেশে যারা ২।৪ বছর কাটিয়ে আসছে তাদের চেয়ে যারা একজায়গায় স্থির হয়ে বসে ধ্যান, ভজন, কাজ কর্ম্ম নিয়ে আছে, তারা যেন তাউই এর মতন উঠে যাচ্ছে। কাশী সেবাশ্রমের চারু বাবুকে দেখছি বছর, বছর উন্নতি কচ্ছে। অত বড় একটা কাজ মাথার উপর রয়েছে, দিন রাত কাজ কচ্ছে। তবুও খোঁজ নিয়ে জানলুম প্রত্যহ বৈকালে বা সন্ধ্যার সময় লুকিয়ে বেণী পণ্ডিতের বাগানে বা গঙ্গার ঘাটে ঘণ্টা খানেক ভগবানের নাম টাম, ধ্যান ভজন করে আসে। কল্যাণ স্বামীকে দেখলুম, সেই যে একবার হরিদ্বারে গিয়েছে—আর নেমেছে? ক্রমে ক্রমে কত বড় একটা সেবাশ্রম করে ফেল্লে। তাতে সেখানে কত লোকের উপকার হচ্ছে। ঐ সেবাশ্রমে দেখেছি কত হিন্দুস্থানী সাধু প্রত্যহ এসে পেটের অসুখের দাওয়াই নে যাচ্ছে, আবার ভাণ্ডারা খেতেও ছাড়বে না। কতবার বলেছি, তাতে বলে, "কেয়া করেগা, মহারাজ। উস্‌দিন সব ছত্র বন্ধ কর দে তা হায়।" বল্লুম,—ছত্র বন্ধ করে দেয় তো গ্রামে গিয়ে মাধুকরী কর না কেন? সে-পরিশ্রম কোরতেও নারাজ। ঐ দিকে দুটো চারটে ভাল সাধু পাওয়া যায় যাদের সঙ্গ করা যায়, আর সব ঐ ক্লাসের। দুটো শ্লোক মুখস্থ করে রেখেছে, আর তাই আওড়াচ্ছে, ব্যাস। স্বামিজীর এই সব মঠ টঠ্ করবার উদ্দেশ্য, পরে যারা সাধু হবে, ঐ টানে না পড়ে যায়, আর আদর্শের দিকে যাতে এগুতে পারে। তা না হলে তিনি নিজে তো বেশ সুখে কাটিয়ে যেতে পারতেন। এত কষ্ট করে মঠ টঠ্ করবার কি দরকার?

"এই দেখ না, তোমরা গোটাকয়েক সাধু একমন একপ্রাণ হয়ে

ভগবানে মনপ্রাণ ঢেলে যখন কাজ কোরতে লেগে গেলে, কত বড় বড় কাজ সুসম্পন্ন হলো ও হচ্ছে। unity (একতা) থাকলে অল্প লোকেও কত বড় বড় কাজ সুচারুরূপে কোরতে পারে, তোমরাই তো তা জগৎকে দেখাচ্ছ। ক্ষুধায় কাতর হোয়ে যারা মচ্ছে, তাদের মুখে যদি দুটো অন্ন দিতে পার, লক্ষ জপের কাজ হবে। শুধু অন্ন দিলেই চলবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে যত পার সদুপদেশ দিতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে। তোমরা এটা বেশ জেনো, যে কাজে ফাঁকি দিবে সে নিজেই ফাঁকে পোড়বে।”

মাধুকরী

মহাত্মাজী বলেন:—আমি সর্ব্বদাই যুবকদিগকে চরিত্র গঠনের আবশ্যকতার কথা বলিয়া আসিতেছি। জাতীয় জাগরণের পক্ষে পবিত্রতার একান্ত আবশ্যক। পল্লী সংগঠন কার্য্যে এমন কর্ম্মীর আবশ্যক যে তাহাদের চরিত্রে কোনও খুঁত থাকিবে না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রবর্ত্তিত অন্যায় উপায, দারিদ্র্য, অপরিচ্ছন্নতা এবং আলস্যই গ্রাম সমূহের ধ্বংসের মূল কারণ। পুরাতন ভারতের পল্লী সমূহ আত্মনির্ভরশীল ছিল। সভ্য সমাজের যাহা কিছু কাঙ্ক্ষিত সমস্তই তথায় সুলভ ছিল। তখন বর্ত্তমান কালের মত গ্রামের প্রধান ব্যক্তি স্বার্থপর ছিলেন না। তিনি গ্রামবাসীর সেবক ছিলেন। স্ত্রী পুরুষ, যুবক বৃদ্ধ, গ্রামের সকলকেই তিনি চিনিতেন। এখন কোনও গ্রামে এমন অবস্থা দেখা যায় কি? পল্লী-জীবন ধ্বংস হইয়াছে। অপরিচ্ছন্নতা, দারিদ্র্য, এবং অলসতার ফলে ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগে গ্রামবাসীরা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। পতিত দলিত হইলেও জাতিত এখনও বাঁচিয়া আছে। এই পতন মাত্র সামান্য কয়েকদিন যাবৎ—মাত্র তিন শত বর্ষ হইল এই পতন হইয়াছে। আমি চরিত্রবান যুবকদিগকে গ্রামে যাইতে বলিতেছি। তাহারা এখনও গ্রামে জীবনের সাড়া পাইবে।

পুস্তক-পরিচয় ও সমালোচনা

১। **রামপ্রসাদ**—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য পাঁচ টাকা। সুন্দর বাঁধাই। প্রকাশক, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন। ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মাতৃমন্ত্রের সাধনা যাঁহার মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, যিনি 'মা তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিলি আমাকে দিবি না?'—বলিয়া জগজ্জননীর নিকট আবদার করিয়াছিলেন, সেই মাতৃগত প্রাণ, মাতৃস্বরূপ সর্ব্বজন বন্দিত শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদ-পদ্মে, তাঁহার ও তাঁহার ভক্ত মণ্ডলীর চরিত্র স্মরণ ও মনন করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার অমৃতময়া গীতি নৈবেদ্য, গ্রন্থকার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় নিবেদন করিয়াছেন। রামপ্রসাদ ছিলেন বাংলার সিদ্ধ সাধক, রামপ্রসাদী গান বাঙ্গালীর মর্ম্মের ভাষা ও ধর্ম্ম। যত দিন বাংলা থাকিবে, বাঙ্গালী বাঁচিবে ততদিন তাহার কণ্ঠে ঐ সুর বাজিবে। ও সুরের অর্থ কেবল মা, যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যিনি বাঙ্গালীর ইহকাল পরকাল। বিধি-নিষেধীর খেয়াল ও ধর্ম্মে চলে না। মাতৃস্নেহের অমৃত-সমুদ্রে ও বিধি নিষেধ, ওসব খেয়ালীর হুকুম নিমেষে তলাইয়া যায়।

বাঙ্গালীর নিকট প্রসাদী সংগীতের পরিচয় ও প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। তবে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব উহার শুদ্ধ ও সুন্দর চয়নে আর সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল-করী কার্য্য রামপ্রসাদের জীবনী সংগ্রহে। নিছক্ ভাব গ্রন্থ অপেক্ষা ভাবুকের জীবনী অধিক ধারণার যোগ্য। তাই দর্শনাদি অপেক্ষা ভাব-মূর্ত্ত সিদ্ধ সাধকের অমৃতময় উপদেশ ও জীবনী এত লোক-প্রিয়; কাজেকাজেই এই গ্রন্থ যে জনসাধারণের নিকট উপাদেয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার আর একটি বিশেষ কার্য্য করিয়াছেন। কতকগুলি গানের অর্থ বড় দুরূহ। তিনি ঐ গুলির আধ্যাত্মিক, যৌগিক ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা এবং চিত্র-সম্বলিত করিয়া আরও সহজ-বোধ্য

করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পড়িলে বেশ বুঝা যায় রামপ্রসাদের দার্শনিক অভিমত ছিল অদ্বৈতবাদ এবং সাধনার পরীক্ষাগার ছিল তন্ত্র। বেদান্তের ব্রহ্মকেই তিনি মা বলিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন।

তিনি শুধু সাধক ছিলেন না, ভাবুক কবিও ছিলেন। তাঁহার কালী কীর্ত্তন, শিবসংকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি খণ্ড কবিতা ও কাব্য বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। সাংখ্য-বেদান্ত সম্বন্ধীয় উচ্চতত্ত্ব সমূহ এরূপ সুললিত ভাবে কেহ বাংলা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে রচনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

স্ফটিকে গ্রহণ করে জবাপুষ্প আভা।
স্ফটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জবা॥
প্রাণধন উমা আমার পূর্ণ সুধাকর।
আমা সবাকার তনু নির্ম্মল সরোবর॥
এক চন্দ্র আভা শত সরোবরে লখি।
তমো করে লয় সকল অঙ্গময়,
বিরাজে সে যখন নিরখি॥

তাহা ছাড়া বৈদান্তিকের উদারতাও যে তাঁহার হৃদয়ে যথেষ্ট মাত্রায় ছিল তাহাও তাঁহার সংগীত হইতে প্রমাণিত হয়।

আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্যা,
এবার হয়েছ কোন গোপালের কন্যা।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি দশ অবতার,
নানা রূপে নানা লীলা সকলি তোমার॥

শ্রীযুক্ত অতুলবাবু সত্যই বলিয়াছেন, "বঙ্গ সাহিত্যের একপ্রান্তে শ্রীরামপ্রসাদ আর প্রান্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মধ্যে যেন একটি নদী ব্যবধান। সে নদী বৈতরণী, সাহিত্য ধর্ম্মের সহায়ে যিনি পারে যাইবার আশা রাখেন—আত্মার স্ফূর্ত্তি ও অত্মোন্নতির জন্য উদ্গ্রীব হন, তাঁহাকে এই দুই মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইতে হইবে। অন্ততঃ মাতৃনামের ভেলায় যাঁহারা ভর করেন, তাঁহাদের গতি এই মায়ের 'গণ' প্রসাদ ও মায়ের মূর্ত্তিমান প্রতিনিধি দয়ালঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব। * * * তাহার

সংস্কার করিবার তুমি কে? আগে নিজের সংস্কার নিজে কর—সচ্চরিত্র, সত্যনিষ্ঠ, সরল, দ্বেষহিংসাবর্জ্জিত, দাম্ভিকতাশূন্য, ঈশ্বর বিশ্বাসী কর্ম্মী হও, তবেই মার প্রসন্নতা লাভ করিবে—মাতৃরূপিণী মাতৃভাষার সংস্কার সাধনে সক্ষম হইবে। প্রসাদের চরণ প্রান্তে বসিয়া, ভক্তি শিক্ষা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সান্নিধ্যে উপনীত হও—তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে।"

সংঘ-বার্ত্তা

১। আগামী ২২ পৌষ, ইংরাজী ৬ জানুয়ারী বুধবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ দিন বালকগণের মধ্যে সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যাহারা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে তাহাদিগকে পদক ও পুস্তকাদি পারি-তোষিক দেওয়া হইবে।

২। আগামী ১০ পৌষ শুক্রবার, ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে বেলুড় মঠে ঈশ্বর-তনয় যীশুখৃষ্টের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। সময় অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৫টা।

৩। ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একনিষ্ঠ অক্লান্ত কর্ম্মী প্রফুল্লচন্দ্র বন্দোপধ্যায় বি, ই, ইঞ্জিনিয়ার গত ১০ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীঠাকু-রের পাদপ্রান্তে মিলিত হইয়াছেন। ঢাকা মিশন কায়-মন-প্রাণ দিয়া যাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কাম-কাঞ্চন ত্যাগীর আশ্রয়ে আসিয়া প্রফুল্লচন্দ্র স্ত্রীমূর্ত্তিকে জগজ্জননী মূর্ত্তি ভাবিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঢাকা মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যসেবার জন্য তাঁহার সামর্থানুযায়ী একখানি বাড়ী উৎসর্গ করিয়া সেবার আংশিকভার লাঘব করিয়াছিলেন। তাঁহার অদম্য কার্য্যকরী শক্তি, তাঁহার মিশনসম্পর্কে প্রাণপাত পরিশ্রম, তাঁহার জীবনব্যাপী আদর্শের প্রতি অনুরাগ, তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার কর্ত্তব্য পরায়ণা পত্নী সর্ব্বদা স্বামীর কাজে সহায়তা করিয়া স্বামীকে যশোমণ্ডিত করিয়া তুলিতে যত্নপরায়ণা হইতেন। শ্রীভগবান এই শোক-সন্তপ্ত পরিবারের শান্তি বিধান করুন।

সমর্পণ

স্থূল সূক্ষ্ম বিশ্ব এক সঙ্গীত ঝঙ্কার
অনাদি অনন্তকাল নিরন্তর তার
বহিছে প্রবাহ গূঢ় মধুর ধ্বনিতে,
অব্যক্ত তত্ত্বের আত্ম বিকাশ সঙ্গীতে।
সৃষ্টির কারণরূপ বিন্দু যার নাম
নিখিল আনন্দকন্দ মাধুর্য্যের ধাম।
আকর্ষণ সুর যার, মূর্চ্ছনা বিকাশ,
ব্রহ্ম মান, জাতিত্রয় তাল ত্রয়াভাস,
ষড়জাদি সুর ভূরাদিক সপ্তলোক,
সৃষ্টি ক্ষেম নাশ মাত্রা, এই তত্ত্বালোক
গুপ্ত ছন্দো দিব্য জ্ঞান অবিদ্যা বাধক,
হে গুরো! জেলেছ হৃদে, তাই এ সাধনা
তোমারি চরণে দিনু। কুসুম তোমার,
তব সূত্র, তব সূচী, কেবল আমার
মালিকা রচনা, তাহে যত দোষ মম
হে দয়াল, কৃপা করি নিজগুণে ক্ষম

শ্রী—

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী মাঘ মাসে "উদ্বোধনের" ২৮শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। নব বর্ষের প্রারম্ভ হইতে ধর্ম্ম, শিক্ষা, সেবা ও সমাজ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ও মীমাংসা "উদ্বোধনে" প্রকাশিত হইবে। প্রশ্ন সমূহের সদুত্তর "উদ্বোধনের" গ্রাহক গ্রাহিকা, পাঠক পাঠিকা ও বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট হইতে প্রধানতঃ আমরা আশা করি। প্রশ্ন ও মীমাংসা সহজ, সরল, অর্থপূর্ণ ভাষায় ও যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে হওয়া বাঞ্ছনীয়। নামধামহীন প্রশ্নোত্তর এবং বাদানুবাদ ধারাবাহিকরূপে ছাপা হইবে না। কোন প্রশ্ন ও উত্তর প্রকাশ করা বা না-করা সম্পাদকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

Printed by MANMATHA NATH DASS.
SRI GOURANGA PRESS, 71/1, Mirzapur Street, Calcutta
Published by: BRAHMACHARI KAPILA
Udbodhan Office 1, Mukherji Lane Calcutta

১০।৮।২৫